অপরাধ-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল,
এম্. এস্-সি, ডি-ফিল্.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত
চতুর্থ সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৭২

অপরাধ-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

অপরাধ-পদ্ধতি

প্রচলিত চৌষট্টিটি কলার মধ্যে অপকার্য একটি বিশেষ কলা বা আর্ট। এই বিশেষ কলা [Art] অপরাধীদের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির [Modus-operandi] মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সকল অপরাধ-পদ্ধতি অপরাধীরা জন্মগত, কিংবা অভ্যাসগতভাবে লাভ করে—সেই সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "অপরাধ বিভাগ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সবল, নির্বল, শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক, শোণিত-সাম্পত্তিক, যৌনজ, অযৌনজ প্রভৃতি বিভাগ সকল কতকটা বংশানুক্রম [Heredity] এবং কতকটা মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর গঠিত। এই সকল বিভাগের সাহায্যে অপরাধী বিশেষ কি প্রকারের অপরাধ করবে, অর্থাৎ কি'না সে সবল অপরাধ করবে কিংবা নির্বল অপরাধ করবে, যৌনজ অপরাধ করবে কিংবা অযৌনজ অপরাধ করবে—তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা তাদের মনোনীত অপরাধটি কিরূপে বা কি উপায়ে সমাধিত করবে, তা নির্ভর করে তাদের [অভ্যাস জাত ?] কার্য-পদ্ধতির [মোডাস-অপরেণ্ডাই] উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শঠতার কথা বলা যেতে পারে। প্রবঞ্চনা তথা চিটিঙ [Cheating]

একটি নির্বল-সাম্পত্তিক অযৌনজ অপরাধ, কিন্তু এই শঠতা বহুবিধ উপায়ে সংঘটিত হয়—অর্থাৎ কি'না এক-এক জন শঠ এক-এক প্রকার কার্যপদ্ধতিতে লোক ঠকায়।

অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ-পদ্ধতির উদ্ভবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে কোনও অপরাধী কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা একবার সফলতা লাভ করলে সে মাত্র সেই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যেই অপকর্ম করতে থাকে। অপর কোনও নূতন অপ-পদ্ধতির কথা সে আর তখন চিন্তা করে না। একই পদ্ধতি পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করার ফলে সেই বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে সে এমনি পাকাপোক্ত হয়ে উঠে যে তখন অবলীলাক্রমে, অনায়াসে বা অল্প আয়াসে এবং নির্ভুলভাবে সে উক্ত পদ্ধতি দ্বারা অপকর্ম করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে বহুদিন সময় লাগে। এই কারণে একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি আয়ত্ত্বে আনা সময় সাপেক্ষ ত বটেই, তা ছাড়া মুহুর্মুহু এইরূপ পদ্ধতি পরিবর্তন করা সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। প্রথম অবস্থার অপরাধীরা [প্রাথমিক অপরাধীরা] কোনও কোনও সময় একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্রকৃত বা শেষ অবস্থার অপরাধীরা কদাচ এইরূপ কার্য করে না। প্রকৃত অপরাধীদের দলগত অভ্যাস, তাদের সংস্কার এবং ঔৎসুক্যের অভাব এইরূপ কার্যের প্রতিবন্ধক হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় পাঁচমেশালী শহরে প্রাথমিক অপরাধীরা একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর আর একটি পদ্ধতি কোনও কোনও সময় গ্রহণ করে বটে। কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনভ্যাসের কারণে তার ধরাও পড়ে অতি সহজে। পরিশেষে এই সব প্রাথমিক অপরাধীরা পাকাপোক্তভাবে মাত্র একটি পদ্ধতি

অবলম্বন ক'রে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিবৃত শেষ অবস্থার প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা অপরাধ সম্পর্কিত অতিন্দ্রীয়তা অর্জনও উহার অন্যতম কারণ।

প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা তাদের স্ব স্ব গুরুর কাছে এই সব [পৃথক পৃথক] অপরাধ-পদ্ধতি শিক্ষা করে থাকে। স্ব স্ব গুরু, সর্দার বা ওস্তাদ নির্দেশিত পন্থানুযায়ী তারা একই ধরনের অপকর্ম করে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওস্তাদ বা গুরুরা অন্য কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করার জন্যে প্রারম্ভেই সাকরেদ বা শিষ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েও নিয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে যে পকেটমারগণ সিঁদ কাটে না এবং যারা লোক ঠকায় তারা মানুষ মারে না বা সিঁদ কাটে না। যারা গৃহে চুরি করে, তারা পথে চুরি করে না। এমন কি, যারা রাত্রে চুরি করে তারা দিনে চুরি করে না। একমাত্র প্রাথমিক ও দৈব অপরাধীরাই সুযোগমত এক প্রকার অপরাধ ও উহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর একটি পদ্ধতি গ্রহণে প্রয়াস পায় এবং এজন্য অকুস্থলে তারা অতি সহজে ধরাও পড়ে। এদের অনেকেই কোনও গুরু বা ওস্তাদের কাছে অপকর্ম শিক্ষা না করে অপকর্ম শুরু করে। এই কারণে কোনও একটি সুচিন্তিত অপরাধ-পদ্ধতি বেছে নিতে এরা অপারক হয়। বড় বড় শহরে এই ধরনের বহু প্রাথমিক অপরাধী দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই কারণে অনেকে শহরে অপরাধীদের বিভিন্নমুখী [ভার্সেটাইল] অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁদের এইরূপ বিশ্বাস ভুল। কারণ শেষের দিকে এই প্রাথমিক অপরাধীরাও অপকর্মের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে সকল অপকর্মের জন্য একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয় [টিম্ ওআর্ক] সেই সব অপকর্মের জন্য এক-এক দিন

এক-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করাও অসম্ভব। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই অপরাধ-পদ্ধতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

স্ব স্ব অপ-পদ্ধতির প্রতি এদেশীয় অপরাধীদের প্রগাঢ় অনুরাগও দেখা যায়। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"পকেট-মারির মামলায় এক তালাতোড চোরকে ভুলক্রমে সিপাহীরা ধরে আনলে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'আমরা গামছা মারি, কিংবা চাবির কাম করি। বাপু! আমাদের কি এই কাম আছে নাকি?' [চাবি ও গামছা অর্থে সিঁদকাটি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র বুঝায়।] অপর একদিন ডক্-ইয়ার্ড-এর চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে সে উত্তর করে, 'আমি মশাই কেবিন চোর [জাহাজের], আমি ত ডক্ চোর নই'।"

[সুবিধা-অসুবিধা ও মনস্তাত্বিক প্রভৃতি কারণে অপপদ্ধতির বিবিধ বিভাগ নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিবা ও রাত্রি চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। কোনও এক অ্যাংলো দিবা-চোর আমাকে এইরূপ বলেছিল, 'ডে ইজ্ ফর ওআর্ক। নাইট্ ইজ্ ফর এনজয়মেণ্ট। এই জন্যেই আমি দিনেই চুরি করে থাকি।' দিবা-চোরদের নিকট রাত্রে স্ফুর্তি করার সময়। এই সময়টুকু তারা নষ্ট করতে চায় না। এজন্য তারা দিনেই চুরি করে। এ ছাড়া স্বভাব-চোরদের কাউর কাউর অপস্পৃহা মনস্তাত্বিক কারণে রাত্রে আদপেই আসে না। অপপদ্ধতির মনস্তাত্বিক কারণ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি কারণ সম্বন্ধে বলা যাক। দিবাভাগে পুরুষরা বাড়ি থাকে না বলে বহু অভ্যাস-চোর ঐ সময় চুরি করে। এ ছাড়া আমরা এও দেখেছি

যে, য়ুরোপীয় বাড়ির চোর ও দেশীয় ব্যক্তির বাড়ির চোরও পৃথক হয়ে থাকে। কারণ এদের অভ্যাসজাত সুবিধা-অসুবিধা ঐ সকল বাড়ির গঠন, লোকজনদের জীবন-প্রণালী ও উহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করে। উন্নতমনা এবং বনিয়াদি চোররা আবার নিকৃষ্ট প্রকৃতি চোরদের ঘৃণা করে। আমার মতে ইহাও বিভিন্ন অপপদ্ধতি গ্রহণের অপর এক কারণ।]

বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রতিটি অপরাধের জন্য বিবিধ প্রকার অপপদ্ধতি গৃহীত হয়ে থাকে। এ সকল অপপদ্ধতির পশ্চাতে বহু ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণও থাকে। পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ভারতীয় অপরাধীদের কোনও কোনও অপরাধ-পদ্ধতির সহিত পারস্য, চীন এবং য়ুরোপের মধ্যযুগীয় অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতির মিল দেখা যায়। ইহা দ্বারা এইরূপ মনে করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বোধ হয় বাণিজ্য এবং রাজ্য বিস্তারের সহিত এক দেশের অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীদের মিলন ঘটেছে। আমার মতে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে। এই সকল অপপদ্ধতির কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি আধুনিক ও অতি-আধুনিক; কিন্তু পুরাতন পদ্ধতিগুলি কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে পুনরায় পুরানো যুগের গহনার ন্যায় অপরাধীদের দ্বারা পুনঃ গৃহীতও হয়ে থাকে।

অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতিকে আমরা চারিটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, * যথা—(১) কি ধরনের অপকর্ম অপরাধীরা ক'রবে, (২)

[* কারণ বসত বাটীর গঠন এবং গৃহস্বামীর জাতি এবং তৎজনিত তাঁদের আচার-ব্যব-

মনোনীত অপরাধটি তারা কোন সময়ে সমাধা করবে, (৩) ঐ অপরাধ তারা কি ভাবে ও উপায়ে সংঘটিত করবে, (৪) অপকর্ম দ্বারা তারা কি কি প্রকারের দ্রব্য অপহরণ করবে, ইত্যাদি। অপপদ্ধতির এই বিভাগগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা উপরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইবার অপপদ্ধতির অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথমে অপরাধীরা যাহা কিছু সম্মুখে পায় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব দ্রব্য সকল সময় তাবা বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থাদি না পেলে এই সব দ্রব্য অপহরণ করা বা না করা তাদের পক্ষে সমান। এই কাবণে অপরাধীরা মাল পাচারের জন্য 'খাউ' বা চোরাই মালের গ্রাহকদের সহিত ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ থাকে। সকল বামাল-গ্রাহক বা রিসিভাররা যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করে না। এক-একজন বামাল-গ্রাহক এক-এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এই সকল গ্রাহকদের ফরমাস মত অপরাধীরা দ্রব্য আহরণ করে থাকে। অনেক গ্রাহক আবার বিশেষ শ্রেণীর চোরেদেব এজন্য পুষেও থাকে। সাইকেলের গ্রাহকরা কেবলমাত্র সাইকেল এবং ঘড়ির গ্রাহকেবা কেবল মাত্র ঘাড়ই গ্রহণ করে থাকে। এই কারণে আমরা কোন অপরাধীকে কেবলমাত্র ঘড়ি এবং কোনও অপরাধীকে আমবা কেবলমাত্র সাইকেলই চুরি করতে দেখি। শহরে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য বেশি চুরি হবে তা নির্ভর করে তৎকালীন বাজারের দর, চাহিদা এবং বামাল-গ্রাহকদের প্রয়োজন ও নির্দেশের উপর।

হাবের উপরেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, যারা য়ুরোপীয়দের গৃহে চুরি করে তারা ভারতীয়দের গৃহে চুরি করে না। এ ছাড়া স্থান কাল পাত্র ভেদেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। "চৌর্য-অপরাধ" শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।]

অপরাধ-পদ্ধতির প্রতিটি প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে বলা হল। উহাদের অপরাধের ন্যায় অপপদ্ধতিও বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের মধ্যে যৌনজ ও অ-যৌনজ শ্রেণীর অপরাধীরও পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইবার অপরাধসমূহের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির সম্বন্ধে বলা যাক। এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র অযৌনজ প্রবঞ্চনার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আমি ব্যাখ্যা করবো।

প্রবঞ্চনা অপরাধ

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ নির্বল অপরাধ। প্রবঞ্চক অপরাধীদের ছল-চাতুরীর অন্ত নেই। এদের মধ্যে বহু স্বভাবের ব্যক্তি দেখা যায়। বাকচাতুর্য এদের অপকর্মের প্রধান সহায় হয়। তবে এরা যে অত্যন্ত চতুর ও কর্মতৎপর তাতে সন্দেহ নেই। উঁচু শ্রেণীব প্রবঞ্চকদের অধিকাংশ প্রাথমিক অপরাধী। এদের মধ্যে সুশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তিন প্রকারের মানুষ আছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকে মিথ্যা ভাষণে ও ছল-চাতুরীতে অতি দক্ষ। নিম্নোক্তরূপ বিবিধ স্বভাবের প্রবঞ্চক আছে।

(১) কর্মঠ—এরা সত্যকার বহু গুণাগুণের অধিকারী। কেউ কেউ একাউণ্টে পারদর্শী। কারুর ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক জ্ঞান প্রখর। স্বভাব-অলস হলেও কিছু সময় এরা কর্মতৎপরতা দেখায়। কিন্তু অলসতার কারণে এরা মধ্যে মধ্যে অন্তর্ধান হয়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে এরা অপারক। গৃহীত অর্থ খরচ করে ফিরে এসে তারা অজুহাত ও

কৈফিয়ৎ দেয়। এরা প্রচুর আশা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উভয়কে এরা ঠকায়।

(২) অভাবী—এরা অভাবগ্রস্ত ভদ্র মানুষ। অভাব মেটাতে এরা চুরি করতে অপারক। পরিশেষে এরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এরা নিজেরা ঠকে ঠকে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যেভাবে এরা নিজেরা ঠকেছে—সেইভাবে অপরকে ঠকিয়ে ওরা অর্থ পুনরুদ্ধার করে। এরা অবস্থাপন্ন হলে নিজেদের শুধরে নেয়।

(৩) সরব—এরা সব সময় রোয়াব দেখিয়ে কথা বলে। ধমকা-ধমকিতে এরা বিশেষ ওস্তাদ। এদের 'কর্নার্ড' করলে চেঁচিয়ে এরা বাজিমাৎ করে। নিজেদেরকে এরা বুদ্ধিমান বুঝাতে ও অন্যকে বোকা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। এরা অযথা অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী সাজে। এদের মধ্যে চঞ্চলতা, মুখরতা ও [ক্ষণস্থায়ী] তৎপরতা দেখা যায়। মিথ্যার পর মিথ্যা বলতে এদের বাধা নেই। পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে এরা শিকার বেছে নেয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এদের মধ্যে বহু অলীক [Pseudo] গুণ্ডা আছে। আসলে গুণ্ডামীর ক্ষমতা এদের নেই। এরা ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতির। বহু নির্বিষ সর্প আকারে প্রকারে ও ফোঁস-ফোঁসানিতে সবিষ সর্পের অনুকরণ করে। শত্রুকে প্রবঞ্চনা দ্বারা ভয় দেখিয়ে ওরা আত্মরক্ষা করে। বিজ্ঞানীরা এই গুণকে [mimicry] বলেন। এই অলীক গুণ্ডা নিজেদের গুণ্ডা বুঝিয়ে ভয় বা লোভ দেখিয়ে অর্থ নেয়। কিন্তু এদেরকে তেড়ে গেলে এরা পলায়নপর হয়। গুণ্ডা নিয়োগকারী মানুষ এদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। এই অলীক গুণ্ডারা তাদের সত্যকার কোনও কাজ করে নি।

অবশ্য কিছু উঠতি গুণ্ডা একাধারে গুণ্ডামি ও প্রবঞ্চনা

করেছে। এরা কোনও এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হয় না। সাধারণতঃ এরা প্রাথমিক অপরাধী। এর সাংসারিক ও স্ত্রীপুত্র প্রয়াসী হয়ে থাকে।

(৪) নীরব—এরা খুব নম্র ও ধীর হয়। এদের চাটুকরিতা ও চুকলামী করার শক্তি আছে। এরা অপকর্মের পূর্বে নির্লিপ্ত ভাব দেখায়। এরা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে না। এরা চাকরি-বাকরি ও কাজ কর্ম করে থাকে। চাকরি না থাকলে এরা প্রবঞ্চনা অপকর্ম করে। চাকুরির ফাঁকে ফাঁকেও এরা ঐ ভাবে অর্থ উপার্জন করে। এদের অপমান করলে এরা সে বিষয়ে নির্বিকার থাকে। প্রথম প্রথম বহু উপকার করে এরা মানুষকে মুগ্ধ করে তুলে।

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ * নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধ। এই অপকর্মের জন্য কোনওরূপ দৈহিক বলপ্রকাশের প্রয়োজন হয় না। আঘাত হানা প্রবঞ্চক তথা শঠেদের পক্ষে রীতি এবং স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার। আত্মরক্ষার্থে এরা কখনও কাউকে আঘাত হানে না। পৃথিবীতে শঠেদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এদের কার্যপদ্ধতিগুলির সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। বুদ্ধিমত্তায় এরা পণ্ডিতমণ্ডলীকেও মুগ্ধ করে দেয়। মেরে ধরে কেড়ে নেওয়াই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম বা সনাতন অপরাধ-রীতি। পরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিরা বোধ হয় না-বলে-নেওয়া বা [গোপনে] চুরির পক্ষপাতী হয়। এর পর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি এবং চুরির বিরুদ্ধে লোকে সজাগ হয়ে নানারূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এর ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা

* যৌনজ প্রবঞ্চনা অপরাধেরও অস্তিত্ব আছে। পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উহাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে করা হয়েছে।

শঠতার বা চিটিঙ-এর আশ্রয় নেয়। এই শঠতা অপরাধ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে।

অপরাধ-পদ্ধতি সকল দু'টি বিশেষ পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা শত্রুর বেশে সোজাসুজি আঘাত হানে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহা মানুষের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমাধা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপরাধীরা বন্ধুরূপে আলাপ জমিয়ে গৃহস্থদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সর্বনাশ ঘটায়। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ের অপরাধ। এই অপরাধ সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জ্ঞাতসারে সমাধা হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কেবলমাত্র প্রবঞ্চনা সম্বন্ধেই আলোচনা করব। এই প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপকর্ম মূলতঃ দুই প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা—(১) সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং (২) অসাধারণ প্রবঞ্চনা। ইহা ব্যতীত ইহাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপবিভাগও আছে। প্রবঞ্চনার এই বিভাগ ও উপবিভাগ সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক রূপে ব্যাখ্যা করব। প্রবঞ্চনার প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কীয় অপরাধ সমূহের প্রত্যেক অপরাধ আবার দুইটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। যথা, যৌনজ প্রবঞ্চনা ও অযৌনজ প্রবঞ্চনা।

প্রথমে সাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণ প্রবঞ্চনা দ্বারা গৃহস্থেরা স্বাভাবিক মন নিয়ে সুস্থ অবস্থায় ঠকে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, ধরুন, আপনার গোয়ালা এসে জানালে, সে আপনাকে খাঁটি গরুর দুধ দেবে; আপনি তাকে বিশ্বাস ক'রে দুধও ক্রয় করলেন। সে আপনাকে "খাঁটি গরুর" দুধ দিলেও গরুর "খাঁটি দুধ" দিল না। এইখানে তার ঐ গরুটা খাঁটি হলেও ঐ গরুর দুধ খাঁটি নয়।

আসলে সে আপনাকে দিল জল মেশানো দুধ। এই দুধে জল মেশানো হয়েছে জানলে বা বুঝলে নিশ্চয়ই তা আপনি ক্রয় করতেন না। আপনি উহা ক্রয় করলেও ওর দাম দিতেন আরও কম। এই ক্ষেত্রে ঘোষের-পো প্রবঞ্চনা দ্বারাই জল মিশানো দুধকে খাঁটি দুধ বলে আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে, তা না হলে অত অধিক মূল্যে ঐ জলীয় দুধ আপনি কখনও ক্রয় করতেন না। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে বলা হয়

'সাধারণ প্রবঞ্চনা'। মানুষ অন্ধ ভালবাসা বা ভক্তি ও স্নেহ দ্বারা অভিভূত হলে এই ভক্তি, ভালবাসা বা স্নেহের পাত্রেরা তাকে আরও সহজে ঠকাতে পারে। এই ভক্তি, ভালবাসা ও স্নেহ, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় মানুষের বিচার বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে হাস্যকর ভাবে বোকা করে তুলে। এইরূপ অবস্থায় তারা দুর্বৃত্তদের অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। মানুষ ঠকে তখনই যখন সে কাউকে

ভালবেসে ফেলে। এইরূপ অবস্থায় সে দেখেও দেখে না বা শুনেও শুনতে পায় না।

"সাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা হ'ল। এইবার "অসাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা যাক। অসাধারণ প্রবঞ্চনার দ্বারা মানুষের মন অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসুস্থ হয়ে উঠে। লোভের কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে। এই অবস্থায় ফরিয়াদী নিজেই কতকটা অপরাধীর পর্যায়ে এসে পড়ে। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। ধরুন, কোনও এক প্রবঞ্চক আপনাকে এসে জানাল যে এক যায়গায় জলের দরে সোনা বিক্রয় হচ্ছে। আপনি এও বুঝলেন ও জানলেন যে, ঐ গহনাগুলি চোরাই গহনা। তা না হলে এত সস্তায় সোনা বিক্রয় হয় না। প্রথমে হয়ত আপনি চোরাই গহনা কিনতে রাজি হলেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তি নানাভাবে আপনাকে প্রলুব্ধ করে গহনা কিনতে রাজি করাল; অর্থাৎ কিনা বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগ্রত করে আপনাকে সে লোভী করে তুলল। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আপনি গোপনে গহনাগুলি কিনলেন। আসলে কিন্তু আপনি কোনও সোনা কিনলেন না, আপনি সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনলেন গিল্টি করা কতকগুলি পিতল। এই ক্ষেত্রে আপনি অপরকে ঠকাতে গিয়ে কিংবা অপরের অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ করতে গিয়ে নিজের দ্রব্য বা অর্থই আপনি হারিয়ে ফেললেন। এই অসাধারণ প্রবঞ্চনা দ্বারা ঠগীরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক [সুপ্ত] অপস্পৃহা জাগ্রত করে তাকে লোভী করে তুলে। এই ভাবে প্রবঞ্চিত না হলে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ অপকর্ম সম্বন্ধে হয়ত চিন্তাও করত না; বরং ঐরূপ কার্যকে সে অন্তরের সাথে ঘৃণাই করত। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে আমরা 'অসাধারণ প্রবঞ্চনা' বলে থাকি।

[প্রবঞ্চকগণ বন্ধুরূপেই নাগরিকদের অর্থাপহরণ করে। বস্তুতঃ মানুষের ক্ষতি করা শত্রুতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে আরও সহজে সম্ভব হয়। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি কারও ক্ষতি করতে চাও ত প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার দুর্বলতাসমূহ জেনে নাও।" বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষ যদি সাবধানী, শক্তিমান ও দুর্দান্ত প্রকৃতির হয় তা হলে এই পন্থাই প্রকৃষ্ট। ঠগীরা এই সত্যটি বিশেষ রূপে জেনে নিয়েছে। ঠকামীর দ্বারা অর্থাপহরণ অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। এই কারণে পৃথিবীতে ঠগীদের সংখ্যা অন্যান্য অপরাধীদের তুলনায় অনেক বেশি। ঠগীরা সাধারণতঃ দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির এবং অত্যধিক চতুর হয়ে থাকে। তারা সাধারণতঃ খুন-জখমের ধার দিয়েও যায় না। বরং তাদের একান্ত রূপে নিরীহ ও বিনয়ী মানুষের মতই দেখা যায়। এ কথা স্বীকার্য যে চুরির তুলনায় জোচ্চুরি করা অনেক নিরাপদ। এইবার আমি এই প্রবঞ্চক অপরাধীদের সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করবো।]

এই অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঠগী নওসেবা', 'টপকা ঠগী', 'নোট ডবলিং' প্রভৃতি অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এগুলি অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। অনুরূপ ভাবে যৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনারও অস্তিত্ব আছে। মানুষ মাত্রের মধ্যেই যে যৌনজ ও অযৌনজ অপস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান আছে এবং উহাদেরকে কৃত্রিম উপায়ে যে বহির্গত করা যায় তাহা এই সকল অসাধারণ প্রবঞ্চনাসমূহ প্রমাণিত করে। প্রথমে বিবিধ প্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ঠগী নওসেরা

নওসেরা পদ্ধতির অপর নাম বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ [Bead Gambling]। ইহা একপ্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনা। এই পদ্ধতিতে অপরাধীরা Bead বা ঘুঁটির সাহায্যে জুয়ার অভিনয় ক'রে লোক ঠকায়। অনেকে ঘুঁটির বদলে তাস প্রভৃতির দ্বারাও এই খেলা খেলে থাকে। আসলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য একেবারে জুয়া নয়। নওসেরা দলে প্রায়ই বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। ইহাকে একটি বাস্তব অভিনয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এক-এক জন ব্যক্তি এক-একটি অংশ অ্যাক্ট বা প্লে করে যায়। এদের মধ্যে কেহ সাজে রাণী, কেহ সাজে রাজা, জমিদার বা বড বড় ব্যবসাদার, কেহ বা উহাদের ম্যানেজার সাজে। দারোয়ান, বেয়ারা, ঘাতক, খাতাঞ্জি প্রভৃতি সাজবারও লোকের অভাব হয় না। প্রথমে 'নওসেরা' নামে পশ্চিমা অপরাধী দল দ্বারা [মতান্তরে দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা] এই অপরাধ প্রবর্তিত হয়। পরে বাংলাদেশের পতনোন্মুখ ধনী বংশের দুলালরা অর্থের প্রয়োজনে এর উন্নতিসাধন করেন। * আজ এদের গতিবিধি পৃথিবীর সর্বত্রই। বড় বড় শহরে এরা আস্তানা গেড়ে লোক ঠকায়। ভারতে সর্ব প্রদেশের ব্যক্তিদের নিয়েই এদের দলগুলি গঠিত। এদের মোহিনী-শক্তি অল্প কথায় ব্যক্ত করা যায়

---

* কেহ কেহ এ'ও বলে থাকেন যে নয়'শ [৯০০] উপায়ে ইহা সমাধিত হয় বলে এ'কে নওসেরা বলা হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বাংলা দেশে এর প্রকৃত উন্নতি ঘটে। একণে এই অপরাধ পৃথিবীর সকল দেশে প্রচলিত হয়েছে।

না। বাক-চাতুর্য, বচন-বিন্যাস এবং বিভিন্ন রূপ "মেক্-আপ"ই এদের প্রধান সহায়।

নওসেরা অপরাধীরা দল বেঁধে বড বড় শহরে অপকর্ম করে থাকে। এদের আমরা উপরি উক্ত কারণে "অসাধারণ" প্রবঞ্চকদের পর্যায়ে ফেলে থাকি। শহরের বড় বড় পুরানো বনেদী বাটীগুলিতেই এরা অপকর্ম করে থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে এইরূপ বহু পুরাতন প্রাসাদ আছে। এই সকল বিরাট বিরাট প্রাসাদে উত্তরাধিকারীসূত্রে বাড়িব স্বর্গগত ধনী মালিকের বহু নিঃস্ব বংশধর সপরিবারে ইহার বিভিন্ন অংশে বাস করেন। এই সকল বাটীতে পুরাতন আমলের বড বড় দালান বা "হল" ঘর দেখা যায়। পুরাতন আমলের আসবাবে সজ্জিত হল ঘরটির উপর কিন্তু সকল বংশধরেরই সমান অধিকার থাকে। পৃথক পৃথক রূপে বসবাস করলেও প্রয়োজন মত সকলেই এই হল ঘরটি ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল বংশধরদের কাহারও কাহারও অবস্থা উন্নত থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত রূপ শোচনীয় দেখা যায়। নওসেরা দলের অপরাধীরা অনেক সময় এইরূপ এক বংশধরকে তাদের অংশীদার রূপে বেছে নিয়ে তাদের সহিত যোগসাজসে লোভী বণিক এবং অন্যান্য লোকদের এই সকল হল ঘরে * ভুলিয়ে এনে তাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। এই কারণে অতগুলি বংশধরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির সাহায্যে যে এই অপরাধীরা হল ঘরটি ব্যবহার করেছে তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ সংশ্লিষ্ট বংশধরটি প্রায়ই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন এবং

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ি ভাড়া করে উহা 'ভাড়া করে আনা' দামী আসবাবপত্র দ্বারা সাজিয়ে রাখাও হয়। বড় বড় শহরে এরূপ বহু দামী আস্তানা এরা ভাড়া ক'রে নিজেদের দখলে রাখে ও প্রয়োজন মত ব্যবহার করে।

ফরিয়াদীর সামনে কখনও তিনি হাজিরও হন না। এ ছাড়া বিষয়টি এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই সকল ঝুটা রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদারকেই বাড়ির আসল মালিক বলে সহজেই ভুল করে। দলের অধিকাংশ লোকই কিন্তু দালালের ভূমিকায় কাজ করে। এই সকল দালালেরা শহর, শহরতলী এবং দূর গ্রাম্য জনপদগুলি হ'তে নানা অছিলায় দুর্বলচিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোকদের ভুলিয়ে এনে কাজ হাঁসিল ক'রে অপর আর এক বড় শহরে কিছুদিনের মত সরে পড়ে। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপকর্ম সংঘটিত হয় তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লেই বুঝা যাবে।

"মাস দেড়েক পূর্বে এক চায়ের দোকানে বন্ধু অজিতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অজিতের আগ্রহাতিশয্যে আমাদের এই পরিচয় অচিরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। একটা ব্যবসা ফাঁদবার খেয়াল সেই আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অজিত আমায় বুঝায়, 'ত্থাখ! ব্যবসা করতে গেলে তিনটি জিনিস চাই—সময় চাই, সুবিধে চাই, পয়সা চাই। তোর তো তিনটে জিনিসই আছে। এবার চল তোকে ভৈরব দাদুর কাছে নিয়ে চলি। মস্তবড় কারবারী লোক তিনি। তিনি ঠিক একটা মতলব নিশ্চয় বাতলে দেবেন।' এর পর অজিত আমাকে ভৈরববাবুর কাছে নিয়ে আসে। প্রথমে ভৈরব দাদু আমাকে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহই দেন না। পরিশেষে অবশ্য আমার এবং অজিতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাকে সাহায্য করতে তিনি রাজি হন। কিন্তু প্রথমেই বেশি টাকা খরচ করতে তিনি আমাকে মানা করে দেন। তিনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেন—'কত টাকা নষ্ট করতে তুমি রাজি আছ? তোমার সম্বল ত মাত্র হাজার ত্রিশ টাকা। বাপ মরবার সঙ্গে সঙ্গেই সব উড়াতে চাও বুঝি! দেখ বাপু! তুমি অজিতের বন্ধু। তাই তুমি আমার পৌত্র স্থানীয়

ব্যবসা হচ্ছে একটা জুয়া খেলা, হার-জিতের কোনও স্থিরতা নাই। তবে একটা কাজ তুমি করতে পার। তুমি বরং কিছু জমি কিনে ফেল। হুম। বুঝলে? তা কি হে—”

ইতিমধ্যে সেখানে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী এসে হাজির হলেন। ভৈরববাবু বিরক্ত হয়ে তাকে শুধালেন, ‘এখানে কি চাই হে আবার তোমার? আমি বলেছি তো ও’সবে রাজি নই।’ আমতা-আমতা করে ভদ্রলোক উত্তর করলেন, ‘দেখুন, বাদলপুরের মাতাল জমিদারটা কোলকাতায় এসেছে। অনবরত হুণ্ডি কেটে জলের দরে বিষয়বিক্রয় করছে।’ তার এই কথাতে চশমাটা কপালে উঠিয়ে ভৈরব দাদু বললেন, ‘আরে! তাই নাকি? আমি খুব চিনি ওদের। ওদের ম্যানেজার আমার বাল্যবন্ধু। কোন কোন সম্পত্তি ওদের বিক্রি হবে?’ উৎফুল্ল হয়ে দালাল ভদ্রলোক উত্তর করলেন,‘আজ্ঞে। বীরভূম জেলার দুটো শাল বন। আসল দাম ওর চল্লিশ হাজার হলেও মাত্র সাত হাজার টাকায় বিক্রয় করবেন।’ ‘এঁ্যা! এ তুমি বল কি? আমি যে একবার নিজে গিছলাম সেখানে। কিন্তু চল্লিশ হাজার তুমি কি বলছ? ওর আসল দাম হবে অন্ততঃ সত্তর হাজার।’ প্রত্যুত্তরে তার প্রতি এইরূপ এক উক্তি করে এরপর ভৈরব দাদু আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘তোমার দাদু একখানা কপাল বটে। একেবারে, মেঘ না চাইতেই জল; কিন্তু সবটা তোমায় দিচ্ছি না ভাই। অর্ধেকটা আমি নিজেই রাখব। মাস দুই ধরে রেখে ষাট হাজারে ত বিক্রি করবই। ল্যাণ্ডস্পেকুলেশনই দেখছি বেস্ট বিজনেস্। আমার প্রায় নয় লক্ষ টাকা জুটমিলে আটকে গেল। নইলে কি আর আমি বসে থাকি! যাক, দাদু! তাহলে তুমি কাল সাতটায় এস। যদি কিছু হয় ত তোমার কপালেই হবে। হাজার আষ্টেক টাকা তুমি সঙ্গে এনো। এর বেশি বোধ করি দরকার হবে না।’

এদিকে হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রীঙ ক্রীঙ। রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে ভৈরবদাহুর কথা কইলেন, 'কোউন্? পরিমলবাবু! হাঁ, হাঁ, ও ত হবেই! কেয়া? বাহান্ন হাজার। ওতনা তো আভি গদিমে মজুত নেহি। নেহি নেহি নেহি, কেইসেন হো শেক্তা। ব্যাঙ্ক-উঙ্ক তো আভি বন্দ হো গিয়া। আভি ত্রিশ হাজার হাম্ দেনে শেক্তা। আচ্ছা! আপ আদমি ভেজিয়ে। শুনিয়ে! মুলুক-চাঁদকো ভেজ দিয়ে।' এর পর ভৈরবদাহুর কারবারী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে আমি এবং বন্ধুবর অজিত সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরি। পরদিন সকাল সাতটায় অজিত আমাকে ভৈরবদাহুর বাড়ি আনে। ভৈরববাবু একটু কিন্তু-কিন্তু করে আমাকে বললেন, 'ড্রাইভারটা তো এখনও এল না। যাক্! তাহলে ট্যাক্সি করেই চলো।' অজিত ও আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ভৈরববাবু হুকুম দিলেন, 'এই চালাও শোভাবাজার।' কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি ভেবে তিনি অজিতকে বললেন, 'আচ্ছা! অজিত, তুমি আমার অফিসে একটু বস। সিকিমের একজন ব্যবসায়ী আসবেন। তাঁকে বসতে বলবে।' এরপর অজিতকে নামিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললেন। উদ্দাম গতিতে তখন ট্যাক্সি ছুটে চলল। শোভাবাজারে এসে ভৈরববাবুর নির্দেশমত একটা মোটা মোটা থামওয়ালা পুরান বড় বাড়ির সামনে ট্যাক্সিখানা রুখে দিয়ে ট্যাক্সিচালক আমাদেরকে বললো, 'ই তো হামরা মুল্লুককা জমিনদার। আরে এ তো বাদলপুরকো রাজাবাবু আছে।' তার এই স্বগতোক্তির উত্তরে ভৈরববাবু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, 'কা? তুম্ চিনতা ইসকো?' ড্রাইভার উত্তরে খুশি মনে তাঁকে বললে, 'আপ কেয়া বলে? বেলিয়ামে তো ইনকো ভারী জমিনদারী হ্যায়। ওনা হ্যায় বাঙলামেভি ইন্‌কো জমিনদারী আছে আউর বড়ি বড়ি বহুত জঙ্গলভী আছে।' 'হুম্! ঠিক হ্যায়,'—এই বলে ভৈরববাবু ট্যাক্সির

ভাড়া চুকিয়ে আমাকে নিয়ে নামলেন। কিন্তু সেখানে বাদ সাধল গেটের তকমা-আঁটা শান্ত্রীমশাই। পথ আগলে দরোয়ানজী খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'পয়লা এত্তালা দিইয়ে তো ?' দুটা টাকা দরোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে ভৈরবদাদু হুকুম করলেন,—'তুম্ যাও আভি। মহারাজাকো দেওয়ানজীকে খবর ভেজো-ও-ও।' আমাদের সেলাম জানিয়ে দরোয়ানজী এইবার আমাদেরকে একটা হলঘরে এনে সেখানে আমাদের বসতে বলে দেওয়ানজীকে এত্তালা জানাতে গেল। আমি অবাক হয়ে এই বনেদী বাড়ির আদব-কায়দা পরিলক্ষ্য করছিলাম। আমাকে এধার-ওধার তাকাতে দেখে ভৈরবদাদু একটু হাসলেন ও বললেন,'কি আর এখন দেখছ দাদু! সবই এদের মদে আর জুয়ায় গেছে। রাজার চেহারা দেখলে আরও অবাক হবে। লোকটা ঠিক একটা নিরেট বোকা নর-রাক্ষস।' হঠাৎ গপ্ গপ্ আওয়াজ করে একটা ঘোড়ার গাড়ি গাড়িবারাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়াল। সেখানে একজন তকমা-আঁটা লোক। বোধহয় ওদের সহিসই হবে। সে চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছিল,—'হুঁশিয়ার! তফাৎ যাও। রাণীমা আতি।' দূর হতে আমি লক্ষ্য করি যে, একজন শ্যামাঙ্গী প্রৌঢা মহিলা গরদের কাপড় প'রে বাড়ি ঢুকছেন। তাঁর পিছনে পিছনে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি হাতে আসছে ঝি এবং তার পিছনে পিছনে আসছে এক অপূর্বসুন্দরী সপ্তদশী বালিকা। হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাওয়ায় এদের আর আমি দেখতে পাই না। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই দোতালার ঘর থেকে অরগ্যানের ঝঙ্কার বেজে উঠে। আমি শুনতে পাই জমিদার-কন্যার অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত, 'তুমি যে আসিবে তা আমি জানি গো জানি।' আমি মুগ্ধ হয়ে ঐ গীত শুনছিলাম। হঠাৎ দেওয়ানজী চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'আরে ভৈরব যে, তুমি এতদিন পরে? ও-ও—সেই

জঙ্গলটার জন্যে বুঝি! কিন্তু তায় সাত হাজারে হবে না। ওর জন্যে দেড় হাজার আরও চাই। তা ছাড়া আমাকে ভাল কমিশন না দিলে সব ভেস্তে দেব।' উত্তরে ভৈরববাবু মৃদু হেসে তাঁকে জানালেন, 'ওটা না বললেও হত। ও আমি তোমাকে দিতাম।' এর পর দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ব আলাপ জমে উঠল। সংলাপের মধ্যে দেওয়ানজী জানিয়ে দিলেন, জমিদার নাকি রোজ জুয়া খেলছেন, আর হাজার বিশ করে তিনি প্রতিবার হারছেন। এর মধ্যে নাকি দেওয়ানজীরও কারসাজি আছে। তাঁর নির্দেশমত খেললে রাজাকে হারতেই হবে। যে খেলতে আসে সে দেওয়ানজীর শিক্ষামত খেলা জিতে ঘরে ফিরে। দেও-য়ানজীও এদের কাছ থেকে বেশ কিছু কমিশন পেয়ে থাকেন ইত্যাদি। উৎসুক হয়ে ভৈরববাবু দেওয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কারসাজিটা কি? শিখিয়ে দাও না আমাকে। এক হাত নয় আমিও দেখি। কিছু টাকা যদি মুফৎ এসে যায়! তাতে মন্দ কি আর হবে?' 'ও-ও কিছু না, খুব সোজা জিনিস। এই দু হাত গঙ্গা আর দু হাত কালী'—এই বলে দেওয়ানজী ভৈরববাবুকে তাসের কসরৎ দেখাতে লাগলেন। বোঝা গেল ব্যাপারটা খুবই সহজ। শুধু হাতসাফাই-এর কার্য মাত্র। কতকটা তাস সাজাবার কায়দাও বটে! কিন্তু ভৈরব-বাবুর মাথায় বিষয়টা কিছুতেই আর ঢুকে না। অনেক কষ্টে কায়দা-গুলো বোধগম্য করে ভৈরববাবু দেওয়ানজীকে বললেন, 'ও সব এখন থাক ভাই। এয়েছি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। ব্যবসায়ে আর সব চলে, কিন্তু জুয়াচুরী চলে না।' উত্তরে দেওয়ানজী কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর তাঁর তখন বলা হল না।

'কাকাবাবু!' বলে জমিদার-কন্যা ঐ হলঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ আমা-দের সেখানে দেখে তাঁর আর বাক্যস্ফুরণ হয় না! মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে

তিনি আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে লাগলেন। 'আরে সতী মা! আয় আয়। এঁকে প্রণাম কর। ইনিও তোর একজন কাকা।' সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভৈরববাবুকে প্রণাম জানাল। সেই সাথে সে দেওয়ানজীকেও প্রণাম জানাতে ভুললো না। আশীর্বাদ করে দেওয়ানজী তাকে বললেন, 'যা তো মা, এঁদের জন্যে চা-টা—' সতীরাণী চলে গেলে দেওয়ানজী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাদুর কানে কানে বললেন—'ওহে! চেষ্টা করে একটু দেখো না। তোমার নাতিটি তো পাত্র হিসেবে ভালই। মরা হাতির দাম এখনও লাখ টাকা। তা ছাড়া ওই ত একটা মাত্র সন্তান। যা অবশিষ্ট আছে তা সবই তো ওর।' 'তা কথাটা তুমি মন্দ বল নি। চল, তাহলে পাশের ঘরে চলো। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। এসব আর ছেলে-ছোকরাদের কাছে নয়।' ইশারায় আরও কিছু বলে বন্ধুদ্বয় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পরামর্শের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। বন্ধুদ্বয় অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে চা নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং জমিদার-কন্যা। দেওয়ানজীদের সেখানে না দেখে ভীতিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা! কাকাবাবু কোথায়?' তিনি আমার গা' ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?' উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, 'বালীগঞ্জ।' সতীরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি জাত?' উত্তরে আমি জানালাম, 'কায়স্থ।' সতীরাণী উত্তর দিলেন, 'আমরাও কায়স্থ।' সতীরাণী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পদবী কি-ই।' তখন উত্তরে আমি বললাম, 'মিত্তির'। উত্তরে সতীরাণী জানালেন, 'আমরা হচ্ছি বোস।' এই ভাবে আমাদের আলাপ ভালো করে জমে উঠেছে। এমন সময় দেওয়ানজী ঘরে ঢুকলেন, দেওয়ানজীদের দেখে সতীরাণীও ত্বরিত গতিতে সরে পড়ল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে জানাল যে, রাজা

সাহেব সেলাম দিয়েছেন। আমরাও কালবিলম্ব না করে দেওয়ানজীর নির্দেশ মত রাজা সাহেবের খাশ কামরায় এলাম। প্রকাণ্ড একটা ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলান কাঁচের সেকেলে ঝাড়-লণ্ঠন। বড় বড় আরশি ও ছবি দিয়ে ঘরখানি সাজান। একটা বড ফরাসের উপর বসে গডগড়া টানতে টানতে রাজা সাহেব দু' জন মাডোয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলছিলেন। তাঁর পাশে রাখা টিপয়ের উপর একটা রেকাবে সাজান মদের গেলাস। আমাদের সেখানে বসতে অনুরোধ করে তিনি আবার জুয়ায় মনোনিবেশ করলেন। দেখতে দেখতে আমাদের রাজা সাহেব ত্রিশ হাজার টাকা হারালেন। শেষ দানের পর ক্ষেপে উঠে রাজা সাহেব ক্রুদ্ধ ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ই লোক যাদু জানতা। এ দারোয়ান! নিকাল দেও ই লোককো।' বেগতিক দেখে দরোয়ান আসবার আগেই মাডোয়ারীদ্বয় কেটে পডল। আর এক গেলাস মদ নিঃশেষ করে রাজা সাহেব ডাকলেন, 'দেওয়ানজী।' তাঁর ডাকের উত্তরে দেওয়ানজী বললেন, 'হুজুর!' তখন রাজা সাহেব তাঁকে বললেন, 'আর কেউ খেলবে?' ভৈরবদাদু এই সময় বাধা দিয়ে তাঁকে জানালেন, 'আজ্ঞে আমরা এসেছিলাম শাল বন সংক্রান্ত একটা কথাবার্তার জন্যে।' এবার উত্তরে রাজা সাহেব ভ্রূ কুঁচকে তাঁকে বললেন, 'হাঁ হাঁ। সে ত আপনারই হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি খেলবো না। আমি কিন্তু খেলবো এখন এর সঙ্গে।' স্বগত স্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাদু বলে উঠলেন, 'এই খেয়েছে রে! মাতালের কাণ্ড দেখ। শেষ বরাবর দাদুভায়ের উপরই ঝোঁক পড়ল। বেচারা ছেলেমানুষ!' মৃদুস্বরে দেওয়ানজী বলে উঠলেন, 'তা আর কি হবে, খেলুক না। কায়দাটা তো শিখে নিয়েছে। বোকাটা হারুক না। আরও কিছু না হয় যাবে।' ভৈরবদাদু ভৎর্সনার স্বরে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি-ই বল ত? এদিকে

জামাই করতে চাচ্ছ, অথচ—' ভরসা দিয়ে দেওয়ানজী তাঁকে বললেন, 'সবই তখন তো ওরই হবে। না হয় আগে থেকেই হাজার ত্রিশ নিল। এখন থেকে এঁকে তো ওকেই সামলাতে হবে! ভগবানের ইচ্ছেয় যদি দু'হাত এক হয়—।' এদিকে রাজা সাহেব তো সেখানে মদ খেয়েই চলেছেন। এদের কথোপকথন তাঁর কানেই যাচ্ছিল না। হঠাৎ মদের গেলাস নামিয়ে রেখে রাজা সাহেব বললেন, 'এই খোকাবাবু, এসো! তাহলে বসে যাও আসনে।' আমি এ প্রস্তাবে প্রথমটায় রাজি হই নি। কিন্তু দেওয়ানজী ও ভৈরবদাদু ভরসা দেওয়ায় রাজি হই। এতে রাজি হই কতকটা লোভে পড়েও বটে। কিন্তু মাত্র দু'বার জেতার পরই আমি হারতে আরম্ভ করি। শেষে আমার সঙ্গে করে আনা দশ হাজার টাকাও হেরে যাই। বেশ বুঝতে পারি যে হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে রাজা সাহেব একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং এও বুঝতে পারি যে আমি একটা দস্যুদলের কবলে এসে পড়েছি। ভয়ে ও ভাবনায় এবং অনুশোচনায় আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমাকে চেঁচাতে শুনে রাজা সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে হেঁকে উঠলেন, 'বটে। জুয়ায় হেরে আবার চেঁচাচ্ছ মানে? এই! এই দারোয়ান।' দেওয়ানজী এইবার আমাকে সরিয়ে এনে বললেন, 'এখানে ছেলেমানুষী করো না খোকা! জুয়া খেলা সকলের পক্ষেই অপরাধ। চেঁচালে পুলিশ এসে সকলকেই পাকড়াও করবে।' এর পর ফিরে দেখি ভৈরবদাদু অন্তর্ধান হয়েছেন। আমি সেখানে ফাঁকা ঘরে তখন একা আছি। এরপর আমি পরিত্রাহিভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'পুলিশ! পুলিশ!' আমি যে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করব তা বোধ হয় এদের পরিকল্পনার বাইরে ছিল। বেগতিক বুঝে সেখানে হাজির হলেন স্বয়ং রাজকুমারী সতীরাণী। তিনি ঝড়ের মত ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা! ফের তুমি এইভাবে লোক ঠকাচ্ছ! দাঁড়াও! মা

আসছেন।' ওদিকে দরজার ওপারে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ শোনা গেল। বেগতিক দেখে রাজা সাহেব, দেওয়ানজী ও দরোয়ানরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। এর পর সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে অনুযোগের স্বরে বলল, 'দেখুন! কিছু মনে করবেন না আপনি। বাবা লোক খারাপ নন। সম্প্রতি ওঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে। দেওয়ানজীই মদ খাইয়ে খাইয়ে ওঁর সর্বনাশ করেছেন। কালও ওঁরা একটা লোককে এইভাবে বত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়েছিলেন। মা জানতে পেরে সব টাকা তেনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মা বললেন যে, কাল আপনাকে একবার আসতে। আপনি রাত্রে এখানে খাবেন, টাকাগুলোও নিয়ে যাবেন।' আমি তখনও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম! আমার মুখে কোনও উত্তরই যোগায় না। সতীরাণী এইবার তার হীরা ও মুক্তা বসান হার ও বলয় দুটা খুলে ফেলে সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! আচ্ছা এইগুলো তাহলে রেখে দিন। এই-গুলোর দাম অন্ততঃ চল্লিশ হাজার।' আমি এবার অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর করলাম, 'না না, আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার মাকে বলবেন যে, কাল আমি নিশ্চয় আসব।' অন্তরাল থেকে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, 'আহা! আহা! বাবা আমার! আমার সতীর কি এমন কপাল হবে! এমন ছেলে কি আমরা পাবো? এদের দুহাত কি এক হবে?' 'আসব আসব, নিশ্চয়ই আসবো—' এইবলে আমি সেদিন বাড়িফিরলাম। আমার হৃদয়ে ও মনে অনেক আশা। আমার হারানো অর্থের বিষয়ে তখন আমি নিশ্চিন্তও হয়েছি। পরদিন সন্ধ্যায় দাড়ি কামিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে সতীদের বাড়ি গিয়ে দেখি যে সব ভোঁ-ভাঁ। সেখানে জনমানবের সাড়া-শব্দও নেই। দরজার কাছে দেখি একজন সাহেব ও জন দুই-তিন

বাঙ্গালী দাঁড়িয়ে। সকলেই রাজা সাহেবকে খুঁজতে এসেছেন। সাহেবের কাছে শুনলাম তিনি রাজা সাহেবের কাছ থেকে নেপালের তারাই-এর ছয় হাজার একর জমি কিনবেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা বেহারের একটা অভ্রের খনির খবরে সেখানে এসেছেন, ইত্যাদি। সকলে মিলে দলবেঁধে থানায় এসে শুনলাম যে, আমরা একটা দুর্দান্ত নওসেরা গ্যাঙ্গের খপ্পরে পড়েছি। তদন্তে প্রকাশ পেল যে আমার বন্ধুমন্য—ঐ অজিত, ভৈরবদাদু, রাজা, রাণী, দেওয়ান, দরোয়ান, মায় ট্যাক্সি ড্রাইভার পর্যন্ত এক দলেরই দলী। রাজ সাহেব এবং ভৈরবদাদুর বাড়ি দুটি ভাড়া করা এবং বাড়ির যাবতীয় আসবাব-পত্তর দোকান থেকে ভাড়ায় আনা হয়েছে। দলটা না'কি ততক্ষণে বোম্বে, দিল্লী বা অন্য কোনও দূর দেশে পিট্টান দিয়েছে। বড় বড় শহরে এসে এই দল একাধিক বাটী সাময়িক ভাবে ভাড়া করে আড্ডা গাড়ে এবং চারি দিকে তাদের এজেণ্ট পাঠায়। এই এজেন্টরা আমার মত বোকা দেখে ছেলে-বুড়োকে যোগাড় করে আড্ডায় এনে এইভাবে লোক ঠকায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে শিকার পেলে সতীরাণীর আবির্ভাব হয়। তা না হলে সতী ও তার মার সাহায্য ব্যতিরেকেই সেখানে কার্য সমাধিত হয়।"

মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—যৌনজ এবং অযৌনজ। অর্থাৎ কাহারও ঝোঁক থাকে নারীর উপর, কাহারও ঝোঁক থাকে অর্থের উপর। কাহারও কাহারও আবার নারী এবং অর্থ [সম্পত্তি] এই উভয়েরই উপর ঝোঁক দেখা যায়। প্রয়োজন মত অপরাধীরা ইহার একটি বা অপরটি কিংবা একত্রে দুইটির দ্বারাই দুর্বলচিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। উপরি-উক্ত কাহিনীটিতে নওসেরা অপরাধীরা কিরূপ পদ্ধতিতে মানুষের

অন্তর্নিহিত এই যৌনজ এবং অযৌনজ স্পৃহাদ্বয় জাগ্রত ক'রে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা বলা হয়েছে। এইবার ঠগী দলের আভ্যন্তরিক সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নওসেরা দলের কার্যকলাপ এবং সংগঠনের মধ্যে আমরা অত্যন্তরূপ মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই। এই সম্বন্ধে নওসেরা দলের একজন অপরাধীর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই চমকপ্রদ বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের দলের লোকেদের মধ্যে কতকগুলি সাঙ্কেতিক শব্দ প্রচলিত আছে। এই সকল সাঙ্কেতিক শব্দ আমরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজা, জমিদার বা বড ব্যবসাদার সাজে, তাকে আমরা বলি 'বৈঠো'। আমাদের দলের মধ্যে যে ব্যক্তি ম্যানেজার বা দেওয়ানজীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাকে আমরা বলি 'গোক্কাব'। নওসেরা দলে যে ব্যক্তি প্রথম জুয়া খেলার সূচনা করে তাকে আমরা বলি 'ট্রাইম্যান'। আমাদের যে ব্যক্তি দালালের ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে আমরা 'দালাল'ই বলি।

এই সকল দালাল নানা স্থান হতে নানা শ্রেণীর লোকদের নানা অছিলায় ভুলিয়ে এনে আড্ডাস্থলে হাজির করে। প্রতারণার অভিপ্রায়ে আড্ডাস্থলে নীত ব্যক্তিদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং তদনুযায়ী আমরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আমরা যথাক্রমে (১) কোরা, (২) সোনামুড়া এবং (৩) ফুটা বলে থাকি। এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা পূর্বে এইরূপ খেলা খেলে ঠকেছে। এই সকল ব্যক্তিদের আমাদের পরিভাষাতে আমরা বলি 'ফুটা।' এদের মধ্যে যারা এইরূপ খেলা কখনও খেলে নি, কিন্তু নওসেরা প্রতারণার পদ্ধতি সম্বন্ধে গল্প শুনেছে, সেই

সকল ব্যক্তিদের আমরা বলি 'সোনামুড়া'। এদের মধ্যে এমন লোক থাকে যারা এইরূপ খেলা পূর্বে কখনও খেলে নি, কিংবা তারা এইরূপ প্রতারণার সম্বন্ধে কখনও কোন গল্পও শুনে নি। এই সকল ব্যক্তিকে আমরা বলি 'কোরা'। এই 'কোরা' মানুষদেরই বেছে নিয়ে আমরা ঠকিয়ে থাকি। সাধারণতঃ আমরা ঘুঁটির দ্বারাই এই খেলা খেলি। কখনও কখনও আমরা তাসও ব্যবহার করি। এই তাসগুলি কায়দা মাফিক সাজানো হয়। প্রত্যেক বিবি বা গোলাম পিছু আমরা টাকা ফেলি। তাসগুলি একটা বিশেষ কায়দাতে সাজান হয়। এতে ক'রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দানে কাহারও ভাগে কোনও ছবি পড়ে না। অর্থাৎ, তাতে কেউ জেতেও না, তাতে কেউ হারেও না। তাস সাজাবার কায়দার গুণে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিই [victim] জিততে থাকে। দুই হাজার টাকা ক'রে তিন দানে ছয় হাজার টাকা জেতার পর [আনন্দের আতিশয্যে] প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যন্তরূপ উত্তেজিত হয়ে উঠে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাকে আমরা বলি 'গরম'। পর পর তিন তিনবার জেতার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তির উত্তেজনা শেষ সীমায় আসে। এই সময় তার প্রতি ধমনীতে রক্ত অতি দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় তার জিহ্বা ও তালু শুকিয়ে যায়। তখন তার বাক্যস্ফুরণ পর্যন্ত হয় না। এই সময় তার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করে। অর্থাৎ তার মাথা হতে রক্ত নীচে নামে। ফলে মস্তিষ্ক তার অসাড় হয়ে আসে। তার বক্ষ দুরদুর করে এবং হস্তদ্বয় কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় জুয়ায় জেতা মুদ্রা কয়টিও সে পূর্বের ন্যায় নিজের কোলের দিকে টেনে আনতে পারে না। যে দালালটি প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অকুস্থলে ভুলিয়ে এনেছিল, সেই দালালই তখন প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কোলের দিকে টাকাগুলো টেনে আনে। তখন তারা এমন ভাব দেখায়, যেন সেও তার

মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে আমরা বলি 'ধুর'। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির এই 'ধুর অবস্থায়' সময়েই আমাদের দলের একজন খেলার ঘুঁটি পাল্টিয়ে বা খেলার তাস উল্টিয়ে বা তা সরিয়ে দিয়ে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণতঃ হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই আমরা এই কাজ করে থাকি। 'ধুর' অবস্থায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং এর ফলে সে আমাদের কোনওরূপ চালাকিই ধরতে পারে না। এইরূপ হাত সাফাই-এর সাহায্যে ঘুঁটি উল্টান বা তাস পাল্টানকে আমরা বলি, 'তোড়'। এই 'তোড়ে'র কার্য নির্বিঘ্নে সমাধিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে যে বৈঠোর ভূমিকায় [রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদার] অভিনয় করছে, সেই ব্যক্তি হঠাৎ এক সঙ্গে একেবারে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যত টাকা জিতেছে তার দু'গুণ টাকা বাজি ধরে বসে, অকুস্থলে উপস্থিত কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষীর বার বার নিষেধ সত্ত্বেও। এই সময়ে আমরাও নিম্ন স্বরে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে 'বৈঠো'র এই শেষ প্রস্তাবে রাজি হতে বলি। আমাদের উপদেশে এবং উৎসাহে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 'বৈঠো'র এই প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু এই শেষ খেলার পর সে দেখে যে, তার প্রথম কয়দানে জেতা ছয় হাজার টাকা তো সে হারিয়েছেই, তদুপরি সঙ্গে করে আনা তার নিজের ছয় হাজার টাকাও তাকে বার করে দিতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যে দালাল সেজেছে, সে তখন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময় সে তাড়াতাড়ি প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে উঠে, 'মশাই ! ও—ওটা কিছু নয়। এই হারটা দৈবক্রমে হয়ে গেছে। এর পরের দানে সবটাই উশুল হয়ে যাবে। আপনি দিয়ে দিন দানের টাকা কটা।' এই উপদেশ মেনে নিয়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি পকেটের টাকা কয়টা তাদের দিয়ে পরের দানের জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু তার সাজাবার গুণে সে আর একটি বারও জিততে পারে না। এই বাজিমাৎ করার নাম দিয়েছি আমরা 'চোট্'। এই খেলাতে দশ টাকাকে আমরা বলি 'গজ', এবং একশ টাকাকে আমরা বলি 'গিরাই'। এইভাবে টাকার সংখ্যানুযায়ী আমরা গজ, গিরাই, পট্টি, বারি ও বাটা বলে থাকি। অনেক সময় এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদেরও আমরা দলে ভর্তি করে নিই। কি করে তা বলছি শুনুন,—এই ধরনের শিকাররা [victim] প্রায়ই লোভী, অভাবী বা দুর্বলচিত্তের হয়ে থাকে। কাহারো কাহারো মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও দেখা যায়। এইরূপ প্রকৃতির মানুষ না হ'লে অপরকে ঠকিয়ে অর্থ উপায়ের বাসনা তাদের মধ্যে আসতো না। এইরূপ প্রকৃতির মানুষেরা বোকা জমিদারকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠকে। এই অবস্থাতে তারা আমাদের কাছেই এসে ধরে কেঁদে পড়ে। নিজেরাই জুয়া খেলেছে—এই ভয় ও লজ্জায় তারা এ কথা কাউকে বলে না। এই সুযোগে আমাদের এই অভিনয় চাতুর্য সম্বন্ধে আমরা তাদের ওয়াকিবহাল করে দিই এবং তাদের আমরা জানাই যে তারা অনুরূপ ভাবে আড্ডাখানায় লোক সংগ্রহ করে আনতে পারলে তাদেরকে ঠকিয়ে আমরা যা' অর্থ পাবো তা থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার হৃত অর্থ তো তাকে ফিরিয়ে দেবোই, তা ছাড়া ঐ খেলা বাবদ আরও কিছু টাকা তাকে তার হিস্যা স্বরূপ দেওয়া হবে। অনেক সময় প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা স্ত্রীর বা কোনও আত্মীয়ের গহনা বন্ধক রেখে কিংবা পৈতৃক জমি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে বা টাকা কর্জ করে লোভে পড়ে এই প্রতারণা-জুয়া খেলতে আসে। এই হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করে যথাসময়ে উহা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে না পারলে তাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। এই কারণে বাধ্য হয়েই তাদের কেউ কেউ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়। এমন কি এদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে আমাদের দলভুক্তও হয়ে পড়ে।

আমাদের দালালেরা বাক্‌জাল সৃষ্টি করে নানা উপায়ে মানুষের মন ভুলোয়। মানুষের মন ভুলোবার অভিনয় পদ্ধতিগুলিকে আমরা বলি 'রগড়া'। আমরা মানুষের পেশা বা স্পৃহা অনুযায়ী তার প্রতি প্রযোজ্য [উপযুক্তরূপে] 'রগড়া' নির্ধারণ করি। ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ব্যবসায়িগণ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তায় অধিক আগ্রহশীল থাকে। মানুষের চিত্তপ্রস্তুতির [predisposition] কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আমাদের শিকার বা 'ভকটিম্ [victim]-দের পেশানুযায়ী মুখরোচক বাক্‌জাল সৃষ্টি ক'রে, তাদের সহিত আলাপ জমিয়ে তাদের দুর্বলতাসকল কোথায় সেটা আমরা জেনে নিই। প্রথমে আমরা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির প্রফেশন বা পেশা সম্বন্ধে খবর নিই। যদি আমরা বুঝি লোকটি চাউলের ব্যবসা করে, তা হ'লে সোজাসুজি তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা মশাই! এক সঙ্গে সত্তর হাজার মণ চাউল কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? এক জন বড় ব্যবসাদার ব্রেজিলে পাঠাবার জন্যে এই সপ্তাহেই সত্তর হাজার মণ চাউল চান। বড় উপকার হয় মশাই, যদি সন্ধান দিতে পারেন। মশাই! হঠাৎ বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি আমি। কিছু দালালি মেরে আমার মেয়েটার বিয়েটা দিতে চাই। অত বড় আইবুড়ো মেয়ে! মশাই! রাত্রে ঘুম হয় না।'

এইরূপ রগড়া বা বচন-বিন্যাস দ্বারা স্বভাবতঃই চাউল ব্যবসায়ীর মন আশান্বিত হয়ে উঠবে। ক্রেতার অভাবে তার ব্যবসা যাবার দাখিল হয়েছে, এ সংবাদ আমরা পূর্বেই জেনে নিয়েছি। এর পর আমরা তাকে রগড়ার পর রগড়া প্রয়োগে অভিভূত করে অতি সহজেই আড্ডাখানায় হাজির করতে পারি। আড্ডাস্থলে সে উত্তেজনাপূর্ণ মন নিয়েই আসবে। উত্তেজনার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক

হয়ে উঠে। এই কারণে তাদের লোভী করে তুলে ঠকানও সহজ হয়।"

সাধারণ ভাষায় প্রতারণার নওসেরা পদ্ধতিকে আমরা বলি 'বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ বা ঘুঁটি খেল্'—আপাতঃ দৃষ্টিতে এই খেলাকে জুয়া বলে মনে হলেও আসলে উহা প্রবঞ্চনার একটি অভিনব পদ্ধতি মাত্র।

এই দলের মধ্যে রগড়া দেবার কাজে বহাল ব্যক্তিদের পরিশ্রম করতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। এই 'রগড়া'র বচন-বিন্যাস এবং বাক্যজাল সৃষ্টির মধ্যে এরা প্রচুর চাতুর্য প্রকাশ করে থাকে। তাদের শিকার বা victim-দের খুঁজে বার করতেও তাদের কম বেগ পেতে হয় না। এই 'রগড়া' সম্বন্ধে নিম্নে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"হাওড়া জেলার অমুক গ্রামে আমার বাস। পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের সেবার উপর নির্ভর করে আমার সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। একদিন ঠাকুর পূজা সমাপন করে বহির্বাটীতে ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি ব্যস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাঁ মশাই! এই কি সেই অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের বাড়ি?' উত্তরে আমি 'হাঁ' বলা মাত্র ভদ্রলোক একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'আঃ, বাঁচালেন মশাই!' এর পর তিনি ভক্তি গদগদ ভাবে কপালে বার বার যুক্তকর ঠুকে বলতে থাকলেন, 'বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ।' হতভম্ব হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি মশাই? মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

ভদ্রলোককে বিশেষ ক্লান্ত মনে হলো। শুনলাম তিনি বহু দূর

থেকে আসছেন। এই গ্রামটা খুঁজে বার করতেও তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। একটা মিষ্টি প্রসাদ মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা আমাকে বললেন।

'আমি মশাই শ্রীপুর গড়ের সাতলাখী জমিদার মহারাজা স্যার মহাপ্রতাপ রায় বাহাদুরের একজন অন্দর মহলের কর্মচারী। আমি সেখানে স্বর্গগত বাবা মহারাজের আমল থেকে বহাল আছি। অধমের নাম শ্রীহরিসাধন মৈত্র। সাতক্ষীরের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা। তারপর, হ্যাঁ, আসল কথা বলি শুনুন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় মহারাণীর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। ঠিক যেন ননীর পুত্তলি। হঠাৎ একদিন খেলা করতে করতে ধড়াস করে তিনি মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ব্যাস। তারপর আর তিনি উঠেন না। দৌড়ে এসে আমরা সকলে দেখি তড়কা আরম্ভ হয়েছে, ভেদবমিও। কোলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা এলো, লাট সাহেবের সাহেব ডাক্তারও। কিন্তু সকলেই সেই এক কথাই বলে গেলো, সাত দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। গলার মধ্যে নাকি, কি বলে গেলাণ্ড [gland] না কি হয়েছে। রাণীমা তাই শুনে সেলুন ভাড়া করে সোজা হরিদ্বারে তাঁর সেই সাধক গুরু প্রভানন্দগিরির কাছে চ'লে গেলেন। তাঁর আশ্রমের দুয়ারে এসে উনি আছড়ে পড়লেন। একটি কণাও তিনি খান না দান না। সঙ্গে আছে এই অধমতারণ বুড়ো। কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম মশাই! গুরু মহারাজ মা'কে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে অবশেষে নাচার হয়েই ধ্যানে বসলেন। তিন দিন তিন রাত্রি পরে তিনি কি প্রত্যাদেশ পেলেন জানি না; ঐ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মা'কে জানালেন, 'যা বেটী, বাড়ি যা! ছেলে এতক্ষণে তোর ভালো হয়ে গেছে।' তা আমি মশাই কোন কালেই ঠাকুর-দেবতায় একটা

বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু মশাই, বলবো কি! আমি ফিরে এসে দেখি, যে-ছেলেটার মরবার কথা, সে কি'না রাজবাড়ির হল ঘরে লাট্টু ঘোরাচ্ছে! জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী! বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! বাবা-আ। আজ্ঞে! এর পর কি হলো? হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি, দেবতা! বলছি, শুনুন। এর পর গুরুঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আবার আমরা গাড়ি রিজার্ভ করতে যাচ্ছি, এমন সময় হরিদ্বারবাসী সেই গুরুঠাকুরের এক চেলা সেখানে এসে হাজির। তিনি আমাদের সেই রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে আমাদেরকে বললেন :—

'গুরুদেব বলে পাঠিয়েছেন যে, হরিদ্বার যাবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ছেলেটি বেঁচে গেছে গুরুদেবের স্বর্গগত গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত হাওড়া জিলার অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর কৃপায়। সেখানকার জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরই গুরুদেবকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে আমরা যে লক্ষ টাকা দান করতে মনস্থ করেছি তা তিনি গ্রহণ করবেন না। তাঁর আশ্রমের জন্য একটি মাত্র পর্ণ কুটিরই যথেষ্ট। উহার অতিরিক্ত তাঁর কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর আবাসস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবার জন্যে গুরুদেবকে স্বপ্ন দিয়েছেন। অতএব আমরা যেন লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর সেবায়েত পরম ভক্ত অমুক গ্রামের অমুকের হস্তে লক্ষ মুদ্রা পত্রপাঠ দিয়ে দিই।'

এর পর সেই ভদ্রলোক 'লক্ষ্মীনারায়ণজী, লক্ষ্মীনারায়ণজী' বাক্য উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেললেন। এত বড় একটা সুখবরের পর লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর দয়ার কথা স্মরণ করে আমিও কেঁদে ফেললাম।

আমরা উভয়ে এই ভাবে বহুক্ষণ কেঁদেছি। কতক্ষণ তা আমাদের কারুরই স্মরণ নেই। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখের জল মুছে প্রস্তাব করলেন, 'মশাই! তাহলে এখন চলুন, গাত্রোত্থান করা যাক্। শুভস্য শীঘ্রম্। মহারাজা এখন দমদমার প্রাসাদেই আছেন। মহারাণীও তাঁর সঙ্গে আছেন। রেজিস্টারী কবলা প্রভৃতির ব্যাপারটা পাকাপাকি করে আসা যাক্। রাজা-রাজড়ার মন। বলা তো কিছু যায় না; ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক কাঁসি। এই দেখুন না, দিনে দশবার তাঁরা আমাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় কর্মে বহাল করছেন। খেয়েদেয়েই রওনা হওয়া যাক। এখানে আমাদের দেরি করা ঠিক নয়।'

অনতিবিলম্বে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হলাম। আমরা উভয়ে নির্বিবাদে রাজা বাহাদুরের দমদম বাগানবাড়িতে পৌছাই। আমার ট্যাকঘড়িতে তখন বারোটা বেজেছে। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি। তক্‌মা-আঁটা দরোয়ানের দল এবং নীল কোর্তা পরা চাপরাশীরা ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটি করছে। প্রাসাদের উঠবার সিঁড়ির দুইপাশে দুইটা বড় বাঘ সাজানো ছিল। বাঘ দুইটির সহিত সংলগ্ন দুইটি ফোয়ারাও দেখলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপটায় পা দেওয়া মাত্র বাঘ দুইটা গাঁক করে ডেকে উঠলো। চমকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে দেখি যে ফোয়ারা দুইটা হতে গোলাপ জল পড়ছে। এই আজব ব্যাপারে আমাকে অবাক হতে দেখে ভদ্রলোক আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'মশায়! ও কিছু নয়। সিঁড়ির তলায় স্প্রিং-এর যন্ত্র লাগানো আছে তাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার হয়। রাজা-রাজড়ার কাণ্ড মশাই, কি'ই আর আমি বলব।' এরপর দরবার ঘরে এসে দেখি রাজা বাহাদুর একটা মূল্যবান ফরাস ঢাকা চৌকিতে বসে মখমলে মোড়া তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জরির টুপি পরা এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলচেন। আমাকে পাশের একটা স্প্রিং-এর সোফার উপর হাতে

ধরে বসিয়ে দিয়ে নিম্ন স্বরে মৈত্র মশাই আমাকে জানালেন, 'চুপ করে বসে থাকুন, কথা বলবেন না। ওঁর মেজাজ এখন গরম। দেখছেন না, জুয়োতে উনি এখন হারছেন!' তেইশ হাজার টাকা হারার পর রাজা বাহাদুর খেঁকরে উঠে বললেন, 'এ বেটা নিশ্চয়ই জাদু জানে। এই দরোয়ান! ইসকো নিকাল দেও।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চালাক লোক। বেগতিক বুঝে জুয়ায় জেতা টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাড়ি থেকেও উধাও হতে তাঁর দেরি হয়নি। অনতিদূরে একজন ভাটিয়া ব্যবসায়ী বসেছিলেন। একটু এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি বললেন, 'রাজাসাহেবের আজ্ঞা হোয় তো মে ভি থোড়া খেল্ চুকে।'

হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধান একটা টিপয় চৌকির সামনে রাখা ছিল। সেই টিপয়টির উপর রাখা ছিল অর্ধপীত মদের গেলাস। টিপয়টির উপর হ'তে গেলাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে রাজা বাহাদুর উত্তর দিলেন, 'নেহি, নেহি, কভি নেহি। তুম্ভি আউর এক শয়তান আছে।' এর পর হঠাৎ রাজা বাহাদুরের লক্ষ্য পড়লো আমার উপর। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন, 'হাম্ ইন্‌কো সাথ খেলেঙ্গে। কি ঠাকুর মোশায়, খেলবেন না কি?' অকুস্থলের কাণ্ডকারখানা আমাকে অবাক করে তুলেছিল। আমার মুখ দিয়ে এর কোনও উত্তরই বার হলো না। মৈত্র মশাই এইবার এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে, না। ইনি ওদের কেউ নন। ইনি হচ্ছেন সেই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায়েৎ পরম ভক্ত শ্রীযুত অমুক।' আমার পরিচয় পেয়ে রাজাসাহেব অত্যন্ত রূপ লজ্জিত হয়ে উঠে মাথা নুইয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ঠাকুর মশাই! এই জুয়োই হচ্ছে আমার একমাত্র দুর্বলতা। তা আমি আর কি করব বলুন।

এই সব আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। পূর্বপুরুষদের সুকৃতির ফল আর কি! তা তাঁদেরই তো সন্তান আমি—হে হে হে।' এর পর হঠাৎ রাজাবাহাদুর মৈত্র মশাইকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তা তুই ঠাকুর মশাইকে এখানে আনালি কেন? তোর কি এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ছিঃ! এটর্নি বাড়ি থেকে মন্দির সংক্রান্ত দলিল-পত্রগুলোও বোধ হয় এখনও আনিস্ নি? অ্যাঁ, কি'রে কথা বলছিস্ না যে, ও'গুলো তুই আনিস্ নি তো? মশাই দেখছেন? দেখছেন তো? ওর কাণ্ডই এই রকম। ওগুলো আগে এনে তবে তো ওঁকে আনা উচিত ছিল? যা, এখন ওঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর। খবরদার! ওঁর সেবার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।' মনিবের তাড়া খেয়ে মৈত্র মশায় আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে গজ্‌রে উঠে বললেন, 'মশাই! আপনি দেখেছেন! দেখেছেন তো আপনি! এখন সব দোষ যেন আমারই।' এর পর মৈত্র মশাই-এর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারি যে রাজাবাহাদুর একটি বোকা জমিদার। জোচ্চোরেরা কায়দা মাফিক জুয়া খেলে প্রত্যহই তাঁকে হাজার হাজার টাকা ঠকায়। কিছুক্ষণ সংলাপের পর মৈত্র মশাই আমাকে প্রস্তাব করে বসলেন,—'মশাই! এক কাজ করুন না? বড় উপকার হয় তা হলে। মেয়ে দুটো আমার বড্ড বড় হয়ে গিয়েছে। বিয়েটা তাদের তা হলে এই মাসেই দিয়ে দিই। আপনার সঙ্গে উনি খেলতে রাজি হয়েছেন। এখন না হয় খেলেই দিন একটা দান। হাজার হোক আমরা ওঁর চাকর লোক। আমরা তো আর ওঁর সঙ্গে জুয়া খেলতে পারি না।'

ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে প্রথমে আমি কিছুতেই রাজি হই নি। কিন্তু ভদ্রলোক একরকম কান্নাকাটিই শুরু করে দিলেন। এইভাবে মেয়ের বিয়ে তিনি এই মাসেই দেবেন। টাকার দরকার।

পরে আমিও লোভে পড়ে রাজি হই এবং জমিদারের সহিত খেলে নগদ তিন হাজার টাকা জিতেও নিই। খেলার কায়দা-কানুন অবশ্য মৈত্র মশাই আমায় শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকাটাও দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে পূর্ব বন্দোবস্ত মত মাত্র দুইশো টাকা বাদে বাকি সব টাকা তাঁকেই দিয়ে দিতে হয়। এই উপকারটুকুর জন্যে মৈত্র মশাই আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান,— আমাকে দশ হাজার টাকা জোগাড় ক'রে পুনরায় সেখানে আসতেও তিনি আমায় উপদেশ দেন। কারণ তা হ'লে মন্দিরের বাবদ এক লক্ষ টাকা তো আমি পাবোই, এ ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা জুয়ায় জিতে আমি ঘরে ফিরতে পারব, ইত্যাদি।

লোভে পড়ে সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরে আমি গিন্নীকে মিথ্যা করে জানাই, 'গিন্নী! বড় সুখবর গিন্নী তোমার। তোমার এক বড় সুখবর। আমার এক স্যাকরা শিষ্যের সঙ্গে আজ পথে হঠাৎ দেখা হলো। কাল আমি তোমার গহনাগুলো পালিশ করিয়ে আনবো। সে বিনা পারিশ্রমিকে ঐগুলি পালিশ করে দেবে, বুঝলে?' পরের দিন আমি গিন্নীর গহনাগুলো পালিশ করাবার অছিলায় তাঁর কাছ থেকে সেগুলো চেয়ে নিয়ে তা বাঁধা দিয়ে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করি। এ ছাড়া পৈতৃক জমিজমাগুলো বাঁধা দিয়ে আরও চার হাজার টাকা যোগাড় করি। সর্বসমেত আট হাজার টাকা সঙ্গে করে শুভক্ষণ দেখে আমি বার হচ্ছি, এমন সময় আমার এক পুরাতন মন্ত্র-শিষ্য এসে সেখানে হাজির। একটু বিব্রত হয়েই আমার প্রিয় শিষ্যটিকে জানালাম, 'তা বাবা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু বাবা, এক্ষুনিই যে আমাকে একটা শুভ কার্যে বেরুতে হচ্ছে।' কথায় কথায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণের সংবাদটাও আমি তাকে জানিয়ে দিলাম।

দমদমার জমিদারের বদান্যতার কথাও আমি তাকে বলতে ভুললাম না। সব কথা শুনে শিষ্যটি আমার আঁৎকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে বলে উঠলো, 'এ্যাঁ! করেছেন কি আপনি, সেখানে গিয়েছিলেন? সর্বনাশ! ওরা যে নওসেরা জোচ্চরের দল! কয়লার একটা বড় কনট্রাকট্ দেবে বলে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেই ওরা পাঁচ হাজার টাকা ঠকিয়েছে! আদালতে ওদের নামে তিন-তিনটে ফৌজদারি মামলা এখনও পর্যন্ত পেণ্ডিং। আর আপনি কি'না—'

শিষ্যের কাছে আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হই। সত্য সমাচার অবগত হয়ে চক্ষু আমার কপালে উঠে। এই সময় আমি বুঝতে পারি যে, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকান্ত জীউ সত্য সত্যই জাগ্রত দেবতা। যথা সময়ে তিনি শিষ্যকে মদ্ সকাশে পাঠিয়ে তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। তা না হ'লে গিন্নীর হাতেই আমার প্রাণটা যেতো। আরে বাপ স্! অতগুলো গহনা, ছিঃ! বার বার যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে আমি ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাই—বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! এ অধম ভক্তের উপর অসীম তোমার দয়া।"

অসাধারণ প্রবঞ্চনার এই বিশেষ অপপদ্ধতিতে প্রবঞ্চকগণ বিবিধ রূপ রগড়ার আশ্রয় নেয়। অবস্থা বুঝে এরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের সৎ প্রেরণাসম্ভূত আদর্শ উদ্বেলিত করেও উহারই দ্বারা তারা তাদের সুপ্ত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটিয়েছে। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমাকে ওরা ইলেকট্রিক ওঅ্যারিঙ-এর একটা কনট্রাক্ট দেবে বলে। আমি সেই লোভে তাদের আড্ডা ঘরে উপস্থিত হই। এই সময় আমি ওদের বসবার ঘরে একটি নিরীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে শায়িত দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁ মশাই, এইটি কি অমুক বাবুর বাটী?' উত্তরে বৃদ্ধ

ভদ্রলোক 'হাঁ' বলে আমাকে একটি শোফায় উপবেশন করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে অপর এক ভদ্রলোক বাটীর ভিতর হতে সেইখানে আসা মাত্র তাঁকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'দয়াময় আর কত্তো ভোগাবেন? কখন আপনাদের কর্তা আসবেন বলুন তো? ঐ দেখুন আরও এক ভদ্রলোক ওঁর খোঁজে এসেছেন।' কিছুক্ষণ পর আমার পরিচিত ঐ বাটীর মালিক বাহির হতে এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির কলহের অভিনয় শুরু হ'ল। কলহের বিষয়বস্তু হতে আমি বুঝলাম অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই এই কলহের সৃষ্টি। পরে আমার ঐ পরিচিত ব্যক্তি আমাকেই মধ্যস্থ মেনে আদ্যোপান্ত ঐরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে দিয়ে বললেন, 'মশাই! বলুন তো আমার অপরাধ কি? ঐ বোকা জমিদারটিকে জুয়ায় হারাবার কায়দা-কানুন তো ওঁকে আমিই শিখিয়েছি। আর এই জন্যই তো তা হতে আমার প্রাপ্য হিস্যা আমি কেটে নিয়েছি। আমরা তার বেতন-ভোগী নোকর না হলে ওঁর সাহায্য না নিয়ে আমি নিজেই ঐ বোকা শয়তানটার সঙ্গে জুয়া খেলে টাকাটা জিতে নিতে পারতাম।' প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া মাত্র আমার মন আমার ঐ পরিচিত ব্যক্তির উপর স্বভাবতঃই বিরূপ হয়ে উঠছিল। আমার মনের এই অবস্থা বুঝে ঐ ভদ্রলোক তখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, 'জানেন! সাধে কি আমি ওর এই ভাবে সর্বনাশ করছি? আমাকে গোমস্তার চাকরিটা দিয়ে বলে কি'না আমার ভগিনীকে টাকার বিনিময়ে তার উপভোগের জন্য এনে দিতে। জানেন আপনি ও এই ভাবে এই দেশের কত সতীসাধ্বী কন্যার সর্বনাশ সাধন করেছে? ঐ শয়তান লোকটাকে জুয়ায় ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করলে কোন পাপ নেই। আমি চাই শুধু ওর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। আপনিও আসুন না, স্যার! আপনাকে

দিয়েও কয় হাত ওর সঙ্গে খেলিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুটে নেই। উঃ! রাগে ও ক্ষোভে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটে উঠছে! চলুন কালই ওর সেই বাগানবাড়িতে আপনাকে আমি খেলবার জন্ত নিয়ে যাব।"

বহু ক্ষেত্রে এই সকল দালালরা তাদের 'শিকার'দের সহিত নানা উপায়ে আলাপ জমাবার পর তাকে সঙ্গে করে নিমন্ত্রণের অছিলায় তার স্ব-বাটীতে নিয়ে গিয়েছে। এমন সময় পথিমধ্যে ঐ দলের অপর আর এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে ঐরূপ কলহের অভিনয় শুরু করে দিয়েছে। এই কলহের কারণ ও বিষয়বস্তু অবশ্য বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্য থাকে অবশ্য যে কোনও প্রকারে 'শিকার' বা 'ভিক্‌টিম'কে ঐ অভিনব জুয়ার কার্যকরণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করে তাকে প্রলুব্ধ করে তুলা। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারকের পুত্র। আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ও একটি ছোট-খাটো ফ্যাক্টরির মালিক। অমুক ব্যক্তি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে ৮০০০০৲ টাকার একজন ফাইনেন্‌সিয়ার যোগাড় করে দেবে বলে। এর পর একদিন ভদ্রলোক সস্ত্রীক আমার বাটীতে এসে বেড়িয়েও যান। কিন্তু তার পর দুই মাস আমি তাঁর আর কোনও খবরই পাই না। পরে একদিন তিনি পত্র দ্বার আমাকে জানান যে, ইতিমধ্যে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় আমার কোনও খোঁজ নিতে পারেন নি। এই সঙ্গে তিনি আমাকে এ'ও জানান যে, তাঁর মনিব অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাটীতে এখন অবস্থান করছেন এবং তাঁর ঐ মনিব আমার ফার্মের একজন ফাইনেনসিয়ার হতে রাজি হয়েছেন। এইরূপ আরও দুই-তিনটি পত্র

বিনিময়ের পর আমি ভদ্রলোকের নির্দেশ মত তাঁর ঐ বাটীতে এসে উপস্থিত হই। ভদ্রলোক আদর-আপ্যায়ন করে আমাকে তাঁদের বৈঠকখানায় বসালে একজন মাড়োয়ারী এসে জানালো যে ঘোড়ার ব্যাপারে সে ঐ জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মাড়োয়ারী লোকটির বক্তব্য শুনে আমার ঐ বন্ধুবর খেঁকরে উঠে বললেন, 'কেয়া বাত্ বলতা আপ? যো বোলনে হোয় হামকো বলো। বাবুকো পাশ আপ নেহি যানে শেখথা।' এর পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাত কচলাতে কচলাতে অনুযোগ করে বললে, 'হুজুর সাহেব খুদ হামকো বোলায়া। উস রোজ [ঘোড়দৌড়] রেস'মে উনসে মূলাকাত হুয়া থে।' ঠিক এই সময় জমিদারবাবু অর্ধ পানোন্মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে ঐ ঘরে এসে একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে বসলেন। উনি এমন ভাব দেখালেন যেন ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে তিনি কোনও দিনই দেখেন নি। এর পর ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাঁকে ঐ সকল পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, 'আপ তো ঘোড়াকো বাস্তে বাহারমে বহুত লোকসান দিয়া। লেকেন আপকো হাম আভি নয়া ঘোড়াকে এক খেল দেখলায়গা।' 'কেয়া? কেয়া? কোন্‌সী ঘোড়াকে খেল', জমিদার সাহেব নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর করলেন, 'ঘোড়া কাঁহা হ্যায়? তোমরা পকেটমে?' তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, 'হাঁ, বিলকুল ঠিক বাত হুজুর! আপ ঠিক বাত বাতায়া হ্যায়। ঘোড়া হামরা পকেটমে মজুত হ্যায়।' এই বলে ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পকেট থেকে প্রায় বিশটা গোল ঘুঁটি বার করে জমিদার সাহেবের সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললে, 'আপ দেখিয়ে না। আভি কেউসেন ইনলোক জোর কদমমে দৌড়েগা গা।' আমি কৌতুহলী হয়ে টেবিলের দিকে চক্ষু ন্যস্ত করা মাত্র ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খেলার কায়দার মহড়া শুরু

করে দিলে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে 'বোকা' ঐ জমিদারও বাজি হারতে শুরু করে দিলে। এই দেখে আমার বন্ধুবর নিম্নস্বরে আমাকে বললে, 'এখন বুঝলেন তো ব্যাপার? আপনি দেখে রাখুন খেলাটা।' ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে তাগিদ আসায় জমিদার সাহেব অল্পক্ষণের জন্য অন্দর মহলে গেলে বন্ধুবর মাড়োয়ারীকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি বাপু, চালাকী রাখো। আমাকে ও আমার এই বন্ধুকে বখরা না দিলে বাবুসাবকে আর খেলতেই দেবো না।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলল, 'আচ্ছা! ঠিক হ্যায়। বখরা আপকো মিলেগা! চাহে তো ইস বাবুজী দো এক দান খেল দেনে শেখতা। খেলাকো কায়দা হাম আভি উনকো শিখলায়া দেয়েঙ্গা।"

উপরের বিবৃতিতে দেখা যায় যে 'শিকার'-এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পর কোনও এক অজুহাতে দুইমাস সময় নেওয়া হয়েছে। এইভাবে কয়েকটি শিকারকে জিইয়ে রেখে ইতিমধ্যে যে সকল 'শিকার' তৈরি হয়ে গিয়েছে তাদের বধ করার পর এই সকল জিইয়ে রাখা শিকারদের উপর একে একে এরা হাত দেয়। ইহাতে সুবিধা এই যে, এতদ্দ্বার শিকারগণ মনে করে যে তাদের ঐ নূতন বন্ধুর এতে বিশেষ কোনও স্বার্থ নেই। তা না হলে প্রথম কয়দিনের মধ্যে যা করবার তা না করে এত দেরি করেই বা উনি আসবেন কেন? এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে শিকারগণই তাদের আসতে দেরি হতে দেখে যেচে তার বাটী গিয়ে তাকে ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। এই অবস্থায় প্রবঞ্চকগণ তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য বহু গড়িমসি ও টালবাহনার পরে তবে তাদেরকে ঐ আড্ডায় প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে।

বহুক্ষেত্রে শিকারদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ আছে কি'না তা পরখ করে

দেখে নেওয়া হয়ে থাকে। এই সময় খেলতে বসে জমিদার হঠাৎ অপমানিত মনে করে বলে উঠেন, 'কিই! আমি এই লোকটার সঙ্গে খেলব! ও দেখাক আগে কতো টাকা ওর আছে। এই আমি রাখলাম পাঁচ হাজার টাকার নোট। এবার রাখুক আগে ও ওর টাকাও এখানে। আমি কোনও ভিখিরীদের সঙ্গে খেলি না।' প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নোটের সাইজে কাটা এক বাণ্ডিল কাগজের উপরে ও নিম্নে একখানা করে ১০০৲ টাকার নোট রেখে ঐ বাণ্ডিলটা বেঁধে রাখা হয়। শিকারমন্ত ব্যক্তিগণ যদি অধিক অর্থ ঐ দিন জমির উপর না রাখতে পারে তা' হলে তাকে বিদেয় দিয়েদলেরই এক ব্যক্তির সহিত খেলার সূচনা করা হয় এবং ঐ শিকারমন্ত ব্যক্তির সম্মুখেই রাজাবাহাদুর-গণ প্রতিদানেই হেরে যেতে থাকেন। এই সুযোগে দালালগণ ঐ সকল শিকারমন্ত ব্যক্তিদের পরদিন প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে করে আনবার জন্য উপদেশ দিতে থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধামত এই সকল লোভী ব্যক্তিদিগকে তাদের শ্রীঅঙ্গের সোনার ঘড়ি, হীরার আংটি বা সোনার বোতামের বিনিময়ে এই খেলা খেলবার জন্য অকুস্থলেই দালালগণ কর্জ দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে জুয়ায় হার হওয়ায় এই সকল দ্রব্য তাঁরা আর ফেরত পান নি। এই সকল রাজাবাহাদুর দামী সিল্কের পাঞ্জাবি ও বহু হীরার আংটি পরিহিত হয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেও ওঁরা কিন্তু দলে প্রধান ব্যক্তি হন না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে খেলার সূচনা করে সে-ই হয় দলের একজন প্রধান ব্যক্তি।

এই সকল অপরাধীদেরই আমরা নওসেরা ঠগী বলে থাকি। বিচারের সময় এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই বলে থাকে যে, ফরিয়াদীর সহিত তারা কেবলমাত্র জুয়া খেলেছিল। জুয়ায় হার

হওয়াতে ফরিয়াদী অর্থ হারিয়েছেন। তাদের কেহ তাকে প্রতারণা করে নি। এই জুয়া ঐ সকল ফরিয়াদী স্ব-ইচ্ছাতেই খেলেছে। অতএব আসামীরা প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। অপরদিকে ফরিয়াদীর পক্ষ হ'তে বলা যেতে পারে যে, আসামীরা কেবলমাত্র জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে ফরিয়াদীকে অকুস্থলে আনে নি। তারা তাকে প্রতারিত করার জন্যেই সেখানে ভুলিয়ে এনেছে। প্রতারণা অপরাধের কর্ম পদ্ধতির [Modus operandi] একটি অংশরূপে এই দ্যূত-ক্রীড়ার অবতারণা করা হয়। এই দ্যূতক্রীডার মধ্যে এমন অনেক ফাঁকি ছিল, যার জন্যে এই প্রকার জুয়াকে আদপে জুয়া বলা চলে না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণা অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ: "যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা কি'না, ঐ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংবা কেহ যদি কাহারও উক্ত রূপ কার্য বা উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূক্ত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্য করে বসে বা উহা না করে, যে কার্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা তা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করতো না বা তা করতে বিরত থাকতো; প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপরাধ বলা হবে।"

এই বিশেষ ক্ষেত্রে উক্তরূপে প্রতারিত না হলে, প্রতারিত ব্যক্তি কখন দ্যূত-ক্রীডায় আসক্ত হতো না। প্রতারিত ব্যক্তিরা লোভে পড়ে

জুয়া খেলেছেন। এই ভয়ে ও লজ্জায় তাঁরা প্রায়ই থানায় আসেন না। এঁদের একটা মিথ্যা ধারণা জন্মে যে, সেখানে তাঁরাও জুয়া খেলেছেন, এই কথা থানায় প্রকাশ পেলে তাঁদেরও শাস্তি হবে। প্রবঞ্চক অপরাধীরাও প্রতারিত ব্যক্তিদের এইরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা ভুল। মানুষের স্বভাবজাত অপস্পৃহার কৃত্রিম উপায়ে বহির্বিকাশ ঘটানোর জন্য ওরাই আসল অপরাধী। বাক্-প্রয়োগদ্বারা যে কোনও দুর্বলচিত্ত মানুষকে উক্তরূপে লোভী করে তোলা সম্ভব। নওসেরা পদ্ধতি মানুষের অন্তর্দেশে [দেহকোষে] অপস্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণিত করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন]। ভারতীয় পুলিশ নওসেরা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিকটা বিবেচনা করে প্রতারিত ব্যক্তিদের প্রতি বরং সহানুভূতিশীল হন এবং ঐসকল প্রবঞ্চক-দের জন্যে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ভাবে প্রতারিত হলে প্রতারিত ব্যক্তিদের যথা শীঘ্র থানায় খবর দেওয়া উচিত।

তিমি মৎস্য নয়। আসলে উহা একটি স্তন্যপায়ী জীব। অনুরূপ-ভাবে বিড্-গ্যাম্ব্লিঙ্ বা ঘুঁটিখেল্, জুয়া নামে অভিহিত হ'লেও আসলে উহা একটি প্রতারণা অপরাধ। এই খেলা যে কোনও এক সত্যকার জুয়া নয়, আসলে উহা প্রতারণা মাত্র—এই বিশেষ সত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝা উচিত প্রকৃত পক্ষে দ্যূত-ক্রীড়া বা জুয়া কাকে বলে? যে সকল খেলাতে হার-জিত, চান্স [chance] বা দৈবের উপর নির্ভর করে তাকেই বলা হয় জুয়া বা দ্যূত-ক্রীড়া। যে সকল খেলার হার বা জিত কোনও না কোনও পক্ষের নৈপুণ্যের [skill] উপর নির্ভর করে তাকে কেউ জুয়া খেলা বলে না। এই নৈপুণ্য দুই প্রকারের হয়; যথা, অঙ্গ-নৈপুণ্য এবং প্রজ্ঞি-নৈপুণ্য। অঙ্গ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্জুনের

লক্ষ্যভেদের কথা বলা যেতে পারে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মূলে ছিল এই অস্ত্রনৈপুণ্য, তাঁর ঐ বিষয়ে সাফল্যের জন্য দৈব দায়ী নয়। কোনও ব্যক্তির মস্তকোপরি ছোট একটি বল রেখে ৭০ গজ দূরে থেকে বলটিকে গুলি বিদ্ধ করা কিংবা ২০০ গজ দূরের একটি ফল তীর দ্বারা বিদ্ধ করা রূপ খেলার মধ্যেও থাকে এই অস্ত্র-নৈপুণ্য। এবংবিধ অস্ত্রনৈপুণ্য বা চাতুর্য দেখিয়ে যদি কেহ অর্থ লাভ করে তাহলে উহাকে জুয়া বলা হয় না। অস্ত্রনৈপুণ্যের বিষয়টি এখানে বুঝিয়ে বলা হ'ল। এবার প্রতি-নৈপুণ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যাক্। কোনও পক্ষ এমন চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা পূর্ব হতেই অবলম্বন করে, যার জন্যে উক্ত তীর বা গুলি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌঁছায় না। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে উহাকে বলা হবে প্রতিনৈপুণ্য। বিড্-গ্যাম্বলিঙে প্রতারকেরা প্রতিনৈপুণ্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। চাতুর্য সহকারে তারা তাস বা ঘুঁটি এমনভাবে সাজিয়ে রাখে বা সরিয়ে দেয়, যা'তে করে এ সকল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা সহজেই হেরে যায়। এ ছাড়া প্রতারকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যেই মানুষকে তাদের আড্ডা-স্থলে ভুলিয়ে আনে। অর্থাৎ কি'না শুরু হ'তেই তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রতারণা।

এই সব খেলা সত্য সত্যই জুয়া বা প্রতারণা কিনা তা নির্ভর করে এই 'দৈব' শব্দটির [Chance] প্রকৃত সংজ্ঞার উপর। এই দৈব শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে আরও দুইটি অনুরূপ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা দরকার। উহাদের যথাক্রমে দৈব-দুর্ঘটনা [Accident] এবং দৈব-সম্মিলন [বা chance coincidence] বলা হয়। নৈপুণ্যমূলক খেলার সাফল্যের মধ্যে যেমন থাকে চাতুর্য, তেমনি প্রতিটি দুর্ঘটনার মূলে থাকে ব্যক্তি-বিশেষের অবহেলা বা অসাবধানতা। অপরদিকে কোনও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা বিনা প্রচেষ্টায় হঠাৎ যদি পেয়ে যাই,

কিংবা যে লোকটিকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, হঠাৎ যদি তাকেই আমরা রাস্তায় দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ পাওয়া বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা বলে থাকি দৈব-সম্মিলন [chanced coincidence]। এই দৈব-দুর্ঘটনা বা দৈব-সম্মিলনের সহিত আসল দৈব বা 'চান্স'-এর কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার মতে দ্যূত ক্রীড়া তথা জুয়া খেলার মূল ভিত্তি, এই দৈব বা 'চান্স'-এর সংজ্ঞা হওয়া উচিত এইরূপ : "যে খেলায় হার জিতের আশা এবং আশঙ্কা থাকে প্রায় সমান সমান বা ৫০%. ৫০%, তাকে বলা যেতে পারে জুয়া খেলা।" আমার মতে হারার আশঙ্কা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি থাকলে বুঝতে হবে যে এই খেলার মধ্যে কারসাজ আছে। একটি পয়সা যদি বার দশেক "টস্" করা যায় তা হলে কতবার "হেড্" এবং কতবার "টেল্" পড়বে তা বুঝা যায় না। কিন্তু কেহ যদি এই পয়সাটিকে দুই লক্ষ সাতায় হাজার বার "টস্" করেন তা হলে দেখা যাবে, "হেড্" এবং টেলের সংখ্যা হয়েছে প্রায় সমান সমান। এই দৈব বা 'চান্স'-এর প্রকৃত দর্শন বা ফিলসফি হওয়া উচিত এইরূপ। যে সকল খেলায় এই দৈব বা চান্স উপবিউক্ত সংজ্ঞানুযায়ী হয় না, সেই সকল খেলাকে জুয়া না বলে প্রতারণাই বলা উচিত। রেস বা ঘোড়দৌড়ের কোন্ ঘোড়াটি প্রথম হবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে দৈব বা চান্স-এর উপর। কারণ, অশ্ব পশু হওয়ায় পশু-জীবের মতিগতির উপর কারো হাত নেই। কিন্তু কোনও "জকি" শেষ সময়ে রাশ টেনে ধরে অশ্বটিকে প্রথম হতে না দিলে উহাকে প্রতারণা বলা হবে। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা যাক্।

"কোনও এক শহরের রেইস্কোর্সে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। যে ঘোড়াটিকে সকলেই "গুড ফর নাথিং" বলে জানতো সেই ঘোড়াটিই সেইদিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই ঘটনার ফলে বহু লোকের

বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় এবং দৌড় ক্লাবের মালিকদের ক্ষতি হয় অসামান্য। তদন্ত দ্বারা পরে জানা যায় যে, ঘোড়াটিকে দৌড়ানর অব্যবহিত পূর্বে মাদক দ্রব্য সেবন করানো হয়েছিল এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অশ্বটি হঠাৎ অত্যন্ত রূপ তেজী হয়ে উঠে। অশ্বটির মূত্র পরীক্ষার দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হয়। জনসাধারণকে এইরূপ ভাবে প্রতারিত করার জন্য স্টুয়ার্টগণ অশ্বের মালিকের শাস্তি-বিধান করেন।"

উপরি উক্ত বিতণ্ডা [Argument] দ্বারা আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি যে, এইরূপ ঘুঁটিখেলা বা বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ আসলে জুয়া নয়। উহা রাষ্ট্রের আইন মতে এক প্রকার প্রতারণা মাত্র। এইরূপ প্রতারণার জন্যে নওসেরা অপরাধীদের দণ্ড হওয়া উচিত। এইরূপ প্রবঞ্চনা অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অবশ্য দণ্ডনীয়।

এই সকল অপরাধীদের সাজা দেওয়ার অপর আর এক অসুবিধা আছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এমন কতকগুলি অপরাধ সম্পর্কিত ধারা আছে, ঐ সকল ধারানুযায়ী মামলা হলে ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে আসামীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ প্রত্যাহার করতে পারে। ইংরাজিতে এইগুলিকে বলা হয় "কমপাউণ্ডেবল কেস"। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে প্রতারণা একটি কম্পাউণ্ডেবল কেস। এই কারণে ধরা পড়ে চালান হবার পর দুর্বৃত্তেরা ফরিয়াদীকে তার অপহৃত অর্থ ফেরত দিয়ে তার সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে।*

---

* কখনও কখনও নিম্ন আদালতে সাজা হওয়ার পর এরা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করেছে এবং ঐ উচ্চ আদালতে শুনানীর সময় মামলাটি তারা ফরিয়াদীর সহিত মিটিয়ে নিয়েছে।

কথনও কথনও এরা ফরিয়াদীকে টাকা খাইয়ে তাকে পুলিশের নাগালের বাইরেও সরিয়ে দেয়। আমার মতে ফরিয়াদীর এই দ্বিতীয়বারের অপরাধ সত্যকার অপরাধ এবং উহা ক্ষমারও অযোগ্য।

এইবার মানুষের এইরূপ হাস্যকর ভাবে ঠকার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। কথিত আছে—লোভ এবং ক্রোধ, এই দুই রিপু মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। এই অবস্থায় তারা কোনও কিছু দেখেও দেখে না, কিংবা কোনও কিছু বুঝেও বুঝে না। এই সময় তারা কোনও বিষয় শুনেও শুনে না। এই অবস্থায় শিশুর বোধগম্য সত্যটিও সে উপলব্ধি করতে অপারক হয়। এই কথাটি অতীব সত্য। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে: প্রত্যেক মানুষের মধেই নির্বুদ্ধিতা এবং চতুরতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই লোভ মানুষের চতুর মনটিকে বিচ্ছিন্ন করে [spllt up] এমন ভাবে প্রদমিত রাখে যে উহা কিছুক্ষণের জন্য আর তাহার মধ্যে কার্যকরী থাকে না। কোনও সঙ্গত উত্তেজনা বা তীব্র অভাবের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা বাক্‌প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মনের দুর্বল বা নির্বোধ অংশটিকে ভুল বুঝিয়ে তার দ্বারা নানারূপ কার্য করিয়ে নেয়; উপরি উক্ত রূপ অসাধারণ-প্রবঞ্চনা এই মতবাদের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিষয় বুদ্ধির সাময়িক অবলুপ্তি এবং প্রতিরোধ-শক্তি অপসরণের কারণে উহা ঘটে। এই কারণে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সকল সময়েই যাচাই করে নেওয়া উচিত। লোভ, আশা এবং উত্তেজনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বক্তিদের কিরূপ পরিমাণে বুদ্ধিহীন করতে পারে তা এইভাবে প্রতারিত কোন স্কুল মাস্টারের নিম্নোক্তরূপ বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

"আমি পূর্বেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে বরং লজ্জিতই হয়ে উঠি। আমার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এভাবে ঠকানোর বিষয় ভেবে আমি অবাক হই। আমি নিজেও অনেককে বহুবার নানা ভাবে ঠকিয়েছি। তবু ঠকামীর পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত থাকা সত্ত্বেও আমি ঠকলাম। তার কারণ লোভ আমার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি সাময়িক ভাবে অপহরণ করেছিল; তা না হ'লে অত বড় একজন মহাজনের সন্ধানে আমি ঐ সামান্য খোলার বাড়িতে যেতাম না। তারা যখন বলল যে মহাজনটি কোনও এক বিশেষ কারণে এই সময়টায় ঐখানে এসে থাকেন, তখন তাদের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা আমি অবলীলাক্রমেই বিশ্বাস করি। মহাজনের সাজানো ভৃত্যটি যখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানাল, 'দয়াময়! আপনি আমার মনিবকে বাঁচান। তা না হ'লে ওরা ওঁকে মেরেই ফেলবে।' তার সেই কান্নাকে আমি মায়াকান্না বলে আদপেই বুঝি নি। সাজানো জুয়ায় সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রায় মাইল পাঁচেক উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হেঁটে চলি। প্রায় সাত-আট দিন এই লজ্জাজনক কথা কাউকে জানাইও না। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের জানালে হয়ত সেইদিনই আসামীরা ধরা প'ড়ত এবং আমার অপহৃত অর্থও হয়ত আমি পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম।"

নওসেরা—অন্যান্য

এই বিড্ গ্যাম্বলিঙ-এর অভিনয় ব্যতীত অন্যান্য রূপ অভিনয়ের দ্বারাও নওসেরা দুর্বৃত্তরা দুর্বলচিত্ত মানুষদের ঠকিয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। অপরাধটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

"আমি এই শহরে একজন নূতন ব্যবসাদার। আমার ঔষধপত্রের কারবার আছে। দুষ্প্রাপ্য বিধায় আমার দোকানে কিছু কুইনাইনের ঘাটতি পড়ে। ফলে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আমি কালোবাজার [Black-market] হতে সংগ্রহ করতে মনস্থ করি। অচিরে একজন দালালেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান কালে পারমিট্ বা ছাড়পত্র ব্যতীত কুইনাইন্ ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। দালালটি আমাকে গোপনে এই কুইনাইন্ ক্রয় করবার জন্যে পরামর্শ দেন। এই জন্য একজন বড় ভাটিয়া ব্যবসাদারের কাছে তিনিই আমাকে নিয়ে যান। ভাটিয়া ব্যবসাদার ভদ্রলোকটির কাছে আমি এও শুনি যে সরকারী ট্রেজারি হতে কুইনাইনের টিনগুলি কোনও এক ব্যক্তি চুরি করে তাঁর কাছে বিক্রয় করে দেবার জন্যে রেখে গেছে। এই সময় কুইনাইনের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এতে আমার লোভ বেড়ে যায়। চোরাই জেনেও সস্তা দরে আমি উহা কিনতে রাজি হই। ভাটিয়া মহাজনটি কিন্তু কিছুতেই স্ববাটীতে মাল আনতে রাজি হন না। তিনি আমাকে শহরের একটি নিরালা উদ্যানে দুপুর বেলায় মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা সমেত হাজির থাকতে অনুরোধ জানান। যথা সময়ে নির্ধারিত স্থানে এসে আমি হাজির হই। ঔষধের মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা ব্যাপারীটির হাতে হিসেব মত তুলে দিয়ে মার্কামারা কুইনাইনের টিনগুলো গুনে নিচ্ছিলাম। নিরালা দুপুর। সেই সময় সেইখানে জনপ্রাণীরও আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সেখানে মোটা মোটা জন চার সি. আই. ডি. পুলিশের আবির্ভাব হল।* পুলিশরূপে তাদের বুঝতে পারা মাত্র দালাল ও সেই ব্যাপারীটি উভয়ে

* কোনও অপরাধ-পদ্ধতিতে পুলিশের অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকলে, উহাকে বলা হয় "ধড়িসি" পদ্ধতি। বহু ক্ষেত্রে নিম্নপদস্থ কোনও অসাধু পুলিশও এদেরকে সহায়তা করে।

টাকা নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পালাবার সময় দালালটি অস্ফুট স্বরে আমাকে সাবধান করে বলে গেলো, 'মশাই পালান। শীঘ্র পালান। গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে। ঐ।' তাদের পিছু পিছু আমিও সবে পড়ছিলাম, কিন্তু পুলিশ ক'য়জন দৌড়ে এসে আমাকে ধরে ফেলল, তাদের নেতা ছিল একজন ছদ্মবেশী জমাদার। গোঁফ মুচড়ে আমার মাথায় একটা চাঁটি কষিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'শালা! তুম্ বাতায়ে জলদি, কোউন লোগ ভাগা আভী।' এর পর জমাদার সাহেব কুইনাইনের টিন কয়টি আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিয়ে সঙ্গের লোকদের হুকুম জানান, 'লে চলো শালেকো থানামে।' চোরাই মাল ক্রয়ের শেষ পরিণতি যে জেল তা আমার জানা ছিল। আমি নাচার হয়ে কুইনাইনের টিনগুলো এবং সেই সঙ্গে আমার শেষ কপর্দকটিও তাদের উৎকোচ দিয়ে আমি মুক্তি ক্রয় করি। তিন দিন তিন রাত পরে আমি জানতে পারি যে এই লেনদেনটি আসলে ছিল একটি অভিনয় মাত্র। এমন কি পুলিশ কয়জনও আসল পুলিশ নয়। উহারা সকলে নকল পুলিশ মাত্র। দালাল, ব্যাপারী, পুলিশ—সকলেই একই ঠগী দলের দল। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি আমি চেপেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে কোনও এক বন্ধুর পরামর্শে আমি থানায় এজাহার দিই। তদন্তের পর পুলিশ অপরাধী ব্যক্তিকে ধরে আনলে আমি তাদের সনাক্তও করি।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধ-পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু অদল-বদলও দেখা যায়। অর্থাৎ কি'না জাল পুলিশের বদলে প্রথমে এসে হাজির হয় সাজানো গুণ্ডার দল—জন পাঁচ-ছয় ষণ্ডামার্কা লোক হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে উভয় পক্ষকেই মারধর করে এবং অর্থাদি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে থাকে। এর কিছু পরেই আবির্ভূত

হয় জাল [নকল] পুলিশের দল। এই নকল পুলিশের আবির্ভাবে সাজানো গুণ্ডারা পলায়ন করে এবং পলায়নে অপারক হয়ে প্রতারিত ব্যক্তি যথারীতি ধরা প'ড়ে উৎকোচ দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

উপরের ঘটনাটি অসাধারণ প্রতারণার একটি বিশেষ উদাহরণ। আমি এমন অনেক ব্যক্তির কথাও শুনেছি যে গোপনে নিষিদ্ধ কুইনাইন কিনে দেখেছেন টিনগুলিতে কুইনাইনের বদলে ময়দা ভরা রয়েছে। এই ভাবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও এ কথা তাঁরা পুলিশকে জানান নি। কারণ তাঁদের ধারণা, নিষিদ্ধ পণ্য বে-আইনি ভাবে সংগ্রহ করতে তারা প্রয়াস পেয়েছেন, এ কথা স্বীকার করলে পুলিশের কবলে পড়ে তাঁদেরও হয়ত সাজা পেতে হবে। কিন্তু তাদের এইরূপ ধারণা ভুল। নওসেরা দুর্বৃত্তদের প্রত্যেকটি অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধেই পুলিশ অবগত আছে। কি রূপে মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে নওসেরা দুর্বৃত্তরা মানুষকে লোভী করে তুলে তাদের ঠকিয়ে থাকে, তা পুলিশ ভাল ভাবেই জানে। এই সব অপরাধ সম্বন্ধে প্রতারিত ব্যক্তিরা থানায় যথাসত্বর এজাহার দিলে তাঁরা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের উপকারই করবেন—এই ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে তাঁদের কোনওরূপ বিপদেরই সম্ভাবনা নেই।

সাধারণতঃ নওসেরা অপরাধীরা অপকর্মের সময় কোনওরূপ বল প্রকাশ করে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেরও কথা শুনা গিয়েছে। প্রতারণার জন্য অকুস্থলে নীত ব্যক্তিদের কেহ কেহ দুর্বৃত্তদের এই অভিনয় [মধ্যপথে] ধরে ফেলে স্থান ত্যাগ করতে চায়। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের অক্ষত দেহে যেতে দেওয়াই হয়। কিন্তু এইরূপও শোনা গিয়েছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অবস্থায় তাদের অর্থাদি বলপ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে। এইরূপ

অপরাধকে রাহাজানি [Robbery] অপরাধ বলা হবে। উহাকে কখনও প্রতারণা অপরাধ বলা হবে না। সাধারণতঃ ঠগী দলের অপরাধীরা নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে। এই কারণে অপরাধের এইরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। বলপ্রয়োগের কথা শোনা গেলে বুঝতে হবে আসলে অপরাধীরা নওসেরা দলের নয়, কিংবা ঐ দলে এমন কাউকে কাউকে [নবাগত] নেওয়া হয়েছে, যাদের নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী মনে হলেও আসলে তারা সবল শোণিতাত্মক অপরাধী।

টপকা ঠগী

টপকা ঠগী বা টপকাওয়ালারা অসাধারণ প্রবঞ্চকদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। প্রায়শঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানীরাই এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। টপকা ঠগীদের দলগুলি সাধারণতঃ চার কিংবা পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এরা পালিশ করা সোনার বাট বা বালার আকারের পিতলের টুকরাকে সোনার দ্রব্য বলে চালিয়ে লোভী লোকেদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ এরা মজুরদের হপ্তার দিনে তাদের যাতায়াতের পথে কিংবা পল্লী অঞ্চল হ'তে আগত যাত্রীদের অপেক্ষায় রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ওৎ পেতে বসে থাকে। শহুরে লোকেরা এদের টপকা ঠগী বলে থাকে। পল্লীগ্রামের লোকেরা এদের বলে থাকে বালা খেলার দল।

চম্পারণ এবং নেপালের মুনিয়া, মজঃফরপুরের সোনার, দুসাদ্ ও মুণ্ডা মুসলমান প্রভৃতি স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির লোকেরা পল্লী অঞ্চলে এই খেলার সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। এরা পিতলের বালাকে

সোনার বালা বলে চালিয়ে লোক ঠকায় ; এই কারণে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ 'বালা খেল' বা 'বালাট্রিক্'ও বলে। প্রদেশের রেলওয়ে স্টেশন সকল ও রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টগুলিই এদের প্রধান কার্যক্ষেত্র। শহুরে টপকা ঠগীরা বালার পরিবর্তে বার বা বাট্ ব্যবহার করে। বিড্ গ্যাম্বলিঙ-এর ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব অভিনয়। এই প্রবঞ্চকদের মধ্যে কেহ সাজে পথচারী, কেহ সাজে স্যাকরা, কেহ সাজে ভিখারী, কেহ বা সাজে পুলিশের সিপাহী। কিরূপ পদ্ধতি দ্বারা টপকা ঠগীরা বড বড শহরের পথচারীদের ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠাকুরমার অনুরোধে আমি পঞ্চাশ টাকা ছোটকাকাকে মনিঅর্ডার করবার জন্যে পোস্ট আফিস যাচ্ছিলাম। রৌদ্রের প্রখর তাপে ফুটপাথগুলো তেতে উঠেছে। আমি ঐ দিন অতি কষ্টে পথ চলছিলাম। হঠাৎ একজন আধাবয়সী গেঁইয়া গোছের লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই আপনি কইতে পারেন? সোনাপট্টি কোন দিকে যাত্তি পারবো?' ভদ্রলোককে কোলকাতায় নবাগত বলে মনে হলো, তাই একটু সহানুভূতির স্বরে আমি তার এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম, 'কোলকাতায় আপনি নূতন বুঝি? তা ওটা বেশি দূর নয়। এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যান।' ঠিক এই সময়েই পাশের গলিটা থেকে একদল লোক সেখানে এসে ভিড করে দাঁড়ালো। তাদের কথাবার্তা হতে বুঝা যায় যে তারা কাল্লুভকত নামে একখানা হিন্দী ছবি দেখতে চলেছে। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি ভিড ঠেলে অদৃশ্য হবামাত্র সেখানে ঠং করে একটা আওয়াজ হলো। শব্দটি লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই আমি দেখতে পেলাম নীল কাগজে মোড়া একটি সোনার বাট রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল যে, সোনাটা ওই ভদ্রলোকের

পকেট থেকেই পড়েছে। এই সময় একজন সরল-মনা পথচারী যুবক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ভিখারী গোছের লোক সোনার বাটটা কুড়িয়ে নিয়ে ওই যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই এটা কি সোনা?' এই টপকা ঠগী দলের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আমি শুনেছিলাম। তাই কৌতুহলবশতঃ কাউকে কিছু না বলে ব্যাপারটা আমি পরিলক্ষ্য করতে থাকি। ইতিমধ্যে সোনাপট্টিগামী গেঁইয়া লোকটি সেখানে ফিরে এলেন। গেঁইয়া লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে সেই ভিখারী লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি সেই পথচারী সরল মনা যুবককে শুনিয়ে শুনিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাইদের কি কেউ এখানে একটা সোনার বাট কুড়িয়ে পেয়েছেন? পাঁচ হাজার টাকা দাম মশাই। হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এইখানটায় বোধ হয় ওটা পড়েছে। হায় হায় হায়।' এর পর প্রায় পাগলের মত হয়ে ভদ্রলোকটি স্থান পরিত্যাগ করলেন। সেই ভিখারী লোকটি এইবার পুনরায় সেইখানে হাজির হয়ে সোনাটা পরীক্ষা করছিল। এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এসে বলে উঠল, 'মাইরি মাইরি। এ তো সোনা—সোনা।' 'দেখি দেখি দেখি—' ইতিমধ্যে অপর আর একজন গুণ্ডাগোছের লোক এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'এই! খবরদার বলছি! ঐ ভদ্রলোকের পকেট থেকে ওটা পড়েছে। আমি নিজে ওটা পড়তে দেখেছি। ডেকে আন্ লোকটাকে, না হয় থানায় জমা দে।' ঘাবড়ে গিয়ে তাদের সকলেই সোনাপট্টিগামী ভদ্রলোকটিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু তাঁর কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেলো না। এর পরে সকলেই সোনাটা থানায় জমা দেবার জন্যে প্রস্তাব করলে। কিন্তু

যে লোকটি সোনাটা পেয়েছে সে কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে একটা উল্টো প্রস্তাব আনল। মাথা ও হাত নেড়ে সে বলে উঠল, 'আরে রেখে দেন মশাই, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। পুলিশের পেটে না দিয়ে আসুন এটা আমরা নিজেরাই ভাগ করে নিই। ক'টা টাকা পেলে যে আমরা এক্ষুণি মেট্রোয় যাব, কাল ভকতের নটী চামেলীবিবির বাড়িতেও যেতে পারবো। কি মশাই আপনারা রাজি আছেন তো?' অত দামী একটা সোনার বাট অত সস্তায় কিনতে কে না রাজি হয়? সকলেই ঝুঁকে প'ড়ে সোনাটা বারে বারে পরীক্ষা করতে শুরু করল। এদের মধ্যে একজন লোভী-মনা-লোক বলে উঠল, 'দেন মশায়, দেন, আমিও নেব। কিন্তু আমার কাছে আছে মাই'রি এই কুল্লে পঞ্চাশ টাকা।' কিন্তু সেই ভিখারী লোকটা কিছুতেই আশি টাকার কমে সেটি ছাড়তে রাজি হয় না। পথচারী সেই সরল-মনা যুবকটি এতক্ষণ অবাক হয়ে বিষয়টি পরিলক্ষ্য করছিল। এদের মধ্যে একজন এইবার সেই যুবকটির কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার হাতের এই সোনার ঘড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে ত্রিশটা টাকা ধার দিতে পারেন? কালই আমি টাকাটা আপনার বাটীর ঠিকানায় দিয়ে আসব।' এই লোকটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সামনের আর একজন লোক বললে, 'শুনবেন না মশাই, ওর ঐ আজে-বাজে কথা। আমি দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকা আর আপনি দিন পঞ্চাশ। আসুন আমরা দু'জনে মিলে সোনাটা কিনে নিই। সোনাটা অব আপনিই রেখে দিন। আমি বিক্রি করতে গেলেই তো পুলিশে আমায় পাকড়াও করে বলবে, আরে শালা বিড়িওয়ালা! তোর বাবা তোর জন্যে সোনা রেখে গেছে, না? আপনারা মশাই তো ভদ্দরলোক আছেন। আপনারা ঠিক বিক্রি করে নেবেন। নিন্-নিন্ মশাই, সোনাটা কিনে নিন্।' পথচারী সেই সরল-মনা যুবকটি এরপর আর

লোভ সামলাতে পারল না। প্রায় একশত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে'ও কাউকে মনিঅর্ডার করবার জন্যে পোস্ট অফিসে চলছিল। মনে মনে সে ভেবেছিলো যে সোনাটি এক্ষুণি সোনাপট্টিতে বিক্রয় করে হাজার দুই টাকা সে লাভ করতে পারবে এবং তারপর তা থেকে একশ' টাকা বার করে নিয়ে মনিঅর্ডারটা না হয় সে পরের দিনেই করে দেবে। ইতিমধ্যে রাস্তার ওপারের ফুটপাতের উপর জন দুই-তিন হিন্দুস্থানী এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সকলের হাতে ছোট ছোট খেঁটে লাঠি। সেই লোকগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বলে উঠল, 'এই গোয়েন্দা পুলিশ এসে গেছে। এটা নেবেন তো তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন। লোভে পড়ে যুবকটি তাড়াতাড়ি একশত টাকা পকেট থেকে বার করে সোনাটা কিনে নিচ্ছল আর কি। এমন সময় আমি এগিয়ে এসে ছোকরাটিকে নিরস্ত করে বললাম, 'আরে। এ তুমি কি করছ খোকা? ওর ঐ বাট কখনো সোনা নয়। ওটা একটা চক্‌চকে পেতল। এরা সব টপকা ঠগীর দল, এমনি করে লোক ঠকায়।' এরপর ঠগীগুলোকে আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'চালাকি পেয়েছ সব, না?' আমার কথা শুনে যুবকটি ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়াবা মাত্র অপর আর একজন ভদ্রবেশী পথচারী এগিয়ে এসে সোনাটা আশি টাকায় কিনে নিয়ে বলে উঠলেন, 'না মশাই। এ সোনাই। সিলেটে আমাদের দোকান ছিল যে।' এর কিছু পরেই ঠগীর দল সোনা বলে পিতলটি ভদ্রলোককে গছিয়ে দিয়ে একে একে সেখান থেকে সরে পড়ল। ঠগীর দল চলে যাবার পর ভদ্রলোকটি ফুটের সানের উপর সোনার বাটটি একটু ঘষে নিলেন। এতক্ষণে বেশ বোঝা গেল যে বাটটা পিতলের, সোনার নয়। একটু-আধটু পরীক্ষার পর উনি বুঝলেন যে ওটা একটা পিতলের বাট। ভদ্রলোকটি একেবারে অস্থির হয়ে কেঁদে ফেলে আমাকে বললেন, 'কেন

আপনার কথা শুনলাম না, মশাই! আমাকে আপনি এবার বাঁচান একটু। সামনের ঐ গলিটার মধ্যে ওরা একটু আগে ঢুকেছে। আসুন একটু খুঁজে দেখি।' ভদ্রলোকের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তার উপর আমার দয়া এসেছিল। তাঁর সেই কান্নাকাটি আমাকে অভিভূত ক'রে দিল। দয়াপরবশ হয়ে ভদ্রলোকটিকে নিয়ে আমি কলাবাগান বস্তির একটা নির্জন গলির মধ্যে দুর্বৃত্তদের সন্ধানে ঢুকে পড়লাম। এই নির্জন গলিটার ভিতর এসে ভদ্রলোকটির চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। পকেট থেকে চকচকে ধারাল ছোরা বার ক'রে সেটা আমার মাথার উপর উঠিয়ে ভদ্রলোক হেঁকে উঠলেন, 'এবে শালা জান বাঁচাও। ভাগাও হামাদের শিকার!' দেখতে দেখতে সেখানে আরও সাত-আটজন গুণ্ডা এসে হাজির হল। তাদের কারুর হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা, কারুর হাতে লাঠি, কারোর হাতে ধারালো চকচকে ছুরি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি একে একে আমার হাতের আংটি, মানিব্যাগ, সোনার ঘড়ি, ফাউণ্টেন-পেন, এমন কি পেনসিলটা পর্যন্ত তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই। এইরূপে তাদের ব্যবসা মাটি করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্বস্বান্ত হয়ে আমি অবসাদে ক্লান্ত দেহে থানায় এসে এজাহার দিই। মনে মনে আমার একটা দম্ভ ছিল যে আমি চালাক এবং বড় সাবধানী। কিন্তু সেই দম্ভ আজ আর আমার একটুকুও নেই। এই গুণ্ডার দল আমার সেই দম্ভ ভেঙে দিয়েছে।"

এই টপকা ঠগীরা অপরাপর ঠগীদের ন্যায় নির্বল অযৌনজ সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে। পারতপক্ষে তারা কারুর উপর বলপ্রকাশ করে না। নির্বল সাম্পত্তিক প্রবঞ্চনার দ্বারাই এরা মানুষের অর্থ অপহরণ করে থাকে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই দলের

কাউকে কাউকে আমরা বলপ্রকাশ করতেও দেখি। এর কারণ স্বরূপ শহরে অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলের কথা বলা যেতে পারে। সবল এবং নির্বল—এই উভয়বিধ ব্যক্তিদেরই নিয়ে এই দল গঠিত হয়। তবে এইরূপ মিশ্র দল এখনও পর্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায়; সাধারণতঃ এই টপকা ঠগীরা নির্বল অপরাধীই হয়ে থাকে। এরা অপকর্মের সময় কখনও কাউকে আঘাত হানে নি। সক্রিয় অপরাধীদের সহিত তাদের প্রায়ই কোনও রূপ সম্পর্ক থাকে না। এই মিশ্র দল সম্বন্ধে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বুঝবার সুবিধার জন্যে উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। [অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

"সাধারণ ভাবে আমরা দেখে এসেছি যে পকেটমার, ছিঁচকে চোর, ঠগী প্রভৃতি অপরাধীরা ধৃত হওয়ার কালীন কাহাকেও কখনও আঘাত হানে নি। কারণ উহারা নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী, শোণিতপাতে স্বভাবতঃই তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পকেটমারদের আত্মরক্ষার্থে ছুরিকাঘাতের কথা শুনা গিয়েছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে। আসলে এই সকল অপরাধী থাকে শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী। জনবহুল শহরে সুবিধার জন্যে এরা পিক-পকেটদের কার্যপদ্ধতির অনুসরণ করে—কিন্তু অনভ্যাসের কারণে তারা ধরা পড়ে, এবং ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরা তখন আত্মরক্ষার্থে ছুরি ব্যবহার করে। আসলে ইহারা পিক-পকেট করে না, ইহারা করে সবল রাহাজানি [Robbery] এবং উহা তারা করে পকেটমারার অছিলায়। উহা তাদের অপপদ্ধতির পূর্বাংশরূপে প্রকাশ পায় মাত্র।

আজকালকার পিক-পকেটরা সেফটি-রেজার ব্লেড্ ব্যবহার করে।

ইহারা কখনও ছুরি ব্যবহার করে না, এমন কি ইহারা ছুরি সঙ্গেও রাখে না। ইহা ছাড়া বড় বড় শহরে চণ্ডুখানা, জুয়ার আড্ডা প্রভৃতি স্থান অপরাধীদের ক্লাবঘর বা আড্ডাখানার কাজ করে। এই সব আড্ডায় এবং বেশ্যাগৃহে নির্বল অপরাধীদের সহিত সবল অপরাধীদের মেলা-মেশার সুযোগ ঘটে। একটি বোমারু বা বোমাবর্ষী বিমানকে যেমন বহু পাহারাদার বা ফাইটার প্লেন ঘিরে নিয়ে চলে, তেমনি বন্ধুত্ব বশতঃ একজন নির্বল পিক্-পকেটকে তার দল হতে ভাঙিয়ে নিয়ে একজন সবল অপরাধীর অপকর্মে বহির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কথিত সবল অপরাধীটি তাদের পাহারাদারের কাজ করে। এই স্থলে নির্বল অপরাধীটি ধরা পড়লে সবল অপরাধীটির পক্ষে বন্ধুর উদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ঘটনা এখনও পর্যন্ত বিরল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।"

টপকা ঠগী প্রভৃতি নির্বল প্রবঞ্চকদের পক্ষেও তাদের সবল অপরাধী বন্ধুদের নিয়ে ঘুরাফিরা করা অসম্ভব নয়। এই সব ঠগীরা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থ অপহরণে অসমর্থ হলে এদের এই সকল বন্ধুরা নির্বাক দর্শকের ন্যায় আর নির্বল থাকতে পারে না। এরা তখন ধৈর্যহারা হয়ে পথচারী ব্যক্তিটির উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়। এই কারণে কখনও কখনও সোনা ক্রয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি এদের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনীও শুনা গিয়েছে। আমাদের মতে শহরের অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলই অপরাধীদের এইরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণ।

নোট ডব্লিঙ্

নোট ডব্লিঙকে কেহ কেহ দোনাখেল পদ্ধতিও বলে থাকে। পূর্বোক্ত অসাধারণ প্রবঞ্চনার ইহা অন্যতম উদাহরণ। এই ঠগীরা

সরলচিত্ত লোকদের বুঝায় যে তারা যে কোনও একটি কারেন্সি নোটের ন্যায় হুবহু অপর একটি অনুরূপ নোট রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তৈরি করতে সক্ষম। সরল প্রকৃতির ব্যক্তিটি দুর্বৃত্তদের এই মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তার হাতে একখানি হাজার টাকার নোট তুলে দেয়। তাদের আশা যে ঐরূপ দুইটি নোট্ তারা ফেরত পাবে। কিন্তু একখানিও তারা আর ফেরত পায় না। কতকগুলি ফটোগ্রাফিক কেমিক্যাল এবং সেন্‌সিটিভ পেপারের সাহায্যে দুর্বৃত্তরা সরল প্রকৃতির মানুষদের বুঝায় যে সত্য সত্যই একটি নোটকে দুইখানি করা সম্ভব। কিরূপ পদ্ধতিতে তারা মানুষকে তার অর্থাদি দ্বিগুণ্ করে দেবার লোভ দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠগী লোকটির কথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করি নি। আমি প্রথমে তার এইরূপ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাকে পরখ করতে চাই। লোকটা তখন আমার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে একটা ফটোগ্রাফিক্ ফ্রেমে এঁটে দেয় এবং তার পর নোটের মাপ অনুযায়ী কাটা একটি সাদা কাগজ নোটখানার সামনে মেলে ধরে—এই কাগজটায় সে কি সব রসায়ন মাখিয়েও দিয়েছিল। এরপর সে উভয় কাগজটি আলোর দিকে সরিয়ে আনে। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আমি নোটের ছবির মত অনুরূপ একটা ছাপ সাদা কাগজটার উপর পড়তে দেখি। ঠগী লোকটি তখন আমায় বুঝায়, 'এই দেখুন ধীরে ধীরে আপনার এই নোটখানিই দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐরূপ আর একখানি দশ টাকার নোট তৈরি হচ্ছে।' এর পর দুর্বৃত্তটি আমাকে বুঝায় যে, পুরোপুরি নোটখানি তৈরি হতে খরচ হবে একশোর উপর। এজন্যে দশ টাকার নোটে খরচ পোষাবে না! ঐ দুর্বৃত্তটি এর পর আমাকে একটি হাজার টাকার নোট জোগাড় করতে বলে। সে বলে যে তাহলে

মাত্র একশো টাকা খরচে হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আমি তার এই কথা বিশ্বাস করি। এইভাবে নোট ডবল করে গভর্নমেণ্টকে ঠকান একটি বে-আইনি কার্য। এই কারণে বিষয়টি আমি তৃতীয় ব্যক্তিরও কানে তুলি না। এর পর আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে একটি হাজার টাকার নোট সংগ্রহ করে আনি। দুর্বৃত্তটি তখন নোটের মাপে কাটা একটি সাদা পার্চমেণ্ট কাগজ হাজার টাকার নোটের উপর নিক্ষেপ করে। পূর্বের মতই সাদা কাগজটার উপর হাজাব-টাকা নোটের একটা হুবহু ছাপ আমি পডতে দেখি। এর পর দুর্বৃত্তটি দুইখানি নোটই [আসল নোট এবং ছাপপডা কাগজ] একটা কাগজে বেঁধে দিয়ে আমাকে মোডকটি দুই দিন পরে খুলবার পরামর্শ দিয়ে সেখান থেকে সরে পডে। এদিকে কখন যে হাত সাফাই-এর সাহায্যে তিনি আসল নোটটি সরিয়ে ফেলেছেন তা আমি জানতেও পারি নি। দুই দিন দুই রাত্রি পরে মোডকটি আমি খুলে দেখি আমার সর্বনাশ হয়েছে। আসল বা নকল কোনও নোটই মোডকটিব মধ্যে নেই। সেখানে আছে শুধু নোটের সাইজে কাটা দুইখানি সাদা কাগজ। দুর্বৃত্তটি আমাকে বুঝিযেছিল যে দুই দিন দুই রাত্রি পরে অপর কাগজটি হুবহু আসল নোট হবে। কিন্তু এর পূর্বে ওগুলো আলোয় আনলে উহা আর তা হবে না। এই কারণে তার উপদেশ মত আমি দুই দিন দুই রাত্রি অপেক্ষা করেছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সেন্‌সিটাইজড্ পেপার হাত সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা সেখানে একখানি সত্যকার নোট এনে সরল প্রকৃতির মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। ছাপ ধরা কাগজটা হঠাৎ সত্যকার নোট হয়ে উঠায় তখন আর তার কোনও সন্দেহ থাকে না। এর পর অনুরূপ ভাবে হাতের কায়দায় দুইখানি

নোটই সরিয়ে ফেলে মোড়কের মধ্যে মাত্র দুইখানি সাদা কাগজ ঢুকিয়ে তার উপর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে অ্যাসিড ঢালবার উপদেশ দিয়ে দুর্বৃত্তটি বামালসহ নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে।

দোনা খেল—অন্যান্য

দোনাখেল অপরাধীরা নানারূপে শহর ও পল্লীর লোকদের ঠকিয়ে থাকে। কোনও কোনও সময় এরা প্রচার করে এদের কোনও এক ব্যক্তি দশখানা হাজার টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে। যেহেতু হাজার টাকার নোট ভাঙ্গান তাদের মত গরিব লোকদের পক্ষে নিরাপদ নয়, সেই হেতু মাত্র একশো টাকার খুচরা নোটের বিনিময়ে হাজার টাকার নোটগুলি তারা বিক্রয় করতে প্রস্তুত। সরল প্রকৃতির লোভী মানুষরা তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করে নোটগুলি দেখতে চায়। এই সকল দুর্বৃত্তদের নিকট প্রায়ই দুই তিন খানি হাজার বা একশো টাকার জাল নোট মজুত থাকে। নোটের মাপে কাটা খানকতক কাগজের উপরে ও নিম্নে জাল নোটগুলি রেখে দূর থেকে সেগুলো প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখিয়ে তারা তাদের বিশ্বাসও উৎপাদন করে। এর পর নির্ধারিত দিনে রাত্রিকালে কোনও নির্জন স্থানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অর্থসহ উপস্থিত হয় এবং সেই শুভমুহূর্তেই কতকগুলো গুণ্ডা লোক এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদেরকে মার-ধর করে তাদের অর্থ কেড়ে নেয়। কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে জাল [নকল] পুলিশ এসে উভয় পক্ষকে গ্রেপ্তার করে মারধর করে। পরে উৎকোচস্বরূপ উভয়পক্ষেরই অর্থাদি হস্তগত করে তারা স্থান পরিত্যাগ করে। তবে সব সময়েই যে জাল পুলিশ বা জাল গুণ্ডার আবির্ভাব হয় তা নয়। অধিক ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা প্রথমে

আসল বা জাল নোট দেখিয়ে পরে কতকগুলো কাগজের একটা বাণ্ডিল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের [Victims] হাতে হাত সাফাই-এর সাহায্যে গছিয়ে দেয়। এই সব ঠগীদের মধ্যে যারা রেলওয়ের কুলি সাজে তারা বলে নোটগুলি তারা ট্রেনের কামরায় কুড়িয়ে পেয়েছে এবং যদি তারা রাজমিস্ত্রি সাজে তাহলে তারা বলে একটা ভাঙ্গা বাড়ি সারাতে গিয়ে সেগুলো তারা হস্তগত করেছে। কেউ কেউ ভান করে থাকে যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তারা গুপ্তধন পেয়েছে। কোনও একটা বড় ট্রেন দুর্ঘটনা বা বড় একটা জাহাজ ডুবির খবর কাগজে বেরুলে এই সব ঠগীদের অত্যন্তরূপ সুবিধা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নোটের বদলে সোনার গহনা পেয়েছে—এইরূপও তারা বলে থাকে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই গহনা গোপনে কিনতে গিয়ে তারা সোনার গহনা না কিনে সহস্র সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনে আনে কতকগুলো পিতলের বা গিল্টি করা গহনা।

পল্লী অঞ্চলে নিম্নবঙ্গীয় ব্যাধ নামধেয় দোনাখেল অপরাধীরা এক অদ্ভুত উপায়ে সরল প্রকৃতির গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে থাকে। লোক ঠকানোর এই অভূতপূর্ব পদ্ধতিকে বলা হয় "লক্ষীর ভর" পদ্ধতি। এরা মানুষকে বুঝায় যে তাদের কাছে একটি অক্ষয় ঘট বা কলস আছে। মোহর ভরা মন্ত্রপূত এই কলসের অর্থ কখনও ফুরাবে না। আসলে কিন্তু কলসটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে উপরে কতকগুলো গিল্টি করা মুদ্রা বা চকচকে পয়সা রেখে তারা রাত্রিকালে গৃহস্থদের তা দেখিয়ে থাকে। লোভী গৃহস্থদের কেউ কেউ বহু অর্থের বিনিময়ে উপরি উল্লিখিত "লক্ষীর ভর" কিনে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এইরূপ বহু কাহিনী বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের গোচরে এসেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা মোহর ভরা কলস মাটি খুঁড়ে পেয়েছে—এইরূপ কাহিনী বলে

গ্রামবাসীদের কাছে অনুরূপ মাটি ভরা কলস বিক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে। এই সব ঠগীদের কাছে কয়েকটি সত্যকার আকবরি মোহর মজুত থাকায় এই সব অপকার্যে তাদের বিশেষ সুবিধা হয়। গ্রাম-বাসীরা এই সব মোহর প্রথমে স্যাকরা দ্বারা যাচাই করে নেয়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও তাদের আমরা প্রবঞ্চিত হতেই দেখি—এর একমাত্র কারণ অতি লোভ। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" প্রবচনটি অতীব সত্য কথা। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় **Treasure Trove Trick** বা গুপ্তধন প্রাপ্তির পদ্ধতি।

নওসেরা পদ্ধতি ভারতে উদ্ভাবিত হলেও একটু অদল-বদল করে উহা য়ুরোপ প্রভৃতি দেশেও গৃহীত হয়েছে। য়ুরোপে কোটিপতি-গণের [মিলিয়োনিয়ার] মৃত্যুর পর দরিদ্র দূরসম্পর্কিত আত্মীয়দের প্রায়ই তাঁদের উত্তরাধিকারী হতে দেখা যায়। এঁদের খুঁজে বার করবার ভার পড়ে স্বর্গত ধনকুবেরদের উইল প্রস্তুতকারক অ্যাটর্নিদের উপর। এই সব ক্ষেত্রে অ্যাটর্নিরা এদেরকে সংবাদপত্র মারফৎ তাদের অফিসে আহ্বান করে আনেন। এইজন্য ঐ দলের একজন পথের মধ্যে সংবাদপত্রের ঐরূপ এক বিজ্ঞাপনের কাটিঙ সহ মোড়ক নিক্ষেপ করে পরে ওটা শিকারমন্য ব্যক্তির সম্মুখে খোঁজাখুঁজি করেন এবং তাতে অসফল হয়ে উনি স্থান ত্যাগ করলে অন্যেরা সেটা খুঁজে পায় ও সেটা সেই শিকার-মন্য ব্যক্তিকে দেখাতে থাকে। কখনও ঐ নকল উত্তরাধিকারী শিকারমন্য [ভিকটিম্] ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ নেওয়ার চেষ্টা করে এই বলে যে সম্পত্তি পাওয়ার পর তাকে প্রচুর অর্থ সে বকশিস্ দেবে।

বহুক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতন রাষ্ট্রকেও এই দলের লোকেরা এই পদ্ধতি দ্বারা অভিনব উপায়ে ঠকিয়ে থাকে। এই সম্পর্কে একটা

চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো। এরা সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক প্রবঞ্চক হয়ে থাকে।

"আমি অমুক মোটর কার এজেন্সির ম্যানেজার। ঐ শনিবার সকাল ১০টাতে জনৈক সুবেশ বাঙালী ভদ্রলোক আমার অফিসে এলেন। টকটকে লাল তাঁর চেহারা। পরনে য়ুরোপীয় পোশাক। ঠোঁটে জলন্ত চুরট ও মুখে ইংরেজি বুলি। ভদ্রলোক আঠারো হাজার টাকার দামের একটি মোটর কার কিনতে চাইলেন। তবে হাঁ—নগদ তখুনি তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন বটে কিন্তু বাকি টাকাটা ব্যাঙ্কের চেকে প্রদান করবেন। গাড়িটা কিন্তু তাঁর তখুনি চাই। আমি অচেনা ভদ্রলোকের ঐ প্রস্তাবে 'কিন্তু কিন্তু' ভাব দেখালাম। ভদ্রলোক তা বুঝে ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'এই দেখুন আমার লয়েডস্ ব্যাঙ্কের পাশ বুক। ওতে আটাশ হাজার টাকা জমা রয়েছে। লাস্ট উইথড্রয়াল মাত্র কালকে।' আমি পাশ বুকটা পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা আপ্-টু-ডেট্ করা আছে। তা ছাড়া ওঁর নামের পাশ বুকের সঙ্গে আনা চেক বুকও দেখলাম ও পরীক্ষা করলাম। অতো দামী গাড়ির খদ্দের কালে-ভদ্রে পাওয়া যায়। এই সুযোগ পরিত্যাগ করতে আমি পারি নি। ভদ্রলোক নগদে ও চেক যোগে মূল্য মিটিয়ে গাড়ি নিয়ে [স্বয়ং চালিয়ে] চলে গেলেন। এরপর বেলা প্রায় একটার সময় একজন গোঁফওয়ালা বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর আমাদের সেই বিক্রীত মোটর গাড়ি ও হাতে আমাদের কোম্পানির ঐ গাড়ি সম্পর্কিত ব্লু বুক [যা নাম পরিবর্তনের জন্য পূর্বেকার ক্রেতা ভদ্রলোককে দেওয়া হয়েছিল।] এই নূতন আগন্তুক ভদ্রলোক আমাকে ঐগুলি দেখিয়ে বললেন—'আমিও মোটর সম্পর্কিত একটা 'সেল

ভিড' ভেরিফাই করতে এসে'ছ। আমি আজকে কিছুক্ষণ আগে অমুক ভদ্রলোকের নিকট হতে এই গাড়িটা মাত্র দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম। আমি জানি এটার দাম আঠার হাজারের উপরে হবে। কিন্তু ওটা কেনার মাত্র দু'ঘণ্টা পর আমাকে ওটা এতো সস্তাতে উনি বিক্রি করলেন। এতে কিছু সন্দেহ হওয়াতে বিষয়টা আপনাদের কাছে [এক বন্ধুর পরামর্শে] যাচাই করতে এসেছি। ঐ ভদ্রলোক আরও জানালেন যে কথোপকথনের মধ্যে তিনি আরও জেনেছেন যে সেই ভদ্রলোক ঐ দিন সন্ধ্যা ছয়টাতে উড়োজাহাজে [প্লেনে] দমদম বন্দর থেকে রেঙ্গুন যাত্রা করবেন। এরপরে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ঐ চেক্ বুক জাল চেক্ বুক এবং আমি গাড়ি বিক্রয় বাবদ বক্রী আট হাজার টাকা সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হয়েছি। এদিকে ঐ দিন শনিবার হওয়াতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোনও কিছু পূর্বাহ্নে পাকা করে নেওয়া ঐ দিন সম্ভব হবে না। এজন্য সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি ঐ ব্যক্তির পরামর্শে গোয়েন্দা পুলিশের আফসে পুলিশ সাহেবকে সকল বিষয় জানালাম। তখুনি স্বয়ং পুলিশ সাহেব এবং তাঁর সহকারীদের সাথে আমি দমদম এরো-ড্রোমে এলাম। সেই আসামী-মন্য ভদ্রলোক তখন রেঙ্গুনগামী প্লেনে উঠবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমরা ওঁকে ঐ মোটর ক্রয় ও ব্যাঙ্কের চেকের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমাদের বললেন—'এ্যাঁ! এ আমার খুশি আমি কম দামে [আণ্ডার সেল্] গাড়ি বিক্রি করেছি। কি? ঐ দিন কিনেই ঐ দিনেই বিক্রি করলাম কেন? সেটা আমার খুশি। ও গাড়ি আমার আর দরকার নেই—তাই। উনি চেক্ নিতে রাজি হয়েছেন। আমিও চেক্ ওঁকে দিয়েছি। এতে অপরাধ আমার কোথায় তা বুঝি না। হ্যাঁ!

ঐ চেক্ ডিস্অনার্ড্ হলে অবশ্য আমি অপরাধী হবো। সোমবারে আপনাদের ঐ চেক ক্যাশড্ও হয়ে যাবে। আমি একটা গভর্নমেন্ট কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে রেঙ্গুনে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে না পৌঁছুলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার আরনেস্ট মনিই দালালরা ফরফিট করবে। আমাকে আপনারা আটকালে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে দু'লক্ষ টাকার ড্যামেজ স্যুট আনবো।' এই ভাবে কথা বলে ভদ্রলোক হৈ-হাল্লা করে এরো-ড্রোমের উচ্চপদী [অফিসার] কর্মীদের সেখানে জড় করে তাদের সাক্ষী করে তাদের কাছেও উপরোক্ত রূপ অভিযোগ জানালেন। প্রথমে আমরা ভড়কে গেলেও পরে পুলিশ সাহেব তাকে প্রবঞ্চক বলে বুঝলেন এবং বললেন যে ঐ ব্যাঙ্কের চেক্ কস্মিনকালে ক্যাশড্ [ভাঙানো] হবে না। আমরা ঐ অবস্থাতে ঐ বেয়াদব ভদ্রলোকটিকে গ্রেপ্তার করার ঝুঁকি নিলাম। সোমবার সকালে ব্যাঙ্কে ঐ চেক্ প্রোডিউস করা মাত্র উহা ক্যাশড্ হ'য়ে গেলে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঐ ভদ্রলোক তাঁর কথা মত আমার কোম্পানি এবং প্রদেশ সরকারের [পুলিশের] নামে দু'লক্ষ টাকা ড্যামেজ স্যুটের মামলা আদালতে আনলেন। তখন রেঙ্গুনে তদন্ত করে জানা গেল ঐ ভদ্রলোকের কথা সব সত্য। পরে জানা গেল যে দ্বিতীয় ব্যক্তি [গোঁফওলা ক্রেতা] মায় রেঙ্গুনের দালাল কোম্পানি একই দলের [ইনটার-ন্যাশনাল গ্যাঙ্গ] দলী। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিরই পাঠানো ব্যক্তি। আদালতের ঐ মামলা আমরা ও গভর্নমেণ্ট বহু অর্থ খেসারাতি [গচ্চা] দিয়ে মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নওসেরা পদ্ধতিতে একক চেষ্টাতেও ঐরূপ প্রবঞ্চনা অপরাধ করে থাকে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এদের কুহক-জাল

ছিন্ন করতে না পেরে প্রবঞ্চিত হন। নিম্নে এই সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হলো।

"হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের আফিসে এসে গ্যাট্ হয়ে বসে এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন এবং বললেন যে তিনি গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার। এখুনি থানাতে একটা ফোন করবেন। এর পর অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে ইন্‌চার্জ অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর এপারের কথাবার্তা হতে আমরা বুঝলাম যে নিকটের গলিতে এক গাড়ি চাউল ধরা পড়েছে এবং সেখানে পুলিশের পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা আরও বুঝলাম যে ইন্‌চার্জবাবু তাঁকে অকুস্থলে নিলাম করে উহা বিক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন। কারণ থানাতে স্থানাভাব এবং ঐ সম্পর্কে হুকুম পূর্ব হতেই নেওয়া আছে। তবে র‍্যাশন কার্ড হোল্ডারদের কাছে উহা বিক্রয় করতে হবে। এরপর আমাদের প্রদত্ত লেমনেড্ খেতে খেতে তিনি আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বললেন—'আরে মশাই! যা মাইনে পাই তাতে চলে না। এক কাজ করুন না আপনারা। আপনাদের র‍্যাশন কার্ড অনুযায়ী দশ কিলো করে চাউল কিনুন ও রসিদ নিন। আর সেই সঙ্গে মাথা পিছু বে-সরকারী ভাবে আধা দরে দুই মণ করে নিন। থানাতে জমা দেবার সময় আমি আটক্ চাউল কম করে দেখাবো।' এই প্রস্তাবে আমরা সকলে রাজি হয়ে একত্রে ৫০০ৎ টাকা ঐ ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। আমাদের হেড্ ক্লার্ক-বাবু আফিসের ক্যাশ ভেঙে ঐ দিনের মত ঐ টাকা নিজেকে ও অন্যদেরকে কর্জ দিলেন। পুলিশ কর্মচারী ঐ টাকা গ্রহণ করে বললেন যে তিনি পুলিশের গাড়িতে বাড়ি বাড়ি ঐ চাউল পৌছিয়ে দেবেন। 'এখুনি গাড়ি সমেত আমি আসছি'—এই বলে উনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু আর কোনও দিনই তিনি সেখানে ফিরলেন না। থানায়

বড়বাবু সব বিষয় শুনে একেবারে হতবাক ও অবাক। আমরা পরদিন গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে হেড্ ক্লার্ককে তা ফিরত দিয়ে তাঁর তহবিল এবং চাকুরি রক্ষা করি।"

উপরোক্ত কাহিনীগুলি অসাধারণ প্রবঞ্চনার এক-একটি দৃষ্টান্ত। এই 'অসাধারণ অপরাধের' দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একজন প্রৌঢ় চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই দিন সকালে আমি আমার বহিঃকক্ষে বসেছিলাম। এমন সময় একজন সুবেশ যুবক ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকাবাবু ভাল আছেন?' এর পর সে আমার পদধূলি গ্রহণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই যুবকটিকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। বিব্রত ও তৎসহ কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কৈ, বাবা! তোমাকে তো চিনতে পারছি না?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতীব নম্রভাবে যুবকটি বললে, 'এ্যাঁ! সে কি কাকাবাবু? এ কি আপনি বলছেন? আমাকে আপনি চিনতে পারলেন না! আমাকে খুবই ছোট দেখেছিলেন কি'না, তাই! আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর ছোট ছেলে।' এই সুব্রতবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। তবে বছর কুড়ি হল তিনি পাটনায় কর্মবাহাল ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। মাত্র বছর দুই পূর্বে অবসর গ্রহণ করে তিনি বালিগঞ্জে বাড়ি করেছিলেন। আমি খুশি হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলে উঠলাম, 'আরে তাই না'কি, তুমি এত বড় হয়েছ! তা তোমার মেজদা কোথায়?' 'মেজদা, মেজদা? মেজদা কাকাবাবু?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে ঠিক পূর্বের মতই হাত কচলাতে

কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, 'মেজদা কাকাবাবু এখন মস্ত বড অফিসার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা ভাল কাজ পেয়ে গিয়েছেন।' 'এঁ্যা তুমি বল কি?' এবার অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ-এ কি বলছ তুমি? দেড মাস হল তোমার বাবার সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা হয়েছিল। বেশ মনে পডে উনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন যে— তোমার মেজদা বর্মায় আটকা পডে গিয়েছে। সে তো অনেক দিন ধরে যুদ্ধের ব্যাপারে এখানে ওখানে ঘুরছে। তোমার বাবা খুবই চিন্তিত তার জন্যে দেখলাম।' কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে যুবকটি উত্তর করল, 'হাঁ। বাবা ঠিকই বলেছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু— কাকাবাবু। মাসখানেক হ'ল দাদা ফিরে এসেছেন। পায়ে স্প্লিণ্টার লেগে পা'টা একটু জখম হয়েছিল। সেই সুযোগে উনি ডিস্চার্জড্ হতে পেরেছিলেন। ফিরে এসেই মেজদা এই চাকুরিটা জোগাড করে নিয়েছেন। এ সবই ভগবানের দয়া কাকাবাবু।' এর পর আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বেশ। তা এখন ব্যাপার কি বল।' হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি বলল, 'কাকাবাবু! পরশু আমার ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে বললেন।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বোন? বোন তোমার ছিল না'কি?' আবার হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, 'হাঁ কাকাবাবু! আমার পরেই তো আমার বোন। আপনি সব ভুলে গিয়েছেন কাকাবাবু। আমাকেই আপনি খুব আদর করতেন ছোট বেলায়। তাই আপনার শুধু আমাকেই মনে আছে। আমার বোনটা তখন মাত্র এক মাসের। আপনি তো বহুদিন আমাদের বাড়ি যান নি। তা হলে কাকাবাবু উঠি এবার। প্রায় আটশো লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সব আমাকেই করতে হচ্ছে।' আটশো

লোককে নিমন্ত্রণ করার কথায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, •'এঁ্যা! সে কি? এত রেশন জোগাড় করলে কি করে!' উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, 'সে কথা কেন জিজ্ঞেস করেন কাকাবাবু! চাল তো জোগাড় করেছিই, তা ছাড়া বিশ গাঁট কাপড়ও।' 'এঁ্যা!' বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশ গাঁট কাপড়? অত কাপড় কি করবে? পেলেই বা এতো কি করে? আমরা ত কিছুই পাই না!' আমার এই উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, 'আমি এখন যে টাউন হলের রেশন অফিসার। সিভিল সাপ্লাইতে আমি গোড়া থেকেই আছি।' এর পর আমিও আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বাবাজীবন! আমাকে কয়েক জোড়া কাপড় জোগাড় করে দিতে পার?' আমাকে লজ্জিত করে তুলে যুবকটি উত্তর করলে, 'তা কি করে হয় কাকাবাবু! এ আপনি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেললেন।' এর পর সে কিছুতেই রাজি হয় না। কিন্তু আমিও তখন নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর যুবকটি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজি হয়ে বললে, 'তাহলে কাকাবাবু এক গাঁট কাপড়ের দাম ১০০৲ টাকা দিন। খুচরা কাপড় বার করা সম্ভব হবে না। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে না হয় ওগুলো বাঁটোয়ারা করে নেবেন।' এই দুষ্প্রাপ্যের বাজারে আমি কৃতার্থ হয়ে ১০০৲ টাকার একটা নোট আমার ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্র অজিতের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'যা তো তোর এই দাদার সঙ্গে এই টাকা নিয়ে। একটা ট্যাক্সি করে কাপড়গুলো ওখান হ'তে নিয়ে আসবি।' হাঁ হাঁ করে উঠে যুবকটি বললে, 'সে কি কাকাবাবু! আপনি কি শেষে আমাকে বিপদে ফেলবেন না'কি! কাপড় যে কনট্রোলড্। আমাদের লরি করে আমিই এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। অজিত টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে

আজই চলুক। এক্ষুনি ওদের এই টাকা জমা দিতে হবে।' অজিতকে কিন্তু আড়ালে ডেকে আমি বলে দিলাম, 'দেখ খোকা! কাপড় লরিতে না তুললে কিন্তু টাকা দিস্ নি।' এর পর যুবকটি আমার পদধূলি গ্রহণান্তে অজিতকে নিয়ে বার হয়ে গেল।

যুবকটি মাত্র এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। এর মধ্যে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে। এছাড়া টাকা কয়টা আমিই জোর করে তার হাতে তুলে দিয়েছি। বরং তাকে এই ব্যাপারে জোর করেই আমাকে সাহায্য করতে রাজি করিয়েছি। তাই এর মধ্যে আমার সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। কিন্তু ছয়-সাত ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার পুত্র বাড়ি ফিরছিল না। পরিশেষে আমি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হলাম। সকল কথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে এক্ষুনি ফিরে আসবে।' প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে বললাম, 'কিন্তু টাকা যে জিনিস না পেলে তাকে দিতে আমি বারণ করেছি। সে যদি অস্বীকৃত হয় আর তার ফলে তারা যদি তাকে মারধর শুরু করে?' হেসে ফেলে ইনেস্‌পেক্‌টার ভদ্রলোক বললেন, 'ও আপনি কিছু ভাববেন না। বাপ যখন দিয়েছে, ছেলেও তাহলে দেবে। ছেলে আপনার ফিরে এল বলে।' ইনেস্‌পেক্‌টারবাবু এ বিষয়ে ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে পুত্রও আমার থানায় এসে হাজির হ'ল। মুখটা কাঁচুমাচু করে সে আমায় জানাল যে, তার কাছ হতে যুবকটি টাকা ক'টা ধাপ্পা দিয়ে চেয়ে নিয়ে তাকে একটি আফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে 'এক্ষুনি আসছি' বলে চলে যায়। পুত্র আমার তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃথাই অপেক্ষা করে এইমাত্র ফিরে এলো। এর পর থানা হ'তে

আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি যে, তার কোনও কন্যা নেই। ঐ প্রবঞ্চক নিমন্ত্রণের মুদ্রিত পত্র আমাকে দিলেও বুঝা যায় যে, এই বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটিও আগাগোড়া মিথ্যা। আমার ধারণা ছিল আমি একজন চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু এই দিন আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে বুদ্ধির ন্যায় নির্বুদ্ধিতাও আছে।"

[উপরের কাহিনী হ'তে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এই সত্যটি হচ্ছে এই যে, স্বার্থ ও লোভ মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে তাকে বোকা করে তুলে এবং সেই সময়ে যে কোনও সাজেস্‌শন (বাক-প্রয়োগ) তার উপর কার্যকরী হয়। এইজন্য রায় বাহাদুরের কন্যা নেই জেনেও ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করানো গিয়েছিল যে তাঁর কন্যা আছে। এ'ছাড়া মানুষের মনে 'আছে বা নেই'—এই সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে বা তাদের তা স্মরণ না থাকে তখন বাক্‌-প্রয়োগ বা সাজেস্‌শন দ্বারা তাদের সেই সম্বন্ধে 'হাঁ বা না' রূপে বিশ্বাস করানো সম্ভব।]

অলীক-উদ্বাহন

অসাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতি দ্বারাও সমাধিত হয়। অর্থাৎ কেহ ভুলে টাকার লোভে, কেহ বা ভুলে স্ত্রীলোকের মোহে। কাহাকেও কাহাকেও আবার উভয় প্রকারেই ভুলানযায়। মানুষের অন্তর্নিহিত যৌনজ বা অযৌনজ স্পৃহার পৃথক পৃথক বা একত্র অবস্থিতি ইহা প্রমাণিত করে। মানুষের এই উভয় প্রকার দুর্বলতা সম্বন্ধেই দুর্বৃত্তরা অবহিত। অসাধারণ প্রবঞ্চনায়

অযৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইবার ইহার যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। উদাহরণ স্বরূপ "অলীক উদ্বাহন" বা ভূয়া বিবাহের কথা বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে বোগাস্ ম্যারেজ ট্রিকস্ [Bogus marriage tricks]। এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা দুর্বৃত্তরা বিবাহেচ্ছু লোভী যুবক বা তার অভিভাবককে বুঝায় যে তারা পাত্রপক্ষের জন্যে একজন ধনীলোকের একমাত্র কন্যাকে বধূ রূপে এনে দিতে পারে। এ'জন্য তাকে যে বেশি কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে একথাও সে তাদের জানিয়ে রাখে। এই প্রস্তাবে রাজি হলে একদিনে রাজা এবং রাজ-কন্যা লাভ হবার সম্ভাবনা। এই কারণে দুর্বৃত্তদের এই প্রস্তাবে পাত্র-পক্ষ খুশি হযেই একশ' বা দুইশ' টাকা এদের অগ্রিম দেন। এদিকে বরপক্ষের যাবতীয় দুর্বলতা সাবধানে গোপন রাখা হয; এই কারণে বিবাহের ব্যাপারে যা কিছু কথাবার্তা তা দুর্বৃত্তদের মারফৎই চলতে থাকে। আসলে কিন্তু দুর্বৃত্তরা একটি বেশ্যাকন্যাকে জমিদার-কন্যা সাজিয়ে পাত্র পক্ষকে বধূরূপে গছিয়ে দিয়ে থাকে। এজন্য ভদ্রপল্লীতে বড় বড বাডি ভাড়া করে, উহা ভাড়া করে আনা দামী আসবাবপত্রে সাজিয়ে রাখা হয়। এই সব বাড়িতে দুর্বৃত্তরা কোনও এক প্রৌঢ়া বেশ্যাকে গৃহিণী সাজিয়ে এবং নিজেরা বাড়ির কর্তা প্রভৃতি সেজে দুই এক মাস সকন্যা বাসও করে থাকেন। এর পর দুই-একদিনের মধ্যে আসল ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে পড়ে। বরপক্ষ তখন বধূ এবং দ্রব্যাদির উপর কোনও রূপ আর দাবী-দাওয়া না রেখে কারুর কাছে কোনরূপ নালিশ না জানিয়েই মানে মানে সরে পড়েন।

অবশ্য সাধারণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে সত্যকার ধনী ভদ্রকন্যাদেরও এরা যে সর্বনাশ না করেছে তা'ও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে

দুর্বৃত্তরাই বরপক্ষ সেজে উক্তরূপ অভিনয় দ্বারা একটির পর একটি সালঙ্কারা রূপবতী ধনী কন্যাদের বধূরূপে সংগ্রহ করে নগদে ও অলঙ্কারে বহু সহস্র টাকা উপায় করেছে। বিবাহের কয়েকদিন পরেই এরা বধূটির অলঙ্কারগুলি এবং আসবাবপত্র সকল অপহরণ করে সদলে ভাড়া করা বাটীটি হঠাৎ পরিত্যাগ করে চলে যায়। এইরূপ দুই-একজন বিবাহ-বিশারদ অপরাধীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ভালরূপ তথ্য তল্লাস না করে বিবাহ দেওয়ার জন্যেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বরকে উপযুক্ত কনে এবং কনেকে উপযুক্ত বর জুটিয়ে দেবার অজুহাতে আজকালকার স্বাবলম্বী বর এবং স্বাবলম্বিনী কন্যাদের কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা প্রতি বৎসর বহু অর্থ ঠকিয়ে নিয়ে থাকে।

এছাড়া এদেশে এমন অনেক নির্বোধ ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁদের প্রাইভেট গার্ল বা গৃহস্থ কন্যাদের উপর ঝোঁক দেখা যায়। শহরে এমন অনেক ধূর্ত ও বদ দালাল আছে, যারা এঁদের উপভোগের জন্যে গোপনে গৃহস্থ কন্যাদের সংগ্রহ করে আনে। এই সব দালালেরা এঁদের বুঝায় যে গৃহস্থ কন্যারা পেটের দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র; কখনও তারা মিথ্যে বলে অলীক ধনীর কন্যাদেরও তাঁদের এনে দেয়। এই দালালরা তাঁদের বুঝায় যে ঐ সব কন্যা কেবলমাত্র আত্মচরিতার্থতার কারণেই দেহ দিতে চায়। তারা পয়সা উপায়ের জন্যে ঐ যৌনজ কাজে নামে না। আসলে কিন্তু এই সব দালালেরা বা নারী কুটনীরা বেশ্যা-কন্যাগণকে ভদ্রকন্যা সাজিয়ে তাদের কাছে এনে দেয়। অবশ্য শহরাঞ্চলে প্রাইভেট রূপজীবিনীর অস্তিত্ব যে নেই তাও নয়। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করব। তবে এই সব হতভাগ্য ভদ্রসন্তানদের বুঝা উচিত যে, এইসব তথাকথিত প্রাইভেট গার্লস কেবলমাত্র তার একার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। এক দিক থেকে এরা সাধারণ বেশ্যা

অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সাধারণ বেশ্যাদের তাদের দয়িতদের বেছে নেবার অধিকার আছে। এই সকল মেয়েরা কিন্তু ঐ বিষয়ে এতটুকু স্বাধীনতাও পায় না। এ বিষয়ে তাদের দালালদের উপরই তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। পূর্বেই বলেছি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্থ কন্যাগণও এইরূপ ভাবে ব্যবসা যে না চালায় তা নয়। কিন্তু তাদের সহিত সাধারণ বেশ্যাদের কি কোনও প্রভেদ আছে? এই ভাবে প্রতারিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে এরা লাভ করে কুৎসিত ব্যাধি। পাঠকবর্গ হয় তো বলবেন যে এতে তো উভয় পক্ষই দেখা যায় সমান অপরাধী, অর্থাৎ ইহা তো একটা সহযোগীয় তথা কনট্রিবিউটিঙ্ অফেন্স। তাহলে এই প্রকার অপরাধকে প্রতারণা অপরাধ বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর ইতি-পূর্বে বহুবার দিয়েছি। মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যৌন-স্পৃহা জাগ্রত করে যারা মানুষ ঠকায় তারাই আসল অপরাধী। এ ছাড়া দেশের আইনের উদ্দেশ্য সহানুভূতি দেখানো বা সমাজ সংস্কার করা নয়। মানুষের প্রতি সুবিচার করা বা তাদের দুর্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করাই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে সামাজিক ভাবে এই দুর্বলচিত্ত ভদ্রসন্তানদল নিন্দনীয় হ'লেও আইনের চক্ষে তারা এতদ্দ্বারা কোনও রূপ অপরাধ করেনি। অধিকন্তু তাদের এই ভাবে ঠকানোর জন্যে ঐ সব দালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী। এইরূপে প্রবঞ্চিত হওয়ামাত্র ভদ্রসন্তানদের লজ্জিত না হয়ে থানায় এসে এজাহার দেওয়া উচিত। এই সব অপকর্মের জন্যে দুর্বৃত্তরা শহরে অনেক "এম্পটি হাউস" বা খালি বাড়ি ভাড়া করে থাকে। এই সকল বাটী দিবাভাগে খালি থাকলেও রাত্রে নরনারীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে। শহরের কোনও কোনও "হোটেল কিপার"ও এই বিষয়ে দুই-এক টার জন্যে এক-একখানি কামরা দুর্বৃত্তদের ভাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য

করে। এই সকল বাড়িতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্যাদের আনবার সময় দালাল বা কুটনীরা একরকম নিষ্প্রয়োজনেই অত্যন্তরূপ সাবধানতার ভান করে থাকে।

এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক। বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"দালাল ভদ্রলোক আদালতের একজন মুহুরী। এইজন্যে আমি তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সন্ধানে এমন অনেক গৃহস্থ-কন্যা আছে, যাদের সে তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে আমার ভোগের জন্যে এনে দিতে পারে। এই সকল মেয়েদের কেউ বা থাকে হোস্টেলে, কেউ বা থাকে স্বগৃহে। এই ভাবে সে আমাকে ভদ্রকন্যাদের প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলে। সে আরও বলে যে সে কোনও কন্যার ভাইয়ের এবং কোনও কন্যার বা পিতার বন্ধু। এই জন্যে বাড়ির লোকে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমি তার নির্দেশমত চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করি। "ঐ আসছে, এই এল বলে"—ইত্যাদি স্তোকবাক্য দিয়ে সে আমাকে সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক অপেক্ষা করিয়ে রাখে। আমাকে উতলা করে ভুলিয়ে রাখার এটা ছিল একটা চালাকি মাত্র। কিন্তু মন উতলা থাকায় তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রঘরের কন্যাদের যে অত সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আনা যায় না, এইটেই এইরূপ বিলম্ব দ্বারা দালাল ভদ্রলোক আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি-ভ্রংশের কারণে সেদিন আমি তা না বুঝলেও আজ আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কন্যাটি রিক্সায় করে বাড়ির ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে আমি গাড়িতে তুলে হোটেলের নির্ধারিত কামরায় এনে উপভোগ

করি। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে আমাকে তার নাম বা বাড়ির ঠিকানা বলে নি। থেকে থেকে তাকে আমি লজ্জায় অধোবদন হতে দেখি। অপকর্মটি যেন তার এই প্রথম। একবার সে এজন্যে কেঁদেও ফেললে। এ জন্যে যেন সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; এ কথা সে আমাকে বারে বারে জানাতে থাকে। এইভাবে আরও দুই-তিন বার তার সঙ্গে সম্মিলিত হই। পরিশেষে আমাদের আলাপ এত অধিক জমে উঠে যে কন্যাটি আমাকে গোপনে তার বাড়িতেও নিয়ে যায়। একদিন গোপনে পিছনের দরজা দিয়ে রাত্রিযোগে তার ঘরে এসে আমি অর্গল বন্ধ করছি, এমন সময় উকিলের পোশাক পরে সেখানে তার বড় দাদা এসে হাজির। আমার ঘাড়টা চেপে ধরে তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলেন, 'হারামজাদা! দাঁড়াও এইবার ঠিক করছি তোমায়।' এদিকে বড ভাইকে সেখানে দেখে প্রিয়তমা আমার অজ্ঞান হয়ে পডলেন। এর পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার টাকা তার উকিল ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে আমি থানা-পুলিশ বা মামলার দায় এডাই। সেই সঙ্গে মান-সম্ভ্রমহানি ও লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাই। অতি কষ্টে আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়। এর দুই মাস পরে আমি জানতে পারি, কথিত কন্যাটি দুই পুরুষের বেশ্যামাত্র এবং তার উকিল ভাইটি আসলে উকিল বা ভাই নয়। সে একজন নিকৃষ্ট ধরনের দালাল মাত্র। বর্তমানে সেই ঐ কুলটা মেয়েটির উপপতি। এরা সকলে অভিনয় দ্বারা আমাকে প্রতারিত করেছে মাত্র।*"

এই সকল বেশ্যা মেয়েরা তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্যে আজকাল মাস্টার রেখে কিছু কিছু পড়াশুনাও করে থাকে। এ ছাড়া যে সকল

* বিবৃতিটির বিবরণে ব্ল্যাক মেলিং-এর সন্ধান পাই। এদের এই মিশ্র দলই এর কারণ। ঐ দলের মেয়েটি নির্বল অপরাধী হলেও তার ভাইটি ছিল সবল অপরাধী।

নাবালিকাদের বেশ্যালয় হতে প্রতি বৎসর [নূতন আইনানুসারে] উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছাড়া পায়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন তারা রীতিমত শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষাসহ এদের কেউ কেউ তাদের পালিকা মাতার কাছে ফিরে আসে। এই সব মেয়েদের কথাবার্তা শুনলে তারা যে উচ্চ শিক্ষিতা এবং বড় ঘরের মেয়ে তা মনে হবে। এজন্য এইরূপ ভুল করা কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া ভদ্রসন্তানদের সহিত সংলাপের মধ্যে তারা যে দুই-একটা ইংরাজি কথা বা বুকনি শিক্ষা করে তা'ও তাদের এইরূপ ব্যবসার অনেক সুবিধা করে দেয়। এই সকল সুবিধার সুযোগ এই সব মেয়েরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। এরা ভদ্রসন্তানদের জানায় যে তারা শহরের কোনও এক মহিলা কলেজের ছাত্রী। তাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করলে তারা যেন অমুক কলেজের গেটের কাছে চারটার সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে মেয়েটি একগোছা কলেজের বই হাতে করে বেলা তিনটা থেকে সেই কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা এমন ভাব দেখায় যেন এইমাত্র গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলো। এইরূপ অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়েরা প্রায়ই ভদ্রসন্তানদের ঠকিয়ে থাকে।

[হোম হতে ছাড়া পাবার নির্ধারিত দিনে পালিকা বেশ্যা মাতারা ঘোড়গাড়ি করে হোমের গেটের সামনে অপেক্ষা করে এবং সাদরে তাকে গাড়িতে তুলে তাদের পূর্বগৃহে নিয়ে আসে। বহু বেশ্যানারী এজন্য নিজেরাই তাদের পালিতা কন্যাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে হোমে পাঠিয়েছে। এতে পালন করার খরচার দায় হ'তে তারা অব্যাহতি পায় এবং ঐ কন্যাদের ব্যবসার সুবিধার্থে চৌকসও করে তুলা হয়। তবে তাদের মমতা বোধ জাগিয়ে রাখবার জন্য ঐ পালিকামাতারা

মধ্যে মধ্যে ভালমন্দ দ্রব্য নিয়ে কন্যাদের সঙ্গে হোমে গিয়ে দেখা করে আসে। এদের জন্য 'আফটার্ কেয়ার হোমের' ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এইরূপ অঘটন ঘটে।]

এই শহরে এমন অনেক প্রবঞ্চক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থ কন্যা আছে—যারা ভদ্রসন্তানের সহিত সিনেমা দেখে হোটেলে সান্ধ্যভোজন করে শেষ বরাবর একটা দোকানে ঢুকে অনেক দ্রব্যাদি কিনে নেয়—খরচ-খরচা অবশ্য ভদ্রসন্তানটিকে একরকম বাধ্য হয়ে সভয়ে বহন করতে হয়। এমনি ভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হ'লে মেয়েটি সভয়ে বলে উঠে, "ওমা-আ! এর মধ্যে রাত ন'টা বেজেছে? দেখুন, আমার বড্ড ভয় করছে। এত দেরিতে বাড়ি ফিরলে মা আর বেরুতে দেবে না। লক্ষীটি! আজ আপনি আমাকে মাপ করুন। আজ আর আপনার সঙ্গে [নিভৃত স্থানে] কোথাও যাবো না। কাল হেদোর মোড়ে এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন। আপনার সঙ্গে আজ থেকে রোজই ঐখানে আমি দেখা করব।" তাড়াতাড়ি কথাগুলা বলে চট্ করে একটা রিক্সায় উঠে সেখান থেকে সে সরে পড়ে। পরের দিন ভদ্রসন্তানটি হেদোর মোড়ে সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কারুর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ওই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। মেয়েটি এইবার অপর আর একটি ভদ্রসন্তানের সন্ধানে বাহির হয়। আমি এইরূপ তিনটি প্রবঞ্চক মেয়ের কথা শুনেছি। ভদ্রসন্তানরা এদের নাম দিয়েছেন মিস্ চিপ [Cheap], মিস্ চিট [Cheat] এবং মিস্ ব্লাফ [Bluff]। আমি শুনেছি, এরা এই ভাবে না'কি বহু অর্থ উপায় করে থাকে।

[আশাহত ভদ্র সন্তানদের মনের এই চাঞ্চল্য তাদের মন ও স্নায়ুর

উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। তাদের এই স্নায়বিক ক্ষয়-ক্ষতির কুফল সুদূরপ্রসারী হয়। প্রবঞ্চক কন্যাদের এইরূপ অপকীর্তি এক প্রকার সামাজিক অপরাধ। ভদ্র সন্তানদের উতলা করে সরে পড়া তাদের পক্ষে একটি পাপ কার্য।]

এছাড়া অনেক দুর্বৃত্ত আছে—যারা নিজের বা কোনও বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী বা ভগ্নীকে [তাদের অজ্ঞাতে] দূর থেকে ভদ্রসন্তানদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে। ভদ্রসন্তানদের তারা এই বলে যে, শীঘ্রই ঐ সব মেয়েদের তাদের কাছে এনে দেবে। সাধারণতঃ সিনেমা, থিয়েটার বা প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনার পর্যায় সমাপ্ত হয়। এইভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভদ্রসন্তানদের অর্থ অপহরণ করে ভদ্রঘরের দুর্বৃত্তরা বেমালুম সরে পড়ে। ঐ ভদ্রসন্তানগণ তখন আর তাদের কোনও খোঁজ-খবরই পায় না।

এই ধরনের যৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করব। এই বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বর্তমানে যে সরকারী অফিসে কাজ করি, সেই অফিসে একটি শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে কাজ করতে আসে। জানি না কেন, মেয়েটিকে আমার অত্যন্ত রূপ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সাহস করে একদিনও আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই আমি তার যাতায়াতের পথে ওত্ পেতে অপেক্ষা করতাম। একদিন সে নিজে হ'তেই আমাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা! আপনি তো দেখি যে রোজই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। কিন্তু কৈ আমাকে তো একদিনও ডাকেন না?' হ্যাংলা ছেলের মত জিভ বার করে আমতা আমতা করে আমি উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনাকে

আমার সত্যি খুব ভাল লাগে। কিন্তু ভয় করতো বলে কথা বলতে পারি নি।' এর পর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে তো আপনি মাইনে পেয়েছেন। এ মাসে কত টাকা মাইনে আপনি পে'লেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতার্থ হয়ে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 'আজ্ঞে হাঁ, ডিআরনেস্ অ্যালাওয়েন্স নিয়ে এই মাত্র ৯৫৲ টাকা।' এইবার মেয়েটি নিজেই আমাকে অনুরোধ করল, 'চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন?' আমি এতে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম! আমার ভাগ্য যে এতদূর সুপ্রসন্ন হবে তা আমি কল্পনাই করি নি। আরও কৃতার্থ হয়ে আমি তাকে উত্তর করলাম, 'যাবেন? সত্যি যাবেন, কোথায় যাবেন?' আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি আমার মতামতের আর অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রীমতী এইবার আমাকে নিয়ে এলেন একটা হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচায় প্রায় টাকা পনেরোর খাদ্যসামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন। এর পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা দোকানে। দোকান থেকে যে জিনিসটি তিনি কিনলেন তার বিল হ'ল ত্রিশ টাকার। বাধ্য হয়ে লজ্জার খাতিরে বিলটা আমিই চুকিয়ে দিই, কারণ দোকানদার বিলটা আমার দিকেই এগিয়ে দিল। এর পর আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে উনি হুকুম করলেন, 'চলো আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিদা।' উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল। পথের উপর ট্যাক্সি যতই চলে ততই আমি তার মিটারের দিকে তাকাই। মিটারে ততক্ষণে বার টাকা উঠে গেছে, আর সেই সাঙ্গে তেরর একটা অক্ষরও। এবার আমার বুক দুর দুর করে উঠে। শ্রীমতীর সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, তার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে

হয় না। শ্রীমতী আমার কাঁধটা ধরে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথা কইছেন না যে, বাঃ। বেশ আমিও তাহ'লে কথা বলব না।' আমার সারা দেহ হতে ঘাম বেরিয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জলও সেই সাথে বার হয়। এর উত্তরে একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে আমি জানাই, 'না তা নয়। আমার শরীরটা কি রকম ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কেন এরকম হচ্ছে তা জানি না।' এর পর পলতার হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি যখন শ্রীমতীকে তার বাড়ি পৌছে দিলাম ট্যাক্সির মিটারে তখন উঠেছে ত্রিশ টাকা। পরের দিন আফিসে এসে ভাবছি এ মাসের সংসার খরচের জন্যে কারুর কাছে গোটা সত্তোর টাকা ধার করা যাবে কিনা। এমন সময় আফিসের একজন বেয়ারা এসে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটিতে শ্রীমতী লিখে পাঠিয়েছেন, 'আজ বিকালে বেড়াতে যাবেন তো? যাবেন কিন্তু—।' চিরকুটটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেয়ারাকে জানালাম, 'আচ্ছা। তুম্ যাও আভি।' মনে মনে আমি বলে উঠলাম—বা-বাঃ, আবার—ছিঃ—"

[অনেক সময় জনবহুল পথে ট্যাক্সি থামিয়ে এই সব মেয়েরা এমন ভাবে হাত ধরে শিকারমন্ত যুবকদের উহাতে উঠার জন্য অনুরোধ করতে থাকে যে পরিচিত ব্যক্তিদের চোখ এড়ানোর জন্য ও সম্মানহানির আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্বেও ঐ সকল যুবকদের ট্যাক্সিতে উঠে জনবহুল স্থান ত্যাগ করে নিরালা স্থানে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে।]

এই সব মেয়েরা নানাস্থানে নানা অছিলায় যৌন লোভী যুবকদের সহিত আলাপ করে, কিন্তু কদাচ নিজেদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা তারা তাদের জানায় না। প্রায়শঃক্ষেত্রে কোনও একটা গলির মুখে তারা

ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছে এই বলে যে, অমুক স্থানে অমুক দিন ঐ সময়ে সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তাদের অজুহাত এই যে অপরিচিত যুবকদের সাথে স্ববাটীর ধারে-কাছে যেতে তাদের যা কিছু আপত্তি।

ধর্মীয় প্রবঞ্চনা

'ধর্মেণ হীনা পশুভি সমানা'—এই শাস্ত্র বাক্যটি মিথ্যা নয়। কিন্তু এই 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? এই ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ যদি ইংরাজি প্রিন্সিপল হয়, তাহলে প্রতিটি পশুর নিজস্ব প্রিন্সিপল আছে। কিন্তু বহু মানুষের মধ্যে উহার অভাব থাকে। কিন্তু অধুনা ধর্ম শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে পথঘাট ও যানবাহনের অভাব ও অসুবিধা ছিল। এজন্য রাষ্ট্রীয় শাসন গ্রামাঞ্চলে ঠিক পৌছুতে পারতো না। এই কালে ধর্মের প্রভাব মানুষকে অপরাধবিমুখী করতো। মানুষের চক্ষুকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে কি করে? ধর্মনেতাদের পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত এই উপদেশ বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হতো। ফলে অধিকাংশ প্রজাকুল নিরপরাধ থেকেছে। অবশ্য গ্রামীণ শাসকরা এদেরকে দৈহিক, আর্থিক ও সামাজিক শাস্তির ভয়েও ভীত করে রাখতো। অবিশ্বাসী অপরাধীদের জন্য এই রাষ্ট্রীয় ভয়ের প্রয়োজন হতো। তবে ধর্ম-বিশ্বাসের হানি ও ঈশ্বর ভীতির লোপ অপরাধীর সংখ্যা বাড়ায়। অবশ্য এই সত্য মাত্র অভ্যাস ও দৈব অপরাধী সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য। ইংরাজিতে এই ধর্মবিশ্বাসকে টাবুউ [Taboo] বলা হয়।

"আমার মূল্যবান ফলের বাগানের দ্বারদেশে গ্রাম-দেবতার মন্দির

গড়ে দিয়েছি। প্রতি মাসে ওখানে আমি ২৫৲ টাকা প্রণামী দিয়ে থাকি। পরিবর্তে আমাকে দ্বারবান রাখতে হয় না। এতে আমার মাসিক বহু অর্থের সাশ্রয় হয়। দ্বারবানের বদলে ঐ গ্রাম্যদেবী আমার বাগানের ফল রক্ষা করেন। তাঁর বিরাগের ভয়ে কেহ বাগানের ফলের উপর কখনও লোভ করে নি।”

উপরোক্ত সত্য প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় বটে। কিন্তু উহা সকল প্রকার পেশাদারী প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। জনসাধারণের অধুনা ধর্ম বিশ্বাসের হানি ঘটেছে। এইজন্য দেব-মন্দির হতে বিগ্রহ ও তাঁর গহনা চুরি হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য বহু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আজও দেবতা প্রতিষেধকের কার্য করে। প্রায়ই দেখা যায় শিষ্যরা ভক্তিমান হলেও বহু ধর্মব্যবসায়ীর নিজেদের এতে বিশ্বাস নেই। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

“অমুক ঠাকুরবাড়ির বিগ্রহের দেহ হতে বহু অলঙ্কার চুরি যায়। আমি তদন্তে ওখানে গেলে সেবায়েত ভদ্রলোক বললেন,—‘গহনাগুলি উদ্ধার করতে না পারলে একটা কাজ করুন। শ্রীমা নিজের গহনা নিজে রক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য প্রণামী এখানে এখন কম পড়ছে। আমি সকলকে বলেছি মা স্বপ্ন দিয়েছেন। এই গহনার অবস্থান আমি পুলিশকে জানিয়েছি। এবার অনুরূপ গহনা গড়িয়ে মা'র গায়ে তুলবো। আপনি শুধু বলবেন যে গহনাগুলি আপনি মা'র প্রত্যাদেশ অনুযায়ী উদ্ধার করে এনেছেন।’ ঐ ভদ্রলোকের ভণ্ডামীর কথাগুলি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তার চাইতে রটানো ভালো যে মা তার ভক্ত চোরকে ঐ গহনা দিয়েছিলেন। কিংবা উনি বীতরাগ হয়ে কিছুদিনের জন্য ঐ বিগ্রহ হতে অন্তর্ধান

হয়েছেন। মশাই! এইরূপ এক বিশ্বাসযোগ্য স্বপ্ন দেখুন ও গহনা খরিদা বাবদ আপনার অর্থ বাঁচুক।" [পূজারিগণ ও সেবায়েতরা অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে থাকেন।]

বহু জ্যোতিষী আমার কাছে এসে অনুরোধ করে গিয়েছেন—'মশাই! ভক্তদের আমি গুণে বলেছি যে পক্ষকালের মধ্যে পুলিশ অলঙ্কার উদ্ধার করবে। এখন দয়া করে আপনারা চেষ্টা করলে সুনাম রক্ষা হয়।' এই জ্যোতিষিগণ এক প্রকারের ধর্মব্যবসায়ী। কারণ—জ্যোতিষশাস্ত্রাতিরিক্ত তান্ত্রিক সাধনারও এঁরা আশ্রয় নেন। এঁরা নির্বিচারে বিশ্বাসীদের বলে থাকেন যে ওঁরা রাত্রে নরমুণ্ডের সাথে কথা বলেন। কোনও সদুত্তর সাথে সাথে দিতে অক্ষম হলে—ওঁরা বলেন যে মা'কে [ঠাকুরকে] জিজ্ঞাসা করে বলবো। হিমালয়ের উপর এ'দেশের মানুষের অসীম মোহ। তাই এঁরা নিজেদেরকে হিমালয়-প্রত্যাগত বলেন এবং সাংখ্য নবদ্বীপে, বেদান্ত কাশীতে, পুরাণ মিথিলাতে, যোগ কাঞ্চি নগরে ইত্যাদি স্থানে অধ্যয়ন করেছেন ও শিখেছেন বলেন। বহু মূর্খ চতুর ব্যক্তিকে উহা আমি বলতে শুনেছি। রাজা আর এদেশে নেই। কিন্তু—বহু রাজজ্যোতিষী আছেন। নিজেদেরকে পঞ্চম জর্জের কুষ্ঠী বিচারক বলেন, এমন মানুষও আছেন। [এখানে অবশ্য ভালো মন্দ দুই আছে।] এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, তাহলে এতো লোক ওঁদের ওখানে যান কেন? ওঁদের কাছে বিশ্বাসী মানুষরা শুধু আসে। অবিশ্বাসীদের ওঁরা তাঁদের কাছে ঘেঁসতে দেন না। এই বিশ্বাসীরা কিরূপ প্রকৃতির মানুষ তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

ট "আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললাম—না না। মাদুলি আমি দোবো না। ও সব স্বস্ত্যেন শান্তির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। যা যা—দূর হ।

আমি যতই তাকে তাড়াতে চাই, সে ততই আমার পা' দুটো জড়িয়ে ধরে। পরিশেষে এমন ভাব দেখাই যেন আমার দয়া হলো। তখন তাকে আমি ২৫৲ টাকা ঠাকুরকে ভোগ দিতে বললাম। সে'ও বুঝলো যে আমি কতো বড়ো নির্লোভ ব্রাহ্মণ; তাকে আমি বুঝালাম যে ওর উপকার করার অর্থ আমার নিজের ছয় মাস আয়ুর ক্ষয়।"

বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে গেলে পারসেণ্টেজ বুঝা'র প্রয়োজন আছে। যদি ১০০ জন ভক্ত আসে তাহলে ও'দের শতকরা কুড়ি জনের উপকার হবে। অবশ্য ঐ সুফল গুরুর দয়া ব্যতিরেকেই হতো। এই বিশ্বাসী লোকরা ৫০৲ টাকা প্রণামী দিলেও ভদ্রলোকের মাসে বহু টাকা লাভ হয়। এরপর ঐ ক'টি ব্যক্তি ও তার পরিজনগণের প্রোপাগাণ্ডাতে সেখানে আরও বহু ব্যক্তি এসে থাকে। একদল ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারায় এবং অন্য দলের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়। কিংবা ওঁর শিষ্যরা বলবে যে গুরুর বাণী ওঁরা ঠিক বুঝেন নি—তাই। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি মুখরোচক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক মা হাইকোর্টের লিস্ট হতে বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করতেন। এর পর তাদের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা করতেন ও বলতেন যে ওঁরা মামলাতে জয়ী হবেন। বাদী ও প্রতিবাদী—উভয়ের মধ্যে একজন মামলাতে জিতবেই। এই জয়ী ব্যক্তি ঐ দিন হতে তাঁর ভক্ত হবেন। এতে আর আশ্চর্য কি আছে!"

এঁদের কাছে দুই প্রকারের লোক এসে থাকে—(১) ভয়াতুর বিপদগ্রস্ত লোক। এরা বিপদ হতে মুক্ত হতে চায়। (২) লোভী সম্পদাভিলাষী মানুষ। এরা স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। এই লোভ ও ভয় মানুষের বিচারবুদ্ধি হরণ করে ও তাদের মনের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়ে দেয়। ফলে, গুরুদেবের বাক্-প্রয়োগ এদের উপর

কার্যকরী হয়। ভক্তের মুখ দেখে গুরুদেব বুঝেন যে তাঁদের বিপদ কি? অবশ্য তার আগে ভদ্রলোকের পেশা ও স্ত্রী কন্যা পুত্র সম্পর্কে উনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এভাবে ঐ ক্ষতি তার ব্যবসায় বা চাকুরি ক্ষেত্রে বা পারিবারিক বিষয়ে তা তাঁরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে বুঝতে সক্ষম। বহু ক্ষেত্রে অলীক ও সাজানো শিষ্যরা গুরুর অন্য ভক্তদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। পরীক্ষায় ফেল করে ছাত্ররা টাকা ফেরত চাইলে এঁরা বলেন—তোমরা ভালো করে পড়ো নি কেন? মাদুলি দিলেও তোমাদেরকে পড়তে আমি বারণ করিনি। এঁদের ছল-চাতুরী দক্ষ মনোবিজ্ঞানীদেরও হার মানায়। এঁদের অনেকে তান্ত্রিকাচার্য, জ্যোতিষাচার্য প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কারুর কারুর ঘরে কঙ্কাল মুণ্ডের পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি থাকে। এভাবে ওঁরা ভক্তদের মনে ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নামে এবং জাতীয় জীবনে ধর্মের অজুহাতে এক মানুষ অপর মানুষের যত ক্ষতিসাধন করেছে, তত ক্ষতি অপরাধী নামধেয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হয় নি। বর্তমান পরিচ্ছেদে এদেশে ধর্মের নামে সংঘটিত অপরাধসমূহ সম্বন্ধে বলা হবে। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীদের ধর্মের নামে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে; বিবিধ পদ্ধতিতে উহাদের দ্বারা ওই সব অপরাধ সংঘটিত হয়। ঐ সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবরণটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে। সাধারণতঃ সরলবিশ্বাসী এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীদের এই পদ্ধতিতে দুর্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। এই বিবরণটি এই সম্পর্কে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমার তখন বয়স বাইশ কিংবা তেইশ হবে। ঐ সময় আমি

গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি দলে দলে লোক দীঘির পূব পাড়টার দিকে ছুটে চলেছে। শুনলাম প্রকাণ্ড এক সাধু কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হয়েছেন। এরই মধ্যে রটে গিয়েছে যে তিনি একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। সম্প্রতি তিনি কাশী থেকে সেখানে এসেছেন। কাশীর বিশ্বনাথও না'কি শীঘ্রই সেখানে আসবেন। তিনি তাঁর অগ্রদূত মাত্র, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি শূন্য থেকে নেমে এসেছেন। কেউ কেউ আবার এমনও মনে করেন যে তিনি মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠেছেন। এমনি বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে। এর পর আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। কৌতূহলী হয়ে আমিও সাধু দর্শনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হলাম। অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি যে সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন। তাঁর আসনের সামনেই একটি নাতিউর্ধ্ব ভূখণ্ড। সাধুবাবার নির্দেশমত শিষ্যের দল ব্যোম ব্যোম শব্দে গগন মুখরিত করে চিহ্নিত ভূখণ্ডটির উপর কলসের পর কলস জল ঢালছেন এবং সাধুবাবার শিষ্যদের সঙ্গে ভক্ত ও বিশ্বাসী গ্রামবাসীরাও যোগ দিয়েছে। বহু ব্যক্তিই সেখানে এসে জড় হয়েছেন। সকলের মুখেই সেই এক কথা শুনা যায়। শিবঠাকুর নাকি পাতাল হতে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠবেন। দিনের পর দিন চলে যায়, জল ঢালার কামাই নেই। আমরা হাসি ও উপহাস করি। তবু প্রতিদিন একবার অকুস্থলে বেড়াতে যাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমরা লক্ষ্য করি মাটিটা একটু চিড় খেয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করি ধরিত্রী দেবী আরও একটু ফাঁক হলেন। এর পর আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। ভক্তের দল কিন্তু অধিকতর উৎসাহে জল ঢালতে থাকে। আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম যে শিবঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন।

দেখতে দেখতে প্রায় দুই হাত উঁচু কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের একটি শিবলিঙ্গ ধীরে ধীরে মাথা তুলে মর্ত্যে উঠলেন। চক্ষের সামনে শিবঠাকুরকে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠতে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল। এমন কি, নাস্তিক জমিদার হয়কান্তবাবুর পর্যন্ত সেই একই অবস্থা। সাধুবাবার জন্যে জমিদার তৎক্ষণাৎ সেখানে একটা কুঠি বানিয়ে দিলেন। এর পর হতে দূর দূর গ্রাম হ'তে লোক এসে প্রণামী দিয়ে যায়। গ্রামের স্থানীয় লোক তো অর্থাদি দলে দলে এসে দেয়ই। টাকাকড়ি সোনাদানায় সাধুর পকেট নির্বিবাদে ভর্তি হতে থাকে। মাঝে মাঝে সাধুবাবার উপর ভর হ'লে তিনি তখন নানারূপ ভবিষ্যদ্বাণী বলতে থাকেন। উহার কতক মেলে কতক বা মেলে না। কিন্তু তাহলেও লোকে তাঁকে বিশ্বাসই করে যায়। কোনও কথা না মিললে লোকে বলে যে শুনতে তাহলে ভুল হয়েছে। উনি যা বলেছেন তার প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ, ইত্যাদি। সাধুবাবার দিনগুলো শ্রীশ্রীদেবাদিদেবের কৃপায় ভালই চলছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান দেবাদিদেব শ্রীশ্রীমহাদেব নিজেই। হঠাৎ একদিন এই সাধুর সন্ধানে গ্রামে পুলিশের আবির্ভাব হ'ল। শুনা গেল যে সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার আসামী। দারোগার আদেশে সিপাইরা শিবঠাকুরকে উঠিয়ে ফেললে। এরপর তারা মাটির নীচে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলল। মাটির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পিপে জলে ভিজে ফুলে উঠা ছোলা। এই ছোলার দানাগুলার উপরই এ শিবটা বসানো ছিল। আসলে ব্যাপারটি হয়েছিল এইরূপ: সশিষ্য সাধুবাবা রাত্রিযোগে শুখ্‌না ছোলা ভর্তি একটা পিপে মাটির তলায় পুঁতে রেখে তার ঠিক উপরেই শিবটা বসিয়ে রেখেছিলেন। শিবের মাথাটা শুখ্‌না মাটি ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে রাত্রিযোগে তাঁরা সরে পড়েন। ক্রমাগত জল ঢালার ফলে

ফাঁপা মাটির মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে নেমে পিপের ভিতরকার শুখ্‌না ছোলাগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে সেগুলাকে ফুলিয়ে দেয়। এর ফলে শিবঠাকুরও ধীরে ধীরে উপর দিকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে উদয় হন। মহাদেবের হঠাৎ আবির্ভাবের মূল কারণই ছিল এইরূপ। পুলিশ সাধু এবং তাঁর শিব, উভয়কে নিয়েই অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস না ভাঙ্গিয়েই গ্রাম পরিত্যাগ করেন। তাই তারা এখনও বিশ্বাস করে মহাদেব ঠিকই এসেছিলেন। কিন্তু জমিদারের পাপে তিনি সেখান হতে অন্তর্ধান হয়েছেন। যে দিনটিতে প্রথম শিবঠাকুর ওখানে উঠেছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিনটায় ঐ স্থানে গাঁয়ের লোক জড় হয়ে আজও জল ঢালে। পরবর্তীকালে সেইখানে সত্যিকার একটি শিবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

গ্রামবাসীদের এবংবিধ অন্ধ-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ভণ্ড তপস্বীরা কিরূপ নৃশংসভাবে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা শহরবাসীদের কল্পনারও বাইরে। এর কারণ, ধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অপহরণ করে সময় সময় তাকে অমানুষ করে তুলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ তার ঐশ্বর্য অপহরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। চিন্তাশীল ও বিদ্বান্ ব্যক্তিমাত্রই এ কথা স্বীকার করবেন। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে নাস্তিক ভাবাপন্ন বা কম ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই এই সকল কপট সাধুদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণে আমি মনে করি যে, ধর্মকে আজ বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং ন্যায়ের কাঠামোতে ফেলে জাতির কল্যাণের জন্যে তাকে নূতন করে রূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। মানবতার দিক হ'তে বিবেচনা করলে দেশপ্রেম আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল পূজা মাত্র। অনুরূপ ভাবে জাতির অগ্রগতির

পথে ধর্ম মধ্য-যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও আধুনিক যুগে উহা একেবারে অচল ; এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে উহা ক্ষতিকরও বটে। দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড রাষ্ট্রনায়কেরা পৃথিবীর মানুষের অমানুষিক ক্ষতি করে এসেছে। কিন্তু চুরি-ডাকাতির দ্বারা তদনুরূপ ক্ষতি পৃথিবীর হয় নি। অন্ধ ও উৎকট ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কদের প্রয়োজন হলে যেমন ছলের অভাব হয় না, স্বার্থান্ধ ধর্মব্যবসায়ীদেরও তেমনি কখনও কৌশলের অভাব হয় না। সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন উভয় স্তরেই আমরা ভণ্ড তপস্বীদের সন্ধান পেয়ে থাকি। এইসব ভণ্ড সাধুরা মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ পদ্ধতিতে তাঁরা লোক ঠকিয়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে নিম্নে কোনও এক ভণ্ড তপস্বীর বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতিটি এ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"সূর্যদেব তখন প্রচণ্ড প্রতাপে ঠিক মাথার উপর বিরাজ করছিলেন। ঠিক সেই শুভ মুহূর্তটিতে শিষ্যকে আমি দীক্ষা দিতে মনস্থ করলাম। শিষ্যটিকে আমি মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে মুখ ক'রে করজোড়ে দাঁড়াতে বললাম এবং আমি দাঁড়ালাম সূর্যের দিকে পিছন ফিরে। এর পর আমি শিষ্যের হাতে ধান ও দূর্বা দিয়ে সূর্যদেবের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে সূর্যস্তব পাঠ করতে বললাম। জলন্ত সূর্যদেবের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে শিষ্য স্তব পাঠ করতে লাগল, "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্—" ইত্যাদি। এর কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে আমি আমার দিকে তাকাতে বললাম। স্বাভাবিক কারণে শিষ্য আমার কথা শুনতে পেলেও আমাকে সে দেখতে পেল না। সে মনে করল আমি অন্তর্ধান হয়ে গেছি। কেঁদে উঠে শিষ্য আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরুদেব,

গুরুদেব, দেখা দাও। এখুনি কোথা গেলে তুমি?' উত্তরে আমি তাকে অভয় দিয়ে জানালাম, 'ভয় নেই বৎস! আমি এইখানে তোমার নিকটেই আছি। বৎস! তুমি শীঘ্রই আমাকে দেখতে পাবে।' কয়েক মিনিট পরেই শিষ্যের চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল এবং আমিও পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলাম এবং এই সুযোগে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'বৎস! তোমার প্রথম দীক্ষা শেষ হ'ল। এইবার তোমার দ্বিতীয় দীক্ষা শুরু হবে।' প্রথম দীক্ষার বিষয় বলা হলো। এইবার দ্বিতীয় দীক্ষার কথা বলবো। দ্বিতীয় দীক্ষার সময় আমি সারা অঙ্গে সাদা বিভূতি মেখে [উদ্দেশ্য—দেহটি শ্বেতবর্ণের করা] শিষ্যের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে রাখলাম একটি লাল রঙের কাঁচের পাত্রে লাল রঙ করা গঙ্গোদকমন্ত্রা জল। এর পর শিষ্যকে আমি আদেশ করলাম, 'বৎস! এবার স্থির দৃষ্টিতে লাল পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাক।' শিষ্য আমার আদেশ প্রতিপালন করল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আমি শিষ্যকে আমার মুখের পানে তাকাতে বললাম। শিষ্য আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি দেখছো, বৎস? আমার সারা অঙ্গে কি তুমি সবুজ আভা দেখতে পাও?' এই প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য আমাকে বলল, 'হাঁ গুরুদেব! আপনি সবুজ হয়ে উঠেছেন।' উত্তরে আমি তাকে জানালাম, 'হাঁ বৎস! এইটেই পৃথিবীর আসল রূপ।' এর পর আমার সাকরেদরা এসে লাল পাত্রটি সরিয়ে নিয়ে আমার নির্দেশমত সেখানে একটা পীতোদক ভরা পীত বর্ণের কাঁচপাত্র রেখে যায়। আমি পূর্বের ন্যায় শিষ্যকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাত্রটির দিকে চেয়ে থাকতে বলি। এর পর আমার আদেশ মত চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শিষ্য দেখতে পায় আমি নীল হয়ে গেছি। আমি তখন মহা আনন্দে শিষ্যকে জানালাম, 'বৎস। এইটেই ঈশ্বরের আসল

রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন এই নীল বর্ণের।' এই সব অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করে শিষ্য আমার অভিভূত হয়ে পড়ে এবং আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে, 'প্রভু! তোমার অসীম দয়া এই ভক্তের উপর। এই কি সেই বিশ্বরূপ? তুমি কি তা হলে—।' এর পর আমি তাকে আমাকে তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে আদেশ দিই। অর্থাৎ কি'না গুরুর পাদপদ্মে, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে তাকে আমি উপদেশ দিই। এইভাবে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ মঠের নামে আত্মসাৎ করে আমি সরে পড়ি।"

এইবার এই বিশেষ পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করা যাক। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে যে লাল রঙের উল্টা রঙ সবুজ এবং হরিদ্রা বা পীত রঙের উল্টা রঙ নীল। ইহাদের যথাক্রমে রেড্-গ্রীন প্রসেস্ এবং ইয়োলো-ব্লু প্রসেস্ বলা হয়। মস্তকের মধ্যকার ঘিলুর [মগজ] মধ্যে এইগুলি অবস্থান করে। দুই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত একটি লাল চৌকা কাগজের প্রতি কেহ যদি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি রেখে পরে হঠাৎ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায় তা হলে সে সবুজ রঙের অনুরূপ পরিমাপের ছাপ দেওয়ালের উপর দেখতে পাবে। কারণ লাল রঙের উল্টা রং সবুজ। এই একই কারণে পীত রঙের কোনও একটি বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেওয়ালের দিকে হঠাৎ তাকালে সেখানে দৃষ্ট হবে নীল রঙের ছাপ। কারণ এই যে, পীতের উল্টা রঙ নীল। এইভাবে হলদের দিকে তাকালে নীল, নীলের দিকে তাকালে হলদে মানুষ দেখে থাকে। মানুষের মস্তিকের মধ্যকার রেড্ গ্রীন প্রসেস্ [লাল-সবুজ দণ্ড] এবং ইয়োলো-ব্লু প্রসেস্ [পীত-নীল দণ্ড] এইরূপ ব্যবস্থার জন্যে দায়ী। ইহা একটি নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার মাত্র। এরূ

মধ্যে বাহাদুরির বা কেরামতির কোনও কিছুই নেই। এই কারণেই সাধুবাবা একবার সবুজ এবং একবার নীলবর্ণের হ'তে পেরেছিলেন।

সূর্যের খররশ্মির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরালেই মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আঁধার দেখে। এই সময়ের মধ্যে সামনে কোনও মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে এবং সে নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে থাকলে তাকে [সেই ব্যক্তিকে] কিছুক্ষণের মত সে দেখতে পায় না। সূর্যের প্রখর রশ্মি চক্ষুমণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় যে মানুষ তার চক্ষু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত সামনের কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে সে আর দেখে না। এই কারণেই সাধুবাবা কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্ধান হয়ে শিষ্যকে চমৎকৃত করতে পেরেছিলেন।

এই সকল বিজ্ঞ ভণ্ড সাধুরাই যে এইভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে তা নয়। অজ্ঞ গ্রাম্য সাধুরাও লোক ঠকাবার জন্য এইরূপ ভেল্কিবাজির সাহায্য লন। নিম্ন বঙ্গের ব্যাধজাতি, পাটনার যদুয়া ব্রাহ্মণ, যোধপুর এবং উদয়পুরের বৈদ মুসলমান নামধারী ভ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির ঠগীরা প্রায়ই এইভাবে গ্রাম্য লোকদের ঠকিয়ে থাকে। এই সকল দুর্বৃত্তরা যোগী ও সাধুর বেশে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এর পর তাঁরা উপরি উক্ত উপায়ে নিজেদের অন্তর্ধান করেন। তাঁরা কখনও বা শিষ্যদের রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মা লক্ষ্মী * দেখান। কখনও বা হয়ত তাঁরা হাত সাফাইএর

---

* সাধুবাবারই এক সাকরেদ লক্ষ্মীমাতা সেজে জঙ্গলের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এবং জঙ্গলের মধ্যে মাতৃ দর্শনের ব্যবস্থা হয়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া সাধুবাবার সাকরেদদের পূর্বগামী একটা দল, চাষী ও ব্যবসায়ীর বেশে গ্রামের মধ্যে ঘুরাফিরা করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাধু-বাবাকে পূর্ব হতেই তা জানিয়ে দেয়, এতে করে সাধুবাবার ভবিষ্যবাণী করার ও হাত দেখার সবিশেষ সুবিধে হয়।

সাহায্যে পিতলকে সোনা বানিয়ে গ্রামবাসীদের মোহিত করে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। তারপর এঁরা লোকেদের জানান তাঁরা রূপা বা সোনাকে পূজার্চনা ও প্রতিক্রিয়াদির দ্বারা দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে লোকের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্ষম। সংসারে সকলেই চালাক লোক নয়। তাদের মধ্যে বোকা লোকও থাকে। কয়েকজন বোকা গ্রামবাসী সাধুর কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের যাবতীয় সঞ্চিত সোনা রূপা সাধুবাবার কাছে গোপনে এনে দেয়। সাধুবাবা তখন এই রূপার ও সোনার অলঙ্কারাদি একটা মাটির তালের মধ্যে পুরে মৃত্তিকার তলায় প্রোথিত করেন এবং এরপর ওর উপরকার সেই ভূমিখণ্ডের উপর পূজা হোম যাগ যজ্ঞ চলতে থাকে। এদিকে সাধুবাবাও অলঙ্কার কয়টি গোপনে বার করে নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা চরণামৃতের নামে শিষ্যদের সোমরস [সিদ্ধি, ভাঙ বা মদ] খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। একদিন এ বিষয়ে সুযোগও মিলে যায়। সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ অলঙ্কারগুলি মৃত্তিকার তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এক বিশ্বাসী চেলার মারফৎ সরিয়ে দেন। এদিকে যাগ-যজ্ঞ কিন্তু সমানভাবেই চলতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সাধুবাবার ষোড়শোপচারে পূজাও। এর দুই দিন পরে সাধুবাবা শিষ্যকে জানান যে, সোনা এবং রূপা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, তবে এই দ্বিগুণ হওয়া অলঙ্কার বা সোনা সাত দিন পরে সে যেন উঠায়। এর অন্যথা করলে তাদের সর্বনাশ হতে পারে। এর পর শিষ্যকে আরও সাত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে সাধুবাবা দেবীর প্রত্যাদেশে সদলে দেশ ত্যাগ করেন। এই নয় দিনের মধ্যে সাধুবাবা কোনও এক দূর দেশে সরে এসে একান্তভাবে নিরাপদ হ'তে সক্ষম হন। এই নয় দিন পর শিষ্যরা সাধুবাবার উপদেশ মত মাটি খুঁড়ে দেখে যে তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাবতীয় অর্থাদি

অপহৃত হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এইসব সাধুবাবারা হাত সাফাই-এর [Sleight of hands] সাহায্যে প্রথম চোটেই মূল্যবান অলঙ্কারাদি সরিয়ে ফেলে তৎপরিবর্তে পিতলের অনুরূপ অলঙ্কারাদি শিষ্যদের চোখের সামনেই মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করে দেন। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতির দুর্বৃত্তরা নাম দিয়েছে, "দোনাখেল"। এই সব অপরাধী ঠগীদেরও বলা হয় দোনাখেল-ঠগী।

[সাধু এবং গুরুজন সাধারণতঃ চারি প্রকারের হয়ে থাকে—(১) ভগবৎ-বিশ্বাসী ও সৎ, (২) প্রবঞ্চক বা অলস, (৩) নিউরোটিক এবং রিস্ট্রিয়া-গ্রস্ত, (৪) ধর্ম-ব্যবসায়ী মানুষ। বহু গুরু ইমপোটেন্ট্ হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে পারভার্সিটি অধিক থাকে। এঁরা নারী-শিষ্যাদের দ্বারা গা-হাত-পা টিপিয়ে এবং তাদেরকে কিছু কিছু আদর করে যৌন তৃপ্তি পান। এঁদের যৌন-সম্মিলন [sex-satisfaction] হয় না বটে, কিন্তু যৌন-উপশম দ্বারা [sublimation] এঁরা প্রচুর আনন্দ পান। অন্যদিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুরু সংসর্গে কাটালে নারীদের অপবাদের ভয় নেই।]

অযৌনজ অপরাধ সকলের ন্যায় যৌনজ অপরাধ সকলও অনেক সময় ধর্মের পোশাকে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গুরু নামধেয় দুর্বৃত্তরাই এই সকল অপকর্মের হোতা হয়ে থাকেন। ভাড়াটে গুণ্ডা বা ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীতে আবহমানকাল হ'তে প্রচলিত আছে। অনুরূপ ভাবে অর্থ দিয়ে পুরোহিত নিযুক্ত ক'রে ঈশ্বরের কাছে আবেদন-নিবেদন পৌছানোর পদ্ধতিও এ পৃথিবীতে দেখা যায়। এ দেশের অনেকেরই ধারণা পুরোহিত এবং গুরুরা উকিলের ন্যায় ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের দরবারে ওকালতি না করলে ভক্তদের সকল আবেদন ঈশ্বরের দরবারে হয়তো সঠিক ভাবে পৌছাবে না।

পুরোহিতগণ অনেকটা উকিল বা পেশকারের পর্যায়ে পড়েন। গুরুরা কিন্তু আরও উর্ধ্বে স্থান পান। শেষ বরাবর তাঁরা ঈশ্বরের একজন সোল এজেণ্ট হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের সুপারিশ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে যেন ভগবানের ত্রিসীমানায় পৌঁছানও অসম্ভব। এই সম্বন্ধে আমি এক গুরু নামধেয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের তো সম্পর্ক পিতাপুত্রের। আমরা নিজেরাই তো সাধারণভাষায় তাঁকে আমাদের নিবেদন জানাতে পারি। এর মধ্যে আপনাদের সাহায্যের কি কোনও প্রয়োজন আছে?' গুরু নামধেয় ভদ্রলোকটি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেন, 'দেখ, গুরু হচ্ছে একটা দর্পণ, বা আরশি। গুরু রূপ দর্পণের সাহায্য ব্যতিরেকে ভগবৎ সন্দর্শন হয় না।' এর পর গুরুঠাকুর আমাকে আরও বোঝান যে গুরু হওয়া এক জন্মের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর জন্যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র উপযুক্ত ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্যে গুরুদেব পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীটা না'কি সবই মায়া এবং এই মায়াজাল ছিন্ন করে একমাত্র তিনিই ভক্তদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্ষম। গুরুঠাকুর অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ এমনি সব বাক্যজাল সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। এতে ক'রে আমার মত লোকও কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে উঠে। সত্য কথা বলতে গেলে গুরুদেবের মুখনিঃসৃত 'বিরাট ব্যোম' রূপ অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থটি আজও পর্যন্ত আমার বোধগম্য হয় নি।

চিত্ত প্রস্তুতির [Predisposition] কারণেই এইরূপ সম্ভব হয়। এই চিত্তপ্রস্তুতির কারণে ধর্মের নামে সহজেই আমরা উতলা হ'য়ে উঠে আমাদের বিবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলি। আবাল্য বাক্-প্রয়োগ [suggestion] এবং ধর্ম, সংস্কার ও কতকটা জাতীয় অভ্যাস এই জন্যে দায়ী।

এদেশের ভগবৎ-বিশ্বাসী লোকদের [বিশেষ ক'রে মেয়েদের] সব চেয়ে বড শত্রু ছোক্‌রা গুরু। গুরু অনেক প্রকারের হয়, যথা—উদাসী, বিদেশী, [আরণ্য] গৃহী, সস্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু ইত্যাদি। এমন বহু গুরু সস্ত্রীক গুরুগিরি করেন। অর্থাৎ কি'না খোকা মহারাজ [গুরুপুত্র] বিলাত যাবেন, টাকা যোগাবেন শিষ্যরা। খুকী মাতার [গুরুকন্যা] বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যেরা বহন করবেন। কোনও এক সস্ত্রীক গুরু প্রতি বৎসরই সপরিবারে প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে শিষ্যদের অর্থে মধুপুরে যেতেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁর কোনও এক অন্ধ-ভক্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! উনি সাধু হবেন তো অরণ্যে না গিয়ে প্রতি বৎসর উনি মধুপুরে যান কেন? কামিনী কাঞ্চনই বা উনি ত্যাগ করেন না কেন? প্রতি বৎসরই শহরে ওঁর একটা ক'রে বাড়ি উঠছে। এত অর্থের বা ওঁর প্রয়োজন কি? এর কি কোনও সদুত্তর আপনারা দিতে পারেন?' এই সব প্রশ্নে ভক্ত শিষ্যটি কিছুমাত্র বিব্রত বোধ না করে এইরূপ উত্তর দেন, 'ওঃ, এই কথা? গুরুদেবকে আমরা এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিনি? আমরা তাঁকে এসব জিজ্ঞাসা করেছি বই কি? গুরুদেব কি বলেন জানেন? গুরুদেব আমাদের বুঝিয়ে বললেন, 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগ। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিজে ভোগ করে তিনি ভক্তদের তা থেকে মুক্ত করতে চান।' অপর আর এক ভক্ত শিষ্যকে আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! গুরুঠাকুর শুনেছি মানুষের ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম। তাহলে সেবার ওঁর নিজের নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগ হল কেন? ওঁর জন্যে বড় বড় ডাক্তার-বৈদ্যই বা ডাকতে হয় কেন?' উত্তরে শিষ্য মশাই আমাকে এই বিষয় বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'রোগটা আসলে হবার কথা ছিল গুরুঠাকুরের কোনও এক শিষ্যের। ভক্ত শিষ্যের সেই কাল-ব্যাধি

গুরুঠাকুর তাঁর নিজ দেহে তুলে নিয়ে তাঁর সেই ভক্ত শিষ্যকে তিনি এ যাত্রা রক্ষা করলেন মাত্র।'

পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে কতদূর নির্বোধ এবং নির্বাক করে তুলতে তাঁরা সক্ষম তা উপরি উক্ত উক্তিগুলি অনুধাবন করলে সহজেই বুঝা যায়। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের এই সকল দুর্বলতার সুযোগ বিজ্ঞ দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন। এই সম্বন্ধে জনৈক ছোকরা গুরুর একটি চমকপ্রদ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি পাঠ করলে আলোচ্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গুরুগিরি করতে হ'লে দুইটি জিনিস জানা দরকার, যথা : মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি, আর কিছুটা ম্যাজিক। এই দুইটি জিনিসের মার প্যাচে আমি একটি সদ্য বিবাহিত তরুণ-শিষ্যকে আয়ত্তে আনি। আমার উপদেশে [আদেশে] সে অচিরে তার পিতামাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি আত্মীয়দের বিদেয় দেয়। তার স্ত্রীটি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। প্রথমে সে কিছুতেই আমার ভক্ত হ'তে চায নি। এতে বিরক্ত হয়ে আমি শিষ্যটিকে ব্রহ্মচর্য পালনে আদেশ দিলাম। এমন কি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা আমি তাকে তার স্ত্রীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতে প্ররোচিত করি। এইরূপ কার্যের মধ্যে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ, স্বামীর উপর তার বিরক্তি আনা। স্বামী-সাহচর্য হ'তে তাকে বঞ্চিত করে তার যৌনবোধকে তীক্ষ্ণ করা। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে আমি আমার শিষ্যকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেও প্রকাশ্যে কিন্তু আমি তাকে তার স্বামীর অত্যাচার হ'তে ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—তার মনটাকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিরূপ করে আমার দিকে টেনে আনা। এর পর আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। শিষ্যকে আমি সারা রাত জাগিয়ে রেখে ধর্মকথা

শুনাতাম। সারা রাত জাগিয়ে রেখে তাকে দিনের বেলায় আমি অফিসে পাঠাতাম। সারাদিন আমি ঘুমালেও শিষ্যকে কিন্তু ছুটির দিনেও আমি ঘুমাতে দিই নি। ঘুমাবার সে কোনও সুযোগই পেত না। রাত্রে চরণামৃতের নামে তাকে আমি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়েছি। এ ছাড়া তাকে কখনও পরলোকের ভয় দেখিয়ে, কখনও বা তাকে নানারূপ অশুভ দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে সর্ব সময়ই আমি তার মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম। ঘুমের অভাবে তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে আসত। তার উপর চরণামৃতের নামে আরক পান আছে। এইরূপ ভাবে অচিরেই তাকে আমি পাগল বিশেষে পরিণত করি। এ অবস্থাতে দেখেও সে দেখে না, বুঝেও সে বুঝতে পারে না। এদিকে বাড়িতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ। স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি একেবারে বিষিয়ে উঠেছে। তার উপর তার আর কোনও সহচর বা সম্বল নেই। একটি পয়সার দরকার হলে তাকে তা আমার কাছেই চাইতে হয়। ওদিকে স্বামীর কঠোর ব্রহ্মচর্য। স্বামীর এইরূপ ব্যবহারের জন্যে তার মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঠিক এই সময় আমি তার মুখে সুধার পাত্র তুলে ধরলাম। হতভাগা শিষ্য এ'সব বুঝেও বুঝল না, চোখে দেখেও সে তা দেখল না। বরং অপকার্যে প্রকারান্তরে সে আমার সহায়তাই করল। কারণ তখনও পর্যন্ত সে আমাকে ঈশ্বরের অবতার রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে কিন্তু শিষ্যর চেয়ে শিষ্যাই আমার বেশি ভক্ত হয়ে উঠে।"

এইরূপ গুরুগিরি অবশ্য বেশি দিন চলে নি। মেয়েটির বাপ এবং ভাই খবর পেয়ে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা বাড়ি ঢুকে গুরুকে মারধর ক'রে বার করে দেয়! শিষ্য মশাই দোতলা থেকে আস্ফালন করলেও গুরুরক্ষায় তিনি অপারক হন। এর পর

শিষ্যমশাই ধীরে ধীরে সেরে উঠেন। পূর্বের কথা স্মরণ করে তিনি এখন বিশেষ লজ্জিত। হঠাৎ সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

"চোখের সামনে দেখতে পেলাম যে, শ্রীশ্রীভগবান নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারলেন না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত সত্ত্বেও আমি যীশুর কাহিনী স্মরণ করে মনকে সুস্থির করি। দুই দিন ও দুই রাত্রি আমি ঘুমালাম এবং কাঁদলাম। ঘুম ভাঙার পর বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র, হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, নিচের ভাড়াটিয়াটা অকথ্য ভাষায় আমায় গাল দিচ্ছে, 'হারামজাদা। নেমে আয় দেখি। তোর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ হ'ল। তুই-তো জোচ্চরটাকে সাধু বলে আমায় তার শিষ্য করিয়েছিলি।' ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে এসে স্বেচ্ছায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে আমার চেয়েও তাঁর বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ভক্তি দেখে আমার হিংসা হ'ত, কিন্তু আজ তার এ কি পরিবর্তন। তবে কি—। আমার মনে সন্দেহ জাগাতে, আমি তাকে বলি, 'ওপরে আসুন না মশাই। যা আপনার বলবার আছে তা ওপরে এসে বলুন। খামকা গাল পাড়েন কেন?' আমার অনুরোধে লোকটি উপরে উঠে এসে আমাকে বল্‌লে, 'শুনুন তবে বলি সব কথা। গুরুর নির্দেশ মত দরজা বন্ধ করে আমি পূজা করছিলাম। হঠাৎ কোনও এক ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় গুরুদেবের বাক্সটা খুলে ফেলি। বাক্সের ভিতরের কাগজপত্র থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি একজন ঠগ। আমাকে, আপনাকে এবং আরও অনেককে তিনি ঠকিয়েছেন।' আমি সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠার পর ভদ্রলোক আমাকে জানান যে, জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্যেই তিনি

ঐ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে সেদিন তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে এবং আমার গুরুদেবকে গাল দিচ্ছিলেন। আমারই মত একজন গুরুভক্তকে গুরুনিন্দা করতে শুনেই আমি সত্বর নিরাময় হই।”

এই গুরুটি আরও অনেক শিষ্য-পত্নীর অনুরূপ ভাবে সর্বনাশ করেছেন। এইরূপ এক শিষ্য-পত্নীকে আমি জানতাম। অনুযোগ করাতে তিনি আমাকে জানান, ‘দেখুন স্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের জন্যে তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান করি।’ উত্তরে আমি তাঁকে এইরূপ উপদেশ দিই, ‘তা বোন্! বেশ করেছ, লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু যা করেছ তা করেছ। এখন আর তা ক’রো না। আর যা বলেছো তা আমাকে বলেছ। আর কাউকে এ কথা বল না। কারো কাছে এ কথা স্বীকার করতে নেই। জানতে পারলেই এটা মস্ত দোষ হতো। কিন্তু তা না জানতে পারলে দোষ নেই। মানুষ মাত্রেরই ভুল-চুক হয়ে থাকে। তোমার স্বামী ছিলেন তখন একজন রোগী। কোনও রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। এইবার একনিষ্ঠ হয়ে ঘরকন্না কর। পূর্বের ঘটনাগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত উপেক্ষা করে সুখী হও। এই আমার কামনা ও আশীর্বাদ।’

এই সকল ছোকরা গুরু হ’তে পূর্বাহ্ণেই সাবধান হওয়া ভাল। এমন অনেক দুর্বৃত্ত গুরু আছেন, যাঁরা শিষ্যদের বিশ্বাস করান যে, তিনি ভগবান এবং শিষ্যা ও শিষ্য উভয়েরই দেহ ও মনের অধিকারী। শিষ্যার যৌন-সংযম পরীক্ষার ভান করেও তাঁরা অগ্রসর হন। এইরূপ এক ছোকরা গুরু কোনও এক মহিলাকে বুঝান যে, তিনি [গুরু] সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তাঁর [শিষ্যার] দুই [বয়স্থা] কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর

অংশ মাত্র। প্রতি দিন গভীর রাত্রে তিনি রূপার বাঁশী নিয়ে কন্যাদের সমভিব্যাহারে নৃত্য করতেন। এইরূপ অবস্থায় গুরুসেবার দ্বারা কন্যা বিশেষের সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই মনো-রোগীর আত্মীয়দের এবং পড়শীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনানু-মোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

উপরি উল্লিখিত ছোকরা গুরু ছাড়া আর একপ্রকার ছোকরা গুরু দেখা যায়। এঁরা ভান করেন যে, কোনও এক দেবতা তাঁর উপর ভর করেছেন এবং এই ভাবে তাঁরা লোকচক্ষে হঠাৎ একদিন দেবতা হয়ে উঠেন। এইরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। এদেশের অধিকাংশ লোকই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদী হলেও বহু-দেবদেবীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরও এদেশে অভাব নেই। অনেকে আবার এই সকল দেব বা দেবীকে একই ঈশ্বরের এক-একটি রূপ বা অংশ রূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। এই সকল দেব বা দেবীর [কিংবা খোদ্ ঈশ্বরের] নামে দুর্বৃত্তরা কিরূপ প্রণালীতে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

"সাধারণতঃ ছেলে-ছোকরারা হঠাৎ গুরু বা সাধু হ'য়ে উঠলে প্রাচীন লোকেরা তাদের আদপেই আমল দেন না। অথচ এ সম্বন্ধে প্রবীণরাই একমাত্র সমঝদার। এদের মস্তিষ্ক এই সময়ে একটি পাকা রিসিভারের মত হয়ে উঠে। এই কারণে এদের যা তা বিশ্বাস করানও সহজ হয়। বহু বৃদ্ধাদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। পরলোকের পথে এগিয়ে এসে মৃত্যুবিশ্বাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যুভয় অতিষ্ঠ ক'রে তুলে। পিছনের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করে এঁরা কোনও রূপ পাথেয়র সন্ধান পান না। এর ফলে হঠাৎ এঁরা পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। জীবনব্যাপী অতৃপ্ত বাসনার কারণে এবং আত্মপ্রবঞ্চনার

ফলে তাঁরা প্রায়ই স্নায়বিক রোগে ভুগে থাকেন। এইরূপ স্নায়বিক রোগের সহিত সন্নিবেশিত থাকে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা। পরলোকের চিন্তা তাঁদের এই সময় অত্যন্ত রূপ উদ্বিগ্ন করে তুলে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই দুর্বলতা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করি এবং তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে আমি মনস্থ করি।

কিন্তু আমি স্বল্প শিক্ষিত যুবক মাত্র। আমার অমৃতবাণী কে বিশ্বাস করবে? অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা মতলব ঠিক করে ফেলি। একদিন ঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি বিভোর হয়ে কেঁদে উঠি এবং তার অব্যবহিত পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে ভূমির উপর লুটিয়ে পড়ি। আমার মা, পিসিমা ও ঠাকুমা নিকটেই ছিলেন। আমাকে এই ভাবে পড়ে যেতে দেখে তাঁরা তো ছুটে এলেনই, তা ছাড়া পাড়াপড়শীদেরও অনেকের সেখানে আগমন হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আমি উঠে ব'সে চোখ পাকিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, মা, জানো? জানো, আমি কে?' ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে কাকা-কাকীমাও সেখানে এসে গেছেন। নানা লোকে আমাকে প্রশ্ন করলেও আমি কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিই না। হঠাৎ মা আমার কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে বাবা তুমি? আমার বাছার উপর ভর করছ?' উত্তরে চোখ পাকিয়ে আমি তাঁকে বলে উঠি, 'কে? কে জানিস আমি? আমি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।' আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বা তা করে না। কেউ বা বিশ্বাস করে বলে উঠে, 'না ভাই, ছেলেটা তো এ রকমের নয়। নাঃ, ওর উপর ভরই হয়েছে। এ সব ঠাকুর দেবতারই ব্যাপার।' এর পর আমি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বাণীর পর বাণী দিতে থাকি। আমার মুখনিঃসৃত কতকগুলা কথা কারুর কারুর সম্বন্ধে মিলেও যায়।

বলা বাহুল্য, এই সকল গোপন কথা আমি পূর্বাহ্ণেই অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছিলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠে বসে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি। মা এইবার ছুটে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো বাবা? কি হয়েছিল তোমার বাবা? একটুও ভাল মনে হচ্ছে তো?' অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করে আমি উত্তর দিই, 'না মা, না তো। কিছু হয়নি তো আমার।' অধিকতর অবাক হয়ে মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা, সে কি রে। এই যে তুই কি সব বলছিলি। তুই না'কি রামচন্দ্র?' আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি নি এইরূপ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি রামচন্দ্র? মানে? সে আবার কি?'

বিষয়টি সজ্ঞানে এইভাবে অস্বীকার করায় আমার উপরে সকলের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর পর হতে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আমার ওপর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ভর হতে থাকে। এই সময় আমি ভূত ভবিষ্যৎ সমেত নানারূপ জানা ও অজানা তথ্যাদি বলে যেতাম। এর কতক মিলে যেতো, কতক বা মিলতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাণী শুনবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে লোক এসে আমার কাছে হত্যা দিতো। ভরের সময় আমি আগন্তুকদের ঔষধাদির সন্ধান বলে দিতাম। এমন কি, ছেলেপুলেদের আশীর্বাদ করে তাদের রোগও সারিয়েছি। আমি ভক্তদের সাবধান করে বারে বারে তাদের জানিয়ে দিতাম, 'দেখ বাপুরা, ডাক্তার দেখাচ্ছিস্ দেখা। খবরদার গরিবের পয়সা কটা যেন মারা না যায়। তবে এর রোগ আমি অবশ্য সারাব।' ডাক্তারের ডাক্তারী চলার ফলে রোগী এমনিই সেরে উঠত। কিন্তু নাম ডাক্তারের না হয়ে নাম হ'ত এই আমার। এ ছাড়া ভরের সময় খুড়ো মশাইএর

মাথায় নির্বিবাদে আমার শ্রীচরণ তুলে দিয়ে আমি জানিয়ে দিতাম, 'এ বেটার কিছু হবে না। এ বেটা সুগ্রীব আছে।' খুড়া মশাই পূর্ব জন্মে সুগ্রীব রূপ ভক্তবীর ছিলেন। এই কথা জ্ঞাত হয়ে তিনি বরং খুশিই হয়ে উঠতেন। এজন্যে রাগ তিনি করতেন না। এছাড়া মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়া ব্যবসায়ীরাও আমার মন্দিরে এসে ধর্ণা দিতে থাকে। বাড়ির সামনে রোলস্‌রয় ও মিনার্ভা কারের গাঁথি লেগে যায়! টাকা পয়সা ও গিনি মোহরে আমার সিংহাসনের তলাকার রৌপ্য রেকাবগুলি প্রতিদিনই কাণায় কাণায় ভরে উঠত।

এমনিভাবে আমার দিনগুলো বেশ ভালভাবেই চলছিল। আরও কিছুদিন হয়ত আমার এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার মাথায় এক দুর্বুদ্ধির উদয় হল। হঠাৎ একদিন পূর্বের মত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'মা, জান? জান তুমি আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তংর আমার যশোদা মাতা জানালেন, 'জানি বই কি বাবা। তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। এ জন্মে অভাগিনীকে দয়া করেছ।' গম্ভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, 'হুঁ', ঠিক বলেছ তুমি। এখন যাও, সীতাকে নিয়ে এস।'

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমি বিবাহ করেছিলাম। এতদিন পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে আমার স্ত্রীও নির্বিবাদে আমার সেবা করে আসছিলেন। সীতাদেবীর কথা শুনে ভীত নয়নে আমার স্ত্রী আমার দিকে [রামচন্দ্রের দিকে] তাকালেন। ব্যগ্রভাবে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি বলছ বাবা? সীতা? কোথায় আছেন তিনি?' জলদ গম্ভীর স্বরে আমি তাঁকে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আছে নিকটেই। যা—চলে যা সোজা চীৎপুরের মোড়ে। পুলের তলায় হলদে রঙের টিনের বাড়ি। প্রতুল চক্রবর্তীর ঘরে জন্মেছে সে তার

মধ্যম কন্যারূপে। যা যা, ভাল চাস্ তো এক্ষুনি তাকে নিয়ে আয়। সীতা, সীতা, আমার সীতা—।' আমার এই শেষ আদেশ জানিয়ে দিয়ে 'সীতা—সীতা' বলতে বলতে আমি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হওয়ার পর সকলে ছুটে এসে আমাকে সীতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন। এইরূপ ভান করতে থাকি, যেন এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এর পর অনেক সলা-পরামর্শের পর বাড়ির লোকেরা এবং অপরাপর ভক্তেরা সীতা অন্বেষণে বহির্গত হন। শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িটা তাঁরা সহজেই খুঁজে বার করেন। প্রতুলবাবুর মধ্যম কন্যা সীতাদেবীরও তাঁরা দর্শন পান। বলা বাহুল্য, কিছুদিন যাবৎ এই সীতা নাম্নী কন্যাটির সহিত আমার প্রণয় চলছিল। এই সুযোগে আমি তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করি। এর পর মহা ধুমধামের সঙ্গে আমি আমার সীতাকে বিয়ে করে ভরের মুখেই ঘরে ফিরি। বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যরাই বহন করেন। আমার প্রথমা স্ত্রীকে দিয়েই আমার মা নববধুকে বরণ করান। যশোদা মাতার আদেশে বেচারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাদের ফুলশয্যার বিছানা প্রস্তুত করতেও বাধ্য হয়। এর পর বেশ আনন্দেই আমাদের দিনগুলা কাটা উচিত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে গোল বাধাল আমার প্রথমা স্ত্রী। একদিন নাচার হয়ে ভরের মুখে আমার প্রথমা স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, 'মা, মা, জানো ও কে? ওই সেই শূর্পণখা। এক্ষুণি ওর নাসিকা কর্তন কর।' জ্ঞান হওয়ার পর আমি আমার উক্তরূপ আদেশ সম্বন্ধে অস্বীকার করি। এদিকে রামচন্দ্রের আদেশে আমার মা, খুড়ামশাই এবং ভক্তবৃন্দ বিব্রত হয়ে উঠেন। কি ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ প্রতিপালিত করা যাবে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের বহুবিধ গবেষণা চলে।

ব্রিটিশ রাজ্যে হঠাৎ একজনের নাসিকা কর্তন সম্ভব নয়। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশও প্রতিপালিত হওয়া চাই। তা না হলে হয় তো তিনি এ গৃহ ত্যাগ করে যাবেন। এতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অবশেষে বধূমাতার [আমার প্রথমা স্ত্রীর] নাসিকার কিয়দংশ নরুণের সাহায্যে একটু চিরে দেওয়াই ঠিক হ'ল। অনেকটা ধর্মীয় নিয়ম রক্ষারই মত উহা করা হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী কিন্তু [নাসিকা কর্তনরূপ] এই সাধু প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। অবশেষে বাড়িসুদ্ধ লোক জোর করে তাকে শুইয়ে ফেলে নরুণ দিয়ে তার নাকের কিয়দংশ চিরে দিলেন। পাড়ার নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সংবাদটি শুনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমার প্রথমা স্ত্রীর পিতা-মাতাকে সংবাদ পাঠান। তেনারা দল বেঁধে এসে প্রথমা স্ত্রীকে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। তারপর এ বিষয়ে তাঁরা পুলিশেও খবর পাঠান। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের এই শেষ লীলারও অবসান ঘটে।"

সকল সময়েই যে এই সব ভর হওয়ার ব্যাপারের মধ্যে বজ্জাতি ব বুজরুকি থাকে তা নয়। অনেক সময় ভাবাবিষ্ট ব্যক্তি সাময়িকভাবে বিশ্বাস করে যে, সে সত্য সত্যই একজন দেবতা। ইহা এক প্রকারের হিষ্ট্রিয়া রোগ মাত্র। এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ দেব বা দেবীর নামের উচ্চাঙ্গের বুলি আওড়ায়। আমরা তাদের ভরগ্রস্ত [inspired] বলি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় উপনীত মানুষ সম্পর্কে আমরা বলি যে তার উপর কোনও দেবতার ভর হয়েছে। সেই ব্যক্তি ভূত-পেত্নী বা ব্রহ্মদৈত্যের নাম নিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করলে ও অন্যভাবে কথা বললে আমরা বলি তাকে ভূতে পেয়েছে [possessed]। আসলে কিন্তু [উভয় ক্ষেত্রেই] উহা একপ্রকার স্নায়বিক রোগ

মাত্র। সাময়িকভাবে কোনও কোনও ব্যক্তি এই রোগে ভুগে থাকে। এই সময় তারা চেতন মনের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের রত্নভাণ্ডার উজাড় করে কথা বলতে থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর এর কোনও কথাই কিন্তু তার আর স্মরণ থাকে না। মনের কতকাংশ মূল মন হ'তে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন [Split up mind) হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। এই রোগ হতে রোগীরা কখনও দিনে একবার বা দুইবার কিংবা কখনও বা সপ্তাহ ভর ভুগে থাকে। উৎসাহ পেলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়। কোনও কোনও রোগী বা রোগিণী সামান্য মাত্র চিন্তা দ্বারা যথন তথন তাদের এই পোষা রোগ ডেকে আনতেও সক্ষম হয়।

এই ধরনের ব্যক্তিদের অন্য ব্যক্তিরা মধ্য-ব্যক্তি বা ভরগ্রস্ত [মিডিয়াম] বলে থাকেন। এই ভরগ্রস্ত বা অনুপ্রেরিত এবং তথাকথিত আবিষ্ট [ভূতাবিষ্ট] ব্যক্তিদের কথাবার্তা প্রায়ই সহজাত বুদ্ধি [instinct] প্রণোদিত হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি প্রবল এবং শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি এই সময় প্রথর হয়ে উঠে। এই সময় এরা দূরাগত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদ বুঝতেও সক্ষম। দূর হতে কাকা বা পিতার জুতার শব্দ শুনে এরা বলে দিয়েছে কাকা বা পিতা আসছেন। কিন্তু এইরূপ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শব্দ অপর কেহ শুনতে পায় নি! সহসা আসা 'হাইপার-সেনসিবিলিটির' কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। বহুদিন অসুখ ভোগ করার পর সাধারণ মানুষও ইহা প্রায়ই উপলব্ধি করেছে। এই সময় তারা নিজেদের মূল মনের অজ্ঞাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে কথা বলতে থাকে। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে দৃষ্ট বহু ব্যক্তিত্ব বা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন মন বা [Split up mind] ইহার কারণ। এই সব ব্যক্তিত্বের [personality]

একটি থাকে জাগ্রত এবং অন্যটি [কিংবা বাকিগুলি] থাকে সুপ্ত। এই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি ব্যক্তিত্ব হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মূল ব্যক্তিত্বটিকে প্রদমিত করে কর্মতৎপর হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। মানুষের এই সুপ্ত ব্যক্তিত্ব অলক্ষ্যে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখে এবং সে যাহা কিছু শুনে বা দেখে তা সে মনে রাখে, যদিও কি'না তার জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় শুনেও শুনে না, কিংবা সে তা দেখেও দেখে না। অর্থাৎ কি'না এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় সে নির্লিপ্তভাবে এড়িয়ে যায়। ভরের সময় উপরের জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি হয়ে যায় সুপ্ত এবং নিম্নের সুপ্ত ব্যক্তিত্বটি হয়ে উঠে জাগ্রত। এই কারণে আমরা সাধারণ ভাবে দৃষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদেরও ভরের মুখে বহু ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনে থাকি। ইংলণ্ডের কোনও এক মুদী রাত্রে উঠে বসে ভাবের মুখে বহু কবিতা লিখত এবং সে কবিতাগুলো বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জনও করেছে। কিন্তু দিবাভাগে সে এই কবিতার "ক"ও সে কখনও লিখতে পারে নি ; কারণ এই সময় সে তার মনে ভাব [Mood] আনতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তি এক সঙ্গে এবং একই সময় দুইটি কাজ সমান ভাবে করে যেতে সক্ষম হয়। এরা একজনের সঙ্গে একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করতে করতে অন্য একটি বিষয় সম্বন্ধে পাতার পর পাতা নির্ভুলরূপে লিখতে পারে। উপরি উক্ত কারণগুলাই এজন্য দায়ী। ভরগ্রস্ত ব্যক্তিদের অপরাধী বলা চলে না। কিন্তু যে সকল ধূর্ত ব্যক্তি জেনে শুনে এই সব রোগীর সাহায্যে ব্যবসা চালিয়ে অর্থোপার্জন করে তারা অপরাধী।

এই সকল গুরু, সাধু, দেবতা বা অপদেবতার কবলে পড়ে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের সর্বস্বান্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। এমন

অনেক বিধবা মহিলাকে আমি জানি যারা তাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি গুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই সকল বকধার্মিকগণ দেশের কত সরল প্রকৃতির সমৃদ্ধ পরিবারের যে সর্বনাশ সাধন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার মতে এই সকল দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করার জন্যে সাধারণ আইনের বহির্ভূত একটি বিশেষ আইন [ordinance] প্রণয়নের সময় এসেছে। একটি 'গুরু অ্যাকট্' প্রণীত হলে আরও ভালো হয়। এই সকল দুর্বৃত্ত বিবিধ পদ্ধতিতে প্রতারণার উদ্দেশ্যে শিষ্য সংগ্রহ করে। সেই সব অপরূপ পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো।

সাধারণতঃ এই সকল দুর্বৃত্ত কতকগুলি প্রচারক পুষে থাকেন। এই সকল প্রচারক ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে স্ব স্ব গুরু বা সাধুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়ান। ভক্তদের সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হয়। নানারূপ বচন-বিন্যাসের সাহায্যে এই সকল প্রচারক বা দালালেরা ভক্তদের মন সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বচন-বিন্যাস উদ্ধৃত করা হ'ল।

"হাঁ মশাই, তাহলে বলি শুনুন। এ মশাই আমার শোনা কথা নয়। আমার নিজের চক্ষে দেখা এসব। আমি তখন দানাপুরের স্টেশন মাস্টার। অফিসে বসে হিসাব মেলাচ্ছি। এদিকে ট্রেনও এসে পড়েছে। আমরা সকলেই কাজকর্মে খুব ব্যস্ত। হঠাৎ বাইরে একটা মহা হট্টগোল শোনা গেল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি যে, সাড়ে সাত ফুট লম্বা এক সাধুকে চার-পাঁচজন অ্যাংলো চেকারে জোর করে ট্রেন হতে নামিয়ে আনছে। এর পর ঐ সাধুবাবা সেখানে কি করলেন জানেন? বলি শুনুন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে

রইলেন। ব্যস্—ইঞ্জিন একেবারে নিশ্চল। আমরা ঘণ্টি দিচ্ছি। ইঞ্জিন সিটি দিতে থাকে। কিন্তু ভোঁস ভোঁস করলেও তা চলে না। বেশ বুঝা গেল সবই সাধুর কীর্তি। সাধুকে টেনে প্ল্যাটফরমের বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রেনটাও চলতে শুরু করে দিল। যাক্! সাধুবাবা তো প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলেন। কিন্তু এসে সেখানে তিনি কি করলেন জানেন? হাঁ বলি শুনুন। সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি দুই হাতের দশটা আঙুল তাঁর লম্বা লম্বা দাড়ির ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে টিকিট বার করতে শুরু করলেন। সেখানে দেখতে দেখতে ভিড়ও জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে তুমি কোথায় যাবে?' উত্তরে লোকটা বললে, 'আজ্ঞে, দিল্লী'। দাড়ির ভিতর আঙুল চালিয়ে একটা দিল্লীর টিকিট বার করে সাধু বললেন, 'লাও।—আর তুমি?' একজন বললে, 'আজ্ঞে—পুরী।' দাড়ির ভিতর হতে আর একটা পুরীর টিকিট বার করে সাধুবাবা বলেন, 'লাও।' এমনি করে কাউকে দিলেন তিনি মোগলসরাই-এর টিকিট, কাউকে বা তিনি দিলেন বেনারসের টিকিট। মথুরা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দার্জিলিং, ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, যে যেখানে যাবে বলে, তাকে তিনি সেইখানকার টিকিট দিতে থাকেন। টিকিট কেউ আর কেনে না। টিকিট ঘর এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন বাধ্য হয়ে এজেন্টকে 'তার' করলাম। সদর হতে এজেন্ট এল, ডি টি এস এল। সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব তো এলেনই। তাঁদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ হ'ল। এর পর এজেন্ট হাতির দাঁতের প্লেটের উপর নিজের হাতে খোদাই করে চারজনের মত একটা পাশ সাধুবাবাকে লিখে দিলেন, তাঁদের মধ্যে যে কেউ কি'না সারা ভারতবর্ষ ইচ্ছা মত ভ্রমণ করতে পারেন।

"এই তো গেল মাত্র একদিনের ঘটনার কথা। আমি আর একদিনের ঘটনা এবার বলবো। এই সময় আমি হেড অফিসে বদলি হয়েছি। দরকারি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখি সেই সন্ন্যাসী। বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে আপ হিঁয়াপর?' কোনও কথার উত্তর না দিয়ে সাধুবাবা টেবিল থেকে কয়েকটি দরকারি সরকারী কাগজ উঠিয়ে নিলেন। আমি 'হাঁ হাঁ হাঁ' করে বলে উঠলাম, 'আরে এ কেয়া করতা মহারাজ! ইয়ে বহুৎ জরুরী কাগজ হ্যায়! ইসমে মেরি নোকরী চলি যায়গা।' আমার কথা শুনে সাধু মহারাজ একটু হেসে নিলেন। কি মিষ্টি সে হাসি। এর পর সস্নেহে একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসিকো বাস্তে নকরী করতি বেটা?' আশ্বস্ত হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'রুপেয়াকে বাস্তে মহারাজ!' —স্বরে সাধুবাবা বললেন, 'কেয়া? রুপেয়াকো বাস্তে? হুঁ—।' এর পর হঠাৎ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে তিনি সেই কাগজগুলা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'লেও।' মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সেই টুকরাগুলা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখি যে, খাস সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমলের টাঁকশালে তৈরি; গরম গরম সিকি, আনি, দুয়ানি, আর আধুলি এধার ওধার গড়িয়ে পড়ছে। এর কতদিন পর আমি চাকুরি হতে পেনসন্ নিয়েছি। তার পরও আরও কতদিন আমার এমনি সুখে-দুঃখে চলে গেছে। এতদিন পর আজ হঠাৎ আমি আবার তাঁর সন্ধান পেলাম। সকালে স্ত্রীকে নিয়ে মর্নিং ওআক করে ফিরছি, হঠাৎ দেখি তিনি একটা ধুনী জেলে গঙ্গার ধারে বসে আছেন। আমাকে ডাক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেয়া বেটা চিনোত

হামা? ভবিয়েত সে ঠিক আছে তো?' কেঁদে উঠে আমি জানালাম, 'সবই ভাল প্রভু। কিন্তু জামাইটা আমার বাঁচে না।' একটু হেসে ঝুলির ভিতর থেকে একটা শিকড় বার করে সেটা আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'সে যক্ষ্মা রোগ ভো? বড় খারাপ রোগ মা। লেকেন এটা তো তাকে খাইয়ে দে'।"

খোদ্ সাধুবাবারা সাধারণতঃ নির্বল অপরাধী হয়ে থাকেন। অর্থাৎ পারতপক্ষে তাঁরা কাউকে আঘাত হানেন না। এমন কি, প্রবঞ্চক রূপে ধরা পড়ার পরও এরূপ কার্য তাঁরা করেন নি। সাধারণতঃ তাঁরা নির্বল ভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্মের নামে গৃহস্থদের অর্থে অলস জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁর দলের এই সব প্রচারকদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা চলে না। এই সব প্রচারকরা সাধারণতঃ গৃহী হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ কেউ এই সকল সাধুবাবাদের স্ব-গৃহে পুষেও থাকেন। প্রচার কার্যে বাধা পেলে ধর্মের নামে তাঁদের প্রায়ই মারপিট করতে দেখা যায়। কোনও এক প্রচারকের উপরি উক্তরূপ প্রচার-কার্যের প্রত্যুত্তরে আমার কোনও এক বন্ধু নিম্নোক্ত রূপ একটি কাহিনীর অবতারণা করেন। এর ফলে ছদ্মবেশী প্রচারকটি মারমুখী হয়ে আমার বন্ধুকে প্রহার করেছিলেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক বিধায় পাঠকদের অবগতির জন্যে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি বলি তবে শুনুন মশাই। আমেরিকার কেণ্ট জার্নালে বিষয়টি বেরিয়েছিল। আমেরিকার এক বড় বৈ ানিক ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটির আবিষ্কারক। যন্ত্রটির মধ্যে একটি বক্না বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দেন তো দেখবেন যে, তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, কাঁটা, নস্তির কৌটা ইত্যাদি, অর্থাৎ কি'না শিং ও ক্ষুর থেকে যা তৈরি হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রের দ্বিতীয় মুখ থেকে বেরিয়ে

আসতে দেখবেন চপ, কাটলেট, ওমলেট, সুপ, অর্থাৎ কিনা মাংস দিয়ে যে সব খাদ্য তৈরি হয়। এরপর এর তৃতীয় মুখটা দিয়ে আপনারা বেরুতে দেখবেন, স্যুটকেস্, মনিব্যাগ, বেল্ট, চামড়ার পেটিমাল্ট্, জুতা বাঁধা ফিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা যে সকল দ্রব্য গরুর চামড়ায় তৈরি হয় এবং এর শেষ মুখটা হতে আপনারা বেরুতে দেখবেন ছানা, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যাদি, অর্থাৎ কিনা যে সকল সামগ্রী দুধ হ'তে তৈরি হয়। আর সর্বশেষে কি পদার্থ বার হবে জানেন? সব শেষে যন্ত্রের তলাকার একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে একটা আস্ত কেঁলে বাছুর, অর্থাৎ কিনা 'নো লস্ অব এনার্জি', এই অদ্ভুত শক্তির কোনও ক্ষয়ই হয় না, বুঝলেন'।"

[এঁরা মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও কালচার অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ করে থাকেন। কারণ—একজন মূর্খ ও অজ্ঞ বা নির্বোধ ব্যক্তির উপর যে কাহিনী প্রযোজ্য তা শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তির প্রতি কদাচ প্রযোজ্য নয়। এ জন্য বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শনগুলি মানুষের 'চিত্ত-প্রস্তুতি' তথা প্রিডিস্পজিশন এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অনুযায়ী তৈরি করা হয়ে থাকে।]

আমি আমার বন্ধুটির নিকট শুনেছি যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি আগন্তুকগণ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং উপভোগ করলেও তার এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি তাঁরা বরদাস্ত করেন নি। এই ভাবে তাঁরা একজন ধর্মগুরুকে বিদ্রূপ করার জন্য বন্ধুর উপর ক্ষেপে উঠেন। আগন্তুকদের মধ্যে একজন ভট্টপল্লীর লোক ছিলেন। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বন্ধুকে বলেছিলেন, 'জানো-ও! ভট্টপল্লীর মধ্যে প্রাপ্ত হ'লে গাত্র হতে তোমার চর্ম স্খলিত করে নিতাম, ইত্যাদি।' এ ছাড়া পণ্ডিত ভদ্রলোকটি তাঁকে নাকি অর্বাচীন, মূর্খ প্রভৃতি

সম্বোধনেও ভূষিত করেছিলেন। এই ধরনের মনোবৃত্তি এ দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য মাত্র। কোনও এক হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে কোনও এক মন্ত্রগুরু বলেছিলেন, 'আমি অমুক গ্রামে থাকি এবং আমার পেশা গুরুগিরি।' হাকিম মহোদয় তাঁর এই উত্তরের ইংরাজি করেছিলেন এইরূপ—'আই অ্যাম্ এ রেসিডেন্ট্ অব্ [সো এণ্ড সো প্লেস] হোয়ার্ আই অ্যাম্ এ রিলিজিয়াস ফ্রড্।' পাঠকবর্গকে আমি কথাটা ভেবে দেখতে বলি। স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। আমি এমন অনেক অল্প বয়স্ক গুরুঠাকুরকে জানি, যে কিনা মুমূর্ষু বা মরণযাত্রী অতি বৃদ্ধ শিষ্য বা শিষ্যদের মস্তকে পা তুলে দিয়েছে। তার উদ্দেশ্য এই মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে এইভাবে স্বর্গে পাঠানো। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ভণ্ডামীর এবং ভণ্ডামী সহ্য করারও একটা সীমা আছে। দেহহীন নর-নারীর কিরূপে স্বর্গ বা নরক ভোগ সম্ভব তা' আজও আমাকে কোনও সাধু বুঝাতে সক্ষম হন নি। বাক্জাল সৃষ্টি করে অজ্ঞ শিষ্য-শিষ্যাদের ঠকাবার ক্ষমতা এদের অসীম। কোনও এক ঠাকুরমশাইকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আচ্ছা, ওই যে এয়ারোপ্লেনটা উড়ছে, ওটা কি একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়? আপনার অলৌকিক গল্পগুলি কি এর চেয়েও আশ্চর্য?' বলা বাহুল্য, অজ্ঞ শিষ্যকে ঠাকুরমশাইয়ের কবল হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করি। ঠাকুরমশাই কিন্তু এতে না দমে শিষ্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দেন, 'ওটা কিই আর ভারি-ই আশ্চর্য! আরে, ওড়বার জিনিস উড়ছে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ওকে তো সৃষ্টি করাই হয়েছে উড়বার জন্যে। ওড়াও তো বাবা ওই চেয়ারটা বা টেবিলটা, কত বড় তোমার বিজ্ঞান দেখি।' এই বিষয়ে অপর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাক।

"কোনও এক ঠাকুরমশাই শিষ্যবাড়ি গিয়ে স্বপাক ভোজন করতেন। কারণ তিনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং শিষ্যরা করেন আমিষ ভোজন। হঠাৎ একদিন আমি এই ঠাকুরমশাইকে একটা মৎস্য হস্তে গৃহে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'এ্যাঁ! এ কি ঠাকুরমশাই? মাছ হাতে যান্ কোথা?' উত্তরে নির্লজ্জের মত ঠাকুরমশাই আমাকে জানান, 'তা বাবা বাড়িতে একটা বিড়াল-শিশু আছে কিনা?' ইত্যাদি। এর কয়েকদিন পর আমি তাঁর এক ধনী শিষ্য সমভিব্যাহারে ঠাকুর-মশাইএর গৃহে এসে দেখি তাঁর উঠানে চার-পাঁচটি বড় বড় মৎস্য বঁটির সাহায্যে কুটা হচ্ছে এবং ঠাকুরমশাই তাঁর অহিংস-নীতি ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বা প্রমাণ স্বরূপ স্বয়ং মৎস্য কুটার তদ্বির করছেন। আমাদের হঠাৎ সেখানে আসতে দেখে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এসো বাবাজীবন, এসো। এ মৎস্য-যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্‌গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তা বাবা প্রসাদাদি পেয়ে যাবে। তোমাদের [শিষ্যদের] আর গাঁয়ের গরিবদের জন্যই যা কিছু সব। আমরা তো আর, হে হে হে—"

বহু সাধুকে বহু ব্যক্তি বাল্যকাল হতে জানেন। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ সাধুদের বিষয় শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এঁরা যে, যে কোনও সাধারণ মানুষ হতে নগণ্য তা তাঁদের পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। কারুর কারুর কাছে এঁদের ঠগী ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় নেই। অথচ তাঁরা স্থানান্তরে আস্তানা গেড়ে নূতন মানুষদের নিকট আসর জমাতে সক্ষম। [এই জন্য বাংলাদেশের এক প্রবাদ—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।] কোনও পরিচিত লোক এঁদেরকে কোনও ভক্তের বাড়িতে চিনে ফেললে এঁরা প্রমাদ গনেন। এ সময় এঁরা তাদের না-চেনার ভান করে

অন্যদিকে মুখ ফিরান কিংবা আড়ালে তাদের অনুযোগ করে তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জানাতে অনুরোধ করেন। কেউ কেউ উৎকোচ স্বরূপ তাঁদের ক্ষমতাসীন শিষ্যদের বলে তাদের বহু উপকারও করেন। এমন বহু গুরু মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের নিম্নে শিষ্য রাখেন না। বহু শিষ্য প্রতি মাসে বা বৎসরে নগদ মূল্যে এঁদের প্রণামী পাঠান। কয়েক ক্ষেত্রে এঁদের বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও উপরে উঠে। অথচ এঁদের আয়কর প্রভৃতি কর দিতে হয় না। এর সবটাই এঁরা জনহিতে বা পূজাতে মিথ্যা করে খরচ দেখান। ঐ অর্থ হতে মাত্র সামান্য অংশ তাঁরা বাৎসরিক উৎসবে শিষ্যদের প্রসাদ বিতরণে খরচ করেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে বাড়তি প্রণামী আদায় করে তা তাঁরা পূরণ করে নেন। এইরূপ ভূমিহীন জমিদারীর উচ্ছেদ এদেশে এখনও সমাধা হয় নি। এঁদের বিলাসী শ্রমবিমুখ মোটর-বিহারী বহু পুত্রকন্যাও আছে। এরা মঠের আয় হতে পুরুষানুক্রমে বা শিষ্য পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহ করতেও সক্ষম। এই সব 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগ'—এই মন্ত্রধারী গুরুরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছেন। কেহ ভগবান রূপে শিষ্য-পত্নীর তুচ্ছ দেহকেও তাঁর পূজার উপকরণ করেছেন। এদের মধ্যে কারুর কারুর পারভারসিটি থাকায় মাত্র নারীর সঙ্গ দ্বারা তাদের যৌন-তৃপ্তি ঘটে। আমি কয়জন নারীকে একদা এক গুরুর উরুদেশ পর্যন্ত হাত দিয়ে টিপতে [পদসেবা] দেখি। আমি এতে প্রথমে কোনও দোষ দেখি নাই। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র ঐ গুরুকে পাদুটো ত্বরিত গতিতে সরাতে দেখে বুঝি যে তাঁর মনের কোথায়ও পাপ ছিল। এইভাবে অনেকে এঁদের বিকৃত যৌনবোধের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ঘটান। তবুও বলবো যে অন্য কোনও নিদারুণ বিপদ হতে এই বিকৃত যৌনবোধী গুরুরা তাদের নারী শিষ্যাদের পক্ষে কম বিপজ্জনক। সৌভাগ্যক্রমে

আজ নারীরাও পুরুষ গুরুদের সাথে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এতে অন্ততঃ নারীদের ঐরূপ বিপদ কমছে। এই সব ঠগী গুরুরা বিপদ বুঝলে ভারতের একাংশ হতে অন্যাংশে বহুকাল আত্ম-গোপন করেন। এঁদের মধ্যে বহু জেল-খাটা বা ফেরার আসামীসহ বরখাস্ত সরকারী কর্মী আছেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে বহু নিরীহ সাধু চরিত্রের ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁরা অলস এবং পরগাছা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এঁদের কেউ কেউ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। মন্ত্রপূত উদকের নামে [জলপড়া] ঠিক মত ঔষধ বিতরণ করেও এঁরা ভক্তের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। আমার চেনা-জানা জনৈক মূর্খ কূপমণ্ডুক যুবকের বাটীতে একদা নিম্নোক্ত রূপ এক সাইনবোর্ড দেখে অবাক হই :

"হিমালয়-প্রত্যাগত তিব্বত-প্রবাসী মহাযোগী। ইনি কাশীতে পুরাণ, নবদ্বীপে ন্যায়, মিথিলাতে বেদ, দাক্ষিণাত্যে যাগ-যজ্ঞ শিক্ষা করেন। তিব্বত বাসকালে এঁর তন্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়। ইনি হস্তরেখা বিশারদ রাজজ্যোতিষী ১৩২ শ্রী শ্রীমৎ ভক্ত প্রবর অমুক। জগতের মঙ্গল কামনাতে ইনি ধ্যানরত আছেন। এখানে কোনও প্রকার বাদ্য বা শব্দ দয়া করে যেন কেহ না করেন।"

এই ভদ্রলোক সিভিল এবং অন্যান্য আদালত সমূহে বাদী ও বিবাদীর নির্ঘণ্ট [লিস্ট] সংগ্রহ করতেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে একজনের অজ্ঞাতে অপরকে আশীর্বাদান্তে ব'লে আসতেন যে উনি ঐ মামলাতে নিশ্চয়ই জয়ী হবেন। এই সময় ইনি এঁদের কপর্দক মাত্র প্রণামী গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে বলতেন যে মামলাতে জয়ী হলে যেন উনি তাঁর আশ্রমের ঠিকানাতে এসে দেখা করেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ হাকিমের রায়েতে জয়ী হতেন। ঐ সময় তাঁরা স্বেচ্ছাতে দেখা না

করলে ঐ মাদুলী-দাতা আশীর্বাদক সাধু কিংবা তাঁর এক শিষ্য তাঁর সাথে দেখা করে প্রাপ্য আদায় করতেন।

মাদুলী ও আশীর্বাদে ও পূজাতে কখনও কখনও ফল লাভ হয়। কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে শতকরা কতো ভাগ উহা সত্য হয়। বলা বাহুল্য, একটি নগণ্য অংশের এই উপকার লাভ একটি দৈব সুঘটন মাত্র। ঐরূপ আশীর্বাদের বহর ব্যতিরেকেও উহা ঘটতে পারতো। [একশো ছাত্রকে 'তোমরা পরীক্ষাতে পাশ করবে' বললে ওদের মধ্যে সত্তর জন নিশ্চয়ই পাশ করে। বাকি ফেল করা ত্রিশ জনের মধ্যে বিশ জন ঐ জন্য প্রবঞ্চকের গৃহে কলহ করতে আসে না। এদের বাকি দশজন অর্থ ফিরত নিতে এলে তাদের বলা হয় যে, তারা পড়াশুনা একেবারে করে নি বলেই ফেইল করেছে। এই ফেইল করা ছাত্ররাও এজন্য খুউব বেশি হুজ্জুত-হাঙ্গামা করে নি।]

এইবার মানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কেন সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে তাহা বিবেচ্য। আমি বহু সুঠাম ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজপুরুষদেরও এদের কাছে অসহায় ব্যক্তির মত হাত জোড় করে বসে থাকতে দেখেছি। কাহারও কাহারও পক্ষে এইভাবে গুরু পোষণ এবং তোষণ একটা শখমাত্র। ইহার বিবিধ চিত্তাকর্ষক কারণ সমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।—

(১) বহু ধনী পরিবারে একটি মোটর গাড়ি, একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর, একটি সুগায়িকা কুমারী কন্যা [নিজের না থাকলে] পালন এবং একজন গুরু পোষণ একপ্রকারের বিলাস মাত্র। বহু ব্যবসায়ী এইগুলির সহিত একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদী রাজকর্মচারীকে নিষ্প্রয়োজনে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কোনও এক কর্মে বহাল করেন। এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা অবশ্য এখনও নগণ্য! তবে এঁদের অস্তিত্ব এই শহরে

আছে। এঁরা এগুলিকে অর্থোপার্জনের আড়কাঠি রূপেও ব্যবহার করেন। এতদ্বারা এঁরা বহু নির্বোধ ব্যবসায়ী এবং রাজপুরুষদের আয়ত্তে আনেন।

(২) বহু দুর্বলমতি লোভী গৃহস্থ এদেশে আছেন। এঁরা সট্‌কাট্‌ দ্বারা স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে জীবনে উন্নতি করতে চান। এই সকল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁদের নিজেদের এবং পুত্রকন্যাদের উন্নতির চিন্তাতে সদা উদ্বিগ্ন। এই সময় বহু ভ্রাম্যমাণ সাধুদের নিযুক্ত আড়কাঠি তাদের সকাশে প্রস্তাব করে—'আরে! আপনি এতে চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছেন। অমুক বাবার কাছে গেলে একটা না একটা পন্থা তিনি বাতলে দেবেন। এমন কতো দরিদ্র লোক ওঁর সংস্পর্শে এসে ধনী হয়ে গেল' ইত্যাদি। এই সকল স্বার্থপর অভাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উপর বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সহজ। [পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উক্ত 'সম্মোহন বিদ্যা' শীর্ষক আখ্যান ভাগ দ্রষ্টব্য।]

এই সকল গুরু বেছে বেছে ক্ষমতাবান রাজপুরুষদের শিষ্য করতে উন্মুখ থাকেন। এদের মাধ্যমে এঁরা রাষ্ট্রীয় শাসন কার্যে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেছেন। এঁদের আশীর্বাদ ভিন্ন বহু অফিসারের প্রমোশন পর্যন্ত বন্ধ হয়। এর ফলে বহু অধস্তন অফিসার ঐ বিভাগীয় কর্তার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ মহাকর্তার অন্যত্র বদলি হওয়া মাত্র তাঁরাও তাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন। অতি উচ্চ পদের কর্মকর্তার গুরু গ্রহণ ও পালন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির চাকুরিতে স্বাভাবিক কারণেই উন্নতি হয়। তবুও আমি এইরূপ এক সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত আবাধ্য-মন্ত্র শিষ্যকে তাঁর ঐ প্রবঞ্চক গুরুকে তিরস্কার করে

বলতে শুনেছি—'আমিই তোকে তুলেছি, আমিই তোকে নামাবো'। এই ভৎর্সনার বাণী শুনে ঐ শিষ্য ঠক ঠক করে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই সব দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও মনের ঐ একটি কেন্দ্রে তাঁরা একপ্রকার পাগল মাত্র। ঐ সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড আঘাত কিংবা যুক্তিপূর্ণ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা এঁরা নিরাময় হন। এঁদের মধ্যে এমন গুরু অন্বেষী ব্যক্তি আছেন যাঁরা পথে-ঘাটে ভিখারীদের মধ্যে গুরু অন্বেষণ করেন। এই সময় [মনোবিকারের] যে কোনও চতুর ব্যক্তি এঁদের গুরু হতে পারেন।

[একজন তান্ত্রিক সাধক দুর্ঘটনা নিবারণ মাদুলী বিতরণ করতেন। কিন্তু, নিজেই একদিন দুর্ঘটনাতে জখম হলেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন—'এতে আমার মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু, কবচের জন্য স্বল্প আঘাতে পরিত্রাণ পেলাম।']

(৩) হঠাৎ শোক ও দুঃখ পেলে মানুষ অস্থির-মনা হয়। এই সময় তাদের চিত্তচাঞ্চল্য চরমে উঠে। কারুর পুত্র, কন্যা বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের উদয় হয়। এ সময় তারা পরলোক সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসু হয়ে উঠে। এ সময় তাদের মনে একটু মাত্রও শান্তি থাকে না। আবেগের মুখে তারা এক স্থানে স্থির হয়ে বসতে পর্যন্ত পারে না। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে পাগল হয়ে লোকে গুরুর কবলে পড়ে। ঠিক এই সময় প্রবঞ্চকরা তাদের মুখে ধর্মীয় মাদকের পাত্র তুলে ধরে।

[এদেশে এক শ্রেণীর সাধারণ দালাল, ইনসিওরেন্স এবং ব্যবসায়ী এজেন্ট আছেন। এঁরা খদ্দের সংগ্রহার্থে বহু ধনী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করার জন্যে লজ ও ক্লাবের মেম্বার হন। ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্যে বহু-শিষ্য-সম্বল গুরুদের মন্ত্রশিষ্য হয়ে এঁরা অন্যান্য ধনী মানুষ

ও সরকারী কর্মীদের গুরুভাই হন। এঁরা জানেন যে ধর্মীয় কারণে এই সকল গুরুভাইগণের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্ব আছে। সাক্ষাৎভাবে সরকারী কর্মীদের উৎকোচ না দিয়ে গুরুকে তাঁদের সমক্ষে অর্থ প্রদান করে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কার্য ঐ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা করিয়ে নিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে গুরুদেবকে খুশি করে তাঁর দ্বারা সুপারিশ করানোও যেতে পারে। বহু বিপথগামী যুবক আছে যারা গুরুভাই রূপে গুরুভগ্নীদের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে তারা গুরুর আশ্রমে ঘন ঘন যাতায়াত করে। অভিভাবকরা রাজি না হলে এরা তাদের উপর গুরুর আদেশ সংগ্রহ করে অসম বিবাহে তাদের সম্মতি আদায় করেছে।]

সাধারণ ভাবে এদেশে এক অন্ধ বিশ্বাস আছে যে গুরুত্যাগ করতে নেই। অর্থাৎ তাদের মতে গুরু কারুর দু'বার হতে পারে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা গিয়ে থাকে। এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূর্ব গুরু ত্যাগ করে অন্য গুরু কাড়তে দেখে আমি অবাক হই ও তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন—'একজন ভালো মাস্টারের কাছে আমি পড়ছি; কিন্তু তার চাইতে ভালো অন্য মাস্টার পেলে কি তাকে আমরা গ্রহণ করি না?' কোনও কোনও ডাক্তারদের মত ঠগী গুরুরাও শিষ্য ভাঙাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে থাকেন।

এই সকল গুরু ও সাধুগণ কতদূর পর্যন্ত সর্বনাশ করতে সক্ষম তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যায়। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ দেশে ফিরে শুনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এক সন্ন্যাসীর

আবির্ভাব হয়েছে। আমার শাশুড়ী, শ্যালিকাদ্বয় এবং সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীও সাধুসেবায় নিযুক্তা। এমন কি, তাদের আহার-নিদ্রারও সময় নেই। প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করা মাত্র আমি এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোনও লোক ত দূরের কথা, আমার নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই না। একদিন শ্বশুরমশাই আমার শিশু শ্যালকটিকে ধমক্ দিয়ে বলছিলেন, 'হতভাগা, পড়াশুনা করছিস্ না, খাবি কি করে?' প্রত্যুত্তরে আমার ঐ শ্যালকটি সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, 'কেন? গুরুগিরি করে?' আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এতটুকু একটি বালকও যা সহজে বুঝেছে, তা আমার শ্বশুর মশায়ের মত জ্ঞানী ও গুণী লোক এবং তাঁর মত অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝছেন না কেন? এরপর আমি ঔৎসুক্যজনিত এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাধুবাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে এইরূপ অভিশাপ দেন, 'নির্বোধ অবিশ্বাসী! শীঘ্রই তোর সর্বনাশ হবে।' এর মাস দুই পরে আমার একমাত্র জামাতা মারা যায়। কন্যা আমার বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসে এবং মাতার নির্দেশে সেও সাধুসেবায় নিযুক্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যেও সকলে আমাকেই দায়ী করে। এর কয়েকদিন পরে আমার মধ্যম পুত্র টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে আমার উপর আরও ভীষণ পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। সকলেরই মতে আমার সাধুবাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। ঐ সাধুবাবা কিন্তু কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন যে, আমি নীচে হ'তে ওপর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সিঁড়ি জিহ্বা দ্বারা চেটে চেটে উপরে উঠে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারেন। সাধুবাবা তখন

ত্রিতলের একটি নিরালা কক্ষে বাস করছিলেন। আমি নিরুপায় হয়ে সর্বশুদ্ধ আটাত্তরটি সিঁড়ির ধাপ জিহ্বার দ্বারা চাটতে চাটতে উপরে উঠি। অপত্যস্নেহে আমি তখন এমনিই অন্ধ যে আমার একবারও মনে হ'ল না যে, সাধু-সন্ন্যাসীর কোপ ব্যতিরেকেও এইরূপ কত দুর্ঘটনা ঘরে ঘরে ঘটে থাকে। আমার এই কৃচ্ছ্রসাধনা বোধ হয় সাধুবাবাকে নিরুদ্বেগ করতে পেরেছিল। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমার গৃহে এসে রুগ্নপুত্রের শিয়রে বসলেন। তিনি আমার স্ত্রীর সাহায্যে আমার পুত্রের চিকিৎসাতে নিযুক্ত সকল ডাক্তার-বৈদ্যকে বিদায় করলেন। অপর কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি আমার পুত্রকে নিরাময় করতে সক্ষম। ভক্তদের সকাশে সাড়ম্বরে তিনি এইরূপ বারতা প্রচার করতে থাকেন। ইন্‌জেকশন্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুত্রের অবস্থা খারাপ হতে আরও খারাপ হতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকে দেখি পুত্রের আমার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। এই দেখে আমি ঐ সময় ক্ষেপে উঠে তখন সাধুকে শুধাই, 'একি ? এ যে শ্বাস আরম্ভ হয়েছে ?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে খেঁকুরে উঠে সাধুবাবা আমাকে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছিস্ না! ওকে নিয়ে হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় হচ্ছে। অর্থাৎ যমে একদিকে টান্‌ছে, আর আমি একদিকে টান্‌ছি।' এরপর আমি বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে সাধুবাবাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেই। এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে আমি দুইটি পরিবারকে রক্ষা করি। পরে জানতে পারি সাধুসেবার ব্যয় বাবদ এক বৎসরের মধ্যে শ্বশুরমশাই-এর বসত বাটীটা পর্যন্ত বন্ধক পড়েছে। নগদ টাকা যা কিছু ছিল, তা তো ওঁর গর্ভে গেছেই, এমন কি ওঁর জমি-জমাগুলো পর্যন্ত নীলামে উঠেছে।"

এইবার কেন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

দৈহিক রোগের ন্যায় মানুষ বহুপ্রকার মানসিক রোগেও ভুগে থাকে। মানসিক রোগ দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কিন্তু মানসিক রোগকে আমরা রোগ রূপে স্বীকার করি না, পুরাপুরি পাগল না হয়ে উঠলে অনেক সময় এই সকল মানসিক রোগ দৈহিক রোগ রূপেও চালু হয়। এই মানসিক রোগের বিষয় রোগীরা পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। দিনের পর দিন মনের মধ্যে একটা নিদারুণ অশান্তি নিয়ে তারা এই রোগে ভুগে। কিন্তু লজ্জায় এই রোগের কথা তারা কাউকে বলে না। এই কথা বলতে পারলে তারা নিরাময় হতে পারতো, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এর ঔষধের সন্ধান মিলত। আমি এমনও বহু রোগীকে জানি যে তার রোগের কথা অপরকে বলার পরেই ভাল হয়ে উঠেছে। এই বলতে না পারাই ছিল তার মানসিক অশান্তির একমাত্র কারণ। অনেকে এই সব মানসিক রোগ স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা সারিয়ে ফেলে। কারও বা পরবাক্-প্রয়োগের [outside suggestion] প্রয়োজন হয়। ব্যর্থ আশা আকাঙ্ক্ষা, দমনীত স্পৃহা বা ইচ্ছা এবং দমনীত [Repressed] ভয় বা দমনীত যৌনবোধের কারণে এই সব রোগের উৎপত্তি হয়। হঠাৎ শোক বা ভয় পেলেও এই সব রোগ এসে থাকে। এই সকল রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ চিন্তা মানুষের অপরাপর চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটি চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। একটির পর একটি চিন্তা তার মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে। এইরূপ

অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। কয়েক ক্ষেত্রে ভগবৎ জিজ্ঞাসাও মানুষের মনকে উত্ত্যক্ত করেছে। মৃত্যুর পরের কথা তারা জ্ঞাত হতে চায়। বহু বৃদ্ধের মন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সান্ত্বনার বাণী কামনা করে। স্ববাক্-প্রয়োগে এই রোগ সারাতে মানুষ অক্ষম হলে অনেক সময় তারা তাদের এই মানসিক রোগের কথা সাধু-সন্ন্যাসীদের বলে বসে; চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলে মানুষ সাধু বা গুরুর কাছে আসে। এই গুরু বা সাধুগণও মানুষের এই সকল দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাল রূপেই অবগত থাকেন। এঁরা তখন নানারূপ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা এই সকস রোগ বা অশান্তি হতে মানুষকে মুক্ত করে দেন। বলা বাহুল্য যে, কোনও আত্মীয়স্বজন দ্বারাও এই কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্দেশের পর রোগী এমনিতেই নিরাময় হয়ে উঠে। এজন্যে সাধু-সন্ন্যাসীর দরকার হয় না। এই ভাবে নিরাময় হওয়ায় পর মানুষ এই সব সাধুদের অত্যন্তরূপ অনুগত হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সব চিন্তারোগ বা অশান্তির পুনরাবির্ভাবও হয়। মানুষ তখন পুনরায় উপকারী সাধুটির কাছে আসে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা ভাইটামিন এবং হরমনের ঘাটতিতেও এরূপ স্নায়বিক ও মানসিক রোগ হয়। কোনও কোনও সাধু বাক্-প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই সব মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন। মানুষের মন এই ভাবে অতি মাত্রাতে অশান্ত হয়ে উঠলে সেই সাধু আবার উল্টা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাকে নিরাময় করে বশীভূত করেন।

বহু ব্যক্তি ম্যাজিকের মারপ্যাঁচ দ্বারাও এই অপকার্য করে থাকেন। ম্যাজিক মাত্রই হাত সাফাই বা কতকগুলি রসায়ন দ্রব্যের মারপ্যাঁচ মাত্র। একথা বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের

জানা আছে। এই ম্যাজিকের সাহায্যে কোনও কোনও সাধু নানারূপ গন্ধ বার ক'রে গন্ধ-বাবা সাজেন। এইরূপ ভেল্কির সাহায্যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়েও কেহ কেহ শিষ্যদের বশীভূত করে থাকেন। শিষ্যদের বশীভূত করার জন্যে সাধুবাবারা আরও একপ্রস্থ এগিয়ে যান। পরপুরুষ সাহচর্যের স্পৃহা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই কম-বেশি বর্তমান থাকে। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ স্পৃহা স্ত্রী মাত্রেরই আদিম স্পৃহা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই আদিম স্পৃহা ত্যাগ করেছে। কিন্তু তা হলেও যে কোনও দুর্বল মুহূর্তে সে এই বিশেষ স্পৃহার কবলে পুনরায় পড়তে পারে। ভয়, ভাবনা, আত্মসম্মান এবং কর্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক স্পৃহা হতে রক্ষা করে। অপরাধ-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং প্রথম খণ্ডে বিষয়টি সম্যকরূপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গুরু-সেবার মধ্যে লজ্জাবোধের কারণ নেই। মেয়েরাও এই সুযোগে তাদের এই সুপ্ত স্পৃহার [গুরুসেবা দ্বারা] উপশম ঘটায়। তবে উহা অবচেতন মনের মধ্যেই অধিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে। বাহিরে বা চেতন মনে উহা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। তবে তাদের মনে এই ইচ্ছা বা স্পৃহা প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শঃ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর। আসলে বাক্-প্রয়োগ এবং অভিনয় দ্বারা সাধু-সন্ন্যাসীরা শিষ্য ও শিষ্যাদের বশীভূত করেন। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প উদ্ধৃত করলাম। এই গল্পটি হচ্ছে আমার শোনা একটি গণ-গল্প। এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলেও এর বৈজ্ঞানিক দিকটা কখনই অবিশ্বাস্য নয়। সাধু বাবাদের প্রচারকগণ [tout] মুখে মুখে এই রূপ বহু গল্প রচনা করে তা রটনা করেন। 'অন্য দিকে সাধুদের

বিপক্ষ পক্ষীয়রাও বহু অনুরূপ গালগল্প সমূহ এতৎসম্পর্কে প্রচার করেছেন।

"অমুক ষ্ট্রিট্ দিয়ে আমি গন্তব্য স্থানে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমি দেখি সামনে এক সাধুবাবা। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি একটা খড়ি দিয়ে রাস্তার এপার হতে ওপার পর্যন্ত একটি*দাগ কেটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভো ভাই সব! মাৎ যাও উধাব। যো উধার যায়েগা উ জল যায়গা!" ঠিক এই সময় একজন পোস্টাল পিওন এসে সেখানে হাজির। মানা সত্ত্বেও এগিযে যাওয়া মাত্র সাইকেল সমেত ছিটকে পড়ে সে কেঁদে উঠল, 'ওরে বাবা জ্বলে গেলাম, ওঃ।' তার হাতের মনিঅর্ডার ফর্ম ও তার টাকা কয়টাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সরকাবী টাকা-কড়ি ও কাগজপত্র রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে সাইকেলে মুহুর্মুহুঃ ঘন্টি দিতে দিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। এর পর খড়ির দাগের ওপারে আর কেউ এগুতে সাহস করে না। দেখতে দেখতে সেখানে প্রায় দুই শত লোকের বিরাট ভিড় জমে গেল। এর কিছুক্ষণ পবে সেখানে এসে হাজির হলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। হাতে তাঁর দধির হাঁড়ি ও সন্দেশের ঝুড়ি। আমরা অনেকেই তাঁকে ওপারে যেতে মানা করলাম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই কারও কোন মানাই কানে নিলেন না। 'যত সব—'বলে তিনি দাগের ওপারে একটি মাত্র পা বাড়িয়েই 'জ্বলে মলুম, জ্বলে মলুম' শব্দে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের দধি ও সন্দেশের পাত্র দুইটিও চুরমার হয়ে রাস্তার উপর ভেঙে পড়ল। এর পর সেখানে এসে হাজির হলেন একজন অ্যাংলো সাহেব ও তাঁর মেম। গট্ গট্ করে এগিয়ে এসে দাগের ওপর পা দেওয়া মাত্র তাঁরাও এক লাফে পিছিয়ে এসে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ মাই গড্, বারনিং সেনসেশন্!' এর পর সাধুবাবা

একটু হেসে দাগটা পা দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, হো গিয়া। আপ লোক যানে শেক্তা আভি।' ততক্ষণে সেখানে প্রায় হাজার দশ লোক এসে জমেছে। এরপর সাধুবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাইল খানেক হেঁটে এসে তাঁর আস্তানায় উঠলেন। সাধুবাবার পিছন পিছন তাঁর আস্তানা পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক লোক এসে গেল। আস্তানার ভিতরকার একটা হলঘরে প্রায় জন দশ-বারো ভক্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে, সাধুবাবার বয়স নাকি একশ সাতান্ন বৎসর। কায়কল্পের দ্বারা নাকি তিনি এত অল্প বয়স্কের মত রয়ে গেছেন। তা ছাড়া ধ্যানে বসার সময় না'কি তিনি মাটি হতে প্রায় ইঞ্চি দুই উপরে উঠেন। এ ছাড়া এঁর কাছে না'কি লর্ড ক্লাইভের লেখা একখানা চিঠিও আছে। চিঠিখানাতে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে 'মাই ডিয়ার ইয়ং সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করে তাঁর কাছে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি। এর পর দেখতে দেখতে হলঘরে সাজানো রেকাবিগুলি সিকি, আনি ও টাকাতে ভর্তি হয়ে উঠতে থাকল।

আমি প্রত্যহই এসে এই সাধুকে একবার করে দর্শন করে যেতাম। এর কয়দিন পরে সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হলো। সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার খুনে আসামী, তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। পুলিশের ধমকে সাধুবাবা মিনতি জানিয়ে বলে উঠলেন, 'কেন স্যার আমাকে দিক্ করছেন? সর্বশুদ্ধ এ কয়দিনে আমার আয় হয়েছে মাত্র সাত শ' পঞ্চাশ। এ থেকে আমাকে সেই পিওনটাকে দিতে হয়েছে দেড় শ' টাকা। খাবার শুদ্ধ পড়ে যাওয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে আমি দিয়েছি আড়াই শ' টাকা। এ ছাড়া সেই সাহেব ও তার মেমসাহেবকে দিতে হ'ল এক'শ করে দুই

শ' টাকা। এই সব খরচ-খরচা বাদে আমার ভাগে পেয়েছি কুল্লে মাত্র দেড় শ' টাকা। হুজুর এবারকার মত ছেড়ে দেন। আসলে আমার কপালটাই হলো মন্দ। তা না হলে একটা মাসও সবুর সইল না, আপনাদের—"

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি হয় তা'হলে বড় বড় ব্যারিস্টার, প্রফেসার, হাকিম এবং জমিদাররা, এমন কি ধুরন্ধর ব্যবসাদাররাও এই সব সাধুবাবাদের ভেল্কিবাজিতে ভুলে যান কেন? এর উত্তরে এইরূপ বলা যেতে পারে: মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি কেন্দ্র বা পয়েণ্ট থাকে। একটি কেন্দ্রে সে মূর্খ রোগী পাগল হলেও অন্যান্য পয়েণ্ট বা কেন্দ্রে সে একজন সহজ বা স্বাভাবিক মানুষই থাকে। যান বিশেষের চাকার অনেকগুলি পোক [poke] বা কাটি থাকে, এর একটি পোক্ কেটে বা ভেঙে গেলেও চাকাটি সমান ভাবেই ঘুরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু-আধটু খট্ খট্ শব্দ হয়, এই যা। এই ভাবে মনের একটি কেন্দ্রে মানুষ দুর্বল থাকলেও তার অপর কেন্দ্রগুলি সবলই থাকে। এজন্য অপরাপর বিষয়ে তাদের সহজ মানুষের মতই দেখা যায়।

এই সকল সাধু-সন্ন্যাসী বা গুরুদেবেরা অনেক সময় বিকল্পের সাহায্যেও মানুষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প দুই প্রকারের হয়, যথা—(১) বহির্বিকল্প, (২) অন্তর্বিকল্প। রজ্জু-সর্প, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের [illusion] দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিকল্প [ভুল দেখা] চক্ষু হ'তে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্য দিকে অন্তর্বিকল্পের [hallucination] মধ্যে কোনও রূপ বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে উহার ছবি মস্তিষ্ক হ'তে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায়

আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। কেহ কেহ এই অবস্থায় স্ব স্ব আরাধ্য 'দেবতার অলীক ছবিও দেখে থাকেন। অর্থাৎ কি'না প্রথম ক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্প বা রজ্জু কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না। অথচ মানুষ ভূলে সর্প দেখে থাকে। তাদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কারণেই এইরূপ ঘটে। এই ধরনের ভুল পরিদর্শনকেই আমরা অন্তর্বিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা মানুষের এই সব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কখনও বাক্‌-প্রয়োগ [suggestion] দ্বারা কখনও বা হাত সাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্বল-চিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি ক'রে নানা রূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতার কারণেও অন্তর্বিকল্পের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনও কিছু চিন্তা করা মাত্র উহার একটি ছবি মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেবতার দুয়ারে হত্যা দিয়ে ঔষধ লাভের বা স্বপ্নদেখার কাহিনী শুনে থাকি—বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকারের অন্তর্বিকল্প মাত্র। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম।

"বৃদ্ধা মহিলাটি পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রায় সাত মাইল হেঁটে আমাদের ঠাকুর বাড়িতে এসে পৌঁছান। এ ছাড়া নিয়ম মত সমস্ত পথ তিনি ভূমি চুম্বন করতে করতে এসেছেন। ঐ সময় পথশ্রমে তিনি অতিমাত্রাতে ক্লান্ত। অতি পরিশ্রমের ফলে পেশীসকল তাঁর অসাড় হয়ে এসেছে। তার উপর তাঁর তিন দিন তিন রাত উপবাস। এই সময় তাঁর মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই সুযোগে চরণামৃতের নামে তাঁকে আমরা মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে দিই। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা মন্দিরের দুয়ারে শুয়ে পড়েন। তিনি

এইভাবে শুয়ে পড়ে হত্যা দেবার পূর্বাহ্ণেই যদি তাঁকে বাক্-প্রয়োগ [suggestion] দ্বারা বলে দেওয়া যায়, যে তিনি এই দেখবেন বা শুনবেন তা হলে স্বপ্নে তিনি সেই সবই দেখেন বা শুনে থাকেন। সাধারণ নিয়মানুসারেই এইরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু পূজারীরা সকল সময়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে শুয়ে পড়লেও এই অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের সহিত একেবারে সম্পর্ক শূন্য হয় না। আমি একজন তথাকথিত জাগ্রত দেবতার পূজারী। তাই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধেও আমি অবগত ছিলাম। বৃদ্ধা হত্যা দিয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি রাত্রিযোগে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি, 'অয়ি বৃদ্ধা, ভয় নেই। তোমার পুত্র নিরাময় হবে। পুকুর পাড়ের সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা শিকড় আছে। সেটি নিয়ে পিষে তাকে খাইও।' চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধার এই সময় অল্পমাত্র জ্ঞান ছিল। চোখ বুজে আমার কথাগুলা শুনার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমরাও যথাস্থানে বৃদ্ধার জন্যে শিকড়টি রেখে এলাম। কোনও কোনও সময় আমরা এই সকল ব্যক্তিদের হাতের মুঠার মধ্যে ঔষধাদি গুঁজেও দিয়ে থাকি। অকস্মাৎ ক্লান্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকারের কারণে আমাদের এই কারসাজি তারা বুঝেও বুঝতে পারে না। বহুক্ষেত্রে আগে-ভাগে সাজেসশন দিয়ে রাখলে বিশ্বাসী লোক তাই স্বপ্ন দেখে। এমন কি অপরে যা দেখেছে বা পেয়েছে বলে সে শুনেছে—তাই সে আশা করে এবং তা সে স্বপ্নেতে দেখে। অনেক সময় স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারাও সুফল ফলে। স্ববাক্-প্রয়োগের [auto-suggestion] কারণে তারা স্বপ্ন দেখে, অমুক জায়গায় গেলে সে একটা কিছু পাবেই। কথিত জায়গায় গিয়ে সে 'যা কিছুই' দেখে, তার মনে হয় 'তাই' যেন সে স্বপ্নে দেখেছে। দ্রব্যটি

সম্বন্ধে অবসাদ-ক্লান্ত দেহে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা মাত্র মনে ধ্রুব বিশ্বাস হয় যে সেই দ্রব্যটিই সে স্বপ্নে দেখেছে। এই কারণে হত্যা দিতে আসা ভক্তদের আশে-পাশে আমরা নানারূপ দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রাখি। হত্যা দেবার পূর্ব হতেই সে ঐ সব দ্রব্য দেখে বটে, কিন্তু মনোবিকারের কারণে উহা তারা সেই সময় দেখেও দেখে না। আসলে ঐ সব দ্রব্যাদির স্মৃতি তাদের অবচেতন মনে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের অবচেতন মন হ'তে সেই সকল দ্রব্যের স্মৃতি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চেতন মনে উপনীত হয়। এই কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা দ্রব্য তার হাতের মুঠার কাছে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ সময়ে বলে উঠে, 'বাবা দেবাদিদেব! দয়া তা হলে তুমি করলে, বাবা।' 'হত্যা দেওয়ার' দ্বারা স্বপ্নাদ্য ঔষধাদি প্রাপ্তির মূল তথ্য আসলে এইরূপই হয়ে থাকে।"

[বহু সাধু স্টেশন হতে বহু দূরে আশ্রম করেন। পথেতে যাত্রীদের মধ্যে বহু ছদ্মবেশী চর থাকে। এরা তাদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য জেনে তা সাধু বাবাকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে এদেরকে আশ্রমে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়েও রাখা হয়েছে।]

এতদ্‌ব্যতিরেকে বহু ব্যক্তি নিজের মনকে ও অপরকে বুঝানোর জন্যে এ বিষয়ে বহু মিথ্যে কথাও বলে থাকে। এগুলিকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল লাইস।

এইবার এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি সত্য হয় তা হলে এই স্বপ্নাদ্য ঔষধাদির দ্বারা সময় সময় মানুষের ব্যাধি আদি নিরাময় হয় কেন? এর উত্তর স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, কদাচ রোগ সারে বটে! কিন্তু তা সারে

কেবলমাত্র বিশ্বাসের কারণে বা মনের জোরে। বিশ্বাস মানুষের স্নায়ু সকল সতেজ করে তুলে। স্নায়ু সকল এইভাবে সবল হওয়ায় দেহাভ্যন্তরের প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কর্মতৎপর হয়ে উঠে—এই কারণে সময় সময় একমাত্র বিশ্বাসের কারণেও মানুষকে নিরাময় হতে দেখা যায়। এছাড়া অধিকক্ষেত্রে মানসিক রোগ সকল দৈহিক রোগ রূপে চালু হয়ে যায়। দৈহিক রোগ বিধায় আমরা দৈহিক রোগের চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফলও পাই না। উদর এবং হৃৎপিণ্ডের রোগের মূলে প্রায়ই মানসিক রোগ থাকে। এই অবস্থায় এই সব মাদুলি মন্ত্র আদি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রোগীদের নিরাময় করতে সক্ষম হয়। এইভাবে চিকিৎসা বিনা অর্থ ব্যয়ে পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনরাও করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার কোন এক প্রতিবেশী বহু বৎসর ধরে শ্বাস [হাঁপানি] রোগে ভুগছিলেন। আমি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাঁর এই রোগের চিকিৎসা করতে মনস্থ করি। একদিন কথোপকথনের সময় আমি তাঁর কাছে একটি অলীক গল্পের অবতারণা করি, 'দেখুন! একজন বড় বৈজ্ঞানিক দুই বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড সংগ্রহ করেন। এই হীরক খণ্ডটি তাঁর গ্রাণ্ড হোটেলের কক্ষ থেকে চুরি যায়। আমি অতি কষ্টে তদন্ত দ্বারা এই মূল্যবান হীরক খণ্ডটি এক পুরনো চোরের নিকট হ'তে উদ্ধার করি। সাহেব তখন খুশি হয়ে আমাকে একটা লালরঙের ঔষধ দিলেন। এই অমূল্য ঔষধ ছিল হাঁপানির। সাহেব বলেন যে, এক শিশি ঔষধের দাম দশ হাজার টাকা। কারণ, এর একটি ফোঁটা এক-একজন হাঁপানি রোগীকে চিরকালের মত নিরাময় করতে সক্ষম। এই ঔষধটি আমি

দুইটি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছিলাম। এই দুইটি রোগীই আশ্চর্য-জনক ভাবে সেরে উঠেছে। ঔষধটি আমি আমার দেশের বাড়িতে রেখে এসেছি। তাতে মাত্র আর একজনকে সারাবার মত ঔষধ আছে। আপনার জন্যে ঔষধটা আমি আনিয়ে রাখব।' বলা বাহুল্য, কাহিনীটি সর্বৈব মিথ্যা ছিল; কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা রীতিমত বিশ্বাস ক'রে আমাকে ঔষধটি আনিয়ে নেবার জন্যে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। আমি আজ নয় কাল হবে, কাল নয় পরশু হবে—এইরূপ স্তোকবাক্য দ্বারা তাঁকে অত্যন্তরূপ উতলা করে তুলি। শেষ বরাবর ভদ্রলোক রেগে গিয়ে আমার এই ইচ্ছাকৃত ভুল বা দীর্ঘসূত্রতার জন্যে আমাকে অনুযোগ করতে থাকেন। শেষে একদিন সত্যই ঔষধটি আমি তাঁকে এনে দিই। ঔষধটি কয়েকদিন সেবন করার পর তিনি সত্য সত্যই সেরে উঠলেন। আসলে কিন্তু একটু মধু কিনে তাতে লাল রং করে ঐ রং করা মধুটুকু একটা দামী বিলাতি শিশিতে ভরে সেটা তাঁকে আমি এনে দিয়েছিলাম।”

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিশ্বাস সকল সময় কার্যকরী হয় না। বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত ঔষধেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, বীজাণু তার আপন কার্য করে যায়। এ ছাড়া শিশুদের এবং জড় [idiot] ও নির্বোধদের উপর এইরূপ বাক্-প্রয়োগ একেবারেই কার্যকরী হয় না। এই স্থলে প্রবঞ্চকগণ ধর্মের নামে এদের শুধু প্রবঞ্চনা ও সেই সাথে হত্যাও করে। বহুদিন পূর্বে আমি কোনও এক গ্রামে “বুড়ো শিবতলায়” বেড়াতে গিয়েছিলাম। বহু লোক সেখানে এসে শিবঠাকুরের মাথায় ডাবের জল ঢালতেন। সেই জল একটা নালা ব'য়ে অদূরের একটি গর্তের মধ্যে জমা হ'ত। দূর-দূরান্তর থেকে মেয়েরা রুগ্ন শিশু-পুত্রদের সেখানে এনে সেই বিল্বপত্র পচা জল তুলে তাদের পান

করাতেন। এর বিষময় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি এবং স্থানীয় ডাক্তারকে এই সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত জানাই। উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন, এর অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে কোনও ফল হবে না বরং নালাটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে গর্তের জল প্রতিদিন বদলানোর ব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে। এ ছাড়া আমি এও লক্ষ্য করি যে অকুস্থলে আনীত শিশুগুলির গলদেশে নানা প্রকারের বহু মাদুলী ঝুলানো রয়েছে। এই তাম্র মাদুলী-গুলি তারা মুখে পুরে সেগুলা জিভ দিয়ে চুষছিল। এর পর আমি ভাল রূপেই বুঝতে পারি যে পল্লী অঞ্চলে শিশু মৃত্যুর হার এত বেশি কেন ?

পল্লীবাসীদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসই এই সব অঘটনের একমাত্র কারণ। এই সব ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কত সহজে তাদের ঠকানো বা জব্দ করা যায়, তা নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বুঝা যাবে।

"আমরা বাল্যকালে গ্রামের কাউকে জব্দ করার জন্যে আমরা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। কালী, কার্তিক বা সরস্বতী পূজার পূর্ব দিনে আমরা একটি কালী মাতার বা কার্তিকের বা সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি কিনে এনে আমাদের শত্রুদের বাড়ির উঠানে রাত্রি যোগে রেখে আসতাম। এই সব লোকেরা আমাদের এজন্য সন্দেহ করে গাল দিত বটে, কিন্তু কর্জ করেও এই সকল প্রতিমার তারা পূজার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ত।

এ ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারাও আমরা প্রতিবেশীদের ঠকিয়েছি। আমাদের মধ্যে একজন দাড়ি ও পরচুল পরে কসাই সাজত। তার সঙ্গে থাকত একটা নিটোল বকনা গাভী। এদিকে আমরা মিথ্যে করে রটিয়ে দিতাম যে কসাই লোকটা জবাই করবার

জন্য গাভীটি নিয়ে যাচ্ছে। এই বলে আমরা পল্লীবাসীদের নিকট হতে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ঐ গাভীটিকে কসাই-এর কবল হতে মুক্ত করবার জন্যে চাঁদা স্বরূপ ষাট-সত্তর টাকা আদায় করেছি। আমাদের পাঠাগারের জন্যে পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজনেই এই ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থাদি আমরা সংগ্রহ করতাম। কারণ আমরা জানতাম যে, ধর্মের নামে অকাতরে অর্থ দিলেও জনহিতকর কার্যের জন্যে কখনও একটি পয়সাও এরা দান করবে না। এ ছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের অনুকরণে পরচুলা পরে সাধু সেজে আমরা কাউকে সন্তান হবার জন্যে, কাউকে বা রোগ হতে নিরাময় করবার জন্যে মাদুলী বিতরণ করেও প্রচুর অর্থ উপায় করতাম।

বিদ্যাটা বাল্যকাল হতেই আমি অভ্যাস করেছিলাম। তাই এই বিদ্যার দ্বারাই আমি সংসার-যাত্রা নির্বাহ করি! দেখুন, স্যার! অমুক ধনী ব্যবসায়ীকে আমি গুণে বলে দিয়েছি যে সে তার অপহৃত দ্রব্য ফিরে পাবে। দেখুন না আপনি মশাই, যদি দয়া করে তদন্ত করে আপনারা চোরের সন্ধান করে দ্রব্যগুলি উদ্ধার করতে পারেন। আমার রোজগার-পত্র একেবারে কমে গেছে। এখন আমি কি করব বলুন, মশাই; ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে চুরিটা তো আর করতে পারি না। এ্যাঁ, ও আপনি কি বলছেন? আমি মা কালীর সঙ্গে কথা কই কি'না? তা ওকথা সকলকে বলতে হয় তাই বলি। আপনি আসল বিষয় সবই বুঝতে পারছেন। তান্ত্রিক সাধু সেজে কয়েকটি মড়ার খুলি যোগাড় করে আসন না-বানালে লোকে ভয় পাবে কেন? অনেকে যে ভয় পেয়েই বেশি প্রণামী দেয়। তারা ভাবে প্রণামী কম দিলে মা কালীর ভূত-পেত্নীরা হয়ত তাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে, ইত্যাদি।

এর আগে কিছুদিন আমি নবদ্বীপে এসে বৈষ্ণব সাধুও সেজে-ছিলাম। কি উপায়ে ব্যবসাটা আমি প্রথম সেখানে শুরু করি সেই সম্বন্ধে বলছি। শুনুন! নবদ্বীপের কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন আমি কেঁদে উঠি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদতে কাঁদতে আমি বলতে থাকি, 'এ কি-ই মূর্তি-ই। এ কি-ই আমি দেখছি-ই ইত্যাদি।' সেই সময় সেখানে অনেকগুলি ভক্ত নবনারী উপস্থিত ছিলেন। আমার কপালের শ্বেত চন্দনের ফোঁটা ও লোহিত বস্ত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বলে-উঠলেন, 'কে বাবা তুমি? এ্যা? এ যে রাজপুত্তুর।' বলা বাহুল্য, আমার চেহারাটি ছিল ঠিক ননীর পুতুলের মত। এ ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতে আমি ইতিমধ্যেই নাম করেছিলাম; এর পর আমি সুললিত স্বরে নাম গান করতে করতে গৃহাভিমুখে চলতে থাকি এবং আমার পিছন পিছন চলতে থাকেন অসংখ্য দেবভক্ত নরনারী। ব্যবসাটি সেখানে আমার বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় এক নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় আমি হঠাৎ একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পঞ্চমুণ্ড আসনধারী মহাযোগী পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু হয়েছি। এই পদ্ধতিতে সুবিধা অনেক, এমন কি, স্ত্রী সম্ভোগ ও মদ্যপানেরও।

এইবার কি উপায়ে আমরা হাত দেখি বা প্রশ্ন গণনা করি, সেই সম্বন্ধে বলি, শুনুন। আমাদের কাছে বহু প্রকারের লোক আসে, যথা বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। এদের আমরা অতি সাবধানে চিনে নিই। অবিশ্বাসী লোকদের আমরা আদপেই আমল দিই না। এদের আমরা পাপী ব'লে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিই। কিন্তু বিশ্বাসী লোকদের আমরা আদর করে কাছে ডাকি। এমনি নানা কথাবার্তা

এবং যত্ন আয়ত্তির মধ্যে সে নিজের অসতর্কতাতে নিজেদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলে। কিন্তু পরে তাদের এই সব কথা প্রায়ই স্মরণ থাকে না। উত্তেজিত মন ও বিভুলতার কারণেই ইহা ঘটে থাকে। এর পর অন্য কথাবার্তার দ্বারা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর তার কাছ থেকে কথায় কথায় বার করে নেওয়া কাহিনীগুলিই হাতের রেখা গণনার ছলে তাকেই আমরা শুনিয়ে দিই। একটা দারুণ উদ্বেগ এবং উত্তেজনা তাদেব মনের মধ্যে সব সময়ে বিরাজ করার জন্যই আমাদের এই চালাকি তারা ধরতে পারে না। সাধাবণতঃ শোকতাপ বিপদগ্রস্ত বা অভাবী অন্নক্লিষ্ট ও লোভী লোকেরাই আমাদের কাছে এসে থাকে। এই কারণে তাদের মনকে নানা উপায়ে চঞ্চল করে পূর্বাহ্ণেই তাদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটি মাত্র কাহিনীর কিছু জেনে নিলে বাকি কাহিনীটুকু বা তাদের পরবর্তী কাহিনীগুলি অনুমান করে নেওয়া খুবই সহজ। কারণ জীবনের একটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে থাকে। একটি ঘটনার সহিত অপর একটি ঘটনার প্রায়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। ধরুন, প্রতি মাসে আমাদের কাছে গড়ে একশ' জন ভক্ত আসে। এদের মধ্যে আমাদের পনের জনকেই খুশি করতে পারাটা কি আমাদের সুনামের পক্ষে যথেষ্ট নয়! এই পনের জন আমাদের কি সুনামই না যত্রতত্র গেয়ে বেড়ায়? কোনও লোক আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বেশভূষা ও চালচলন পরিলক্ষ্য করি। এই বেশভূষা ও চালচলন থেকে আমরা বুঝে নিই যে সমাজে তার স্থান কোথায়। সে একজন ব্যবসায়ী, চাকুরে বা জমিদার, তা থেকে সহজেই বুঝা যায়। তার বয়স ও শরীরের গঠন দেখে আমরা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত কিংবা সে

কি প্রকৃতির লোক তাও বলে দিতে পারি। পরিবার ভারাক্রান্ত লোকের চেহারই হয় আলাদা। এ ছাড়া মানুষের ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, দুঃখ ও অভাবাদির পৃথক পৃথক রূপ আছে। মানুষের মুখে চোখে এই সব রূপ প্রশ্ন করার সময় তীব্রভাবে ফুটে উঠে। সাধারণ মানুষের অগোচর এমন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরিবর্তন তাদের মুখে দেখা যায় যা ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষদেব চোখে অতি সহজে ধরা পড়ে। প্রশ্নেব মধ্যেও মানুষ তার নিজের অসতর্কতায একটা সূত্র ধরিয়ে দেয। এই সব সূত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনেকেব অনেক পূর্বকাহিনী বলে দিতে সক্ষম। গোলমাল বুঝলে আমি ভক্তদের জানিয়ে দিতাম, 'আচ্ছা কাল মাকে [মা কালীকে] জিজ্ঞাসা করে আপনাকে জানাব।' ইত্যবসরে আমার সহকারী চেলারা ছদ্মবেশে পাড়া ঘুরে তাদের সম্পর্কে বহু সংবাদ আনে। অনেক সময় আমরা মিথ্যা করে ভক্তদের ভয় দেখিয়েছি, 'দেখুন! শীঘ্রই আপনার একটা বিপদ আসছে—এমন কি জীবনহানিরও সম্ভাবনা আছে।' এইরূপ বাক-প্রয়োগের কুফল সুদূবপ্রসারী হয়। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা মানুষ রোগগ্রস্তও হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আমরা যাগ-যজ্ঞ বা মাদুলী বিতরণ করে বেশ কিছু অর্থও ভক্তদের কাছ হ'তে পেয়ে থাকি। কারুর উপর ক্রুদ্ধ হলে তার নামে উল্টা তুলসী দেব এইরূপ ভয় দেখিয়ে তাদের আমরা জব্দও করে থাকি। ভক্তদের মনে বিশ্বাস আনবার জন্যে আমবা নানারূপ উপায় অবলম্বন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পন্থার কথা বলি, শুনুন।

গতকল্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার কাছে তার ভাগ্যের ফলাফল জানতে এসেছিল। আমি একটা পৃথক কাগজে 'জবা ফুল, এই কথাটি লিখে কাগজটি তারই মুঠার মধ্যে গুঁজে দিই। এর পর

তাকে আমি একটা ফুলের নাম করতে বলি, বিশেষ ক'রে যে ফুলটা কি'না সে বেশি পছন্দ করে। লোকটা উত্তর দেয়, 'জবা'। আমি তখন কাগজটা তাকে খুলে দেখতে বলি। সে কাগজের মোড়ক খুলে দেখে যে তাতে 'জবা'ই লেখা রয়েছে। এদিকে তার অলক্ষ্যে আরও দুই-চার টুকরা কাগজে যথাক্রমে মল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের নাম আমি লিখে রেখেছিলাম। যদি সেই লোকটির উত্তর হ'ত 'গোলাপ' তা হলে তার হাতের মোড়কটা ক্ষণিকের জন্যে স্পর্শ করে হাত সাফাই-এর দ্বারা গোলাপের মোড়কটা তার হাতে গুঁজে দিতাম। ঐ সময় 'জবা' লেখা মোড়কটা আমি অলক্ষ্যে সরিয়ে নিতাম। সাধারণতঃ মধ্য-বয়স্ক ধর্মপ্রাণ লোকেরা জবা ফুল এবং যুবকেরা গোলাপ ফুলই প্রথম মনে করে। বহু দিনের অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ জেনেছি। এইভাবে লোকের মনের মধ্যে প্রথম হতেই বিশ্বাস উৎপাদন করে ধর্মের নামে তাদের আমরা ঠকিয়ে থাকি।"

এই সব ব্যক্তিগত অপরাধ ছাড়া ধর্মের নামে দলগত অপরাধও দেখা যায়। এদেশে অনেক মঠ ও আশ্রম কার্যক্ষম সুস্থদেহ যুবকদের আটকে রেখে দেশের পুং শক্তিকে [Man power] খর্ব করে। এই সকল শক্তিমান যুবক সেইখানে অলস-ভাবে পরগাছার ন্যায় জীবনযাপন করে। এই সকল মঠেও দুই শ্রেণীর যুবক দেখা যায়, যথা—(১) ব্রহ্মচারী এবং (২) অধিকারী। যে সকল যুবক অবিবাহিত, তাহাদের বলা হয় ব্রহ্মচারী। এদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না। কোনও যুবক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আপন স্ত্রীকে চির জন্মের মত ত্যাগ করে এলে তাদের বলা হয় অধিকারী। যে দেশের মেয়েদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ সেই দেশে এই 'অধিকারী' প্রথা কিরূপ ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমেয়। আমার

মতে এই অধিকারী প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা উচিত। এইরূপ আইন প্রণয়ন দ্বারা আইনকারগণ অনেক সতী-লক্ষ্মীর শুভেচ্ছাই লাভ করবেন। পূর্বে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথাও প্রবর্তিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানকালে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে। যার সুযোগ দ্বারা দেশের যুব-শক্তিকে ধর্মের নামে ঘরছাড়া করে যারা তাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থে অলস জীবন যাপন করে তাদের অপরাধী ছাড়া কিছু বা আর বলা যেতে পারে। সহস্র সহস্র যুবককে মঠে ও মন্দিরে এইভাবে আটকে রেখে অকেজো করে দিলে কি জাতিকে দুর্বল করা হয় না? এ সম্বন্ধে দেশবাসীর অবহিত হ'য়ে চিন্তা করা উচিত যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজশক্তির ধর্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে কিনা?

[হিমালয়ের উপর ভারতীয়দের একটা দুর্বলতা আছে। তাই সাধুরা প্রায়ই হিমালয় প্রত্যাগত রূপে নিজেদেরকে প্রচার করেন। এ ছাড়া এঁরা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার স্থান রূপে নবদ্বীপ কাশী কাঞ্চি ও মিথিলাদির নাম করে থাকেন।]

পর প্রবঞ্চনা অপেক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনা অধিকতর ক্ষতিকর। অন্যান্য প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে 'সাধারণ-প্রবঞ্চনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। আমরা ধর্মের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনাই ক'রে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

"কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক সাধক মহাপুরুষের প্রাসাদতুল্য ভবনে তাঁকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি গমন করি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাই সাহেবকে তাঁর জনৈক শিষ্যের বয়স্থা কন্যাদের নিয়ে হৈ-হল্লা করতে দেখি। বিষয়টি পরিলক্ষ্য করে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। তখন সাধুপুরুষকে দর্শন না

ক'রেই আমি প্রত্যাগমন করি। ঘটনাটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাধু-পুরুষের কোনও এক শিষ্য আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে! ঐ দেখেই আপনি চলে এলেন! ঐ তো সেই কাল-ভৈরব। আপনাকে বাধা দেবার জন্যে ওখানে বসে রয়েছে। এই সব মিথ্যা মায়া দ্বারা আপনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দেবে, যাতে আপনি আর এগুতে না পারেন। কিন্তু এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেই তো আপনাকে সাধু সন্দর্শনে যেতে হবে। সাধুসন্দর্শন কি আর সকলের ভাগ্যে হয় মশাই? সকলের ভাগ্যে তা হয় না, এ ব্যাপারে পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই।"

জানি না এর চেয়েও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভাল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে আর আছে কি'না? ধর্ম-প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যাভাষী [pathological lies] করে তুলে এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ সজ্ঞানে তার আরাধ্য গুরু বা দেবতাদির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়ায়। সব সময় সে ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা বলে তা নয়। মিথ্যা বলতে তাদের একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়। এই মিথ্যা বলার প্রলোভন একরকম মানসিক রোগ। কখনও কখনও এরা পুনঃ পুনঃ চিন্তার দ্বারা মনের একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়। তখন তারা পূর্বেকার প্রকৃত তথ্য [সময়ের ব্যবধানে] ভুলে গিয়ে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি ঘটনা বোধ হয় তাদের চক্ষের সামনেই ঘটেছে—যদিও কি'না সেই সকল ঘটনা কখনও ঘটেনি বা তা ঘটতে পারে না। ইহাও একরকম আরোগ্যযোগ্য মানসিক রোগ। অনেকে আবার এই ধরনের মিথ্যা বলে আত্মতৃপ্তিও লাভ করেন এবং এইরূপ মিথ্যা না বলে তাঁরা মনে শান্তিও পান না। এ ছাড়া মানুষের স্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটলে তার সাধারণ বুদ্ধিরও বিলোপ

ঘটে। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে ভালরূপেই বুঝা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও একপ্রকার সাময়িক মনোবিকার। এই সম্পর্কে নিম্নের চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"বন্ধু বীরুবাবুর মুখে অমুক পল্লীতে এক পাহাড়ীবাবার আবির্ভাবের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে এলাম। একটা গোটা দ্বিতল বাটী ভাড়া ক'রে শিষ্যাদিসহ তিনি সেথায় জাঁকিয়ে বসেছেন। সঙ্গে আছে একটা ছোট জ্যান্ত শুল বাঘ এবং গোটাকতক বিষাক্ত গোখুরা সাপ। একজন মেমসাহেব টাইপিস্টও এদের সঙ্গে আছেন। রীতিমত এত্তালা পাঠিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। এও শুনলাম তাঁর কামরায় দুই তিনটা রেডিও ফিট্ করা হয়েছে। এই রেডিওগুলির একটির মারফৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অপরটির মারফৎ শয়তানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলে, ইত্যাদি। বহু ব্যারিস্টার, উকিল, জমিদার প্রভৃতি জ্ঞানী ভদ্রলোকও সেখানে আনাগোনা শুরু করেছেন।

গোপনে শুনতে পেলাম, ইতিমধ্যে পাহাড়ী যোগী অর্থের বিনিময়ে শয়তানি বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তদের বেছে নিয়ে তাদের একপ্রকার অদ্ভুত মন্ত্রও বিতরণ শুরু করেছেন। এই মন্ত্রের দুইটি বিপরীত গুণ সম্পন্ন শক্তি আছে। যথা: নেগেটিভ্ ও পজেটিভ্। উহাদের নর্থ পোল ও সাউথ পোলের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। এ মন্ত্র নিজের স্ত্রীর কানে কানে বললে সে পরের হয়ে যাবে এবং পরের স্ত্রীর [পরস্ত্রীর] কানে কানে বললে তাকে আর কেউই ঘরে রাখতে পারবে না। ঐ নারী সতীসাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্রের অধিকারীর অঙ্কশায়িনী হবে। আমি এরপর ছদ্মবেশে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা! নিজের স্ত্রীর কানে-কানে মন্ত্রটি বললে তো সে তৎক্ষণাৎ অপরের হয়ে যাবে। ও অবস্থায়

তাঁকে কি আর ফিরানোর কোনও উপায়ই থাকবে না?' পাহাড়ী যোগী একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, পারা যাবে। কিন্তু অনেক পরে। অর্থাৎ কি'না সে পরস্ত্রী হবার পর তবে তাকে ফিরানো যাবে।' এই সময় পরস্ত্রী বিধায় তার কানে কানে মন্ত্রটি পুনরায় উচ্চারণ করলে সে আপনার [পূর্ব স্বামীর] কাছে ফিরে আসবে। ব্যর্থ প্রেমিকদেরই সাধুবাবা এ ভাবে অত্যন্ত রূপ আয়ত্তে এনে ফেলেছলেন। এঁদের তিনি কন্যা বিশেষকে বশ করবার জন্যে বহুশত টাকার মাদুলী ও ঔষধাদিও বিতরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে সাধুবাবার এক সাকরেদ [স্থায়ী শিষ্য] সাধুর এক নবাগত ভক্তের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন এবং ভক্তটি নিরুপায় হয়ে পুলিশে নালিশ জানালেন। প্রায় দুই মাস পরে ভক্ত মহিলাটি কলিকাতায় ফিরে এসে জানালেন যে, তিনি ইচ্ছা করে গৃহত্যাগ করেন নি। তাঁকে কোনও এক মন্ত্রশক্তি দ্বারা গৃহত্যাগ করানো হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মরক্ষার কারণেই তিনি এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করেছিলেন। এর পর একদিন প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে ট্যাক্সি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। এই ট্যাক্সি ভাড়াটা অবশ্য সাধুবাবাই দিয়েছিলেন। জামীনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সাধুবাবা ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, ডেপুটি সাহেবের স্ত্রীর দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্যেই তিনি ইনেস্‌পেকটারকে পাঠিয়ে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে বে-ইজ্জতের বদলে তাঁর মান-ইজ্জত আরও বেড়ে যায়। এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাধুবাবা শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থান ত্যাগ করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এক জায়গায় বেশি দিন প্রতারণার ব্যবসা চালান সম্ভব নয়। ইহার পূর্বে কিন্তু মন্ত্রটি আমি সাধু-

বাবার নিকট হতে জেনে নিয়েছিলাম। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে উহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। কোনও এক বিশেষ সময় ও ক্ষণে নাকি উহা উচ্চারণ করা উচিত, 'হুঁ ক্রীং হুঁ ক্রীং হুং ক্রীঙ হুম্ হাম্ হুম্ হ্রীঙ ইত্যাদি।' এর চেয়ে আজগুবি ও লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?"

এই সকল সাধকগণ লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা আগন্তুকগণ তাঁর কাছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা প্রথমে অবগত হয়ে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক আশ্রমে এসে দেখি সেখানে উৎসব শুরু হয়েছে। রুপার সিংহাসনে মূল্যবান সিল্কের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে গুরুদেব বসে আছেন। তাঁর দুই বুক পকেটে দুইটি স্বর্ণ নির্মিত ঘড়ি ঝুলায়মান। তাঁর দুই হাতেও দুইটি হীরক ও মুক্তা খচিত স্বর্ণ ঘড়ি। এ ছাড়া তাঁর ভেলভেট আবৃত দুইটি জুতার উপরও দুইটি ছোট ঘড়ি আঁটা রয়েছে। কেউ কেউ এ জন্য এঁকে ঘড়িবাবা নামে অভিহিত করতেন। ডান হাতে তাঁর একটি হস্তী দন্তের ছড়ি ও বাম হাতে তাঁর চন্দন কাষ্ঠের মালা। এই সময় এক ভক্ত এসে তাঁকে একটি রৌপ্য ঘড়ি উপহার দিলেন। রুপার ঘড়িটি নিয়ে শিশুসুলভ সরলতা সহ উৎফুল্ল হয়ে গুরুদেব বললেন, 'আরে বেটা! এত ঘড়ি হামি কি করবে? আচ্ছা! হামারটা তুই লিবি আর তোরটা হামি লিব।' এই কথা বলে গুরুদেব তাঁর ডান হাতের মুক্তা ও হীরক খচিত স্বর্ণ ঘড়িটি খুলে ভক্তকে তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। ভক্ত কিন্তু এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। বহুক্ষণ যাবৎ বাদানুবাদের পর

এই বিষয়ে ঐ ভক্তেরই জয় হ'ল এবং গুরুদেব রুপার ষড়িটাও বিনাশর্তে গ্রহণ করতে রাজি হলেন। গুরুদেবের নির্লোভ নিস্পৃহতা পরিদর্শন করে সমাগত ভক্তবৃন্দের মস্তক ভক্তিতে নুইয়ে পড়ল। বিষয়টি ধীরভাবে পরিলক্ষ্য করে আমি একটি মতলব মনে মনে এঁটে নিলাম। আমি সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশ হতে একটি মোষের সিঙ দিয়ে তৈরি ছড়ি কিনে এনেছিলাম। বলা বাহুল্য, ছড়িটি আমার খুব শখেরই ছিল। পরদিন ঐ ছড়ি সমেত ঐ আশ্রমে এসে গুরুদেবের পদতলে ঐ ছড়িটি রেখে ভক্তি গদ গদ স্বরে তাঁকে উহা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম। আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করেছিলাম যে এবার গুরুদেব আমার ছড়িটি গ্রহণ করে পরিবর্তে তাঁর হাতির দাঁতের ছড়িটি আমাকে দান করবেন। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে! আমি দুইটি ছড়ি কি করবে? আচ্ছা, আমি তাহলে এক কাজ করবে। এই হাতে একটি লিবে আর এই হাতে একটা লিবে। কেমন? এই ভাবে আমি যে আমার ছড়িটা হারাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সত্যকার ভক্তরা অবশ্য আমার এই সৌভাগ্যে বরং ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল।"

এই সকল সাধুগণ প্রায়ই গরিব শিষ্যদের নিকট দুই-তিনটি মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করে উহা লাখপতি শিষ্যদের দান করেন। ইহা কিন্তু মাছ ধরার চারের মত এক প্রকার চার ফেলা; কারণ, তাঁরা জানেন ঐ বড় লোকেরা এরপর অধিকতর মূল্যবান দ্রব্য তাঁদের দান করবে। এই জন্য তাঁরা সব সময় বড় লোকদের দান করে নির্লোভী দাতা সাজেন। স্বার্থ না থাকলে গরিবদের এঁরা কম ক্ষেত্রেই দান করেছেন। এমন গুরুপ্রবরও আছেন যাঁকে অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারা পিতা রূপে পূজা করলেও তাদের মধ্যে একজন সুন্দরী নারী তাঁকে

পতিরূপে সেবা করে থাকেন। এই শ্রেষ্ঠা ভক্ত নারীদের মধ্যে বিধবা, সধবা ও কুমারীও দেখা গিয়েছে। ঐ নারীরা স্ত্রীরূপে গুরু-পূজা করেন বলে এঁরা সর্বদা গুরুর পার্শ্বের আসন প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। এ'ছাড়া এমন বহু বামাচারী সাধু আছেন, যাঁদের একাধিক পত্নী গ্রহণ বা বামা রক্ষণেও আপত্তি নাই। এতদ্ব্যতীত গৃহী-গুরুর ভণ্ডামীও পুরুষানুক্রমে এদেশের লোকেদের সহ্য করতে হয়েছে। এই সকল গুরু পরিবারে ভাই-ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ার পর জমি-জমার ন্যায় শিষ্যদেরও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নিয়ে থাকেন। অপর দিকে এমন বহু মঠ-মন্দিরের অধিকারী আছেন যাদের হাতি রয়েছে। এঁদের অনেকে সরকারী বনভূমি জোরপূর্বক দখল করে মঠ করেছেন। নানাবিধ কর এড়িয়ে ধর্মের নামে এঁরা স্বার্থসিদ্ধ করেন। এঁরা ঘোড়া, প্রাসাদ, জমিদারী ও বহু ধন-রত্নের মালিক। এঁদের ভোগ-বিলাসের সীমা নাই। তবে এঁদের অনেকের বিষয়-সম্পত্তি পুত্রগণ ভোগ না করে তা তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর প্রধান চেলা ভোগ করে থাকে। তবে এজন্য ঐ চেলাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের মত গুরুসেবা করতে হয়েছে। এদের কেউ কেউ পথ-ঘাট দখল করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে সেখানে বসে গিয়েছে। কেউ কেউ প্রাচীর গাত্রে "প্রাচীর বাবা" লিখে ঐ স্থানের দখলীকার।

এই সকল ধন-ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ আধ-পাগল সাধকের বেশে দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি পীঠস্থানে ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করে থাকেন। হঠাৎ কোনও ভক্তমন্য ব্যক্তিকে ওখানে আসতে দেখলে তাকে তাঁরা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, 'ওরে তুই বাবা এসেছিস? আজ বিশ বৎসর ধরে তোকে যে আমি খুঁজছি।' এই একটি বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চ-করা দুর্বলমতি ভক্তের গুরু হয়ে উঠে।

বাক্-প্রয়োগ লোভী সরলপ্রকৃতির ব্যক্তিদের কতদূর পর্যন্ত নির্বোধ ক'রে তুলতে পারে তা উপরের কাহিনীসমূহ হতে বুঝা যাবে। অধুনা যুগে ধর্মকে একটি বিরাট অসংস্কৃত পুরানো দীর্ঘিকার সহিত তুলনা করা চলে। নূতন অবস্থায় ঐ দীর্ঘিকা গ্রামবাসীদের প্রাণস্বরূপ ছিল। কিন্তু সেই দীর্ঘিকাই শত বৎসর পরে সংস্কারের অভাবে মজে গিয়ে সেই গ্রামবাসীদের ধ্বংসের কারণ হয়। মনে হয় দীর্ঘিকাটি না থাকলে হয়তো গ্রামে আধিব্যাধির প্রকোপ এতটা বেশি হ'ত না। বহু ধর্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এই কারণে যুগে যুগে পৃথিবীতে পুরানো ধর্মকে সংস্কার দ্বারা যুগোপযোগী করে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাবার জন্যে এক-একজন মহাপুরুষ এসেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান যুগ অবতারের যুগ নয়। বর্তমান যুগ হলো বৈজ্ঞানিক যুগ। এই যুগে অবতারের আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নেই। আজিকার এই গণতান্ত্রিক যুগে অবতারের স্থান নেই। বর্তমান যুগে কোনও কাজ একার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। পূর্বেও তা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক ধর্মমতগুলির যদি কেহ সত্যকার রূপ দিয়ে থাকেন তো তা দিয়েছেন এই সব অবতারের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁর সংগঠন-কার্যে অভিজ্ঞ পরিশ্রমী জ্ঞানবান শিষ্যমণ্ডলী; তাঁদেরই সমবেত চেষ্টায় অধুনা দৃষ্ট প্রধান ধর্মমতগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমার মতে ঋক্‌বেদীয় ঋষিদের ন্যায় ভারতের মনীষিগণেরও যথা সম্ভব একত্রে সমবেত হয়ে যুগোপযোগী করে স্থানীয় ধর্ম-মতগুলির সংস্কার সাধন করা উচিত *।

* বৌদ্ধ ধর্ম কাউন্সিলের অনুকরণে।

[বহু গুরু উচ্চপদী সরকারী কর্মীদের শিষ্য করে নেন। ফলে অধীনকর্মীদের প্রমোশনের আশাতে তাঁদের শিষ্য হতে হয়। 'আমিই তোকে তুলেছি। আবার আমিই তোকে নামাবো'—এই বলে তাঁরা উচ্চপদী শিষ্যদের ভয় দেখান। কথিত আছে যে গুরু গ্রহণ করে তাকে আর পরিত্যাগ করা যায় না। এর উত্তরে বলা হয় বেশি ভালো মাস্টার পেলে কম ভালো মাস্টারকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে।]

ভগবান বুদ্ধদেব পরিলক্ষ্য করেছিলেন যে "মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বর আছেন কি'না এবং কি উপায়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায়"—এই অলীক চিন্তাতে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কোনও কাজ সে করে না। এই কারণে তথাগত আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "অযথা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে সময় নষ্ট করো না। পৃথিবীতে যখন এসেছ তখন তোমার একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত জীবের কল্যাণকর কার্য করা।" ভগবান বুদ্ধদেব এই কারণে তাঁর ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেন নি। এই জন্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তগণ ভুল বুঝে তাঁকেই [বুদ্ধদেবকে] কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন। জগতের অপর আর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মূর্তি পূজার অসারতা উপলব্ধি করে তাঁর কোনও মূর্তি না গড়বার জন্যে ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য পাছে কেহ বাতিল করা দেব-দেবীর পরিবর্তে তাঁরই মূর্তিপূজা করতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় তাঁর কোনও ভক্ত পীর প্রভৃতির মূর্তি পূজা না করলেও তাঁদের কবরে পূজা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব-জাতির মধ্যে সমন্বয় আনবার জন্যে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ পরবর্তী যুগে তাঁর উদার প্রেমধর্মকে রাধা-কৃষ্ণের

প্রেমে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে ধর্ম বিকৃত হয়; এই বিকৃত ধর্মমতগুলি মানুষের উপকার না করে অপকারই করে। কোনও কোনও মন্দিরে স্নানযাত্রার পর বিগ্রহের গাত্র-বর্ণ বারি স্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যায়। এই সময় পূজারিগণ রটিয়ে দেন দেবতার ব্যাধি হয়েছে। বিগ্রহকে পুনরায় রঞ্জিত করার জন্য কালক্ষয় করার কারণেই পুজারীরা এইরূপ রটিয়ে থাকেন। কিন্তু দেবতার নামে এইরূপ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? সকলে জানেন হিন্দুরা মূর্তিপুজা করে না। মূর্তিটিকে সাময়িকভাবে তারা ঈশ্বরের আসন বা প্রতীক মনে করে মাত্র। "প্রাণম্ বিমুচ্যতে" মন্ত্রটি উচ্চারণের পর উহার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আর থাকে না, উহাকে তখন সামান্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডই মনে করা হয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর উহাকে পুনরায় আমরা দেবতার আসন বা প্রতীক মনে করি। ইহাই যদি হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মমত হয় তাহলে পূজারীদের এইরূপ মিথ্যা প্রচার কি প্রতারণা নয়? এই বিকৃত ধর্মমত সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গত বৎসর বসন্তকালে আমি অমুক গ্রামে কিছুদিনের জন্যে স্থান পরিবর্তন করি। একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় নদীর ঘাটে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমি অবলোকন করি। ঘাটের চত্বরের উপর একটি ছোট চৌকির উপর বসে জনৈক কথকঠাকুর কথা বলছিলেন,—আলোচ্য বিষয়টি ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদরের মধ্যে অর্জুনের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। কথকঠাকুর সুর ক'রে ক'রে বলে যাচ্ছিলেন, 'অ-আ-আ, সেই শিশুর পেটের ভিতর আমি কি দেখলাম? আমি সেখানে দেখলাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, কীট-পতঙ্গ, তক্তপোষ, তাকিয়া, খাটি-য়া-য়া' ইত্যাদি।. অবাক

হয়ে পরিলক্ষ্য করলাম যে ঠাকুর মশাই-এর এই সব কথা শুনে মহিলা শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই সকল দুর্বলচিত্ত জননীদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করার পর কথকঠাকুর ঐ সভাতে বলে চললেন তাঁর নিজের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। একদিন নদীর ওপারে এসে তিনি না'কি দেখলেন ভীষণ ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে আছে ঝঞ্ঝা, ঘুর্ণি ও বাত্যা। কি ক'রে পার হবেন তখন তাই তিনি ভাবছিলেন। এমন সময় এক ধীবর-বালক নৌকা বেয়ে এসে তাঁকে জানালে যে জমিদারের আজ্ঞায় কথক ঠাকুরকে সে আনতে এসেছে। ওপারে নেমে পিছন ফিরে কথক ঠাকুর দেখলেন সেখানে সেই বালক বা তার সেই নৌকা নেই। জমিদারবাবু এ সব কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি এই দুর্যোগে কাউকেই পাঠাতে পারেন নি ইত্যাদি। এই পর্যন্ত বলে কথকঠাকুর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন, 'প্রভো! তুমি দেখা দিয়েও দিলে না' এবং এই সঙ্গে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও সীমা নেই? এভাবে ধর্মের নামে এইরূপ প্রতারণা আর কতদিন এদেশে চলবে? এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ঐ কাহিনী ঐ সভাতে বলার পূর্বে তিনি চোখ বুজে পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন।"

উপরি উল্লিখিত বিবৃতিদাতার সহিত আমরাও একমত। ধর্মের নামে এই সকল প্রতারণা বন্ধ করার সময় এসেছে। মূর্তিপূজা করার জন্যে আমরা নিন্দনীয় নই। মূর্তি পূজার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সার্থকতা আছে। এই সব প্রতারকদের সহ্য করার জন্যে আমরা নিন্দনীয়। যারা গাছ পাথর ও সাপ পূজা করে

তাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। অপরদিকে একেশ্বরবাদীরা মূর্তিপূজা করার জন্যে না বুঝে আমাদের মধ্যযুগীয় মানুষ ভাবে। অপর দিকে যারা নাস্তিক বা শূন্যবাদী তারা একেশ্বরবাদীদের পাগলামীর কথা চিন্তা ক'রে অবাক হয়। মানুষ অদ্যাবধি বহু দেবতার ন্যায় এক ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারে নি। একটি ঈশ্বর থেকে থাকলে বহু ঈশ্বরই বা থাকবে না কেন? এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ তো কোনওটিরও নেই। এই সব চিন্তা ক'রে আমাদের পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ নেই। বরং শূন্যবাদ, একেশ্বরবাদ হ'তে আরম্ভ ক'রে সাধারণ মূর্তিপূজার পদ্ধতি পর্যন্ত এই ধর্মে স্থান পেয়েছে—এই জন্যে এই ধর্মকে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্রী ধর্ম মনে ক'রে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। এ বিষয়ে এদের সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু জেনে শুনে ধর্মের পোশাক পরিহিত শত শত প্রতারকদের প্রতিদিন বরদাস্ত করার জন্যে আমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? কিছুদিন পূর্বে কোনও এক বালিকার অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ রূপে কোনও এক মহিলা আশ্রমের পুরুষ সেক্রেটারি বালিকাটিকে দুষ্টা নামে অভিহিত করলে প্রত্যুত্তরে বালিকাটি বলেছিল, 'হাঁ, আমি স্বীকার করি আমি দুষ্টা। কিন্তু আমি দুষ্টামী করি সাদা কাপড় পরে। আপনার মতন রঙিন কাপড় পরে আমি দুষ্টামী করি না। আপনি গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড় পরে আসুন। আমিও আপনার সঙ্গে দুষ্টামী করব এবং এ বিষয়ে আমি কোনও আপত্তি করব না। আপনিও ইচ্ছা মত দুষ্টামী করতে পারেন। সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রঙিন কাপড় পরে ও কাজ করতে আপনি পারেন না।' সহায়সম্বলহীনা

দরিদ্রা অশিক্ষিতা বালিকাটির এই অভিমত সম্বন্ধেও 'আমি এদেশের সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমরা কাউকে গোপাল দেবতাকে [বিগ্রহ] নিজের শিশু মনে ক'রে তাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দেখলে তার সেই বাৎসল্য ভক্তির রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। ঈশ্বরকে যদি পিতা বা বন্ধুরূপে পূজা করা যায়, তাহলে তাঁকে সন্তান রূপেও আরাধনা করা সম্ভব। কিন্তু আমরা বিগ্রহ সেবার অধিকারী হবার জন্যে দুই ভাইযে বিরোধ করতে দেখলে সত্য সত্যই অবাক্ হই। আমার মতে মানুষের আত্ম-প্রবঞ্চনার ইহা একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেব-বিগ্রহের নামে প্রদত্ত সম্পত্তির লোভে এদেশে নরহত্যার নজীরও আছে। কেউ কেউ দেবতার সম্পত্তির অছিরূপে সেই সম্পত্তি নানা অছিলায় আত্মসাৎও করে থাকেন। বড় বড় মন্দির ও মঠের নামে জনসেবার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ প্রদত্ত হয়েছিল। তখন মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পুস্তকাগার, অনাথ আশ্রম ও পান্থশালা। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দিরে প্রদত্ত অর্থ হ'তে সুপরিচালিত হবে, সেকালের বহু বদান্য রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাদের ইহাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সকল লোভী ভণ্ড গৃহী বা সন্ন্যাসীদের কবল হতে এই সকল সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের ভার স্বহস্তে নেবার কি সময় আসে নি? পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাগণ আজ পর্যন্ত জীবিত থাকলে তাঁরা দেবসেবায় প্রদত্ত তাঁদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি সকলের এবম্বিধ দুর্দশা পরিলক্ষ্য ক'রে নিশ্চয়ই এই সব দেবালয়ের বর্তমান অধিকারীদের বিপক্ষে আদালতে মামলা রুজু করতেন। দেববিগ্রহের নামে আদালতে মামলা রুজু হতে কিংবা দেবতাকে স্বয়ং আদালতে প্রতিনিধিত্ব [Representation] দ্বারা

মামলা দায়েব করতে দেখলে সত্যই আমরা লজ্জিত হ'য়ে উঠি। তথাকথিত দেববিগ্রহ যেন একজন জন্মগত নাবালক মাত্র [Perpetu. l Minor]। এরূপ নির্লজ্জ আত্মপ্রবঞ্চনার কি শেষ নেই? আমার মতে এই দেবসেবা প্রথা যদি বহাল রাখারই প্রয়োজন হয় তাহলে দেবতার নামে প্রদত্ত এই সব সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার [উদ্দেশ্য-প্রতিপালনের] ভার ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। ধর্ম যখন এদেশের রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গলের জন্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বিভাগ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি দেশবাসীদের চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

[ধর্মের নামে নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীনির্যাতনের দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। এক ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অপর ধর্মাবলম্বীদের বিদ্বেষের কথাও শুনা যায়। এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র সর্বধর্ম সমন্বয় দ্বারা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সকল ধর্ম পুস্তক হতে সার সংগ্রহ করে একটি পৃথক ধর্মপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বৌদ্ধ মঠ, মন্দির মসজিদ এবং গীর্জা প্রভৃতির স্থাপত্য একত্র করে তৈরি করতে হবে উপাসনালয়। সেখানে মানুষ তুলনা মূলক ধর্ম আলোচনা দ্বারা উপকৃত হবে। ঐ আলয়ে শুধু রাখতে হবে বিবিধ ধর্মসম্পর্কীয় পুস্তক। কেবল মাত্র এই ভাবে এই মহাসমস্যার সমাধান হতে পাবে।

প্রবঞ্চনা

প্রবঞ্চনা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়, যথা—সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র সাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বলা হবে। [প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণ প্রবঞ্চনার সংজ্ঞা দেখুন।] এই সাধারণ প্রবঞ্চনাকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা- আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা। একমাত্র পরপ্রবঞ্চনাকেই আমরা আইনানুসারে অপরাধ বলি। মানুষ যখন নিজে নিজেকে ঠকায় তখন তাকে আমরা বলি আত্মপ্রবঞ্চনা। আমার মতে আত্মপ্রবঞ্চনা প্রকারান্তরে আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। এই বিবৃতিটি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"—ও কথা আর বলেন কেন মশাই! আমি এবং আমার দুঃখিনী স্ত্রী, উভয়েই আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি। জানেন তো, বিবাহের দেড় বৎসর পরই জ্যেষ্ঠা কন্যাটি বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে, উপরন্তু আমাদের বিধবা পুত্রবধূটিও ঘরে। বালিকাদ্বয়ের দুঃখ মনে হলে বুক ভেঙে যায়। ওরা যখন মাছ বা মাংস খায় না, তখন আমরাই বা তা খাই কি করে! তাই এই গব্যঘৃতটুকু কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আর খোকার ডালনার জন্যে এইগুলোও কিনতে হলো। যা হোক ক'রে মুখে দুটো অন্ন তো দিতে হবে।"

উপরের দুঃখের কাহিনীটুকু যিনি আমাকে শুনাচ্ছিলেন, তিনি

আমারই এক পুরাতন বন্ধু। তাঁর ঘরের সব খবরই আমরা জানতাম। তাঁর স্ত্রী এ বৎসর আর একটি কন্যা প্রসব করেছেন। গত বৎসর তাঁর একটি পুত্রও হয়েছে, যদিও কি'না ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে উঠেছে। এদেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী বিধবা অবস্থায় তাঁর পুত্রবধূ ও কন্যাটি সামান্য থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন কাটালেও ভদ্রলোকটির এবং তাঁর স্ত্রীর বেশভূষার কোনও অভাব আমি কদাচিৎ দেখেছি। আসলে ভদ্রলোক এই সুযোগে বাড়িতে আমিষ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বাঁচাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 'মশাই! আপনি কি মনে করেন যে মানুষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া আর কোনও ক্ষুধা নেই? জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী দোঁহেমুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন। তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য আপনাদের ভালই থাকবে। এজন্য আপনাদের দুঃখ করবার কোনও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ যুক্তিসঙ্গত ভাবে এরূপ আমি মনে করি।'

উপরের এইসব উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্ম' বঞ্চনার স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। এই আত্মপ্রবঞ্চকদের সহিত দুঃখ-বিলাসীদের প্রভেদ আছে। দুঃখ পাওয়াই যাদের বিলাস বা আনন্দ তাদের বলা হয় দুঃখবিলাসী। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে এ কথাটুকুও বলা চলে না। আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের দুর্বলতাজনিত নানারূপ অসুবিধা ভোগ ক'রে দুঃখ পায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা এখনও আমি হারাই নি। অন্তরে অন্তরে প্রতিটি মুহূর্তে আমি আমার পুনর্বিবাহ কামনা করি।

কিন্তু দুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে ! এই ভেবে আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই না। যদিও কিনা আমার বর্তমান বয়স মাত্র আটাশ। মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই—'পাগল ! প্রিয়তমার স্মৃতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি ? ছিঃ, এ ছাড়া বাচ্চা দুটোর কি হবে ? ওদের যে কষ্ট হবে এতে ইত্যাদি।' এদিকে কিন্তু আমি গোপনে অন্য নারীর সঙ্গ কামনাও করেছি। ওদিকে আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী, বড় জায়ের অবর্তমানে বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর নবলব্ধ কর্তৃত্বের অবসান আশঙ্কায় এ বয়সে (?) আমাকে বিবাহ করতে দিতেও নারাজ। এতে না-কি তাঁর পুত্রবৎ প্রতুল [অর্থাৎ আমার পুত্র] কষ্ট পেতে পারে। আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা, ও ভ্রাতৃবধুকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিই ; কিন্তু মুখে আমি সকলকে বলি 'না থাক্, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে ইত্যাদি।' আসলে আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃবধু—এই তিনজনেই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করে আসছিলুম।"

এই আত্মপ্রবঞ্চনা একটি সামাজিক অপরাধ। "সামাজিক অপরাধ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। এক্ষণে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় "পরপ্রবঞ্চনা"। এই আত্মপ্রবঞ্চনা এবং পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে "ধর্মীয় প্রবঞ্চনা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পরপ্রবঞ্চনা যৌনজ এবং অযৌনজ, এই উভয় উপায়েই সংঘটিত হয়। প্রথমে পরপ্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

পরপ্রবঞ্চনা

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—(১) একক প্রবঞ্চনা ও (২) ব্যাপক প্রবঞ্চনা। একক পদ্ধতিতে মাত্র একজন বা দুইজন বা ততোধিক ঠগী প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট থাকে। এতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে অপর কোনও ব্যক্তি এই অপকর্মে জড়িত হয় না। কেহ যদি কাহাকেও সোনা বলে পিতল গছিয়ে দেয় তাহলে সে প্রত্যক্ষভাবে মাত্র একজনকেই ঠকিয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক প্রবঞ্চনা আছে যা কিনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রবঞ্চনার এই ব্যাপক পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে নিম্নের দৃষ্টান্তটুকু প্রণিধান করুন।

"'ক' বাবু একজন তৈল ব্যবসায়ী। তিনি খাঁটি তিল তৈলের নামে অধিক মূল্যে বাদাম তৈল মিশ্রিত তিল তৈল গছিয়ে দিলেন। এর পর 'ক' বাবু অপর আর এক ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবুকে উচিত মূল্যে এই খাঁটি তিল তৈল [বাদাম তৈল মিশ্রিত] বিক্রয় করলেন। এই ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবু, তথাকথিত এই খাঁটি তৈল বিক্রয় করলেন এক সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবুকে। এর পর এই সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবু খাঁটি তৈলের নামে মিশ্রিত তিল তৈল জনসাধারণের নিকট বোতলে পুরে বিক্রয় শুরু করলেন। [ভেজাল তেল ব্যবহারে ক্রেতাদের মাথার চুল উঠে টাক পড়লো।] এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বাবু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে এই প্রতারণারূপ অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। এই কারণে উপরি উক্ত ঠগী ব্যাপারীর

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা ব্যাপক প্রবঞ্চনা বলে থাকি। এই ক্ষেত্রে একের অপরাধে বহু লোককে অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হতে হয়।" [দুঃখের বিষয় রক্ষীকুল এদের শেষ ব্যক্তিকে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ের অপরাধে ধরপাকড় করেন। এ বিষয়ে এই ব্যক্তির উপব ঐ ভেজাল দ্রব্যের হেপাজতী প্রমাণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করেন। কিন্তু তার বিবৃতি মত পূর্বাপর ব্যক্তিকে সন্ধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এর ফলে এই মহাপাপ কোনও দিনই নিশ্চিহ্ন হয় নি।]

এই সকল বহুদূরস্পর্শী অপরাধ সকলকে আমরা ব্যাপক অপকাষ বলে থাকি। প্রবঞ্চনার ন্যায় অন্যান্য বহু অপরাধের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এমন অপরাধও আছে, যে সকল অপরাধ কোনও এক পুরুষ, তাঁর [বা তাঁদের] জীবিত অবস্থায় করেন। কিন্তু পরবর্তী পুরুষগণকে তাঁদের ঐ স্বার্থান্ধ আত্মসর্বস্ব পূর্বপুরুষের অপকর্মের জন্যে পরম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কেবল মাত্র জীবিত মানুষদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন তৈরি হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়দের ভাবীকালের কথা বাদ দিলেও বর্তমান কালেও আমরা এই শ্রেণীর নানারূপ ব্যাপক অপরাধ দেখতে পাই। পিতামাতার ভুলের জন্য সন্তানদের শাস্তিভোগের দৃষ্টান্তও এদেশে দেখা গিয়েছে। রাজা বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধের কারণে দেশশুদ্ধ লোকের অধোগতির দৃষ্টান্তও এ দেশে বিরল নয়। রোগগ্রস্ত অসৎচরিত্র পিতার অপরাধে পুত্রদের ভোগান্তির বিষয়ও এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। এই সকল বিবিধ ব্যাপক অপরাধ সম্বন্ধে "ব্যাপক অপরাধ" শীর্ষক একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করব।

যে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহার পিছনে থাকে কোনও

একটি বিশেষ কারণ—বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহাকে কার্যকারণ বলা হয়। হঠাৎ একটি বৈদ্যুতিক পাখা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে একজনের মৃত্যুর কারণ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে উহা দুর্ঘটনা মনে হলেও উহা কোনও না কোনও ব্যক্তির অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে ঘটে থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি বা কোম্পানি ঐ পাখা তৈরি করেছে, কিংবা যে মিস্ত্রি ঐ পাখা ছাদের সহিত সংযুক্ত করেছে, সেও ঐরূপ এক দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী হতে পারে। এই ধরনের অপরাধকেও সঙ্গত কারণে ব্যাপক অপরাধ বলা চলে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে মাত্র পরপ্রবঞ্চনার একক অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই বিশেষ পরপ্রবঞ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি-গুলি সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে তথা জগতে পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" প্রণেতা মহাপণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুশর্মা। শ্রীবিষ্ণুশর্মা-কথিত পরপ্রবঞ্চনার একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই পদ্ধতিটি হতে পরপ্রবঞ্চনার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগশিশু ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন। কয়েকজন ঠগী-চোর এই ছাগশিশুটি প্রবঞ্চনার দ্বারা অপহরণ করতে মনস্থ করল। তারা তখন সেই ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনের পথের এক এক জায়গায় এক-একজন পৃথক পৃথক ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এরা এমন ভাব দেখায় যেন এদের কেউ কাউকেও চিনে না। এরপর প্রথম ঠগী ব্রাহ্মণের পথ অবরোধ করে জিজ্ঞেস করল, 'একি ঠাকুরমশাই! এই কুকুর ছানাটা নিয়ে চলেছেন কোথায়?' ছাগশিশুটিকে এই ভাবে কুকুর ছানারূপে অভিহিত করায় ব্রাহ্মণ প্রথম ব্যক্তিকে তার এবম্বিধ ব্যবহারের জন্যে গাল দিয়েপুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুদূর

চলে এসে তিনি দ্বিতীয় ঠগীটিকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণকে দেখে দ্বিতীয় ঠগীটি অবাক হওয়ার ভাণ করে জিজ্ঞেস করে উঠে, 'অপনার এই কুকুর ছানাটা কত দিয়ে কিনলেন ? এ ভাল জাতেরই কুকুর হবে। আমার পূর্বে একটি কুকুর বিক্রির ব্যবসা ছিল' ইত্যাদি। দ্বিতীয় ঠগী ব্যক্তির কথায় ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ জাগে। ছাগটিকে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে পুনরায় তিনি পথ চলতে থাকেন। এব পর পথে ঐ তৃতীয় ঠগীটির সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয়ঠগীটি ব্রাহ্মণকে শুনিযে অপর আব ব্যক্তিকে বলছিল,'দেখ দেখ ! ঐ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখ, কুকুর নিযে চলেছেন। কলির ব্রাহ্মণ !' তৃতীয় ঠগীর এবম্বিধ বাক্যে ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তিনি ছাগটিকে কিছুক্ষণের জন্তে রাস্তায় নামান এবং তারপর তাকে তুলে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে তাঁর দেখা হয় চতুর্থ ঠগীটির সহিত। চতুর্থ ঠগীটির ঐরূপ কথায় ব্রাহ্মণ আর পুরাপুরি অবিশ্বাস করতে পাবলেন না। তাঁব মনে হয় কি জানি হয়ত কোথায একটু গোলমাল আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছাগ শিশুটিকে ছাগ শিশুরূপে বুঝেও কুকুর ছানা বিধায় পবিত্যাগ করে স্নান সমাপনে ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে গৃহে ফিরেন।"

উপরি উক্ত কাহিনীটি গল্পচ্ছলে বর্ণিত হলেও উহা হ'তে বাক্-প্রয়োগের [Suggestion] অত্যদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। অধিক ক্ষেত্রে বাক-প্রয়োগের সাহায্যে প্রবঞ্চকগণ অপকর্ম করে থাকে কিন্তু বাক্‌প্রয়োগের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এবং তা যত্রতত্র হামেসাই হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা যাক্।

"আমার কাছে পাড়ার একটি ছেলে এসে ধরে পড়ল, ঐ বৎসর

তাদের সরস্বতী পূজার জন্য চাঁদা দিতে হবে। এদিকে টাকাকড়ি যা কিছু আমার ব্যবসার ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়—এই বিশেষ তথ্যটি ছেলেটির ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলেটির পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে, আমি দোকানের ম্যানেজারের নামে নিম্নোক্তরূপ একটি পত্র লিখে ছেলেটির হাতে তা দিই।

প্রিয় অমুকবাবু, বা তাঁর ম্যানেজার ইত্যাদি—

* * * *

আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠাচ্ছি। এর হাতে পাড়ার পূজার চাঁদা স্বরূপ ৫৲ টাকা দিয়ে দেবেন। ইতি—স্বাক্ষর—'অমুক বাবু'।

এদিকে ঠগী ছেলেটি পত্রের শিরোনামটুকু ফুটকি চিহ্নিত অংশ বরাবর সুঠামভাবে বিচ্ছিন্ন করে, নিম্নের অংশটি পৃথক পৃথক খামে ভরে খামের উপর আমার বহু কুটুম্ব আত্মীয়ের নাম লিখে সেই আত্মীয়দের নিকট পত্রটি দেখিয়ে পাঁচ টাকা করে আদায় করে। এর পর প্রবঞ্চকটি আমার এক আত্মীয়ের হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে পত্রের পিছনে (Paid Rs. 5/-) 'পাঁচ টাকা দিলাম' এইরূপ লিখিয়ে নিয়ে কায়দা মাফিক পত্রটি ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। এর পর রবারের সাহায্যে পত্রের পিছনের "পাঁচ টাকা দিলাম" লেখাটি মুছে ফেলে চিঠিটি অপর আর একটি খামে ভরে আমার অপর আর এক আত্মীয়র কাছে তিনি উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, প্রবঞ্চকটির আমার বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের নাম ও ঠিকানা জানা ছিল। কথার মার-প্যাঁচ দ্বারা প্রবঞ্চকটি অনায়াসে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে টাকা আদায়ের পর পত্রটি এই ভাবে ফেরত নিতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বশেষে এই প্রতারক যুবকটি আমার দোকানেও যায় এবং তার

প্রাপ্য টাকা কয়টা আদায় করে ঘরে ফিরে। প্রায় ছয় মাস পরে কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে আমার এক আত্মীযের নিকট বিষয়টি জেনে আমরা উভয়েই অবাক হযে যাই। এর পব অনুসন্ধান দ্বারা অন্যান্য আত্মীয ও বন্ধুদের নিকটও ঐ একই কথা শুনে আমি অবাক হই। কিন্তু আমি প্রতারক যুবকটির আর কোনও সন্ধান পাই না।"

সাধারণ প্রবঞ্চনার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি প্রবঞ্চনার পদ্ধতি উদ্ধৃত কবলাম। কলিকাতা শহরে এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রায়ই গৃহস্থদের দ্রব্যাদি অপহবণ কবে থাকে।

"দশটা পনেব মিনিটের সময় আমাব স্বামী অফিস রওনা হযেছেন। এব ঠিক দুই মিনিট পরেই লোকটা এসে আমাব সঙ্গে দেখা করে বলে,—'দেখুন, অমুকবাবু আমাকে পাঠিযে দিলেন। এই ওঁব সঙ্গে দেখা হল মোড়ের মাথায়; উনি অফিস যাচ্ছিলেন। উনি বললেন, তাঁর শালখানা রিপু করার জন্যে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে। আমার শাল রিপু করার দোকান আছে, মা! বাবুব অফিসের দপ্তবী বদ্রুদ্দীন আমার বড় ভাই। বাবু বলে দিলেন, যে, মা হোক বা মিতু দিদি হোক, যার কাছে হোক চাইলেই হবে।' আমার ছোট মেয়ের নাম 'মিতু'। মিতু নামটা শুনে লোকটার কথা আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া বদ্রুদ্দীন নামটাও আমার শুনা ছিল। লোকটা কদিন ধরে ওৎ পেতে সুড়ুক সন্ধান করেছে এবং আগে ভাগেই খুকীর নামটা জেনে নিয়েছে। কিন্তু তা আমি সেদিন সন্দেহ মাত্র করতে পারি নি। আজ্ঞে, হাঁ মশাই, আপনার সে কথা ঠিক। আমরা প্রায়ই খুকীর নাম ধরে ডেকে থাকি। বাইরে থেকে কারও পক্ষে তা শুনা অসম্ভব নয়। যাই হোক, লোকটাকে বিশ্বাস করে দামী শালটা তাকে আমি দিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় উনি বাড়ি ফিরে সব

কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং আমাকে ভৎ´সনা করেন। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি যে লোকটা একটা প্রবঞ্চক। সে মিথ্যা ছলনা দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে দামী শালটা হস্তগত করেছে।”

এইরূপ অপরাধ সম্পর্কীয় অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

“আমার পুত্র সান্ধ্যভ্রমণে বার হবার কয়েক মিনিট পরই তার সমবয়স্ক এক বালক আমার নিকট এসে বললে, ‘মা! রাজেন্ আমার সহপাঠী। সে একদিনের জন্য আমার ইতিহাসের নোট বইটা চেয়ে এনেছিল। আমার বাবা এক্ষুণি সেটা আমার কাছে চাচ্চেন। না পেলে বড্ড বকাবকি করবেন।’ বালকটির এই কাতরোক্তিতে আমি মনে করলাম, তা সত্যই হয় ত বা তাই হবে। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে বললাম, “তা বাবা! আমি তো লেখাপড়া জানি না। তুমি বরং ওর টেবিলের উপরকার বইগুলার ভিতর হতে ও বইটা বেছে নিয়ে যাও।’ আমার পদধূলি গ্রহণ করে তখন সে আমার পুত্রের টেবিল থেকে বইখানি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর আমার পুত্র ফিরে এলে তার কাছে অবাক হয়ে শুনি যে ঐ অজ্ঞাতনামা বালকের সব কথাই মিথ্যা ছিল।”

উপরের প্রবঞ্চনা পদ্ধতি ব্যতীত আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ শহরের লোকেদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিটিকে “টেলিফোন স্থইণ্ডলিঙ” এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রথমে টেলিফোন দ্বারা দোকানদারদের সহিত তাদের কোনও এক পরিচিত ব্যক্তির নামে কথোপকথন করে। অনেক সময় সেই পরিচিত বা নামজাদা ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বরও তারা অনুকরণ করে থাকে। এই সময় প্রবঞ্চকটি জানিয়ে দেয় যে, তার ম্যানেজার বা কোনও কর্ম্ম

চারীকে পত্রসহ সে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছে। দোকানদার যেন তার সেই লোক মারফৎ দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। এর পরক্ষণেই একজন লোক পত্রসহ পদব্রজে বা মোটরে দোকানে এসে হাজির হয়। লোকটি দোকানের রসিদ বইয়ে যথারীতি সই করে দ্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে। এর পর আরও কয়দিন অপেক্ষা করে দোকানদার তার সেই ধনী খদ্দেরের বাটীতে বিল পাঠিয়ে জানতে পারে যে তারা প্রতারিত হয়েছে। দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথিত ভদ্রলোক একেবারেই ওয়াকিবহাল নহেন। এ সম্বন্ধে কোনও একটি প্রবঞ্চকের একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম।

"আমি কোনও এক পাবলিক টেলিফোনে এক আনা জমা দিয়ে অমুক জুয়েলারী দোকানে ফোন করি, 'দেখুন। আমি অমুক থানার বড়বাবু। আমাকে চিনতে পারছেন তো?' দোকানদার বড়বাবুকে ভাল রূপেই চিনতেন। ভদ্রলোকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমিও অবহিত ছিলাম। এই জন্যে এত লোক থাকতে আমি এঁর নামেই ফোন করি। উত্তরে দোকানদার, 'বিলক্ষণ—বিলক্ষণ' বলে উঠে অভিবাদন জানায়। আমি তখন তাঁকে জানাই, 'দেখুন একজন সিপাইকে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছি। দু'ছড়া ভাল নেকলেস্ পাঠাবেন তো! পছন্দ হলে একটা রেখে দেব, হাঁ, ওদের দামটাও লিখে পাঠাবেন।' দোকানদার আমাকেই বড়বাবু ভেবে এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়। এদিকে আমি কয়েকখানা পুলিশের ফর্মও পূর্বাহ্নে জোগাড় করে রেখেছি। পুলিশের সেই ছাপানো ফর্মে বড়বাবুর জবানিতে একটি পত্র লিখে আমি আমার এক হিন্দুস্থানী সহকারীকে পত্রসহ সেই দোকানে পাঠিয়ে দিই। আমার হিন্দুস্থানী সহকারীটি সিপাহী-দের কায়দানুসারে সেলাম করে দোকানদারকে পত্রটি দিলে দোকান-

দারটি দুই জোড়া জড়োয়া নেকলেস্ নিঃসন্দেহে তার হাতে তুলে দেয়।"

নামকরা নাগরিক এবং পদস্থ কর্মচারীদের নামে শহরে এই ধরনের প্রবঞ্চনা হামেসাই হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও এক পদস্থ কর্মচারীর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"একদিন আমি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ শহরের এক নামজাদা খাবারের দোকানের সরকার এসে হাজির। ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ৫৫৲ টাকার একটা বিল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার! অনেক দিন বিলটা পড়ে আছে, আপনি বোধ হয় ভুলে গিছলেন, হে হে হে।' আমি বিলটা পড়ে দেখে অবাক হই। আমি নাকি তিন মাস পূর্বে তাদের দোকান থেকে কয়েক হাঁড়ি দধি ও সন্দেশ কিনেছি। আমি বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে শুধোই—'এ্যাঁ আমি কিনেছি! চেনেন আপনি আমাকে?' ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'না, আপনি তো অমুক বাবু নন।' আমি তখন তাঁকে জানাই যে আমিই অমুক বাবু এবং দোকানের বিক্রেতাকে ডেকে পাঠাই। বিক্রেতা এসে আমাকে অমুক বাবুরূপে জেনে অবাক হয়ে যায় এবং নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দেয়—

'তিনমাস পূর্বে একজন মোটা গোছের প্রৌঢ় ভদ্রলোক দোকানে এসে 'আমি অমুক বাবু' ঐ নামে পরিচয় দিয়ে কিছু খাবার বন্ধুসহ খেতে চান। আমরা তাঁকে খাবার খাওয়াই এবং তাঁকে মালিকের বন্ধুরূপে জেনে দাম নিতে অস্বীকৃত হই। কিন্তু তিনি জোর করে দাম দেন এবং ৫৫৲ টাকার মূল্যের দধি ও সন্দেশ তাঁর গাড়িতে তুলে দিতে বলেন। আমরা তাঁর উপদেশমত কাজ করি এবং দ্রব্যাদির মূল্য

বাবদ একটা বিলও তাঁর হাতে দিই। তিনি বিল অনুযায়ী টাকা পাঠিয়ে দেবেন বলে মিষ্টান্নাদিসহ প্রস্থান করেন। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই সেই লোকটিকেই আমি, 'আপনি' মনে করেছিলাম। হাঁ স্যার, আপনার নাম আমি ইতিপূর্বে বাবুদের মুখে বহুবার শুনেছি, তাই—"

আমি উপরি উক্ত পদস্থ ব্যক্তিটির মুখে শুনেছি যে, তিনি ইতিপূর্বে কার্যব্যপদেশে বহুবার উক্ত দোকানে গিয়েছেন, কিন্তু দোকানের কেহ তাঁহাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা তো দূরে থাক, অভ্যর্থনা পর্যন্তও তাঁহাকে কেহ করেনি। আসল 'অমুক বাবু' যে খাতির পায় নি, নকল 'অমুক বাবু' সেই খাতির পেল। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে আসবে। বিষয়টি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করলে, এই সব প্রবঞ্চনার মধ্যে দোকানের কর্মচারীদের যে যোগাযোগ থাকে, এইরূপ মনে করা চলে।

এই প্রবঞ্চনা অপরাধের নিদর্শন স্বরূপ অপর আব এক রত্ন-ব্যবসায়ীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এ বিষয়ে আমার কি দোষ মশাই। আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু কখনও আপনাকে দেখিনি, এবং এও শুনেছি আপনি একজন দেবতুল্য লোক। সকাল নয়টায় একজন লোক ফোনে জানাল আপনি কথা বলবেন। এর পর আপনার নাম নিয়ে আর একজন ফোন করে জানালেন যে তিনি পত্রসহ দারোয়ান পাঠাচ্ছেন। দারোয়ান এসে আংটি কটা নিয়ে গেল এবং কিছু পরেই আবার সেগুলা ফিরিয়ে এনে জানাল, তার সাহেব মেমসাহেব সমভিব্যাহারে খোদ আসবেন বেলা তিনটায় নিজেরা জিনিস পছন্দ করতে। এর পর বেলা তিনটায় টকটকে বর্ণের লম্বা চেহারার একটা লোক একজন পরমা সুন্দরী

মহিলাকে নিয়ে দোকানে এলেন। আমরা তাঁদেরই 'আপনারা' মনে করে আনন্দে গলে পড়ে খাতির-যত্ন করলাম। - সাহেব কম দ্রব্য নিতে চাইলেও মেমসাহেব নিতে চান বেশি জিনিস। সাহেব একটা কম দামের পছন্দ করলেও মেমসাহেব সেটা বাতিল করে দেন কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর মেমসাহেব প্রায় সতের হাজার টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে মোটরে উঠলেন। বিব্রত হয়ে সাহেব পাঁচ শত টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বিবর্ণ মুখে বিলটা তাঁর বাড়িতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে মেমসাহেবের পাশে এসে বসলেন। আমরাও যথা-রীতিতে তাঁদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দোকানে ফিরলাম। আমাদের একবারও মনে হয় নি যে তাঁরা 'আপনারা' নন।"

এই বিশেষ পদ্ধতি সকল ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারা প্রায়ই ঠগীরা সরল প্রকৃতির ভদ্র দোকানদারদের কলকাতা শহরে ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠগী প্রায়শঃ একজন বালক সঙ্গে করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আসে। এর পর বালকটিকে দোকানে বসিয়ে রেখে ঠগী লোকটা দশ-বারোটি ভাল ভাল দামী শাড়ি বেছে নিয়ে বাড়ির মেয়েদের দেখাবার জন্যে দোকান ত্যাগ করে। বালকটি অছিস্বরূপ বসে থাকায় দোকানদার এই প্রস্তাবে প্রায়ই অরাজি হয় না। অর্ধ ঘণ্টা পরে শিক্ষানুযায়ী ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে মা' বা কাকীমার নাম নিয়ে কান্না শুরু করে দেয়। এই অবস্থায় কোনও কোনও দোকানদার এই সকল ছেলেদের কান্নায় বিব্রত হয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাদের মিঠাই কিনে দিয়েছে। এরপর দোকানদার অপরাপর খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বালকটিও ইত্যবসরে আনমনা হয়ে' রাস্তায় নামে। এরপর রাস্তার উপর কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা ক'রে

সুযোগমত সরে পড়ে ছেলেটি ঠগী লোকটির সহিত এসে মিলিত হয়।

এই সকল বালকগণ সকল সময়ই দোকানদারদের নজর এড়িয়ে সরে পড়তে সক্ষম হয় নি। ঠগী লোকটির অবর্তমানে প্রায়ই দোকানদাররা এদেরই থানায় ধরে' নিয়ে আসে। থানায় এসে এরা কাঁদতে শুরু করে এবং জানায়, লোকটা রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিযে এসেছিল এবং সে না'কি তাকে ইতিপুর্বে কখনও দেখেনি। লোকটা তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে দোকানে সে না ফিরা পর্যন্ত বসে থাকতে বলেছিল, ইত্যাদি। ছেলেটি তার মুঠার মধ্যে রক্ষিত একটিমাত্র সিকিও প্রমাণস্বরূপ পুলিশকে দেখিয়ে দেয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় ছেলেটি নির্দোষ। দোকান-দারকে এও স্বীকার করতে হয যে ছেলেটির সহিত তাদের এ সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নি। এ ছাড়া দেখা যায় যে, ছেলেটির বাড়ি ঘর ও পিতামাতা বর্তমান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বালকেরা স্কুলের ছাত্র হয়। এই সকল বালকেরা প্রমাণের অভাবে প্রায়ই মুক্তি পেয়ে থাকে। আসলে কিন্তু এই সকল বালক অত্যন্তরূপ ধূর্ত হয়ে থাকে এবং কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। ছোটবেলা হ'তে অপরাধীদের সহিত মিশে এরা এইরূপ হয়ে থাকে। এই ধরনের বালক অপরাধীদের সংখ্যা শহরে অত্যন্তরূপ অধিক। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহরের লোভী দরিদ্র বালকদের এই সব ঠগীরা ভুলিয়ে এনে এইভাবে যে কাজ হাসিল না করে তা'ও নয়।

এছাড়া অপর আর এক অভিনব পদ্ধতিতে শহরে ঠগীরা দোকানদারদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে দোকানেরই এক কুলিকে দ্রব্যাদিসহ অমুক নং বাটীতে পাঠাবার জন্যে

অনুরোধ জানিয়ে ঠগী মহাশয় স্থান ত্যাগ করেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি এই যে জিনিস পৌঁছবামাত্র কুলির হাতেই তাঁরা দাম দিয়ে দেবেন। এদিকে যথা সময়ে ঠগী মহাশয় কথিত বাটীর দরোজার নিম্নে অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পর তিনি কুলির নিকট হ'তে দ্রব্যাদি বুঝে নিয়ে দ্রব্যাদিসহ বাটীর অপর আর এক দুয়ার দিয়ে বেমালুম সরে পড়েন। প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কুলি [বা কর্মচারী] বুঝতে পারে যে বাড়িটি খালি বাড়ি কিংবা বাড়িটিতে বহু ভাড়াটিয়া বাস করে। তারা দ্রব্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। বেশ বুঝা যায় বিষয়টি আগাগোড়া প্রতারণা মাত্র।

[বহু গৃহী ঠগী লোকবলহীন অসহায় ব্যক্তিদের বহু কর্ম বিনা অর্থে নিঃস্বার্থভাবে কয়দিন করে দেয়। পরে এরা তাদের ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা ভাষণে দক্ষ। এরা কিছুটা উপকার করতে সক্ষম। এজন্য বারে বারে লোকবলহীন ব্যক্তিরা এদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। দুর্বল-চিত্ত মানুষ এদের বুঝেও বুঝে না। ফলে তারা বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।]

অন্তিবাজি

অন্তিবাজি বা অন্তমার পদ্ধতি সাধারণ প্রবঞ্চনার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণতঃ ইরাণী নামক ভ্রাম্যমাণ স্বভাবদুর্বৃত্ত দলের লোকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লোক ঠকায়। এই দুর্বৃত্তদল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লোকের অর্থ অপহরণ করে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই পদ্ধতিটি কিরূপ তা বুঝা যাবে।

"আমাদের একজন জনবহুল কোনও এক দোকানে এসে সামান্য কিছু দ্রব্য ক্রয়ের অছিলায় একটা টাকা ভাঙিয়ে নিই। সাধারণতঃ আমরা কোনও দ্রব্য ক্রয় না করেই টাকা ভাঙিয়ে থাকি। এক টাকার রেজগি হাতে তুলে আমরা দোকানদারকে দেখাই এবং মিথ্যে করে বলি যে এর মধ্যে অনেকগুলি জালিমুদ্রা আছে। এর পর আমরা দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই সিকি দু'আনি বা পয়সা বেছে বা বদলে নিতে থাকি। আমাদের পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে দোকানী এ প্রস্তাবে রাজিও হয়। এই সুযোগে দোকানীর চক্ষের সামনে হাত সাফাই-এর [sl i_ht of hand] সাহায্যে আমরা অনেকগুলি সিকি দু'আনি ইত্যাদি সরিয়ে নিতে সক্ষম হই। কখনও কোনও দোকানীকে তার পয়সাকড়ি গুনতে দেখলে আমরা তাকে জানাই যে, তাদের ঐ মুদ্রাগুলা জালি বা খারাপ মুদ্রা। এর পর ঐগুলি দোকানদারকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাবার অছিলায় আমরা মুদ্রাগুলি স্পর্শ করে হাতসাফাই-এর সাহায্যে অনেকগুলি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে থাকি।"

এইরূপ প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চনা না বলে চৌর্য-অপরাধ বলা উচিত। কারণ এই পয়সা বা আনিগুলি দুর্বৃত্তরা সরিয়ে ফেলেছিল দোকান-দারের অজ্ঞাতসারে, জ্ঞাতসারে নয়। দোকানদার নিজে দুর্বৃত্তদের হাতে ঐ সব মুদ্রা তুলেও দেয় নি। ঐ দুর্বৃত্তরা দোকানদারের অজ্ঞাতসারে ঐগুলো সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই অস্তিবাজির অধিক সংখ্যক পদ্ধতিই প্রবঞ্চনা অপরাধের পর্যায়ে প'ড়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন লোক কতকগুলো ভাল ভাল শাড়ি সস্তায় বিক্রয় করছে। কয়েকজন ভদ্রলোককে কয়েকখানি শাড়ি সস্তা দামে কিনতেও দেখলাম। অপর সকলের দেখাদেখি আমিও আমার এক শ্যালিকাকে উপহার দেবার জন্যে একখানি শাড়ি কিনে ফেলি। মূল্য বাবদ উনিশটি টাকা গুনে নিয়ে লোকটা শাড়িখানা একটা খবরের কাগজে মুড়ে যত্ন ক'রে সেটা সে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। এর পর সোজা শ্বশুরালয়ে এসে শ্যালিকাটিকে কাপড়খানি আমি উপহার দিই। কিছু পরে শ্যালিকাটি কাপড়ের মোড়কটি খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে একটা ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া রয়েছে। সেখানে ঐরূপ মূল্যবান কোনও শাড়ি নেই। বিষয়টি সকলে ঠাট্টার সামিল মনে করে হেসে উঠেন। এদিকে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকি উনিশ টাকা খরচ ক'রে আমি শাড়িই কিনেছিলাম। পয়সা খরচ করে ন্যাকড়া নিশ্চয়ই আমি কিনি নি। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা আমি জানতে পারি যে, লোকটা একটা ঠগী হাতসাফাই-এর সাহায্যে আসল শাড়িটা সরিয়ে ফেলে একটা ন্যাকড়া কাগজের মোড়কে পুরে দিয়ে সে আমাকে ঠকিয়েছে যে সকল ভদ্রসন্তানকে ঐ লোকটার কাছ

থেকে আমি কাপড় কিনতে দেখেছিলাম তারাও না'কি ঐ লোকটারই দলের লোক। এর আশে-পাশের লোকগুলো ছিলো সব ঝুটা বা জাল ক্রেতার দল। এই সব জাল ক্রেতারা কখনও বা ভিড় ক'রে কখনও বা ঐ ভাবে নিরীহ পথচারীকে প্রলুব্ধ ক'রে বস্ত্রবিক্রেতাকে লোকঠকানোর কার্যে সাহায্য ক'রে থাকে।'

সম্প্রতি কতিপয় নীলামদার এক নূতন পদ্ধতিতে লোক ঠকাচ্ছে। এরা ঘণ্টা বাজিয়ে চার গজের এক পিস কাপড় হাতে তুলে চীৎকার করে, 'চার টাকা।' কিন্তু প্রলুব্ধ ক্রেতারা চারি টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া মাত্র তারা পুরা পিস না দিয়ে এক গজ মাত্র কাপড় তা থেকে কেটে বা ছিঁড়ে তা ক্রেতাদের প্রদান করে। প্রতিবাদ করলেও তারা ঐ অর্থ আর কাহাকেও ফেরত দেয় নি।

ইরানী প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দলের মেয়েরাও প্রায়ই তাদের পুরুষদের শিক্ষামত গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি এসে টাকার ভাঙানি বা রেজগি সরবরাহ ক'রে থাকে। গৃহস্থ-কন্যাগণ এদের নিকট হ'তে রেজগি [সিকি, দু'য়ানি ইত্যাদি] গুনে গুনে নেন। কিন্তু এরা চলে যাবার পরই তাঁরা পুনরায় ঐগুলি গুনে দেখেন যে কুড়ি টাকার ভাঙানির মধ্যে প্রায় ছয় বা সাত টাকার মত রেজগি কম পড়ছে। সাধারণতঃ হাতসাফাই-এর সাহায্যে এই ইরানী মেয়েরা রেজগিগুলি অপহরণ করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সময় এজন্যে তারা হাতের চেটোয় আঠা মাখিয়ে রাখে। এদের কেহ কেহ হাতের চেটোর মধ্যাংশ সঙ্কোচন ক'রে ভেকুয়ম তৈরি করে। রেজগিগুলি আকর্ষণ [suction] করতেও সক্ষম—অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে এইরূপে দ্রব্যাদি আকর্ষণ করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রেজগিগুলি হাতের চেটোর মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বচন-বিন্যাস

দ্বারা গৃহস্থকন্যাদের অন্যমনস্ক ক'রে বা তাদের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট ক'রে কাজ হাসিল ক'রে থাকে।

এইরূপ পদ্ধতি দ্বারা অর্থ অপহরণ করাকে চুরি কিংবা জুচ্চুরি বলা হবে তা বিবেচ্য। এদের কেহ কেহ পিত্তলের কতকগুলি দানা সোনার দানা বলে' গৃহস্থ কন্যাদের নিকট সোনার দরে বিক্রয়ও ক'রে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা কয়েকটি আসল সোনার দানা পরীক্ষার্থে গৃহস্থকন্যাদের নিকট রেখে যায়। স্বর্ণকারের সাহায্যে ঐগুলি সত্যই সোনা কি'না তা যাচাই ক'রে নিয়ে গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐ দানাগুলি কিনতে মনস্থ করেন। এরা এরূপ ভান করে যেন ওঁদের সাথে ওগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের সময় দরে বনিবনা হচ্ছে না। এই অজুহাতে এরা গৃহস্থ-কন্যাদের নিকট হ'তে দানাগুলো চেয়ে নিয়ে তাদের চক্ষের সামনেই হাতসাফাই-এর সাহায্যে সোনার দানাগুলি বেমালুম ভাবে সরিয়ে ফেলে তারা সেইস্থলে মুঠির মধ্যে কতকগুলা পিত্তলের দানা এনে—সেই পিত্তলের দানাগুলা গৃহস্থ কন্যাগণকে পুনরায় ফেরত দেয়। গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐগুলাকেই পূর্বেকার সোনার দানা মনে ক'রে পুনরায় তাদের সহিত দর কষাকষি শুরু করেন। দুর্বৃত্ত স্ত্রীলোকেরা এই সুযোগে গৃহস্থ কন্যাদের প্রস্তাবিত বা ঈপ্সিত মূল্যেই দানাগুলি [Beads] বিক্রয় করতে রাজি হ'যে সোনার বদলে কতকগুলি পিত্তল গৃহস্থকন্যাদের গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। মাড়োয়ার বাউরি এবং বগরি মাঘেরা নামক স্বভাবদুর্বৃত্ত দলের মেয়েরা এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে প্রায়ই গৃহস্থ কন্যাদের ঠকিয়ে থাকে। প্রবঞ্চনার এই বিশেষ পদ্ধতিকে কেহ কেহ দানা-কুল পদ্ধতি বা বিড্‌স্থইগুলিঙ বলে থাকেন।

এদেশে প্রচলিত ভিক্ষা ও দানপ্রথা সাধারণ প্রবঞ্চনার প্রধান

সহায়ক। দান করাকে আমরা পরলোকের জন্য পাথের সংগ্রহের সামিল মনে করি—দানের সব কয়টি মুদ্রাই পরলোকের কোনও ব্যাঙ্কে যেন জমা পড়ছে। দানের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয়ের মনো বৃত্তির সুযোগ প্রবঞ্চকরা এদেশে হামেসাই নিয়ে থাকে। [বহু ব্যবসায়ী ইনকাম ট্যাক্সে রিবেট পাবার জন্যেও কিছু কিছু দান কার্য করে থাকেন।] এদের কেহ কেহ সাধু বা ফকিরের বেশে জনসাধারণের নিকট প্রচার করে যে তারা কোনও এক পুরান মন্দির বা মসজিদ সংস্কারের জন্যে অর্থ ভিক্ষা করছে। এদের কেহ কেহ [একক ভাবে বা দল বেঁধে] অবলা আশ্রম, হাঁসপাতাল, গোশালা নির্মাণ বা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেও অর্থসংগ্রহ করে থাকে। আসলে কিন্তু এরা এইরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা উদরসেবা বা উদরপূজা করে মাত্র। প্রদেশের কোনও এক দূর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বন্যা বা মহামারীর সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হলে এদের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় এবং এই সুযোগে তারা অত্যন্তরূপ কর্মতৎপর হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ কোনও এক নামকরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জাল এজেন্ট সেজেও অর্থ ভিক্ষা ক'রে থাকে। এদের প্রায়ই প্রতিষ্ঠান বিশেষের নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া বাক্স নিয়ে রাজপথে ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। এদেশের ভাত্রা কালান্দার প্রভৃতি স্বভাব দুর্বৃত্ত দলেরাও এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থাপহরণ ক'রে থাকে।

এ ছাড়া এমন বহু প্রকার ঠগী দুর্বৃত্ত দল আছে যাঁরা জন সেবক বা দেশভক্ত সেজে গ্রামে গ্রামে মানুষের দুঃখ লাঘব করবার অছিলায় ঘুরে বেড়ান। এঁদের অনেকে প্রায়ই শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এঁরা গ্রামে গ্রামে সভা ক'রে দরিদ্রগণকে,

তাদের ঋণভার লাঘব ক'রে মহাজনদের কবল হ'তে তাদের রক্ষা করবেন, এইরূপ এক ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিকট হতে ঐ কার্যের জন্য চাঁদা আদায় ক'রতে থাকেন। এঁরা গ্রামবাসীদের বুঝান, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ ক'রে দুঃখ জানাতে হলে এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এঁরা মহাজনদের সহিত দেখা ক'রে সমিতির পক্ষ থেকে ভয় দেখিয়ে খাতকদের নিকট হ'তে ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁদেরকে অর্থ আদায় করতে বলেন। অপরদিকে এঁরা খাতকদের নিকট হ'তে 'ফি' স্বরূপ আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাদের ইনসলভান্সি ফাইল করবার জন্যেও পরামর্শ দেন। এইভাবে মহাজনদের নিকট হ'তে ঘুস্ [উৎকোচ] স্বরূপ এবং খাতকদের নিকট হ'তে চাঁদা ও 'ফি' স্বরূপ অর্থ আদায় ক'রে হঠাৎ একদিন এঁরা গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে যান। মহাজন ও খাতকদের যা কিছু মধুর সম্পর্ক তা চিরদিনের জন্য সমূলে বিনষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁরা হঠাৎ সরে পড়েন। এই সব প্রবঞ্চক দুর্বৃত্তদের নাম দেওয়া হয়েছে "ডেট্ রিলিফ প্রাপোগাণ্ডিস্ট" বা ভূয়া জনহিতৈষী [প্রবঞ্চক] দল।

ঠগী-ভিখারী

সাধারণ প্রবঞ্চক অপরাধীদের মধ্যে ঠগী ভিখারিগণ একটি উল্লেখ-যোগ্য স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এরা ভিক্ষা দ্বারাই মানুষকে প্রতারিত করে। নগরে নগরে তথাকথিত বহু দরিদ্র ভদ্রলোক বা ভদ্রকন্যাকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এঁরা প্রায়ই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা না'কি পূর্বে অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময় এঁরা মিথ্যা বলে কোনও এক নামকরা লোকের নিকট আত্মীয়ও সেজে থাকেন। কেহ কেহ নামজাদা ব্যক্তিদের সই করা জাল পরিচয়-পত্রও এই জন্যে যোগাড় করেছেন। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ়া মহিলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে মহিলাটি মাথার কাপড়টা সলজ্জভাবে আরও একটু নামিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে নিজেই তিনি উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। কথায় কথায় আমার পরিচয়টা জেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হা আমার কপাল! তুমি তা হলে অমুক গ্রামের মধুবাবুর নাতি! উনি যে আমার নিজের মেসো হতেন।' এর পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি অনেক কথাই বলে' চললেন। যথা—'আর বাবা! সেদিন কি আর আমার আছে? না বাবা, বড় মানুষ আত্মীয়দের কাছে আর যাব না। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম দেখো। এ

সবই বাবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আসলে আমাদের রক্তের টান যাবে কোথা?' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, নগদ দশ টাকা সাহায্য নিয়ে সেদিন তিনি আমায় রেহাই দেন। এর পরের দিন তাঁর প্রদত্ত ঠিকানায় আমি খোঁজ ক'রে জানতে পারি, সেরূপ কোনও ব্যক্তি ঐ ঠিকানায় কস্মিনকালেও ছিলেন না।"

কলকাতা শহরে প্রায়ই ভদ্রবেশী মহিলাদের রুগ্ন শিশু ক্রোড়ে ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিখারীদের নিকট হতে ঐ সকল রুগ্ন শিশুকে তাঁরা ভাড়া ক'রে এনেছেন। মাতা এবং শিশুটির স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত করে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই প্রকৃত তথ্যটি প্রতীয়মান হবে। শুনা গেছে, যে শিশুটি যত বেশি রুগ্ন তার ভাড়া না'কি তত বেশি হয়ে থাকে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে নিশ্চল অবস্থায় শুইয়ে রাখবার জন্যে এই সকল শিশুদের কাহাকে কাহাকে অহিফেন মিশ্রিত জলও খাওয়ান হয়।

সাধারণ ভিখারীরাও অনেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভিক্ষা বৃত্তি ক'রে থাকে। আমি এমন বহু প্রবঞ্চক ভিখারীকে জানতাম। এদের একজনকে পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে সারাদিন ভিখারীদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা যেতো। কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে বিজলী পাখার তলায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে রাত্রি যাপন করতো। এমন কি, তার সগৃহিণী সিনেমা দেখারও শখ ছিল। 'ভিখারী সমাজ' সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে উহার কোনও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শহরের ভদ্র দুর্বৃত্ত দালালেরা ভদ্র গৃহস্থদের ঠকাবার জন্যে কোনও কোনও

ক্ষেত্রে এই সব ভিখারীদের সহায়তা কামনা করে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"শুনুন বলি, কি ক'রে আমি ভদ্রলোকটির নিকট হ'তে দেড় হাজার টাকা আদায় করি। একদিন রাত্রে একজন ভিখারী কম্বল মুড়ি দিয়ে নয়া রাস্তার উপর শুয়েছিল। ঐ নিরীহ ভদ্রলোক সাবধানেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝ রাস্তার উপর কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকায় তিনি মানুষটাকে দেখতে পান নি। এ ছাড়া হঠাৎ গাড়িটাকে তার দিকে আসতে দেখে সে উঠে পড়ে ছুট দেয়। এই ভাবে হঠাৎ সে-ই গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল। তাকে বাঁচাবার জন্যে ভদ্রলোক চেষ্টার কোনওরূপ ত্রুটি করেন নি। তদন্ত দ্বারা পুলিশ ভদ্রলোককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। এই সময় আমি শ্যামবাজার থেকে এক ভিখারী কন্যাকে সংগ্রহ ক'রে তাকে নিহত বৃদ্ধার কন্যা সাজিয়ে তাকে দিয়ে ভদ্রলোকের নামে আদালতে একটা মামলা রুজু করিয়ে দিই। গৃহহীন আত্মীয়বিহীন বৃদ্ধা ভিখারীর হঠাৎ একজন ওয়ারিশ এসে জোটায় ভদ্রলোক এবং তদন্তকারী পুলিশ উভয়েই অবাক হয়ে যান। এর পর আমি সুযোগ মত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে উক্ত সাজানো কন্যাকে তিন হাজার টাকা দান করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে বলি। এই ভদ্রলোকটিও ছিলেন নিরীহ ভদ্রলোক মাত্র, আদালতের ঝঞ্ঝাটে তিনি লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না— আর কে-ই বা আর তা চায়। ভদ্রলোক আমার মারফৎ ভিখারী মেয়েটিকে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করেন। এই অর্থ হ'তে আমি মাত্র দুই শত টাকা ঐ মেয়েটিকে এই অপকার্যে আমাকে সাহায্য করার জন্যে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিই এবং পুরা অর্থ বাবদ একটা সাদা কাগজে মেয়েটির টিপসহি নিয়ে বাকি টাকাটা আমি

নিজেই আত্মসাৎ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সাজানো কন্যার কান্না দেখে অভিভূত হয়েও এই সব ধনী মোটরবিহারী ভদ্রলোকেরা অর্থ প্রদান করেছেন। অনেক সময় সাজানো কন্যাগণ দ্বারা ওয়ারিশবিহীন মানুষদের দাহ কার্যও সমাধা করানো হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই এদেরকে মৃত ব্যক্তির ওরারিশ সাজানো সম্ভব হয়।"

এদের বহু ব্যক্তি নামী ভদ্রলোকদের নিকট হতে ধাপ্পা দ্বারা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করতেও পেরেছে। এমন কি, ভুয়া দাতব্য পতিষ্ঠানের পক্ষে ইনকাম্ ট্যাক্স এক্সেম্পশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে দানার্থে প্রতিষ্ঠিত বহু এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড হতে সহজে দান গ্রহণ করেছে।

[এই সব ভিখারীরা নানারূপে ভদ্র গৃহস্থদের ঠকিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিলাতি গণ-গল্পের অবতারণা করা যাক। ওদেশে মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশনের লাইসেন্স ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি দণ্ডনীয়। ওদেশের কোনও এক শহরে এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। লোকটির বুকের উপর করপোরেশনের মোহর অঙ্কিত একটি বোড ঝুলানো ছিল। বোর্ডটিতে লেখা ছিল—"অন্ধ।" কোনও এক পথচারী দয়াপরবশ হয়ে লোকটিকে একটি মুদ্রা দান করেন। মুদ্রাটি হাতে পেযে খুশি মনে অন্ধটিকে উহা নিরীক্ষণ করতে দেখা যায়। ভদ্রলোক এইরূপ ভাবে অন্ধকে চেয়ে থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, "তবে না বেটা তুই অন্ধ ?" ঠগী ভিখারী এতে বিব্রত হয়ে না'কি বলে উঠেছিল, "আজ্ঞে না, আসলে আমি অন্ধ নই, আমি হলাম কালা [বধির], ওটা করপোরেশন লিখতে ভুল করেছে।" এর পর পথচারী ভদ্রলোকটি অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ধমকে উঠলেন, "এ্যাঁ ! কি বল্লি ? ফের মিথ্যে কথা !" ভিখারী লোকটা

কেঁদে ফেলে না'কি তখন উত্তর দিয়েছিল, "আজ্ঞে তা নয়। আমি তো কালা নই। স্যার! আমি একজন বোবা [মূক]।"]

কলকাতা শহরের ন্যায় বড় বড় শহরে বংশ-তালিকা তো দূরের কথা, কাহারও প্রকৃত নাম ও পিতার নাম সংগ্রহ করাও দুষ্কর হয়ে উঠে। দুই পুরুষ গৃহহীন পরিচয়হীন ভাবে বাস করেছে, এমন লোকেরও এখানে অভাব নেই। এই কারণে এইরূপ কোনও এক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সেজে লোক ঠকানো এখানে সহজসাধ্য। এইরূপ প্রবঞ্চনার কাযে দুর্বৃত্তদের শহরের কোনও কোনও অসৎ উকিল ও মুহুরীরা প্রাযই অধিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাহায্য ক'রে থাকেন। কোনও এক মোটর দুর্ঘটনার পর দুর্বৃত্তরা মোটর চালকদের প্রায়ই ব্ল্যাক-মেইল ক'রে থাকে। এই ভিখারীদের কথা বাদ দিলে গরীব বস্তিবাসী গৃহস্থরাও এ বিষয়ে পিছপাও নয। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তির পিতামাতাও এই কাযে দুর্বৃত্তদের অর্থ প্রাপ্তির আশায় সাহায্য করেছে। এমন সব পিতাকেও আমি দেখেছি যারা কিনা আপন পুত্র এই ভাবে গাড়ি চাপা পড়ায কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হযে উঠেছে।

এমন বহু ভিখারী ঠগী আছে যারা তৈল-রঙের দ্বারা তাদের পদদ্বয় চিত্রিত করে নিজেদের কুষ্ঠরোগীরূপে প্রচার করেছে। রঙিন মোমের সাহায্যে তারা চামড়ার উপর ক্ষত তৈরি করে থাকে। এই ভিখারী ঠগীদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নের কাহিনী দুটি হ'তে এই ভিখারী ঠগীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"মৌলালীর নিকটস্থ কোনও এক স্থানে ফুটের উপর জনৈক বৃদ্ধ অন্ধকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে দেখা যেত। প্রতি দিন একজন বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে অতি কষ্টে অকুস্থলে হাজির হত। সন্ধ্যার

সময় যথারীতি এই বালকটিই বৃদ্ধকে হাতে ধরে গৃহে নিয়ে যেত। এদিকে কলকাতা পুলিশে খবর এল যে ঐ বৃদ্ধটি একেবারেই অন্ধ নয়। আসলে সে এক পিকপকেট দলের সর্দার এবং আশ্রয়দাতাও। বহু বালককে সে ভুলিযে এনে আশ্রমে ভর্তি করেছে এবং তার আড্ডায় খোঁজ করলে 'চুরি ক'রে আনা অনেকগুলি অপরিচিত বয়স্ক বালকেরও' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সেদিনও সন্ধ্যার পর একটি ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত মলিন ও অনাহার-ক্লিষ্ট বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে যষ্টি হস্তে নুইযে পড়া দেহটাকে অতি কষ্টে উপরে তুলে তাকে ধীরে ধীরে পথ চলতে দেখা গেল। এদিকে পুলিশ যে তাকে অনুসরণ করছে তা আদপেই সে বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধের পিছন পিছন পুলিশও একটি নোংরা বস্তির মধ্যে এসে পৌঁছল। বাসগৃহের কাছে এসে বৃদ্ধটি চোখ দুটা দুই হাতে একবার কচলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাট-কোঠার মধ্যে তখন ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছিল। চোরাই মাল সমেত অনেকগুলি ছোকরাকেও সেখানে দেখা গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃদ্ধের নজর পড়ল পিছনের গোয়েন্দা পুলিশের দলের উপর। অকুস্থলে পুলিশ দেখে বৃদ্ধ উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। এদিকে পুলিশও ছিল প্রস্তুত। ঐ বৃদ্ধের পিছন পিছন ধাওয়া করতে তাদেরও একটুও দেরি হয় নি। আঁকা বাঁকা বস্তির পথ ধ'রে বৃদ্ধ অবলীলাক্রমেই তার অন্ধতা সত্ত্বেও ছুটে চলছিল। ধরা পড়ার পর বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন বৃদ্ধের চক্ষুর মধ্যে স্থূল নিষ্প্রভ শ্বেত মাংস পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এক্ষণে তার চক্ষুর শ্বেত অংশের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের চক্ষুমণি দুইটি প্রকট হয়ে উঠেছে। এর পর তাকে আর কোনও ক্রমে অন্ধ বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ জানতে পারে যে, বৃদ্ধ বহুদিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধন [অভ্যাস] দ্বারা চক্ষুর মণি দুইটি এমন ভাবে উপরে উঠাতে পেরেছিল, যাতে করে উহা বাহির হ'তে কিছুতেই আর পরিলক্ষ্য হয় না। বৃদ্ধ চক্ষুর মণি দুইটি একবার উপরে উঠিয়ে এবং একবার নিম্নে নামিয়ে তার এই বিবৃতির সত্যতাও প্রমাণ করে!"

এইবার ব্যাখ্যাসহ অনুরূপ অপর একটি কাহিনী সম্বন্ধে বলা যাক্।

"কোনও এক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট একটি মূক [বোবা] বালক ভিক্ষার জন্যে আসে। তার মুখ-বিবরের মধ্যে জিহ্বার বদলে একখণ্ড স্থূল মাংসপিণ্ড দেখা যায় মাত্র। কোনও এক বিশেষ কারণে সেক্রেটারী ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ জাগে এবং তিনি বালকটিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ছেলেটি আদপেই মূক বোবা নয়। আসলে সে বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা জিহ্বাটি এমন ভাবে ভিতরের দিকে গুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ক'রে কি'না আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে মূক [বোবা] বলেই মনে হয়।"

এই ভাবে ভিখারী ঠগীরা নগরবাসীদের প্রায়ই প্রতারিত ক'রে থাকে। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা তাদের হাতের ও পায়ের ক্ষত আদি কিছুতেই নিরাময় হতে দেয় না। অনেকে আবার ভিক্ষা না দেওয়ার কারণে তার ক্ষতপূর্ণ হস্ত দ্বারা নগরবাসীদের জড়িয়ে ধরে' তাদের ভয় দেখিয়েছে। এই শহরে এমন অনেক বীভৎস কাহিনীও শুনা গেছে। এই সকল ভিখারীদের অপরাধী ছাড়া আর কি'ই বা বলা যেতে পারে।

এই ভিখারীরা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা 'একক' ও 'সমাজবদ্ধ'। ভিখারী সমাজ ও উহার সংগঠন সম্বন্ধে পুস্তকের

প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিখারী কর্তৃক প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে মাত্র বলতে চেয়েছি। ভিখারীদের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে অপর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। এই শহরে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

"একদিন আমি ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এগারো বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার পথ রোধ ক'রে সাহায্য ভিক্ষা করল। আমি একে একে তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, সে এমন ভাবে সেইগুলির উত্তর দিল যে আমার মন করুণায় ভরে' উঠল। তার কাহিনীটুকু আমি নিম্নে তুলে দিলাম।

—'হাঁ, মশাই! দুই বছর পূর্বের ঘটনা—আমি তখন খুবই ছোট। আমার পিতাকে মনে পড়ে বই কি, তিনি আমাদের কত-ও ভালবাসতেন। আমার মাকেও তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন। কিন্তু কিছু পরে হঠাৎ তাঁর চাকরি যায় এবং আরও কিছুদিন পরে হঠাৎ তাঁকে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি। আমাদেরও এ সময় তিনি কটু কথা বলতেন। এর পর প্রায়ই তাঁকে রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখিনি। গত দুই বছর হ'ল কোথায় তিনি উধাও হয়ে গেছেন। হাঁ, মার খুব অসুখ, ছোট ভাইটারও তাই। সে বোধ হয় আর বাঁচবে না। সাত মাস আমাদের বাড়ি ভাড়া বাকি। কাল বোধ হয় আমাদের ওরা তাড়িয়ে দেবে। হাঁ! এই পানের খিলিগুলা বিক্রি হ'লে ভাইটার জন্যে দুধ কিনব। আজ্ঞে! আমার মায়ের ঔষধ? না তা আর কেনা হবে না। তার জন্যে পয়সা কই?'

এর পরের দিনই ছেলেটির সঙ্গে আমার পুনরায় দেখা হয়। এদিন সে আর আমাকে চিনতে পারে নি। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চায়; কিন্তু আমি অবাক হয়ে শুনি তার কাছে অপর

একটি সম্পূর্ণরূপ নূতন.কাহিনী। পূর্বের কাহিনীটির সহিত পরের এই কাহিনীর একটু মাত্রও মিল ছিল না। আমি তখন অবাক হয়ে যাই। এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে ঐটুকু একটা ছেলে—"

এই ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"আমি প্রায়ই দেখতাম এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত উপায়ে ভিক্ষা করছে। লোকটি সাষ্টাঙ্গভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে সম্মুখে একটা দাগ কেটে উঠে পড়ছিলো। এর পর সেই দাগ বরাবর পা রেখে দাঁড়িয়ে আবার সে ভূমি চুম্বন করছিল। এইরূপ ভাবে না'কি সে কোনও এক তীর্থ পর্যন্ত যাবে—ঠাকুরের কাছে মানত করতে। প্রতিবারেই সেই ভিক্ষায় রেকাবীটা সম্মুখে রেখে দিচ্ছিল এবং সেখানে পয়সাও পড়ছিল বিস্তর। নিয়ম মত তাকে না'কি ভিক্ষা করতে করতে এই ভাবে গণ্ডি কাটতে কাটতে তীর্থে যেতে হবে। আমি কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেও তাকে শহর ত্যাগ ক'রে তীর্থের দিকে একটুও এগুতে দেখি নি। এইরূপ ভাবে অসাধু উপায়ে ভিক্ষাকে প্রতারণা ছাড়া আর কি'ই বা বলা যাবে।"

ভুয়া চাকুরি

বোগাস্ সার্ভিস বুরোকে বাংলাতে ভূয়া চাকুরি সংস্থা বলা হয়। মিথ্যে প্রলোভন দ্বারা চাকুরি দিবার অছিলায় প্রতারকরা শহরের ও গ্রামের বেকার যুবকদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। অধুনাকালে বেকার যুবকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বর্ধিত হচ্ছে। এই জন্যে কলকাতা শহরে চাকুরি দিবার লোভ দেখিয়ে দুর্বৃত্তেরা প্রায়ই বেকার যুবকদের ঠকিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একজন দুর্বৃত্তের একটি বিবৃতি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারাই লোক ঠকিয়ে খাই। প্রথম প্রথম আমি বেকার যুবকদের জানাতাম যে অমুক অফিসের হেড্ ক্লার্ক আমার আত্মীয়। তবে ছোট সাহেবকে দেড়শো টাকা ঘুষ দেওয়া চাই। তা না হলে চাকুরি জোটা মুস্কিল হবে ইত্যাদি। ঐ টাকাটা দিলেই তিনি সত্তর টাকা মাইনের একটি চাকুরি পেতে পারেন। বেকার যুবকগণ এর পর মায়ের গহনা বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় ক'রে তা আমাকে এনে দিত। তাদের এই আশা যে চাকরি হ'লে মাইনে হ'তে প্রতি মাসে কিছু কিছু বাঁচিয়ে মার টাকা কয়টা তারা শোধ ক'রে দেবে। এই ভাবে বহু বেকার যুবকদের কষ্টার্জিত অর্থ আমি আত্মসাৎ করেছি। হতভাগা যুবকগণের একবারও মনে আসে নি যে, চাকুরি জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা আমার থাকলে আমি নিজে এমনি ভাবে বেকার জীবনযাপন করছি কেন? এই

ভাবে আরও কিছুদিন লোক ঠকানোর পর আমি আমার কার্য-পদ্ধতির কিছুটা অদল-বদল করি। এই সময় আমি বেকার যুবকদের জানাতাম যে, আমি রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর একজন অফিসার এবং তাদের আমি ভাল চাকুরি যোগাড় করে দিতে সক্ষম। আমি সাধারণতঃ এদের এই বড় অফিসের গেটের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করতে বলতাম। ঐ সময় আমি গোপনে পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে সামনের গেটে এসে এদের সঙ্গে দেখা করতাম এমন ভাব দেখিয়ে, যেন এই মাত্র আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি। বড় বড় অফিসের চাপরাশী সকল অর্থের বিনিময়ে সর্বসমক্ষে আমাকে সেলাম জানিয়ে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্যও করেছে। এই-ভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এখন আমি নিজেই একটি সাজানো অফিস খুলেছি। "কর্মখালি আছে, এক টাকার টিকিট সমেত দরখাস্ত চাই, জমার জন্যে দেয় মাত্র ২০০্ টাকা"—ইত্যাদি লিখে কাগজে অমি বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি দরখাস্ত পেয়েছি প্রায় ২৭০ খানি। আর সেই সঙ্গে জামিনের টাকাও পেয়েছি অনেক। ভাবছিলাম এইবার আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব। আর এই সময়ই কি'না আপনারা এসে হাজির হলেন।"

অধুনাকালে এই অপরাধ এক নূতন পদ্ধতিতে কলকাতা শহরে শুরু করা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকি জব-চিটিং, [Job cheating]। এই বিশেষ প্রবঞ্চনার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দূর দূর দেশ থেকে দুঃস্থ যুবকদের এই শহরে এনে তাদের এক অভিনব পদ্ধতিতে ঠকানো হয়ে থাকে। এই সকল যুবক-দের কেহ কেহ বিধবা মাতার শেষ গহনা পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে সেই কষ্টলব্ধ অর্থ এই সকল দুর্বৃত্তদের হাতে সরল বিশ্বাসে

তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এই অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা-কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসরপ্রাপ্ত খেতাবধারী হাকিম বা সুপারকে মোটা মাইনের সেক্রেটারি বা ডিরেক্টর নিযুক্ত করতাম। তারপর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত,—'মাসিক একশত টাকা বেতনে বহু ক্যানভাসার ও শেয়ার বিক্রেতা চাই, কিন্তু পূর্বাহ্নে একশত বা দুই শত টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর অমুকের নিকট আবেদন করুন।' রায়সাহেব প্রভৃতি খেতাবধারী সরকারী কর্মচারীর পূর্বতন পদমর্যাদার জন্যে নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি অফিসে এসে অর্থ সহ ধন্না দিত। ঐ সকল রায়সাহেব প্রভৃতিকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের এই পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও এতটুকুও আমরা জানাই নি। তিনি পর্দা ঘেরা অফিসে বসে কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ নির্দোষ নথিপত্রে সই করে যেতেন। এদিকে আমাদের নিকট কয়েকটি শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে বহু তথ্য সহ ছাপা ফর্ম থাকত। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ করে চলাকীর সহিত এমন সব কাগজপত্রে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিতাম যাতে প্রমাণ করা যাবে যে তারা আমাদের কার্মের শেয়ার মাত্র ক্রয় করেছে। চাকুরির জন্য এখানে তাঁরা কোনও অর্থ সিকিউরিটি রূপে জমা দেয় নি। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ধাপ্পাবাজিতে তারা না পড়েই প্রতিটি ছাপা ফর্মে একটি করে সই দিত। শক্ত ইংরাজিতে লেখা নানা তথ্য ভারাক্রান্ত ফর্মের লিখিত অর্থ তারা বুঝতে পারে না। এর পর আমরা তাদের কয়েকটি বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপূর্বে বাজারে জিনিস চালাতে না পারলে তাকে বিদায় দেওয়া হবে—এইরূপ এক

মুদ্রিত স্বীকৃতি-পত্রে তাদের দ্বারা আমরা সই করিয়ে নিয়েছি। এই সব কারণে তারা আমাদের নামে মামলা করে তাদের পূর্ব অর্থ কোনও দিনই আদায় করতে পারে নি।"

প্রবঞ্চনা—অন্যান্য

"রেশনড্‌ এবং কণ্ট্রোলড দ্রব্যাদি, যথা—কাপড়, চিনি, তৈল ইত্যাদির জন্যে পারমিট্‌ বা ছাড়পত্র কিংবা বাড়ি বা গাড়ি সংগ্রহ করে দিব"—এই অজুহাতেও খাদ্য এবং দ্রব্য রেশনের যুগে দুর্বৃত্তরা দেশবাসীদের অর্থাপহরণ করে থাকে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এ বিষয়ে এদের স্বর্ণ সুযোগ এনে দেয়। নানা-রূপ কৃত্রিম বাধা-নিষেধের ফলে একে ওকে উৎকোচ প্রদানের প্রশ্নও এরা এই সময় উঠিয়ে থাকে। "অমুককে উৎকোচ স্বরূপ এত টাকা দিতে হবে বা অমুকের সঙ্গে আমার এইরূপ হৃদ্যতা আছে"—এইরূপ বচন বিন্যাস দ্বারা দুর্বৃত্তরা সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে বহু অর্থই আদায় করেছে। কখনও এই সব দুর্বৃত্তরা সিভিল সাপ্লাই ডিপার্ট-মেণ্টের জাল অফিসার সেজে পল্লী অঞ্চলে সফরে বাহির হয়। সঙ্গে থাকে গভর্নমেণ্টের মোহর অঙ্কিত তকমা আঁটা নকল চাপরাশী। এই পিতলের চাপরাশটি তারা বাজার হ'তে তৈরি করিয়ে নিয়েছে। এই ভাবে মফঃস্বলের দোকানগুলিতে হানা দিয়ে উৎকোচ স্বরূপ তারা প্রায়ই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দোকানদাররা ভয়ে ভক্তিতে প্রথমতঃ এঁদের জলযোগের যোগাড় করে দেয়। তার পরে এঁদের

নির্দেশমত তাঁদের চাপরাশীকেও ব্যাপারীরা খাইয়ে দেয়। এর পর এরা পারমিট্ আদি প্রাপ্তির আশায় অর্থাদি উৎকোচ দিয়ে এঁদের কাছেই "ফি" বাবদ টাকা জমা দেয়। এরা যথারীতি অকুস্থলেই রসিদ পায় বটে কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও এরা ডাকঘরের মারফৎ কোনও পারমিট্ বা ছাড়পত্র কখনও পায় নি।

এছাড়া জাল পুলিশ এবং জাল ইন্‌কাম্ ও সেলস্-ট্যাক্স অফিসার সেজেও দুর্বৃত্তরা প্রতারণা করে থাকে। জাল পুলিশ সেজে খানা-তল্লাসী করে দুর্বৃত্তরা যথারীতি সাক্ষীর সামনে লিস্ট করে গৃহস্থদের অলঙ্কারাদি চোরাই মাল সন্দেহে গ্রহণ করে সরে পড়েছে। এইরূপ চৌর্য-বৃত্তির কাহিনীর কথাও এদেশে শোনা গেছে।

কোনও কোনও প্রতারণা অপরাধ এমন সাবধানে পরিকল্পিত হয়, যাতে করে প্রতারকরা সহজেই প্রচলিত দণ্ডবিধিকে এড়িয়ে চলতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। এই চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"একদিন আমি অফিস ঘরে বসে আছি। এমন সময় একটি দালাল ভদ্রলোক এসে হাজির। কিছুদিন যাবৎ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা চলছিল। তিনি আমাকে জানান যে, খড়্গপুরের কোনও এক বড় রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর তাঁর কণ্ট্রাক্টের কাজের জন্যে একটি ফায়ার ইঞ্জিন কিনতে চান। এ জন্য নাকি তিনি চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি আছেন। আপাততঃ তিনি এ জন্যে কলকাতায় এসে অমুক হোটেলে বাসা নিয়েছেন, ইত্যাদি।

এর পর আমি দালাল ভদ্রলোকের পরামর্শ মত কিছু দাঁও মারবার আশায় সারা শহরে উক্ত রূপ ইঞ্জিনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমরা ঐরূপ কোনও পুরানো ইঞ্জিনের সন্ধান পাই না। এর পর

দালাল ভদ্রলোক আমাকে একটি নামকরা ওআর্কশপে এনে হাজির করে। এখানে আমরা কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একটি ইঞ্জিনের সন্ধান পাই। আর তৎক্ষণাৎ অমুক হোটেলে এসে উক্ত কণ্ট্রাক্টরের সহিত মুলাকাৎ করি। তাঁর বেশভূষা এবং আদবকায়দা ও ভদ্রতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরের দিন ব্যবস্থামত কণ্ট্রাক্টর মশাই একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের সমক্ষে ইঞ্জিনটি পর্যবেক্ষণ করে মত দেন যে চল্লিশ হাজার টাকায় তিনি উহা কিনতে রাজি আছেন, এবং ঐ সময় এও ঠিক হয় যে আমরা যেন ইঞ্জিনটি ওঁর ওখানে পৌঁছে দিয়ে প্রাপ্য মূল্য বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে আসি। পরের দিন আমি নগদ কুড়ি হাজার টাকা মূল্যে ইঞ্জিনটি ক্রয় করে উহার ডেলিভারি দিতে গিয়ে দেখি উক্ত কণ্ট্রাক্টর মশাই উধাও হয়েছেন। এর পর আমি জানতে পারি যে উক্ত ইঞ্জিনটির আসল মূল্য দুই হাজার টাকারও কম। প্রতারণাটি আসলে কণ্ট্রাক্টর, দালাল এবং জাল ইঞ্জিনিয়ারের যোগসাজসে উক্ত মেসিন বিক্রয়কারী ব্যাপারীটির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু আইনতঃ এ জন্যে তাঁকে কোনও রূপে দায়ী করা যায় নি। কারণ যন্ত্রাদি কণ্ট্রোলড্ না হলে ফ্যান্সি প্রাইস্-এ যে কোনও মূল্যে উহা বিক্রয় করা আইনতঃ অপরাধ নয়।"

এই বিশেষ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি ফরিয়াদীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার কাছে একদিন রতনবাবু এসে জানালেন যে, হরি সিং নামক এক বিদেশী ব্যবসায়ী এই নমুনার বহু যন্ত্র সাপ্লাই চায়। কয়েকদিন পরে এই দালাল রতনবাবুই আমাকে নিয়ে বহু দোকানে ঘুরে একটি দোকানে ঐরূপ কয়েকটি যন্ত্র খুঁজে বার করলেন। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য ঐ দোকানী মাথুরাম ৫০৲ টাকা চেয়ে বসলেন। ওদিকে কিন্তু

দালাল রতনবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং প্রতিটি যন্ত্র পিছু ১০০৲ টাকা দিতে রাজি। এর পর আমরা ঐ যন্ত্রের নমুনাসহ ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং-এর কাছে উপস্থিত হই। ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন সাহেব দ্বারা ঐ যন্ত্রের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে আমাকে অনুরূপ ৪০০০ পিস্ যন্ত্র তাঁদের সাপ্লাই দেবার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমি প্রথম লটে ঐরূপ দুই হাজার পিস্ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মজুত করি। কিন্তু তার পরই দেখি ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন। এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে দেখি যে ঐরূপ যন্ত্র বাজারে প্রতি পিসে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে, ঐ বাঙালী দালাল, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ও তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ মাড়োয়ারী দোকানী প্রভৃতি সকলেই একই দলের দলী।

আমি এর পর ঐ মাড়োয়ারী দোকানী মাথুরামের দোকানে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি নির্লজ্জভাবেই উত্তর দিলেন, 'আরে আপনি যে বুদ্ধিতে হেরে গেছেন। এই সহজ কথাটাও এখনও আপনি বুঝছেন না। এখন নিয়ে আসুন আপনার মত আর এক মক্কেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে। তা' হলে আপনি আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাবেনই, তা ছাড়া আপনি ঐ বাবদ আরও কিছু হিস্সা বা ভাগ পাবেন।' এর পর আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের নামে কেস্ করব জানালে দোকানী ভদ্রলোক শান্তভাবে উত্তর করলেন, 'আচ্ছা! এ সম্বন্ধে একটা মিটমাট করব। কিন্তু এ সপ্তাহে তা' হবে না। আচ্ছা! আপনি দিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, যাতে আপনাকে দুই-তিন দিনের

'মধ্যে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই কথা বলে লোকটি একটা ভাঁজ করা কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তার নিচেটা আমাকে দেখিয়ে দিলে। আমি অর্থনাশের কারণে এমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এবারও আমি তাদের ধাপ্পায় ভুলে সেইখানে আমার নাম ও ঠিকানা স্বহস্তে লিখে দিলাম। এর পর ঐ লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ঐ কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলে দেখলাম যে, আমার সইয়ের পাশে একটা রেভিনিউ টিকিট এঁটে তাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে এবং উহাব উপরেই মানানসই রূপে টাইপ করে ইংরাজিতে লেখা রয়েছে, 'আমি অমুকেব নিকট হতে এই বাবদ এত টাকা ফিরত পাইলাম।' আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে লোকটি অট্টহাসি হেসে বলে উঠল, 'এই দেখুন দ্বিতীয়বাব আপনি ঠকলেন। অর্থাৎ বুদ্ধির লড়াইয়ে আবার আপনি হাবলেন'।"

[মূল্যবান অথচ বাজাবে অচল এমন বহু দ্রব্য আছে, যেমন এরোপ্লেনের পার্টস। এইগুলিই প্রবঞ্চনার কর্মে ব্যবহৃত হয। এক প্রবঞ্চিত ভদ্রলোককে পূর্বাহ্ণে সাবধান করাতে সে আমাকে বলেছিল, —'না, না। আমি লোভ সামলাতে পাবছি না। দুটাকাতে ২০ টাকা লাভ।' ব্যবসা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও লোভী ব্যক্তিরাই এইরূপে ঠকে।]

কালীঘাটের কালী মন্দিরের নিকট সম্প্রতি এক অভিনব উপাযে লোক ঠকানোব পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। এই প্রবঞ্চনার জন্য অজ্ঞ গ্রাম্য তীর্থযাত্রীদেরই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। এই অপকর্মের জন্য জনৈক দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি সুন্দর ফটো দেখিয়ে বলে যে, তার এইরূপ এক ফটো ১৲ টাকা মূল্যে সে তুলে দিতে পারবে। এর পর ঐ দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি ফটোর দোকানে বসিয়ে

দিয়ে অলক্ষ্যে সরে পড়ে। তার পর ফটোওয়ালা ক্যামেরায় কোনও প্লেট না দিয়ে মিথ্যা করে ফটো তোলার অভিনয় করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির নিকট মূল্য চায়। এর পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তি দালালের কথামত তাকে একটি টাকা দেওয়া মাত্র ক্রোধের ভান ক'রে ঐ দোকানী বলে উঠে, 'সে কি মশাই! কে বললে এক টাকায় ফটো উঠানো যায়? এক-খানি ফটো প্লেটের মূল্যই যে ৩৲ টাকা। শীঘ্র নিয়ে আসুন আরও চার টাকা।' প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ টাকা না দিতে পারলে তার সেই একটি টাকা তারা ফটো না দিয়েই বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তবে যদি বাকি চার টাকা তারা দিতে পারে তাহলে পরে সত্যকার ফটো প্লেট দিয়ে তার একটা মামুলী ফটো তারা তুলে দিয়েছে।

চাকুরি এই বাজারে দুর্লভ হয়ে উঠায় চাকুরি-প্রত্যাশী ব্যক্তি-দেরই ঠগীরা অধিক সংখ্যায় ঠকাতে সচেষ্ট হচ্ছে। সাধারণতঃ মধ্য-বিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বেকার যুবকরা এর শিকার হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"ঐ দিন একটা বুইকগাড়ি করে একটি সুবেশ দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমাদের বাটী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক বাবু কি বাড়ি আছেন?' উত্তরে সসম্ভ্রমে আমি তাঁকে জানালাম, 'আজ্ঞে, বাবা তো দিল্লী গেছেন।' 'ওঃ তাই না'কি?' একটু চিন্তিত ভাবে ভদ্রলোক বলেন, 'তবে তো মুস্কিল হ'ল। তিনি কার একটি চাকুরির জন্য আমাকে বলেছিলেন। একটা ৪০০৲ টাকা মাহিনার সাব-ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরি। আজই যে লোকটিকে দরকার ছিল। আচ্ছা! তিনি ফিরলে এই কার্ডখানা তাঁকে দিও।' ঐ কার্ডখানাতে লেখা ছিল, মিঃ এস বোস, B. E. A. N. C. I. E. [cuperhill] Supdt. Eng.। আমি বিব্রত হয়ে'বললাম, 'আজ্ঞে আমি একজন B. E,, আমার জন্ত তিনি

বলেছিলেন। এখুনি কি কোথাও যেতে হবে? তা চলুন তাহলে যাব আমি।' 'তাই না'কি! আরে গুড, গুড, তবে এস শীঘ্রি', বলে ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসলেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে একটা স্যুট পরে তাঁর পাশে এসে বসেছি। এমন সময় আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করো না, একটা ভুল হয়ে গেল। আমার কাছে অবশ্য একশ' টাকা আছে, কিন্তু আরও দু'শো টাকা চাই। একটা কিছু কিনে ডাইরেক্টার সাহেবকে প্রেজেন্ট দেওয়া দরকার। দেখ তো মার কাছে শ' দুই টাকা হবে কি'না? অগত্যা আমি বাড়ি ফিরে মার কাছ হতে দু'খানা একশ' টাকার নোট এনে ভদ্রলোকের হাতে তা তুলে দিলে ভদ্রলোকটি বলেন, 'তা হলে চল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটা ঘুরে ওখানে যাই।' এর পর ধর্মতলায় এসে আমার চুলের দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে! এ কি করেছ তুমি? এই রকম একটা ফার্স্ট ইম্প্রেশন সাহেবকে তুমি দেবে! ছিঃ, যাও চুলটা সেলুন থেকে তাড়াতাড়ি ছেঁটে নাও।' আমি তাঁর কথামত একটা সেলুনে ঢুকে চুল ছেঁটে বেরিয়ে এসে দেখি ভদ্রলোক টাকাসহ ঐ গাড়ি করেই অন্তর্ধান হয়েছেন।"

প্রবঞ্চনার পদ্ধতিসকল বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। নিম্নে অপর আর এক প্রকার প্রবঞ্চনা সম্পর্কীয় বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহরীর দোকানে একশ' টাকা ভাঙ্গিয়ে মাত্র দশ টাকা মূল্যের একটা গহনা কিনে নিয়ে এস। দোকানটি খরিদ্দারবহুল হওয়ায় ঐরূপ বহু একশ' টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে। আমরা কিন্তু ঐ একশ' টাকার নোটটির নম্বর পূর্বাহ্ণে টুকে রেখেছিলাম। এর পর বিকাল তিনটায় আমি ঐ দোকানে এসে একটি দশ টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকা

মূল্যের একটি রূপার কৌটা কিনি। ঐ কাউণ্টারের বিক্রেতা আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিলে আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এ্যাঁ, এ'কি মশাই! আমি যে একশ' টাকার নোট দিয়েছি!' ততক্ষণে ঐ দোকানী ঐ দশ টাকার নোটটি বহু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে এই বাক্সে রেখে দিয়েছেন। দোকানী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে আমি আমার নোট বুকে লিখা একশ' টাকার নোটের নম্বরটি তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটি আপনাদের ঐ বাক্সে আছে কি'না?' দোকানী খুঁজে তার বাক্স হতে ঐ নম্বরের একশ' টাকার নোটটি বার করে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো! তা'হলে আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু ঐ দোকানী যদি তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন তা'হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সাহায্যে ঐ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে ঐ নোট আমারই।"

অভাব অনটনে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠায় তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। এই সময় নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো সে ভাসমান খড়-কুটোও ধরতে রাজি। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে তারা আশাভঙ্গজনিত দুঃখ পেতে চায়নি। বহু ক্ষেত্রে জুয়া খেলার [চান্স ট্রাই] মতো তারা এগোয়। এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি ঘটনামূলক বিবৃতি উদ্ধৃত করে দিলাম।

"ঐ ভদ্রলোকটি বারাকপুর মহকুমার এক ফ্যাকটরির কর্মচারী। আমাকে এসে জানালো যে ৩০০৲ টাকা লেবার অফিসর এবং ওআর্কস্ ম্যানেজারকে দিলে তবে আমার চাকুরি হবে। সে এও বললে যে তাদের ফ্যাকটরির বড়ো ম্যানেজার উৎকোচ গ্রহণ করেন না। আমি পড়শীদের কাছে ধারধোর করে ১০০৲ টাকা সংগ্রহ করে তাকে তা দিই।'

সে উহা গ্রহণ করে কি ভেবে রুখে উঠে তা আমাকে ফেরত দিয়ে বললে,—'না না মশাই ! যদি ৩০০৲ টাকা যোগাড় করতে পারেন তো আসুন, নইলে আমার দ্বারা আপনার চাকুরি যোগাড় অসম্ভব।' এই ভাবে ঐ টাকা ক্রোধের সাথে ফেরত দেওয়াতে তার উপর আমার বিশ্বাস বাড়ে। এর পর আমি তার পরামর্শ মত স্ত্রী ও মা'র গহনা খুলে তা তারই পরিচিত এক সেকরাকে বাঁধা দিয়ে বাকি ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করি। আমি পরে শুনি যে ঐ ব্যক্তি এই ভাবে বহু ব্যক্তিকে, মায় তার নিজের ও কাজিন ভাইদের এবং তার নিজ খুড শ্বশুরকে চাকরির লোভ দেখিয়ে ঠকিয়েছে। আমি ঐ ১০০৲ টাকা বাদে আর টাকা তাকে না দিলে সে ঐ ১০০ টাকাই গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করতো। এরূপ ঘটনাও দুই এক ক্ষেত্রে ঘটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে সে অপরের জমি দেখিয়ে ২০০ টাকা গ্রহণান্তে বায়না পত্র করেছে। এর পর মূল দলিল তৈরি করবার অজুহাতে সে সেটা চেয়ে নিয়ে আর ফেরত দেয় নি। কম মূল্যে জমি সংগ্রহে প্রয়াসী বহু নির্বোধ ব্যক্তিকে সে অপরের জমি বিক্রয় করে। এমন কি এক অনভিজ্ঞ সদ্যাগত পূর্ব দেশের বাস্তুহারাকে সে গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নিচে এক বিঘা জমি বিক্রয় করবে বলে। এই ব্যক্তির প্রধান সহায়ক তার নিজেরই এক ভ্রাতা। সে দূরে নিরাপদে থেকে তারই সহায়তায় প্রবঞ্চনা দ্বারা উপার্জিত অর্থের ভাগ নেয় এবং আদালতে তদ্বির তাগিদ করে। কখনও কখনও গুণ্ডা আমদানী করে এরা নিজেদের শক্তি বর্ধন করে। এই ভয়ে অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় না। এই ব্যক্তি এতো লোককে ঠকিয়েছে যে তাদের ভয়ে তার কর্মস্থলে যেতে পর্যন্ত সে অপারক। এখন সে ক্ষুধার তাগিদে এই ভাবে এখনও লোক

ঠকায়। সে তার নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকেও অপকার্যে তার সহায়ক রূপে নিযুক্ত করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার অন্য ভ্রাতাটির সক্রিয় সাহায্য মধ্যে মধ্যে বন্ধ হলে সে সৎভাবে জীবন যাপনে প্রয়াস পায়। আরও আশ্চর্য এই যে, তার ঐ ভ্রাতাটি তারই কর্মস্থলে বেশি মাহিনার এক চাকুরে। এক প্রবঞ্চক উকিল ভদ্রলোক এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করে। ইনি স্থানীয় সরকারী কর্মীদের উপর এদের রক্ষার্থে প্রভাব প্রয়োগও করে থাকেন।"

মিথ্যা বিজ্ঞাপন

মিথ্যা [ভুয়া] বা অলীক বিজ্ঞাপনের ইংরাজি নাম 'বোগাস এডভারটাইজমেণ্ট'। এরূপ বিজ্ঞাপন পত্রিকাদিতে দিয়ে দুর্বৃত্তরা সরল চিত্ত ভদ্রলোকদের ঠকিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন দ্বারা মানুষের মন ভুলিয়ে দুর্বৃত্তরা মন্দ দ্রব্য ভাল বলে প্রায়ই দেশবাসীকে অধিক মূল্যে গছিয়ে দিয়েছে। এই বিজ্ঞাপন বাকৃপ্রয়োগের কাজ করে। এই কারণেই ইহা সম্ভব হয়ে থাকে। এদের অনেকে ভি, পি, করে মফঃস্বলে মাল পাঠায়। কিন্তু তারা আসল মাল না পাঠিয়ে পাঠায় নকল মাল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। বহুদিন পূর্বে কোনও এক শহরে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় "ছারপোকার অব্যর্থ ঔষধ; দুই টাকা মনি অর্ডার করে পাঠান চাই। এ ছাড়া পত্রের সঙ্গে এক আনা মূল্যের একটা ডাক টিকিটও।" যে সকল ভদ্রলোক এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কয়েকদিন পরে

"ছারপোকার ঔষধের" বদলে এক পত্র পান। পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল—"ধরো আর মারো।"

যৌন ব্যাধি ও যৌন-শক্তিহীনতার ঔষধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা অধিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের ঠকান হ'য়ে থাকে। এই অপরাধ নিবারণের জন্য বিশেষ একটি আইনও সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাধি গোপন করার প্রবণতার জন্য উহা কার্যকরী হয় নি।

এ ছাড়া অপর আর একটি অপরাধও এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দুর্বৃত্তরা করে থাকে। এই বিশেষ প্রবঞ্চনাকে ইংরাজিতে বলা হয় সাইকেল চেন [cycl: chain]। বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা হয়: "কেউ পাঁচ টাকা পাঠালে পঞ্চাশ টাকা পাঠানো হবে।" দুর্বৃত্তরা এজন্য রীতিমত অফিসও খুলে থাকে। এরা মানুষকে বুঝায় যে, এই চেন্ কখনও ছিন্ন হবে না। অনন্ত কাল ধরে এক দল টাকা দেবে এবং অপর আর এক দল উক্ত হারে টাকা পাবে। এঁরা বলেন, পৃথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির হার এমনিই বেশি। পৃথিবীর মানুষ নিঃশেষিত না হলে এই চেন্ কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অতীব মিথ্যা। পৃথিবীর সব মানুষ এই ভাবে ঐ অফিসেই টাকা পাঠালেও প্রত্যেক অর্থ-প্রেরক প্রেরিত টাকার অতগুণ বেশি টাকা পেতে পারে না। আসলে এই সব দুর্বৃত্তরা মাত্র কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতি মত টাকা পাঠায়। এতদ্দ্বারা মানুষের লোভ বেড়ে গেলে শেষে এদের কয়েকজন পাঁচ টাকার বদলে এক সঙ্গে পাঁচশ', হাজার বা ততোধিক টাকা পাঠায়। ইহার দশ গুণ বেশি টাকা ফিরে পাবার আশায় তারা এতে রাজি হয়। ঠিক এই সময়ই দুর্বৃত্তরা অর্থাদি সহ অফিস বন্ধ করে সরে পড়ে। পুলিশের চেষ্টায় এই সব দুর্বৃত্তরা নিঃশেষিত হয়েছে। কোনও কোনও দুর্বৃত্ত এই ব্যাপারে আত্মপক্ষ

সমর্থনে বলে থাকে যে, তাদের এই টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে উহা বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনাও ছিল এবং এই জন্য পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা পাঠান তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি, ইত্যাদি। কিন্তু তদন্ত দ্বারা দেখা গেছে যে তাদের এরূপ ব্যাখ্যা সর্বৈব মিথ্যা।

অধুনা কালে এই পদ্ধতির একটু আধটু অদল-বদলও হয়েছে। এই নূতন পদ্ধতিতে প্রথমে এক টাকা মূল্যের একটা ফর্ম বিতরণ করা হয়—গ্রাহক এই ফর্মে পাঁচজনের নাম লিখে উহা ঐ অফিসে পাঠিয়ে দেয়। অফিস তখন ঐ পাঁচজনের নামে এক-একটা ফর্ম পাঠায় এবং এক-এক টাকা প্রতি ফর্মের জন্য মূল্য বাবদ তারা আদায় করে। এই ভাবে তারা তাদের কাজ হাসিল করবার জন্যে বহু গ্রাহককে যোগাড় করতে সক্ষম হয়। এই সকল পদ্ধতিকে নিঃসন্দেহে অপপদ্ধতি বলা যেতে পারে; অন্ততঃ আমার মত অনেকেই এইরূপ মনে করেন।

[এ ছাড়া ভেজাল খাদ্যকে খাঁটি বলে ও নকল ঔষধকে আসল বলে চালিয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে তো বটেই! এমন কি উহার দ্বারা তারা তাদের প্রাণহানিরও কারণ ঘটাচ্ছে। আধুনিক বাঙালীর মেধা ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এই ভেজাল খাদ্যের অতি প্রসার। এ'ছাড়া প্রসাধন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জাল করেও প্রবঞ্চনা-কার্য করা হয়ে থাকে।]

তেতাস ও ফিতা খেলা

কার্ড ট্রিক্স বা তেতাস এবং ফিতা খেলা রূপ প্রবঞ্চনা এ দেশে নিম্ন শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। ফিতা খেলাকে ইংরাজিতে বলা হয়, "টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্"। প্রথমে এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ সম্বন্ধে বলা যাক্। বিড্ গ্যাম্বলিঙ্-এর ন্যায় এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্ও আসল জুয়া নয়। উহা এক প্রকাব প্রতারণা মাত্র। এই সব প্রতারকরা প্রাবই দিবা ভাগে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং এই জুয়া দ্বারা নিম্ন শ্রেণীব ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে।* ফিতা খেলায় প্রতারকরা একটি সুতার লেস্তিকে একটি পেন্সিলের চারি পাশে জড়িয়ে নেয। এর পর পেন্সিলটি বার করে নিয়ে উহা শিকারদের [victim] হাতে তুলে দিয়ে তারা পেন্সিলটিকে পুনরায় এই জড়ানো সুতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে। এর পর সুতার একটি মুখ ধরে টান দিলে যদি উহা ফেঁসে যায় তাহলে তার হার হলো অর্থাৎ পেন্সিলটি সুতার ফাঁকে আটক না পড়লে শিকার বা ভিকটিমের হার হবে। এইরূপে ফেঁসে যাওয়া বা না যাওয়ার উপর বাজি ধরা হয়।

---

* কেহ কেহ মনে করেন, পুলিশের অসাধু সিপাই-জমাদারদের সহিত এদের যোগসাজস্ আছে। ভারতীয় পুলিশ সম্বন্ধে ইহা সর্বৈব মিথ্যা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিতও হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়।

এই সুতা জড়ানো এমন কায়দার সহিত সমাধিত হয় যাতে করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি হেরে যেতে বাধ্য। নিম্নের চিত্র দুইটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। প্রথম চিত্রে সুতাটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ানো হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে এই সুতা জড়ানোর মধ্যে একটি বিশেষ কায়দা বা ফাঁকি পরিলক্ষিত হবে।

প্রথম চিত্রের ক এবং খ দড়ির প্রান্ত দুইটি ধরে টান দিলে পেন্সিলটি আটকে যাবে। কিন্তু পর পৃষ্ঠায় গ ও ঘ চিত্রে প্রদর্শিত দড়ির

প্রান্ত ধরে টান দিলে পেন্সিলটি কিছুতেই আটক পড়বে না। এই বহু নিন্দিত ফিতা খেলা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার তেতাস জুয়া খেলা সম্বন্ধে বলব। তেতাস খেলার মধ্যেও এইরূপ অনেক ফাঁকি থাকে। তাস সাজাবার কায়দার গুণেই এইরূপ সম্ভব হয়। অনেক সময় হাত

সাফাইয়ের দ্বারা বিবি বা গোলামখানা সরিয়েও ফেলা হয়, কারণ এই বিবি বা গোলামের উপরই হার-জিত নির্ভর করে। তেতাস খেলোয়াড়দের ইংরাজিতে বলা হয় "কার্ড সারপার"। সাধারণতঃ একখানি গোলাম বা বিবি এবং দুখানি অন্য তাস নিয়ে এই খেলার সূচনা করা হয় এবং পরে বিবি বা গোলামখানি সরিয়ে অন্য একটি সাধারণ তাস মূর্খ মানুষদের ঠকাবার জন্যে তৎস্থলে নীত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গরিব শ্রমিক শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরাই এই সকল প্রবঞ্চনার শিকার হয়।

এই সব অপরাধীরা প্রথমে নিজেদের লোকদের দ্বারাই এই খেলা শুরু করে দেয়। সাধারণ পথিকরা এদের জিততে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে এই খেলায় যোগ দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এই অপরাধীরা পিল্টি করা

সোনার হার গলায় দিয়ে ঘুরাফিরা করে। দরিদ্র মূর্খ শ্রমিকেরা এই হার দেখে এদের ধনী লোকই মনে করে—এতে তাদের ধারণা হয় এরা প্রচুর অর্থ দান করতে সক্ষম। কখনও কখনও এরা অর্থ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি কেড়ে-কুড়েও নিয়েছে। ঐ সব ঘটনা ওদের মিশ্র দলের কারণেই ঘটে থাকে।

যৌনজ প্রবঞ্চনা

এই সাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও দৃষ্ট হয়। এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীরা বহু অবলা বালিকার সর্বনাশ সাধন করেছে। এই সব ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা সরলমতি বালিকাদের কিংবা এই সব বালিকাদের অভিভাবকদের বুঝায় যে তারা ঐ কন্যাদের বিবাহ করবে। অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলামেশায় বাধা তো দেনই না, বরং আশাপ্রদ বুঝে একটু আড়ালে তাঁরা সরে থাকেন—বড়লোক জামাই কে না চায়, বিশেষ ক'রে এই দুর্মূল্যের যুগে। এ ছাড়া মেয়েরাও গরিব পিতামাতার স্কন্ধ হ'তে নামতে পারলেই বাঁচে।

এরা প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দেয়। এই সময় বালিকারা এদের নিশ্চিত রূপে ভবিষ্যৎ স্বামী জ্ঞান করে প্রায়ই দেহ দান করে থাকে। কিন্তু পরে কোনও-না-কোনও এক অছিলায় এই দুর্বৃত্তরা তাদের পূর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করে নির্বিঘ্নে সরে পড়ে। লজ্জার খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব বালিকারা এবং

তাদের অভিভাবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অক্ষম হন। এই সব সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। "বিবাহ করবো" এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে এই সব বালিকারা দেহদান রূপ কার্য হতে বিরত থাকত। এই কারণে প্রবঞ্চনা-অপরাধের সংজ্ঞানুযায়ী এই দুর্বৃত্তরা প্রবঞ্চক মাত্র। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, কিম্বা (২) কেহ যদি কাহারও উক্তরূপ কার্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূত হতে দিতে সম্মতি জানায়, কিম্বা (৩) কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্য করে বসে বা উহা না করে, যে কার্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করত না বা তা করতে বিরত হ'ত, প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা বলা হবে।"

শঠতার উপরি উক্ত সংজ্ঞা হ'তে প্রতীত হবে যে, কেবল মাত্র দ্রব্যাপহরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকায় না। অন্যান্য ভাবেও মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে। "দ্রব্যপ্রদানের" বদলে কোনও "কার্য করান বা না করানর" উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হয়। যৌন-রোগগ্রস্ত নারী যদি কোনও যৌন রোগ-ভীত সাবধানী ভদ্রলোককে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে তার কোনও যৌন রোগ

নেই এবং ঐরূপ ভাবে তাকে বিশ্বাস করিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে তাকে সম্মত করায় তা'হলে ঐ নারীর উক্তরূপ কার্যকে আইনানুসারে প্রবঞ্চনা বলা হবে। কারণ এতদ্দ্বারা ঐ ভদ্রলোকের দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা তা হ'তে পারে। অনুরূপ ভাবে কোনও ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে, সে তাকে বিবাহ করবে [মনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না করেই] এবং ঐরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা দ্বারা যদি সে সেই মেয়েটিকে তার সঙ্গে যৌন সম্মিলনে সম্মত করায—যাতে কি'না সেই মেয়েটি কখনই সম্মত হ'ত না যদি না সে উক্তরূপে প্রবঞ্চিত হ'ত, তা হ'লে ভদ্রলোকের উক্ত কার্যটিকে আমরা প্রবঞ্চনা বলব। আইনানুসারে ইহা ৪২০ ধারা মতে দণ্ডনীয় অপরাধ।

কোনও এক বালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা! খুকি! তুমি বলতে পার তোমরা এত সস্তা হও কেন?" উত্তরে প্রবঞ্চিতা বালিকাটি বলে—

"কি করব আমি বলুন! সত্যি কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে কিছুতেই রাজি হই নি। সে হঠাৎ ভিখারীর মত আবেগপূর্ণ স্বরে বলে বসল, 'না রাণী! এ কিছুতেই হবে না। আজকের এই জ্যোৎস্না রাত্রিটি চলে গেলে তা কি আর ফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে তুমি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছ না! যাকে তুমি দু'দিন পর মাল্যদান করবে, তাকে কি তুমি এমনিই হীন মনে কর?' এর পর আমারও মনে কিছুটা দুর্বলতা আসে। আমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি। এর কিছুক্ষণ পরে আমি কেঁদে ফেলে তার গলা জড়িয়ে বলে উঠি, 'এ কি করলে তুমি? সত্যি! আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?' আমি কি তখন

জানতাম যে, এই কাজের পরও সে আমাকে বিয়ে না করে এমনি ভাবে পালাবে ?"

এই সম্বন্ধে আদালতে নালিশ জানালে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা প্রায়ই বলে, "হাঁ, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন আমি প্রতিজ্ঞামত বিবাহ করব বলেই আমি তা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।" এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত বালিকাটির পরবর্তীকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই অপরাধ অপরাধী পূর্বকল্পিত রূপে করেছে, অর্থাৎ কি না শুরু হ'তেই তার মনে অসদুদ্দেশ্য ছিল—এইরূপ প্রমাণ করতে না পারলে কেস্ প্রায়ই টিকে না। এই ধরনের একটি কেস্ কিছুদিন পূর্বে আমার গোচরে এসেছিল। এই স্থলে যুবকটি যথাক্রমে দুইটি মেয়েকেই একই সময় কথা দেয় যে মাত্র তাকেই বিবাহ করবে। বলা বাহুল্য, এই দুইটি মেয়েকে সে পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মেয়ে দুইটির পরস্পরের মধ্যে কোনও রূপ জানা-শুনা না থাকায় তারা সহজেই প্রতারিত হয়। এই দুইটি মেয়েই স্বাবলম্বিনী এবং বিত্তশালিনী ছিলেন। দুর্বৃত্তটি যথাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্যার বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী রূপেই বসবাস করত। এই মেয়ে দুইটি স্বগৃহে থাকাকালীন তাদের ভবিষ্যৎ-স্বামীর জন্যে নানাভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছে। কিছুদিন পরে দৈবক্রমে বিষয়টি উভয় কন্যারই কর্ণ-গোচর হ'লে উভয় কন্যাই সেই লোকটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোকটির এই অপরাধ যে পূর্বকল্পিত ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয় ; কারণ সে একই সময়ে দুইটি কন্যাকেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৈহিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। এই সকল বিবাহেচ্ছু

ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের সাবধানে মেলামেশা করা উচিত—কারণ, বিশেষ ক্ষেত্রে সামান্য খোরপোষের মামলা ছাড়া এইসব প্রতারকদের অন্য কোনও রূপে শায়েস্তা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

সাধারণ প্রবঞ্চনার যৌনজ পদ্ধতির অপব একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একটি বিশেষ চালাকীর সহিত ইংরাজ দুহিতাটিকে প্রলুব্ধ ক'রে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত করাই। আমার বাস ছিল "অতো" নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। আমি মায়ের বাক্সো ভেঙ্গে অর্থ ও গহনা চুরি করে এক জাহাজে চাকুরি সংগ্রহ করে বিলাতে আসি। এই বিলাতে এসে ঐ মেয়েটির সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাকে আমি 'প্রিন্স অব্ গোয়ালটুলি', এই বলে নিজের পরিচয় দিই। এর পর আমি বেঙ্গলের ম্যাপ্ খুলে চিটাগাঙের কোল হতে মেদিনীপুরের কোল পর্যন্ত রেখা টেনে গোয়ালটুলি স্টেটের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পরিজ্ঞাত করাই। এই ইংরাজ দুহিতার ভারতের মহাধনী নেটিভ্ প্রিন্সদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। তাই সহজেই আমার সাথে বিবাহ করতে তাকে রাজি করাই।"

এইভাবে যে মাত্র ওদেশের মেয়েরাই ঠকে থাকে তা নয়। এ দেশের মেয়েদের আরও সহজে দুর্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। আমি এমন একটি কন্যার কথা শুনেছি যাকে, "চল আমরা চলে যাই, কেমন সুন্দর ভাবে আমরা থাকব। লেকের ধারে হলদে রঙের বাড়ি করবো। সবুজ রঙের একটা নৌকা থাকবে। মধু যামিনী ভর সেখানে চাঁদ উঠবে। আমরা তখন মোটরও একটা আয়ত্তে রাখব" ইত্যাদি কথা বলে জনৈক অতি নিঃস্ব দুর্বৃত্ত তাকে সহজেই আয়ত্তে আনতে পেরেছিল।

এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা যে ছেলেরাই মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে তা

নয়। বহু ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরলচিত্ত ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ "বাহানার" সাহায্যেই মেয়েরা এই সম্বন্ধে ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। "বাহানা" পরিশব্দ অপরাধ-বিজ্ঞানের দুর্বৃত্তদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। এই বাহানা রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ রূপজীবিনীরা বিশেষ করে এই বাহানার অভ্যাস করে থাকে। কিন্তু দুশ্চরিত্রা গৃহস্থ নারীদের এই পন্থা আজ আর অজ্ঞাত নয়। এদের কেউ কেউ দাদা বলে কাউকে জড়িয়ে ধরে তাদের পকেট বেমালুম হাতড়ে নিয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে এই "বাহানা" শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে।

"কিছু দিন পূর্বে আমি কোনও এক রূপজীবিনীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম ও শেষ সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, আমি ঐ মেয়েটিকে ভাল বেসেছিলাম। এমন কি তাকে আমি বিবাহও হয় তো করতাম। ঐ মেয়েটি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে, এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে এই সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের বাড়ি এসে হাজির হই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পাই আমার ঐ প্রিয়ার মায়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন—'হ্যালো, কে? বল বাবা, নাম বল। আমার কাছে লজ্জা কি? আমি চামেলীর মা, কে? রতীশবাবু!'

জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে রিসিভারটা মার হাত থেকে সোৎসাহে এবং আবেগের সঙ্গে কেড়ে নিল। এর পর প্রিয়তমাকে বলতে শুনলাম, 'এই দুষ্টু, পাজী কোথাকার, খুব কথার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ! আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, হাঁ—'

ততক্ষণে আমি ওদের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝোঁকটা কোনও রকমে সামলে নিয়ে চামেলী বললে, 'আরে তুমি? আরে? এস এস, ও মা!' একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে ফোন করছিলে?' দ্বিধাহীনভাবে চামেলী আমাকে উত্তর করল, 'দাদাকে—দা-দা।' হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে ও চামি, বিনু এসেছে।'

বিনুর আগমনের বার্তা কানে যাওয়া মাত্র চামেলীর মুখটা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল যে, সে শুধু বিব্রত নয়, এবার সে বেশ একটু সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছে। কোনও রূপে তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী আমার দিকে একবার চাইল। তারপর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কে—বিন্‌দা? এই বিন্‌দা?'

চামেলী বিন্‌দার নাম শুনে আমাকে আর কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়েই ঝড়ের মত বার হয়ে গেল। এত দাদার উৎপাত আমি পূর্বে সেখানে কখনও দেখি নি। দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চামেলী বলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে রয়েছ, না?' গম্ভীর-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কে এলেন?' মুখে চোখে একটা সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ মিটিমিটি করে সে চেয়ে রইল এবং তারপর হেসে ফেলে সে বলল, 'ওঃ হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা ভয় নেই! ও আমার দাদা, পিসতুতো ভাই।' সন্দিগ্ধভাবে আমি তখন উত্তর করলাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?' উত্তরে চামেলী আমাকে বললে, 'বাঃরে! লজ্জা করে না বুঝি?' এর পর, 'আসছি পাঁচ মিনিটের

মধ্যে' বলে চামেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম যে পাশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। বোধ হয় তাকেও 'পাশের ঘরে কাকাবাবু এসেছে। এই আসছি এক্ষুনি—' বা ঐ রকম একটা কিছু বুলি বলে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে সে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোককে একটু খুশি করে বিদেয় দিয়ে হয় তো সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হত। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের তলায় তিনখানা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে আসি। এর পর আর কখনও আমি সেখানে যাই নি।"

উপরি উক্ত রূপ বাঁধা বুলিগুলিকে বেশ্যা সমাজের লোকেরা "বাহানা" বলে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও একটি বিবৃতি দেওয়া যাক্।

"উপরে উঠে গদির উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, 'আহা! বাবার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। ওরে ও রাধু! ওরে ও মুখপুড়ী, এ ধারে আয় না। বাবা যে কতোক্ষণ বসে রয়েছেন।' কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে রাধু এসে হাজির হ'ল। বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের সুরে সে বলে উঠল, 'বারে! এতদিন পরে আসা হ'ল। আমার মন কেমন করে না, বুঝি!' এর কয়েক মিনিট পর বাইরে থেকে রাধুর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও রাধু! পাঁচটা টাকা তুই দিয়ে যা, দুধওয়ালা বড্ড গোলমাল করছে।' প্রত্যুত্তরে রাধু আমাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বারে! টাকা পাব কোথায় আমি? বললাম তো তখন দুধ আমায় খাইও না।' বলা বাহুল্য যে এর পর টাকা পাঁচটা বাধ্য হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয়; ঐরূপ পরিস্থিতিতে

এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে আমি শুনেছি যে, এগুলি টাকা আদায়ের এদের বাঁধা বুলি বা বাহানা।"

ভদ্র সমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার দ্বারা স্বামীকে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে ঠকিয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে কোনও এক ভদ্র নারী ত্রিতলের কক্ষে উপপতির [স্বামীর বন্ধু] সহিত প্রেমালাপের পর নীচে নেমে স্বামীকে অনুযোগ করে, "যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এতক্ষণ ধরে একলা থাকতে আমার ভাল লাগে না'কি ! ও কি নিষ্ঠুর গো তুমি ?" উপপতিটিও [স্বামীর বন্ধু] বন্ধুপত্নীর সহিত নেমে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর বৌদির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভৎ‍র্সনা করে বললেন, "সত্যি ! এ তোমার ভারি অন্যায়। এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব দুঃখই করছিলেন। কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি এস। বুঝলে ?"

ইহা অবশ্য আমার শুধু শোনা কথা নয়। বহু অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এই ধরনের "বাহানার" দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। বস্তুত পক্ষে এ পৃথিবী এ যুগের 'মেক্ বিলিভের' পৃথিবী।

চৌর্য অপরাধ

"চুরি বিদ্যা বড বিদ্যা, যদি না আমি পডি ধবা।" পৃথিবীর চৌষট্টিটি কলা বিদ্যার মধ্যে ইহা একটি অন্যতম কলা। ইহাকে মহা-বিদ্যাও বলা হয। অনেকেব মতে চুবিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যা। দ্রব্যাদিব স্বত্বাধিকারিত্বেব সৃষ্টিব সহিতই ইহাব উৎপত্তি। পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ বনেব ফলমূল খেযে জীবন ধারণ করত। অবশ্য তখনকাব অবণ্যাদিতে ফলমূলও ছিল অপর্যাপ্ত। এই কারণে সঞ্চযেব মনোবৃত্তিও তখন কাহাবও মনে স্থান পায় নি। প্রত্যেককেই স্ব স্ব খাদ্যাদি পবিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে বাধ্য হ'তে হ'ত। এব পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধিব সঙ্গে স্থান ও খাদ্যেব অভাব ঘটে। মানুষ তখন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সঞ্চয় করতে শুরু করে। প্রথম প্রথম পচ্যমান বিধায অধিক শস্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয নি। কিন্তু পরবর্তীকালে মুদ্রানীতি প্রচলনের পর তাদেব এই অসুবিধা দূরীভূত হয। সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাদ্যবস্তু এবং অর্থ সঞ্চয করা সম্ভব হয় না। ফলে পৃথিবীতে ধনী ও নির্ধনের এবং নিবলস ও অলস লোকের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে যে সকল লোক কর্মালস ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ চুরির অভ্যাস করে। পরবর্তীকালে মানুষ এই চুরির বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠলে এদের মধ্যে যারা অতি ধূর্ত তারা প্রবঞ্চনাব আশ্রয় নেয়। তবে চুরিই যে পৃথিবীর প্রথম অপবিদ্যা তাতে সন্দেহ নেই। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে শক্তিমান ব্যক্তিরা অপরের সঞ্চিত দ্রব্য কেড়েও নিত এবং এদের মধ্যে যারা

দুর্বল ছিল তারাই করত চুরি। এই চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি রক্ষার কারণেই মানুষ প্রথমে সমাজ এবং পরে রাষ্ট্র গঠন করে। এ কথা স্বীকার্য যে এই চৌর্য প্রভৃতি অপরাধের প্রাদুর্ভাবই মানুষকে সভ্য করেছে।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানুষ চুরি বিদ্যাটি পশুপক্ষীদের নিকটেই প্রথম শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, এক পশুর সংগৃহীত খাদ্য অপর পশু প্রায়ই চুরি করে থাকে। পশুদের সংগৃহীত খাদ্যাদি মানুষও যে চুরি করে নি তা'ও নয়। আজও পর্যন্ত মানুষ মৌমাছিদের সংগৃহীত মধু, পক্ষীকুলায় হতে পক্ষীশাবক ইত্যাদি চুরি করে থাকে। এমন কি, ব্যাঘ্রকুল সংগৃহীত মৎস্যও মানুষ চুরি করে থাকে। সুন্দরবনের মধ্যে এমন অনেক নদী আছে যার জল না'কি ভাঁটার সময় অতি সত্বর সরে যায়। এক শ্রেণীর ব্যাঘ্র না'কি এই সময় ভাঁটার কারণে অপসারিত স্রোতের সহিত ছুটে চলে এবং ঐ সময় তারা সম্মুখে মৎস্য পেলেই উহা বালির তলে পুঁতে রাখে ; এই ভাবে মাছ পুঁততে পুঁততে সে নদীর মোহনার মুখ পর্যন্ত চলে যায়। এরপর সে ফিরে এসে মাছগুলা একে একে না'কি উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করে। এদিকে শিকারী মানুষরা ঐ ব্যাঘ্রের পিছু-পিছু ধাওয়া করে ব্যাঘ্রের কষ্টলব্ধ মৎস্যগুলিকে তার অগোচরে উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ঘটনাটি অবশ্য আমার শোনা কথা হলেও উহা অবিশ্বাস্য নয়—যে মানুষ ব্যাঘ্রের দ্রব্যাদি চুরি করতে সমর্থ, সে সুবিধে পেলে মানুষের দ্রব্য চুরি করবে এতে আর আমাদের আশ্চর্য হবার কি আছে ? যাই হোক, মানুষ মানুষের দ্রব্য চুরি করলে মনুষ্য সমাজে উহাকে অপরাধ বলা হয়। এই সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইবার এই

চৌর্য অপরাধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

ভারতীয দণ্ডবিধিতে ১৭৮ ধারায় চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ—

"কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলীভূত ব্যক্তির বিনানুমতিতে আত্মসাৎ বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপসারণ করে তো তার এই কার্যকে [অপকার্যকে] চৌর্য কার্য বলা হবে।"

সাধারণভাবে আমরা এই চৌর্য অপরাধকে দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকি, যথা—বহিঃচৌর্য এবং গৃহচৌর্য। এই গৃহচৌর্য তিন প্রকারে সমাধিত হয়। উহাকে আমরা যথাক্রমে সরলচৌর্য, সবল-চৌর্য এবং ভৃত্যচৌর্য বলে থাকি। সাধারণ ভাষায় আমরা সবলচৌর্যকে বলি বাড়ির চুরি বা হাউস্ থেফট্, সবলচৌর্যকে বলি সিঁদেল চুরি বা বারগলারী [Burglary] এবং ভৃত্যচৌর্যকে বলি চাকর হিসাবে চুরি বা থেফট্ অ্যাজ সার্ভেন্ট্। এই বিভাগ কয়টির যথার্থ সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪ ও ৪৫৭ এবং ৩৮১ ধারায় দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে বহিঃচৌর্যকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাকি। যথা—(১) গাঁটকাটা, (২) জেবকাটা, (৩) পিকপকেট বা পকেটমার। এই পকেট মারের বাইরে আছে ছিঁচকা বা ছিন্নক চোর বা ছিনান্দার [Snatcher] যারা শিশু এবং মেয়েদের হার ইত্যাদি ছিনিযে নেয়। এই প্রকার চোরেদের বলা হয় ছিঁচকা চোর। আরও আছে উত্তোলক চোর বা চোরোত্তো-লক। এই উত্তোলক চোর [লিফটার] তিন প্রকারের হয়; যথা—শকট-উত্তোলক [cart lifter], বিপণি-উত্তোলক [shop lifter] এবং পাশব-উত্তোলক [cattle thief]।

এই ছিন্নক চোর বা স্ন্যাচার, জেবকাট চোর [pick-pocket], এবং উত্তোলক চোরদের কার্যকে একত্রে বলা হয় সহজচৌর্য। এই সকল অপরাধীরা কোনও অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করে না। আঘাত হানা এদের স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। ব্যক্তির পোশাক বা দেহ হতে কিংবা তার সন্নিকট হ'তে চুরিকে সহজচৌর্য বলা হয়।• কোনও ব্যক্তির পকেট, গাত্র বা হস্ত হ'তে বা তার সন্নিকট হ'তে দ্রব্যাদি অপহরণ করার বৈজ্ঞানিক নাম সহজচৌর্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পিক্‌পকেট বা পকেটমার এই সহজচৌর্যের অন্তর্গত একটি অপরাধ। পুরাকালে মানুষ যখন কোর্তা পরত না এবং টাকাকড়ি প্রায়শঃই গাঁটে বা ট্যাঁকে রাখতো, তখন সেখান থেকে টাকা অপহরণ করা হ'ত। এই জন্যে তখনকার যুগের এইরূপ অপরাধীদের বলা হ'ত গাঁট-কাটা। এক্ষণে জেব বা পকেটের সমধিক প্রচলনের ফলে এই গাঁট-কাটাইদের নূতন নাম হয়েছে জেবকাটা বা পকেটমার। মানুষের পোশাক ও ব্যবহারের পরিবর্তনই ইহার অন্যতম কারণ। এক্ষণে বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র কয়েকজন গাঁটকাটা আছে। এরা মাড়বারীদের কাপড়ের গিঁট কেটে অর্থাপহরণ করে। অধুনা কেউ কাপড়ের গাঁঠে বা খুঁটে টাকা না রাখাতে এরা আজ বিলুপ্তির পথে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চৌর্য অপরাধকে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ, অপরাধীদের শিক্ষা-দীক্ষা

• অসাধারণ চৌর্যও এই সহজচৌর্যের একটি উপশ্রেণী। এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। অসাধারণ চৌর্যের সাথে অসাধারণ প্রবঞ্চনার কিছুটা মিল আছে।

ও উহাদের দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের সহিত এই সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দেখা যায়।

পকেটমার

পকেটমার তথা পিকপকেটররা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। কালের গতিতে পোশাকের পরিবর্তনের সাথে উহার উদ্ভব। উহাদের যথাক্রমে, গাঁটকাট্টাই, জেবকাট্টাই ও তুলমারীয়া বলা হয়। এদের প্রাথমিক অপরাধীরা একক ভাবে কাজ করে ও বারে বারে কার্যপদ্ধতি বদলায়। কিন্তু এদের পুরানো পাপীরা একই প্রকার কার্যপদ্ধতি রক্ষা

করে। এরা সর্দারের অধীনে ছোট ছোট দলে [স্ব স্ব পদ্ধতি অনুযায়ী] কাজ করে।

(১) গাঁটকাট্টা—পূর্বের মানুষ ধুতি ও চাদরে শোভিত হতো। এ সময় এরা পরিধেয় বস্ত্রের [কোমরের নিচে] গাঁটে বা টেঁকে অর্থ রাখতো। এই গাঁট তারা ছুরি দিয়ে কাটতো বলে এরা ছিল গাঁটকাটা। এখন মানুষ কোট ও প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত হওয়াতে এই অপরাধীদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবে বড়বাজার অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ী আজও গাঁটে অর্থ রেখে ঘুরাফিরা করে। এখন ওদের কম সংখ্যার জন্য ঐ অঞ্চলে নয় জন গাঁটকাটা আজও টি"কে আছে। মোটরের প্রাদুর্ভাবের পর ঘোড়ার গাড়ির মত ওরা একেবারে বিদায় নেয় নি।

(২) জেবকাট্—আজকাল মানুষ পকেটে টাকা কড়ি রাখে। এজন্য এরা ব্লেড বা ছুরি দিয়ে এদের পকেট কাটে। এদের চাপ জ্ঞান অত্যধিক। কতটা চাপ দিলে শুধু পকেট কাটবে এবং গায়ের চামড়া কাটবে না—তা এরা এদের চাপবোধের কারণে জানে ও বুঝে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। এদের কার্যপদ্ধতি পরে বিবৃত করা হবে।

(৩) তুলমারী—এরা হাতের আঙুলের সাহায্যে পকেট হতে কায়দা মত ব্যাগ তুলে নেয়। এদেরকেই ইংরাজিতে পিকপকেট ও বাঙলাতে পকেটমার বলা হয়ে থাকে। এদের বিবিধ দলের বিবিধ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বিবৃত করা হবে।

বিঃ দ্রঃ—সিঁদেল চোরদের মত এরাও সর্দারের অধীনে ছোট-বড়ো দলে কাজ করে। বস্তুর বিরুদ্ধে [যন্ত্রের দ্বারা] বলপ্রয়োগী সবল অপরাধী বিধায় বাধা পেলে সিঁদেল চোর কখনও কখনও ব্যক্তিকেও আঘাত করেছে। কিন্তু পকেটমারগণ বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে

বলপ্রয়োগী অপরাধী নয়। তাই এরা ধরা পড়লেও কাউকে কখনও আঘাত করে না। প্রকৃত পিকপকেট অপরাধী সম্পর্কে ইহা অতীব সত্য। তবে প্রাথমিক তথা উঠতি অপরাধীদের পক্ষে কদাচিৎ এব ব্যতিক্রম হতে পাবে। বেশ্যা-সম্ভোগ, বস্তিবাস, হুল্লোড়, অর্থ পাচার-কাবী [নম্বরীনোটেব ক্ষেত্রে] প্রকৃত [উৎকট] পিকপকেটদের আচরণ সিঁদেল চোরদের সমতুল। তবে এরা সিঁদেল চোরদের মত অতো উগ্র প্রকৃতির হয না। পকেটমাররা প্রথমে পরস্পবেব পকেট মেরে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে। স্বয়ং সর্দার এদেরকে কায়দা-কানুন শিক্ষা দিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলে। এদের বেপরোয়া করবার জন্যে এদের জেল ঘুরিয়ে আনারও রীতি আছে। এইভাবে এদের জেল ও পুলিশ ভীতি দূর কবা হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতি হতে উহা বুঝা যাবে।

"সাক্ষাৎ ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে সে আমাকে নিয়ে ট্রামে উঠলো। এর পব সে একজনের পকেট সাফ কবে ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে গা' ঢাকা দিলে। সে সরে পড়তে পারলেও আমি বামাল সমেত ধরা পড়লুম। পথে ও থানাতে বেদম মার খেলাম। এর পর আমার মেয়াদও হয়ে যায়। খালাসের দিন সর্দাবের হুকুমে সে জেলেব বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে পাকড়াও করে সর্দারের কাছে আনলে সর্দার বললো—ঠিক হ্যায় বাচ্ছা। ডরো মাৎ। তুম ভুরণ শেয়না হোগী। এর পরের কাজগুলিতে আমি বহুদিন ধরা পড়ি নি।"

[সিঁদেল চোর ও পকেটমারদের দলপতি তাদেরকে বহুবিধ শিক্ষা দেয়। ওদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মার সহ করার শিক্ষা। নূতন বালক দলে ভর্তি হলে সর্দার তাকে বেপরোয়া মার দিতে থাকে। এতে তার

ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে ও মুখ ফুটবলের মত ফুলে উঠে। কিন্তু অতভেও সে বালকের চোখ দিয়ে জল পড়ে না।' এতে সর্দার খুশি হয়ে তাকে কাছে টেনে আদর করে বলে—'সাবাস। পুলিশ পিটনেভী এ কুছ নেহী বাতাবে। তুরণ এ রঙরুটসে লায়েকী বেনে যাবে! কুছ রোজ বাদ হামাদেব মত উ পক্কা শেষনা বনবে।' এব পর এর মুখে চোখে ঔষধ লেপন করা হয়। এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষা এরা পেয়ে থাকে।]

এদেরকে কচি নাউ-এর উপর ভিজা ন্যাকড়া জড়িয়ে ঐ কাপড় ব্লেড দিয়ে কাটতে অভ্যাস করানো হয়—এমন ভাবে যাতে শুধু ঐ কাপড়ই কাটা পড়ে, কিন্তু নাউ-এর গাযে ছুরির আঁচড়ও না পড়ে। এ'ছাড়া এরা গালের কসির ভিতর কৃত্রিম থলির মধ্যে লাল রঙের গুট পুরে রাখে। ধরা পড়ার পর নিজেরাই প্ররোচনা দিয়ে মারধর খেতে থাকে। ঐ অবস্থাতে তারা মুখ হতে ঝলকে ঝলকে কৃত্রিম বক্ত বমন করতে শুরু করে। পরে এরা মৃতের মতন শুয়ে পড়লে খুনের দায এড়াতে জনতা সেখান থেকে সরে পড়ে।

এদের কর্মক্ষেত্রের স্থানীয় টপোগ্রাফি সম্বন্ধে এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মস্থানের অলিগলি ও পলাবার বা লুকবার প্রভিটি স্থান ও উপায় এদের নখদর্পণে আছে। এইজন্য নিমেষে অদৃশ্য হতে এরা সক্ষম।

পকেটমারগণ নির্বল-চৌর্যাপরাধীর একটি উল্লেখযোগ্য উপশ্রেণী। এরা প্রায়ই দল বেঁধে কাজ করে। সাধারণতঃ এরা পঙ্কিল বস্তিগ্রামে বাস করে। এদের অধিকাংশই মোসলেমধর্মী হিন্দীভাষী। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ও পশ্চিমী হিন্দুও এদের মধ্যে আছে। এরা প্রায়ই জাঁদরেল সর্দারদের অধীনে কাজ করে। এদের এক একটি দলে ১—১২

জনেরও অধিক ব্যক্তি যুক্ত আছে। কখনও কখনও ওরা এককভাবে কার্য করে থাকে। কখনও কখনও বা এরা দল বেঁধে অপকর্মে বাহির হয়। পূর্বে এদের দলগুলি অভ্যন্তরূপ সুগঠিত হ'ত। পূর্বে এদের নিজস্ব অফিসও ছিল। এই অফিসগুলি চলন্ত [moving] ছিল। পুলিশের ভয়ে এরা প্রতিদিনই এক বস্তি হতে অপর এক বস্তিতে এদের অফিস বা আড্ডাঘর স্থানান্তরিত করেছে। দলের লোকেরা দিনান্তের স্ব স্ব উপার্জিত বস্তু বা অর্থাদি এই সব অফিস বা আড্ডা-ঘরে এনে সর্দারের নিকট জমা দিত। সর্দারজী এই সব অপহৃত অর্থ সমান ভাবে সাকরেদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এতে এদের দলের সকলেরই সমান সুবিধে হ'ত। কোনও দিন কোনও ব্যক্তি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে না'ও পারলে তার কোনও অসুবিধা নেই। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সেও সেদিন কিছু হিস্যা নিয়ে ডেরায় ফিরতে পারবে। এ সবের বড় হিস্যাটি অবশ্য সর্দারজীই নিতেন। পরিবর্তে চোরাই মাল পাচারের এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এবং তাদের দায়-অদায়ে দেখার ভার এই সর্দারজীর উপর বর্তাতো।

এই অফিস বা আড্ডাঘর সম্বন্ধে আমি একজন পুরানো অফিসারের মুখে অনেক কিছু শুনেছিলাম। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই আড্ডাঘর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। আজও কয়েকস্থানে উহার প্রচলন আছে।

"বহু কষ্টে তাদের আড্ডাঘরটি সম্বন্ধে আমি খবর পাই—একজন ইনফরমারের সাহায্যে। মাত্র দিন দুই পূর্বে এরা অমুক বস্তি থেকে এখানে উঠে এসেছে। এর দুই দিন পরে এখান থেকেও তারা অন্যত্র সরে পড়বে। এদের মধ্যে পূর্ব হতে এইরূপ এক বন্দোবস্তও

ছিল। আমি যথাসম্ভব সদলে রাত্রি দশটায় এদের আড্ডাঘরে এসে হানা দিই। কারণ, রাত্রি দশটার পরই সকলে এসে এখানে জমা হবে। আড্ডাঘরের কাছে এসে লক্ষ্য করি যে দুইজন লোক উপরে উঠছে। একজনের পরনে ছিল সার্জের কোট ও মিহি ধুতি এবং অপর জনের পরনে ছিল ছেঁড়া গেঞ্জি ও লুঙ্গি। বিভিন্ন বেশী এই দুই ব্যক্তিকে গলা জড়াজড়ি করে উপরে উঠতে দেখে আমার বুঝতে আর বাকি থাকে নি। এরা যে কারা তা এদের চলন থেকে আমি বুঝতে পারি। এর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম যে একটা ছেলে দৌড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলেছে। এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি মোড়ের মাথায় আনচান ভাবে ঘুরতে দেখেছিলাম। আসলে এই ছেলেটি ছিল এদের পাহারাদার। আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ধরে ফেলে একজন সিপাই-এর হেপাজতে তাকে দূরে সরিয়ে দিই। এ জন্তে ওরা আমাদের আগমন সম্বন্ধে কোনও খবর পায় না।

আড্ডাঘরটা ছিল একটা মাঠকোঠোর দ্বিতলের ঘরে। বাড়ির নিচে কোনও জানালা বা দরজা নেই। উপরের ঘরগুলা ঘিরে একটা কাঠের বারান্দা আছে। ঐ বারান্দার কোণ থেকে একটা কাঠের নড়নড়ে সিঁড়ি নেমে এসেছে। আমরা অতি সন্তর্পণে উপরের বারান্দায় উঠে পড়ি। শেষের দিককার একটা ঘর থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এর পর পিছনের বারান্দা দিয়ে ঐ ঘরটার পিছনে এসে দাঁড়াই। পিছনের দেওয়ালে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটা ছিল। এক-একটি ফুটার মধ্যে চোখ রেখে আমরা আড্ডাঘরটি পরিলক্ষ্য করি। আড্ডা তখন পুরাদমেই বসে গিয়েছে। মেঝের উপর সারি সারি বাইশ-তেইশটা ছেঁড়া মাদুর। ঘরে দুই-একটা পুরানো ট্রাঙ্কও দেখা গেল। দেওয়ালের ব্রাকেটগুলোতে গোটা পাঁচ-

ছয় গরম কোট, শাল ও ফ্লানেলের শার্ট। এমন কি, সেখানে কয়েকটা বিলাতি স্যুটও ঝুলানো রয়েছে। বুঝলাম, প্রয়োজন মত সর্দারের নির্দেশে এরা এই সব পোশাক অপকার্যের স্থবিধার জন্যে ব্যবহার করে। মাদুরগুলার উপর প্রায় জন পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশের লোক তাদের বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার মধ্যে আত্মগোপন করে বসে আছে। এদের কেউ কেউ বড় বড় নলে মুখ রেখে চণ্ডু খাচ্ছিলো। কোণের দিকে একটা ছেঁড়া গদির উপর বসে সর্দারজী তখন টাকা গুনছিলেন, দু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি বারো, ইত্যাদি শব্দে। টাকা ও নোটের আলাদা আলাদা থাক দিতে দিতে সর্দারকে বলতে শুনলাম, 'এই ঢোলিরাম! কেতো টাকা পেলি সেই সোনাকো ঘড়ি বেচে?' উত্তরে ঢোলিরাম সর্দারকে বলল, 'উ তো জরুর দেড়শো রুপেয়াকা হোবে। লেকিন ছট্টুলাল পঞ্চাশের বেশি একদম দিলে না।' এর উত্তরে সর্দার খেঁকরে উঠে তাকে বলল, 'তুই কুছু কামকো নেহি আছে। আচ্ছা! যো মিলা উহি লে আও।' এর পর টাকার আরও কয়েকটা থাক দিয়ে সর্দারজী বলে উঠলেন, 'আচ্ছা! আভি এক এক আদমি আ-যাও।' সর্দারের কথায় প্রায় দশ-বারোজন হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এল। সর্দারের পাশে গোল টুপীপরা একজন হিন্দুস্থানী হিসেব লিখছিল। সে এবার সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'এক সাথমে নেহি আও। পহলা আও বংশীলাল, উসকো পাছু হোসেনি।' ইতিমধ্যে একজন মুসলমান রুক্ষ মেজাজে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে! কেয়া খবর? ওকিল বাবুসে উসকো কুছ পাত্তা মিলা? উ লোক কাঁহা পাকড় লিয়া?' নবাগত লোকটি ক্রুদ্ধভাবে সর্দারের প্রশ্নের উত্তর

দিল, 'কোহি নেহি পাকড় গিয়া হ্যায়। উকিলবাবু সে কোটসে খবর লিয়ে বলিয়ে দিলেন। উ লোক রুপেয়া লেকে সেরেফ ভাগা। হামরা গোয়েন্দাকো ভি খবর এহি আছে।' সব কথা শুনে দলের একজন আস্তিনার তলা থেকে একটা ছুরি বার করে সর্দারকে শুধাল, 'যে তৈয়ার সর্দার, হুকুম ফরমাইএ। বেইমান লোককো যে—' পরে আমি জেনেছিলাম যে এই ছুরি-হাতে লোকটি নিজে পিকপকেট ছিল না। সে মাঝে মাঝে আড্ডায় এসে চণ্ডু খেত ও সেই সাথে সে সর্দারের এটা ওটা ফাইফরমাজও খাটত। এর পর আর আমরা দেরি না ক'রে হুড়মুড় করে আড্ডাঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। এদিকে ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলে উঠে, 'খবরদার ভাই, পুলিশ আ গিয়া।' বোধ হয় আমাদের জুতার শব্দ শুনে এরা বুঝেছিল পুলিশ এসেছে। সকল কথা শুনে দলের একজন বলে উঠল, 'কেয়া সর্দার, হম্ লড় যায়?' উত্তরে সর্দার বলল, 'কেয়া লড়েগা দু'-ঘণ্টাকো বাস্তে।' আড্ডা ঘরের পাশেই একটা জানালা ছিল। এই জানালা দিয়ে এরা তখন ছুরি, কাঁচি ও খালি মনিব্যাগগুলি ছুড়ে ছুড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। এদিকে ঘরের ভিতর ঢুকে আমরা দেখি সর্দার একটা গজলগান শুরু করেছে এবং তাকে ঘিরে সকলে মিলে হাততালির সাহায্যে তাল দিয়ে চলেছে। আমাদের দেখে সর্দারজী সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, 'সেলাম হুজুর! এ পঞ্চায়েতি হোতা, কুছ বেকানুন নেহি হ্যায়। এই, বড়বাবু আ গিয়া, জবান ঠিক রাখো, এই—"

এ ছাড়া মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং হাজার টাকার নোট সর্দারজীর" সাহায্য ব্যতীত ভাঙানোও' অসম্ভব। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ থাকায় সর্দারজী এই সব দ্রব্য পাচার করছে

সহজেই সক্ষম হন। দলের কোনও ব্যক্তি ধরা পড়লে এই সব সর্দাররা তাদের জামিনের ব্যবস্থা ও মামলার তদ্বিরও অলক্ষ্যে থেকে করে থাকেন। এই দলপতির সহিত অনেক নামজাদা ব্যবসায়ীরও সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনা গেছে। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"কোনও এক নামজাদা ব্যবসায়ীর গদিতে কার্য ব্যপদেশে আমাকে যেতে হয়েছিল। গদির মালিক ক্যাস ঘরের টাকার ঝন-ঝন আওয়াজে মসগুল হয়ে কাজকর্ম দেখছিলেন। পাশে চার-চারটা টেলিফোন পর পর সাজানো রয়েছে। বোধ হয় সেখানে লাখ লাখ টাকার কারবার হয়। এমন সময় একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা চোয়াড়ে চেহারার লোক সম শ্রেণীর দুইজন লুঙ্গিপরা যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'রাম রাম! ছেলাম বাবু সাব!' তাকে দেখে দোকানের মালিক খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে বহুৎ দিন বাদ আসেছে, পান সিগারেট মাঙায়ে?' এই সময় গদির মালিকের উপরিউক্ত যুবকদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য পড়ল। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ওই লোকটার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'উ লোক কোউন আছে? সব বিশ্বাসী তো? সে দেখবেন মুস্কিল উস্কিল—'। প্যাণ্ট-পরা লোকটা অভয় দিয়ে তাঁকে বললে, 'সব শেয়ানা আছে, সাব। হামিলোককো বাদ উনলোকই মালিক হোবে। হামিলোক কেতো দিন আর বাঁচবে বোলেন। ইনলোককোভি একটু দেখবেন।' এর পর চুপি চুপি তাদের মধ্যে কি কথা হ'ল তা তারাই জানে। হঠাৎ আমার কানে এল ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলছেন, 'লেকেন হাজারমে হাম দেড়শো রুপেয়াকো যাস্তি নেহি দেবে।' উত্তরে আগন্তুক তাঁকে জানাল, 'ঠিক হ্যায়। নম্বরী নোটকো বাস্তে যো দস্তুর আছে উহিই দিবেন।' এর

পর আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে এরা কারা এবং কি জন্যই বা এরা গদিতে এসেছে।”

এই সকল পকেটমারদের এক-একটি দল পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাও ভাগ করে নিত।* এক-একটি দল এক-একটি স্থানে শিকারের সন্ধানে ঘুরা-ফিরা করে। একজন অপর দলের নির্ধারিত স্থানে হানা দিলে মারপিট হয়।' এজন্যে এরা অপরের এলাকায় কদাচিৎ এসে থাকে। এই সব ঝগড়া-ঝাটির সুযোগ গ্রহণ করে পুলিশ একদলের নিকট হতে অপর দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি দেওয়া হ'ল। এই বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

“আমি একজন পুলিশের পুরানো ইনফরমার। সেইদিন হুবহু যা যা দেখেছিলাম তা বলে যাচ্ছি শুনুন। আমি হ্যারিসন রোডের মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ঐ সময় আমার লক্ষ্য পড়ল একদল লোকের প্রতি। তাদের বেশভূষা বা ভাষার মধ্যে থেকে তাদের জাত নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওদের দলের মধ্যে

---

* একদল কোনও মোড়ে এসে দাঁড়ালে সেখানে পশ্চাদগামী দল আর দাঁড়ায় না। কারণ দুই দলের এক জায়গায় অপকর্ম করা সম্ভব নয়। তখন ওরা অপর এক স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই ভাবে দল বিশেষের স্থান সম্বন্ধে অধিকার দাঁড়িয়ে যায়। ভিখারীদের ভিক্ষা করার এবং ফেরিওয়ালাদের ফেরি করার মধ্যেও এইরূপ স্থানাধিকার দেখা গেছে।

একটা গাট্টাগোট্টা লোক ছিল। সে বোধ হয় তাদের সর্দার-টর্দার হবে। হঠাৎ সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'এই শালা লালু, তুই ঠিকসে ফেল। এখনও একটা লোকও পড়ল না।' উত্তরে লালু তাকে বলল, 'আরে সে ঠিক মানুষ আসে তবে তো! এবে কুত্তাও শিকারই নেই?' লালু একটা ফলের দোকান হতে নির্বিচারে একটা কবে আম তুলে খোসা ছাড়াচ্ছিলো। এরপর ছাড়ানো খোসাগুলা সে তাগসই মাফিক ফুটপাতের উপরই ফেলছিল। একজন মধ্যবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই পথে আসছিলেন। হঠাৎ খোসার উপব পা পড়ায় সড় সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি নির্বিকাব চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও হাতের ব্যাগটি ছাড়লেন না। ব্যাগটি আঁকড়ে ধ'রে তিনি উঠবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় সন্দেহজনক লোকগুলা ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। ভদ্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ন দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কেউ দেয় ভদ্রলোকের কাঁধ ঝেড়ে, কেউ তাঁর জামাটা টেনে দেয়। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের পকেটটা একটু নেড়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখেন তো বাবু! আউর একটু হলে আপনি নেঙড়া বেনে গেছলেন। আপনার সে খুব চোট লাগে নি তো?' ভদ্রলোকটি ছিলেন কলিকাতার পুরানো বাসিন্দা। এদের চিন্‌তে তাঁর বাকি থাকে নি। ব্যাগটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 'আমের খোসা ফেলতা যব, তব জান্‌তা নেহি যে চোট লাগতা? তুমলোক হামসে চালাকি মাৎ করো।' ভদ্রলোকটির এই বিদ্রূপ-বাণীর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্যে থেকে একজন বললো, 'আপনি তো মশাই খুব ভদ্রলোক আছেন। ব্যাগে তো আছে সে মাত্র দুইখানা কাপড় আর আপনার পকেটে তো একটা পয়সাও

নেই।' ভদ্রলোকটি চলে গেলে লোকগুলা আবার তাদের পূর্বস্থানে ফিরে এল। আমি কৌতূহলী হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদের হালচাল পরিলক্ষ্য করছিলাম। এদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'শালা বহুৎ হুঁশিয়ার আছে।' উত্তরে আর একজন ব'লে উঠল, 'তো শালার চোখই লেই, শালা সব মাটি করে দিলি। মাছু শালা তোকে এত শেখালে—'। এর পর এদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এই শালারা, পালা এখন তোরা। ওদের সে দল এখানে এইসে গেছে।' কিন্তু ঠিক সময়ে পালান আর এদের হ'ল না। অপর দল ততক্ষণে তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। আগন্তুকদের দল থেকে একজন লম্বা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোকের গলাটা বাম হাতে টেনে ধরে শুধাল, 'তু শালা নিজের এলাকা ছেড়ে হেনে এয়েছিস্। যা শালা তোর মির্জাপুরের মোড়ে।' লোকটি কিন্তু সহজেই অপমানটা হজম ক'রে নিল। বেশ বুঝা গেল তারা লুকিয়ে অপর দলের এলাকায় কাম করতে এসেছে। একটু আমতা আমতা করে সে উত্তর করল, 'মাইরি মামু! আম খাচ্ছিলাম। তুই শুন মাইরি।' মামু কিন্তু তার কোনও কথাই শুনল না। সজোরে তার গালে একটা চড় কসিয়ে সে উত্তর করল, 'ভাগ্ শালা। কাম করতে আইয়েছিস্, ফিন্ মিথ্যাভি বলছিস্।' অপর দলের দলপতি এর পর গুমরতে গুমরতে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করল। দলবল নিয়ে চলে যেতে যেতে সে বলে গেল, 'দাঁড়া শালে, বড়িবাজারে [থানায়] সটিনবাবু আইয়েছে। উনে হামিভি খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।' প্রত্যুত্তরে মামু তাকে জানাল, 'আরে আরে কেতো থানেদার হামিভি দেখিয়েছি। তোর জান তো হামি আগে লিবে।'

এর পর নূতন দলের কার্যকলাপ সেখানে নির্বিরোধে শুরু হল।

আমিও যথাস্থানে দাঁড়িয়ে এদের কার্যকলাপ দেখতে থাকলাম। এই নূতন দলের একজন লোক হঠাৎ তাব সাথীর কাঁধে একটা গাঁট্টা কসিযে বলে উঠল, 'চুপ কর, শালা।' পাশের একজন পথিকেব পকেট থেকে বেমালুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিযে দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তব করল, 'কেন রে ?' প্রত্যুত্তবে তাকে হাঁটুব গুঁতা মেরে প্রথম ব্যক্তিটি ঐ সময় বলে উঠল, 'চুপ শালা। শিকার। পকেটে সে মাল আছে মনে হয, আগে পরখ কবে দেখ্।' এর পর এদের একজন জনৈক পথচারীর গা ঘেঁসে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর পকেটে একটা আঙ্গুলের টোকা মেবে আবার পিছিয়ে পডল। তাকে পিছিযে পডতে দেখে দ্বিতীয ব্যক্তিটি ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস কবলে, 'কি, মাল তো আছে ? না সব বাজে কাগজ।' অপর লোকটি উচ্ছ্বসিত হযে উত্তর দিলে, 'আবে। সব লোট্ মাইরি। তুই জলদি ওদেব ইথানে ডাক্।'

ফুটপাতের অপব পাবে জন-দুই লম্বা-চুল বাঙ্গালী, কযেকজন ঘাড ছাঁটা দেশোবালী ও জন-চার পাঁচ লুঙ্গিপরা মুসলমান দাঁডিযে আপন মনে বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের দিকে একটা ইশাবা কবে প্রথম ব্যক্তি এক ছুটে ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁসে অনেক দুব এগিয়ে গেল। আর দ্বিতীয ব্যক্তিটি তাঁব পিছন পিছন চলতে শুরু করে দিল কি মতলবে তা সেই জানে। এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে তাঁকে উপলক্ষ্য কবে হয়ে গেল তা সেই ভদ্রলোকটি মোটেই জানতে পারলেন না। আপন মনেই তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কাগজে মোড়া কি একটা তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। গোবর কি বিষ্ঠা— তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তা তাঁর গাল বেয়ে নেমে এসে তাঁর জামার অনেকখানি নষ্ট করে দিলে। ভদ্রলোকটি চমকে উঠে উপর

দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'দেখতো, দেখতো, যত বেল্লিক সব।' কানে বিড়ি গোঁজা মুসলমান কয়জন ভদ্রলোকটির পিছিন পিছন আসছিল। হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের অবস্থা পরিলক্ষ্য করে বলে উঠল, 'এ কেয়া তাজ্জব, ছো ছো ছো। এ কোউন কিয়া রে?' সামনের ফলের দোকান থেকে একজন আধা ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলল, 'আপনাকে তো বড় মুস্কিলে ফেলিয়েছে। হাপনি পানি লিবেন তো আসেন এহানে।' দেখতে দেখতে সেখানে বড় রকমের একটা ভিড় জমে গেল। কোথা থেকে আবার আর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এক বালতি জল এনে তাঁর জামা কাপড় কতক কতক ধুয়ে দিয়ে বললে, 'বাবুজী! মাথা সে একটু নীচু করেন। হামি সে বেশ করে ধুইয়ে দিই। হাপনি ভদ্দর লোক আছেন মশয়।' দলের প্রথম ব্যক্তিটি ভদ্রলোকের পিছনেই দাঁড়িয়েছিল, সেই সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলাম। জল ঢালতে ঢালতে সেই শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটি ঐ প্রথম ব্যক্তিটিকে চোখ টিপে ইশারা করে ভদ্রলোকটিকে শুধাল, 'হাপনি সে আউর একটু নীচু হবেন। হামি সে হাপনাকে বেশ করে—'

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করলেন। নীচু হবামাত্র প্রথম ব্যক্তিটি ছুটে এসে একটা রেজার ব্লেড বার করে ভদ্রলোকের বুক পকেটের তলায় খানিকটা বেমালুম কেটে দিল। তারপর ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে দুটা মাত্র আঙুলের সাহায্যে নোটের বাণ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এ ধারে কিন্তু জল ঢালার পালা সমানে চলছিল। মাথাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ভদ্রলোক কোঁচার খুঁট দিয়ে চুলগুলা মুছে

ফেলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর পকেটের দিকে নজর পড়ায় তিনি চমকে উঠলেন। মুখ দিয়ে তাঁর আর কথা বার হল না, অস্ফুট আর্তনাদে তিনি তখুনি রাস্তার ঐ ফুটের উপর বসে পড়লেন।

যে লোকটা এতক্ষণ তাঁর মাথায় জল ঢালছিল, সে একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, 'কি মশাই? আউর জল ঢালবে না'কি? এখন হাপনি উমন করছেন কেন?' ভদ্রলোকটি এইবার চীৎকার করে উঠলেন, 'আরে। হামরা সর্বনাশ হো গিয়া। পুলিশ বোলাও, পুলিশ বোলাও।' এতক্ষণে একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁর নিকট এগিয়ে এসে বললেন, 'কি, পকেট মেরেছে বুঝি? তাতো মারবেই, অমন জায়গায় রাখে?' সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন সে-দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকেও বাঙ্গালী বলে মনে হ'ল। তিনি বেশ বিশেষজ্ঞের মতই তাঁর মত বলে গেলেন, 'ও মশাই ওঁর নিজের টাকা নয়। নিজের টাকা হলে ওরকম জায়গায় রাখে? পুলিশ শুনলে এ কেস লেবেই না!' অপর আর একজন সেই সময় বলে উঠল, 'আর পুলিশ ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন, বাড়ি যান মশায়। আর ঝামালা করবেন না।' শেষ কথা বলে গেল একজন মাড়োয়ারী। ভিড়ের ভিতর থেকে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে ভাঙা বাঙলায় তিনি বললেন, 'হাপনি মশয় বোকা লোক আছেন। এ কলকাত্তা শহর। বড় বড় কাজ কারবার হেনে হয়। বোকা লোকের হেনে থাকা কামই নয়। বুঝলেন মশায়?'

এইবার এল এখানে একজন বাঙালী ছোকরা। সে বোধ হয় কোন কলেজের পড়ুয়া হবে। বই হাতে করে সেই পথ দিয়ে আসছিল। ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে মশাই?' ভিড়ের ভেতর থেকে দলের একজন ছোকরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে

বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। সরে পড়েন মশয়, আপনিও সরে পড়েন।' এর পর সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে ঠিক ভাবে দাঁড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলা এক-একজন এক-এক দিকে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাদের কাউকে আর সেখানে দেখা গেল না।"

উপরের কাহিনী কয়টি হ'তে এই পকেটমার বা গাঁটকাটাদের আভ্যন্তরিক সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা করা যায়। এই অপকর্মের অব্যবহিত পরে যে সকল সন্দেহজনক ব্যক্তি দরদ বা সহানুভূতি দেখায় তাদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে অনেক সময় এই সব চুরির কিনারা হয়ে যায়। এইবার এই পকেটমারদের অপর আর একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি পড়ে দেখুন। এই পিকপকেটদের এক এক দলের কার্যপদ্ধতি এক এক রকমের হয়ে থাকে। এই পৃথক পৃথক কার্যপদ্ধতি হ'তে এদের কোন দলটি কোন অপকর্মটি করেছে তা বলে দেওয়া যায়।

"আমি শহরের একজন পুরানো পিকপকেট হুজুর। সেদিন এক ছোকরা সাকরেদকে নিয়ে পথ চলছিলাম। আমার পরনে ছিল দোরস্ত বিলাতী স্যুট। তা ছাড়া দেখছেন তো, আমার রঙটাও একটু কটা। আমার সাকরেদটি হঠাৎ একজন ছোকরা পথিকের পকেট থেকে ব্যাগটা টেনে বার করে নিল। ছোকরাটিকে সে যতটা অসাবধান মনে করেছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ততটা অসাবধান সে ছিল না। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিষ্যের হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "চোর—চোর!" আমার চেলা একটা ঝটকান মেরে ছোকরাটির হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ইতিমধ্যে আমার অপর কয়জন সাকরেদও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সমবেত জনতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও "চোর—চোর" বলে বন্ধুর পিছন পিছন ছুটে চলল। উদ্দেশ্য সুবিধা মত তাকে জনতার হাত হ'তে উদ্ধার করা। কয়েকজন সাইক্লিস্ট তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে আমার লোকটিকে ধরে ফেললে। আমিও এতক্ষণে ছুটতে ছুটতে এসে বাম হাতে তার গলাটা টিপে ধরলাম। তার পর ডান হাত দিয়ে তাকে কয়েকটা চড় কসিয়ে বলে উঠলাম, 'শালে হামরা পকেট তুম্ মারেগা। লে আও হামরা রুপেয়া, ব্লাডি সোয়াইন।' সাকরেদটি তখন ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে আপ সাব, আপকো রুপেয়া। হামকো পুলিশমে মাৎ দিইয়ে। হাম এইসেন কাম আউর নেহি করেগা।' এর উত্তরে আমি চেঁচিয়ে উঠে তাকে বললাম, 'চোপরাও। আলবৎ তুমকো পুলিশমে দেগা। এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি!' দৈবক্রমে একখানি ট্যাক্সি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি সাকরেদের চুলের মুঠিটি ধরে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে—উভয়েই আমরা সরে পড়লাম। আমাকে সাহেব দেখে কেউ আর আমার সঙ্গ নিল না। আসল ফরিয়াদী হাঁপাতে হাঁপাতে অকুস্থলে পৌঁছানোর আগেই আমরা বামাল সহ সরে পড়ি।"

শহরের বিভিন্ন এলাকা এরা বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করে নেয়। বাস ট্রাম আদি পরিবহন সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। কারুর এলাকা মৌলালী হতে শ্যামবাজারের বাস বা ট্রাম রুট্। কোনও দলের এলাকা মৌলালী হতে ধর্মতলা পর্যন্ত বাস বা ট্রাম রুট্ ইত্যাদি।

এই পিকপকেটদের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক।

"আরে মশাই! আমি ওদিন ক্যানিং স্ট্রিট্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই ছেলেটা আমার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। আমি মনে করলাম সত্যিই পড়ে গেল বুঝি। আমি হাত ধরে একে উঠাতে যাচ্ছিলাম। আমি সবে মাত্র একটু নীচু হয়েছি, অমনি এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম। আর তখুনি আমি ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে।"

এই পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপর আর একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"রাত তখন প্রায় দশটা বেজেছে। রাস্তা দিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় একটি কঠিন বস্তু আমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম যে সেটি কোনও দ্রব্য নয়। সেটা ছিল একটা জলজ্যান্ত মানুষ। লোকটা ততক্ষণে আমার পায়ের উপর পড়ে গোঙরাতে শুরু করেছে। আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল, 'কি রে বাবা! লোকটা মাতাল নাকি?' লোকটা এইবার দুই হাতে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'না, বাবা! আমি একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। তবে একটু বেশি খেয়েছি—এই যা। আপনি দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। মাইরি বাবা—'

মানুষটাকে দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়; শুধু তাই নয়। সে ধনী লোকও বটে। সোনার বোতাম ও রিস্টওয়াচ তো আছেই, তা ছাড়া একটা হীরার আঙটিও তার হাতে দেখলাম। এইরূপ

অবস্থায় তাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার বাড়ি কদ্দুর এখান থেকে? শান্তভাবে আসেন তো পৌঁছে দিতে পারি।' ইতিমধ্যে একটা রিক্সাও সেখানে এসে গেল। আমি জোর করে মাতালটিকে রিক্সায় তুলে দিই। কিন্তু মাতালটা আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে, 'তুমি আমার বাপ ভাই। এই কাঁকুড়গাছির মোড়ে একটু পৌঁছে দাও' ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আরও দুই একজন লোক সেখানে জড় হয়েছে। সকলে মিলে তাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানায়। এর পর আমি রিক্সায় উঠে মাতালটির পাশে বসে পড়ি একরকম বাধ্য হয়েই। ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করে পথের উপর রিক্সা ছুটে চলল। কিন্তু ঐ মাতালটা কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। কখনও সে ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠে। কখনও বা সে নেতিয়ে পড়ে। কখনও বা দুই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এমন বিপদে আমি জীবনেও পড়িনি। কাঁকুড়গাছির মোড়ে এসে কিন্তু লোকটা শান্ত হয়ে উঠল। ছোট একটা হাই তুলে সে বলে উঠল, 'বাঃ, বেশ হাওয়া বইছে তো! আরে, আপনি কে মশাই! এ্যা, কে আপনি? এই রিক্সা, এই রোকো।' বেশ বোঝা গেল লোকটার নেশা কেটে গেছে। প্রকৃত বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রিক্সা থেকে নেমে পড়ে একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে বকশিস্ স্বরূপ গুঁজে দিল। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদের সহিত তার এই দান প্রত্যাখ্যান করি। এর পর লোকটা শিশ্ দিতে দিতে রিক্সা ভাড়া না চুকিয়েই সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। এদিকে রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। মাতালটার পিছন পিছন আর

ধাওয়া করা নিরর্থক। রিক্সা ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিতে মনস্থ করে হাত উঠাতেই লক্ষ্য করলাম, আমার বুক পকেটটা কাটা—এবং আমার ব্যাগ সমেত সমুদয় অর্থ অপহৃত হয়েছে। এর পর আমি দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ততক্ষণে সে সেখান থেকেও উধাও হয়েছে। আমি আর তাকে ধরতে পারি নি। আমি বুঝতে পারি যে, আসলে লোকটা মাতাল নয়। সে একজন ওস্তাদ পিকপকেট মাত্র এবং এও বুঝতে পারি যে, তার দলের লোকরাই মাতালটাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিল।"

কিছুকাল পূর্বে ঝিনঝিনিয়া নামক এক রোগের কথা শুনা গিয়েছিল। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ত। যদিও কিনা এই রোগ সংক্রান্ত সকল কাহিনীই ছিল কল্পিত বা গুজব মাত্র। এই সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ এক পথিককে বেছে নিয়ে তার মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে "ঝিনঝিনিয়া হয়েছে" এই কথা বলে এবং তারপর তার পকেট থেকে তারা অর্থ অপহরণ করেছে,—এইরূপ অনেক কাহিনীও ঐ সময় শুনা গিয়েছে। এই ধরনের আর একটি কাহিনী সম্বন্ধে নিম্নে বলা যাক্।

"রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পকেটভারী লোক যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমরা তার কাছে ছুটে যাই। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠে—এই পড়ে গেলেন বুঝি? আমাদের অপর আর এক বন্ধু ভদ্রলোককে বলে উঠে—অত কাঁপছেন কেন? ওঃ, চোখ দুটো আপনার বড্ড লাল হয়েছে। এর পর ভদ্রলোককে আর কোনও রূপ উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়ে তার গলার কম্ফর্ট ও গায়ের জামাটা খুলে দেয়। এর পর তাকে আমরা বাতাস করতেও শুরু করি। এদিকে

রাস্তায় ভিড় জমে যায়। কিন্তু কেউই ভিতরের আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। ইত্যবসরে আমাদের একজন ভদ্রলোকের পকেট হ'তে যাবতীয় অর্থ অপহরণ করে সরে পড়ে এবং কিছু পরে আমরাও ঐরূপ ভাবে সরে পড়ি। সেখানে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই সকল কার্য সমাধা করা হয়।"

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পিকপকেটদের মধ্যে যে পকেট কাটে, সে কখনও বামাল তার সঙ্গে রাখে না। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে পাচার [pass] করে দিয়ে থাকে। এই হাত সাফাই-এর কার্যে এরা সকলেই সুদক্ষ থাকে। এই কারণে এই ব্যক্তি অকুস্থলে ধরা পড়লেও তার কাছে অপহৃত দ্রব্য বা অর্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না। পূর্বে এরা পকেট বা গাঁট কাটার উদ্দেশ্যে বোতল ভাঙা কাঁচ ঘষে একপ্রকার ক্ষুর-ধার ছুরি তৈরি ক'রত। কিন্তু আজকালকার পিকপকেটরা চাকু ব্যবহারও করে না, এরা সকলেই এখন রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে। এদের একজন দলের লোকের সুবিধার জন্যে এক বাণ্ডিল রেজার ব্লেড সহ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটি অপকার্য সমাধা হওয়ার পর অপর কার্যের জন্যে সে তৎক্ষণাৎ আরেকখানি ব্লেড দলের লোকদের সরবরাহ করে দেয়। এরা দুইটি আঙুলের সাযায্যে পকেট কাটা সমাধা করে; পিকপকেটরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ব্লেডটিকে নিম্নে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে ঐ দুইটি আঙুলের সাহায্যেই নোটের বাণ্ডিলাদি পকেট হ'তে বার করে নেয়। এইজন্য এক একটি ব্লেড দ্বারা মাত্র একটিবার পকেট কাটা চলে। কারণ অকুস্থলের রাস্তা হতে নিক্ষিপ্ত ব্লেডটি পরবর্তী অপকর্মের জন্যে উঠিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে ঐ সময় আর সম্ভব হয় না।

এইবার পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে জনৈক পিকপকেটের নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য। এই বিবৃতিটি পকেটমারদের মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

"পকেট মারার পূর্বে আমরা মানুষকে জোরে একটা ধাক্কা দিই এবং এর পরেই আমরা তার পকেটটা কেটে ফেলি। ফলে পকেট কাটার জন্যে ছোট ধাক্কাটি সে আর অনুভব করে না। মানুষ তখন বড় ধাক্কার কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কার আওতায় ছোট ধাক্কাটি আর অনুভব হয় না। এ ছাড়া আমাদের কেউ কেউ পকেটে একটা টোকা মেরেই বুঝতে পারে যে লোকটার পকেটে নোট কিংবা কাগজ আছে।"

উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে যে, পিকপকেটদের স্পর্শ বোধ [touch sensation] অত্যধিক। ইহা তারা অভ্যাস ও স্বভাব-গতভাবে অর্জন করে। এদের নিয়ে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

উপরে দলবদ্ধ পিকপকেটদের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া একক পিকপকেটও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ রেল, স্টিমার ও পোস্ট অফিসের ও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ভিড়ের মধ্যে এসে পকেট মেরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে এরা ফরিয়াদীদের অনুসরণ করেও তাদের পকেট কেটে থাকে। এদের কেহ কেহ ভিড়ের সময় বাস ও ট্রামে উঠেও পকেট মেরেছে। হাটে ও বাজারে এবং মেলাতেও এদের গতিবিধি দেখা যায়। ট্রামে ও বাসের পাদানিতেই অপকর্মের সুবিধার জন্যে এরা অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রামের বা বাসের কোনও

কোনও কন্‌ডাকটারের সহিত এদের যোগসাজস থাকে। কয়েকটি সঙ্গত কারণে এইরূপও কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তবে ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে করা সমীচীন হবে না।

কোনও কোনও ভদ্রবেশী পিকপকেট শালের জোড়া গায়ে বা গরদের পাঞ্জাবি পরে ট্রামে উঠে কোনও যাত্রীর পাশে এসে বসে। তার হাতের দামী ঘড়ি ও হীরার আঙটিটা দেখে যাত্রীটি সসম্ভ্রমে তাকে তার পাশে বসতে সাহায্যও করে। এর পর নানা কথায় যাত্রীটিকে অন্যমনস্ক করে পিকপকেটটি বেমালুম তার পকেটটি খালি করে নেমে পড়ে। এ সম্বন্ধে কোনও এক মামলার ফরিয়াদীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি ঐ দিন ট্রামে বসে আছি। এমন সময় চোস্ত বিলাতি স্থট পরা এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন। এর পর চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট দি টাইম-প্লিজ্‌ ?' আমি আমার হাতের ঘড়িটি তুলে ধরতেই কখন যে তিনি আমার পকেটের ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছিলেন তা আমি টেরও পাই নি।"

এই সকল পিকপকেটরা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে থাকে এবং এদের কেহ কেহ কাজের স্থবিধার জন্যে দুই একটা ইংরাজি বুকনিও শিক্ষা করে। এরা হিন্দি ভাষা ও বাংলায় কথা বলতে পারে। এদের কেহ কেহ চোস্ত উর্দুও বলতে পারে। এই পিক-পকেটদের চাপ-জ্ঞান অত্যন্তরূপ অধিক। কতখানি চাপ দিলে শুধু পকেটের উপরটা কাটবে, নীচের জামা বা গাত্রচর্ম কাটবে না প্রখর কাইনেটিক্ সেনসেসনের সাহায্যে তা তাদের বেশ ভাল রকম জানা আছে। অধুনাকালে অনেক ভদ্রঘরের বাঙালী পিকপকেটও শহরে দেখা যাচ্ছে।

এদের সময়ের পরিজ্ঞান থাকে অতীব তীব্র। কোনও এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এক সেকেণ্ড পরে বা পূর্বে পকেট মারলে তারা ধরা পড়তে পারে। এইজন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পকেট কেটে থাকে এবং এই জন্য তারা ধরাও পড়ে না। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ইহাদেব প্রতিক্রিয়াকাল তথা সময়ের পবিজ্ঞান [Reacti n Time] অতীব প্রখর।

পূর্বকালে এই পিকপকেটরা কলকাতায় কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তা নিম্নের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যাবে।

"প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। এই সময় কলকাতার মধ্যাংশে বহু বড় বড় বস্তি বিদ্যমান ছিল। কলকাতার এই বস্তিসঙ্কুল অংশের সহিত গহন বনানীর তুলনা করা চলত, কারণ এই বস্তির বাসিন্দাদের সহিত শহরের ভদ্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা কমই পরিচিত ছিলেন। এই সকল ঘন বস্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধিগণ নির্ভয়ে তাদের স্ব স্ব ডেরা স্থাপন করতে পারত।

এই সময় কোনও এক ধনী ব্যক্তির পকেট হ'তে একটি রুপার ঘড়ি চুরি যায়। এই ঘড়িটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুকরূপে পেয়েছিলেন। এই জন্যে ঘড়িটির উপর তাঁর বিশেষ দরদ আছে— এই বলে তিনি কোনও এক উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট কেঁদে পড়লেন। উর্ধ্বতন অফিসারটি সব কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে থানার ভার-প্রাপ্ত অফিসারকে যেরূপেই হোক ঐ দ্রব্যটি উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই সময় ঐ অঞ্চলে বড়মিয়া নামক এক ব্যক্তি পিকপকেটের সর্দার রূপে পরিচিত ছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, 'বাপু! যে রকমেই হোক এই

ঘড়িটা তোমায় উদ্ধার করতে হবে।' পিকপকেট সর্দার রাজি হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা! আপনার ঘড়িটি কোথায় অপহৃত হয়েছিল?' উত্তরে ভদ্রলোক তাকে বললেন, 'আজ্ঞে সিঁদুরে পটির মোড়ে।' 'ওঃ আমি বুঝেছি, তবে আসেন আমার সঙ্গে।' এই বলে পকেটমার সর্দার তাঁকে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে তুলে তাঁর চোখ দুটো পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। এর পর ঘোড়ার গাড়িটি একটি বিরাট বস্তির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালে ভদ্রলোকের চোখের বন্ধন খুলে দিয়ে তাঁকে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, ঐ হলঘরের মাটির দেওয়ালের উপর সোনার ও রুপার বহু মূল্যবান ঘড়ি পাকাটির পেরেকের উপরে সারি সারি টাঙান রয়েছে। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়ল একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ির দিকে। ঘড়িটির একাংশে একটি হীরা ও কয়েকটি মুক্তা বসানো ছিল। ভদ্রলোককে হতবিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পিকপকেট সর্দার বলে উঠল, 'কৈ বাবুসাব! এর মধ্যের কোন ঘড়িটি আপনার? এর মধ্যে সেটা আছে? আপনি বেছে নিন।' প্রলুব্ধ হয়ে ভদ্রলোক ঐ মুক্তা ও হীরা বসানো ঘড়িটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আজ্ঞে! ঐ ঘড়িটাই হচ্ছে আমার!' 'এ্যাঁ, এ আপনি বলেন কি? তা—তাই না'কি?' ক্রুদ্ধ হয়ে পকেটমার সর্দার এবার উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে, না! ওটা আপনার ঘড়ি নয়। আপনার হচ্ছে কোণের দিকে ঝুলানো ঐ রুপার ঘড়িটা। আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী ও লোভী ব্যক্তি। আসুন। আপনি চলে আসুন শীগ্‌গির। আপনার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি পেয়েছেন।' এর পর পকেটমার সর্দার পুনরায় ভদ্রলোকের চোখ দুটো বেঁধে দিয়ে ঘড়িটা

তাঁকে ফিরিয়ে না দিয়েই ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁকে চৌমাথা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।”

অধুনাকালে কোনও কোনও পকেটমার দলবলসহ ট্রামে উঠে ডান হাত দিয়ে উপরের রড্ বা ডাণ্ডা ধ'রে ঈপ্সিত শিকারের [Victim] কাঁধের উপর ঐ হাতের বাহু ন্যস্ত করে। এই ভাবে বাহুর ধমনীর সহিত শিকারমন্ত ব্যক্তির কাঁধের ধমনীর সংযোগ স্থাপন করে রক্তসঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে ঐ 'শিকার' ভদ্রলোক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইহা বুঝা মাত্র সে ইশারায় সাথীদের জানিয়ে দেয় যে ভিড়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার সময় হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ সংযোগ স্থাপন করার পর সর্দারজী সন্দেহ এড়াবার জন্য তার মুখটি সর্বদাই শিকারমন্ত ব্যক্তির বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রাখে।

এই পিকপকেটদের কার্যকরণ সম্বন্ধে নিম্নে একটি পকেটমার-প্রধানের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

“স্কুল কলেজ ও অফিসে যাবার সময় বাসে বা ট্রামে উঠে আমরা লেডিস সিটের পিছনে এসে দাঁড়াই। এই লেডিস্ সিট উঠা-নামার দরজার নিকটে থাকলে আমাদের আরও সুবিধে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্ত্রস্ত, উৎফুল্ল কিংবা ভাবে বিভোর থাকে। এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ান আবৃত করে তাদের পাশে দাঁড়ালে এরা অন্যমনস্কভাবে ঘড়িশুদ্ধ হাতটা আমাদের আলোয়ানের ভিতরেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।”

এরা ডান হাতের বাহু দ্বারা মানুষকে ধাক্কা দিয়ে বাম হাতটি ডান হাতের তলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে মানুষের পকেট কাটে। এদের কেহ কেহ দুইটি আঙুলকে কর্তনক্ষম কাঁচির ন্যায় করে লোকের পকেট

হতে দ্রব্যাদি তুলে নেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলি অপর দিকে রেখে এইরূপ কাঁচি তৈরি করেছে। কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের দ্বারা কাঁচি তৈরি করে তাদের বাকি অঙ্গুলিগুলি মুঠির আকারে বুড়া অঙ্গুলি সহ হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। এদের কেহ কেহ আঙুল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ছুরিকা লুকায়িত রেখে পথ চলে। অর্ধঅঙ্গুলির ন্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে। সাধারণতঃ এরা দোকানে বা ব্যাঙ্কে গমন ক'রে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করল কি'না। তারপর তারা তাকে অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে ও মুহূর্তে তার পকেট খালি করে।

[এরা পলায়নের জন্য অলিগলি ও লুকানো স্থানের খবর রাখে। ছোট্ট একটি ঢিবি বা আবর্জনা স্তূপের পিছনে লুকাবার কায়দা কানুনও এরা জানে। বন্ধু ভাবাপন্ন এবং নির্লিপ্ত ও ভীতু লোকদের বসতির মধ্য দিয়ে এরা পলায়ন করে।]

ছিন্নক চোর

ছিন্নক চোর বা ছিঁচকা চোর নির্বল চৌর্য শ্রেণীর অন্তর্গত সরল চৌর্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এদের দলে দুই বা তিনজনের অধিক ব্যক্তি প্রায়ই যুক্ত থাকে না। সাধারণতঃ এরা এককই একইরূপ পদ্ধতিতে একই অপকার্য করে থাকে। এই সব ছিন্নক চোরেরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায, এবং সুবিধামত নারী ও শিশুদের গলা ও বাহু হতে তাবিজ, হার আদি অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। এদের ইংরাজিতে বলা হয় স্ন্যাচার [Snatcher]। পূর্বে এরা অলঙ্কারাদি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পালাত, কিন্তু অধুনাকালে এই কার্যে এরা কর্তন যন্ত্র [wire cutter] ব্যবহার করে থাকে। এতদ্বারা নিমেষের মধ্যে অতি সহজে তারা তাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হয়। কর্তন যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অনেকটা প্লাস [plus] বা সাঁড়াশীর মত দেখতে হয। এর মুখে কিন্তু দাঁতের বদলে কাঁচির মত ধার থাকে। এরূপ বহু কাঁচির ডাঁটীতে উহার ফলদ্বয় উঠানো নামানোর সুবিধার্থে স্প্রিঙ্ যুক্ত থাকে। ইহা একটি অতি সাধারণ কর্তন যন্ত্র মাত্র। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল অপরাধী অত্যন্তরূপ ধূর্ত হয়। এই সম্বন্ধে কোনও এক ছিন্নক চোরের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হল। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"অপকর্মের সুবিধার জন্যে আমরা এক অদ্ভুত উপায়ে গালের

কসির মধ্যে থলি বানাই। ছোট ছোট নুড়িতে চুণ মাখিয়ে সেগুলি গালের কসিতে পুরে কসির মধ্যে ফুটা করি। চূণের দ্বারা গালের ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরি হয়। এর পর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড় বড় নুড়ি পুরে ছিদ্রটি বড় হতে আরও বড় করে উহাকে একটি গুপ্ত থলি বিশেষে পরিণত করি। গহনা বা অর্থাদি ছিনিয়ে নিয়ে উহা আমরা তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলি। সাধারণতঃ লোকে মনে করে আমরা ঐগুলি গিলেই ফেললাম। আসলে কিন্তু ঐগুলি আমরা গিলে ফেলি না। আমরা ঐগুলি গালের ভিতরকার ঐ থলির মধ্যে লুকিযে ফেলি। এই কারণে 'এক্স-রে' করেও কেহ আমাদের উদরে কোনও দ্রব্যাদির চিহ্ন দেখতে পায না।"

শহরের পুলিশ এই সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে প্রথমেই এদের গলদেশের ঐ সব থলির সন্ধান করে। গণ্ডের দুই দিকে অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ চাপ দিলেই এরা থলির মধ্যে রক্ষিত দ্রব্যাদি উগরে ফেলে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা অপহৃত দ্রব্য যে গিলে না ফেলে তাও নয়। বহুবার এক্স-রে [X-Ray] দ্বারা ইহা প্রমাণিতও হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় জোলাপ দিলে ঐ দ্রব্য বিষ্ঠার সহিত বার হয়ে আসে—তবে এইরূপ ছিন্নক চোরের সংখ্যা খুব কম। এই সব অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"অপকর্মের সময় আমাদের কেহ কেহ বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকি। নিম্নে আমরা একটি ইজের বা পাতলা পাতলুন পরি এবং উপরে একটা লুঙ্গি পরি। পাঞ্জাবির উপর একটা কোটও চাপাই। অপকার্যের পর তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে আমরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গি খুলে ফেলে অকুস্থলে

ফিরে আসি। এই অবস্থায় আমাদের দেখে ফরিয়াদি এবং আশে-পাশের কোনও লোকেই আর আমাদের চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে লুঙ্গি পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে। এ সময় পাতলুন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না।"

এদের কোনও কোনও দল গঙ্গার ঘাট, মন্দির বা প্রমোদগৃহের পথে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। বিশেষ করে এরা প্রাচীনপন্থী মহিলাদেরই শিকাররূপে বেছে নেয়। কারণ এই ভদ্রমহিলারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে রাজি হন না। মাড়োয়ারী মহিলাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এতে নাকি তাদের ইজ্জতহানির আশঙ্কা থাকে।

এই ছিনক চোরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপর দুইটি বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম। বিবৃতি দুইটি হতে এদের কাযধারা সম্বন্ধে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি মশাই অমুক বাবুর বাড়ির একজন চাকর। মনিবের খোকাকে নিয়ে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলাম। এই সময় এই ভদ্রবেশী অপরাধীটিও সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন খোকাকে তাঁর ভাল লেগেছে। সামনের দোকান থেকে খোকার জন্যে তিনি লজেন্সও কিনতে চাইলেন। তিনি সস্নেহে আমার কোল হতে খোকাকে তুলে নিলেন এবং আমার হাতে একটা আধুলি গুঁজে লজেন্স আনবার জন্যে দিলেন। দোকান থেকে লজেন্স কিনে ফিরে এসে দেখি যে খোকা রাস্তার উপর বসে কাঁদছে এবং তার গলার সোনার হারটা খোয়া গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটাকে কোথাও আর আমি দেখতে পাই না। আসলে লোকটা ছিল একজন শিশু ছিনক [Child snatcher]।"

[মনি ব্যাগে একটা আঙটা লাগিয়ে ঐ আঙটাতে তার বা সুতা লাগিয়ে ঐ সূত্রের অপর মুখে একটি বঁড়শী লাগাতে হবে। ঐ বঁড়শী জামার পকেটে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে ব্যাগ উঠানো মাত্র পকেটে টান পড়ে। এই ভাবে ছিনতাইকারী এবং পকেটমারদের কবল হতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব।]

এইবার এদের অপপদ্ধতি সম্পর্কে অপর একটি উদাহরণ সম্বন্ধে এখানে বলা যাক—

"আমি একজন সওদাগরী আফিসের কেরানী। আমি আপন মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমি ঘাড়ের নীচে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। বোলতা কামড়াল কিনা—তা অনুভব করার জন্যে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়েছি মাত্র, এমন সময় কোথা থেকে একটা লোক এসে তাবিজ সমেত গলার সোনার হারটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। এর পর জামার কলারে আমি একটা পাতা দেখতে পাই। আমি পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি উহা একটি বিছুটি গাছের পাতা।"

কোনও কোনও স্থলে মানুষের গাত্রে গোময় বা বিষ্ঠাও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এইরূপ বহু কাহিনীও শোনা গেছে। আধুনিক দুর্বৃত্তগণ এজন্যে ইরিটেন্ট পাউডার ব্যবহার করে। প্রাচীনেরা এজন্যে ডেঁয়ো বা কাটপিঁপড়া ব্যবহার করেছে। এইজন্য বিবিধ জাতীয় পিপীলিকা এরা বাটীতে পুষেও থাকে। শিকারের [ভিক্‌টিম্] দৈহিক গঠন ও কৃষ্টি অনুযায়ী কম বেশি বিষাক্ত পিঁপড়া এরা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট আফিসগামী দরোয়ানদের নিকট হতেই দুর্বৃত্তরা এই উপায়ে নোটের বাণ্ডিল অপহরণ করে থাকে। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এই ছিন্নক চোরেরা যে কেবলমাত্র হার প্রভৃতি দ্রব্য ছিনিয়ে নেয় তা নয়, সুবিধামত তারা আধুনিকাদের হাত হতে ভ্যানিটি ব্যাগও ছিনিয়ে নিয়েছে। বুদ্ধিমত্তায় [মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানে] এই ছিন্নক চোরেরাও কম যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মার্কেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। আমরা সেখানে মাত্র আট ঘটিকা হতে বারো ঘটিকার মধ্যে কাজ করি। একমাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া অন্য কোনও দ্রব্য আমরা হরণ করি না। যে সকল মেমসাহেব অল্প দিন মাত্র বিলাত হতে এদেশে এসেছে কেবল মাত্র তাদেরই আমি আমার ঈপ্সিত শিকাররূপে বেছে নিই। আমি প্রথমে মেমসাহেবের গাল বা গণ্ডের দিকে লক্ষ্য করি। যদি তার গাল দুইটি অধিক লাল দেখি তা হলে আমি বুঝে নিই যে মেমসাহেব সবেমাত্র এদেশে এসেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক দিন থাকলে গালের এই লালচে ভাব কমে যায়। গণ্ডের মধ্যদেশে মনে মনে একটা বিন্দু এঁকে নিয়ে তার চতুর্দিকের লালাভার বিস্তৃতি হতে আমরা বুঝে নিই যে কতদিন ঐ মেমসাহেব ভারতে এসেছে। নবাগত বিধায় এই ধরনের মেম-সাহেবের হাত হতে ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা সহসা চীৎকার করে না। কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে তারা অস্ফুটস্বরে 'উ-উ—' এইরূপ একটা শব্দ করে মাত্র। এই সুযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। এরা হঠাৎ পুলিশ ডাকে না। কর্তব্য ঠিক করতে এরা একটু সময় নেয়।

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা এক দৃষ্টিতে বলে দিতে পারে যে কোন লোকটা ভীরু বা কোন লোকটা

সাহসী, কিংবা কে একা যাচ্ছে বা কার সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে; এমন কি, কার কাছে কি দ্রব্য আছে তাও তারা অনুমান করে নেয়। এই ক্ষমতার জন্যে এদের আমরা গুণী বলি। কিন্তু যারা কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমরা বলি শেয়ানা। শেয়ানারা ব্যাঙ্কের কাউণ্টার, পোস্ট আফিস ও স্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ করে। গুণীরা কিন্তু রাস্তায় এদের দেখেই শিকার বলে চিনে নিতে পারে।"

উপরের কাহিনীটি হতে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় অপরাধীরা কিরূপ 'স্পেসালাইজেশনের' পক্ষপাতী। এই স্পেসালাইজেশন বা একমুখী শিক্ষা এরা ব্যক্তি, কাল, স্থান ও দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করে থাকে। অর্থাৎ (১) এরা শুধু নারী নয়, সদ্যাগত য়ুরোপীয় নারী, (২) অন্য কোনও দ্রব্যের বদলে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ, (৩) অন্য কোনও স্থান নয়, মাত্র মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, (৪) অন্য কোনও সময়ের বদলে মাত্র সকাল আট হতে বারো ঘটিকা তারা বেছে নেয়। কিন্তু য়ুরোপীয় বহু অপরাধীর মধ্যে ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদের ন্যায় ভারসেটাই-লনেস্ বা বহুমুখী শিক্ষা দেখা গিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় তারাও সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় প্রাথমিক অপরাধী। সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধীরাই তাদের কর্মপদ্ধতিতে এই একমুখিতা অবলম্বন করে।*

---

* একজন যদি বোটানি, জুলজি ও জিওলজি এই তিনটি বিষয়েই M. A. পাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি এই বিদ্যাত্রয়ের কোনটিকেই ভালবাসে না। যে জুলজিতে একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত, তার বোটানি বা জিওলজিতে একমুখী হতে ইচ্ছাই যাবে না।

এই ছিন্নক চোরদের সংগঠন পূর্বকালে অতি উন্নত ছিল। তৎকালীন জনৈক অধ্যাপকের নিম্নোক্ত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। একদা ইনি আমারই একজন অধ্যাপক ছিলেন।

"এই দিন অমুক রাজপথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে আমার কাঁধে ঝুলানো ছাতাটি নিয়ে অন্তর্ধান হল। ঐ স্থানে এক বস্তি সর্দারের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাকে অনুযোগ করাতে সে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঐ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা সাজান রয়েছে। কিন্তু আমার ছাতাটি সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। ঐ কক্ষের অধিকারী তখন আমাকে বললে—বোধ হয় এখনও ছাতাটি এখানে জমা পড়ে নি। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধঘণ্টা পরে সেখানে এসে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পাশে সেখানে দাঁড় করানো আছে। আমি এও বুঝতে পারি যে, এই এলাকায় যা কিছু কাজ তা মাত্র এরাই করে থাকে।"

এমন বহু অপরাধী পূর্ব হতে খবর নেয় বাড়ির পুরুষরা কোন সময় বাড়ি থাকে না। এই সময় তারা নানা অজুহাতে গৃহিণীদের দুয়ার খুলতে অনুরোধ করে। কয়েক ক্ষেত্রে বাহিরের কোনও যুবক এসে বলেছে—মাসীমা, এক গ্লাস জল দেবে? তৃষ্ণার জল প্রদান এদেশের নারীরা ধর্মীয় কার্য মনে করে। এদের জলের গেলাসে হাত জোড়া থাকতে ঐ সময় এরা অসহায়। এই সুযোগে ঐ দুর্বৃত্ত তাদের গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাটীর বা ফ্ল্যাটের মূল দরজাতে একটা 'পিপ্‌হোল' রাখলে একটা সুরাহা হতে পারে। এই সঙ্কীর্ণ গর্তে উঁকি দিয়ে এরা দেখতে পারে যে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কি না।

একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এইরূপ অপকর্মের সুযোগ কম। কিন্তু অধুনা অনেকে উহা হতে অব্যাহতি পাবার পক্ষপাতী। এ কারণে কয়েক ক্ষেত্রে এদের অসহায় হয়ে পড়তে হয়। ভৃত্যচৌর্য এবং বহিঃচৌর্য হতে রক্ষা পেতে হলে উহার পুনঃ প্রবর্তন প্রয়োজন। পরিবারগুলির জন্য পৃথক পৃথক মহাল [ফ্ল্যাট] থাকলেও সকলের জন্য কমন পাচক চাকর সহ রসুই-এর ব্যবস্থা থাকলে খরচ কমে অন্য দিকে ওদের দলীয় ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাড়ে। এতে মেসিঙ এবং অন্য দিকে যথেষ্ট আর্থিক সাশ্রয় হয়। কয়েক বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা রেখে অন্য বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা রাখলে যৌথ পরিবারে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু এজন্য ওদের প্রত্যেক অংশীদারকে উদারচেতা ও সহনশীল হতে এবং তৎসহ পরশ্রী কাতরতা বর্জন করতে হবে। এই প্রকার যৌথ পরিবারগুলি রক্তাক্ত সম্পর্কের বদলে সমকৃষ্টির ভিত্তিতে গঠিত হলে উহা বহুকাল স্থায়ী হবে।

বহু বাহিরের ব্যক্তি যৌনজ ও অযৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্যে পারিবারিক বন্ধু সাজে। এরা অযাচিত ভাবে কোনও পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে ক্রীতদাসের মত পরিবারের সকল ব্যক্তির সেবা করে। এই অবস্থাতে তারা এঘর ওঘর করলে বা এটা ওটা জিনিস নাড়াচাড়া করলে চক্ষুলজ্জার জন্য কেউ আপত্তি করতে পারেন নি। এই সুযোগে বৎসর কালের মধ্যে তারা ঐ বাড়ির বহু শখের দ্রব্যসহ মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করে।

উত্তোলক চোর

উত্তোলক চোরগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) শকট উত্তোলক [Cart lifter], (২) বিপণি উত্তোলক [Shop lifter], এবং (৩) পশব উত্তোলক [Cattle lifter]।

শকট উত্তোলকদের [অপসারক] কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোনরূপ মার-প্যাঁচ নেই। অসতর্ক বা ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের পিছনদিক থেকে শকট হতে মাল সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরূপ বাহাদুরী নেই। তবে, হ্যাঁ, এদের গতি অতি দ্রুত হওয়া চাই। সাধারণতঃ মন্থরগতি শকটাদি হতেই দ্রব্যাদি এরা অপহরণ করে থাকে। যেমন গো-শকট। শহরে একদল লোক আছে যারা ভোর রাত্রে শহরাগত তরকারীবাহী শকটের পিছন হতে তরকারী অপহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অশ্বযানের পিছনের রেকাবিতে উঠেও এরা ছাদ হতে দ্রব্য চুরি করেছে। কোনও কোনও অপরাধী এই শকট উত্তোলনের সুবিধার জন্যে সাইকেল ও মোটরাদি যানেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। এর দ্বারা তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে আসা ও সেখান হতে অনুরূপ ভাবে সরে পড়ার সুবিধা আছে। এদের কেহ কেহ বাস ট্রাম প্রভৃতি দ্রুতগতি যানে আরোহীরূপে উঠে মালপত্র সরিয়ে নিয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে চালক প্রভৃতির সহিত এদের যে সড় থাকেনি তাও নয়।

বিপণি উত্তোলকদের কার্যপদ্ধতির মধ্যে কিন্তু অনেক বুদ্ধির মার-প্যাঁচ দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ উত্তমরূপ বেশভূষায় সজ্জিত

হয়ে দোকানে এসে হানা দিয়ে থাকে। মহিলা উত্তোলকগণ তাদের পরনেব শাড়ির মধ্যে দ্রব্যাদি লুকাতে পেরেছে। এস্থলে একজন বিপণি উত্তোলকের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি তাদের গেঞ্জির উপর একটা রবারের বেল্ট এঁটে তার উপর একটি শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান হতে বস্ত্রাদি তুলে নিযে নিমেষে সেটি গেঞ্জির নীচে এরা ঢুকিযে দেয়। গেঞ্জিব নিম্নাংশ রবারের [গোল] বেল্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায উহা আর নীচে পড়ে না। এর ফলে অপরাধীটি হাত দুলাতে দুলাতে প্রকাশ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে।"

যে সকল দোকানের খদ্দেরের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সকল দোকানে বিপণি উত্তোলকেরা সাধারণতঃ হানা দেয। অন্যান্য খরিদ্দারদেব নিযে ব্যস্ত থাকাকালীন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এরা কাজ হাসিল করে থাকে। বামালসহ ধরা পড়ার পব এরা নানারূপ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে নিম্নের এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বৌদির জন্যে কাপড় কিনতে গিযেছিলাম। দোকানদাব বার-তেরখানি কাপড় দেখায়। কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। শেষে দোকানদার ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে, এতগুলার পাট ভাঙলেন। আপনি নেবেন না মানে ? আপনাকে এগুলো নিতেই হবে। এর পব তর্ক-বিতর্ক এবং গালি-গালাজও আরম্ভ হয়। অবশেষে দোকানদার 'মজা দেখাচ্ছি' বলে এই কাপড়টা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে থানায ধরে এনেছে। আমি এই বিষয়ে একেবারেই নির্দোষ।"

এই বিপণি উত্তোলকেরা আইনানুসারে গৃহ চৌর্যের পর্যায়ে পড়ে থাকে। উহারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার মতে অভিযুক্ত হ'য়ে

থাকে। যে সকল অপরাধী গৃহ-বেষ্টনীর [erclosure] মধ্য হতে দ্রব্য চুরি করে তাদের গৃহ-চোরই বলা হয়। এর কারণ এই বিপণি সমূহও গৃহ মাত্র। তবে বহু বিপণি বা দোকান উন্মুক্ত স্থানে থাকে। এরূপ দোকান হাটে ও রাস্তায় দেখা যায়। ঐ সব দোকান হতে চুরি হ'লে ঐ চুরিকে গৃহ-চৌর্য বলা হয় না। উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতে ব্যক্তির নিকট বা সন্নিকট হ'তে চুরি বলা হয়। শকট উত্তোলকগণ এই কারণে ঐ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতেই অভিযুক্ত হয়ে থাকে। গৃহ-আবেষ্টনীর মধ্য হ'তে স্বাভাবিকভাবে চুরিকে বলা হয় বাটীর চুরি বা গৃহ চৌর্য। ইংরাজিতে ইহাকে বলে হাউস থেফ্‌ট [l ouse theft]। যে ভাবে মানুষ সচরাচর বাটীর মধ্যে যাতায়াত করে, সেইরূপ সোজা বা স্বাভাবিক পথে, গৃহে, দোকানে বা গুদামে প্রবেশ ক'রে কেহ ঐ সকল স্থান হ'তে দ্রব্যাদি চুরি করলে ঐ সকল চুরিকে বলা হবে 'গৃহ-চৌর্য'।

এই বিপণি উত্তোলক বা শকট উত্তোলক ছাড়া অপর আর এক-প্রকার উত্তোলক আছে। এদের পশু উত্তোলক [cattle thief] বলা হয়। নিম্নে জনৈক পশু উত্তোলকের বিবৃতি তুলে দিলাম।

"ছাগল চুরি সম্বন্ধে আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি, যাতে করে ঐ ছাগল ডেকে উঠতে না পারে। আমরা গোটা কয় সরিষার দানা ছাগলের কানের মধ্যে ঢালি। এইরূপ অবস্থায় তারা কখনও ডাকে না। আমরা অভিজ্ঞতা হ'তে এইরূপ জেনেছি। কুকুর চুরির সময় সাধারণতঃ আমরা মাংসের টুকরা দেখিয়ে তাদের বাইরে এনে পশুগুলিকে করায়ত্ত করি। কখনও আমরা পোষা মাদী কুকুরেরও সাহায্য নিয়ে থাকি।"

কোনও কোনও স্বভাব দুর্বৃত্তজাতীয় ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত উপায়ে

গবাদি পশু চুরি করে। নিম্নে ঐরূপ এক ব্যক্তির একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"গরু প্রভৃতি চুরি কববার সময় আমরা খড়ের একটি গাত্র-আচ্ছাদন [ক্লোক] বা পোশাক দ্বারা সারা অঙ্গ আবৃত করে নিই। এর পর আমরা চারণরত গবাদির সম্মুখে শুয়ে পড়ে বা বসে ধীরে ধীরে নিরালা স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। গরু আমাদের গাত্রের খড় খাবার জন্য আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে প্রলুব্ধ করে পশুদের সুবিধাজনক স্থানে এনে তাদের অপহরণ করি। বাটীর মধ্য হ'তে গরু চুরি করবার সময় গৃহস্থ জেগে উঠলে আমরা ঐ খড়ের আচ্ছাদনসহ উঠানের খড়-গাদায় শুয়ে নিজেদের তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি।"

উত্তোলক চোরেরা বহুবিধ মনস্তত্ত্ব ও জৈব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৎস্য উত্তোলক বা মৎস্য চোরদের কথা বলা যেতে পারে। মৎস্য চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগে রাত্রিযোগে আলোড়ন করে অর্থাৎ 'ঘাই মারে'। এর ফলে বহুক্ষণ উপরে উঠতে না পারায় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে বহু মৎস্য আধমরা হয়ে জলের উপর ভেসে উঠে। ঐ চোরেরা তখন মৎস্য সকল হাতে ধরে উপরে তুলে আনে। কোনও কোনও মৎস্য ভয়ে পাঁকে মাথা গুঁজে ও তার ফলে পাঁকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। বহু মৎস্যকেই শ্বাস গ্রহণের জন্য যে মাঝে মাঝে উপরে উঠতে হয় তা এই সকল অজ্ঞ চোররাও জ্ঞাত আছে।

এ ছাড়া জাল পোলো বা ছিপ দ্বারাও যে রাত্রিযোগে মাছ চুরি করা না হয় তাও নয়। কিন্তু গৃহস্থগণ এর প্রতিষেধকরূপে পুকুরের তলায় কাঁটা ও বহু ডালপালা ও কঞ্চি ডুবিয়ে রাখায় সব সময় জালের

সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। এইজন্য অপরাধীরা উপরোক্তরূপ পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে থাকে।

এই পণ্ড চুরি গৃহ হ'তে সমাধিত হলে দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং মাঠ বা পথ হ'তে চুরি হলে উহার ৩৭৯ ধারা মতে চোরেরা অভিযুক্ত হয়ে থাকে। বিপণি, শকট ও পথ হ'তে চুরি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার অপর কয়েক প্রকার গৃহ ও বহিঃ চুরি সম্বন্ধে বলা যাক।

এই চৌর্যকার্য অপরাধিগণ পোষা জন্তু-জানোয়ারদের সাহায্যেও সমাধিত করে থাকে। সাধারণতঃ পোষা কুকুর এবং বাঁদরের সাহায্যেই এই অপকার্য সমাধিত হ'য়ে থাকে· বেদিয়া প্রভৃতি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির ব্যক্তিগণ তাদের পোষা কুকুরদের এমন ভাবে শিক্ষিত ক'বে তুলে যে তারা অনায়াসে নর্দমা বা গবাক্ষের পথে বা উন্মুক্ত দুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য গৃহস্থের গৃহে ঢুকে সুবিধামত জামা কাপড় বা থালা বাসন মুখে করে বেরিয়ে এসে ঐ অপহৃত দ্রব্য সকল মনিবদের নিকট প্রত্যর্পণ করে। কয়েক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভোঁদড় দ্বারাও মৎস্য চুরি সহজসাধ্য করা হয়েছে। অপরদিকে শহরাঞ্চলেও বিশেষ করে কলকাতা শহরে এইরূপ অপকার্যের জন্যে অধিক ক্ষেত্রে বাঁদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী রাজপথে ফুটপাথের উপর শ্বেতাঙ্গ পথিকদের উপর এইরূপ বহু উপদ্রব সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই অপপদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"আমি একজন কলিকাত্তায় নবাগত ইংরাজ নাগরিক। এই দিন আমি আমার মেমসাহেবাকে সঙ্গে করে চৌরঙ্গী রাস্তার পূর্বদিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা হতে দুই-দুইটা বাঁদর ছুটে এসে আমাদের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

ওদের বড বাঁদরটি আমার কাঁধে এবং ছোটটি আমার মেমসাহেবের কাঁধে জেঁকে বসেছিল। আমরা হস্ত দ্বারা ঝট্‌কানি দিয়ে তাদের অতিকষ্টে অপসারণ করি। রাস্তার অপর ফুটপাথে দুইজন এদেশীয ব্যক্তি চেন ও বগলস হাতে অপেক্ষা করছিল। বাঁদরদ্বয় এর পব ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল। প্রথমে আমরা এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু মনে করি নি। বরং এটাকে আমরা বাঁদরের বাঁদরামী মনে করে হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কিছুটা দুর অগ্রসর হয়ে আমি লক্ষ্য করি যে, আমার বুক পকেট হতে দুইটা দামী ফাউণ্টেন পেন অপহৃত হয়েছে। এই সময় আমার মেমসাহেবও উপলব্ধি করলেন যে তাঁর হাতেব রিস্টওআচ্‌টিও তারা টেনে খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

অপসারক চোররা রবার দস্তানা পরে রাজপথের ও রেলওযের ইলেকট্রিক ফিটিঙ, গ্যাস এবং ওআটার পাইপের পার্টস এবং অন্য আসবাবপত্রের অংশ চুরি করে জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি করে। অধিক ক্ষেত্রে এরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার চুরি করে জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি করে। বহু ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশেও এরা তামার তার চুরি করেছে।

এরা টেলিগ্রাফের তামার তার কাটার জন্যে মই-এর বদলে একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্র সংলগ্ন দণ্ডটি রশিসহ ঠেলে উপরে তুলে নীচে দাঁড়িয়ে ঐ দুমুখো কাঁচি সম যন্ত্র দ্বারা ঐ তার কাটা যায়।

গৃহ-চোর

কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ বাটী আছে অথচ একটি বিশেষ দিন ও সময়ে একটি বিশেষ বাড়িতেই বা চুরি হল কেন? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই গৃহস্থ লোকের মনে জেগে থাকে। এছাড়া গৃহমধ্যকার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার গুপ্তস্থানগুলিরই বা তারা কোথা হ'তে সন্ধান পেল? মালিকেরা কেউ যে ঐ দিন গৃহে থাকবে না—এই সংবাদই বা তারা কিরূপে জানতে পেরেছে? এই সকল একান্ত রূপে পারিবারিক ব্যবস্থার সংবাদ তারা জানলো কি করে? এ প্রশ্নও ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মনে বারে বারে জেগে থাকে। আসলে বিষয়টি হয় এইরূপ,—কোনও বাড়িতে চুরি করতে মনস্থ করলে পেশাদারী চোর মাত্রই প্রথমে সুড়ুক সন্ধান নিয়ে থাকে। বিশেষরূপে সন্ধান না নিয়ে এরা কেহ কাজে অগ্রসর হয় না। এই সব সন্ধান তারা বাড়ির চাকর, বা বয়াটে [বিপথগামী] ছেলেপুলেদের কাছ থেকেই নিয়ে থাকে। এই সকল চোরেরা বা তাদের নিযুক্ত চরেরা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রায়ই খোলা যায়গায় বা রকের উপর বসে তাস বা ঘুঁটি খেলতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দুপুর বেলায় বাটীর চাকর-বাকরদের কাজকর্ম থাকে না। এই সময় এরা বাইরে এলে চোরেরা এদের সঙ্গে আলাপ জমায়। এমন কি এরা এদেরকে নিজ খরচে খাওয়ায় এবং সুবিধামত তারা তাদের সিনেমাও দেখিয়ে থাকে। কেহ কেহ এদের কিছু কিছু অর্থ ধার বা দান স্বরূপও দিয়েছে। এই সকল চাকরদের নিকট হ'তে চোরেরা খোঁজখবর

[গল্পের মধ্যে] প্রথমে সম্যকরূপে জেনে নেয়। কখনও কখনও এই সকল চাকরেরা সাক্ষাৎরূপে এদের সাহায্যও করে থাকে। ধীবে ধীবে এদের লোভ বর্ধিত হওয়ার কারণে এইরূপ সম্ভব হয়। এই সময় মাত্র সামান্য কযেকটি মুদ্রার বিনিময়ে এই চাকরদের কেহ কেহ চোরদের জন্যে রাত্রে বাটীর দরজাগুলি খুলেও রেখে দিয়েছে।* এই চাকবদের সংবাদমত এই গৃহ-চোরেরা যে সকল বাক্সে বা পেটিকায মূল্যবান দ্রব্যাদি ন্যস্ত আছে, মাত্র সেই সেই বাক্সো প্যাটরা ও আলমারি তারা ভাঙ্গে ও তা থেকে দ্রব্য অপহরণ করে থাকে। স্বল্প সমযেব মধ্যে কাজ হাসিল না করতে পারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থা না করে বাইরের চোরেরা কোনও গৃহে দ্রব্যাপহরণেব কারণে কদাচিৎ প্রবেশ করে। তবে বাড়িব ভিতরের চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। চাকর বা অন্যান্য ব্যক্তি বা আত্মীযবর্গের মধ্যে যাবা বাটীতে বাস কবে কিংবা যাবা সাধারণতঃ ঐ বাটীতে যাতাযাত করে তাদের দ্বারা কোনও চুবি সমাধিত হলে উহার জন্য দায়ী ঐ চোরদের ভিতরের চোর বলা হয়। ভিতরেব চোরদের মধ্যে চাকর-চোরেবা অন্যতম। এ কারণে চাকর হিসাবে চুরিব জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি পৃথক

---

* ধরা পড়াব পর এই চাকরদের কেহ কেহ অপরাধ স্বীকার করলেও আসল চোরেদেব নাম বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয। আসলে চোরেরা তাদের নামধাম সম্বন্ধে এদের বলে না। তারা তা তাদের বললেও ভুল খবর দিয়ে থাকে। অনেক সময় পাওনা বা হিস্যা নেবার জন্যে চোরেদের প্রদত্ত ঠিকানায় এসে এরা তাদেব কোনও খোঁজ-খবর পায় নি।

ধারা আছে। চাকর চোরদের ঐ দণ্ডবিধির ৩৮১ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। চাকরেরা বাহিরের কোনও ব্যক্তির সম্পর্ক রহিত ভাবে মনিবের দ্রব্যাপহরণ করলে তাদেরই বলা হয় চাকর-চোর। চাকর-চোরদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে। এক্ষণে এই গৃহচোরদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নে একটি গৃহ-চোরের বিবৃতি তুলে দিলাম। বিবৃতিটি হ'তে গৃহ-চোর সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে।

"আমাকে হীরু সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই। সর্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিত। তদুপরি আমাকে সে নানারূপ কু-অভ্যাসও শেখায়। এছাড়া সর্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দারজীর স্বগৃহে একটা স্কুলও ছিল। এইখানে আমরা তালা চাবি তৈরি করতে ও খুলতে শিখি। এর পর এই বিষয়ে আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য হয়। সর্দারজী আমার হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন, 'যা দিকিনি বাড়ি গিয়ে মা'র আঁচল থেকে সিন্দুকের চাবিটি খুলে তার একটা ছাঁচ নিয়ে আয়।' আমি বাটী গিয়ে সুবিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের নরম অংশে ঢুকিয়ে দিয়ে ছাঁচ তৈরি করি। সর্দারজীর ডেরায় এই ছাঁচ থেকে চাবি তৈরি হয়। এর পর একমাসের জন্যে আমি মামার বাড়ি চলে যাই। কিন্তু ফিরে এসে শুনি মায়ের সিন্দুকের যাবতীয় গহনাপত্র চুরি গেছে।"

[ভৃত্যচোররা দ্রব্যাদি চুরি করে প্রথমে উহা বাড়ির ভিতরের গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখে। ইলেকট্রিক মিটার বক্স, কয়লার গাদা, জলের ট্যাঙ্ক ও নর্দমা প্রভৃতি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়দিন পর সন্দেহ মুক্ত

হলে ওরা ঐ দ্রব্য বাহিরে পাচার করে। দ্রব্য চুরির সাথে ভৃত্যের পলায়ন সন্দেহের বিষয়। এই জন্য উহারা ঐরূপ ব্যবহার করে।]

গৃহ-চোরেরা ব্যক্তি বা বস্তুর উপর কোনওরূপ আঘাত হানে না। কয়েক ক্ষেত্রে এরা সুযোগ মত দিনের বেলাতে সহজ ভাবে বাড়ি ঢুকে কোনও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে রাত্রে দ্রব্য চুরি করেছে। এরা নানারূপ কৌশলের সাহায্যে গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ ক'রে দ্রব্য অপহরণ করে। এই সম্বন্ধে নিম্নে দুইটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। এই বিবৃতি হতে এদের অপপন্থতির ধারা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারবে।

"বাইরের ঘরে বসেছিলাম এমন সময় যন্ত্রপাতিসহ একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে বলল, বড়বাবু তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইলেকট্রিক পাখাটা তেল দিতে এবং মেরামতও করতে। এর পর মিস্ত্রিটি তার দুইজন সহকারীর সাহায্যে কাজে লেগে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধরে এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এই সময় মিস্ত্রিটি একটুকরা ছেঁড়া নেকড়া এনে দেবার জন্যে অনুরোধ জানায়। সহকারী লোকটি এক গেলাস জলও খেতে চায়। কিছুক্ষণ পরে আমি ন্যাকড়া ও জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে ঘরের ইলেকট্রিক পাখা, রেগুলেটার ও বাল্ব কয়টি অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা উধাও হয়েছে।"

[এই বিশেষ অপরাধকে বলা হয় মিশ্র অপরাধ। এইখানে চুরির সহিত মিশান আছে প্রবঞ্চনা। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে এরা পরে চুরি করে পালিয়ে যায়।] এইবার অপর বিবৃতিটি সম্বন্ধে বলা যাক। অপরটিকে চুরি না বলে জুচ্চুরী বলাই ভাল।

"আমার পুত্র 'অমুক' বার হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার

পুত্রের সমবয়স্ক একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, অমুক বাড়ি আছে ?' ছেলেটি আমার পুত্রের সহপাঠী বলে পরিচয় দেয় এবং জানায় যে আমার পুত্র পড়বার জন্যে তার একখানা বই এনেছে। ঐ বইটা এক্ষুনি প্রফেসারের কাছে না নিয়ে গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে। এমন করুণ ভাবে সে বাক্যজাল বিস্তার করে যে আমি তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি। আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তা বাবা! আমি তো সব বই চিনি না। ঐ টেবিলটায় ওর বই-টই থাকে। ওখানে দেখে নাও না তুমি।' ছেলেটি এর পর টেবিল থেকে তিনখানি বই তুলে নিয়ে একটি পত্র আমার পুত্রের নামে লিখে আমার হাতে দেয় এবং এর পর আমার পায়ের ধূলা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। ঘণ্টাখানেক পরে আমার পুত্র ফিরে এলে সকল সমাচার অবগত হয়ে অবাক হয়ে যায়। প্রকৃত বিষয় বুঝে আমিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। বুঝতে পারি আগে-ভাগে আমার পুত্রের নাম ও কলেজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেটা আমায় ঠকিয়ে গেছে।"

যে কোনও গৃহ-চোরেরা বাটীর তালা বা গরাদ ভেঙে, নর্দমা গলে বা পাঁচিল ও ছাদ ডিঙিয়ে অপকর্মের জন্যে গৃহে প্রবেশ করলে তাদের বলা হয় সিঁদেল চোর, তালা তোড় বা সবল চোর। এরা এমন সব পথ দিয়ে [বা এমন ভাবে পথ ক'রে] গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ করে, যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ কেহ ঐ সব গৃহে প্রবেশ করে না। আইনানুসারে এই সব চোরেরা ঐ ভাবে সর্বাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে মাত্র তাদের হাত বা পা [দেহের অংশ বিশেষও] কোন গৃহে প্রবেশ করালেও তাকে সবল বা সিঁদেল চোর বলা হয়। অর্থাৎ কেহ রাস্তা হতে জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি বার করলেও তাকে

সিঁদেল চোর বলা হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সিঁদেল চোরদের সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হবে।

[অধুনা প্রাথমিক অপরাধীরা টেলিফোনে কোনও বাড়িতে জানায় যে তাদের অমুক পুত্র বা কন্যা এক্সিডেন্টের কারণে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়ে অমুক হাসপাতালে নীত। বেশিক্ষণ সে বাঁচবে না। বাড়ির প্রত্যেকে তাকে শেষ দেখার জন্য তালা বন্ধ ক'রে হাসপাতালে গেলে ঐ তালা ভেঙে দুর্বৃত্তরা সহজে দ্রব্যাপহরণ করেছে। এক্ষেত্রে তারা বাড়ির পুত্র বা কন্যার নামটি পূর্বাহ্নে জেনে নিয়ে থাকে।]

কোনও কোনও অপরাধী রাস্তা হতে লোহার শিক বা লম্বা আঁকশির সাহায্যেও জানালার ওপার হতে প্রায়ই দ্রব্যাদি বার করে নেয়। অনেক সময় জানালার ধারে তক্তপোশ বা খাটিয়ার উপর সালঙ্কারা কন্যা বা বধূরা শুয়ে থাকেন। জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এই সব ঘুমন্ত কন্যা বা বধূদের হাত হতে অলঙ্কারাদিও এরা খুলে নিয়েছে। এইরূপ বহু কাহিনীও এদেশে শুনা গেছে। এইগুলিকে গৃহ চুরি না বলে সিঁদেল চুরিই বলা উচিত।]

লস্ট রিলেশন

লস্ট রিলেশন ট্রিক বা "আত্মজনের পুনরাগমন" পদ্ধতি দ্বারাও পল্লী অঞ্চলের অপরাধিগণ সরলমনা পল্লীবাসীদের অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এই পদ্ধতিকে 'হারানো ছাওয়াল" [পুত্র] পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। এরা প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে নেয় কোনও পল্লীবাসীর কোনও পুত্র বহুকাল পর্যন্ত নিরুদ্দেশ আছে কি'না। বিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ কোনও পুত্র কাহারও হারিয়েছে জ্ঞাত হওয়া মাত্র এদের একজন ঐ পুত্রের অভিভাবকদের নিকট এসে নিজেকে তাদের সেই হারানো পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা ঐ ছেলেটির ছোটবেলায় ঘটেছে এমন অনেক কাহিনীও তাঁদের শুনিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনী তারা খোঁজ-খবর নিয়েই জ্ঞাত হয়ে থাকে। এর পর ঐ পরিবারের সকলেই তাকে আদর-যত্নে আপ্যায়িত করতে থাকে। এই সময় দুর্বৃত্তটি সকলকে জানায় যে সে কি ভাবে এতদিন কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গে কোথায় কোথায় দিন যাপন করেছে। সেই সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত কাহিনী সকলকে এরা শুনাতে থাকে। এই সময় সে এও জাহির করে দেয় যে, সে এমন এক মন্ত্র শিখেছে যাতে সে এক ভরি সোনাকে দু ভরি করে তুলতে সক্ষম। পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই তাকে বিশ্বাস ক'রে স্ব স্ব সোনা-দানা এনে তার হাতে সেগুলি সরল বিশ্বাসে তুলে দেয়। দুর্বৃত্তটি তখন প্রতিশ্রুতি মত যাগযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এই সোনা দ্বিগুণ করবার জন্যে দুর্বৃত্তটি ঐগুলি বিল্বপত্র ও ফুলের তলায় রেখে

দেশ এবং পরে সুযোগ মত সে ঐগুলি ঐ স্থান হ'তে সকলের অজ্ঞাতসারে তুলে নিয়ে রাত্রিযোগে পলায়ন করে থাকে।

শহরের লোকেরা কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের ন্যায় সরল প্রকৃতিব নয। এই সব অলৌকিক ক্রিযাকাণ্ডে তারা বিশ্বাসীও নয়। এই জন্যে শহরবাসীদের দ্রব্যাদি অপহরণের জন্যে দুর্বৃত্তরা ভিন্নরূপ পন্থা অবলম্বন ক'বে থাকে। কাবণ, সর্বপ্রধান প্রশ্ন হয 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। শহরে চোরেরা কতদূর ধূর্ত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমরা কোনও এক আমেরিকান ডিপোতে কাজ করতাম। এই ডিপোর প্রতি গেটেই আমেরিকান পুলিশরা পাহারা দিত। এদের নজর এড়িয়ে কোনও দ্রব্যাদি বাইরে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। আমরা তখন দ্রব্য চুরি করবার একটি সুচতুর মতলবের আশ্রয় নিই। আমাদের মধ্যে একজন ধরা পড়া চোরের অভিনয় করত। কিন্তু বাকি সকলে কি করতো জানেন? তারা এই চোরের মাথায় চোরাই দ্রব্য চাপিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে গেটের নিকট এনে সৈনিক পাহারাদের সম্বোধন করে বলতো, 'সাহেব! এই এক বেটা চোরকে বামাল শুদ্ধ ধরেছি। ওকে এবার থানায় ধরে নিয়ে যাব।' শান্ত্রী সাহেবেরা, 'ঠিক হ্যায়। লে যাও থানে মে,' বলে আমাদের বামাল শুদ্ধ গেট পার করে দিত। এর পর এ বিষযে কে আর কার খবর রাখে। আমরা বাইরে এসে খাউ বা বামাল-গ্রাহকদের কাছে এই সব দ্রব্য বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি ফিরতাম।"

আজকাল স্থান বিশেষে এক অদ্ভুত প্রকারের অপকর্মের কথা শুনা যাচ্ছে। শহরের এই সকল অঞ্চলে এমন সব লোক বাস করে যাদের বুদ্ধিমত্তা পল্লী অঞ্চলের লোকের মত সংস্কারাচ্ছন্নও নয়। আবার

শহরের অধিকাংশ লোকের ন্যায় এরা অত্যন্তরূপ চৌকসও নয়। এদেব বুদ্ধিমত্তা পল্লী এবং নগরবাসী ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার মাঝামাঝি ; এদের মধ্যম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিও বলা চলে। এই সকল ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে অর্থাপহরণ করবার জন্যে এদের বুদ্ধিমত্তা [বুদ্ধির দৌড়] অনুযায়ী অপপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি হতে উক্ত প্রকার কর্মপদ্ধতিটি সম্বন্ধে বুঝা যাবে। বিবৃতির [হিন্দি] বাংলা তর্জমা নিম্নে প্রদত্ত হল।

"আমার পতি [স্বামী] বেরিয়ে যাবার পাঁচ ঘণ্টা পরে একজন মাড়োয়ারী এক ঝুড়ি আম নিয়ে বাড়ি ঢুকল। আমের ঝুড়িটি আমার সম্মুখে রেখে সে বলেছিল, 'মাজী ! এই ফল বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন আপনার হাতের বাজু আর গলার হারটা নিয়ে আসতে। ওগুলো দোকান হতে পালিশ করে নিযে আসবেন তিনি।' আমি তার কথায় অবিশ্বাস করি নি। আমি নিঃসন্দেহে তার হাতে গহনাগুলি তুলে দিয়েছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকে হঠাৎ মূল্যবান সোনার গহনা এদের খুলে দেয় নি। কিন্তু গহনার বদলে রিপু করবার বা কাচাবার জন্যে শাল বা বস্ত্রাদি চাইলে দুর্বৃত্তরা সহজেই তা করায়ত্ত করতে পেরেছে।

এদেশের স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে বহু জাতি আছে- কেবলমাত্র চুরি ডাকাতির দ্বারা জীবন যাপন করে। এদের এক একটি দল এক এক পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা চৌর্য কার্য করে। ইরানী জিপসী এবং সন্দার জাতীয় পুরুষেরা চৌর্য কার্যের জন্যে প্রায়ই কোনও দোকানে এসে দোকানদারের সহিত কলহে লিপ্ত হয়। ইত্যবসরে এই দলের মেয়েরা দোকানের দ্রব্যাদি বেমালুম

ভাবে চুরি করে বস্ত্রাচ্ছাদন মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। এই সকল স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে সানুরিয়া ব্রাহ্মণ, চন্দ্রবেদী নামে এক জাতি আছে। এই জাতির লোকেরা এক অদ্ভুত উপায়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ঠকিয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন স্নানের ঘাটের নিকট হঠাৎ একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে উঠে, 'ক্ষমা করবেন ঠাকুর, হঠাৎ আপনাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। আমি সামান্য একজন মেথর, যেন অকল্যাণ হয় না আমাদের' ইত্যাদি। এর পর ঐ উচ্চ-বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের স্নান করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এদিকে দ্রব্যাদি ঘাটের চাতালে রেখে ভদ্রলোক জলে নামামাত্র, দুর্বৃত্তটি দ্রব্যাদি চাতাল থেকে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বিষ্ঠার হাঁড়ি নিয়েও ভদ্রলোকদের ছুঁয়ে দেয়, উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ তাদের স্নান করানো—উপরের পাড় হতে দ্রব্য চুরি করবার সুবিধার জন্যেই এরা এইরূপ করে থাকে। এরা কোন মহিলাকে পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে দ্রব্যাদি পাহারায় নিযুক্তা দেখলে এমন ভাবে মল বা মূত্র ত্যাগ করতে বসে, যাতে ক'রে মহিলাটি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়; ইত্যবসরে দলের অপর আর একজন ঐ দ্রব্যাদি তুলে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায়।

এই চন্দ্রবেদী জাতিরা ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিকে উপরিউক্ত ভাবে বিভ্রান্ত করলেও এরা নিজেরা উচ্চশ্রেণীরই হিন্দু, কিন্তু এরা এদের গোষ্ঠীর মধ্যে এক চামার ও ঝাড়ুদারদের ছাড়া সকল শ্রেণীর হিন্দু-দেরই গ্রহণ করে থাকে। এমন কি মুসলমানদেরও গ্রহণ করতে এদের বাধা নেই। বর্ণহিন্দুদের এই অস্পৃশ্যতা দোষের সুযোগ কোনও কোনও শহরের লোকও নিয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে একজন শহর-বাসী ছোকরার বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"কিছুদিন পূর্বে আমরা দুইজন একটি টি-পার্টি'তে আহূত হয়েছিলাম। আমরা একটি টেবিলে দুইজন টিকিধারী ব্রাহ্মণকে বসে থাকতে দেখে ঐ টেবিলের পাশে ন্যস্ত অপর দুইটি চেয়ার দখল করে বসলাম। টেবিলে খাদ্যসহ চারিটি মাত্র রেকাবি রাখা ছিল। আমরা তখন লোক দুইটিকে শুনিয়ে কথোপকথন শুরু করলাম। আমি আমার বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললাম, 'জাতিভেদ ভাই একটা পাপ বিশেষ। এই তুই তো ব্রাহ্মণ আর আমি হচ্ছি দুলে বাগ্দী [অচ্ছ্যুত]'—এই পর্যন্ত শুনামাত্র ভদ্রলোক দুজন একটু নড়ে বসলেন। তারপর রেকাব দুটিতে আর হাত না দিয়ে উঠে পড়লেন। এই সুযোগে আমরাও হুপাহুপ করে চারটি রেকাবের খাবার সাবড়াতে আরম্ভ করলাম। তবে আমরা মুখে এসব বললেও আমরা দু'জনেই আসলে ব্রাহ্মণ সন্তানই ছিলাম।"

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এমন দুই একটি দল আছে যাদের পুরুষরা [প্রাপ্তবয়স্ক] নিজেরা চুরি করে না। তাদের নির্দেশে চুরি করে তাদের ছোট ছোট ছেলেরা। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে বড়রা এসে ঐ সকল ছেলেদের মার-ধোর করে এবং ফরিয়াদীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ছেলেগুলিকে মুক্ত করে নেয়। এই সকল দলের কেহ-কেহ সাধু-সন্ন্যাসী সেজেও ঘুরা-ফেরা করে। কেহ কেহ ধরা পড়ার পর নির্বোধ বা পাগলের মতও অভিনয় করে থাকে। কেপমারী দলের ছেলেরা ধরা পড়লে প্রায়ই মূক বা বোবা সাজে। এরা অদ্ভুত উপায়ে এদের জিহ্বা উপরে বা নিচে গুটিয়ে নেয়। এমন ভাবে এরা তা করে যাতে তাদের বোবাই মনে হবে। বহু অভ্যাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ঐ কৌশল তারা আয়ত্ত করেছে। কোনও কোনও সময় এরা ফকিরের বেশে কোনও দোকানে এসে জিনিস কেনবার অছিলায়

করদ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রা প্রদান করে। দোকানদার এই মুদ্রা গ্রহণে অসম্মত হলে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তা'হলে কি এদেশের মুদ্রা ভিন্ন প্রকারের?' এই বলে সে তাদের কাছে তা দেখতে চায়। দোকানদার প্রচলিত একটি রৌপ্য মুদ্রা দেখবার জন্যে তার হাতে তুলে দিলে সে তৎক্ষণাৎ হাত-সাফাই-এর সাহায্যে উহা সরিয়ে নিয়ে ঐ স্থলে একটি জালি মুদ্রা আনে। ঐ মুদ্রাটিই সে দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে। এই দুর্বৃত্ত জাতিসকল এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার অপপদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে অন্যান্য চৌর্য পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ক'রে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক।

সবল চোর

সিঁদেল চুরি ভারতের এক প্রাচীনতম অপরাধ। ইংরাজিতে উহাকে বারগলারি বলা হয়ে থাকে। অপরাধীরা ইহাকে 'তালা-তোড়, গামছামারী ও চাবির কাজ [কাম]' নামে অভিহিত করে। এই সিঁদমারী ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে পূর্বে গৃহস্থ বাটীগুলি দুর্গাকারে তৈরি হতো। এজন্য ধনীরা খাড়া পাহাড়ের উপর বাটী তৈরি করতেন। কিন্তু ঐ যুগে খাড়া পাহাড়ে উঠতে এরা শিকল-বাঁধা গোহাড়গিল জীবের সাহায্য নিতো। একালে এরা এ কাজে বহু-বিধ ভাঙন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এযুগে হালফ্যাশানের

বাটীগুলি খোলা-মেলা হয়। ফলে সব ক্ষেত্রে এদের ভাঙাভাঙি করতে হয় না। এই ভাঙাভাঙির কাজ বহু প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) সিঁদমারী—সিঁদকাটির সাহায্যে দ্বিবাল খুঁড়ে গর্ত করা হয়। এরা প্রথমে ঐ গর্তের মধ্যে পা বাড়ায়। বহু গৃহস্থ ঠুকঠাক শব্দে জেগে উঠেছে ও কোপ মেরে তার পা' দুখান করেছে। এতে পূর্ব চুক্তিমত দলের লোক তার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এতে ঐ ব্যক্তিকে কেউ সনাক্ত করতে পারে নি। ফলে, সমুদয় দলটি ঐ কারণে ধরা পড়ে নি। কোঠা বাড়িতে সাধারণতঃ দুয়ারের পাশে ঐ গর্ত করা হয়ে থাকে। উহাকে বগলী সিঁদ বলা হয়ে থাকে। এই গর্তে হাত বা বাঁকা শিক্ ঢুকিয়ে খিল খুলা হয়। দুই স্তর ইট বা মাটির দ্বিবালের [মেটে বাড়িতে] মধ্যে একটা করে করোগেটেড্ টিন রাখলে গর্ত কাটা যায় না। কয়েক ক্ষেত্রে ছাদ ফুটো করে এরা দড়ি ধরে ঘরে নেমেছে। কিন্তু ঐরূপ কার্য খালি দোকান ঘরেতে সম্ভব। বাড়িতে শিক্ষিত কুকুর থাকলে ইহাতে অসুবিধা হয়। কিন্তু ঐ কুকুরকে দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে রাত্রে ছাড়তে হবে।

(২) চাড়-বাজী—এই পন্থাতে দুয়ারের উভয় পাল্লার মধ্যে পাতলা ছুরি, লৌহ পাত ঢুকিয়ে দুয়ারের পাল্লাদ্বয় ফাঁক করা হয়। কখনও দুই হাতের মোক্ষম ও সতর্ক চাপেও ঐ কাজ সমাধা হয়। পরেতে রুটি কাটা করাতের দাঁতে আটকে ভিতরের খিল নিঃশব্দে ধীরে নীচে নামানো হয়।

(৩) তুরপুনি—এই পন্থাতে বিবিধ তুরপুনের সাহায্যে দ্রুত গতিতে দরজার পাল্লাতে ঠিক খিলের উপরে ফুটা করা হয়। এই ফুটাতে বাঁকা তার বা শিক ঢুকিয়ে ধীরে খিল খুলা ও নামানো হয়।

পলায়নের সুবিধার জন্ত প্রায়ই এরা যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ঘটনাস্থলে ফেলে যায়। উপরোক্ত এক একটি পদ্ধতি এক এক বারগ্লারদল দ্বারা গৃহীত হয়।

প্রতিষেধক রূপে দুই পাল্লার দুই প্রান্তে দুটি শক্ত [বড়] ছিট-কিনি ও তৎসহ খিল লাগালে দুয়ার খুলা শক্ত হয়। ঐ ক্ষেত্রে চাড়বাজীতে বা অন্ত ভাবে দুয়ারের পাল্লাদ্বয় ফাঁক করা যায় নি। অতিরিক্ত আঘাত করলে শব্দ হয় এবং গৃহস্থ জেগে উঠে। দুয়ারের পাল্লাদ্বয়ের উপরাংশের ন্তায় উহাদের নিম্নাংশেও ছিটকানি থাকলে আরও ভালো। অন্ততঃ মূল্যবান দ্রব্য সম্বলিত একটি ঘর ঐরূপে সুরক্ষিত রাখা ভালো। দুয়ারের পিছনে টিনের পাত লাগানো সর্বোত্তম।

[পূর্বে বাড়িগুলির চওড়া দিবালের মধ্যে ফলস্ দিবাল থাকতো। অর্থাৎ উহাদের মধ্যস্থলে কিছুটা ফাঁক থাকতো। দিবাল বেশি চওড়া মনে হতো—কারণ বাহির হতে এই ফাঁক বা ফাঁকি বুঝা যেতো না। মধ্যে এই এয়ার স্পেশ থাকাতে ঘর ঠাণ্ডা থাকতো এবং তৎসহ দিবাল ভাঙা বা তা ফুটা করা সম্ভব হতো না।

লাইব্রেরি, পার্লার, ক্লোক রুম প্রভৃতি সহ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ করে। কিন্তু মাত্র অতিরিক্ত দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে কেউ তৎসহ একট স্ট্রং রুম তৈরি করে না। অথচ তাদের মূল্যবান জহরত, অর্থ ও গহনাদি ব্যাঙ্কে না রেখে বাড়িতে রাখা চাই।]

(৪) উঠমারি—এই পদ্ধতিতে অপরাধী দিবালের খড়া বা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে। দ্বিতল বা ত্রিতলে চুরি ঐ

ভাবে এরা করে। এদের কেউ কেউ উপরে উঠার জন্য কর্নিকের সাহায্যে খিবালে খাঁজ কেটে নেয়। এরা ছাদে উঠে পরে সিঁড়ির দুয়ার খুলে নীচে নামে। এদের বিড়াল-চোর [CAT BURGLAR] বা বিড়ালী চোর বলা হয়। এই সকল পাইপ বা পাঁচিলে কাঁটাতার দেওয়া থাকলে ওরা কেউ বা জুতা পায়ে কিংবা পায়ে থলে জড়িয়ে উহা অতিক্রম করে। অধুনা কর্তন যন্ত্র দিয়ে তাদেরকে শিক কাটতে দেখা গিয়েছে। এই পাইপ বাথরুমের ভিতর দিয়ে নামানো যেতে পারে এবং সাবেকী কায়দায় ছাদে জল নিকাশী মাটির পাইপ বসানো চলে। কিন্তু উহাতে বাড়িগুলির অন্তর্ভাগ সুদৃশ্য দেখা যায় না।

(৫) বাঁকীয়াখুল—এই পদ্ধতিতে জানলার রড, হাতের চাড়ে কিংবা করাত বা অন্য যন্ত্রের সাহায্যে কর্তিত, বাঁকানো বা খুলা হয়ে থাকে। এই প্রকার সিঁদেল চোর মাত্র জানালার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। এই জানালার রড মোটা হলে উহাদের অসুবিধা হয়। এর প্রতিষেধক সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

(৬) ঘুলঘুলিয়া—এই পদ্ধতিতে অপরাধী একজন [বালক] নর্দমা বা অপরিসর স্কাইলাইটের ফাঁকে বাড়ির ভিতরে যায়। তারপর ঐ বালক ভিতর হতে খিল খুলে বড়দের ভিতরে ঢুকায়। [কাউর মাথা ঢুকলে দেহও ঢোকে। এই বুঝে ফাঁকের মাপ ছোট রাখা ভালো।] এই জন্য এই অপদল ঐ কাজের জন্য বালকদের পুষে থাকে। এজন্য এরা ছোট ছেলে চুরি করে মানুষ ক'রে তাদের ঐ কাজ কাম শেখায়। ছোট বয়সে বিপথগামী বালকরা স্বেচ্ছাতে এদের দলে ভিড়েছে। কোনও কোনও বালকের সঙ্গে এদের অবৈধ যৌন [বিকৃত যৌন-বোধ] সম্বন্ধও থাকে। এই বালকদের কোকেনখোর করে দলে

ভর্তি করা হয়ে থাকে। গৃহহীন ও ভিখারী বালকদের এরা এজন্য সংগ্রহ করে।

বিঃ দ্রঃ—এক এক অপদল এক একটি প্রবেশ পথ ও নিক্রমণ পথ বেছে নেয়। এই প্রবেশ ও নিক্রমণ পথ [এন্ট্রি ও এক্সিট] অনুধাবন করে ওয়াকিবহাল রক্ষীকুল কোন দল ঐ চুরি করলো তা বলে দিতে পারে। এই অপদলগুলির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ ও শত্রুতা থাকে। এই সুযোগে [বিরোধীয়] অন্য দল হতে বহু সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। এই ভাবে চোরদের মধ্য হতে বেতনভূক গুপ্তচর সংগ্রহ করা হয়। প্রবেশ পথ এবং নিক্রমণের পথ এরা পূর্ব হতে ভেবে রাখে। তবে তাড়াহুড়াতে হেরফের হওয়া অসম্ভব নয়।

সিঁদেল চোরগণ প্রায়ই প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিপূর্ণ দেখা যায়। এরা বেশ্যাবাড়ি হতে বেরিয়ে বেশ্যাবাড়িতে ফিরে আসে। পরে দিবাতে তারা বস্তির ডেরাতে ফিরে যায়। নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা সম্ভোগের ও মহাহুল্লোড়ের ও নেশাভাঙের এরা ভক্ত। এদের মধ্যে কষ্টবোধ অতি কম এবং স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর। ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে এরা পা ভাঙলেও কষ্টবোধের অভাবে এরা হেঁটে চলে যেতে পারে। [প্রথম খণ্ড দেখুন]। কষ্টবোধ মানুষের প্রতি একটা ওআর্নিং। এ থেকে সে বুঝতে পারে যে তার রোগ হয়েছে। এজন্য সে বুঝে যে এবার তাকে সাবধান হতে হবে। কিন্তু কষ্টবোধের অভাবে ওদের রোগ-ভোগ ও দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে ওরা তখুনি অবহিত হতে পারে না। ঐ সময় উত্তেজনার মধ্যে উহা তারা জানতে ও বুঝতে পারে নি।

সিঁদেল চোরগণের দলগুলি ছয় বা সাত জনের বেশি হয় না। এদের দল ডাকাতদের মত বড় দল হলে প্রশাসনীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন

হয়। এ ব্যবস্থাতে কিছুটা আইন-কানুন ও [উহা মানার জন্য] সংপ্রেরণার দরকার হয়। এ অবস্থাতে এদের আদিম ভাব তিরোহিত হয় ও তার ফলে এরা এদের পূর্ব দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। এই জন্য এদের দলগুলি বড় হয় না।

[এদের দল দৈবাৎ বড় হলে উহা সর্দারদের অধীন হয়। এদের মধ্যে খাস মজলিস ও আম মজলিস বসে। বিশ্বস্ত সাকরেদদের শুধু খাস মজলিসে প্রবেশ অধিকার। সাধারণ সদস্যরা আম মজলিসে জড় হয়। এদের জমায়েতে সর্দার বহু উপদেশ ও সারমন দেয়। দল বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হানাহানি দেখা যায়। ফলে দল ভেঙে পড়ে পুনরায় ছোটদলের সৃষ্টি হয়। জাত-সেয়ানারা ঐ সব বড় দলে যোগ দেয় না।]

দ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ার্থে এরা অভ্যাস-অপরাধী ও প্রাথমিক অপরাধীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। এদের মাধ্যমে ওরা দ্রব্যাদি খাউ তথা বামাল গ্রাহকদের নিকট পৌঁছায়। এইজন্য এদের সর্দারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সদস্য অপরাধীরা প্রায়শঃ স্বভাব-অপরাধী হলেও সর্দার অভ্যাস অপরাধী হয়। দলীয় বারগ্লারদের মত আবার একক সিঁদেল চোরও আছে। এরা একাচারী বস্তিবাসী হয়ে থাকে। ক্ষুধার তাড়নাতে অস্থির হলে এরা চুরি করতে বেরোয়। অন্য সময় এরা অলস জীবন যাপন করে। এই অপরাধীরা প্রায়ই এদের একক শক্তির উপর নির্ভরশীল।

সাধারণ সবল বা সিঁদেল চুরিকে ইংরাজিতে বলা হয় বারগ্লারি [Burglary বা House Breaking]। কোনও চৌর-কার্যে বল প্রকাশ করা হলে সেইরূপ চৌর-কার্যকে বলা হয় সবল চৌর্য। এই বলপ্রকাশ মাত্র সম্পত্তির উপর করা হয়, ঐরূপ বল প্রকাশ কোনও

ব্যক্তির উপর করা হয় না। এমন কি বাধা পেলেও এরা আঘাত হানে না ; তবে কোনও স্থলে প্রত্যাগমনের পথে বাধা পেলে আত্ম-রক্ষার্থে এরা আঘাত হেনেছে। অপকর্মের পূর্বাহ্নে বাধা পেলে সাধারণতঃ এরা বিনা দ্বন্দ্বেই প্রত্যাগমন করে থাকে। দুয়ার বা তালা ভেঙে যারা চুরি করে বা যারা সিঁদ কাটে বা যারা দড়ির সাহায্যে বা পাঁচিল টপকে পরগৃহে প্রবেশ করে তাদেরকেই সাধারণভাবে বলা হয় সবল চোর, তালা তোড় বা সিঁদেল চোর।

কলিকাতা শহরে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর বাঙ্গালী, নেপালী এবং হিন্দুস্থানীদেরই দক্ষ তালা-তোড় রূপে দেখা গিয়েছে। স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির তালা-তোড়রা প্রায়ই প্রত্যাবর্তন কালে ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা ও পোড়া বিড়ি ফেলে রেখে গিয়েছে। [কিন্তু অতি দক্ষ প্রকৃত অপরাধীরা ঐ বিষ্ঠা গৃহপ্রবেশের পূর্বে স্নায়বিক কারণে ত্যাগ করে থাকে। এদেব কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল আলিন্দায, কোনও দল প্রবেশ বা নির্গমন পথে ঐ বিষ্ঠা ত্যাগ কবেছে। এই সকল দ্রব্য কোন স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে তা দেখে ঐ অপকর্মট এদেব কোন দল দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বলে দেওয়া গিয়েছে। বেদিয়া প্রভৃতি দুর্বৃত্তরা তুকরূপে ঘটনাস্থলে শিকড় প্রভৃতি ফেলে রেখে গেলেও এই বিষ্ঠা ও বিড়ি ত্যাগ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তুক-তাক নয। এদের যারা বিষ্ঠা ত্যাগ করার পর অপকর্মে প্রবৃত্ত হয় তারা উহা মনস্তাত্ত্বিক কারণে করে থাকে। এই অভ্যাসের প্রকৃত কারণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এই পুস্তকের বর্তমান খণ্ডেও উহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবৃত করা হবে।

এইবার এই সিঁদেল চোরদের অপকর্মের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই সিঁদেল চোরদের দলে সাধারণতঃ চার

হ'তে নয় বা দশজন পর্যন্ত যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পাহারায় কার্যে নিযুক্ত থাকে। এদের বাকি চোরেরা তখন সিঁদ দিতে শুরু করে। একক সিঁদেল চোরও দেখা যায়। তবে অধিক ক্ষেত্রে এরা দল বেঁধেই অপকর্মে বার হয়।

পল্লীগ্রামের সিঁদেল চোরেরা রাত্রিকালে সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করে কাল লেঙট্ পরে অপকর্মে বার হয়। সর্বাঙ্গ তৈলসিক্ত থাকায় কেহ এদের সহজে ধরতে পারে না। এ অবস্থাতে এদের গায়ে হাত দিলে হাত পিছলে যায়। এই অবসরে চোর মশাই সহজে সরে পড়তে পারে। দেহে বস্ত্রাদি থাকলে অসুবিধা অনেক, কাপড়টা ধরে ফেললেও ঐ অবস্থায় চোব আটকা পড়তে পারে। এই জন্যে চোরেরা অধিক কাপড়-চোপড় দেহে রাখে না। শহুরে চোরেরা লেঙটের বদলে কাল হাফ্ প্যাণ্ট ব্যবহার করে। রাত্রিকালে শ্বেত বস্ত্রাদি এরা একেবারেই নিরাপদ মনে করে না। লৌহ নির্মিত সিঁদকাঠিই সিঁদেল চোরদের আদিম যন্ত্র। এদেশের চাষীরা যেমন আজও পর্যন্ত ঋগ্বেদীয় যুগের লাঙল নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, ভারতীয় স্বভাব-চোরেরাও অনুরূপভাবে তাদের পুরানো সিঁদকাঠি নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু এদেশের অভ্যাস-চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এরা বহু প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ভারতীয় সিঁদেল বা সবল বা তালা তোড় চোরেরা অতি সাধারণ [simple] হাল্কা যন্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষপাতী; বিশেষ ক'রে ভারতীয় স্বভাব ও পুরানো চোরদের সম্পর্কে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। ইউরোপীয় সবল চোরদের ন্যায় এরা উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার পছন্দ করে না তুলনামূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে, ইউরোপীয় অপরাধীরা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় অপরাধীরা

উহার ব্যবহারচাতুর্যের * উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত নিরপরাধী ভারতীয়দের ন্যায় এই দেশের অপরাধীরাও বহু বিষয়ে পরিবর্তন-বিরোধী বা রক্ষণশীল। এইজন্য অপকার্যে ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রপাতির মধ্যে সর্ব-প্রাচীন সিঁদকাঠিই এদের পছন্দ।

[স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে যারা আদিমকাল হতেই অপরাধে অভ্যস্ত তারা এই সিঁদকাঠিকে পূজা করে এবং উহাকে এক পবিত্র দ্রব্য মনে করে। কিন্তু ইহাদের যে সকল জাতি আমাদের মতই সভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর তারা ইহাকে অনুরূপ সন্মান দেয় না। এমন কি সেই সকল অপদলের মেযেরা উহা স্পর্শ করে নি। এদের মেয়েদের ধারণা ঐ দ্রব্য স্পর্শ করলে তাদের অমঙ্গলই হবে। জাতি মাত্রের মেয়েরাই যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক তা এদের এইরূপ আচার-ব্যবহার প্রমাণিত করে ।]

এখানে বিভিন্ন সিঁদকাঠি যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল। দৈর্ঘে অর্ধ হস্ত পরিমিত এই লৌহ সিঁদকাঠির সাহায্যে এরা সিঁদ কেটে থাকে। হাতে ধরার সুবিধার জন্য এই যন্ত্রের পশ্চাৎভাগে গোলাকার খাঁজ কাটা থাকে। কখনও কখনও ন্যাকড়া দ্বারা উহার পশ্চাদভাগ আবৃত রাখা হয়, যাতে ধরবার সময় হাত হতে উহা পিছলে না যায়। দুয়ারের পার্শ্বের কয়েকটি ইষ্টক কিংবা [মেটে ঘর হলে] কিছুটা মাটি এরা সিঁদকাঠির সূচলা মুখ দ্বারা বার করে দেয়। এর পর তারা এই সিঁদের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দুয়ারের খিল, হুড়কা বা ছিটকিনি খুলে

* সামান্য ও সাধারণ যন্ত্র তাদের হাতের কায়দা বা ব্যবহার-চাতুর্যের জন্য শক্তিশালী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিকেও হার মানিয়ে দেয়।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে। দেওয়াল মৃত্তিকা-নির্মিত হলে এরা আরও সহজে কার্য সমাধা করতে পারে। তবে দেওয়ালের মৃত্তিকার অভ্যন্তরে [মধ্যদেশে] করগেটেড্ টিন থাকলে উহা সম্ভব

হয় না। এই ধরনের সিঁদেল কার্যকে এ দেশে "বগলী সিঁদ" বলা হয়। এদের কেহ কেহ গৃহস্বামী জেগে আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রথমে একটি পা ঢুকায়। গৃহস্বামী খুট-খাট্ শব্দ শুনে জেগে উঠে দা হস্তে দুয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং চোরের পা'টা কেটে উড়িয়েদিয়েছেন—এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে দলের লোকেরা অমনি সঙ্গীটিকে ফেলে না পালিয়ে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে পালিয়েছে—এইরূপ বহু নজিরেরও অভাব নেই। এইরূপ অবস্থায় মৃত সঙ্গীটিকে কেহ সনাক্ত করতেও পারে না। মৃত ব্যক্তির দ্বারা দোষ কবুল করানোও সম্ভব হয় না। আত্মরক্ষার

কারণে পূর্ব হতেই এরা পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ শর্তে আবদ্ধ করে নেয়। এই জন্তে এদের কাছে এতে দোষেরও কিছু থাকে না। এ ক্ষেত্রে যে যায় সেই যায় এবং যে বাঁচে সেই বাঁচে।

[বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা মধ্যে মধ্যে বাড়িতে ফিরিওয়ালা রূপে এসে খাদ্য দ্বারা ওদের বশ করে। কিন্তু ভালো জাতের কুকুরের সাথে এইভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। উহাদের মাদী কুকুর দ্বারাও বশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কুকুর অত্যুগ্র গন্ধবোধ দ্বারা প্রভু, ভৃত্য ও প্রভুর আত্মীয়দের মধ্যে প্রভেদ বুঝে। বলা বাহুল্য, কুকুরের মেমরির কার্ড ইনডেক্স তাদের সূক্ষ্ম গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল। দশ বা বিশ ফুট দূরে মানুষ না নড়লে উহারা তাদেরকে চক্ষুব দ্বারা মানুষ রূপে বুঝে না, কিন্তু গন্ধ বোধ দ্বারা উহারা তাদেরকে মানুষ রূপে চিনে নেয়। এই জন্য অপরাধীরা গাত্রে 'ক্যান্থারাইডিন' আদি অত্যুগ্র গন্ধ মেখে অগ্রসর হয়। মানুষের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম গন্ধ ঐ সকল উগ্র গন্ধের আওতাতে তাদের অনুভূত হয় না। তারা একটু নড়লেই কুকুর স্বল্প ক্ষণ ডেকে উঠে বটে, কিন্তু তখুনি অপরাধীরা থেমে নিশ্চল দ্রব্যে প্রতীত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা কুকুরকে 'বাই পাশ' করে এড়িয়ে যায়। পুরানো চোরদের গৃহ তল্লাসী করে ঐ রূপ বহু উগ্র গন্ধের শিশি আমরা পেয়েছি। প্রথমে আমরা মনে করতাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ এড়াতে উহা তারা ব্যবহার করে। কিন্তু পরে উহার প্রকৃত কারণ আমরা জানতে পারি।]

বিঃ দ্রঃ—প্রতিষেধকের অভাব, সাবধানতায় অভাব এবং নির্বুদ্ধিতার জন্য গৃহস্থরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে স্থূল লৌহ দণ্ডের বদলে জানালাতে ক্ষণভঙ্গুর গ্রিল লাগানো হয়েছে। এঁরা শক্ত গডরেজের আলমারি বন্ধ করে উহার চাবি ঐ আলমারির

মাথাতে কিংবা বালিশের তলাতে রাখেন,সর্ব সমক্ষে [ঝি-চাকরের সম্মুখে] উহা তাঁরা বারে বারে বার করে আলমারি খুলেন এবং পূর্ব স্থানে রাখেন। যদি চাবি তাঁরা আঁচলে বা গোপন স্থানে না রাখবেন তো ঐ মূল্যবান স্টিল আলমারির প্রয়োজন কি ? বহু ক্ষেত্রে আলমারির ঠিক কোন স্থানে গহনার বাক্সো রাখা আছে তা বাহিরের লোকের পক্ষে অজানা থাকে নি। আমার মতে এই একটি ঘরে ভৃত্যদের ঢুকতে না দিয়ে গৃহিণীদের উহা স্বহস্তে ঝাড়-পোঁছ করা ভালো। অন্যথায় মূল্যবান দ্রব্য ব্যাঙ্কের লকারে রাখা উচিত। অধুনা ব্যাঙ্কে অর্থ ও দ্রব্য থাকাতে বড়ো চুরির সংখ্যা কম। এইজন্য চুরির বদলে প্রবঞ্চনা অপরাধ বাড়ছে। প্রবঞ্চকরা ঐ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলিয়ে আত্মসাৎ করে।

আলমারিগুলির মধ্যে গোপন প্রকোষ্ঠ রাখা যেতে পারে। কতকগুলি স্বর্ণ ও রত্নময় ঝুটা চকচকে গহনা আলমারিতে সম্মুখে রাখা ভালো। এই পন্থাকে ক্যামোফ্লেজ বলা হয়। পুরানো চোরেরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারে। বেশিক্ষণ তারা ঘটনাস্থলে অপেক্ষা করে না। ডাকাতদের মত তারা একাধিক ঘরে সাধারণত ঢুকে না। অবশ্য ঘরগুলি খালি থাকলে উহা স্বতন্ত্র কথা। উত্তেজনার মুখে অতোগুলি গহনা [ঝুটা] পাওয়া মাত্র তারা ঐগুলি নিয়েই সরে পড়ে। আরও ভিতরের সাচ্চা গহনার বাক্সোটি তারা আর খুঁজে না। ডবল লকের এক আলমারির চাবি অন্য এক আলমারিতে রেখে ঐ দ্বিতীয় আলমারির চাবি অপর এক আলমারিতে রেখে ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমারির চাবি আঁচলে বা কাঁকালে রাখা ভালো।

চুরি না করে চাকর হঠাৎ পালালে গৃহস্থের সাবধান হওয়া উচিত। বহু অজুহাতে এরা ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। কয়েক ক্ষেত্রে ওরা

বাহিরের চোরের প্রবেশের স্থবিধা করে দিতে বাড়িতে থাকে। প্রথমে চাকরের কাছ হতে অপরাধীরা স্থড়ুক সন্ধান পায়। এর পর ওরা নিজেরা কেউ কল মিস্ত্রি বা অন্য মিস্ত্রি সেজে বাড়ি ঢুকে। এরা ঐ বাড়িতে এসে বলে—'কল সারাবেন, বাসন কিনবেন, কাগজ বিক্রি হবে, সিল কাটাবেন ?' এইরূপ লোকের গৃহস্থদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। বাড়িতে মিস্ত্রি খাটলে গৃহস্থদের সাবধান হওয়া উচিত। এরা 'জল খাবো' বলে বা 'একটু ন্যাকড়া দিন' বা অন্য অজুহাতে ভিতরটা দেখে যায়। চুরির আগে বাড়িতে বাসনউলীর আনাগোনা হয়ে থাকে।

সিঁদেল চুরির পর প্রায় •ঘটনাস্থলে বা উহার নিকটে বিষ্ঠা, পোড়া বিড়ি দেখা যায়। [উহার কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে।] এরূপ ঘটলে বুঝতে হবে উহা দক্ষ পুরানো চোরের কাজ। এক এক দল এক এক স্থানে বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। কেহ প্রাঙ্গণে, কেহ আলিন্দাতে, কেহ পথ বা গলিতে, কেহ কক্ষে বা চৌকাঠে, কেহ বা নিকটস্থ মাঠে উহা ত্যাগ করে। এই বিষ্ঠা-তত্ত্ব হতে কোন্ দল ঐ কাজ করলো—তা রক্ষীকুল ওদের অন্য দলের নিকট খোঁজ-খবর করলেই জানতে পারবেন। ঐ সব বিষ্ঠাতে বিশেষ বিশেষ বীজাণু ও জীবাণু থাকে। ঐগুলি ফোরেন্সিক লেবোরেটারিতে পরীক্ষার্থে পাঠানো উচিত। পরে সন্দেহমান ব্যক্তি ধরা পড়লে উহাদের ত্যক্ত বিষ্ঠা ঐভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই উভয় বিষ্ঠার মধ্যে প্রাপ্ত বীজাণু ও জীবাণু হতে ঐ ব্যক্তি যে ঐ চুরির জন্য দায়ী তা বলা যায়। এই বিষ্ঠাত্যাগী সিঁদেল চোর দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা (১) তুক্-তাকে বিশ্বাসী এক দল অপকর্মের পর তুক্ রূপে প্রত্যাগমনের কালে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এরা সাধারণতঃ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় মধ্যম

অপরাধী, (১) অন্য দল অপকর্মের পূর্বে বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। এই বিষ্ঠা নির্গত না হলে ঐ দিন তারা গৃহে প্রবেশ না করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা প্রকৃত ও উৎকট ও অতি দক্ষ সিঁদেল চোর হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাব-অপরাধী দেখা যায়। এই শেষোক্ত দলের বিষ্ঠা ত্যাগের গুহ্য কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করেছি।

[সিঁদেল চোরগণ দিবা চোর ও রাত্র চোরে বিভক্ত। এতদ্‌-ব্যতিরেকে ইউরোপীয় বাটীর এবং দেশীয় ব্যক্তিদের বাটীর ঐ চোরও বিভিন্ন হয়ে থাকে। জাতি বিশেষের চাল-চলন, কর্ম, জীবন-প্রণালী ও উহাদের [পছন্দমত] বাটীর গঠন বিভিন্ন হয়। এই কারণে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাটীর চোর আলাদা হয়ে থাকে। এই পুরানো চোরেরা চুরির আগে বা পরে য়ুরোপীয়দের প্যান্ট্রি হতে ব্রাণ্ডি ও ভারতীয় গৃহস্থদের রান্নাঘর হতে পান্তা ভাত খেতে অভ্যস্ত। কেউ কেউ শিকড়, সিঁদুর মাখানো পাতা, মাটি প্রভৃতি ঘটনাস্থলে রেখে যায়।

অধুনা কালে সিঁদেল চোরদের মধ্যে যারা অভ্যাস-অপরাধী তারা নানা প্রকার উন্নত যন্ত্রপাতি এবং অ্যাসিড, এসিটিলিন গ্যাস প্রভৃতি বস্তুরও সাহায্য নিয়ে থাকে। অ্যাসিড এবং গ্যাসের সাহায্যে এরা লোহার সিন্দুক ভাঙে। কেহ কেহ এজন্য প্যাঁচকাটা বোরিঙ ইন্‌স্ট্রুমেণ্টেরও [ইস্পাত নির্মিত তুরপুন] সাহায্য নেয়। এরা সিঁদ না কেটে বোরিঙ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে দুয়ারের স্থানে স্থানে ফুটা করে এবং তার পর এই ফুটার মুখে 'তার' বা সিক ঢুকিয়ে খিল বা ছিটকিনি খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে। চিত্রে কয়েক প্রকারের ড্রিল বা বোরিঙ ইন্‌স্ট্রুমেণ্টের প্রতিকৃতি দেওয়া হল।

ক—একটি কাষ্ঠখণ্ড। ইহাতে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি চৌকা

ফুটা আছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে ঐ সব ছিদ্রের মাপে তৈরি কয়েকটি বিভিন্ন মাপের ড্রিল দেখানো হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ সকল ড্রিল ঐ ছিদ্রগুলিতে প্রবেশ করিয়ে উক্ত কাষ্ঠখণ্ডকে হ্যাণ্ডেলে পরিণত

ক

করা হয়। বিভিন্ন পরিধির লৌহ সিন্দুক এবং পেটিকাদি ছিদ্র করবার কারণে ইহা ব্যবহৃত হয়। সাধারণত গা-চাবির উপর দিয়েই এইরূপে ছিদ্র করা হয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ইহা বিভিন্ন সাইজের সরল তুরপুন যন্ত্র। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের প্যাঁচ কাটা [ইলেকট্রিক] বোরিঙ যন্ত্র ব্যবহার করে।

খ—ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি সাধারণ লৌহ শিক। ,উহার প্যাঁচকাটা অংশ দ্বারা তালা খোলা যায়। তালার মুখের

খ

মাপ অনুযায়ী প্যাঁচের ছোট বা বড় অংশটি উহার মুখে ঢুকিয়ে

দিয়ে তালা খোলা হয়। এই যন্ত্রের বক্র অংশটি উভয় দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিয়ে ভিতরের কাঠের খিলটি টেনে খুলে ফেলা যায়।

কোনও কোনও অপরাধী দরজার একটি পাল্লা হাত দিয়ে সম্মুখের দিকে এবং উহার অপর পাল্লাটি হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে পাল্লার কাঠ বাঁকিয়ে দিয়ে উভয় পাল্লার মধ্যে একটা ফাঁকের সৃষ্টি করে উহার মধ্যে শিক ঢুকিয়ে খিল খুলেছে। অপপদ্ধতির এই
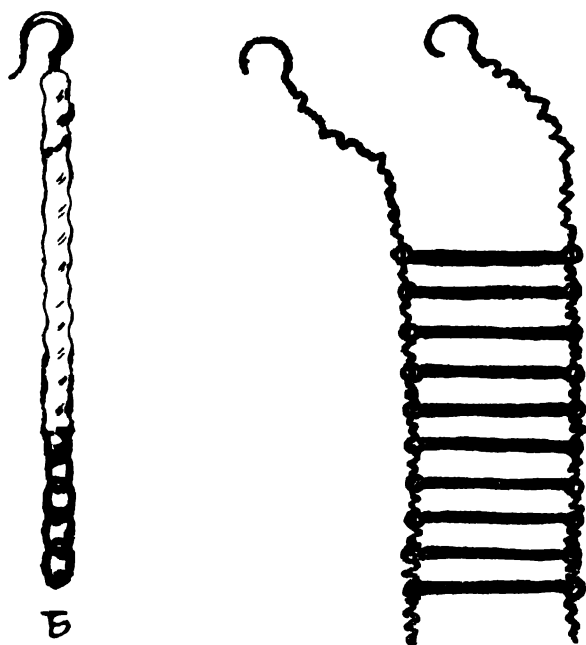
কায়দাকে এরা চাড়বাজি বলে। এখানে দরজাতে এই খিল সমেত উহার উভয় পাল্লাতে ছিটকানি থাকলে কিংবা ঐ খিলের মুখে

ক্লিপ, আঁটা থাকলে উহা সম্ভব হয় না। এদের অনেকে দিবালের খড়া বেয়ে বা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠেছে। এই পাইপে বা পাঁচিলে কাঁটা তার থাকলে এরা পায়ে থলে জড়িয়ে নেয়। এজন্য জলের পাইপ ঘরের ভিতরে থাকা ভালো।

চ=ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি লৌহ শিকল। উহা চামড়া বা রবার দিয়ে আবৃত থাকায় উহা ধরে সহজেই উপরে উঠা যায়। হুকসহ শিকলটি প্রথমে উপরেব দিকে ছাদেব আলিসায

ছুড়ে দেওয়া হয়। পাঁচিল বা আলিসায় হুকটি আটকে গেলে

চোরেরা এই শিকল ধরে উপরে উঠে। শিকলটি চামড়ার দ্বারা আবৃত থাকায় এদের হাতে আঘাতও লাগে না এবং তাদের হাতটিও পিছলে যায় না। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে জটিলতর দড়ির মই বা রোপ ল্যাডার ব্যবহার করে। চৌর্য কার্যে ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ঐরূপ শিকলের পার্শ্বের চিত্রটি দেখুন।

ঙ=একটি ড্রিল। দেশীয় ভাষায় ইহাকে তুরপুন বলা হয়। ইহা দ্বারা দুয়ারের এক পাশে ভিতরের খিলের উপর প্রথমে ছিদ্র করা হয়। [ঞ চিত্র দেখুন]। এর পর ইহার ছিদ্রের মুখে লৌহ শিকের [খ চিত্র দেখুন] বক্র অংশ ঢুকিয়ে খিলটি টেনে খুলে ফেলা হয়। কিন্তু, ঞ চিত্র অনুযায়ী খিলের মুখের উর্ধ্বে কাষ্ঠের বা লোহার ক্লিপ

দেওয়া থাকলে ইহা সম্ভব হয় না। ঐ দুয়ারের দুইটি কপাটে ভিতর হতে দুইটি ছিট্‌কানি লাগালেও উহা সুরক্ষিত থাকে।

ঘ=একটি আধুনিক ড্রিল। ইহার শক্তি সাধারণ ড্রিল অপেক্ষা

অধিক। অনেক সময় ইহা দ্বারা লৌহ বা ইস্পাতও ছিদ্র করা যায়। এদের কেহ কেহ ইলেক্ট্রিক ড্রিলও সঙ্গে রাখে। ঘরের ইলেক্ট্রিক প্লাগে তার সংলগ্ন করে ইহাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে থাকে।

গ=একটি চামড়ার থলি। ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করে কোমরে আটকে রাখা হয়। লৌহ পেটিকাদি ড্রিল দ্বারা ছিদ্র করার সময় মাঝে মাঝে ছিদ্র স্থানে বারি নিক্ষেপ করতে হয়। ঐ স্থানে জল না দিলে সহজে ছিদ্র করা যায় না। ইস্পাত কাটা করাত বা উকা দ্বারা গরাদ কাটবার সময়ও ঐ ভাবে জল নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ ছাড়া লোহা কাটা ছোট করাত বা উকাও ব্যবহৃত হয়। সিঁদকাঠির স্থুল অংশের সাহায্যে তালা বা কড়া ভাঙার কাজ এবং সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে দেওয়াল হতে ইষ্টক সরানোর কাজ সমাধিত হয়।

ইহা ছাড়া একটি পাতলা ও লম্বা লৌহ শলকা বা শিকও ব্যবহার করা হয়। এই শিকের মুখটা কিছু বক্র থাকে। এই শিক উভয় দুয়ারের মধ্যকার ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে খিল বা ছিট্‌কিনি খোলা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে রুটিকাটা ছুরির মত [করাতাকার] স্বল্প খাঁজ কাটা ছুরিও ব্যবহৃত হয়। এই ছুরি উভয় দরজার ফাঁকে ঢুকলে ঐ কাঠের খিল ঐ ছুরির খাঁজে আটকে থাকে। এতে উহার সাহায্যে পতনের শব্দ ব্যতিরেকে ঐ খিলকে ধীরে ধীরে নীচে নামানো সম্ভব হয়। কিন্তু কেহ কেহ খিলের উপরে লোহার ক্লিপ এঁটে রাখেন। এই অবস্থায় এই যন্ত্রের দ্বারা খিল খোলা যায় না। [ঞ চিত্র দেখুন।] এ ছাড়া এদের সঙ্গে অনেক ঝুটা চাবি এবং উকাও থাকে। এরা চাবিতালার কাজে এক রকম পাকা-পোক্ত। এদের কেহ কেহ দিনের বেলায় চাবিতালার কাজ করে এবং রাত্রে

সিঁদ কাটে।* এ ছাড়া এদের কাছে ছোট ছোট ইলেকট্রিক টর্চও এরা রেখে থাকে। পূর্বে এস্থলে এরা চোরালণ্ঠন ব্যবহার করত।

কোনও কোনও সবল চোর লোহার গরাদ বাঁকাবার বা সরাবার জন্যে ছোট জ্যাক্ যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। কেহ কেহ জ্যাকের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও তৈরি করে নেয়। এই যন্ত্রের স্ক্রুগুলি এঁটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরাদগুলাও যায় বেঁকে। এরা তখন সহজেই বেঁকে যাওয়া গরাদের ফাঁকে ঘরে প্রবেশ করে। 'জ' চিত্রে এবং পর পৃষ্ঠার 'ছ' চিত্রে, দুইটি বিশেষ বাঁকন যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে 'জ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রটি চিত্রে প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী জানালার গরাদে সংলগ্ন করে যন্ত্রের ডাঁটি দুইটির মুখের বল্টু [bolt] দুইটি প্লাস বা রেঞ্জের সাহায্যে এঁটে দিতে থাকলে উহার চাপে একটি লৌহ গরাদ ধীরে ধীরে বেঁকে —উভয় [১ম এবং ২য়] গরাদের মধ্যে একটি বড় রকমের ফাঁক সৃষ্টি করে। এই ফাঁকের মুখে তখন চোরেরা সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এইবার 'ছ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রের দুই দিককার ডাঁটি দুইটি দুই পার্শ্বের দুইটি লৌহ গরাদে ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই যন্ত্রের মধ্যকার ডাঁটিটির উপর আগাগোড়া প্যাঁচ কাটা [screwed] থাকে। এই মধ্য ডাঁটিটি মধ্যকার গরাদের উপর ন্যস্ত করে উহার হ্যাণ্ডেলটি ঘুরালে মধ্য ডাঁটিটির চাপে উক্ত লৌহ গরাদটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেঁকে যাবে এবং আরও অধিক চাপ পড়লে উহার উভয় মুখ কাঠের ফ্রেম দুইটি হতে খুলেও এসে

---

* কারুর নূতন চাবি তৈরি করবার সময় এরা গৃহস্থদের দ্রব্যাদির অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকে।

থাকে। এই সব জ্যাক্ যন্ত্রের চাপে লোহার ইঞ্জিন, মোটরকার প্রভৃতিও উঠান সম্ভব; সামান্য গরাদ বাঁকানো তো কিছুই নয়। কিন্তু 'ঋ' চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী এই গবাদগুলিব মুখ

ঙ

সকল বল্টু দিয়ে আঁটা থাকলে কাষ্ঠ ফ্রেমগুলি হতে গবাদগুলিকে এত সহজে এবং নিঃশব্দে উঠিযে আনা সম্ভব হয় না। আমার মতে ঋ চিত্র এবং এ চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযাযী জানালা এবং দুয়ার নির্মিত হওয়া উচিত। এতে এই সব চুরির সম্ভাবনা কম থাকে। গৃহস্থদের ঘরের জানালার লৌহ গরাদগুলিও খুব মোটা হলে ভালো হয়।

ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা আবিষ্কৃত অপর এক সাধারণ ভাঙন যন্ত্রের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ইহা মধ্যম ধরনের স্থূল তিন

টুকরা ফাঁপা লৌহ পাইপ। ভিতর ফাঁপা হওয়ার কারণে ইহা হাল্কা অথচ নীরেট দণ্ডের ন্যায়ই শক্ত। এই নাতিদীর্ঘ পাইপগুলির দুই

মুখে প্যাঁচকাটা থাকে। উহাদের দুইটি পাইপ সরল থাকে। কিন্তু উহাদের একটি পাইপের মুখ বেঁকে উর্ধ্বে উঠে পুনরায় সরলাকার

ধারণ করেছে। প্রয়োজন মত এই সবকয়টিকে উহাদের প্যাঁচকাটা মুখে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডে পরিণত করা হয়। তার পর উহার পূর্বোক্ত বক্রাংশ জানালার লৌহ গরাদে প্রবেশ করিয়ে চাড় দিয়ে গরাদসমূহ বেঁকিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। [ঝ চিত্র দেখুন]। এই সকল যন্ত্র এরা প্রায়ই সন্দেহ এড়াবার জন্যে তরকারির ঝুড়িতে করে বহন করেছে।

জানালাসমুহের শারসির কাঁচসমূহ এদেশের অপরাধীরা বিশেষ চালাকির সহিত ভেঙে থাকে। এরা প্রথমে এক টুকরা কাপড আটা

ঝ

বা লেইয়ের সাহায্যে ঐ সকল কাঁচের উপর সেঁটে দেয়। তার পর একটা কাপড়ের ছোট ডাণ্ডি যুক্ত বল [কটন হ্যামার] উহার উপর রেখে ঠুকে ঠুকে বা চাপ দিয়ে ঐ কাঁচ ভেঙে ফেলে। এই অবস্থায় কাঁচের টুকরা সকল ঐ আটা মাখানো ন্যাকড়ার সহিত সেঁটে থাকায় ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে কোনও প্রকার শব্দের সৃষ্টি করে নি।

এদের কেউ টর্চ বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়ে মাত্র একমুঠা চাউল সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। অন্ধকার ঘরে এই চাউল কণা ছড়িয়ে উহার পতনের শব্দ হতে এই শব্দবিশারদ চোররা বুঝে নেয় কোথায় কোন দ্রব্য ন্যস্ত আছে। ইহাতে শব্দ এতো সামান্য হয় যে উহা কোনও গৃহস্থের গোচরীভূত হয় না। কোনও ক্ষেত্রে ইহা দৈবাৎ শ্রুতিগোচর হলেও গৃহস্থ উহাকে ইঁদুর কৃত শব্দ বলে মনে করে।

এদের কেহ কেহ একজন অপরজনের কাঁধে উঠে স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙেও ঘরে ঢুকেছে। এদের মধ্যে যারা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠতে সক্ষম, তাদের ইংরাজিতে বলা হয় "বিড়াল চোর বা ক্যাট বারগ্লার"।* কোনও কোনও সবল চোরের দল এজন্য ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। এই সব ছোকরারা নর্দমার মুখ দিয়ে বা জানালার কিংবা স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকে বড়দের প্রবেশের জন্যে দরজা খুলে দিয়ে থাকে। এই সবল বা সিঁদেল চোরদের বর্তমান কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বিবৃতি দেওয়া গেল। এই বিবৃতিগুলি পাঠ করলে এদের কার্যকলাপ সকল সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও গৃহে সিঁদ দিতে হলে আমরা একটি বিশেষ উপায়ের সাহায্য নিই। প্রথমে আমরা একটা পুরানো মোটরকার বা মোটর সাইকেল সংগ্রহ করি। এর পর উক্ত যন্ত্র-শকটটি মনোনীত গৃহের সম্মুখে রাস্তার উপর রেখে এইরূপ ভাণ করি, যেন হঠাৎ উহা বিকল হয়ে গেছে। আমাদের কয়েকজন এই মটোর সারাতে ব্যস্ত থাকে। অনবরত গ্যাসের ভট্ ভট্ শব্দ বার হতে থাকে। এই মোটর মেরামতের সেখানে খুট্‌খাট্ শব্দও হয়। দলের অপর ব্যক্তিগণ এই অবসরে গৃহে ঢুকে সিঁদ দিতে শুরু করে। মোটরের ঘট্ ঘট্

---

* বহু প্রাচীনকালে এরা গোহাড়গিল জীবের গলার শিকল ধরে পর্বতস্থ দুর্গ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতেও পেরেছে। মধ্যযুগে ধনিগণ পাহাড়ের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। ঐ সময় তাঁদের গৃহে সিঁদ দেবার জন্যে ঐ ভাবে তারা পাহাড়ে উঠতো।

আওয়াজে সিঁদ কাটার আওয়াজ আর শ্রুত হয় না। উহা শ্রুত হলেও গৃহস্বামী মনে করে উহা ঐ গাড়িরই আওয়াজ। এই কারণে তাঁরা এ বিষয়ে কোনও রূপ সাবধানতাও অবলম্বন করেন না। আমরা অকুস্থলেই বাক্স ভাঙার কাজও সমাধা করতে সমর্থ হই। আমরা সেখানে নির্বিবাদে চুরি করে ঐ মোটরেই বামালসহ সরে পড়ি। এমন কি পুলিশ ঐ রাস্তায় টহল দিয়ে গেলেও মনে করে আমরা মোটরটা মেরামত করছি। তদুপরি এই মোটর ঐ সকল সিপাইদের আড়াল করেও রাখে। দৈবাৎ গৃহের কেহ চেঁচাতে শুরু করলে ঐ শব্দের মাত্রা আমরা আরও বাড়িয়ে দিই। ওতে ক'রে মোটরের উৎকট শব্দে চিৎকারের শব্দ একেবারে চাপা পড়ে যায়।

"কি করে, এত সব শিখলাম? শুনুন তবে আমি তা বলছি। ছেলেবেলায় আমি পিতার সঙ্গে কোলকাতায় থাকতাম। আমাদের বাড়ির পার্শ্বেই ছিল একটা টিন মিস্ত্রির দোকান। ঐ দোকানে সশব্দে কাজ হত। ঠিক সেই সময়ই আমি আমার বাবার হুঁকায় টান দিতাম। পাশের ঘর থেকে বাবা টিন মিস্ত্রির হাতুড়ির আওয়াজ শুনতেন এবং ঐ শব্দের আওতায় হুঁকার গুড় গুড় আওয়াজ তাঁর আর কানে যেত না। ওখানে হাতুড়ির শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমি হুঁকার নলটিও নামিয়ে রাখতাম। পরে প্রাপ্ত বয়সে আমি চোর হয়ে পড়ি। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাল্য-কালের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়—তখন আমিই আমার সর্দারকে বিদ্যেটা শিখিয়ে দিই।

"কখনও কখনও এই মোটরের সাহায্যে আমরা দুয়ারও ভেঙে বা খুলে ফেলেছি। রাস্তার ধারের দোকানগুলিই এই ভাবে ভাঙা হয়। রাস্তা হ'তে একটা কাঠের বেঞ্চি বা বাঁশ বা লোহার কড়ি

উঠিয়ে নিয়ে উহার একটি মুখ মোটরের পিছনে এবং অপর মুখটি দুয়ারের উপর ন্যস্ত ক'রে—ঐ লৌহ বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর মোটরটি সজোরে ব্যাক্ করে দিই। ফলে মোটরের চাপে দরজাটা এমনই ভেঙে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরজার গরাদের এবং মোটরের পিছনের সঙ্গে শিকল বেঁধে মোটরটি সামনে চালিয়েও দরজা খুলেছি—তবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাচিৎ করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও সিড্‌ন্ বডিড্ মোটরের ছাদে উঠে আমরা পথের গ্যাস লাইটসমূহ চুরির পূর্বে নিবিয়েও দিয়েছি।"

"—হাঁ হুজুর, ঐ বাড়ির ঝিটি আমারই উপপত্নী। তাকে তালিম দিয়ে সুড়ুক সন্ধান পূর্ব হ'তে জেনে নেওয়ার জন্যে আমিই ঐ বাড়িতে পাঠিয়েছি। পূর্ব হ'তে চাকর-বাকরদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ না করে আমরা কখনও কারুর বাড়ি ঢুকতে সাহসী হই না। এজন্য বাড়ির চাকরদের আমরা প্রচুর খাওয়াই ও নিজ খরচে তাদের সিনেমাও দেখিয়ে থাকি। এমন কি তাদের আমরা বেশ্যালয়েও নিয়ে যাই। কখনও কখনও চুরির সুবিধের জন্যে বাটীর বিপথগামী সন্তানদের সঙ্গে ভাব ক'রেও আমরা খবর সংগ্রহ করেছি। শহরের বেশ্যালয়গুলি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যে আসে। ওদের বাটীতে এদের সাথে আমাদের আলাপ হয়।"

এই সকল সিঁদেল চোরেরা বাড়ি ঢুকে প্রথমেই যে ঘরে চাকর, দরোয়ান বা বাড়ির পুরুষরা শুয়ে থাকে, সেই সকল ঘরের দরজার কড়াগুলা বাইরে থেকে বেঁধে দেয়, যাতে করে চিৎকার শুনলে সহজে তারা বার হয়ে না আসতে পারে—অবশ্য যদি এইসব চাকর-দরোয়ান-দের সহিত বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হয় তবেই তারা এই পন্থা গ্রহণ করে। এদের কেহ কেহ চুরির পূর্ব রাত্রে ছোট ছোট ইট বা ঢেলা

বাড়িতে ফেলে বুঝে নেয় বাড়ির লোকেদের ঘুম সজাগ কিনা। অনেক সময় এরা দিনের বেলাতেও এইভাবে ঢেলা ছুড়ে, বাড়ির লোকেদের মেজাজ ও প্রকৃতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে।

এদেশের শহরের ও পল্লীগ্রামের সিঁদেল চোরেদের বুদ্ধিমত্তা এবং অপপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"আমি হুজুর একজন বাড়ির চোর। ঐ দিন ঐ বাড়িটায় আমিই চুরি করি। চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বড়িটার নীচেব একটা খোলা মাঠে আমি সিঁদকাঠিটা পুতে রাখি। অধিক রাত্রে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পডার সম্ভাবনা থাকে। এই ভয়ে আমরা পূর্ব হতে সুবিধামত অকুস্থলের নিকট যন্ত্রগুলি পুতে রাখি। এর পর সন্নিকটস্থ একটা বস্তি বাড়িতে আমি আশ্রয় নিই এবং মনোনীত বাটীর ঝি-এব সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিযে সিঁদকাঠিটা উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিযে ভিতরের দিকে একটা দড়ি ফেলে দিই। ব্যবস্থা মত বাড়ির ঝি উঠানে সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলেব পাইপটার সঙ্গে দড়ির একটা মুখ বেঁধে দেয়, আর আমি সেই সুযোগে দ্রুতগতিতে সেই দড়ি ধরে ভিতরে নামি। এর পর পাইপ বেয়ে আমি আরও উপরে উঠি এবং উপরের ঘরের দরজার খিলটা খুলে দিই। ঘরের মধ্যে মশারিব ভিতর ফরিয়াদি ও তাঁর স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডিঙি দিয়ে তাদের শিয়রে এসে বসি। এর পর আমি নিঃশব্দে একটা বিড়ি ধরাই। এই বিড়ি হতে ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু আগুন বেরোয় না। এই বিড়ির মধ্যে কোকেন, চরস, ক্যাম্ফর ইত্যাদি ও একরকম দেশীয় পাতার গুঁড়া থাকে। এই মিশ্র দ্রব্যের ধোঁয়ার মধ্যে একটা ঘুম-পাড়ানী মাদকতা আছে। কখনও কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অগ্নিদগ্ধ

ছোট পুটলি বাহির হতে জানালার মধ্য দিয়ে আমরা ঘরের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। আমরা দেখেছি যে এই ধোঁয়া নাকে গেলে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটির গায়ে হাত দিই। প্রথমেই গহনাতে হাত না দিয়ে ঐ সকল নারীদের মাথায় স্কন্ধে হাত দিয়ে কিছুটা সইয়ে নিয়ে পরে গহনার স্থানে আমরা হাত দিয়েছি। কুমারী মেয়েদের গা হতে গহনা খুলবার সময় আমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করি, কোনও বিবাহিতা মেয়েদের বেলায় আমরা অতটা সাবধানতার প্রয়োজন মনে করি না।* কারণ হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় গায় হাত লাগলে বিবাহিতারা মনে করে উহা তাদের স্বামীর হাত; এতে অনভ্যস্ত কুমারী মেয়েরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে। আমি মহিলাটির গা হতে সকল গহনাই নিঃশব্দে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে আলমারি খুলে অপরাপর দ্রব্য বাহির করি। কিরূপ ভাবে চাপ দিলে বা নাড়লে কোন কোন তালা কি ভাবে খোলা যায় তা আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে তালা খোলা আমরা অভ্যাস করি। এই সব কাপড়-চোপড় ও গহনা একত্রে বেঁধে অচিরেই আমি নেমে আসি। এর পর আমরা নিকটের এক বেশ্যা নারীর গৃহে রাত কাটাই। কারণ রাত্রে বামাল সহ পথ চলা নিরাপদ নয়। হাঁ হুজুর, রাত্রে কোন্ সময় গৃহস্থেরা অঘোরে ঘুমায়, সেই সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত

---

* কুমারী মেয়েদের গাত্রে গহনা থাকে না বা কম থাকে এবং এরা স্পর্শ মাত্র জেগে উঠে। এজন্য এই কুমারী মেয়েদের আমরা এড়িয়ে চলি।

ঘরে আলো জলে এইটেই আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি দেড়টা বা দুইটার পর আলো নিবলে আমরা বুঝে নিই যে এইবার এরা অঘোরে ঘুমাবে। বাড়িতে কোনও বাচ্চা শিশু আছে কিনা এ সম্বন্ধেও আমরা খবর নিই। কারণ এই সব শিশু হঠাৎ জেগে উঠে। শীতকালের প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মকালের শেষরাত্রে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে আমরা এইরূপ জেনেছি। আমাদের অকুস্থলে এসে আমরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নারভাস হযে পড়ি। এ ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের এই ভয বা নারভাস্‌নেস্‌ কাটে না। এই জন্যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অকুস্থলেই বিষ্ঠা ত্যাগ করি। ঠিক সময়ে বিষ্ঠা ত্যাগ না হলে আমরা অপকর্ম না করেই চলে যাই। কখনও কখনও আমরা দল বেঁধেও সিঁদেল চুরি করে থাকি। এই সময কয়েকজন ভিতরে ঢুকলেও অন্য সকলে বাহিরে পাহারার কাজে বাহাল থাকে। এদের মধ্যে একজন পাঁচিলের উপর বসে থাকে। এই ব্যক্তি সন্দেহজনক লোক দেখলে শিস্‌ দিয়ে ভিতবের লোকদের সতর্ক করে দেয়। এ ছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়েও আমরা পাহারা রেখে থাকি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দোকান বা বাজারের দরোয়ানদের সঙ্গেও * আমরা সড করে থাকি। তবে অধিক ক্ষেত্রে বাড়িব চাকরদের সঙ্গে সলা করি।"

কোনও কোনও সিঁদেল চোরের দল তাদের অপকর্মের সুবিধার জন্যে ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। গরাদের ফাঁকে, নর্দমার

---

* কেহ কেহ মনে করেন যে এরা ক্ষেত্র বিশেষে রাস্তার পাহারাদার সিপাইদের সঙ্গে সলা সড় করে নেয়। ইহা মাত্র কয়েকটি অসাধু সিপাইদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মুখ বা স্কাইলাইটের মধ্যে এরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে—ভিতরে প্রবেশ করে এরা বড়দের জন্যে সদর দরজা খুলে দিয়ে থাকে। এই চোরদের দলে এইরূপ অনেক মার্কা-মারা ছোকরা আছে। এই সকল ছোকরা নিয়ে এক দলের সহিত অপর দলের প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি হয়। এমন কি এজন্যে মারপিট খুনোখুনিও হয়ে থাকে। এই সকল বালকদের সহিত এদের বিকৃত যৌন সম্পর্কও থাকে।

বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে চুরি করার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই জন্যে পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত বাটীর দুয়ারে এসে এরা আড্ডা জমায়.—উদ্দেশ্য, কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় কুকুরগুলির সহিত পরিচিত হওয়া। এই সব কুকুরদেব এরা প্রায়ই এটা-ওটা খাইয়েও থাকে। মনিবরা বাধা তো দেনই না, বরং এতে খুশিই হয়ে থাকেন। এর পর এরা রাত্রে বাড়ি ঢুকলে পূর্ব পরিচিত বিধায় কুকুররা আর চেঁচায় না। কোনও কোনও স্থলে অকুস্থলেই আহার্য দ্বারা কিংবা সঙ্গে আনা কুকুরীর [মাদি] সাহায্যে এরা কুকুরগুলিকে বশ করে নিয়েছে। * কুকুরের মেমরির কার্ড ইনডেক্স গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল। [প্রথম খণ্ড দেখুন।] এজন্য এরা উগ্র ক্যানথারাইডিন গন্ধ মেখে এগোয়। এই উগ্র গন্ধের কভারে মানুষের সূক্ষ্ম গন্ধ ঢেকে যায়। আমি এদের বাড়ি তল্লাসী করে ঐ সেণ্টের শিশি পেয়েছিলাম। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ ঢাকতে উহার ব্যবহার হয়। কিন্তু ওদের বিবৃতি হতে প্রকৃত বিষয় আমি অবগত হই।

কোনও কোনও সবল চোর চুরির সুবিধার জন্যে কোনও এক খালি দোকান ভাড়া নেয়। এর পর রাত্রি যোগে ঐ কামরার দেওয়াল

---

* কুকুরের নিকট পরিচিতের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এরা না'ও কামড়াতে পারে।

ফুটা করে এরা পাশের দোকানে ঢুকে ঐ দোকানের সমুদয় দ্রব্যাদি চুরি করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সবল চোর আবার ছাত ফুটা করে দড়ির সাহায্যে গুদামে ঢুকে দ্রব্যাদি চুরিও করেছে। প্রতিরাত্রে অল্প অল্প করে এই ফুটা এরা করে থাকে। পুলিশি তদন্ত দ্বারা এইরূপ জানা গেছে।

কোনও কোনও সবল [সিঁদেল] চোরেরা নাকি ক্লোরোফর্মও ব্যবহার করে থাকে। ঘরের যে জানালাটির উল্টা দিকে অর্থাৎ কিনা যে জানালাটি হ'তে ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই জানালাতে এসে বায়ুর মুখে এরা নাকি ক্লোরোফর্মের শিশিটা খুলে রাখে। এদের ধারণা যে এতে করে গৃহস্থদের ঘুম গভীর হবে। কিন্তু এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অনেকের মতে ক্লোরোফর্মের অপ্রত্যক্ষ [indirect] প্রয়োগ কখনও কার্যকরী হয় না।

বাংলা দেশের দিনাজপুর জিলায়, রায় ঘাটোয়াল এবং মাল-পাহাড়ী নামক দুইটি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি বাস করে। এরা সবল-চৌর্যের সময় এক অদ্ভুত রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এদের একজন একটি লম্বা সুতার একটি মুখে একটি বঁড়শি বেঁধে ঐ বঁড়শিটি তার কাপড়ের সঙ্গে বিঁধিয়ে রাখে এবং এই অবস্থাতেই সে কোনও গৃহস্থের বাড়িতে চৌর্য কার্যের জন্য প্রবেশ করে থাকে। এই সময় দলের অপর আর এক ব্যক্তি ঐ সুতার অপর মুখটি বাণ্ডিলসহ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। বিপদের কোনও সম্ভাবনা হলে এই বাহিরের ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ঐ সুতাটির মুখ ধরে টান দিতে থাকে। ভিতরের লোকটির কোমরের বঁড়শিটিতে টান পড়া মাত্র সে বুঝতে পারে যে, বিপদ আগতপ্রায় এবং ইহা বুঝা মাত্র সে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাইরে এসে পলায়ন করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে সিঁদেল বা সবল চোরেরা পলায়নের সময়ও নানা রূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। মঘেরা ডোম আদি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিরা পলায়নের সময় শিয়ালের অনুকরণে ডাক তো ডেকেই থাকে; তা ছাড়া এরা হুবহু শিয়ালদের ন্যায়ই চার পায়ে—অর্থাৎ উভয় হস্ত ও পদ দ্বারা ভূমি স্পর্শ ক'রে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করে থাকে। এদের কেহ কেহ চুরির মাল অকুস্থলের নিকটেই ভূমির তলে প্রোথিত ক'রে ঐ ভূমির উপর মাদুর পেতে সুখে নিদ্রা যায়। পরে সুবিধামত ঐ দ্রব্য ঐ ভূমির তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এরা প্রস্থান করে থাকে। শহরের কোনও কোনও চোর চুরির পর বামাল ও যন্ত্রপাতি তরকারির ঝুড়িতে করে—তরকারির তলাতে রেখে নির্বিবাদে তা পাচার করে থাকে। ভোরের দিকে শহরের রাস্তায় ঐরূপ বহু তরকারিওয়ালাকে বাজারের দিকে যেতে দেখা যায়। এই কারণে এদের উপর ঐ সময় কারও সন্দেহ আসে না। এই সকল সিঁদেল চোরেদের কেহ কেহ বাসনওয়ালী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিদের নিকট হ'তেও খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও একটি নুতন গৃহ নির্মাণের সময় আশে-পাশের বহু বাটীতে চুরি হ'তে আরম্ভ হয়েছে। দিনের সিঁদেল চোরেরা গুদাম আদি স্থানে প্রবেশ করে ধরা পড়লে প্রায়ই এইরূপ বলে থাকে, "আমি অমুক বাবুকে খুঁজতে এসেছি। এই দেখুন না, এ চিঠিটা।" বস্তুতঃ তাদের কাছে ঐ নামের একটা পত্রও পাওয়া গিয়ে থাকে। এটা অবশ্য এদের অপপদ্ধতির একটা চালাকি মাত্র। কোনও কোনও চোর এই অবস্থায় ভাণ করে যে অকুস্থলে মল বা মূত্র ত্যাগ করবার জন্যে সে প্রবেশ করেছে। এ ছাড়া কোনও কোনও সবল চোর পলায়নের সময় নিজেরাই "চোর চোর" বলে ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক ক্ষেত্রে এমন কাহিনীও শুনা গেছে।

এই সকল চোরেরা অপকার্যের সুবিধার জন্যে নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে থাকে—অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে 'অপরাধ-সাহিত্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল সিঁদেল চোরেদের যন্ত্রপাতি পূর্বাংশে বলা হয়েছে। এই সব চোরেদের দ্বারা ব্যবহৃত অপবাপব যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচনা হয়েছে। পূর্বকালে গ্রাম্য কামাররাই [কর্মকার] এই সব যন্ত্রপাতি চোরেদের জন্যে নির্মাণ করে দিত। এ সম্বন্ধে চোরেদেব সহিত গ্রাম্য কামারদের একটা সংস্কারগত সম্বন্ধও আবহমান কাল হ'তে চলে এসেছে। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। জনপ্রবাদটি হচ্ছে এইরূপ, যথা—"চোরে-কামারে দেখা নেই, সিঁদ মোহনায় চুরি।"* প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ হয় এইরূপ: চোর কামাবেব অসাক্ষাতে পাঁচপো চাউল এবং পাঁচসিকা, একটা গামছায় বেঁধে কামারশালার দরজায় রেখে যায়। কর্মকার ফিরে এসে

---

* এইরূপ চৌর্য সম্বন্ধীয় বহু জনপ্রবাদ সঙ্কলন করলে প্রচীন ভারতের অপবাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান গবিমার অনেক তথ্যই প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, যথা—(১) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, (২) চোরের মন পুঁই আদাড়ে [আঁধারে], (৩) চোরের মন বোঁচকার দিকে, (৪) চোরের সাত-দিন, গৃহস্থের একদিন, (৫) চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা. (৬) চোরের এক পাপ, গৃহস্থের সাতপাপ, (৭) ন্যাঙটার নেই বাট-পাড়ের ভয়, (৮) চোরের উপর বাটপাড়ি, (৯) সাত চোরের মার, (১০) চোরের মায়ের কান্না, ইত্যাদি।

ঐ দ্রব্যগুলি দেখা মাত্র বুঝে নেয় কে বা কারা কি জন্যে ঐ দ্রব্যগুলি ঐখানে রেখে গেছে। এর পর কর্মকার মশাই ঐ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে ঐ স্থানে একটি লোহার সিঁদকাঠি তৈরি করে সকলের অলক্ষ্যে রেখে দিয়ে প্রস্থান করে। চোর মশাই সুযোগ মত ফিরে এসে লৌহ যন্ত্রটি তুলে নিয়ে সরে পড়ে। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কে যে কার জন্যে দ্রব্যটি তৈরি করে দিল, তা চোর বা কামার উভয়ের কেহই জানতে পারে না। এই জন্য ঐ লৌহ কর্মকার ইচ্ছা করলেও ঐ চোরদের সনাক্ত করতে পারে না।

শহর অঞ্চলে এইরূপ কোনও প্রথার বিষয় কদাচ শুনা যায় নি। শহরের কর্মকাররা চোরেদের ফরমাস মত নানারূপ উন্নত ধরনের এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রায়ই তৈরি করে দিয়ে থাকে। এই সকল যন্ত্র-পাতিদ্বারা সাধারণ গৃহগুলি ভাঙা গেলেও বিশেষ ভাবে নির্মিত লৌহ-কক্ষগুলি [str ng-ro m] ভেঙে ফেলা দুষ্কর। এদেশের অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি নির্মাণ করে থাকেন। কিন্তু তৎসহ আরও দুই এক হাজার টাকা ব্যয় করে একটি লৌহ-কক্ষ [strorg-room] নির্মাণ করার কেহ কোনওরূপ প্রয়োজন মনে করেন নি। এদেশের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মূল্যবান অলঙ্কারাদি স্বগৃহে রাখারই পক্ষপাতী। আমার মতে প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তিরই উচিত বাড়ি নির্মাণের সহিত একটি লৌহ-কক্ষ নির্মাণ করা এবং আসবাবপত্র ক্রয় করার সহিত তাঁদের ক্রয় করা উচিত গৃহ-সংলগ্ন পুস্তকাগারের জন্যে কিছু কিছু পুস্তকও। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লৌহ-কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশের অধিকাংশ সিঁদেল চোরেরা আজও পর্যন্ত শিখে নাই।

এ দেশের সিঁদেল চোরদের কেহ কখনও লৌহ গলানো গ্যাস

বা অ্যাসিড এখনও ব্যবহার করতে শিখে নি। কারণ এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ অপকার্যটি এদেশেব নিবক্ষর এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ভদ্রঘবেব শিক্ষিত অপরাধীদেব প্রবঞ্চনা অপরাধটির প্রতিই অধিক লক্ষ্য দেখা যায়। এই সবল চৌর্য রূপ অপবাধের দিকে এখনও তাঁদের নেকনজর পড়ে নি। বোধ হয় এদের দৈহিক পরিশ্রমেব প্রতি বিমুখতাই ইহার কারণ। তবে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

বিবিধ চৌর্য ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এই-বার কিরূপ পন্থায এই সকল অপকর্মেব ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে হযেছিল সেই সম্বন্ধে বলব। প্রকৃতপক্ষে চৌর্য অপরাধ হতেই পব পর দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয -- প্রবঞ্চনা ও সবল চৌর্য [burglary]। সুগঠিত গৃহ নির্মাণ ও মানুষের সাবধানতাই উহাদের সৃষ্টিব কারণ। মৎস্য হতে সরীসৃপের সৃষ্টির প্রমাণ স্বরূপ আমরা যেমন মধ্যবর্তী জীব ভেকের উল্লেখ করি। তেমনি চৌর্য অপরাধ হ'তে প্রবঞ্চনা অপরাধেব উৎপত্তির প্রমাণ স্বরূপ আমবা প্রবঞ্চনা-মিশ্রিত চৌর্য প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তী বা মিশ্র অপরাধের নজিব দিতে পাবি। এই সকল মিশ্র অপকর্ম সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা কবব। এই মতবাদেব অপর প্রমাণ স্বরূপ আমবা দেখতে পাই যে, অধিক ক্ষেত্রে আদিম ও নিম্নশ্রেণীর মানবগণই চৌর্য অপরাধে লিপ্ত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সুসভ্য মানুষ অধিক ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে প্রবঞ্চনা অপরাধে। মানুষের ক্রমিক বুদ্ধি বিকাশও ইহার কারণ হতে পারে। আরও পরে মানুষ সামাজিক জটিলতাসহ সুসংবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে এই সিঁদেল চুরি [burglary] অপরাধ হতে সৃষ্ট হয় উহার সমশ্রেণীর ডাকাতি [robbery] অপরাধ। এই ডাকাতি ও বারগ্লারি

অপরাধে যথাক্রমে ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে অপরাধ সম্পর্কীয় ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হতে এই সকল অপরাধের ক্রমিক উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

ভৃত্য-চৌর্য
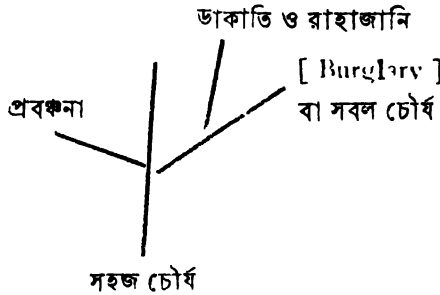
ভৃত্য বা চাকর চোর অধুনাকালে একটি বিশেষ সমস্তার বিষয়। অনেক সময় ধন, মান ও প্রাণ এই ভৃত্যদের উপর নির্ভর করে। কয়েক ক্ষেত্রে এই সকল অপরাধীরা গৃহস্বামিনীকে একা পেলে তাকে বলাৎকার বা হত্যা পর্যন্ত করেছে। তবে এরা সাধারণতঃ সহজ বা সরল চোর হওয়ায় চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধ করে না। এই কারণে ভৃত্য নিয়োগ অতীব সাবধানে করা উচিত। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের কখনও ভৃত্য রাখা উচিত নয়। নবাগত ভৃত্যদের কার্যে বাহাল করার পূর্বে বা পরে যথা সত্বর গৃহস্থদের উচিত, এদের নাম, ধাম, পরিচয় ও দেশের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে ঐ সম্বন্ধে লিখে

পাঠানো। এইরূপ পত্র পেলে পুলিশ ভৃত্যের দেশের ঠিকানায় এবং অন্যান্য স্থলে খবর নিয়ে বলে দিতে পারে লোকটি ভাল বা মন্দ। কলিকাতার মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুর জনসাধারণের হিতার্থে বহুদিন পূর্বেই এইরূপ সুব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ এই ব্যবস্থার কোনরূপ সুযোগ প্রায়ই গ্রহণ করেন না।

এই চাকরদের মধ্যে দুই প্রকারের চোর দেখা যায়—অভাবী ও পেশাদারী। অভাবী চোরেরা প্রায়ই ততো বিপদজনক হয় না। এদের মধ্যে যারা ড্রাইভার তারা রবারের নলের সাহায্যে পেট্রল চুরি করে। এদের কেউ গাড়িব পুরানো পার্ট্‌স্ সরিয়ে নূতন পার্ট্‌স ক্রয়ার্থে অর্থ গ্রহণ করেছে। কেহ নূতন টাযার সরিয়ে পুরানো টায়ার ফিট্ করে দেয়। অভাবের কারণে বা সামান্য স্বভাব দোষে চাকররা বাজারের পয়সা কিংবা সুযোগমত ঘরেব এটা ওটা দ্রব্যাদি সরিয়ে থাকে। কোনও পদচ্যুত চাকরের বাক্স তল্লাস করলে এমনি অনেক ছোট-খাটো চোরাই দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায়। বাড়িতে কোনও নারী না থাকলে এরা বেপরোয়াভাবে চুরি করে থাকে; এই সব বেমালুম ছোট চুরি আবিষ্কার পুরুষদের সাধ্যাতীত। কেবল মাত্র এই চুরি বন্ধের কারণেও ভদ্র মানুষের বিবাহ করা উচিত।

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোন একটি মেস্‌বাসী ছোকরা প্রায়ই থানায় এসে অর্থাদি চুরির বা হারানোর এজাহার দিত। একদিন তাকে আমি প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা মশাই! এভাবে না থেকে আপনি বিয়ে করেন না কেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি আমায় বলেছিল,

আই ক্যাণ্ট মেইনটেন এ ওয়াইফ।' অর্থাৎ কিনা তিনি একটা বৌও নাকি এফোর্ড করতে পারেন না। আমি তখন গত দেড় বছর যাবৎ ওঁর যত কিছু হারিয়েছে বা খোয়া গেছে বা চুরি গেছে, গত দুই বৎসরের নথিপত্র [record] ঘেঁটে তার একটা হিসাব করে—উক্ত সংখ্যাকে বারো দিয়ে ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যে, গড়ে প্রতিমাসে তাঁর যা খোয়া যায় বা চুরি যায় তা দিয়ে তিনি একটি স্ত্রী তো মেইনটেন করতে পারেনই ; এমন কি ঐ অর্থ দ্বারা তিনি দুটো বৌ মেইনটেন করতে সক্ষম। আমার এই কথাটা আমি বিবাহ-ভীরু বিপত্নীক এবং অবিবাহিতদের ভেবে দেখতে বলি।"

চাকর চোর বলতে সাধারণভাবে আমরা পেশাদারি চোরদেরই বুঝি। এরা একমাত্র চুরি করার উদ্দেশ্যেই চাকুরি নিয়ে থাকে এবং সুযোগের অভাবে চুরি করতে অক্ষম হলে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এরা [শহরে বা গ্রামে] এক এক বড়িতে এক এক নামে বাহাল হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম এরা বাটীর ছোট বড় সকলকেই তাদের কর্মতৎপরতার দ্বারা মুগ্ধ করে দেয়। এই ভাবে তারা সুযোগ-সুবিধাও অনেক পরিমাণে আদায় করে থাকে। এর পর হঠাৎ একদিন সুযোগ মত দামী দ্রব্য বা অর্থাদি বা অলঙ্কার অপহরণ করে এরা উধাও হয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ তাদের কর্মপদ্ধতির কিছু কিছু অদল-বদলও করে থাকে। প্রথম দিনেই এরা অপহৃত দ্রব্য বাড়ির বাইরে পাচার করতে পারে নি। দ্রব্যাদি অপহরণ করে বাড়ির মধ্যেই সাবধানে এবং সংগোপনে কোনও গুপ্তস্থানে ঐগুলিকে এরা লুকিয়ে রাখে। কয়েক দিন পর বাড়ির লোকেরা দ্রব্যগুলির জন্যে খোঁজাখুঁজি করে নিরস্ত হলে পরে সুবিধামত একদিন অপহৃত দ্রব্যগুলি ঐ সকল গোপন স্থান থেকে সরিয়ে হঠাৎ একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে এরা

পলায়ন করে। চুরির দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে হাজির থাকায় সহসা এদের কেহ সন্দেহও করে না। এদের অনেকে বাসন চুরি করে উহাদের গামছায় বেঁধে বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে রেখে নিশানা স্বরূপ নিকটে একটা কঞ্চি পুঁতে রেখে থাকে।

[চাকর চোরদের কেহ কেহ সেবা-শুশ্রূষার ছলে বাড়ির কর্তা বা অন্য কারও বিকৃত যৌন-বোধের উপশম ঘটিয়ে এমন ভাবে তাদের প্রিয়পাত্র হয়েছে যে, বাড়ির অপর সকলে তাকে ভৎর্সনা পর্যন্ত করতে সাহসী হয় নি। সাধারণতঃ পায়ে বা দেহে তেল মালিশ করবার সময় এইরূপ সেবা তারা করে থাকে।]

পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয়। চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঐ দ্রব্য অস্থির বা অস্থাবর হওয়া চাই এবং উহা অসদুদ্দেশ্যে অপসারণ করা চাই। এইরূপ সংজ্ঞানুযায়ী কেহ কাহারও দ্রব্য চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারীর টেবিল হতে উক্ত দ্রব্য সরিয়ে উহা ঐ টেবিলেরই এক ড্রআরের মধ্যে রেখে দিলেও ঐ অপ-কার্যকে বলা হবে চৌর্য অপরাধ। এই সব চোরদের প্রায়ই অলঙ্কারাদি বাড়ির ভিতরের কয়লা ঘুঁটের গাদার মধ্যে বা ইলেকট্রিক মিটার বক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে। এরা কাজ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বাড়ির কর্তার অত্যন্তরূপ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে।

এই সকল চাকর চোরেরা ধরা পড়ার পর এক অভিনবরূপ মিথ্যাভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে। নিম্নের উদ্ধৃত বিবৃতিটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী হলেও চোর নই। ফরিয়াদির যুবতী কন্যার সঙ্গে আমার প্রেম হয়। আমি

গোপনে রাত্রিযোগে ঐ কন্যার ঘরে যেতাম। কিন্তু কাল আমরা ধরা পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হয়ে ফরিয়াদি এই ঘটিটা আমার হাতে দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি উনি গোপন করেছেন। ফরিয়াদির স্ত্রীও আমাদের এই প্রেম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি দুধ খাইয়েছেন।"

চাকর-বাকরদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরাই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলা বাহুল্য, চাকর চোররা প্রায় সকলেই অভ্যাস অপরাধী হয়ে থাকে। কোনও এক চাকর-চোর গহনাশুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে, "ও ত গিন্নীমা আমাকে কর্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বাঁধা বা বিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন।" অপর আর এক নারী অপরাধী এইরূপ অবস্থায় নিম্নোক্তরূপ উক্তি করে, "দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আংটিটা চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি এ কথা অস্বীকার করছেন।"

কোনও কোনও ভৃত্যের বাহিরে প্রেয়সী থাকে। তাদের উপহার দেবার জন্যও তারা গহনা চুরি করেছে। কোনও কোনও ঝিরও বাহিরে অনুরূপ চোর উপপতি আছে। এরা নিজের নামে দুজনের উপযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আদি ঘরে নিয়ে যায়। তবে কেহ কেহ চুরির পরই দ্রব্যসহ দেশেও চলে গিয়েছে।

এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁরা ছয় মাস পূর্বে চাকর নিয়োগ করেছেন, অথচ তাঁদের চাকরের পুরা নাম বা দেশের ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তার কিছুই বলতে পারেন না। পীড়াপীড়ি করলে সলজ্জভাবে তাঁরা এইটুকু মাত্র বলবেন, 'তা আমি কি জানি মশাই!

কেষ্ট কেষ্ট বলে তো তাকে ডাকতাম আমরা।' কিছুকাল পূর্বে কোনও এক মাড়োয়ারীর গদি হতে জনৈক দেশবালী বহু সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে উধাও হয়। অপরাধীর নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে এইরূপ বলেছিল, "উনকা নাম? উনাকা নাম উ তো বোলা সদাহরী, মতিহারী? নেহি হুজুর রামহরি ভি হোনে সেকতা। উনকো দেশকো ঠিকানা উ তো বোলা হোগ, মতিহারী—নেহি হুজুর উনে বোলা থে গযা। নেহি নেহি। বেলিয়া ভি হোনে শেকতা। কেযা বোলে হুজুর, মেরি সত্যনাশ [সর্বনাশ] হো গয়া।"

অনেকে আবার নবাগত ভৃত্যদের নামধাম সম্বন্ধে অনেক পীড়াপীড়ি করতে নারাজ হন। কারণ এতে করে সে ভয় পেযে চলে গেলে তিনি আর চাকর পাবেন না। পেশাদার ভৃত্য-চোরদের হাতের টিপ নিলে বা নামধাম টুকে নিলে তারা ভয় পেয়ে যে সরে না পড়ে তাও নয়। কিন্তু এতে গৃহস্থের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হয়ে থাকে। গৃহস্থদের উচিত হবে মাহিনে দেবার সময় চাকরদের সহি এবং তৎসহ তার টিপ সহিও নেওয়া। এতে চুরি করে পালালে তাকে সহজে ধ'রে আনা সম্ভব হয। অন্যথায় পুলিশের পক্ষে এই সব চুরির কিনারা করা অতীব কষ্টসাধ্য হযে পড়ে। কারণ পুলিশ গৃহস্থদের মতই সাধারণ দ্বিপাদ মানুষ মাত্র।* এছাড়া গহনা বা অর্থাদি

* একটু চালাকির সহিত মসৃণ কাঁচের গেলাসে জল আনতে বলে অলক্ষ্যেও এদের অঙ্গুলির টিপ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই উপায়ে বহু জ্ঞানী-গুণী লোকেরও টিপ তাঁদের অজ্ঞাতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বার করা বা ন্যস্ত করার সময়—উহা চাকর-বাকরদের সামনে বাহির বা ন্যস্ত না করাই ভাল। এই বিশেষ বাক্যটি সকল সময়ই আমি গৃহস্থদের স্মরণ রাখতে অনুবোধ কবি। এ ছাড়া সকল বিষয়েই চাকবদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু গৃহস্থালীর কার্য নিজেদের হাতাহাতি করে সমাধান কবারও সময় এসেছে। আজিকার দিনে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমি উচিত মনে করি। এতদ্বারা বাডির পুত্রকন্যাগণ একদিক হতে যেমন কর্মঠ হবে, অপরদিক থেকে তেমনি তারা আত্মনির্ভরশীলও হতে শিখবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুগ কতকটা সমাজতান্ত্রিক যুগও বটে।

ইহা ছাড়া এমন অনেক গৃহস্থও এই শহরে আছেন, যেখানে কর্তার চাকরের সম্বন্ধে বাড়ির মেজবাবু কোন কিছুই জানাতে পারেন না—এইরূপ বিলিব্যবস্থার সুযোগও এই সব চাকর চোরেরা পাইয়া নিয়ে থাকে। বাড়িতে অনেকগুলি ভৃত্য থাকলে কোন ভৃতটি দ্বারা চৌর্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তা জ্ঞাত হওয়াও অতন্তরূপ দুষ্কর হয়ে উঠে।

অধুনাকালে কোনও কোনও সুধী ব্যক্তি মনে করেন যে এই সব গৃহ-ভৃত্যদের মোটর চালকদের লাইসেন্সের মত সরকার বাহাদুর কর্তৃক লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত। লাইসেন্স মাত্রই রীতিমত পুলিশ তদন্তের পর দেওয়া হয়। এই কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত ভৃত্যদের সম্বন্ধে কোনওরূপ ভয়ও থাকে না; উপরন্তু ইহা দ্বারা রাজস্বের আয়ও কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা দেশের আইন-সভার বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শাসন বিভাগের এ সম্বন্ধে কোনও কিছু করবার নেই।

[কিন্তু এ ব্যবস্থাতে গৃহস্থদের বিপদও আছে। তাহলে স্বল্প বেতনে ভৃত্য পাওয়া মুস্কিল হবে। এরা দল বেঁধে মাগগীভাতা দাবী করবে। ফলে গৃহভৃত্য রাখা গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব হবে না।]

কোনও কোনও গৃহস্থ ভৃত্যগণকে অত্যস্তরূপ বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু বাহিরের কোনও ব্যক্তিকে—বিশেষরূপ খোঁজ-খবর না নিযে এতটা বিশ্বাস করা অতীব অন্যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক্।

"কোনও একটি ভদ্রলোক থানায় এসে জানান, তাঁব বাড়িতে নাকি একটা মিসটিরিযাস চুরি হযেছে। তিনি ঐ দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে দেখেন যে, তাঁর স্ত্রী তখনও সিনেমা হতে ফেরেন নি। এরও কতক্ষণ পরে তাঁর স্ত্রী বাড়ি ফিরেন, বাড়িতে তখন অন্য কেহই উপ ি ত ছিল না। এর পর তাঁর স্ত্রী ড্রআর খুলে বস্ত্রাদি ন্যস্ত কবতে গিয়ে দেখতে পান যে তাঁর সমুদয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়েছে। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তদন্তের ব্যপদেশে অকুস্থলে এসে হাজির হই। তদন্তেব সময কোঁচা-ঝোলানো টেরিকাটা একটি ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করছিলেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নের জবাব তিনিই দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন কি, কোন দিক হতে চোরটা এসে থাকতে পারে সেই সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞেব মতই তিনি আমাকে এবং বাড়ির আর সকলকে বুঝাবার চেষ্টাও করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা। 'আপনি এ বাড়ির কে? উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, আজ্ঞে, আমি? আমি এ বাড়ির কুক্ [c^ok]। আমাদের সাথে ঐ ফরিয়াদির স্ত্রীও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এইবার তিনি আমাকে

উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, ও আমার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।* আমার মতে ও ঠিকই বলছে। এর পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাশের সোফাটায় বসে পড়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইংরাজি জান? উত্তরে লোকটি বলে উঠে, আজ্ঞে না, তবে ফ্রেঞ্চ জানি। আমি চন্দননগরের লোক। আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, তাই নাকি! তা ফরাসী বলতে পার? উত্তরে লোকটা বলে চলে, নিশ্চয়ই, এই শুনুন না, মসিঁয়ে, বুনজুর মসিঁয়ে, ওয়ারে ভোঁ, লেলেপে। এইবার ফরিয়াদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বলে উঠি, ইনি তাহলে আপনাদের চাকর? একে আমি আপনার ভাই বা শ্যালক-ট্যালক বা ঐরূপ একজন আত্মীয় মনে করেছিলাম। আপনারা বেশ ভাল চাকর তো আমদানী করেছেন। এ লোকটা এখানে কতদিন আছে? এ ছাড়া মনে মনে তাদের উদ্দেশ্যে আমি এও বলি, মশাই! শীঘ্র বিদায় করুন, নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানিয়েছিলেন, মাস তিনেক হবে বাহাল হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের পর আমি ফরিয়াদিকে জানাই, ঐ চাকরটির উপর আমার অত্যন্তরূপ সন্দেহ হচ্ছে এবং তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় নিয়ে যেতে চাই। আমার অভিমত শুনে ফরিয়াদির স্ত্রী অত্যন্তরূপ নারাজ হয়ে উঠেন। তা ছাড়া আমার প্রস্তাবে তিনি ক্রুদ্ধও হন। মহিলাটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, ও সব আপনার বাজে সন্দেহ। ও কি শুধু বাড়ির চাকর! ও আমার ছেলে! বা রে

---

* চাকর এবং রাঁধুনী—এই উভয়েরই কার্য যারা করে তাদের বলা হয় কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

যা, তুই কাজ করগে যা। মনিবানীর আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। দূর হতে চাকরটার কর্মতৎপরতা আমি উপলব্ধি করতে থাকি। নিমেষের মধ্যে সে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেদের পরিচর্যার কাজ শেষ করে দিল। সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও ত্বরিত গতিতে সে সমাধা করলে। এদিকে আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে বলি যে ঐ চাকরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবই। ভদ্রমহিলা এইবার তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন, ওকে আপনি নিয়ে যাবেন কি! আপনি ওকে নিয়ে গেলে আমাকে হাত পুড়িয়ে বেঁধে খেতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে তো দেখছি এইটুকুই লাভ। না মশাই, আমরা আর কেইস করতে চাই না। আমি এই চুরির কেইস তুলে নিচ্ছি। আমি বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা একদিনের জন্যও রন্ধনশালায় প্রবেশ করতে নারাজ। এই কারণে তিনি গহনা ছাড়তেও রাজি, কিন্তু চাকর ছাড়তে রাজি নন। আমি কিন্তু এদের কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য না করে চাকরটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। থানায় এসে চাকরটি স্বীকার করে যে গহনা চুরি সেই করেছে। যে দোকানে সে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে এসেছে, সেই দোকানেও আমাদের সে নিয়ে যায়। কিছু গহনা সে ইলেকট্রিক মিটার বক্সের মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছিল। এই ভাবে হাজার টাকা মূল্যের সমুদয় অপহৃত গহনা আমরা ঐ চাকরের কথা [বিবৃতি] মত উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর বিষয়টি আগাগোড়া অনুধাবন করে মহিলাটি বলে উঠেছিলেন, ওরে ও হোরে! এঁ্যা, তোর মনে এই ছিল? তোর হাতে যে আমি আমার লাখ টাকার শিশু পুত্রদের ছেড়ে দিয়েছি! সর্বনাশ! তা আপনি মশাই কিছু মনে করবেন না। এখন দেখছি এ বিষয়ে সবটা আমারই ভুল। আপনি কিন্তু কাল

আমাদের এখানে এসে খাবেন। আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রইল। হায় রে! এতগুলা গহনা গিয়েছিল আর কি! এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মহিলাটিকে আমি সেই দিন এইরূপ বলেছিলাম, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। তবে হাত পুড়িয়ে আপনি রাঁধতে পারবেন তো? আপনার কুকটিকে [cook] তো আমি এখন নিয়ে চললুম।"

চৌর্যবৃত্তি—অসাধারণ

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিবিধ প্রকার সাধারণ চৌর্য অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ চৌর্য ছাড়া অসাধারণ চৌর্যও দেখা যায়। এই চুরি দুই প্রকারের হয়, যথা সহজ ও মিশ্র। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে পরে চুরির আশ্রয় নেওয়া হলে আমরা উহাকে মিশ্র চৌর্য বলি। ইহার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রবঞ্চনা ও চৌর্য অপপদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই চৌর্যপদ্ধতি অবিমিশ্র থাকলে উহাকে আমরা বলি সহজ চৌর্য। প্রথমে এই অসাধারণ সহজ চৌর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে কেবলমাত্র অস্থাবর বা অস্থির [movable] দ্রব্য চুরির কথাই বলা হয়েছে। কেহ স্থাবর বা স্থির [immovable] দ্রব্য অধিকার করলে উহাকে চুরি বলে না। উহাকে তখন বলা হয়

অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু কোন কোনও ক্ষেত্রে স্থাবর দ্রব্যও চুরি করা সম্ভব হয়। এই স্থলে স্থাবর দ্রব্যকে অস্থাবর বা অস্থির দ্রব্যে পরিণত করা মাত্র উহা চুরির পর্যায়ে এসে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, না বলে অপরের গাছ কাটার কথা বলা যেতে পারে। বৃক্ষ একটি স্থির দ্রব্য, উহা চুরি করা যায় না। কিন্তু উহা কাণ্ডচ্যুত হযে মাটিতে পড়লে উহা অস্থির দ্রব্যে পরিণত হবে। এইরূপে কাণ্ডচ্যুত করাকে আইনমত অপসারণ বলা যেতে পাবে—এই কারণে বৃক্ষটি মাটিতে পড়ামাত্র বৃক্ষচ্ছেদককে চোর আখ্যায় ভূষিত করা যায়। কর্তনের পর বৃক্ষকাণ্ডটি কার্যতঃ অপসারণ না করলেও কেবলমাত্র কর্তনের কারণেই বৃক্ষচ্ছেদক চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে। নারিকেল চুরি এবং আম ও কাঁঠাল চুরি ইত্যাদি চুরিকেও এই কারণে আইনানুসারে চুরি বলা হয়। কোনও এক লাইট রেলওয়ের ইঞ্জিন চালক পথিমধ্যে ইঞ্জিন থামিয়ে কাঁঠাল চুরি করেছিল। এই অপকর্মের জন্যে তাকে চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হযেছে। পল্লী-গ্রামে কোনও কোনও বালক ফাঁপা পাঁকাটির সাহায্যে খেজুর গাছের কলসী হতে রস চুষে খায় বা ঐ ভাবে ঐ রস বার করে নেয়। কোনও কোনও দুষ্ট মোটর ড্রাইভার এই একই প্রণালীতে ভেকুয়মকৃত রবার পাইপের সাহায্যে মালিকের অজ্ঞাতে মোটর হতে পেট্রল চুরি করে তা বিক্রি করে থাকে। ইহা একপ্রকার চুরি—ইহা ছাড়া নষ্টচন্দ্রের রাত্রে বালকদের দ্বারা চুরিকেও চুরি বলা যায়।

এই সকল সহজ চৌর্য সম্বন্ধে বলা হল। এইবার অসাধারণ চৌর্য সম্বন্ধে বলব। আমরা পুকুর চুরির কাহিনী শুনেছি, যদিও কিনা পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি চুরিও সম্ভব হয়েছিল। ইহা

অসাধারণ চৌর্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।* এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ছিল এইরূপ :

"কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাসী কোনও এক ভদ্রলোকের শহরের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীতে একটি সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ি ছিল। বাড়িটি তিনি জনৈক তথাকথিত ধনী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর কখনও কোনওরূপ ত্রুটি হয় নি। ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ব্যবহারও ছিল অতি মধুর। একদিন তিনি বাড়ির মালিককে জানালেন, আপনি বুড়ো মানুষ। প্রতিবার কষ্ট করে আসেন কেন? দমদমায় আমার ফ্যাক্টরি আছে, রোজই

---

* পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও রাত্রে জাল ফেলে পুকুরের মাছ চুরি সম্ভব। পল্লীগ্রামে ইহা হামেসাই হয়ে থাকে। ক্ষেত বা খামারের কাজের জন্যে অপরের পুকুর হতে জল নিকাশ করে নেওয়ারও নজির আছে। সরকারী খাল হতে বিনামূল্যে জল বার করলেও উহাকে চুরি বলা হয়। এইভাবে গ্যাস বা ইলেকট্রিসিটি চুরি করাও সম্ভব। পুকুর হতে মাছ চুরিকেও চুরি বলা হয়। কিন্তু কোনও নদী হতে মাছ চুরিকে চুরি বলা হয় না। এমন কি যদি কোনও পুকুর, খাল বা নালা দ্বারা এমন ভাবে নদীর সহিত সংযুক্ত থাকে যাতে করে কিনা পুকুরের মাছ ইচ্ছা করলে নদীতে চলে যেতে পারে তাহলে ঐরূপ পুকুর হতে মৎস্য চুরি করলে উহাকে চুরি বলা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মৎস্যগুলি বন্দীকৃত অবস্থায় [পুকুরের মালিকের হেপাজতে] নেই। উহারা সেখানে মুক্ত অবস্থায় আছে। অতএব ঐগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়।

তো যেতে হয় ওখানে। যাতায়াতের জন্ত আপনার আশীর্বাদে আমার যখন মোটর আছে, এই পথে ফিরবার মুখে ভাড়াটা আমি নিজেই পৌঁছে দেব আপনাকে। এর পর হতে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ভদ্রলোক নিজেই ভাড়াটা পৌঁছে দেন। বাড়িওয়ালার আর কষ্ট করে একদিনও শহরতলীতে আসতে হয় নি। এদিকে ঠগী ভদ্রলোক পাড়ার লোকদের সহিত অত্যন্ত রূপ মেলামেশা শুরু করে দেন। ঐ বাড়ির নীচের তলাটা পাড়ার ছেলেদের খেলা-ধুলা, ক্লাব ও লাইব্রেরির জন্তে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আবালবৃদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজও করান হয়—এককথায় পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। একদিন তিনি পাড়ার ভদ্রলোকদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন,—'হ্যাঁ মশাই! বাড়িওয়ালা বাড়িটা আমায় বিক্রি করতে চাইছেন। আপনারা কি বলেন, কিনবো নাকি?' এইরূপ একটি বিশিষ্ট পরোপকারী ভদ্রলোক পাড়ায় স্থায়ীভাবে থেকে যায়—কে না তা চাইবে। সকলেই এই সাধু প্রস্তাবে তাঁকে উৎসাহিতই করেন। তাঁরা এও বলেন যে, ঐরূপ ভাগ্য কি তাঁদের হবে ইত্যাদি। এর কয়েক দিন পরে তিনি পাড়ায় রটিয়ে দেন, বাড়িটি তিনি এইবার সত্য সত্যই কিনলেন। শুধু তাই নয়, মহা ধুমধামে তিনি গৃহ-প্রবেশেরও ব্যবস্থা করলেন। এই উৎসবে খরচ-খরচা করে যাগ-যজ্ঞ তো হলই; তা ছাড়া পাড়ার স্ত্রী-পুরুষকেও তিনি ভূরিভোজন করাতে কার্পণ্য করলেন না। বাড়ির ভাড়াটা কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাড়িওয়ালাকে বাড়ি বয়ে সমান ভাবেই তিনি দিয়ে আসছিলেন। এরও দুই তিন মাস পরে তিনি সকলকে জানালেন যে এই বাড়িটা তাঁর পছন্দসই নয়। তিনি উহা আগাগোড়া ভেঙে ফেলে ঐ স্থানেই নূতন করে

বাড়ি তৈরি করবেন। এই প্রস্তাবে পাড়ার লোকে অবাক হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না; তারা মনে করে ভদ্রলোক যুদ্ধের বাজারে প্রচুর উপার্জন করেছেন। এবার কোনও রূপে অতো অর্থ ব্যয় করা তো চাই ইত্যাদি। এর পর সেখানে ভাঙাইওয়ালা ডাকা হয় এবং বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়ির ইট পাথর লোহার কড়ি বরগা ও জানালা দরজা ইত্যাদি তারা ভেঙে নেয়। যুদ্ধকালীন বাজারের দরুণ এই সব লোহা, ইঁট, কাঠকুঠার অগ্নিমূল্য থাকায় ঐগুলি সহজেই বিক্রি হয়ে যায়। এর পরও মাস দুই ভদ্রলোক যথা নিয়মে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া পৌঁছতে থাকেন। বাড়িওয়ালা তখনও পর্যন্ত জানতে পারেন নি যে তাঁর বাড়ি নেই, সেখানে তাঁর আছে শুধু এক-টুকরা জমি। এর পরের মাসে ভদ্রলোককে যথা সময়ে ভাড়াসহ আসতে [ভাড়া দিতে] না দেখে গৃহস্বামী চিন্তিত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, 'ওরে ও খোকা! এমনটি তো কখনও হয় নি। নিশ্চয় এ ভদ্রলোকের শক্ত অসুখ করেছে। আহা-হা, বড় ভাল লোক তিনি। যা, যা দিকি একবার, দেখে আয়। শহরে কলেরা হচ্ছে, না গেলে খারাপ দেখাবে।' পিতার আদেশে খোকা রাত্রি আটটায় অকুস্থলে এসে হাজির হন, কিন্তু তাঁদের নিজ বাড়িটি বহু চেষ্টাতে খুঁজে পান না। বাড়ি এসে বিষয়টি জানালে পিতাঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠেন, 'হারামজাদা! কক্ষনো তুই সেখানে যাস্ নি। নিজের বাড়ি খুঁজে পেলিনি, একি একটা কথা নাকি? ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোক কি মনে করছেন বল তো! কেউ একবার তোরা খোঁজও করলি না তাঁর!' পরের দিন বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজেই লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে অকুস্থলে এসে হাজির হোলেন—কিন্তু তাঁর বাড়ি? বাড়ি তাঁর

কোথায় ? বিস্মিত হয়ে তিনি পাড়ার একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ মশাই, অমুক নম্বরের বাড়িটা কোনটে বলতে পারেন ? আমি চোখে মশাই, সব আর ঠাওর পাই না। আর বয়স তো হয়েছে।' পথচারী ভদ্রলোক ততোধিক বিস্মিত হয়ে উত্তর করলেন, 'সে কি মশাই! আপনার বাড়ি না আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন ?' সকল সমাচার অবগত হয়ে গৃহস্বামী ভদ্রলোক 'হা হতোস্মি' বলে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি ঐ ঠগী ব্যক্তির এ পর্যন্ত কোনও খোঁজ পান নি—ঠগী ভদ্রলোক হয় তো এতক্ষণে ভারতের অপর আর এক জনবহুল শহরে গিয়ে আড্ডা গেড়ে লোক ঠকাচ্ছেন বা লোক ঠকাবার তালে আছেন।"

কোনও কোনও শহরে এইরূপ বাড়ি-চুরি পদ্ধতির কিছু কিছু অদল-বদল হয়েও থাকে। দুর্বৃত্তগণ প্রথমে সন্ধান নেয়, যে শহর-তলীতে কোনও বিরাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা! বাড়ির মালিকের বর্তমান অবস্থাই বা কিরূপ ? এবং ঐ বাড়ি হতে কতদূরে তিনি বসবাস করেন। এর পর দুর্বৃত্তটি একজন ধনী ব্যক্তি সেজে মালিককে আশাতীত রূপ ভাড়া দিতে চায় এবং এও সে বলে যে সে নিজেই মনের মত করে বাড়ির অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কার্যটুকু স্বব্যয়ে সমাধা করে নেবে। এর পর দুর্বৃত্তটি বাড়িটি নিজের লোকে-দের দ্বারা তৈরি করতে আরম্ভ করে দেয়—পাড়ার লোকে মনে করে বাড়িটি দুর্বৃত্তের নিজেরই বাড়ি। কয়েক মাস সে বাড়ির মালিককে যথারীতি ভাড়াও দিয়ে আসে। এর পর একদিন সুবিধামত ভাঙাই-ওয়ালা ডাকিয়ে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকায় সমস্ত বাড়িটা ভেঙে মাল-মশলা যা কিছু—কড়ি, বরগা, জানালা, দুয়ার, ইলেকট্রিক

ফিটিংস্, জলের পাইপ, সিস্টার্ন ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ে। কিছুদিন পরে মালিকের দরোয়ান এসে বাড়ি না দেখতে পেয়ে মালিককে জানায়—হুজুর উহা কুঠি নেহি হ্যায়। উহা আভি সেরেফ জমীন্ হ্যায়। মালক মশাই তার এ কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলেন, 'পাগলা হ্যায় তুম! কুঠি কোই উঠাকে লেনে সেকতা। ফিন যাও উহা তুম। বাবুকো ব্যামার উমার কুছ জরুর হুয়া,' ইত্যাদি।

এই বিশেষ স্থলে বাড়িটি স্থাবর সম্পত্তি হলেও উহা ভেঙে দেওয়া মাত্র ঐ ভগ্ন দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে—এই কারণে ঐ সম্পত্তির অপসারণ কার্যকে আমরা চুরিই বলব। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ কয়েকটি চুরি সঙ্ঘটিত হয়েছে।

পরের দ্রব্য না ব'লে নিলে আইন মত চুরি করা হয়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দ্রব্যাদি না ব'লে গ্রহণ করলেও উহাকে চুরি বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ধরুন, আপনার একটি ঘড়ি আছে। আপনি এই ঘড়িটি কোনও ঘড়ির দোকানে সারাতে দিলেন। এর পর আপনি মেরামতের দাম না দিয়ে দোকানদারের অজ্ঞাতে ও বিনানুমতিতে যদি ঘড়িটি নিয়ে আসেন তো আপনার এই কার্যকে আইনানুসারে চুরি বলা হবে। এ ছাড়া কেহ বাড়ির কোনও অপ্রকৃতিস্থমনা কিংবা নির্বোধ লোক বা অল্পবয়স্ক বালকের নিকট হতে বাড়ির বড়দের অগোচরে কোনও দ্রব্যাদি চেয়ে নিলেও ঐরূপ অপকার্যকে চুরি বলা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা [definition] দ্রষ্টব্য।

চৌর্য অপরাধের অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও পরি-

লক্ষিত হয়। প্রেম করবার অছিলায় দুর্বলচিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন কন্যারও পৃথিবীতে অভাব নেই। তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের সংখ্যা এখনও অত্যল্প। এই স্থলে কারুর মন চুরির কোনও প্রশ্ন উঠে না। এখানে মাত্র দ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে। কারণ এই সকল মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই। এই প্রকারের চুরির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হল।

"সেদিন ছিল শনিবার। কাজ-কর্ম সেরে আমি উঠে পড়ছিলাম। এমন সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ জানালেন। নালিশটি ছিল এইরূপ: আমি অমুক গণিকার গৃহে চিকিৎসা করতে গিছলাম। আমার রূপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের জন্য চৌকির উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ি দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধৌত করে চৌকির কাছে এসে দেখি যে আমার ঘড়িটি সেখানে নেই। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার ঘড়িটি ঐ মেয়েটিই চুরি করেছে। এই এজাহারটি ছিল চুরির পুলিশগ্রাহ্য অপরাধ। এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধ সম্যক-ভাবে তদন্ত করতে হয়েছিল। তদন্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাটিকে আমি প্রশ্ন করি, ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তা সত্যি? গণিকাটি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়—কিছুটা সত্যি, সবটা নয়। উনি ওঁর প্রোফেশ্যনাল কলে আমার বাড়ি আসেন নি, উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার প্রোফেশ্যনাল কলে। বিশ্বাস না হয় দেখুন ওঁর ডান উরুদেশ। ওখানে একটা কালো তিল আছে কিনা? এর পর ডাক্তারবাবু একবারমাত্র খিঁচিয়ে উঠেন, কিন্তু তার পরেই তিনি সলজ্জ ভাবে অধোবদন হয়ে যান। কিন্তু

এদের ভিতরের ব্যাপারটি যাই হোক না কেন আসলে এই সুযোগে গণিকাটি তাঁর ঘড়িটি যে চুরি করেছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না।”

বেশ্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে। গণিকাদের চাকর-বাকররাও এইভাবে চুরি করে। মদ্যপানে অচৈতন্য যুবকদের পকেট হাতড়ানো বেশ্যালয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই যৌনজ চৌর্য পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক।

“আমি মশাই একজন শিক্ষিত চোর। জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই। দুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজি পড়াতাম। দুপুরবেলা কেউ বাড়ি থাকত না। এই সুযোগে আমি মাড়োয়ারীগিন্নির সহিত আলাপ জামাই। আসলে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। আমার উদ্দেশ্য প্রেম করা ছিল না। এমনি কিছুদিন যাবৎ সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ এক আবদার করি—আপকো যেতনা আচ্ছি আচ্ছি কাপড়া হায়, উস সব পিনকে মেরি সামনে খাঁড়া হো যাও। হাম ইস রূপ আঁখ ভরকে দেখ লেঙ্গে—মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা হ্যায়। আমাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে প্রিয়তমা আমার তৎক্ষণাৎ তার সব চেয়ে ভাল শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে। শুধু তাই নয়, হীরা জহরৎ বসান তার সমুদয় গহনাগুলিও সে গায়ে দেয়। কপালে টিকলি হতে গলার হার এবং হাতের বাজু, চুড়ি প্রভৃতি—মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কারে সে ভূষিত হয়ে উঠে। আমি গদগদ চিত্তে সে রূপ নেহারিয়া মুগ্ধ হয়ে বলে উঠি—হ্যায় হ্যায় হ্যায় কেয়া বলে! ইভো আশমান। দুনিয়ামে কাঁহা বেহস্ত হ্যায় তো উ ইহাই। উত্তরে প্রিয়তমা

আমাকে জানায়, হামি তো তুহরি, জনাব। এর পর আমি তার নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার অজুহাতে একে একে নিজ হস্তে তার সমস্ত গহনাগুলি খুলে একটা রুমালে বেঁধে তা তার ডান পাশে রাখি। তার মুল্যবান কাপড়-চোপড়গুলি রাখি একটা পুঁটলি বেঁধে তার বাম পাশে। এর পর আমি গদগদ চিত্তে অনুরোধ করি, আচ্ছা! আভি আঁখ বুদ। প্রিয়তমা আমার চক্ষু মুদলে আমি আবেগময় ভাবে বলে উঠি—হায় হায়, কেয়া বোলে, ইত্যাদি। এর পর আমি তাকে চক্ষু খুলবার আদেশ জানাই, আঁখ্ খুল। এই অনুরোধ উপরোধটি খেলাচ্ছলেই হতে থাকে। এইভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত ও উন্মুক্ত করে। শেষের বার সে চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র আমি দুই হাতে দুইটি পুঁটলি গ্রহণ করে দাঁত দিয়ে দরজার খিল খুলে একেবারে রাস্তায় পাড়ি দিই। আমি পরে শুনেছি যে চক্ষু খুলবার পুনরাদেশ না পেয়ে প্রিয়তমা নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও বুঝতে পারে যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে গেছে। সে 'চোর চোর' বলে চীৎকার করে উঠে বটে কিন্তু আসল তথ্যটি কারও কাছে প্রকাশ করে না।"

উপরের দৃষ্টান্তটি হতে চৌর্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে বুঝা যাবে। এমন অনেক স্বামী রাত্রিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্য কার্যের জন্যে বাইরের কোনও চোরকে দায়ী করেছেন। এমন কি এইভাবে তিনি থানায় এসে এজাহারও দিয়েছেন। এ ছাড়া এমন অনেক দুর্বৃত্ত কেবলমাত্র তার গহনা চুরি করার জন্যে সালঙ্কারা কন্যার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে। এই সব মেয়েরা তাদের প্ররোচনায় মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও অর্থাদি-সহ এই সব ভাবী স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করে এবং পরে এদের

দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায়-সম্বলহীন ভাবে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ এক দুর্বৃত্তের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহনাপত্রসহ ফুসলে এনে তাকে অমুক ষ্ট্রীটের একটা কামরায় তুলি। এই সময় সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার দেহে পরা ছিল। আমি গদগদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, তুমি যে কত সুন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এত কাছে না পেলে এরূপ কোনদিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজিকার এ মধু যামিনীতে সামান্য ধাতু নির্মিত গহনা তোমার আমার মাঝে কি প্রাচীর তুলবে? আজিকার এই মধু যামিনীতে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এর পর আমার অনুরোধে প্রিয়া আমার তার দেহের সকল গহনাপত্র খুলে রাখে। এর পর গভীর রাত্রে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুঁটলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। বলা বাহুল্য যে আমার নামধাম বা ঠিকানা পদবী সবই তাকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। এর পর মেয়েটির অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে আমি অক্ষম।"

বামাল গ্রাহক

চোরাই মালের গ্রহীতাদের বামাল গ্রাহক, খাউ বা "রিসিভার অব, স্টোলেন্ প্রপারটি" বলা হয়। এই সকল বামাল গ্রাহকগণ নিজেরা কখনও চৌর-কার্যে লিপ্ত থাকে না—অথচ এই সব গ্রাহকরাই লাভ করে বেশি। পাঁচশত টাকার মূল্যের দ্রব্যাদিও এরা মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকায় চোরদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। বিভিন্ন রূপ দ্রব্য বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণ নিয়ে থাকে। সাইকেলের দোকানে সাইকেল, কাপড়ের দোকানে কাপড় এবং সোনার দোকানে সোনা বিক্রয় হয়ে থাকে। এ ছাড়া, এমন অনেক দালাল আছে যারা এই দ্রব্য সামান্য মাত্র মূল্যে ক্রয় করে। কলকাতা শহরে এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছেন, যাঁরা সামান্যমাত্র মূল্যে হাজার টাকার নম্বরী নোট ক্রয় করে থাকেন—এই সব নোট তাঁদের কারবারে প্রায়ই লেন-দেন হয়। এই কারণে ধরা পড়লেও তাঁদের একটা কৈফিয়ৎ থাকে এবং তাঁরা আইন এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এই শহরে এমন অনেক পোদ্দার আছে যারা গহনাদি পাবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহা গলিয়ে ফেলে সোনার বাট তৈরি করে ফেলে; শুধু তাই নয়, পরদিনই এই সোনার বাট তাঁরা অন্যত্র চালান করে দিয়ে থাকেন। এই সব লেন-দেনের ব্যাপার পরিচিত চোরেদের সহিত হলে তাঁরা এ সম্বন্ধে নথি-পত্রে কোন জমা বা খরচ লেখেন না। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হ'তে পেলে পাঁচ টাকা মূল্যে কিনলেও উহা তাঁরা পঞ্চাশ

টাকায় [উচিত মূল্য] কিনেছেন,—তাঁদের জমা বহিতে [কখনও কখনও] তাঁরা এইরূপ লিখে রাখেন। এমন কি ঐ সকল বিক্রেতার একটি সইও তাঁরা ঐ খাতায় নিয়ে থাকেন।

এই সকল পোদ্দাররা সব সময়ই চোরেদের অপেক্ষায় হাপর জ্বালিয়ে বসে থাকেন। আমার মতে এই সকল পোদ্দারদের লাইসেন্স দ্বারা আয়ত্তাধীন করলে অসাধু পোদ্দারগণ এখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। চুরি করে পলানো দ্রব্যের বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটলে চোরেরাও চুরি করবে কম। এই সব লাইসেন্স এদের চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সাধু চরিত্রের পোদ্দারগণেরই প্রাদুর্ভাব হবে। এই সকল পোদ্দারগণের ন্যায় শহরের পুরানো সাইকেলের দোকানগুলিরও লাইসেন্স হওয়া উচিত। এই সকল সাইকেল গ্রাহকগণ চোরাই সাইকেল ক্রয় করা মাত্র উহা ডিস-ম্যাণ্টেল করে [খুলে ফেলে] উহার বিভিন্ন অংশগুলি অন্যান্য সাইকেলের অংশের সহিত বিনিময় করে নেয়। অর্থাৎ এর অংশটি ওর সঙ্গে এবং ওর অংশটি এর সঙ্গে এরা যুক্ত করে দেয়। এর জন্য সাইকেলের মালিক সহজে তার সাইকেলটি চিনে নিতে পারে না। চোরাই সাইকেল এবং টাইপরাইটার প্রভৃতি হতে নম্বরগুলি তুলে ফেলে তৎস্থলে অন্য নম্বর খোদাই করতেও দেখা গেছে। কিন্তু এই সব চালাকি অধুনা যুগে • সকল সময় কার্যকরী হয় না। কারণ খোদাই করার সময় যে চাপ পড়ে সেই চাপ সূক্ষ্মভাবে ধাতু নির্মিত বস্তু মাত্রেরই শেষ স্তর পর্যন্ত [সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে] বিস্তৃত হয়ে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই নম্বর মুছে গেলেও আসলে ঐগুলি আদপে মুছে না। উপরের স্থূল অংশ উখার সাহায্যে উঠিয়ে ফেললেও নিম্নের সূক্ষ্মাংশের বিলোপ ঘটে না। এক রকম কেমিক্যাল

আছে যাহার প্রলেপ ঐ মুছে যাওয়া অংশে নিক্ষেপ করা মাত্র ঐ নম্বর সূক্ষ্মভাবে প্রকট হয়।

বিভিন্ন রূপ চোরাই মালের মধ্যে মূল্যবান মোটরকার একটি অন্যতম সামগ্রী। কিন্তু এই চোরাই মোটরকার কারুর কাছে বিক্রয় করা সম্ভব নয়। এই জন্যে এই সব গ্রাহকগণ মোটরকারগুলি ডিস্‌ম্যাণ্টেল করে উহার বিভিন্ন অংশগুলি বিক্রয় করে অর্থবান হযে থাকেন। এদের কেহ কেহ কলকাতার দ্রব্যাদি বোম্বাই শহরে এবং বোম্বাইয়ের দ্রব্যাদি মাদ্রাজে বা কলকাতায় বিক্রয় করে থাকেন। আজকাল সুবিধা মত নেপাল প্রভৃতি ভিন্ন রাষ্ট্রে এরা পুরা গাড়িটা চালান করে দেয।

এই সকল চোরেরা চোরাই মাল দোকানে পৌঁছবার সময়ও অত্যন্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে। বিশেষ করে রাত্রিকালে এই সাবধানতার প্রয়োজন থাকে। ভারি দ্রব্যাদি হলে ঐ দ্রব্য তারা কোনও এক রিক্সাতে তুলে দেয় এবং নিজে ঐ রিক্সায় দ্রব্যসহ না বসে রিক্সার পিছন পিছন চলতে থাকে। পুলিশ কিংবা অপর কেহ সন্দেহ করে রিক্সা আটকালে এরা পিছন হতে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। রিক্সাচালক বামালসহ ধরা পড়লেও সে আসল চোরের ঠিকানাদি সম্বন্ধে কোনও কিছু জানাতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বামাল রিক্সায় তুলে দিয়ে রিক্সাকে তিন মাইল দূরের কোনও একস্থানে অপেক্ষা করবার জন্তেও নির্দেশ দেওয়া হয়। আসল চোর তখন ট্রামে বা বাসে করে এসে নির্দিষ্ট স্থানে বামাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও রিক্সাওয়ালা বা ঝাঁকা মুটে আদির সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ যোগসাজস্‌ থাকে। কোনও রিক্সায় দ্রব্যাদি যাচ্ছে অথচ দ্রব্যের মালিক রিক্সায় জায়গা থাকা সত্ত্বেও রিক্সায় না

উঠে পায়ে হেঁটে রিক্সার পিছু পিছু চলেছে—এইরূপ কোনও দৃশ্য দৃষ্ট হলে উহা সন্দেহজনক মনে করা উচিত। এ ছাড়া ভোরের দিকে তরি-তরকারির ঝাঁকার মধ্যে চোরাই মাল সরানো হয়ে থাকে। কারণ এই সময় তরকারিওয়ালারা গ্রাম থেকে শহরের বাজারে আসে। সন্দেহ এড়াবার ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ও লোহা-লক্কড়ের দ্রব্যাদি তারা শহরের বিভিন্ন কালোয়ার গ্রাহকদের নিকট ঐ ভাবে বিক্রয় করে থাকে। এই সকল কালোয়ার গ্রাহকদের এক-একটি প্রকাশ্য দোকান ও গুদাম থাকলেও এই সকল বামাল নিরাপদে গুদামজাত করবার জন্যে এরা কতকগুলি গোপন গুদামও রেখে থাকে।

এমন সব বামাল গ্রাহক আছে যারা গবাদি জীব ক্রয় করে অ্যাসিড ও অগ্নির সাহায্যে তাদের বাঁকা শিঙ সোজা এবং সোজা শিঙ বাঁকা করে দিয়ে থাকে; উদ্দেশ্য, সনাক্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা। একটি ক্ষেত্রে চুরি করে আনা নিহত সাদা ছাগলের সাদা চামড়া কালো কালী দ্বারা কালো চামড়া করা হয়েছিল। একবার পাঁটী চুরির মামলাতে ছাগ মাংস উদ্ধারার্থে পুলিশ তল্লাসীতে আসছে শুনে কোনও এক দুর্বৃত্ত তাড়াতাড়ি এক পাঁটার অণ্ডকোষ কিনে মাংসের তপ্ত কড়াতে রেখে প্রমাণ করে যে উহা পাঁটা—পাঁটী নয়। কোনও কোনও বামাল গ্রাহক বস্ত্রাদি চুরি করে ঐ কাপড়গুলিকে ছাপিয়ে নেয়। কখনও বা তারা মাড় লাগিয়ে ঐগুলিকে তাঁতের কাপড়ে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়ে থাকে।

শহরে এমন অনেক ভাঙাইওয়ালা এবং বিক্রিওয়ালা আছে, যারা একমাত্র বামাল গ্রহণ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শহরের বিভিন্ন চোরাবাজার বা চোরাহাট্টার মিশ্র দ্রব্যের

[পুরানো দ্রব্যের] দোকানগুলিও এই সকল চোরাই মাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরানো চোরেরাও বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ দোকানের মালিক হয়ে থাকে। অপর দিকে পুরানো পুস্তকাদি বিক্রয় হয় পুরানো বইএর দোকানে। বাটীর বিপথগামী পুত্রেরাও ঐরূপ পুস্তক বিক্রয় করেছে। বলা বাহুল্য, চুরির পরই এই সব বইএর উপর লিখিত মালিকের নাম ও ঠিকানা মুছে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সকল সময়ই সকল পুরানো দোকানের মালিকরাই যে জেনে-শুনে চোরাই দ্রব্য গ্রহণ করে তা নয়। এদের মধ্যে বহু সৎ ব্যক্তিও আছে। এরা সন্দেহ হওয়া মাত্র এই সকল বিক্রেতাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছে। এই সকল চোরাই দ্রব্যের গ্রহীতাদের কাহাকেও কাহাকেও লোক ঠকাতেও দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের এই সম্পর্কিত বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি চোরাহাট্টার কোনও এক পুরানো দোকানে এসে এক জোড়া বুট জুতা মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। এই জুতা জোড়া ছিল একেবারে আনকোরা নূতন। উহার আসল মূল্য অনুমান মত অন্ততঃ ত্রিশ টাকা হবে। মূল্য পাওয়া মাত্র দোকানদার সযত্নে জুতা দুটি একটা কাগজের মোড়কে পুরে মোড়কটি সুতা দ্বারা ভাল রূপে বেঁধে দেয়। আমি সানন্দ চিত্তে মোড়কটি নিয়ে গৃহে ফিরি। কিন্তু উহা খোলা মাত্র অবাক হয়ে যাই। সেখানে নূতন বুটের বদলে মোড়কটির মধ্যে ছিল এক জোড়া পুরানো ছেঁড়া বুট। হাতসাফাইএর সাহায্যে দোকানদার কখন জুতা বেমালুম বদলে দিয়েছে। এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও আমি টেরই পাই নি। আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত দোকানে ফিরে আসি এবং এ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাই। দোকানদার আমার এই অভিযোগ সরাসরি

অস্বীকার করে বলে উঠে—'এ আপনি বলেন কি বাবু! আমরা কি ওই রকম মানুষ! যাক। গোলমাল করে লাভ নেই। আসুন! আমার কাছে আর এক জোড়া নূতন বুট আছে। ওটা আপনি পাঁচ টাকায় নিয়ে যান। অর্ধেক দরেই ওটা ছেড়ে দিলাম আপনাকে।' আমি ততোধিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখি যে দোকান-দার আমার সেই পূর্বপরিচিত বুট জোড়াটাই বার করছে। এর পর আর আমি বোকা বনি নি। আমি বুট জোড়াটা পরিধান করে আমার পুরানো জুতাটা মোড়কে পুরে বাড়ি ফিরি।" *

এদেশে পর্দা প্রথার সমধিক প্রচলন থাকায় অপরাধীরা বামাল পাচারের জন্যে প্রায়ই নারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে। খানাতল্লাসীর [বাড়িতল্লাসী] সময় আইনানুযায়ী মেয়েদের সসম্মানে এক কক্ষ হ'তে অপর এক কক্ষে সরে যাবার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সুযোগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বামীর নির্দেশে দ্রব্যাদি বোরখা বা শাড়ির ভিতর করে পর্দার অন্তরালে সরিয়ে নেয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সন্দেহের কারণ ঘটলে অপর কোনও এক নারীর সাহায্যে এই সব মেয়েদের দেহতল্লাসী নেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় ঐরূপভাবে দেহতল্লাসী নেবার মত কোনও স্থানীয় নারী অকুস্থলে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠে। এই

[ফলমূল এবং অন্যান্য দ্রব্যের দোকানেও এইরূপ হাত সাফাই-এর মারপ্যাঁচ দেখা যায়। ভাল এক টুকরি আম দেখিয়ে পচা আমের টুকরি গছিয়ে দেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। ডেলিভারি বা সম্প্রদানের কালে সুবিধামত আসল দ্রব্যের বদলে নকল দ্রব্য গছিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।]

সময় নারী-পুলিশের প্রয়োজন অত্যন্ত রূপ উপলব্ধি হয়। আমি এমন অনেক অপরাধীকে জানি যে বোরখাবৃত আপন নারীর দ্বারা বামালাদি অন্যত্র প্রেরণ করত। বোরখার ভিতরে করে জেনানাটি দ্রব্যাদিসহ পথ চলত এবং সে নিজে চলত তার পিছন পিছন—এইরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বামালসহ ধরা পড়ে যায়। পুরুষদের সাহায্যকল্পে কোনও কোনও নারী যৌন-দেশে নোটের বাণ্ডিল এবং কার্তুজাদি লুকিয়ে রেখেছে. এ দেশেতে এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

বামাল গ্রাহকেরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্যে লিপ্ত থাকে না। এরা প্রায়ই বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর গ্রাহকদেরও শহরে অভাব নেই। এরা চোরেদের সহিত পরিচিত থাকলেও কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্যে লিপ্ত হয় না। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল—মৎ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জর্নাল, ১ম খণ্ড— পাগলা হত্যার মামলা দ্রষ্টব্য।

"জ্যোৎস্নায় আলোকে সাঁতারে গঙ্গা পার হয়ে এপারে উঠে দেখি খো-বাবু তার দল-বল সহ ঘাটের পাড়ে জটলা করছে। এই দলে নিহত পাগলাকেও আমি দেখতে পাই। এ সময় এরা পাগলাকে মদ খাওয়াচ্ছিল। আমিও কিছু চোরাই মাল পাবার আশায় তাদের দলে যোগ দিই। এরা পথ চলতে থাকে, আমিও কিছু দূর অগ্রসর হই। এর পর খো-বাবু সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠেন, 'একে আমরা ট্যাপ করব।' আমি বুঝতে পারি এদের চুরির উদ্দেশ্য নয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে এদের দল হতে আমি সরে পড়ি। আমি একজন চোরাই মালের গ্রাহক।

কোনও খুন-খারাপী বা চুরির মধ্যে আমি যাব কেন? বাবু! ও সবে আমাদের বড় ভয়।"

[বারগ্লার, পকেটমার, প্রবঞ্চক ও ডাকাত প্রভৃতির গ্রাহক ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেবলমাত্র প্রচীন গাঁটকাট্টাদের বামাল গ্রাহক নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে গাঁটকাট্টাদের গ্রন্থিচ্ছেদক বলা হয়েছে।]

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় চোরেরা তাদের দ্রব্যাদি তাদের গ্রামেরই জোতদার প্রভৃতিকে বিক্রয় করে। কয়েক ক্ষেত্রে মাতব্বরগণ না আসা পর্যন্ত ঐ চোরেরা মাটিতে অপহৃত দ্রব্য পুতে ঐ স্থানের উপর মাদুর বিছিয়ে সুখে বহুক্ষণ নিদ্রা দেয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত গ্রাম্য মাতব্বরগণ গরুর গাড়ি করে তীর্থযাত্রী বা ব্যবসায়ীর বেশে এদের পিছু পিছু গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করেছে। চৌর অভিযানে বহির্গত এই চোরেরা চুরি করে দ্রব্যাদি পশ্চাদাগত গো-শকট আরোহীদের নিকট পাচার করে দিয়েছে।

রেলওয়ে অপরাধ

স্বল্প দূরের বহু যুবক দল বেঁধে কলকাতাতে বেড়াতে আসে। স্টেশনে এসে তারা শোভাযাত্রার সামিল হয়। এরা শ্লোগান দিতে-দিতে পকেট হতে ঝাণ্ডা বার করে বার হয়ে আসে।

মালগাড়িকে 'বিপথে চালন' তথা ওআগান ডাইভারশন রেলওয়ের অন্যতম অপরাধ। এই মালগাড়ির গন্তব্য স্থল অনুযায়ী তাদের গাত্রে রং দিয়ে এক একটি চিহ্ন অঙ্কিত করা হয়। এর পর এই মাল গাড়ি-গুলি একত্রে কোনও জংশন স্টেশনে এলে উহাদের এক একটি করে সান্টিং দ্বারা আলাদা করে [সর্ট আউট] তাদের প্রত্যেকের গাত্রের আঁকা চিহ্নানুযায়ী এক এক গন্তব্যস্থলে পাঠানোর জন্য এদের এক একটি গুডস্ ট্রেনে সংযুক্ত করা হয়। এই দুর্বৃত্তরা তাদের মনোনীত ওআগানটির গায়ে পূর্ব চিহ্ন উঠিয়ে সেখানে অন্য এক গন্তব্যস্থানের চিহ্ন অঙ্কিত করে। এর ফলে যে ওআগানটির মালদহে বা মেদিনীপুরে যাওয়ার কথা তাকে আসানসোল বা চিৎপুর ইআর্ডে পাঠানো হয়। অপরাধীদের অঙ্কিত ঐ সকল চিহ্নকে ভূয়া চিহ্ন রূপে না বুঝে রেলওয়ে কর্মীরা সরল বিশ্বাসে ঐ রূপ ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এ বিষয়ে উদ্দেশ্য কোন রেলকর্মীর সড় থাকাও অসম্ভব নয়। এই ভাবে পারি এদের চুবিপথে চালান করে তাদের দলের আস্তানার কাছে এরা হতে আমি সকে ঐ ওআগানটিকে রেলকর্তৃপক্ষ বহু কাল খুঁজে বার

করতে পারে না। এই ভাবে সুবিধাজনক স্থানে এনে অপদল ঐ ওআগান ভেঙ্গে উহার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ করে নেয়। এই উদ্দেশ্যে রেল লাইনের দুপার্শ্বে জমি জবর দখল করে এরা কলোনী পর্যন্ত স্থাপন করেছে। ঐ সকল কলোনীতে ডোবা ও পুষ্করিণীতে জলের তলাতে এরা লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি ডুবিয়ে রাখে। এ কার্যে বাধা পেলে ঐ কলোনী হতে শত শত লোক একত্রে মারাত্মক অস্ত্র সহ রেলরক্ষী ও পুলিশের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে আজও পর্যন্ত এদের এই বাসাগুলি ভেঙে দেওযা হয় নি। এই বাসা না ভাঙা পর্যন্ত এদের উৎপাত বন্ধ হবে না। ববং এদের সংখ্যার উত্তরোত্তর বর্ধন ঘটবে।

কয়েকটি ওআগানে এরা খড়ি দিয়ে সাঙ্কেতিক ভাষা লিখে—যথা, 'চলরে চলরে নও জোয়ান।' এই কবিতার পঙক্তি হতে গন্তব্য স্থলে ইহা পৌঁছুলে দস্যুরা বুঝে নেয় যে কোন ওআগানে মূল্যবান দ্রব্য আছে। এরা চলন্ত গাড়িতে উঠতে ও নামতে এবং দ্রুত গতিতে ভাঙাভাঙিতে সদা অভ্যস্ত। এদের উৎপাতে রেল কোম্পানিকে প্রতি বৎসর ক্ষতি পূরণ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীদের বৃথা গচ্ছা দিতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে অসাধু রেলরক্ষী ও পুলিশের সাথে এদের বন্দোবস্ত থাকা অসম্ভব নয়।

প্রায়ই দেখা যায় যে ওআগান ভাঙিয়েদের দ্বারা পরিবৃত স্থানে মালগাড়ি হঠাৎ থামানো হয়। কিংবা উহার গতি মন্থর করা হয়। এর পর ভাঙা-ভাঙির কাজ শেষ হলে উহা চালানো হয়। বহু ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তিন টাকা রোজে ওদের নিয়োগ করেও থাকেন। এমন কি রাস্তার উপর ঐ সব মাল বহনের জন্য গাড়ি বা টেম্পোও মোতায়েন করে রাখা হয়।

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এই অপরাধের দ্বারা অপরাধীরা রেলওয়ে যাত্রীদের এবং রেলওয়ে কোম্পানিকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এই সকল অপকর্ম সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করব। প্রথমে রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের অপকর্ম সম্বন্ধে বলা যাক। এই প্ল্যাট্‌ফর্মে পিকপকেট চোর এবং ঠগীদের বিভিন্ন দল স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী মানুষের দ্রব্য ও অর্থাদি অপহরণ করে। যাত্রীদের নিযুক্ত কুলি হারানো এদেশের একটি সচরাচর ব্যাপার। এ জন্যে যাত্রীদের অসাবধানতা এবং সাশ্রয় প্রীতিই বেশি দায়ী। সস্তার তিন অবস্থা—এ কথা জেনেও এঁরা সস্তায় পাওয়ার জন্যে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেন। এঁরা রেল কোম্পানির নিযুক্ত নম্বরী কুলি নিয়োগে বিরত হন। এদের উভয়ের পারিশ্রমিকের তফাৎ কিন্তু সামান্যই থাকে। প্রায়ই শোনা যায় যে অমুক যাত্রী কুলির মাথায় মাল চাপিযে হাওড়ার পোলের উপর দিয়ে আসছিলেন। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কুলি মহাশয় দ্রব্য সমেত উধাও হয়েছেন। তাকে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সব ক্ষেত্রে যাত্রীরা প্রায়ই রেল কোম্পানির নম্বরী কুলি নিযুক্ত করেন নি। এই সব কুলি ছাড়া পিকপকেট, ঠগী এবং চোরেরাও প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর ভিড় জমায়। প্ল্যাট্‌ফর্মের চুরির একটি বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বলা হ'ল। এ সম্পর্কে জনৈক ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধার এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধা মহিলা। প্ল্যাট্‌ফর্মের ভিড়ে আমি টিকিট কিনতে পারছিলাম না। এমন সময় একজন ভদ্রলোক দয়া করে উপযাচক হয়ে আমার টিকিটখানা কিনে দিতে চাইলেন। আমি এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিই। ভদ্রলোক

টাকা ক'টা গুণে নিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন, বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি আর ফিরলেন না।"

এই বিশেষ অপরাধীকে বিশ্বাসঘাতক না বলে চোর বলা হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে টাকা কয়টি তার নিকট বৃদ্ধা আইনতঃ গচ্ছিত রাখে নি। টাকা কয়টি তার হাতে বৃদ্ধা তুলে দিলেও উহা তার নিজ অধিকারভুক্ত ছিল। এ স্থলে সে এই অর্থের বহনকারী মাত্র।

রেলওয়ে যাত্রীদের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যেও এই প্ল্যাট্‌ফর্ম ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে আমি জনৈক অপরাধীর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের ছয়জনেব মধ্যে পাঁচজনেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিলাম। আমাদের একজন মাত্র টিকিট ক্রয় করেছিলাম। একজন প্রথমে ঐ একখানা টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসি। এর পর সেই ব্যক্তি বাকি পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি প্ল্যাট্‌ফর্মের টিকিট কিনে পুনরায় ভিতরে ঢুকে। আমরা তখন সকলেই ঐ টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসি। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে আমরা একপ্রকার অভিনয় করি। আমাদের মধ্যে যার কাছে একখানি টিকিট আছে, তাকেই সব কয়টি দেখাতে বলি। সে তখন তার হাতের টিকিটটা বার করে ন্যাকা সেজে বলে উঠে, 'বারে! আমি তো একখানি টিকিটই কিনে বাকি টাকা তো আমার কাছেই রয়েছে।' আমরা তখন ভীষণ তার এই বোকামি ও ভুলের জন্য তাকে ধমকাতে শুরু করি। চেকার আমাদের এই সকল কথা বিশ্বাস করে এবং যে ঐ একখানা টিকিট কেনা হয়েছিল, ঐ স্টেশন থেকেই কষে চেকার ভদ্রলোক আমাদের রেহাই দেন।

কোনও স্টেশন থেকে আমাদের এ জন্য ভাড়া বাবদ অধিক মূল্য দিতে হয় না। প্রায়শঃ আমরা আমাদের একজন বাদে বাকি সকলে বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি। অবশিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের চাপরাশী বা চাকর সেজে তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে উঠে বসে। ধরা পড়ার পর আমরা ঐ তথাকথিত চাপ-রাশীকে আমাদেব টিকিট দিতে বলি এবং টিকিট না কেনার জন্যে তাকে ধমকা-ধমকিও করি। ঐ ব্যক্তি তখন টিকিট কিনতে না পারার জন্যে নানা অজুহাত দেখায় এবং আমাদের পাঁচজনের দরুন টিকিট ক্রয়ের জন্যে যে প্রয়োজনীয় টাকা আমবা তাকে দিয়েছিলাম তাব প্রমাণস্বরূপ টাকা কয়টা টিকিট চেকাবের সম্মুখেই সে আমাদের ফেবত দেয়। চেকার ভদ্রলোক তখন আমাদেব কথাতে বিশ্বাস কবে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে পরিদৃষ্ট স্টেশন হতেই তিনি আমাদের ভাড়া চার্জ কবেন। তবে এই ভাবে আমরা কচিৎ কদাচিৎ ধরা পড়ে থাকি। রাত্রিকালে সদাসর্বদাই আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে থাকি। এই সময় সাবা বাত্রি আমরা ভিতব হতে ছিটকানি লাগিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে বাখি। এই ব্যবস্থাতে টিকিট চেকাররা গাড়িতে উঠতে পারে না। কোনও জংশন স্টেশনে এসে স্টেশন কর্মচারীদের আমরা জানাই, 'আমরা প্রিন্স, অব, অমুক এবং তাঁর পার্টি।' এবং বিরক্তির সহিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, 'হাওড়া থেকে কি টেলিগ্রাম পান নি? আমাদের জন্যে কোন্ কামরা রিজার্ভ হয়েছে এক্ষুনি দেখিয়ে দিন।' আমাদের পোশাক ও মুখের চুরোট এবং কথা বলাব ভঙ্গি দেখে স্টেশন স্টাফেব সকলে ভড়কে যায় এবং ক্রটি স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় রিজার্ভ কার্ড লাগিয়ে দেয়—'প্রিন্স, অব, অমুক এণ্ড পার্টি'

এই কথা কটি তাতে লিখে। আমাদের কাছে একেবারে যে কোনও শ্রেণীরই টিকিট নেই, এই বিষয় এদের কারও মনে স্থানও পায় না। এর পর হতে রিজার্ভ কার্ডের লেখা দেখে কোনও টিকিট চেকার আর আমাদের বিরক্ত করে না। এই ভাবে আমরা অতি সহজেই গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।"

বহু বিনা টিকিটের নারী ডেলি প্যাসেঞ্জার আছেন। এঁদের কাউকে আটকালে ঐ যুবতী নারী তরুণ টিকিট কলেক্টরের হাত মুঠি করে ধরে গেয়ে উঠে—আমার হাত ধরে সখা নিয়ে যাও, আমি তো পথ চিনি না। তরুণ টিকিট কলেকটার এতে লজ্জিত হয়ে উঠে তাকে ছেড়ে দেয়।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ রেলওয়ের একটি সাধারণ অপরাধ। বহু যাত্রী টিকিট বাবদ সামান্য অর্থ অসাধু রেলকর্মীর হাতে ঘুষ স্বরূপ গুঁজে দিয়ে থাকেন। বহু স্থলে স্বল্প দূরের যাত্রী হাওড়ায় বা শিয়ালদহে তাদের টিকিট কলেক্ট না করিয়ে সরে পড়েন। পরে ফিরে এসে তাদের পূর্ব স্টেশনের টিকিট বিক্রেতাকে ঐ তারিখেই সামান্য মূল্যে উহা বিক্রয় করেন। ঐ অসাধু টিকিট বিক্রেতা ঐ তারিখেই উহা অন্য যাত্রীর নিকট বিক্রয় করে। এমন অনেক লোক আছেন যিনি নিজে টিকিট কিনলেও তাঁর সঙ্গের জেনানা যাত্রীদের জন্যে টিকিট কিনেন না। তাঁর শিক্ষা মত মেয়েরা ঘোমটার অন্তরাল হতে চেকারদের প্রশ্নের উত্তরে জানান—'পুরুষদের গাড়িতে টিকিট আছে,' এদিকে সারা গাড়ি খুঁজলেও চেকার ভদ্রলোক ঐ তথাকথিত পুরুষটিকে খুঁজে বার করতে পারেন না। এদিকে তাঁর কর্তব্যের গন্তব্য স্থানও এসে যায়। টিকিট কলেক্টারটিও ঝঞ্ঝাট না করে নেমে পড়েন। এ ছাড়া কোনও কোনও রেলওয়ে কর্মচারী পাশ পেয়ে থাকেন। এই পাশে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও

নাবালক পুত্রেরা মাত্র ভ্রমণ করার অধিকারী। কিন্তু এ সত্ত্বেও এঁদের কেহ কেহ বাহিরের মেয়েদের নিযে তাঁদেরই সাজান স্ত্রী পুত্র বলে চালিয়ে ঐ পাশে ভ্রমণ করে থাকেন। কোনও এক রেল কর্মচারী ঐরূপ ভাবে তাঁর এক শ্যালিকাকে আপন স্ত্রী সাজিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মহিলাটি ভদ্রলোককে "জামাইবাবু" বলে সম্বোধন করায় কোনও এক টিকিট চেকার তাঁদের ধরে ফেলেছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে সঙ্গের ছোট ছোট বালকদের "পাশওয়ালা ভদ্রলোকটি" তাদের কে হন?—এই কথা জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা প্রায়ই প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"অমুক আমার সঙ্গে মাত্র তৃতীয় মান পর্যন্ত পড়েছিল। তাব পর সে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যায। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন ট্রেনের এক কামরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। চোস্ত বিলাতি স্যুট পরে সে ফার্স্ট ক্লাসে বসে চুরুট টানছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম সে এখনও চাকুরির চেষ্টায় ঘুরছে। এমন কি সে রেল ভ্রমণের টিকিটও কিনে নি। ঠিক এই সময এক টিকিট চেকারও এসে হাজির হলেন। টিকিট চাওয়া মাত্র বন্ধুবর ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ লঙ ইউ আর হিয়ার? ইয়া!' তার এই চোস্ত ইংরাজি শুনে ও তার জিজ্ঞাসা করবার ভঙ্গিমায় ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করে চেকার ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে—আজ্ঞে, স্যার! আমি এই পুং তিন মাস এখানে আছি।" বন্ধুবর বিরক্তির সহিত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভড়কে উঠলেন, 'ইট ইজ এ উইক আই অ্যাম হিয়ার, এণ্ড ইউ-কামরায় রিজার্ভ ইওর ওন অফিসার,' অর্থাৎ আমি এক সপ্তাহ এখানে ভ হয়ে.] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিজেদের অফিসারদেরও

তুমি চেন না। বলা বাহুল্য, এরপর চেকার ভদ্রলোক অত্যন্তরূপ ভড়কে গিয়ে, 'ইয়েস স্যার, ও নো স্যার এবং সরিই স্যার' ইত্যাদি উক্তি করে ও ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল। আমি বন্ধুবরের সাহস দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর হেসে ফেলে গর্বের সাথে আমাকে বলেছিলেন, বেটা মনে করেছে আমি ওদের নিউলি ট্রানস্‌ফারড কোনও ডি-টি-এস্ বা ঐ রকম একটা কিছু হ'ব আর কি, হে হে হে—"

এমন অনেক ভদ্র ব্যক্তিও আছেন যাঁরা প্রায়ই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। এঁদের কেহ কেহ কম দূরের একটা টিকিট কিনে বেশি দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করেও থাকেন। দৈবক্রমে ধরা পড়লে 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম' কিংবা 'মত পরিবর্তন করেছি ; আরও দূরে যেতে হচ্ছে' বলে, কিংবা 'এ্যাঁ, ঐ স্টেশন ছেড়ে এসেছি,' এই বলে আঁৎকে উঠে বা বুড়বাক সেজে বা ঐরূপ আর কোনওরূপ একটা বাহানা দ্বারা এঁরা মান বা ইজ্জত রক্ষা করে থাকেন। সঙ্গে অবশ্য এঁরা সব সময়ই প্রয়োজনীয় অর্থাদি মজুত রেখে থাকেন। কারণ এঁরা ভালরূপেই বুঝেন যে প্রয়োজনীয় টাকা টিকিট বাবদ প্রদান করলেই রেলওয়ের কানুন অনুসারে তাঁদের আর কোনও বিপদ নেই।

এই বিনা টিকিটে ভ্রমণরূপ অপরাধের অপর আর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল। এইসম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা সেবার এক অভিনব পদ্ধতিতে বিনা টিকিটে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা জন পাঁচেক লোক খাঁকি পোশাক পরে শাস্ত্রী সাজি এবং আমাদের দলের ষষ্ঠ ব্যক্তিকে পলাতক সিপাই সাজিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিজেদের হেপাজতে রাখি, এমন ভাব দেখিয়ে যেন আমাদের পাহারাধীনে তাকে লাহোর

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে চেকার মশাইও এসে টিকিট চাইতে থাকেন। আমাদের মধ্যে যে হাবিলদার সেজেছে সে গম্ভীর ভাবে বলে উঠে—'টিকিট কর্নেল সাহেবকো পাশ হ্যায়। রিজার্ভ কামরামে দেখিয়ে না উধার।' চেকার সাহেব অবশ্য খেঁকরে উঠে হুকুম জানান, 'উ হাম নেহি জানতা, লে আইয়ে টিকিট, মাঙকে।' তাকে উত্তরে আমরা জানিয়ে দিই, 'কেইসেন হোনে সেকথা! হুকুম নেহি হ্যায়। আগামী ভাগে গা, তব?' এর পর আর কারুর কথা চলে না। চেকার মশাই কিছুক্ষণ কর্নেল সাহেবের খোঁজ করেন এবং তার পর গন্তব্য স্থানে এসে পড়লে গাড়ি থেকে নেমে যান।"

ট্রাম এবং বাসেও অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। কণ্ডাক্টার নিকটে এলে আমরা অনেককেই জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতে দেখেছি। আজকালকার ভিড়ের দিনে পা-দানির নিকট জটলা করেও অনেকে টিকিট কেনার দায় হতে এড়িয়ে যান। ভিন্ দেশীয় ছাত্ররা এক অভিনব উপায়ে ট্রাম কোম্পানিকে ঠকিয়ে থাকেন। অবশ্য এই কাজ তাঁরা খেলাচ্ছলেই করে থাকেন। এঁরা দল বেঁধে ধর্মতলাগামী এক ট্রামে উঠে কালীঘাটের টিকিট চান; যেন পথ-ঘাট সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন্। নবাগত বিধায় এইসব জ্ঞান-পাপীদের সকলে বুঝিয়ে দিয়ে বলে—'আরে এ কেয়া কিয়া? এত একদম উল্টা হো যাতা।' এর পর অপ্রস্তুততার ভাব দেখিয়ে এঁরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ে ঐ ভাবেই পশ্চাদগামী এক ট্রামে চড়ে বসেন। এইরূপে দুই বা তিনটি ট্রামে চড়ে তাঁরা বিনা ব্যয়েই তাঁদের গন্তব্য স্থান ধর্মতলাতেই এসে হাজির হন। কখনও কখনও দুই ব্যক্তি বাসে উঠে একজন চার পয়সার টিকিট এবং অপর জন ছয় পয়সার টিকিট কিনেন। এর পর প্রথম ব্যক্তিটি

চার পয়সার টিকিটটি দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে গন্তব্য স্থানে নেমে পড়েন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এই দুইখানি টিকিটের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হন। মাত্র দুই পয়সা [দশ পয়সার টিকিটে] বাঁচাবার জন্যে এইরূপ শঠতার আশ্রয় নেওয়া অতি লজ্জার।

[ওআগান ব্রেকারগণ অধুনা এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এক জনবহুল স্থানে সাবান প্রভৃতি স্বল্প মুল্যের দ্রব্য নীচের ভুমিতে ফেলতে থাকেন। বহু ব্যক্তি ভিড় করে ঐ গুলি কুড়াতে ব্যস্ত থাকে। পরে ওদের নজর এড়িয়ে মূল্যবান দ্রব্য দুর স্থানে এরা নামিয়ে লরিতে তুলে।

এরা অধুনা সশস্ত্র ও দলবদ্ধ হয়ে খুন জখম করতেও অভ্যস্ত। ভয়ে এদের বাধা দেওয়ার চিন্তাও কেহ করে না। ভদ্রজন সব বুঝে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।]

চোর-ডাকাতরাও ট্রেনে ভ্রমণকালে কখনও টিকিট কেনে না। এরা বিনা টিকিটেই ঘুরাফেরা করে এবং সুবিধামত লোক ঠকায় বা চুরি করে। রেলওয়েতে সংঘটিত প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সম্বন্ধে নিয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। এই প্রকার প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ লাহোরের স্টেশনে নেমে আমার সহযাত্রীটি ভীষণভাবে চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে করে আনা দুইটা বাক্সই চুরি হয়ে গেছে। এতে তিনি একবারে কপর্দকহীন হয়েছেন। আমি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই এবং কিছু অর্থ সাহায্যও করতে চাই। কিন্তু আমার নিকট হতে তিনি কোন অর্থাদি গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এর পর তিনি স্বগৃহে [তাঁর পিতার নিকট] টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার জন্যে একটি টেলিগ্রাফ

পাঠিয়ে দেন। আমার ছোট ছেলেই ভদ্রলোকের অনুরোধ মত টেলিগ্রামটা পোস্ট অফিসে গিয়ে 'তার' করে আসে। পরের দিন পাঁচ শত টাকা আমার ঠিকানায় ভদ্রলোকের পিতাঠাকুর টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। এর পর আমাকে সাক্ষী করে পোস্টাল পিওন তাঁকে ঐ অর্থ প্রদান করেন।

এই ঘটনার এক মাস বা দেড়মাস পরে আমার বাড়িতে স্থানীয় পুলিশ তদন্তে আসে। ঐ লোকটা ছিল একজন প্রবঞ্চক অপরাধী; ঐ পথে ট্রেনে ভ্রমণকালে এক ধনী সহযাত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। লাহোরে এসে নিজের ঐ সব কল্পিত দুরবস্থার কথা লিখে সেই লোকটির নামেই তার পিতাকে সাহায্যের জন্যে সে 'তার' করেছিল। যুবকটি বাড়ি ফিরে সকল সমাচার অবগত হয়ে পুলিশে খবর দেয়—পুলিশ এই তদন্ত করবার জন্যে আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন।"

এই ভাবে ঠগীরা সহযাত্রীদের সহিত আলাপ করে প্রথমে তাঁর হাঁড়ির খবর জেনে নেয় এবং তারপর ঐ ভাবে টেলিগ্রাম করে তাদের আত্মীয়স্বজনকে ঠকিয়ে থাকে। এই সব ঠগীদের একজন সনাক্ত না করলে পোস্টাল অথোরিটি তাদের অধিক মুদ্রা প্রদান করতে প্রায়ই অসম্মত হয়। এ বিষয়ে দেরি হলে তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্যে এরা সনাক্ত করবার জন্যে ছলনা দ্বারা শহরে একজন পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ করে নেয়। এ ছাড়া ঐ রূপ এক পদস্থ ব্যক্তির ঠিকানায় অর্থ প্রেরকরাও নিঃসন্দেহে টাকা পাঠিয়ে থাকে। বড় ব্যবসায়ীদের এজেণ্টগণ কার্য-ব্যপদেশে এক শহর হতে অপর আর এক শহরে প্রায়ই যাতায়াত করেন। এই সব এজেণ্টদের সহিত ট্রেনের কামরায় আলাপ করে

ঠগীরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিয়ে এদের হেড অফিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে—এইরূপ কাহিনীও প্রায়ই শুনা যায়।

এইবার রেলওয়ের চুরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কেপমারী ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্তেরা এই সব চোরেদের মধ্যে অন্যতম। এই সব দুর্বৃত্তের ইংরেজি সমেত অনেকগুলি ভাষা জানা থাকে এবং অত্যন্ত রূপ ভদ্রভাবে সহযাত্রীদের সহিত আলাপ জমায়। রাত্রিতে এরা অমায়িকতার সহিত শয়নের জন্তে তাদের বসবার সিট্‌টি সহযাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিম্নে—ভূমিতলে বিছানা করে সময়মত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। এর পর স্বযোগ মত তারা চাদরের একাংশ দিয়ে তাদের দেহের সহিত যাত্রীদের বাক্স প্যাঁটরাগুলিকেও ঢেকে দেয়। এর পর চাদরের অন্তরালে এরা অতি সহজেই বেঞ্চির তলায় রাখা বাক্সগুলি ভেঙে ফেলতে [বা খুলতে] পারে। এই ভাবে বাক্সগুলি হ'তে দ্রব্যাদি বার করে ঐ চাদর দিয়েই সেগুলি জড়িয়ে এরা উঠে বসে এবং পরের স্টপেজেই জল সংগ্রহের জন্তে বা অন্য কোনও আছিলায় নেমে পড়ে অন্য কামরায় এসে দ্রব্যাদি তার অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে রেখে এসে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে।* এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভদ্র-যাত্রীকে এই চুরির জন্তে কেহ সন্দেহও করে না।

---

* এদের কেহ কেহ শক্ত আটা বা লেই দিয়ে ছোটখাটো দ্রব্যাদি বেঞ্চির নীচের কাষ্ঠে এঁটে দিয়ে থাকে। এর ফলে বার হতে অন্য কেউ ঐগুলো খুঁজে পায় না। দ্রব্যের জন্য খোঁজ পড়লে এরা নিজেদের বাক্স প্যাটরা ও দেহ তল্লাসে সম্মতি জানায়।

রেলওয়ে টিকিট ফ্রড্ [জাল] করা রেলওয়ে অপরাধের অন্যতম পদ্ধতি। রেলওয়ে টিকিট জাল করার বিষয় প্রায়ই শুনা গেছে। কিন্তু সরাসরি জাল না করেও অপর আর এক সহজ উপায়েও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীরা একটি দূরের বা লঙ্‌জার্নির পুরানো ও ব্যবহৃত টিকিট জোগাড় করে। নিয়মমত এই সব টিকিটের পিছন দিকেই তারিখ দেওয়া হয়। এর পর অপরাধীরা সেই দিনের তাবিখ দেওয়া অল্প দূরের বা শর্টজার্নির একটি টিকিট ক্রয় করে। এইবার অপরাধীটি উভয় টিকিটই কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে উভয় টিকিটেরই পেছন দিককার তারিখ দেওয়া কাগজ দুইটি উঠিয়ে নেয। এর পর ঐ নূতন টিকিটের তারিখ দেওয়া কাগজটি পুরানো টিকিটের পিছনে সাবধানে লাগিয়ে দেয় এবং এই ভাবে এরা অতি সহজে দূর যাত্রার একটি জাল টিকিট তৈরি করে ফেলে।

উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতিতেও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এমন অনেক রেল স্টেশনে ছাপা টিকিট তো থাকেই না [দূর যাত্রার টিকিট], এমন কি ব্ল্যাঙ্ক টিকিটও সেখানে নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে "N. B. C." লেখা রিশিপ্টের কাগজে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা পেন্সিলে লিখে টিকিট বানান হয়। অপর দিকে কোনও যাত্রী যদি গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে আরও বহুদূর গিয়ে পড়ে তো তার কাছে বাড়তি ভাড়া [excess fare] ও জরিমানা [penal·y] বাবদ অর্থ আদায় করে চেকাররা অনুরূপ একটি রিশিপ্টেই পেন্সিল দিয়ে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা লিখে দেন। তবে শেষোক্ত রিশিপ্টে N. B. C. ['No Blank Caid] লেখা থাকে না। ঐ স্থলে সেখানে লেখা থাকে "Over riding"।

ঠগী দুর্বৃত্তরা এইরূপ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রেল কোম্পানিকে প্রায় ঠকিয়ে থাকে। এরা মাত্র এক স্টেশনের জন্যে টিকিট কিনে দুই তিন স্টেশন ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় এবং তারপর টিকিট চেকারকে নিজেই ডেকে এনে বাড়তি ভাড়া দিয়ে ঐরূপ একটি "Over ride" লেখা রিশিপ্ট সংগ্রহ করে এবং পরে ঐ রিশিপ্টের ওপর হতে Over ride কথাটা উঠিয়ে ঐ স্থলে লিখে নেয় "N. B. C."। এর পর তারা পেন্সিলে লেখা গন্তব্য স্থল ও যাত্রীর সংখ্যাও পরিবর্তন করে দূরের যাত্রার জন্যে একট জাল টিকিট বানিয়ে নিয়ে থাকে। এই ভাবে জাল টিকিট দুর্বৃত্তেরা তৈরি তো করেই, এ ছাড়া এরা জাল রেলওয়ে ওআরেণ্টও তৈরি করে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ এই সব ওআরেণ্ট ব্যবহার করে থাকে। ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিযুক্ত এই ওআরেণ্ট টিকিট ধরে দিবা মাত্র প্রয়োজনীয় টিকিট পাওয়া যায়। কোম্পানি পরে এই সব ওআরেণ্ট সরকার বাহাদুরের হিসাব-নিকাশ অফিসে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেয়। দুর্বৃত্তগণ এই সকল রেলওয়ে ওআরেণ্ট চুরি করে বা জাল করে এই সব ওআরেণ্টের উপর বিভাগীয় অফিসারদের সহিও জাল করে উহার সাহায্যে টিকিট ক্রয় ক'রে ঐ টিকিট ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

কোনও কোনও রেলওয়ের দুর্বৃত্ত জাল টিকিট কলেক্টারও সেজে থাকে। এরা কয়েকটা চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো একটা সাদা বা কাল কোট পরিধান করে। এইরূপ পোশাকের দ্বারা যাত্রীদের বিভ্রান্ত করে তাদের নিকট হতে পরীক্ষার ছলে টিকিটগুলি চেয়ে নেয়। এদের কেহ কেহ এই ভাবে টিকিট সংগ্রহ করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের উদ্দেশ্য থাকে বিনা পয়সায় টিকিট সংগ্রহ

করে নিজেদের যাত্রাপথের বিঘ্ন দূর করা। কখনও কখনও এরা হাতসাফাই-এর সাহায্যে অধিক মূল্যের টিকিটটি সরিয়ে ফেলে যাত্রীকে একটি কম মূল্যের টিকিট ফিরিয়ে দেয় এবং এর পর ভয় দেখিয়ে তার কাছে বাড়তি ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করে রিশিপ্ট না দিয়েই সরে পড়ে। এদের কেহ কেহ যাত্রীদের টিকিট কিনে দিবার অছিলায় অধিক মূল্য নিয়ে একটি কম মূল্যের টিকিট যাত্রীটিকে কিনে দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। এই সকল যাত্রীদের অনেকেই কম মূল্যের টিকিটটাই বেশি মূল্যের টিকিট মনে করে নিঃসন্দেহে রেলে উঠে প্রকৃত চেকারদের হস্তে বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হয়।

রেল এবং ট্রাম কোম্পানি পাশ বা মানথলি টিকিট ইস্যুও করে থাকে। এমন অনেক পরিবারে ছেলেদের নাম যথাক্রমে, জ্যোৎস্না, যামিনী, জ্যোতির্ময়, যোগেন ইত্যাদি। এদের একজন একখানি মাত্র মানথলি টিকিট ক্রয় করে, উহাতে লিখিয়ে নেয় মাত্র "J. Banerjee"। "J" অক্ষরটি উপরোক্ত সকলের নাম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ ছাড়া বাড়ির সকল ভ্রাতাই ব্যানার্জি। এই একখানি মাত্র টিকিটের সাহায্যে বাড়ির সকল ভ্রাতাই ট্রামে ভ্রমণ করে থাকেন—ইহাকে এক প্রকার অপরাধ বলা চলে। একজনের নামের টিকিট অপরজন ব্যবহার করলে কানুন মতে উহাকে অপরাধ বলা হবে। এ'ছাড়া নাম ভাঁড়িয়ে একের মানথ্‌লি টিকিট অপর এক ব্যক্তি কর্তৃকও ব্যবহৃত হয়েছে।

এই জাল টিকিট, চুরি, প্রবঞ্চনা আদি অপরাধ ছাড়া ডাকাতি এবং খুনও রেলওয়ে ভ্রমণকালে হয়ে থাকে। তবে এই সকল অপরাধ, যাকে সাধারণ ভাষায় "মেইল রবারি" আদি বলা হয় তা খুব কমই ঘটে থাকে। রেলওয়ে ডাকাতির য়ুরোপীয় পদ্ধতিটি হয়, এইরূপ : কোনও এক নির্জন স্থান বা জঙ্গল বেছে নিয়ে ডাকাত দলের

অধিকাংশ লোক ওৎ পেতে বসে থাকে। দলের কয়েকজন লোক রেলওয়ের ঐ ট্রেনটিতে উঠে বসে এবং ট্রেনটি ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আসা মাত্র শিকল টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়। ট্রেন থামিবা মাত্র ডাকাতের মূল দলটি ট্রেনে উঠে ড্রাইভার, গার্ড ও যাত্রীদের মারধোর করে মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে থাকে। এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধীও আছে যারা ট্রেনের ছাদে উঠে বসে থাকে। এমন কি, কেহ কেহ নিম্নের ব্যাটারি আঁকড়েও শুয়ে থাকে এবং স্থবিধামত বেরিয়ে এসে কামরায় ঢুকে চুরি ক'রে থাকে। এ ছাড়া রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টে খুন ও রাহাজানির কথাও শুনা গেছে। এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধ আছে যে সকল অপরাধের জন্য অপরাধীর সাজার বদলে সাজা হয় অপরাধীদের পিতামাতার বা অভিভাবকদের। এই সকল অপরাধ কেবলমাত্র অপরিণত বয়স্ক বালকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রেলওয়ে আইনানুসারে বালকগণ যদি রেলগাড়ি লক্ষ্য করে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে তা হলে এ জন্যে বালকদের অভিভাবকদের সাজা পেতে হয়। নিতান্ত বালককৃত অপরাধ আইনমত অপরাধরূপে ধরা হয় না। সেই হেতু এই বিশেষ অপরাধের নিবারণের জন্যে একমাত্র অভিভাবকদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে। যাত্রীদের রক্ষার জন্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেলওয়েতে এক প্রকার প্রবঞ্চনা অপরাধের কথাও প্রায় শুনা যায়। এক স্থান হ'তে অপর আর একস্থানে মাল পাঠালে রেলওয়ে কোম্পানি এ জন্যে একটা রিসিপ্ট দেয়। এই রিসিপ্টে দ্রব্যের নাম, ওজন এবং মূল্য আদি লিখে দেওয়া হয়। গন্তব্য স্থানে দ্রব্য পৌঁছানোর পর এই রিসিপ্ট দেখালে ঐ মাল ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তরা প্রায়ই এই রিসিপ্টের উল্লিখিত দ্রব্যের স্বরূপ, উহার আসল

পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যাগুলি উঠিয়ে ফেলে সেই স্থলে ইচ্ছামত বহুল বর্ধিত পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যা লিখে নেয়। এরপর দুর্বৃত্তরা সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নামে এই রিসিপ্ট খারিজ করে দিয়ে বহু গুণ অর্থ আদায় করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ীটি ঐ রিসিপ্টের সাহায্যে দ্রব্যাদি ডেলিভারি নেবার পূর্বেই বেমালুম সরে পড়ে থাকে।

এই রেলওয়েতে এমন অনেক গৃহস্থ চোরও যাতায়াত করেন। আপন লগেজাদির সহিত এঁরা অপর যাত্রীদেরও দুই একটা লগেজ নামিয়ে নিয়ে থাকেন। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে ত্রুটি স্বীকার করলেই আসল বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এই জন্যে এঁরা ফৌজদারীতে সোপর্দ কমই হয়ে থাকেন। রেলওয়ে হ'তে ছেলে চুরি, মেয়ে চুরিরও নজির আছে। এমন কি বউ চুরিরও। এই সম্বন্ধে একটি হাস্যোদ্দীপক বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমায় বৌকে নিয়ে দেশে আসছিলাম। ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে বড় বড় ঘোমটা দেওয়া আরো কয়েকজন বধূ বসেছিলেন। গন্তব্য স্থানে ট্রেনটি পৌঁছালে মেয়েদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াই। মাত্র এক মিনিট ট্রেনটি ঐ স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই জন্যে আমি অত্যন্তরূপ ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—'ওগো, নেমে এসো। ওগো শীঘ্র নামো।' আমার চেঁচামেচি শুনে আমার আপন স্ত্রী তো সেখানে নেমে এলেনই, এমন কি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও জন দুই তিন বধূ নেমে পড়লেন। ঘোমটার ভিতর থেকে দেখলেনও না যে ঐ সময় কে বা কারা তাঁদের ডাকছে। ও'দের 'ওগোরা' * ঐ ট্রেনে

* এদেশের গ্রাম্য মেয়েরা স্বামীকে এবং স্বামীরা স্ত্রীকে "ওগো" সম্বোধন করে ডেকে থাকে।

[ভিন্ন কামরায়] বসেছিলেন। ওরা প্রায় সকলে আমার ডাকে নেমে এলেন। আসলেন না শুধু যাঁদের সঙ্গে দাদা, কাকা বা বাবা আছেন।"

ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। তবে এই পর্দাবহুল হিন্দুস্থানে ঐরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়। ধরা যাউক কোনও লগেজের উপর ঘোমটাবৃত বধূ বসে আছে। তাড়াহুড়ার মাথায় কোনও কুলির পক্ষে লগেজের সহিত বধূটিকেও লগেজ মনে করে কামরার মধ্যে [প্ল্যাটফর্ম হতে] ছুড়ে ফেলে দেওয়ারও গল্প শুনেছি। এটি গল্প হলেও অত্যধিক পরদা প্রথা ও অজ্ঞতার সুযোগই যে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে এ কথা অতীব সত্য। এ দেশের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এখনও এত বেশি যে মেয়েদের গাড়িতে শুধু "জেনানা" বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজিতে লিখে দিলেই হয় না ; ঐ লেখার সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনানার ছবিও এই দুয়ারের উপর এঁকে দিতে হয়। পুরুষদের পক্ষে ইচ্ছা করে মেয়েদের গাড়িতে উঠে বসাও একটি অপরাধ। এরূপ অপরাধও রেলওয়েতে হামেশা সংঘটিত হ'তে দেখা যায়। ইহা প্রায় জনসাধারণের নিরক্ষরতার কারণেই হয়ে থাকে। অসাবধানতার সহিত ইঞ্জিন চালানো বা ভুল সিগন্যাল দেওয়া এবং তৎজনিত কলিশন দ্বারা বহু লোকের জীবননাশের কারণ হওয়া রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম অপরাধ। এরূপ অসাবধানতা যে কতো গর্হিত তার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোনও কোনও রেল স্টেশনের কর্মচারীরাও বহুবিধ অপকর্ম করে থাকে। বে-আইনী দ্রব্য পাচারের জন্য ঘুষ গ্রহণ এবং স্বয়ংকৃত পার্শেল প্রভৃতি চুরির কথা বাদ দিলেও এদের কারুর কারুর সাহায্যে

মালগাড়ি, পার্শেল ট্রেন প্রভৃতি ভেঙ্গে দ্রব্যাদি অপহরণও করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ড্রাইভারগণ এক নিরালা স্থানে মাল বা যাত্রী গাড়ি থামিয়েছে কিংবা উহার গতি তারা ইচ্ছা করে মন্থর করে দিয়েছে। সেখানে পূর্ব ব্যবস্থামত দলবদ্ধ দুর্দান্ত স্মাগলারগণ উপস্থিত থাকে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তগণ গাড়িতে উঠে তা ভেঙে দ্রব্যাদি এবং বিবিধ ফিটিঙ, অপহরণ করে। পরিবর্তে তারা অসাধু ড্রাইভার ও গার্ডদের প্রতিশ্রুত মত হিস্যা প্রদান করে। আস্কারা পেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে স্মাগলারগণ রেলপথের পাশে নিজেদের কলোনি পর্যন্ত করেছে। এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারগণ সুবিধাজনক স্থানে কয়লাও স্মাগলারদের নিকট নিক্ষেপ করে থাকে।

এই রেলওয়ে অপকর্ম সম্বন্ধে নিম্নে একজন অসাধু রেলওয়ে কর্মচারীব বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি ঐ সময় অমুক রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলাম। যে সকল শহরবাসী [ছোট শহর] আমাদের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করতে পারে বলে আমরা মনে করতাম তাদের কর্মচারীদেবকে ঐ স্টেশনে নামতে দেখলে ছুতায়-নাতায় তার নাম জেনে তার অজ্ঞাতে তাদের নামে আমরা মালপত্রের ওভার চার্জ কিংবা বিনা ভাড়ায় আসার জন্য মিথ্যা করে রিসিপ্ট কেটে রাখতাম। ঐ জন্য কোম্পানিকে দেয় অর্থ অবশ্য তাদের অজ্ঞাতে আমরাই জমা দিয়েছি। এর পর ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের নামে দরখাস্ত করলে আমরা রেকর্ড হতে প্রমাণ করতাম যে এই ভাবে তাদের কর্মচারীদের রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিতে না দেওয়ার জন্য আক্রোশজনিত তারা আমাদের নামে মিথ্যা দরখাস্ত করেছে।"

এ ছাড়া প্যাসেঞ্জারদের নিকট টিকিট না পেলে ঐ টিকিটের

অর্ধেক মূল্য গ্রহণ করে রসিদ না কেটে তা আত্মসাৎও কোনও কোনও টিকিট কালেকটার করে থাকে। শহরের নিকটস্থ স্টেশনের যাত্রীরা কেহ কেহ গন্তব্যস্থানে এসে টিকিটটি কলেক্ট না করিয়ে—ঐ দিনেই পূর্ব স্টেশনে এসে ঐখানকার অসাধু টিকিট-বিক্রেতাকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং ঐ টিকিট-বিক্রেতা উহা অন্য এক যাত্রীকে পূরা মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। যাত্রীবহুল রেলপথে একই তারিখে এইরূপ অপরাধ করা সম্ভব।

ব্যবসায়-অপরাধ

ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ঠকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতারা ব্যবসায়ীদের ঠকায়। একজন ব্যবসায়ী অপর আর একজন ব্যবসায়ীকে ঠকানোর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। বহুক্ষেত্রে ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মীরাও তাদের মনিবদের ঠকিয়ে থাকেন। এদের অনেকে দ্রব্য ক্রয়কালে বিক্রেতাদের সাথে বন্দোবস্ত করে বেশি মূল্যের রসিদ সংগ্রহ করে। এঁদের কেউ কেউ একে ওকে ঘুষ দিতে হয়েছে বলে মনিবদের অর্থ আত্মসাৎ করেন। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা কম ওজনের নকল বা জাল বাটখারার সাহায্যে কেনা-বেচা করেন। কেহ কেহ আসল বাটখারা-গুলি হ'তে আরও কিছু লোহা কুরে বার করে দিয়ে ঐগুলির ওজন কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এই সকল বাটখারার সাহায্যে উচিত মূল্য নিয়ে কম দ্রব্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা অতীব সহজ।

অপরদিকে কোনও কোনও ক্রেতাও ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। এইসব দুর্বৃত্তেরা রাজা বা জমিদার সেজে শহরের কোনও একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন। কিছুদিন নগদ মূল্যে, এমন কি অধিক মূল্যে দ্রব্য কেনার পর একদিন কোনও অজুহাতে তাঁরা বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কিনে বসেন এবং বাড়িতে বিল্ পৌঁছিবার পূর্বেই দ্রব্যাদিসহ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে

যান—এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত এক দোকানদারের একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"মশাই! আমাকে এতে দোষী করে লাভ নেই। আমি কি আর সাধে তাঁদের বিশ্বাস করেছি। আমরা কম মূল্যে কোনও দ্রব্য দিলে তাঁরা চ'টে যেতেন। বেশি মূল্যের দ্রব্য বলে তেনাদের কাছে চালাতে হতো। তাঁরা নিঃসন্দেহে অধিক মূল্যে কম মূল্যের দ্রব্যাদি কিনে নিয়েছেন। আমার ধারণা ছিল যে বোকা পেয়ে আমিই তেনাদের ঠকাচ্ছি। তেনারা যে আমাকে ঠকাবেন এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল।"

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় বাণিজ্যমূলক শহরে [C mmercial City] ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্মের সুযোগ এবং সুবিধা অত্যন্তরূপ অধিক। এ কারণে এই সকল শহরে বা ব্যবসা কেন্দ্রে এইরূপ অপরাধের সংখ্যা অত্যধিক দেখা যায়। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমরা চার বা পাঁচ জনে মিলে প্রথমে একটি ঝুটা, ভুয়া বা নকল [Bogus] ফার্ম খুলে থাকি। আমাদের ব্যবসায় সমবায়ের আমরা একটি উচ্চধ্বন্যাত্মক [high sounding] নামও রাখি, যেমন "ইস্টার্ণ এশিয়ান ফেডারেল কোম্পানি" বা "ইনটার ন্যাশনেল ট্রেডিং ফেডারেশন" ইত্যাদি। আসলে কিন্তু দুই শত বা তিন শত টাকারও ক্যাপিটেল বা মূলধন আমাদের কখনও থাকে নি। আমাদের মধ্যে একজন সাজে ম্যানেজার, একজন সাজে কেশিয়ার, কেহ বা সাজে সরকার। এ ছাড়া বেয়ারা, দরোয়ান ইত্যাদি সাজবার লোকেরও অভাব হয় না। প্রথম প্রথম আমরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং

ম্যানুফ্যাকচারারদের [শিল্পপতিদের] নিকট হতে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকি। এইভাবে আমরা বাজারের আস্থাভাজনও হয়ে উঠি। এর পর আমরা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে শুরু করে দিই এবং ঐ কর্জের টাকা আমরা ক্ষেপে ক্ষেপে শোধও করতে থাকি। ভবিষ্যতে কোনও মামলা হলে উহা দেওয়ানি মামলায় পর্যবসিত করবার জন্যেই আমরা এইরূপ লেনদেনের অভিনয় করে থাকি। এইভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর আমরা ঐগুলি কম মূল্যে বাজারে ছেড়ে দিই। মূল্য কম থাকার জন্যে ঐগুলি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়ে যায়। এমন অনেক অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকল সমাচার অবগত থেকেও আমাদের নিকট হতে কম মূল্যে এই সব দ্রব্য কিনে নিয়ে থাকে। এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আমরা আরও বড় বড় কারবারীর সহিত কারবারে লিপ্ত হয়ে অনুরূপ ভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি এবং ঐগুলিকে কম মূল্যে [under sale] বাজারেও ছেড়ে দিই। এইভাবে বাজারে আমাদের কর্জের পরিমাণ অত্যধিক রূপ বেড়ে গেলে আমরা হঠাৎ একদিন অফিস বন্ধ করে পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম সরে পড়ি।"

[এইরূপভাবে দ্রব্য গ্রহণ চোরাই বামাল গ্রহণেরই সামিল। এইজন্যে এদের চোরাই মালের গ্রাহক বলে চালান দেওয়াও সম্ভব। এতদ্বারা এই ধরনের অপকর্মের বন্ধ হওয়ারও আশা থাকে।]

এই সকল অপকর্মের দ্বারা অপরাধীরা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যবসায়ীদেরই ঠকায় তা নয়। সমষ্টিগতভাবে "কম মূল্যে দ্রব্যাদি ছেড়ে" তারা বাজারেরও ক্ষতি করে থাকে। এইরূপ আণ্ডার সেলের বহর দেখে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে

দোকান বন্ধ করাও অসম্ভব নয়। এই সকল ছোট দোকানদাররা এই সময় দরের সমতা রাখবার জন্যে লোকসান দিয়েও 'আণ্ডার সেল' করতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হ'লে তাদের জানা চেনা খদ্দেররা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সকল ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যবসায় সমবায় [শুরু হতেই] যে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা নয়। প্রথমে এদের কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে সৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবসায় নামে। কিন্তু পরে অকৃতকার্য হওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে প্রতারণার পথে অগ্রসর হয়; এজন্য ক্যাপিট্যালিস্ট [পুঁজিবাদী] ও বড় বড় ব্যবসায়ীরাও কতকাংশে দায়ী থাকেন। এঁরা ওই সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও সাহায্য করা তো দূরে থাক প্রায়ই এঁরা এঁদের নানারূপে এক্সপ্লয়েটেড্ করে থাকেন—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সমবায়ের অকৃতকার্যতার ইহাই সর্বপ্রধান কারণ। এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ এই ভাবে প্রতারণার দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ী অল্প সময়ের জন্যে "আণ্ডার সেল্" করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধও করে দিয়ে থাকে। সমধিক মূলধনের অভাবে লক্ষ-পতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থকাম হয়ে এই সকল ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। লেন-দেনের ক্ষেত্রে হুণ্ডি ও কিস্তিদারী প্রথার উন্নয়ন দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা নিবারণ করে এই উভয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে এই ধরনের অপরাধ বহুলাংশে কমে যেতে পারে।

আদালতে এই সকল অপরাধীদের অভিযুক্ত করার অনেক

অসুবিধাও দেখা যায়। এরা লেনদেনের বহু কাগজপত্র আদালতে দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই দেওয়ানী ব্যাপার। হঠাৎ ব্যবসা পড়ে যাওয়ার জন্যেই এরা দেনদারদের দেনা মেটাতে পারে নি ইত্যাদি। কিন্তু সুযোগ্য ভারতীয় পুলিশের চেষ্টায় এদের এই সকল প্রচেষ্টা সকল সময়ই ব্যর্থ হতে পারে।

আজকালকার কণ্ট্রোলের যুগে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে নানারূপ প্রবঞ্চনামূলক রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ব্যবসায়ী মাত্রেই কাপড় কন্‌ট্রোল দরে বিক্রয় করতে বাধ্য, কিন্তু কোনও দরজী যদি কাপড় উচিত মূল্যে [কন্‌ট্রোল দরে] ১০৲ টাকা চার্জ করে, মেকিং [কাট ছ‍াঁট] চার্জ ৭০৲ টাকা ধরে সুট বানিয়ে লোক ঠকায় তা হলে আইনানুসারে সে দণ্ডনীয় নয়। আইনের এই সকল ফাঁকির সাহায্যে সহজেই লোক ঠকানো চলে। উচিত [কন্‌ট্রোল] মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহা পাঠানোর জন্যে নৌকা, গাড়ি বা মুটে বাবদ অধিক মূল্য গ্রহণ করে পুষিয়ে নেওয়ার মনোবৃত্তিও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা গেছে।

এইবার বড় বড় শহরের ব্যবসাক্ষেত্রে কি ভাবে মানুষের মন বিভ্রান্ত করে সময় সময় প্রবঞ্চনা কার্য এই সকল "আইনের ফাঁকি"র সাহায্যে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"ধরুন কোনও এক কোটীপতি ব্যবসায়ী কোনও এক ফ্যাক্টরির বা কোনও এক ব্যবসা-সমবায়ের সমুদয় শেয়ার বা অংশগুলি কিনে নিতে মনস্থ করলেন। এই জন্যে এঁরা একটি বিশেষ ফাঁদের সৃষ্টি ক'রে থাকেন। প্রথমে তিনি উচিত মূল্যে কিংবা চড়া দরে স্বয়ং

বা লোকমারফৎ ঐ কোম্পানির অনেকগুলি শেয়ার বা অংশ কিনে নেন। এর পর ঐ শেয়ারগুলি কিছুদিন পর্যন্ত ধ'রে রেখে হঠাৎ একদিন ঐগুলিকে আধা বা সিকি দরে বিক্রয় করে দিতে শুরু করেন। এইভাবে ভাল ভাল শেয়ারগুলি কম দরে বিক্রয় হ'তে দেখে ঐ কোম্পানির অন্যান্য অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডাররা অত্যন্তরূপ ভীত হয়ে উঠেন। তাঁদের নিশ্চিতরূপ ধারণা হয় যে, ঐ কোম্পানি বা ফ্যাক্টরির শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে এবং ঐগুলি লালবাতি জ্বালালো ব'লে। তা না'হলে অমুক লোকের মত ব্যক্তিও অত কম দরে শেয়ারগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই উনি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জেনেছেন যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি ফেল হ'তে চলেছে। এইরূপ বিশ্বাস হওয়ামাত্র উহার সকল অংশীদারগণই ভীত হয়ে স্ব স্ব অংশগুলি কম মূল্যেও বিক্রয় করতে থাকেন। এদিকে ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীটিও দালাল ও এজেন্ট মারফৎ বেনামীতে ঐ শেয়ার বা অংশগুলি সুবিধাদরে কিনে নিতে থাকেন—এইভাবে ক্রোড়পতি ভদ্রলোকটি ঐ ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ক'রে একাই উহার মালিক হয়ে বসেন।"

টাকা খরচ করলে হয় না, এমন কোনও কথা নেই। এমন কি ছোট-খাটো একটা রাজ্যের গভর্নমেন্ট টাকা খরচ করে 'ফেল' করে দেওয়া যায়। উপরের উল্লিখিত ঘটনাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রেল স্টেশন প্রভৃতিতে বহু দোকানী চলতি পথের যাত্রীদের বেশি মূল্যে নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করেন। কারণ এঁরা জানেন ঐ ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে আর একটিবারও ঐ স্থানে পুনরাগমনের সম্ভাবনা নেই।

এইরূপ আরও বহু ঘটনার বিষয় এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

কোনও কোনও ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রতারিত করতে বাধ্যও হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা নিজেরাই এজন্যে দায়ী। এ সম্বন্ধে কোনও বিক্রেতার একটি বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম।

"আমি এ ক্ষেত্রে আর কি করব মশাই! ভদ্রলোক এসে বেশি দামের চাউল কিনতে চাইলেন। আমার দোকানে সর্বাধিক মূল্যের চাউল ছিল দশ টাকা মণ মূল্যের। আমি প্রথমে তাঁকে আট টাকা মণের চাউল দেখালে তিনি এতে বিরক্ত হয়ে বেশি দামের কি চাউল আছে তা জানতে চাইলেন; আমার দোকানের দশ টাকা মণের চাউলও তাঁর মনঃপূত হ'ল না। এদিকে খদ্দেরটিকে হাতছাড়া করতেও আমার মন চায় না। আমি তখন অন্য আর এক বস্তা হ'তে আট টাকা মণের "একই চাউল" বার করে এনে তাঁকে জানালাম, 'এই আমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম চাউল যার মণকরা মূল্য আঠার টাকা।' খদ্দেরটি তখন খুশি হযে ঐ চাউল৹ মণ প্রতি দশ টাকা বেশি দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন।"

বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্যে এই সম্বন্ধে অপর দুইটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি মশাই এক দেশীয় কবিরাজ। কোনও এক মহারাণীর চিকিৎসার জন্যে আহূত হয়ে তেনাদের দশ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠাই। এত কম মূল্যের ঔষধের কারণে তাঁরা আমার চিকিৎসার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।* এই খবর পাওয়া মাত্র আমি ত্রুটি স্বীকার করে

---

* 'কি? আমার চাকরের এবং আমার ঔষধের মূল্য হবে একই?'—এইরূপ এক উক্তি অপর আর এক ধনী ব্যক্তি করেছিলেন।

তাঁদের ২৪৫৲ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠিয়ে দিই এবং ভুল ক'রে একজন সাধারণ লোকের ঔষধ পাঠানোর জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আসি।"

এই ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল। এইরূপ পাপ আজ সমাজ দেহে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এই পাপের কোনও প্রতিকার নেই।

"আমি মশাই একজন কনট্রাকটার। কোনও এক জমিদার আমাকে একটি বাটী নির্মাণের কনট্রাক্ট দেন। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে বাড়িটি আমাকে নির্মাণ করে দিতে হবে। ওদিকে ওঁর ম্যানেজার আমার কাছ হ'তে কুড়ি হাজার টাকার "কমিশন" চেয়ে বসলেন। তাঁর সাফ কথা এই যে তা না হ'লে অন্য একজন ব্যক্তি ঐ শর্তেই কাজটা পেয়ে যাবে। অবস্থা যখন এইরূপ তখন গত্যন্তর না থাকায় আমি ঐ প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যাই। কিন্তু ঐ টাকাটা ম্যানেজারকে ঘুষ স্বরূপ দিলে আমার লোকসান হয়। সত্যই তো লোকসান দিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে পারি না। আমি তখন বাজে বা কম মূল্যের মাল-মসলা দিয়ে ঐ বাড়ির নির্মাণ কার্য শেষ করি। ঘুষের টাকাটা মালিককে ঐভাবে না ঠকালে তো তা উশুল হবে না। এই ভাবেই আমাদের তা উশুল ক'রে নিতে হয়। ঐ টাকা ঘর থেকে আমরা কখনও দিই না। এরপর যদি বাড়িটা প'ড়ে যায় এবং তজ্জনিত যদি জীবনহানি ঘটে তো তার জন্যে দায়ী ঐ জমিদারের ম্যানেজার। কারণ উনি আমাকে এইরূপ অপকার্য করতে বাধ্য করেছেন।"

এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা খদ্দেরকে প্রথমে একটি বা দুইটি জিনিস খুব সস্তাতেই দিয়ে থাকেন। এতে ক'রে খদ্দেরের ধারণা হয় ঐ দোকানের দ্রব্যাদি অন্য দোকানের তুলনায় সস্তায় পাওয়া

যায়। এই সুযোগে খদ্দেরটিকে দুই একটি জিনিস সস্তায় দিয়ে অন্য বহু দ্রব্যাদি অত্যন্ত রূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে থাকেন। ইহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় "ট্রেড্ সিক্রেট্" বা গুপ্ত তথ্য। কিন্তু আসলে এইগুলি প্রবঞ্চনারই সামিল।

এমন বহু প্রতারক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দোকানদারদেরও ঠকিয়ে থাকে। এরা কোনও জনবহুল স্থানে একটা বড় বাড়ি ভাড়া ক'রে নিজেদের কোনও নামকরা পরিবার রাজবংশের নামে পরিচয় দিযে থাকে। এরপর কোনও স্থানীয় দোকানদারকে বেছে নিয়ে তার দোকান থেকে নগদে ও ধারে দ্রব্যাদি কিনতে শুরু করে দেয়। এইভাবে ঋণ-পরিশোধের দ্বারা এদের উপব দোকানদারের বিশ্বাস এলে এরা একসঙ্গে ঐরূপ বহু দোকান হ'তে বহু দ্রব্যাদি ধারে সংগ্রহ ক'রে ঐ সকল মুল্যবান দ্রব্যাদিসহ হঠাৎ একদিন অকুস্থল ত্যাগ ক'রে বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, ফার্নিচারওয়ালা প্রভৃতি এমনি আরও অনেকানেক ব্যবসায়ীকে পথে বসিয়ে সরে প'ড়ে থাকে।

কলিকাতা শহরে এমন অনেক অপরাধী আছেন, যাঁরা প্রায়ই ইন্স্টলমেণ্টে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিনে থাকেন। এ'রা এই সকল দ্রব্যের মূল্য বাবদ মাত্র একটি বা দুইটি ইন্স্টলমেণ্টের অর্থ প্রদান করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এ'রা এতটুকুও না ক'রে ঐ সকল দ্রব্যাদি অপর কাউকে বিক্রয় ক'রে দিয়ে যথারীতি সরে পড়ে থাকেন। এছাড়া জাল ইন্সিওরেন্স এজেণ্টের ভূমিকায় অভিনয় করেও অনেক দুর্বৃত্ত শহরে অর্থ অপহরণ ক'রে থাকেন। জাল ঘটক বা জাল দালাল সেজেও অর্থ অপহরণ করা এ শহরে সম্ভব হয়েছে। অধুনাকালে "বাড়ি ভাড়া করে দেব" এই স্তোকবাক্যে ভুলিয়েও

কেহ কেহ "অগ্রিম ভাড়া" বা পারিতোষিক বাবদ অর্থাদি নিয়েও লোক ঠকিয়ে থাকেন।

এই শহরে এমন কয়েকটি চায়ের দোকানী আছে, যারা চায়ের জলে অহিফেন ধোয়া জল মিশিয়ে খদ্দেরকে খেতে দেয়। এর ফলে নেশার কারণে খরিদ্দারগণ প্রতিবারেই তাদেরই দোকানে এসে চা'পান করে।

ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যতম অপরাধ হচ্ছে খাদ্য প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান। প্রকৃতপক্ষে এদের খুনীর চেয়েও অপরাধী বলা যায়। কারণ, এরা মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বও হত্যা করে। এই সকল লোভী ব্যক্তিরা সমগ্র জাতিকে বংশানুক্রমে অখাদ্য খাইয়ে পঙ্গু করে তুলে। অপরাধ সম্পর্কীয় পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় এই সকল অপরাধীদের বাদ দেওয়া হয়। অথচ একই অপরাধ স্পৃহা সাধারণ চোর-ডাকাতদের ন্যায় এই ভেজালকারী ও কালোবাজারীদেরও পরিচালিত করে।* নিম্নে এই ভেজাল সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা হ'ল।

সাধারণতঃ আটা প্রভৃতিতে শ্বেত পাথর গুঁড়া, চায়ের পাতার সহিত চামড়ার গুঁড়া ও ধূলাকুটা, সরিষার তেলে নিম্নশ্রেণীর তেল, শিয়াল কাঁটা, নানারূপ বিচির তৈলাক্ত রস, মোটরের পেট্রোলের সহিত কেরোসিন তেল, ঘৃতের সহিত অনুরূপ গন্ধ সহকারে মোম, ডালদা প্রভৃতি, বিলাতি মাটি বা সিমেন্টের সহিত গঙ্গামৃত্তিকা, রৌপ্য ও স্বর্ণে খাদ এবং দুধের সহিত ময়দা গোলা, বিলাতী পচা দুধ ও

---

* বিদেশী কোম্পানির মালিকরা বহুদূরে থাকায় তাদের পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্য সস্তায় জাল করা সহজ। এর সাথে সাথে দেশী দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে শহরে নকল করা হয়ে থাকে।

জল মিশানো হয়ে থাকে। শুখনা মোটর দানাকে টাটকা ও কাঁচা বুঝাবার জন্যে উহাদের সবুজ রঙ করে বিক্রয় করা হয়। যে কোনও খাদ্যের গন্ধানুযায়ী গন্ধ সমূহ বাজারে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। এই গন্ধ যুক্ত ঘৃত প্রভৃতি গব্য ঘৃত বলে চালানো হয়। যে কোনও খাদ্যের অনুরূপ গন্ধ ভেজালকৃত খাদ্যে সংযোজনা করা সম্ভব। ঔষধে ভেজাল প্রদান করেও এরা বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। সাধারণতঃ ঔষধের লেবেল দেওয়া শিশি বোতল সংগ্রহ করে উহাতে জাল ঔষধসমূহ এরা ভর্তি করে থাকে। পচা মৎস্যসমূহ বরফ সহযোগে কঠিন করে উহাদের কানকোতে লাল রঙ প্রবেশ করিয়ে এরা খরিদ্দারদের বুঝায় যে ঐ রক্তাক্ত মৎসগুলি অতীব টাটকা। দুই এক ক্ষেত্রে মাছের পেটে নেকড়া ভরে এরা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে উহা ডিমে ভরা। 'খয়ের' পর্যন্ত এরা মৃত্তিকা মিশ্রিত করে তা বাজারে চালায়। এমন কি প্রসাধন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও এরা ভেজাল দেয়। এর ফলে সুগন্ধি তেল মেখে অনেকের মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং সাবান আদি মেখে অনেকের চর্মরোগের সৃষ্টি হয়েছে। শহরে বিলাতী লেখার কালি এবং অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের সাথে সাথে সোডা লেমোনেড প্রভৃতি ও সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য তৈরি ছানাতেও ভেজাল দেওয়া হয়। এই ভেজাল আধিক্যের যুগে মানুষ ভেজালের কারণে ধী-শক্তি হারায় এবং রুগ্ন ও দুর্বল হয়।

আলু, ডিম, মাছ, ডাল, মাংস, চাউল প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্য জাল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তা হলেও কাঁকর মিশান চাউল হতে অব্যাহতি নেই। পাথর কুঁচি গুঁড়োর সাথে গমের দানা গুঁড়ানো হয়। তার পর পচা আলু, ঘি প্রভৃতি ও মিশ্রিত ছাগ ও মেষ মাংস

বিক্রয় করে ভেজালকারীরা প্রতিশোধ নেয়। আরও পুরানো কাপড় রঙ দিয়ে ছাপিয়ে তারা উহা নূতন শাড়ি রূপে বাজারে চালিয়ে দি'ছে।

এমন বলা যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতারণার গতি পৃথিবীতে আজ অব্যাহত। এমন অনেক জুয়েলারি দোকানী আছে যারা প্রচুর খাদ-মিশান গহনা বিক্রয় করে ক্রেতাদের বিজ্ঞাপন দ্বারা জানায় যে, তারা ইচ্ছা করলে ঐ গহনা একই দরে এক বৎসরের মধ্যে তাদের নিকটই বিক্রয় করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ভাবে তাদের তৈরি গহনা তাদেরই দোকানে ফিরে এলে তাদের লোকসান তো হয়ই না বরং এতদ্বারা তাদের ঐরূপ প্রতারণা ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এই ভেজাল প্রভৃতি অপরাধের ব্যাপকতার কারণে উহা মানুষের এমনই গা' সওয়া হয়ে গিয়েছে যে, তারা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো করেই না, বরং তারা মনে করে ইহা বুঝি বা এই সংসারের এক স্বাভাবিক পরিণতি। এই জন্য গয়লা দুধে জল মিশালে তারা মনে করে যে, উহাতে বিশুদ্ধ জল দিয়েছে ত'? অন্য দিকে খাদ্যাদির ভেজাল সম্পর্কে তারা মাত্র ভেজালের পরিমাণের কথাই ভাবে।

[ব্যবসায়ীরা যাদের কাছ হতে দ্রব্য কেনে এবং যাদের কাছে তা তারা বিক্রয় করে, এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিকট দাঁও মারার মনোবৃত্তি নিয়ে তারা কার্যে নামে। এই কারণে বড় বড় শহরে যেখানে অতিমাত্রায় ব্যবসায় চলে সেখানে অপরাধ-প্রবণতারও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।]

এই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বা সমর্থনে বা প্ররোচনায় বহু

দুর্দান্ত আনুষঙ্গিক অপদলেরও সৃষ্টি হয়েছে। এরা বিবিধ আইনগত বিধিনিষেধ অমান্য করে, নিষিদ্ধ পণ্যাদি অবৈধভাবে এক জিলা হতে অপর জিলায়, এক প্রদেশ হতে অপর প্রদেশে এবং অন্য রাষ্ট্রে চালান করে থাকে। এজন্য এরা খুনখারাপি এবং সৈন্য ও পুলিশের সহিত সংঘাত করতেও পিছপাও হয় নি। এইভাবে তারা ব্যাপক অপরাধের সৃষ্টি তো করেছেই, এমন কি সেই সঙ্গে বহু অপরাধী পরিবার ও অপরাধী-কলোনীরও সৃষ্টি করেছে। এই সকল অপরাধিগণ বড় বড় শহরের চতুর্দিক ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গ সহ বসবাস করে।

এই সকল কারণে বড় বড় শহর হতে যারা যত দূরে বাস করে তাদের তত কম দ্রব্য সম্ভূত স্পৃহা দেখা যায়। এই সকল শহর হতে বহু দূরে যারা বাস করে তাদের মধ্যে মারপিঠ আদি শোণিতসম্ভূত অপস্পৃহা দেখা গেলেও চুরি-চামারি আদি দ্রব্যসম্ভূত অপস্পৃহা তুলনায় বহু কম দেখা গিয়েছে।

[মোটর মেরামত প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যবসায়ে লোক ঠকানোর সুযোগ অত্যধিক। এখানে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সত্য মিথ্যা বহু অবান্তর বলে এটা ওটা কেনার জন্যে অর্থ আদায় করা হয়। এ সম্বন্ধে প্রফেশনাল্ ক্রাইম প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।]

বহু শিল্প মালিক ইচ্ছা করে খেলো ও নিম্ন মানের দ্রব্য তৈরি করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মোটর গাড়ি শিল্পের বিষয় বলা যায়। শক্ত মোটর গাড়ি কিংবা বিদ্যুৎ পাখা তৈরি করলে ঐগুলি বহু বৎসর টেকে। ফলে ওদের বাৎসরিক বিক্রয় সংখ্যা কমে যায়। এরা জানে ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিত্তবানদের কিনতেই হবে। বিদেশী দ্রব্য আমদানী বন্ধের পর এ বিষয়ে দেশীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের

স্বর্ণ সুযোগ। এরা নিজেদের মধ্যে এ'বিষয়ে পরামর্শ করে ক্ষণ-ভঙ্গুর দ্রব্য তৈরি করে করে ক্রেতাদের ক্ষতি করে। ফলে একটা মোটর গাড়ি ভাঙলে সে অন্য গাড়ি কিনতে অপারক হয়েছে। একাধিক ব্যক্তির একই দুরবস্থা দেখে ক্রয়েচ্ছু অন্য ব্যক্তি বৃথা টাকা নষ্ট করে না। এদের অনেকে পুরানো বিলাতি গাড়ি কিনতে উন্মুখ হয। ফলে, বিদেশ হতে দ্রব্যাদি আমদানী করতে দেওয়া হলে কেউ একটিও স্বদেশে তৈরি দ্রব্য ক্রয় করবে না। এক-মাত্র ফ্রি কম্পিটিশনে ভালো দ্রব্য এদেশে তৈরি হতে পারে। অন্যথায় এ' বিষয়ে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

নিম্নমানের ও ভেজাল দ্রব্য বিদেশে চালান দিয়ে এঁরা স্বদেশের বিদেশী মার্কেট নষ্ট করেন। ফলে অন্যদের ভালো দ্রব্যও কেউ সেখানে কিনতে চান নি। আমি নিজে মেহেদী পাতা গুঁড়োর সঙ্গে বালি মিশিয়ে ঐ মাল বিদেশে চালান দিতে দেখেছি। এই বদনামের জন্য বিদেশে বহু দ্রব্যের বাজার আমরা হারিয়েছি। রাজ-সরকারের বিদেশে রপ্তানী মালগুলো ভালো রূপে পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সংখ্যাতে কিছু বিদেশী দ্রব্য আমদানী হতে দিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হলো।

"অমুক জুট মিলে আমি খুউব কম মূল্যে যন্ত্রাংশ সাপ্লাই করতে থাকি। এত কম মুল্যে বিক্রয় করলে দ্রব্য তৈরির পড়তা পোষায় না। অন্য সকলে এতে অবাক হয়ে যায়। আমি কিন্তু ঐ মিল হতে চুরি করে আনা দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে খরিদ করে ঐ মিলেতেই তা লাভে সাপ্লাই করেছি।"

গুদামে আগুন লাগিয়ে ইনসিওর কোম্পানি হতে অর্থ আদায়ও

করা হয়ে' থাকে। তার পূর্বে অধিকাংশ দ্রব্য অন্যত্র পাচার করা হয়েছে।

ইনকাম ট্যাক্স বৈধ এবং অবৈধ ভাবে ফাঁকি দেওয়া ব্যবসায়ীদের অন্যতম অপরাধ। বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয় হলে ৮৫ হাজার টাকা এদেরকে সরকারকে দিতে হয়। এই ক্ষতি তারা অন্য রূপে পুষিয়ে নেয়। এ জন্য ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়ির দ্বারবান ও ভৃত্যদের ফ্যাকটরির কর্মীরূপে দেখান। কোম্পানি হতে তাদের বেতন দেওয়া হয়। এমন কি নিজেদের ব্যবহৃত বাগান-বাড়িকে গেস্ট হাউস এবং তীর্থ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নির্মিত নিজ বাটীগুলিকে রেস্ট্ হাউস রূপে দেখানো হয়। ঐ বাবদে দেয় ট্যাক্স ও মেরামতি খরচ কোম্পানি দিয়ে থাকে। মালিকরা তাদের মোটর গাড়িগুলিকে কোম্পানির নামে রেজিস্টারি করেন এবং ড্রাইভারদের বেতনও কোম্পানি দিয়ে থাকে। দেশ বিদেশে ভ্রমণ বাবদ অর্থ ব্যবসায় সংক্রান্ত টুরের [Tour] ব্যাপার বলা হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র আহার ও বসন-ভূষণ খরচ ব্যতিরেকে এঁদের অন্য খরচ নেই। এঁদের চিকিৎসা পর্যন্ত কোম্পানির ডাক্তাররা করে থাকে। এঁরা বহু আত্মীয়-স্বজনকেও অধিক বেতনে পুষেন। এই খরচ ইনকামট্যাক্স হতে বাদ যাওয়াতে এঁদের এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। এঁরা বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে উহা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। ইনফ্লেটেড্ খরচ দেখিয়ে ইনকাম-ট্যাক্স হতে রিবেট্ পান। অধিকন্তু এঁরা সরকারী গ্রাণ্টও আদায় করে থাকেন। এই বাবদ এঁদের বাড়তি আয় হওয়াও সম্ভব। কারণ—হিসাব পত্র এঁদেরই হেপাজতে থাকে। উপরন্তু ডিরেক্টর রূপে মোটা বেতনও এঁরা গ্রহণ করেন। পিতা ভ্রাতা পৌত্র—সাবালক

হওয়া মাত্র ডিরেক্টর হন। এমন কি এঁদের বধুরা কার্য না করেও অফিস হতে মোটা বেতন নেন। এঁদের ট্রাস্টেড্ ম্যানেজাররা ঐ বিষযে এঁদেরকে সাহায্য করেন।*

উৎকোচ প্রদান এঁদের অন্যতম অপরাধ। এই ভাবে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এঁরা রাজকীয় কর্মকৃত্যের সৎ অফিসারগণকে প্রলুব্ধ করে অসৎ করে তুলেন। বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য পাপাচার বন্ধ হবে। এঁদের অন্য আয়ের সোর্স দেখানোর জন্য এঁরা কৃষিকার্য না করেও এঁরা বহু কৃষি জমি ক্রয় করে রাখেন—কারণ কৃষির ইনকামট্যাক্স সাধারণ ইনকামট্যাক্সের মধ্যে পড়ে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সামান্য অর্থলাভের আশায় স্বদেশকে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। এমন কি স্মাগলড্ বারুদও সমাজ বিরোধীদের নিকট এদের বিক্রয় করতে বাধেনি। এরূপ ক্ষেত্রে ছোট-বড় সব ব্যবসায়'ই রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে।

কোনও ব্যবসায়ী চেক দ্বারা দ্রব্য কেনেন। ব্যাঙ্কের ঐ চেক ডিসঅনার্ড হলে ফৌজদারী মামলা হয়। উহা এড়াতে এঁরা তাড়াতাড়ি কিছু নগদ টাকা দিয়ে বাকি টাকার জন্য অপর এক চেক দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশ্বাস করে উহা গ্রহণ করেন কিন্তু ঐ দ্বিতীয় চেকটি ও ডিসঅনার্ড হয়। এই ভাবে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী উহাকে দেওয়ানী মামলাতে পর্যবসিত করেন।

কোনও এক উকিল বাবু আমাকে বলেছিলেন,—'মশাই! সম্পত্তি

---

* উচ্চ বেতনের টাইপিস্টরা এঁদের রক্ষিতা। কর্মীদের পত্নীদের উপরও এঁদের লোলুপ দৃষ্টি। পূর্বতন জমিদারদের অপেক্ষা এঁরা সুখ-ভোগী। অবশ্য এঁদের সংখ্যা এখনও অনেক কম।

এবং ব্যবসায় রক্ষা করতে হলে জুচ্চুরী আপনাকে শিখতেই হবে। শুধু তাই নয়। ঐ বিদ্যা আপনার পুত্রকে এবং সময় পেলে পৌত্রকেও তা শিখাতে হবে। অন্যথায় অন্যদের সঙ্গে কমপিটিশনে সব কিছু লোপাট হবে।'

বহু ব্যবসায়ী ফ্যাকটরি বা সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক হতে মোটা অঙ্কের অর্থ কর্জ করে তা অন্যত্র ব্যয় বা আত্মসাৎ করেন। ব্যাঙ্ক মামলা করে উহা ক্রোক করার পর দেখেন যে প্রদত্ত অর্থের অর্ধেকও উঠেনি। ব্যাঙ্ক কর্মীদের যোগসাজসে এই অপকর্ম করা হয়।

ব্যাঙ্ক ফ্রড

ব্যাঙ্ক ফ্রড্‌ কেস্‌ বা ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত মামলাসকল ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্মের পর্যায়ে পড়ে থাকে। "বেয়ারার চেক" জাল বা নকল করে ব্যাঙ্ক হতে অর্থ আদায় এক অতি সাধারণ ব্যাপার। এই অপকর্মে দুর্বৃত্তেরা কোনও ব্যক্তির নিকট হ'তে কৌশলে একটি ৫৲, ১০৲ বা ৫০৲ টাকার বেয়ারার চেক্‌ সংগ্রহ্‌ করে। এরপর তারা ঐ চেকের সংখ্যাগুলি কোনও এক বিশেষ কেমিক্যালের* সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে, ঐস্থলে ৫০০৲, ১০০০৲ বা ৫০০০০৲ টাকা লিখে ঐ চেক্‌ ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নেয়। কখনও এরা এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকে। ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্ক-গুলিতে সকল সময় অধিক টাকা মজুত থাকে না। এরা ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিকট প্রথমে জেনে নেয় ঐদিন প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাঙ্কে জমা প'ড়েছে কিনা। ঐ টাকা ঐদিন যে ব্যাঙ্কে মজুত আছে তা

---

* জনস্বার্থের কারণে এই কেমিক্যালের নাম জানানো হ'ল না। এই কেমিক্যালের সাহায্যে অতি সহজে যে কোনও পেনসিল বা কালির লেখা বেমালুম ভাবে উঠিয়ে ফেলা যায়। তবে কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের কালিতে লেখা হলে উহা উঠানো যায় না। ইহাতে কালি চেকের শেষ ফাইবার পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে।

জ্ঞাত হওযামাত্র তারা ঐ জাল চেকটি ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও খোদ মালিকরাও এই সকল ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এদের ধূর্ততা স্থচতুর অডিটাররাও ধরতে অক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে "একাউণ্টে কোনও ভুল নেই", এইরূপ সার্টিফিকেট্ও তাঁরা প্রতি বৎসর দিয়ে থাকেন। এই সকল দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্রের ফলে সাধু চরিত্রের অডিটাররাও বিনাদোষে বদনামের ভাগী হয়েছেন। আমি একবার কোনও এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসের অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা! আপনি বছরের পর বছর ধ'রে অতগুলি অডিটারকে কি রূপে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছেন?" প্রত্যুত্তরে অপরাধীটি নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে।

"আসলে বিষয়টি থাকে আগাগোড়া মনস্তত্ত্বমূলক। অডিটার প্রথমে "আইটেম্ বাই আইটেমের' অঙ্কগুলি মিলিয়ে নিতে থাকেন, এবং আমিও এ বিষয় তাঁকে সাহায্য করতে থাকি। নিম্নের তালিকাটি দেখলে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

√২০০০০ | ০	√৫০০০ | ০	আইটেম্ নং	১
√৫০০০০ | ০	√২০০০ | ০	,,	২
√৩০৫০০ | ০	√১৫০০ | ০	,,	৩
√৭০৭৪৫ | ০	√৭০৮০ | ০	,,	৪
√২১০০০ | ০	√২০০০ | ০	,,	৫
টাঃ ৯১৮৪৫ ০৲	টাঃ ১৭৫-০ ০৲		

পৃথক পৃথক খাতাপত্র চেক্ ক'রে অডিটার দেখলেন, উহাতে জমা বা খরচ দেখানো হয়েছে, যথাক্রমে ২০০০০৲, ৫০০০০৲, ৩০৫০০৲ ৭০৩৪৫৲ ও ২১০০ ৲ এবং ৫০০০৲, ২০০০৲, ১৫০০৲, ৭০৮০৲, ২০০০৲; ভাউচার রিশিপ্ট প্রভৃতির সহিত এই সংখ্যাগুলির কোনও

অমিলও নেই, ইত্যাদি। অডিটারমশাই বিভিন্ন খাতা-পত্র হ'তে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মিলিয়ে নিয়ে উহার [সংখ্যার] পাশে পাশে একটি ক'রে টিক্ দিয়ে গেলেন। এর পরই তিনি যদি যোগ দিয়ে ফেলতেন, তা হ'লে তিনি দেখতে পেতেন যে, যোগফল অত্যন্তরূপ বেশি করে দেখানো হয়েছে ; এদিকে অডিটারমশাই যে সময় যোগ দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা এক হট্টগোল বাধিয়ে বসি, যাতে করে সেদিনকার মত কার্যে তাঁকে ক্ষান্ত দিতে হয়। হঠাৎ উপর হ'তে [ম্যানেজারের বাসা হ'তে] থালি থালি জলখাবার এসে পড়ে। কিংবা হঠাৎ ম্যানেজারের কোনও এক যুবতী ভগিনী বা শ্যালিকা আবির্ভূত হ'য়ে খাবার খেতে অডিটারকে উঠে পড়ে উপরে যাওয়ার জন্য তাগিদ জানায়। এর পর তাঁর উপরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এর পর সেখানে শুরু হয় তাঁর ভগিনী কিংবা শ্যালিকার বা কন্যার গীত ও ওরিয়েণ্টাল নৃত্য। অডিটার কর্তব্য কর্ম পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে গৃহে গমন করেন বাধ্য হয়েই। কোনও কোনও সময় হঠাৎ সেখানে থিয়েটারের পাশও এসে পড়ে। ম্যানেজারও তখন 'চলুন মশাই থিয়েটার দেখে আসি। এখানে কাজ কর্ম তো আছেই। ও সব কাজ না হয় কালই হবে—' ইত্যাদি বাক্য ব'লে অডিটারকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেন। কখনও বা হঠাৎ ম্যানেজারের বাড়ি থেকে এক দুঃসংবাদ এসে পড়ে। এর ফলে অডিটারকে এমনিই কার্যে ক্ষান্ত দিতে হয়। কখনও কখনও অকারণে ঝগড়াঝাটি করেও অডিটারকে ঐ দিনের মত কার্যে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা যোগ দেওয়ার কার্য শেষ না করেই অডিটারকে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরতে হবেই। এমন কি ক্ষেত্র -বিশেষে স্বল্প মাত্রায় আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে তা পরে নিবানো হয়েছে।

অডিটার চলে গেলে আমরা প্রয়োজনমত সংখ্যাগুলির পার্শ্বে প্রদর্শিত লম্বালম্বি দাঁড়ি দুইটির ওপারের [চিত্র দেখুন] সংখ্যাগুলি যোগ করে দিই। অর্থাৎ মূল সংখ্যাগুলির সহিত প্রতি লাইনেই প্রযোজন মত একটি বা দুইটি ডিজিট [সংখ্যা] আমরা যুক্ত করে দিই, যাতে করে যোগফলের মধ্যে কোনওরূপ ভুলচুক ধরা না পড়ে। পরের দিন কাজে এসে অডিটার সাহেব দেখে নেন কোন্ কোন্ সংখ্যাব উপর তিনি টিক্ দিযে গেছেন। এইগুলি পূর্ব দিন মিলিযে নিযে তিনি টিক মেরে গেছেন। এই জন্যে ঐগুলি তিনি আর পুনরায় পরীক্ষা করা প্রযোজন মনে করেন না। এদিকে ঐ সংখ্যাগুলির সহিত যে আমরা প্রযোজনমত একটি বা দুইটি সংখ্যা যোগ করে দিযেছি তা তিনি দেখেও দেখতে পান না। তাঁব ধারণা হয় ঐগুলি পূর্ব দিনেও ঐরূপ ভাবে লেখা ছিল। অত খুঁটিনাটি মনে রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয। অডিটাবমশাই এইবার নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুলি যোগ দিযে যোগফল মিলিয়ে দেখেন যে, উহাতে কোনও রূপ ভুল নেই। তিনি তখন হেড্ অফিসে [বা গভর্নমেণ্টে] রিপোর্ট দাখিল করে দেন, যে, হেড্ অফিসে বা অন্যত্র পাঠান মূল সংখ্যাতে কোনওরূপ ভুল নেই। খাতাপত্র চেক্ করে তিনিও ঐ সংখ্যাটি [যোগফল] নির্ভুল ভাবে পেযে:ছন, ইত্যাদি।"

এভাবে রিপোর্ট দাখিল করাব জন্যে ঐ সকল হিসাব পবীক্ষকও [Auditor] এই সকল তহবিল তছরূপের ব্যাপারে পবোক্ষভাবে একরকম বিনাদোষেই জড়িয়ে পড়ে থাকেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এঁদেরও একজন অপরাধী মনে হয। কিন্তু আসলে এঁরা থাকেন সম্পূর্ণরূপেই নির্দোষ।

এই ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি তুলে দেওয়া

হল। এই বিবৃতিটি হতে ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝা যাবে।

"আমি প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রায় বারোটি ছোট ছোট ব্যাঙ্কে একাউন্ট খুলে দিই। এই সকল একাউন্টে আমরা স্বল্প মাত্র টাকা রেখে থাকি। এর পর আমরা কয়েকটা বোগাস্ অর্ডারের কাগজ তৈরি করে নিই। বড় বড় অফিস হ'তে ছাপানো ফর্ম সংগ্রহ তো আমরা করিই; এ ছাড়া ঐ অফিসের বড় সাহেবদের সইও— আমরা জাল করেছি। প্রায় একলক্ষ টাকার অর্ডারসহ জাল কাগজপত্র আমরা কোনও একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে উহার স্বপক্ষে আমরা হাজার পঞ্চাশ টাকা কর্জ করে নিই। এক লক্ষ টাকার কাগজপত্র জামিন হিসাবে পাওয়ায় ঐ অর্থের অর্ধেক টাকা আমাদের কর্জ স্বরূপ দিতে ব্যাঙ্ক সহজেই রাজি হয়ে থাকে। এর কিছুদিন পর ব্যাঙ্ক ঐ সকল কাগজপত্র কথিত অফিসে টাকা আদায়ের জন্যে দাখিল ক'রে থাকে—কিন্তু তা করলে কি হয়। ঐ অফিসেরই কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের লোক থাকায় ঐ সকল কাগজপত্র আমাদের কাছেই ফিরে আসে। ওগুলো ঐ অফিসের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট কদাপি পৌঁছায় না। ঐ ব্যাঙ্ক যদি খুব বেশি তাগিদ দিতে থাকে তা হলে ঐ অফিসেরই এক কর্মচারীর মারফৎ মাত্র একটা বা দুইটা বিলের টাকা ঐ অফিসের আসল কর্তাদের অজ্ঞাতেই আমরা জমা দিয়ে দিই। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে এই টাকাটাই বা আমরা পাই কোথা থেকে? কারণ, চুরির বা জুয়োচুরির টাকাটা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিই। আসলে ঐ ভাবে টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারটি হয়ে থাকে এইরূপ: ঐ ব্যাঙ্কের তাগিদ অত্যধিক হ'বা মাত্র আমরা ঐরূপ জাল কাগজপত্র অপর আর একটি ব্যাঙ্কে

জমা দিয়ে ঐ ভাবেই বহু টাকা কর্জ করে নিই, এবং এই কর্জ করা টাকাব কিছুটা অংশ ঐ ভাবে লোক মারফৎ পূর্বেকার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। এই ভাবে অত টাকা পরিশোধ করায় আমাদের উপর ঐ ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর ফলে পরের বার আমরা আরও অধিক কর্জ পেয়ে থাকি। এই ভাবে এক সঙ্গে চার বা পাঁচটি ব্যাঙ্কেব সহিত লেন-দেনের কারবার ক'রে শেষ বরাবর আর সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠলে আমরা যা কিছু টাকা পাবার তা পেয়ে নিয়ে কারবার উঠিয়ে রাতারাতি সরে প'ড়ে থাকি। এতে করে ঐ সকল ব্যাঙ্কাররা আমাদের নাগাল আর পায় না। আমরা সরে পড়ার পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, এত দিন যা কিছু কাজকর্ম বা কারবার তা তাঁরা একটা ঠগী দলের সঙ্গে করেছেন এবং তাঁরা এ'ও জানতে পারেন যে ঐ অফিসের কর্মকর্তারা এই সকল কাগজপত্র সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন।"

কোনও কোনও সময় দুষ্টপ্রকৃতির পোস্টাল পিওনদের সহযোগিতায় এই ব্যাঙ্কের প্রতারণার কার্য সমাধিত হয়ে থাকে। অনেক সময় নাগরিকরা খামের ভিতর করে সই করা চেক্ পাঠিয়ে থাকেন। অসৎ প্রকৃতির পোস্টাল পিওনরা ঐ সকল খাম বা লেপাফা তীব্র আলোকের সম্মুখে ন্যস্ত ক'রে বুঝে নেয় যে ঐ খামের ভিতর চেক্ আছে কি'না? এই ভাবে চেকের সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা খামখানি গাপ করে কিংবা উহা ভেপারের [বাষ্প] মুখে ধরে খুলে ফেলে ঐ খামের ভিতর হতে চেকখানি বার করে নিয়ে ঐ সকল দুর্বৃত্তদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। এর পর দুর্বৃত্তরা উহাতে লিখিত (অর্থের) সংখ্যা কেমিকেলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে

উহা দশগুণ করে জাল সই-এর দ্বারা উহা নিজের নামে এন্‌ডোর্স বা খারিজ করিয়ে ঐ চেক্‌টি কোনও একটি ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে নিজের একাউণ্টে জমা করিয়ে নেয়। এই উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ছোট ছোট ব্যাঙ্কে মিথ্যা নাম নিযে [বা স্বনামে] ছোট ছোট কয়েকটি একাউণ্টও খু'লে থাকে। এই ছোট ব্যাঙ্কটি তখন বড় ব্যাঙ্কে ঐ চেকটা পাঠিয়ে দিয়ে উহা ভাঙিয়ে নিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে চেক্‌ পাঠানোর ফলে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহেরও উদ্রেক হয় না। এইজন্য ঐ ড্রআরকে সনাক্ত করারও কোনও রূপ প্রশ্ন উঠে না। ওরা সনাক্ত না হলে অতগুলো টাকা হয় ত বড় ব্যাঙ্ক ওদেরকে দিত না। এই ভাবে ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঐ বড় ব্যাঙ্কটি হতে সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিয়ে দুর্বৃত্তটি শহর ত্যাগ ক'রে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। ছোট ব্যাঙ্কগুলির টাকার খাঁকতি থাকায় উহারা বিনা ইণ্ট্রোডাক্‌শনে সকল ব্যক্তিরই অর্থাদি জমা নিয়ে থাকে।

এই সকল চোরাই চেক অন্যান্য উপায়েও ভাঙিয়ে নেওয়া হযে থাকে। এই ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা কোনও দোকানে একটি জাল বা চোরাই চেক প্রদান করে বহু টাকার মূল্যের দ্রব্য কেনে। দোকানী নিজের ব্যাঙ্কের একাউণ্টের মাধ্যমে কথিত ব্যাঙ্ক হতে ঐ চেক ভাঙিয়ে নিয়ে তবে দুর্বৃত্তদের বিক্রীত দ্রব্যাদির ডেলিভারি দিয়েছে। পরে পুলিশ ঐ দুইটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঐ দোকানীকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু ঐ সময় প্রকৃত চোরকে সব ক্ষেত্রে খুঁজে বার করতে না পেরে পুলিশ ঐ জাল চেকের দায়ে ঐ নির্দোষ ব্যাপারীকে হায়রানি করেছে।"

অপর আর এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্‌ সংক্রান্ত অপরাধী আমার নিকট এইরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল।

"আমরা প্রথমে একটি জাল রেলওয়ে রিশিপট্ যোগাড় করি—ঐ রেলওয়ে রিসিপ্টে প্রায় ২০০০০৲ টাকার মূল্যের দ্রব্যের কথা লিখা থাকে। এর পর আমরা কোনও এক ব্যাঙ্কে ঐ রিশিপ্ট দাখিল ক'রে উক্ত ব্যাঙ্ককে উক্ত দ্রব্যাদি খালাস করে নেবার জন্যে অথোরাইজড্ করে দিয়ে থাকি। এর পর ঐ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা যৎসামান্য অ্যাডভান্স স্বরূপ চেয়ে নিই। অত টাকার দ্রব্য হেপাজতে থাকায় উক্ত ব্যাঙ্ক আমাকে একটা ৫০৲ বা ৫০০৲ টাকার চেক এমনিই লিখে দিয়ে থাকে। এই চেকটির অঙ্ক আমরা যথা নিয়মে কেমিক্যালের দ্বারা উঠিয়ে ফেলে উহাতে একটা ৫০০০৲ বা ৫০০০০৲ টাকার মোটা অঙ্ক খুশিমত লিখে নিয়ে উক্ত চেক আমরা যথাসময়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে সরে পড়ে থাকি। নিম্নের সইটি এবং চেকের নম্বর ঠিক থাকায় ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহে আমাদের উক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দূর শহরে একটা ছোট ফার্ম খুলে বড় শহরের কোনও এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঐ স্থান হ'তে চিঠিপত্র চালাতে থাকি। এর পর ঐরূপ একটা রেলওয়ে রিশিপ্ট দাখিল করে ঐ ব্যাঙ্কের নিকট আমরা টাকা আমানত চাই। ঐ রিশিপ্টে আমরা লিখিয়ে দিই যে ৭০ টিন প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোনও দুর্মূল্য দ্রব্যাদির কথা, আসলে কিন্তু ঐ টিন বা পিপাগুলিতে থাকে সিমেণ্ট, টিন বা মাটি। ব্যাঙ্কের লোকেরা যথারীতি রেলওয়ের গুদামে এসে ঐ টিন বা পিপা গুনে দেখে নেয় যে উহা ঠিক আছে কি'না কিংবা কোম্পানির লোকেদের নিকট হ'তে তদন্ত ক'রে জেনে নেয় ঐরূপ পিপা যথার্থই বুক্ করা হয়েছে কি'না। এর পর ব্যাঙ্ক ঐ প্লাটিনামের মূল্যের অর্ধেক টাকা প্রতারকদের কর্জ স্বরূপ প্রদান করে ঐ মাল ঐ রিশিপ্টের সাহায্যে রেলওয়ে হ'তে ছাড়িয়ে এনে গুদামে তুলে দেখতে পায় যে উহাতে

প্লাটিনাম নেই। ওগুলোতে ভরা আছে মাত্র সিমেণ্ট বা মাটি।

ইহা ব্য'তীত ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কর্তাব্যক্তিও তাঁদের খাতকদের ঠকিয়ে থাকেন। এঁরা জেনেশুনে এমন সকল ব্যক্তিকে ওভারড্রাফ্‌ট বা কর্জ দেন, যাঁরা কিনা কস্মিনকালেও ঐ টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না। আসলে এই সকল বাহিরের দুর্বৃত্তদের সহিত তাঁদের আধাআধি হিসাবে বখরা হ'য়ে থাকে। এই জন্যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা এমন সব সম্পত্তি জামিনস্বরূপ গ্রহণ করেন "কর্জ দেওয়া অর্থের" তুলনায়, যার কিনা কোনও মূল্য নেই। এখানেও ঐরূপ আধাআধির হিসাবে বখরার বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন অমুক ব্যাঙ্কের কর্মচারী, নিজেই নিজেদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করা শোভা পায় না। তাই আমি আমার এক নামকরা বন্ধুর কাছে এসে প্রস্তাব করি, 'দেখ ভাই, তুমি জানো আমি একজন ব্যবসাদার। প্রায়ই নানারূপ দেনা-পাওনায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়। এজন্যে আমি বেনামীতে একটা একাউণ্ট খুলতে চাই। মনে করছি তোর নামেই একাউণ্টটা খুলব। টাকাকড়ি যা জমা দেবার তা আমিই দেব। তুই মাঝে মাঝে একটা করে সই দিয়ে যাবি। এজন্যে মাসে মাসে তোকে আমি ৫০৲ টাকা ক'রে তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়ে যাব। বন্ধুবর ব্যাঙ্কের কার্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই বুঝতেন না। এজন্যে তিনি সহজেই আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এর কয়দিন পর হ'তেই আমি আমার 'নিজের সাহায্যেই' আমার ব্যাঙ্ক হতেই ওভার ড্রাফ্‌ট নিতে শুরু করে দিই। এই টাকা হ'তে আমি তিন চারটি কারবারও শুরু

করে দিই। আমার ইচ্ছা ছিল এই সকল কারবার ফেঁপে উঠলে আমি এই সকল কর্জ বন্ধুর মারফৎ কারবার হ'তেই শোধ করে দেব। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ থাকায় আমার ব্যবসায় ফেল হয়। ঐ টাকা পরিশোধ করতে আমি অপাবক হই। এইভাবে আমি নিজের ও ঐ বন্ধুর এবং তৎসহ ঐ ব্যাঙ্কেরও বিপদের কারণ ঘটাই।"

আত্মীয়বাৎসল্য বা বন্ধুপ্রীতির কারণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কের কর্মে নিযোগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপও অনেক ছোট-খাটো নূতন ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোনও কোনও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে জমার জন্যে কিছু টাকার আমদানী করতে সাহায্য করার জন্যেও বিনানুসন্ধানে যা'কে তা'কে ব্যাঙ্কের কর্মে নিযুক্ত করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা তহবিল তছ্‌রুপ আদি অপকর্ম করা অসম্ভব নয়। নবজাত দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির পতনের জন্যে এইরূপ নির্বিচার কর্মচারী নিযোগও বহুল পরিমাণে দায়ী থাকে।

[এমন অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অসাধু মালিকের কাহিনী শুনা গেছে যাঁরা নানাবিধ কৌশলে প্রথমে ব্যবসায়ের সমুদয় পুঁজিপাতি সরিয়ে ফেলেন। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে হঠাৎ লিমিটেড্ ক'রে শেয়ার বিক্রয় করতে শুরু করেন। এছাড়া এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বহু লাভের কথা ব'লে ব্যবসায় নামিয়ে তার অর্থ অপহরণ করে থাকেন। মানুষের লোভ তার ক্রোধের ন্যায় মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি হরণ করে থাকে। এই কারণে বহু ব্যক্তি দুর্বৃত্তদের সকল কথাই বিশ্বাস করে যান। এইরূপ অবস্থায় কোনও এক অসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ পক্ষের মতামত নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা বিধেয়।]

কোনও কোনও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ের কারণে পল্লীগ্রামে এসে দোনাখেল" ব্যাঙ্কেরও প্রবর্তন করে লোক ঠকিয়েছে। এই ব্যাঙ্ক খুলে এরা প্রথমে জানিয়ে দেয় যে, এক টাকা রাখলে দু'টাকা দেওয়া হ'বে। অর্থাৎ কি'না জমা অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'বে। প্রথম প্রথম এরা কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতি মত দ্বিগুণ অর্থ দিয়েও থাকে। কিন্তু পরে অনেক টাকা জমা পড়লে এঁরা একদিন সমুদয় অর্থ নিয়ে সরে পড়ে থাকেন।

আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির স্ট্রঙ্, রুম্‌গুলি দুর্ভেদ্য রূপে তৈরি করা হয়। বহুদিন যাবৎ বহু জনের চেষ্টা ব্যতিরেকে উহা ভাঙা বা লুঠ করা সম্ভব নয়। অধুনা কালে তহবিল তছ্‌রুপ, জালিয়াতী ও প্রতারণা ব্যতীত ব্যাঙ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। এ'জন্য এই অপকর্মের সাফল্যের জন্য বহুপ্রকার প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছে। ইহাদের একটি চিত্তাকর্ষক বিলাতি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমি অপকর্ম দ্বারা সংগৃহীত পঞ্চাশ হাজার টাকা অমুক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখি। এর পর শেয়ার কেনা-বেচার সংবাদ সংগ্রহের অজুহাতে ঐ ব্যাঙ্কের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলাপ জমাই। কয়েকবার তাদের ম্যানেজারকে স্ব-বাটীতে নিমন্ত্রণ করে [ককটেলপার্টি] আপ্যায়িত করেছি। একদিন আমি বিব্রত ভাব দেখিয়ে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলি,—'মশাই! আমার এক নূতন পার্টনারকে ত্রিশ হাজার টাকার একটা চেক কেটে দিয়েছি। সেটা সে ওখানে ভাঙাতে না পারলে আমার বিপদ। লোকটা স্পর্শকাতর বাক্যবাগীশ পাগলা টাইপের অদ্ভুত মানুষ।' আমার উত্তরে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভয় দিয়ে আমাকে জানালো যে—'তাতে আর অসুবিধে কি? আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই ব্যাঙ্কে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা

এখনও পর্যন্ত জমা আছে। আমি কর্মচারীদের বলে দেবো যে তারা যেন একটুও দেরি না করে তাকে ঐ টাকা দিয়ে দেয়।" আমি এইবার একটু আশ্বস্ত ভাব দেখিয়ে পুনরায় ঐ ম্যানেজারকে অনুযোগ করে বললাম,—'কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে কোন্ কাউণ্টারে উনি যাবেন তার ঠিক কি ? আপনাদের ওখানে তো সর্বশুদ্ধ বারোটা কাউণ্টার আছে। ঐ অদ্ভুত রাগী লোক সেখানে একটু মাত্র দেরি হলে রেগে ঐ স্থান ত্যাগ করবে। এতে আমার যে কি ক্ষতি হবে তা আপনি বুঝবেন না। ঐ সকল কাউণ্টারে বহাল কর্মচারীরা আপনার উপদেশের অপেক্ষায় বা খাতাপত্র চেকেতে একটু দেরি করলে উনি অনর্থ বাধাবেন।' আমার এবংবিধ বিব্রত ভাব দেখে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দয়া পরবশ হয়ে প্রত্যেকটি কাউণ্টারে হুকুম দিলেন যে আমার সই করা অতো টাকার চেক পাওয়া মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে যেন ঐ চেকের বাহককে ঐ টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়। এর পরদিন সকালে বারোটি লোক বারোটি ঐ অঙ্কের চেক্ সমেত ঐ ব্যাঙ্কের বারোটি কাউণ্টারে এসে উপস্থিত হয়। আমার প্রেরিত বারোটি সহকারী ঐ বারোটি কাউণ্টার হতে এক সেকেণ্ডের মধ্যে অতো টাকা তুলে নিতে পারে। এই ভাবে ঐ ব্যাঙ্কে আমার জমা টাকার বহুগুণ বেশি টাকা আমি তুলে ঐ শহর হতে সরে পড়ি।"

ডাকঘরে অপকর্ম

ব্যাঙ্ক ফ্রড প্রভৃতি অপকর্ম সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পোস্টাল বা ডাকঘর সংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। ডাকঘরে আমরা চুরি এবং জুয়োচুরি উভয়বিধ অপরাধই সংঘটিত হ'তে দেখি। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে ডাকঘরের চোরেরা অত্যন্তরূপ চতুর হয়ে থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্তটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

য়ুরোপে এমন অনেক ডাকঘরের অপরাধী আছে যারা পোস্ট অফিসের মারফৎ একটি কাঠের ছোট বাক্স পার্শেল ক'রে পাঠায়। ঐ বাক্সের উপরে তারা লিখে রাখে "সোনার গহনা, মূল্য ২৫০০০৲ টাকা"। আসলে কিন্তু ঐ পার্শেলে কোনও গহনা থাকে না, গহনার পরিবর্তে তারা কয়েক টুকরা পাথর ও তৎসহ একটি জীবন্ত ইঁদুর অক্সিজেন গ্যাস সহ ঐ বাক্সে পুরে রাখে। এর পর যথারীতি উপরে সীলমোহর এঁটে তারা বাক্সটি পার্শেল করে অপর আর এক অপরাধীর কাছে ডাকঘরের মারফৎ পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ইঁদুরটি বাক্সবন্দি হয়ে বসবাস করতে স্বভাবতঃই রাজি থাকে না। পথিমধ্যেই ঐ জন্তুটি বাক্সটি দন্ত দ্বারা ফুটা ক'রে বেমালুম বার হয়ে যায়। এদিকে যথাস্থানে বাক্সটি পেঁছানোর পর বাক্সটির মধ্যে একটা ছিদ্র দেখা যায়। এই অবস্থায় বাক্সটি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ অপরাধীটি বাক্সটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং পোস্ট অফিসের

নিকট পার্শেলের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে থাকে। স্বভাবতঃ সকলের মনে হয় যে কে বা কাহারা বাক্সটি ঐরূপ ভাবে ফুটা করে গহনাগুলি বার করে নিয়েছে। পোস্ট অফিসকেও বাক্সটির প্রেরককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্শেলের মূল্য বাবদ সমস্ত টাকা খয়রাত দিতে বাধ্য হতে হয়।

চৌর্য অপরাধের এই পদ্ধতিটি যে একটি অদ্ভুত পদ্ধতি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এদেশেও পোস্টাল পার্শেলগুলি হামেসাই অপহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় পোস্টাল কর্মচারীদের যোগ সাজসেও এই সকল চুরি সংঘটিত হয়ে থাকে। কখনও ঐ সকল কর্মচারীদের কেহ কেহ নিজেরাও চুরি করে থাকেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ ছোট-খাট চুরিকে "পাওনা" নামে অভিহিত করে থাকেন। এই সকল কর্মচারীদের পত্নীদের প্রায়ই বলতে শুনা গেছে, "এই সব জিনিস উনি অফিসে পেয়ে থাকেন।" মা লক্ষ্মীরা বুঝেও বুঝতে চান না যে এইগুলি তাঁদের স্বামীরা অফিস হ'তে চুরি করে এনেছেন। কোনও কোনও রেল কর্মচারীর স্ত্রীদেরও ঐরূপ বলতে শুনা গেছে। এই সকল ছোট বড় পার্শেল পোস্ট অফিস ও ষ্টিমার এবং রেল প্রভৃতি স্থান হতে অপহৃত হ'য়ে থাকে। দুঃখের বিষয় এই সকল ভদ্রসন্তানদের ঐসকল দ্রব্যের প্রেরকদের স্ত্রী-পুত্রের কথা একবারও মনে হয় না। ঐ একটুকরা দ্রব্য, তা যত কম মূল্যেরই হোক-না কেন—ঐ দ্রব্যটির জন্যে তাঁদের স্ত্রী-পুত্রেরা কত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে। দূরদেশ হ'তে আগত তাদের স্বামী, পুত্রের বা প্রিয়জনের ঐ স্মৃতিচিহ্নসকল তাদের কতটা আনন্দ প্রদান করতে পারে, তার শতাংশের একাংশও বুঝলে ঐ সামান্য দ্রব্যের জন্যে তাঁরা এইরূপ জঘন্য চৌর্য কার্যে কখনও লিপ্ত হতেন না। আমি এই সকল

ভদ্রসন্তানদের নিজেদের স্ত্রী-পুত্রের ও বিদেশস্থ প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করে বিষয়টি অনুধাবন করবার জন্যে অনুরোধ করি।

"টেলিগ্রাফ সুইণ্ডিলিঙ" ডাকঘর সংক্রান্ত একটি অন্যতম অপরাধ। সাধারণতঃ টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারের সাহায্যে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধীরা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য ব্যপদেশে বিদেশে যাচ্ছে কি'না তা সাবধানে খবর নেয়। ঐরূপ কোনও খবর পাওয়া মাত্র এরা ঐ ব্যক্তির পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে তার গন্তব্য স্থানে এসে হাজির হয়। পথিমধ্যে [ট্রেনের কামরায়] ঐ ব্যক্তির সহিত সংলাপ ক'রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তারা সংগ্রহ ক'রে নিতে ভুলে না। এর পর কথিত শহরের বা জনপদের কোনও দোকানে এসে তারা কিছু দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় ক'রে ঐ দোকানদারকে এইরূপ অনুরোধ জানায়—"দেখুন ! আরও কিছু দ্রব্যাদি আপনার দোকান হ'তে আমি খরিদ করতে চাই। কিন্তু মশাই, আমাদের টাকার একটু কম পড়ে গেছে।. আমাদের কলিকাতার ফার্মে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি, আপনার এই ঠিকানাতেই তারা টাকা পাঠাবে। দয়া করে পিওনকে ও বিষয়ে বলে রাখবেন।" দোকানী দেখে লোকটি তার একটা বড় দরের খরিদ্দার। তাই তার এই প্রস্তাবে তারা আনন্দের সহিতই রাজি হয়ে যায়। সাধারণতঃ অমুক ব্যক্তিরূপে কাহাকেও কেহ রীতিমত সনাক্ত না করলে পোস্টাল পিওনরা অত টাকা কাহাকেও ডেলিভারি দেয় না। এই কারণে দুর্বৃত্তরা ঐ দোকানদারের সহিত ঐরূপ ব্যবস্থা ক'রে কথিত ফার্মের কর্মচারী বা এজেন্টের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসায় কেন্দ্রে কোন এক জরুরি কার্যের উল্লেখ করে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ

জানিয়ে "তার" করে দেয়। এর পর যথারীতি ঐ দোকানের ঠিকানায় টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা এলে অপরাধীটি ঐ টাকা আত্মসাৎ করে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। সাধারণতঃ, ব্যবসা কেন্দ্রের ব্রাঞ্চ অফিসের নাম নিয়ে মূল ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে ঐরূপ ভাবে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করে 'তার' পাঠান হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এই সকল ঠগীরা, যে শহরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস থাকে সেই শহর হতে অপর এক শহরের উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ব্রাঞ্চ অফিসে 'তার' করে জানায় "অমুক ব্যক্তি অদ্যই ওখানে পৌঁছাবে। তাকে এত টাকা আপনারা দিবেন ইত্যাদি।" ব্যবস্থা মত দুর্বৃত্তদল ঐ ছোট শহরটিতে ঐ সময়েই হাজির থেকে পূর্ব ব্যবস্থামত টাকা নিয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা বা আত্মীয়বর্গের নাম নিয়ে দেশস্থ অভিভাবকদের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেও দুর্বৃত্তরা অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এই সকল অপকর্মে দুর্বৃত্তগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পোস্টাল-পিওনের যোগ-সাজসে পোস্টঅফিস থেকেই অর্থাদি গ্রহণ ক'রে সরে পড়েছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলায় কোনও এক দুর্বৃত্তদল এক অভিনব উপায়ে এইরূপ অপকার্য করতে পেরেছে। এরা টেলিগ্রাফ লাইনের ধারে একটি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে একটি টেলিগ্রাফিক যন্ত্র বসিয়ে—ঐ যন্ত্রের সহিত সরকারী টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ ঘটিয়ে বহু জাল [ভূয়া] টেলিগ্রাম বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুর্বৃত্তদলের অপরাপর ব্যক্তি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত থেকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ'তে অর্থাদি গ্রহণ করে সরেও পড়েছে।

ডাকাতি

ডাকাতি অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি আপন স্বার্থে একটি বাটী লুঠ করলে আমরা তাকে ডাকাতি বলি। কিন্তু সহস্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটী লুঠ করলে তাকে আমরা ডাকাতি না বলে তাকে বলি জনবিক্ষোভ। কারণ এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারা মাত্র সংখ্যার জোরে তাদের এই অপকর্মের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। অন্যদিকে ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তিবা তাদের সংখ্যার নগণ্যতার জন্য ঐরূপ এক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি ব'লে তাদের আমরা বলেছি ডাকাত এবং তাদের ঐ অপকর্ম রোধ করতে না পারায় রক্ষীকুলকে আমরা দায়ী করেছি। আমাদের কেহ কেহ আবার প্রথমোক্তদের প্রতিরোধ না করাব জন্য এবং দ্বিতীয়োক্তদের [উৎপীড়ন করা হয়েছে এই অছিলায়] প্রতিরোধ করার জন্য সরকারকে দায়ী করেছে। অপরদিকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যদের অপর এক দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযানকে ডাকাতি না বলে বলা হয়েছে যুদ্ধ। নির্মমতার বিষয় বাদ দিলে এই তিন গোষ্ঠীর মানুষই তাদের কম-বেশি সংখ্যানুযায়ী উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। মূলতঃ কিন্তু তাদের সমাধিত ক্ষতির হার ও উদ্দেশ্য থাকে হারাহারিরূপে একই।

অপরাধীদের সংখ্যানুযায়ী কোনও অপকর্ম ডাকাতি বা রবারি তা নির্ভর করে। রাহাজানিকে ইংরাজিতে বলা হয় রবারি এবং ডাকাতিকে বলা হয় ডেকয়টি। ইহাদের আইনগত পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারায় "রবারির" সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন [Extortion] দ্বারা অর্থ অপহরণ করার অপর নাম রাহাজানি [Robbery]। এই বিশেষ অপকার্যে অপরাধীরা অপকর্মের উদ্দেশ্যে কিংবা অপকর্মের সময়, কিংবা চুরির বামাল নিয়ে পলায়নের সময়, কিংবা বামালাদি নিযে পালাবার প্রচেষ্টায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাহাকেও যদি আঘাত হানে কিংবা আঘাত হানবার চেষ্টা করে কিংবা ঐভাবে কাহারও মৃত্যু ঘটায় কিংবা কাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখে, কিংবা এমন ভাবে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে করে কেহ আশু আঘাত, মৃত্যু বা বেআইনী আটকের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে—এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি সহ-যোগে অর্থ বা দ্রব্য অপহরণ করলে ঐ অপরাধকে রাহাজানি অপরাধ বলা হবে।"

রাহাজানি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার ডাকাতি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা যাক। এই উভয় অপরাধের মধ্যে আদর্শগত কোনও প্রভেদ নেই। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কখনও পাঁচ জন বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে বা একত্রে রাহাজানি অপকর্ম করে কিংবা উহা করার চেষ্টা করে, তা হ'লে তাদের দ্বারা কৃত ঐ অপরাধকে ডাকাতি অপরাধ বলা হবে, এবং উক্ত অপকর্মকালীন যে সকল ব্যক্তি অকুস্থলে হাজির থাকবে বা উক্ত অপকর্মে সহায়তা করবে কিংবা উহার জন্যে তাহারা চেষ্টা করবে, তাদের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তা হলে ঐরূপ কার্যের জন্য দের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ডাকাত বলা হবে এবং তাদের দ্বারা কৃত ঐরূপ কার্যসকলকে বলা হবে ডাকাতির কার্য।"

আজও পর্যন্ত বহুদূর গ্রামে ধনীরা সর্বসমক্ষে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তি রূপে

পরিচিত থাকলেও তারা পূর্বকালীন কোনও কোনও জমিদারদের মত ডাকাত দল পোষণ করে, কয়েক ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে এরা নিজেরাই ডাকাত দলের সর্দার। একমাত্র স্বপরিবারের স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাদের প্রকৃত পেশার বিষয় অবগত নয়। এই সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়টি বুঝাবার জন্য নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমি শহরবাসী হলেও বহু দূরে গ্রামাঞ্চলে এক জোতদার পরিবারের একমাত্র ষোড়শী কন্যার সাথে আমার বিবাহ হয়। এই দিন ট্রেন ফেইল করাতে বহু রাত্রে আমি ওখানকার এক গ্রামের স্টেশনে নামি। অগত্যা অন্ধকার রাত্রে মাঠের পথ ধরে আমি একাকী অগ্রসর হই। হঠাৎ একস্থানে দশ-বারো জন সশস্ত্র ব্যক্তি আমাকে ধরে। এরা আমার সোনার বোতাম সমেত সিল্কের শার্ট কেড়ে নেয়। এমন কি, এরা আমার সিল্কের গেঞ্জি এবং শান্তিপুরী ধুতিটিও খুলে নেয়। আমার হাতের সোনার আংটি এবং হাত-ঘড়িটিও এদের আমি খুলে দিই। তারপর ঘুরা পথে মাত্র একটা আণ্ডার ওআর [জাঙ্গিয়ার] পরে শ্বশুর বাটীর খিড়কির দুয়ারে এসে ধাক্কা দিই। বাটীর ঝি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে লজ্জায় হতভম্ব হয এবং চুপি চুপি সে আমার স্ত্রীকে সেখানে ডেকে আনে। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমার হাতে ধরে তার শয়নকক্ষে আনে। সে তখন ঐ ঘরের আলমারি হতে একটি শান্তিপুরী ধুতি এবং সোনার বোতাম সমেত পাঞ্জাবি আমাকে পরার জন্য বার করে দেয়। আমি অবাক হয়ে এ সময়ে দেখি যে প্রিয়তমা আমারই অপহৃত সিল্কের গেঞ্জি, শান্তিপুরী ধুতি এবং পাঞ্জাবি আমাকে পরতে

দিলেন। আরও অবাক হয়ে আমি আমার হীরক অঙ্গুরী আমার স্ত্রীর অঙ্গুলীতে দেখতে পাই। এই বিষয় আমার স্ত্রীকে আমি জানালে সে ভীত হয়ে পড়ে। এরূপ কোনও অবস্থার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। সে তখন আমাকে সকল বিষয় খুলে বলে ও জানায় যে জানা-জানি হয়েছে বুঝলে, তার পিতা প্রাণাধিক জামাইকেও হত্যা করবে। এ অবস্থাতে আমি আমার স্ত্রীর হাতে ধরে গোপনে ঐ গৃহ ত্যাগ করে ভোর রাত্রে এক ক্রোশ দূরে এক থানাতে আসি। সেখানে এজাহার দিতে গিয়ে দেখি, থানার ঐ এজাহার-লিখিয়ে বাবুর হাতে আমারই সেই কেড়ে নেওয়া হাত-ঘড়িটা বাঁধা রয়েছে। এর পর সেখানে কোনও এজাহার না লিখিয়ে আমি দূরের এক রেল স্টেশনে পৌঁছাই। সেখান থেকে বিপরীতমুখী এক ট্রেনে উঠে ওদের এলাকার বাইরে যাই। কারণ, আমার স্ত্রীর সন্দেহ যে, জানতে পারলে আমার শ্বশুর আমাদের উভয়ের নামে থানাতে মিথ্যা করে চুরির উল্টা অভিযোগ করবে। এই অবস্থাতে আমাদের উভয়ের ঐ থানাতে হাজতবাসী হওযাও অসম্ভব নয়। পরে আমি জানতে পারি যে শ্বশুরের অন্যত্র আরও বহু পত্নী ও উপপত্নী থাকাতে তাঁর বিশেষ কোনও এক সন্তানের প্রতি তাঁর খুব বেশি মায়া নেই। তদুপরি সমগ্র দলের ধরা পড়ার ভয়ে সেখানে তাদের আত্মরক্ষার প্রশ্নই সর্বাগ্রে দেখা দেবে। এর ফলে তাদের ঐ অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হবে। এর পর হতে আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই আর ঐ ডাকাত শ্বশুরের গৃহে পদার্পণ করি নি।"

পূর্বকালে এমন বহু নামকরা ডাকাতে মাঠ ও ঠেঙাড়ের ভুঁই-এর কাহিনী শুনা গিয়েছে। ঐ সকল স্থানে রাত্রে দল না বেঁধে লোকে পথ চলতেন না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সাহেবের আর্দালী

বেয়ারা খানসামা এবং ধনী ব্যক্তিদের দ্বারবান ও চাপরাশী ছুটি নিয়ে ঐ ছুটির সময়ে ঠগী ডাকাতদের সাথে ডাকাতি করতো। পূর্ব কালের বহু জমিদার ডাকাতির অর্থে জমিদারী কিনেছে এবং পরে তা বহু গুণে বর্ধিত করেছে। এ সম্বন্ধে ঐরূপ এক জমিদার বংশের সন্তানের বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী বিনষ্ট হলেও তার শেষ চিহ্ন স্বরূপ দুর্গের মত আমাদের সাবেকী বৃহৎ প্রাসাদের তখনও কিছুটা অভগ্ন ছিল। এই সময় একটি হলের মেঝেটি সংস্কার করতে গিয়ে আমরা তার নীচে একটি বিরাট গুপ্ত কক্ষ আবিষ্কার করি। সেখানে রাশিরাশি নরকঙ্কাল দেখে আমি অবাক হই। এর পর একদিন বাগানের গাছ কেটে তার তলাতে অনুরূপ নরকঙ্কাল আবিষ্কার করি। এখানে বুঝা যায় যে মাটির তলাতে মৃতদেহ রেখে উপরে গাছ পুঁতা হয়েছিল। আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে কেন যে মাথায় অযথা খুন চাপে এবং আমাদের মন কেন যে অপরাধমুখী হয় তা আমরা আমাদের বাটীতে এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের পর বুঝতে পারি।"

পেশাদারী ডাকাতরা অহেতুক ভাবে জীবনহানির কারণ ঘটাতো না। কিন্তু আধুনিক ডাকাত দল অযথা বহু প্রাণহানির কারণ ঘটায়। এর কারণ ঐসকল ডাকাতরা সকলেই প্রাথমিক অপরাধী। এদের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অনভ্যাসের কারণেই ইহা ঘটে থাকে। এই সকল ডাকাতদের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ তাদেরকে সদুপদেশ ও পুনর্বাসন দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব। পূর্ব কালে বহু স্বাধীন জমিদারদের ডাকাত পোষণের রাজনৈতিক কারণও ছিল। পাঠান, মুঘোল এবং ব্রিটিশকে এঁরা বিদেশী জবর-দখলকারী মনে করতেন। হিন্দু রাজারা কেহ কেহ পরাস্ত হলেও

এদেব সৈন্যদল বশ্যতা স্বীকার না করে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে এই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করতো। এদের কোনও কোনও দল পরে সাধারণ ডাকাতদের সাথে একত্রে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সামন্ত রাজা তথা জমিদারদের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে সাধারণ ভাবে তারা লুঠপাট করতো। সেই সময় ঐ সকল বিদেশী শাসকদের অত্যাচার চরমে উঠলে জমিদাররা আত্মরক্ষার্থে এই গেরিলা সৈন্যের সমতুল স্থানীয় ডাকাতদেরকে ঐ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত করতো। এইভাবে ওদের সমর-শক্তি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে এরা প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষা করেছে। এই সকল বিদেশী শাসকগণ ঐ সকল জমিদারদের সাহায্যে এই সকল দেশপ্রেমিক ডাকাতদেব নিবারণ করতে সমর্থ হতেন। এই জন্য মোসলেম এবং ব্রিটিশ শাসক [প্রথমাবস্থাতে] হিন্দু জমিদারদের অতি আবশ্যকীয় সহায সম্বল মনে করতেন। এই কারণে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে হিন্দু জমিদারদের আধিক্য দেখি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু তৎকালীন ডেসপ্যাচে দেখা যায যে ডাকতরা ঐ সময় প্রজাদেব কাছে খাজনা পর্যন্ত আদায করতেন। পরাধীন ভারতের শহরাঞ্চলগুলি বিদেশী শাসকদের কবলিত হলেও দূর গ্রামাঞ্চল এদের শৌর্য বীর্যে স্বাধীনতা ভোগ করতো। এ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্য খণ্ডে পুলিশী [প্রাচীন] কর্মকৃত্য শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। এই শাসকগণ মাত্র জমিদারদের মাধ্যমে এদের সাথে আলাপ-আলোচনাতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এই সকল আদর্শ প্রণোদিত দেশপ্রেমিক পূর্বকালীন সেনাদলের অধঃপতিত বংশধর ডাকাতদের অবলুপ্তির পর বহু অপরাধপ্রবণ নিষ্ঠুর আদর্শহীন স্বার্থান্ধ ডাকাত-দলে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের বহু স্থানে এই

ধরনের দুর্বৃত্ত বেপরোয়া ডাকাতদল আজও দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব অভ্যাস ও সংস্কারের কারণে জনসাধারণের বহু ব্যক্তি আজও এদের ঘৃণা করে না, বরং তারা এই সব দুর্বৃত্তদের বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করে। কোনও গৃহস্থ বাটীর কেহ ডাকাত বা সন্ন্যাসী হলে তারা সমাজে আজও শ্রদ্ধেয়। এই ঐতিহাসিক মনোজট্ তথা কমপ্লেক্স হতে বাক্‌প্রয়োগ [সাজেশসন] দ্বারা প্রথমে ঐ স্থানের জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে। মহাপুরুষ বিনোবা ভাবে স্থানীয় জনতাকে ইহা না বুঝিয়ে সমাজ হতে উদ্ভূত ডাকাতদের শোধন করতে যান। আমার মতে এই জন্য এই বিষয়ে তিনি অসফল হয়েছেন।

অধুনা ডাকাতরা তাদের পূর্বতন ঐতিহ্য ত্যাগ করেছে। এখন তাদের ডাকাত না ব'লে সশস্ত্র গুণ্ডা বলা উচিত। এখন কাহাকেও বা নারীর লোভে ডাকাতদলে ভর্তি করা হয়। এই জন্য ঐরূপ বহু অপকার্যে বলাৎকার [RAPE] অপকার্য সমাধা হতে দেখা যায়। প্রকৃত শৌর্যের অধিকারী পূর্বেকার অভিজাত ডাকাত সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত। এখন সবলের ভক্ত এবং দুর্বলের যম রূপ জঘন্য অপরাধী ডাকাতদলের আধিক্য। এরা রক্ষী ও সান্ত্রীদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। কেহ সামান্য আহত হলে এরা ধরা পড়ার ভয়ে পলায়ন করে। এদের সংখ্যা দেখে ভীত না হয়ে একজনকে সামান্য আহত করলেও সুফল ফলে।

পূর্বে গভীর নিশীথে এরা গ্রামের প্রান্তদেশে কোনও গৃহে আগুন লাগিয়ে দিত। গৃহস্থের চিৎকারে গ্রাম শুদ্ধ লোক ঐ আগুন নিভাতে যেত। এই সুযোগে ডাকাতরা গ্রামে অন্য প্রান্তে নির্ধারিত গৃহে ডাকাতি করেছে। এরা অপকর্মের সুবিধার্থে বহু গুপ্তচর নিয়োগও করেছে।

এই রাহাজানি এবং ডাকাতি অপরাধ এদেশের প্রাচীন অপরাধ-সমূহের মধ্যে অন্যতম অপরাধ। ডাকাতি এবং রাহাজানি জলে ও স্থলে, এই উভয় স্থানেই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে [ড্রাই ডিসট্রিক্ট্] সাধারণতঃ লোকে নানা কার্যব্যপদেশে স্থলপথে যাতায়াত করে থাকে। এজন্যে এই অঞ্চলে এই সকল অপরাধ স্থলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহুল জলা প্রদেশে [Wet District] সাধারণতঃ লোকে জলপথেই অধিক যাতায়াত করে থাকে। এই জন্যে এই সকল অপরাধ এই প্রদেশে জলপথে সংঘটিত হয়। প্রথমে জলপথের অপকর্ম সম্বন্ধেই বলা যাক। এই সকল জলদস্যুরা প্রাচীনকালে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী ছিপ্ [বিশ-ত্রিশ দাঁড়ের লম্বা সরু নৌকা] ব্যবহার করত। অনেকগুলি দাঁড সংযুক্ত থাকায় এই সকল হালকা জলযান সকল বহু ব্যক্তিকে অতি দ্রুত বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। সরকার বাহাদুরের প্রচেষ্টায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জলদস্যুর দলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ; অধুনাকালে এদেশে তাদের কোনওরূপ সন্ধান আর মিলে না। আজকালকার জলদস্যুরা সাধারণতঃ যাত্রী নৌকাতে ক'রে বড় বড় নদীতে ডাকাতি ক'রে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কাছাকাছি কোনও যাত্রী নৌকা দেখলে, ঐ নৌকার যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়ে বলে—"একটু আগুন দেবে গো!" এর পর আগুন নেবার অছিলায় এরা এদের নৌকাটি যাত্রী নৌকার পার্শ্বে এনে সদলে ঐ নৌকাটিকে আক্রমণ করতে থাকে। এদেশে "বিজনা" নামক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির জলদস্যুরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্মা বক্ষে আজও ডাকাতি করে থাকে। এই সকল কারণে দয়াপরবশ হ'য়ে মহাজনী, গহনার বা যাত্রী নৌকার লোকেদের "আগুন বা তামাক দেবার জন্যে" কখনও

তাদের নৌকা দাঁড় করান উচিত নয়, বরং "আগুন দেবে গো বা তামুক দেবে গো" প্রভৃতি বচন শুনা মাত্র তাদের নৌকাটিকে বহুদূরে সরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সকল জলদস্যুদের মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় সন্দার এবং গায়না দল অন্যতম। এই সকল জলদস্যুরা নৌকায় ঘুরে বেড়ায় এবং মৎস্য শিকার ক'রে আহার সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সব দস্যুদল কতদূর ভীষণ প্রকৃতির হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"দস্যুদলের অবস্থিতির সংবাদটি পাওয়া মাত্র আমরা নদীর মোহানার দিকে আমাদের নৌকাটি চালিয়ে দিলাম। সামান্য দূর অগ্রসর হয়ে আমরা দস্যুদলের নৌকাটি দেখতে পাই। ঐ নৌকাটিতে চার বা পাঁচ ব্যক্তি সড়কি হাতে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া মাত্র এদের একজন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আয় দেহি কেডা তুই। দশ হাত জলের তলে মাছ রয়, ঐ মাছকেই গাঁথিয়ে তুলছি। তোকে তো হালা দেখা যায়। তোকে তো আমরা গাঁথমুই।' যুক্তি যে অকাট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের এই হুঙ্কারে স্বভাবতঃই আমি ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই।"

প্রাচীনকালে রাজারাজড়া, নবাব এবং জমিদারের অনেকেই যুদ্ধাদি কার্যে বা জমি দখলের জন্যে এই সকল জলবাসীদের প্রায়ই সাহায্য নিতেন। ঐ সকল জমিদার বা রাজবংশের পতনের পর কিছু-কালযাবৎ এই সকল দল কেবলমাত্র দস্যুবৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়।

এই জলদস্যুদের ন্যায় স্থলদস্যুরাও পূর্বকালে এদেশে অত্যন্তরূপ প্রবল ছিল। স্থলবিশেষে এদের দলপতিরা রাজার ন্যায়ই সমাদর

বা সম্মান পেয়েছে। পূর্বকালে জমিদাররা এদের বার্ষিক কর পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছেন। বৃটিশাধীন ভারতের প্রথম দিকটাতেও এদের কম প্রতাপ ছিল না। শুনা গেছে বর্তমান কালের কোনও কোনও নামজাদা জমিদারবংশের পূর্বপুরুষরা পর্যন্ত ডাকাত ছিলেন। এই সকল ডাকাতেরা ডাকাতি করলেও গরিবদের সম্পত্তি এরা কমই অপহরণ করতেন। এদের লক্ষ্য সর্বদাই থাকতো বড় বড় জমিদার-বাড়ি বা মহাজনদের গদির দিকে। এদের একমাত্র বুলি ছিল, "মারি তো গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার।" ভাণ্ডার শব্দটি দ্বারা ট্রেজারি বা রাজভাণ্ডার বুঝায়। এই সকল প্রচলিত কিংবদন্তী বা চলতি কথা হ'তে তৎকালীন ডাকাতদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এদের কেহ কেহ ধনী লোকের অর্থ লুটে এনে ঢোল সহরত ক'রে গরিবদের অর্থ দান করেছেন—এদেশের ডাকাতদের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কাহিনীও শুনা গেছে। এদের প্রতি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহানুভূতি থাকায় এদের ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার করা প্রাচীনকালে অত্যন্তরূপ দুঃসাধ্য ছিল। কাল-ক্রমে ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ডাকাত দলও নিঃশেষিত হয়েছে। পূর্বকালের ডাকাতি সম্বন্ধে অশীতিবর্ষ বয়স্কা এক ঠাকুরমাতার নিকট আমি এইরূপ এক কাহিনী শুনেছিলাম।

"৭৫ বৎসর পূর্বে তোদের এই বাড়িতে যখন আমি বৌ হয়ে আসি, তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেদিন তোদের বার-মহলের দেউড়ির পাশের পাঁচিলটা ঐরূপভাবেই আমি ভাঙা পড়ে থাকতে দেখেছি। কেমন ক'রে অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল, সেই সম্বন্ধে আমি আমার শাশুড়ীর কাছে গল্প শুনেছিলাম। আমি

তখনও একটি ছোট্ট মেয়ে, তাই তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে আমাকেও কত সত্যিকারের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। তাঁর কাছে শুনা সেই গল্পটা তোদের বলে যাচ্ছি, শুনে যা—

হঠাৎ একদিন এক ঝাঁকড়া-চুলো কপালে সিঁদুর মাখা, বেঁটে কালো হোঁতকা গোছের লোক ভূর্জিপত্রের উপর লেখা এক টুকরা চিরকুট-পত্র এনে কর্তামশাই-এর হাতে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম জানাল। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—'এবার হতে প্রতি বৎসর কালীপূজার রাত্রে আপনার বাড়িতে আমার লোক ধর্ণা দেবে। আশা করি বাৎসরিক দেয় সিধা এবং পাঁচকুড়ি টেকা পাঠিয়ে বাধিত হবেন। তা না হলে বাধ্য হয়ে তা আদায় করতে আমি নিজেই আসব। রতনপুরের বড়তরফদের দুর্দশার কথা স্মরণ করে ইহা অন্যথা করবেন না, ইত্যাদি।' এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তেনা [কর্তামশাই] তাঁর তাঁবেদার কয়েকজন বাছা বাছা লাঠিয়ালকে মহাল থেকে আনিয়ে নিয়ে দেউড়িতে এনে জমা করলেন। এর পর কয়েকদিন পরেই এলো সেই কালীপূজার অমানিশি। মধ্যরাত্রের মহাপূজা সবে মাত্র সমাপন হয়েছে। আমরা যে যার ঘরে এসে শয়নের উপক্রম করছি। এমনি সময় একটা বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। দূর হ'তে একটা বীভৎস আওয়াজ আসছিল, 'রে রে রে-এ'। জানালা খুলে সভয়ে আমি চেয়ে দেখলাম। বাইরের পাঁচিলের ওপারে তখন মশালের আগুনের পাঁতি লেগে গেছে। প্রায় আশিজন ডাকাত মশাল, সড়কি ও তরোয়াল হাতে 'রে রে রে' শব্দে এগিয়ে আসছে। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমরা অন্দর মহলের দ্বিতলের উপরকার চাপা সিঁড়িটা বন্ধ করে দিই। আর গহনাপত্র যা কিছু চোরকুঠরীটার মধ্যে আমরা

লুকিয়ে ফেলতে থাকি। ঐ যে চিলের ছাদটা—তোরা আজ যা দেখছিস, ওর ওপরেও আর একটা ঘর ছিল। সেবারের আশ্বিনের ঝড়ে সেটা পড়ে গিয়েছে। ওটা দেখতে ছিল ঠিক একটা উঁচু মিনারের মত। শুনেছি ওর ওপর দাঁড়ালে নাকি গঙ্গা পর্যন্ত দেখা যেত। আমাদের তীরন্দাজরা ঐ মিনারের উপর উঠে তীর আর গুলতি ছুড়ে ডাকাতদের বাধা দিতে থাকে। ওদিকে আমাদের বিশ্বস্ত লাঠিয়ালরাও নীচের উঠানে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে। এমন সময় ঢেঁকিকলের সাহায্যে দেউড়ির পাশের অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ডাকাতরা বার-বাড়িতে ঢুকে পড়ল। চিলের ঘরে রাখা বাঁকা বাঁকা মরচে ধরা ভারি তরোয়ালগুলো দেখেছিস। ঐগুলোই হাতে করে বাড়ির ছেলেরাও সেদিন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুরমশাই তখন শিঙ্গা ফুঁকে অদূরের বাগ্দীপাড়ার প্রজাদের এই ডাকাত পডার সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। ওদিকে কাছারীর একজন সওয়ার রওনা হয়ে গেছে সদরের তশীলদার ও তাঁর বরকন্দাজদের খবর দিতে। কিন্তু এত কাণ্ড করেও ডাকাতদের কেউ আটকে রাখতে পারে নি। দুচারটা হত্যাকাণ্ড সমাধা করে তারা অন্দর মহলের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে দিল। বাঁকা সিঁড়ির উপরকার চাতালের উপর বস্তা দশেক সরষে রাখা ছিল। আমার দিদিশাশুড়ী ছুটে এসে সেই বস্তা বস্তা সরষে সিঁড়ির উপর ঢেলে দিতে লাগলেন। হুড় হুড় করে সরষে নীচে গড়িয়ে পড়ছিল। এই সরষের উপর পা পড়ায় ডাকাতদের সব কয়জনই পা হড়কে একে-একে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আহত হল। ইতিমধ্যে হৈ চৈ করতে করতে এবং 'কালীমায়ী কী জয়' বলে বাগ্দীপাড়ার দুশো ঘর প্রজাও দা-কুড়ুল ও সড়কি নিয়ে হাজির। শুনেছি গৌরে বেদ্দে

ডাকাতদের জীবনের সেই প্রথম পরাজয়। আমাদের মেয়ে-পুরুষের সমবেত সাহস ও বীরত্বই সেইদিন আমাদের মান ও প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল। আমার দিদিশাউড়ীর সাহসের কথা শুনে তোরা অবাক হচ্ছিস, না? সেকালের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে এইরূপ সাহস প্রায়ই দেখাতে হোত। এই সে দিনও আমার শ্বশুরের এক বুড়ী ঝি চোরকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ঘরের মশারির চারটে খুঁট তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে, মশারিটা চোরের ঘাড়ে জালের মত করে চেপে দিয়ে তার উপর উঠে সে নিজে চেপে বসেছিল। চেঁচামেচি শুনে ঝি-এর ঘরে এসে দেখি চোরটা দম বন্ধ হয়ে আধমরার মত হয়ে শুয়ে রয়েছে। এমন কি তার নড়বার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।"

শুনা গেছে, পূর্বকালের ডাকাতরা নিম্নশ্রেণীর হলেও অত্যন্তরূপ কালীভক্ত ছিল। ডাকাতির জন্যে বহির্গত হবার পূর্বে এরা কালী পূজা করে তবে বেরুত। এদের কোনও কোনও দল এই পূজায় নরবলিও দিয়েছে। অনেকের মতে যুদ্ধ-বন্দীদের ধরে এনে বলি দেওয়ার পদ্ধতি হতেই এই নরবলির সৃষ্টি হয়। এই নরবলি সম্বন্ধে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে আমি একটি গল্প শুনেছিলাম। ঐ ভদ্রলোকটি আবার তাঁর ছোটবেলায় অপর এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে ঐ গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটি ঐ ভদ্রলোকের ছোটদাদুর জীবনের একটি কাহিনী অবলম্বনে বলা হয়েছে। বিবৃতির আকারে উক্ত গল্পটি নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল।

"ঐ সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে ভারতের দূরবর্তী তীর্থস্থানগুলিতে আমরা যাতায়াত করতাম। কাশী হতে ফিরতি মুখে আমরা গঙ্গার এক পাড়ে এসে বিশ্রাম করছিলাম। পড়শীরা আমাকেই

কাঠ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে অনুরোধ জানায়। আমি জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় জন চার-পাঁচ ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে ধরে ফেলে। তারা আমার মুখ ও হাত গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে চেংদোলা করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু ক'রে দেয়। এর পর তারা একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর পাড়ে এনে আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা কালীমূর্তি। ঐ ভীমা করাল মূর্তির লকলকে আধ হাত লম্বা জিভ। মসীঘন নগ্ন হাতে তাঁর সত্যকার একটা কাতান। এরা যে আমাকে মায়ের কাছে বলি দিতে এনেছে তা বুঝতে আমার বাকি থাকে নি। আশেপাশে চেটাই পেতে প্রায় জন ষাটেক লোক বসে বসে তামুক খাচ্ছিল। অদূরে হাঁড়কাঠ আর তার পাশে রাখা মাজা-তোলা খাঁড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি শিউরে উঠছিলাম। এর পর রাত্রি দুইটার সময় পূজার পর এদের জন দুই লোকে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে হাত ধরে আমাকে পুকুর পাড়ে স্নান করাবার জন্যে নিয়ে এলো। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে জলেও নেমে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার উত্তমরূপ ডুব সাঁতার জানা ছিল। আমার বুকের জোর ও দমও ছিল অসম্ভব। ডুব দিবার অছিলায় ডুব মেরে এক ডুবে আমি পুকুরের এপারে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা বড় গাছের মগডালে উঠে নিঃসাড়ে বসে থাকি। ডাকাতরা মশাল জেলে বনে বাদাড়ে আমাকে অনেক খোঁজাখুজি করে শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যায়। ইত্যবসরে আমি চুপি চুপি নেমে এসে পা টিপে টিপে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে পরে একদৌড়ে গঙ্গার ধারে এসে আমাদের নৌকাটায় উঠে পড়ি। মা কালীরই দয়ায় সে যাত্রা আমার প্রাণটি কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল।

তাই তোমাদের এই গল্পটাও শুনাতে পারলাম। নইলে বন্ধুদের সকলে মনে করত আমাকে বাঘেই নিয়ে গেছে।"

এইরূপ কাপালিক ডাকাতের কাহিনী বাঙলায় ঘরে ঘরে শুনা যায়। জানি না এর মধ্যে কতটা সত্য আছে। তবে জনপ্রবাদ মাত্রকেই অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। কারুর দেহে ক্ষত থাকলে খুঁত আছে বলে বন্দীকে বলি না দিয়ে এরা ছেড়ে দিত। এ যুগেও কোনও কোনও ডাকাত দলের মধ্যে অত্যনুরূপ কালীভক্তি

দেখা গেছে। তা ঐতিহাসিক সত্য বিধায় উহা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রাক্তনকালের জলদস্যুগণ দ্রুত গমনাগমনের জন্যে যেমন ছিপ-নৌকা ব্যবহার করত, স্থলদস্যুরা তেমনি দ্রুত গমনাগমনের জন্যে একপ্রকার "রণ-পা" ব্যবহার করতো। এই রণ অর্থে এখানে যুদ্ধ বুঝায়। রণ-পা দুই খণ্ড লম্বা পাতলা বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। এই বাঁশের মধ্যস্থলে একটা করে গাঁইট থাকে। এই গাঁইট দুইটিতে পা দিয়ে অনেক উপরে উঠে ডাকাতরা এই রণ-পার সাহায্যে ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ধাবিত হ'তে পারত। এই রণ-পার সাহায্যে এরা সদলে খাল, বিল, মাঠ, ধেনো জমি ও কাশবন ভেদ করে অতি দ্রুত অন্তর্ধান হ'তে সক্ষম ছিল। এই রণ পা সম্বলিত ডাকাতদের চলবার সময় মনে হত যেন বড় বড় দৈত্য বিরাট বিরাট লম্বা পায়ের সাহায্যে চলতে শুরু করেছে। এই রণ-পা ব্যবহার অত্যন্তরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে। ফিন্ জাতি ব্যতীত যেমন অন্য কোনও জাতি বরফের উপর "স্কিই" ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, ভারতবর্ষে বাঙ্গালী ছাড়া এই রণ পা ও তেমনি অন্য কেহ অনুরূপ ভাবে ব্যবহার করতে পারে নি। এই রণ-পা ব্যবহারে দক্ষ সুশিক্ষিত ডাকাতদের এ যুগের মেকানাইজড্ ট্রুপের সহিত তুলনা করা চলে। বাঙ্গালী রাজাদের আমলে সৈন্য-সামন্তরা গতির কারণে এই রণ-পা ব্যবহার করত। এই কারণে এই কৃত্রিম পা'কে রণ-পা বলা হয়। প্রাচীন ভারতেও রাজাদের যুদ্ধের রীতি ছিল কতকটা এইরূপ। প্রথমে [প্রথম লাইনে] অধুনাকালের বৃহৎ বৃহৎ ট্যাঙ্কের ন্যায় বর্মাবৃত হস্তীচমূ তাদের বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে সকল বাধা-বিপত্তি চুরমার করে দিয়ে পররাজ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত এবং এই জীবন্ত ট্যাঙ্কবাহিনীর পিছন পিছন ছুটে চলত যুদ্ধ রথ ও অশ্ব-বাহিনী। আধুনিক মোটরবাহিনীর সাথে উহার তুলনা করা হয়।

কিন্তু এই যুদ্ধরীতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কঠিন ভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে কার্য্যকরী হলেও বাঙ্গালার স্থলপথ বিহীন ভূমি এবং জলা মাঠ-ঘাটগুলিতে এইরূপ যুদ্ধপদ্ধতি একেবারে অচল ছিল। এই কারণে এদেশে রাজারাজড়ার সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত গমনাগমনের জন্যে জলপথে ছিপ-নৌকা এবং স্থলপথে এই রণ-পা'র সাহায্য নিতে হ'ত। এক কথায় এই রণ-পা পদ্ধতি বাঙ্গালী যোদ্ধাদের এক নিজস্ব জিনিস। বলা বাহুল্য, বড় বড় রাজবংশের পতনের পর—তাঁদেরই সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বকালে এই সকল ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল। এই রণ পা শব্দটি এবং ডাকাতদল দ্বারা উহার একচেটিয়া ব্যবহার ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। ৪০৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত যোদ্ধা মানুষের চিত্রটি হতে রণ-পা সম্বন্ধে সম্যকরূপ ধারণা করা যাবে।

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে যে সকল ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল জমিদারদের বরখাস্ত করা বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ। পাঠান রাজত্বের সময় এই সকল জমিদার আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন। এই কারণে বংশপরম্পরায় তাঁদের এই সকল বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বংশকে জমি দান করে স্বরাজ্যে বসবাস করাতে হ'ত। বংশপরম্পরায় এদের পেশাই ছিল জমিদারদের হয়ে লড়াই করা। মোগল শাসনকালে জমিদারদের আভ্যন্তরিক ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হলেও এই সকল লড়াকুদের নিজ প্রয়োজনে তাঁরা বহুকাল পর্যন্ত ভরণপোষণ করে এসেছেন। ইংরাজ শাসনকালেও কিছুকাল যাবৎ এই সকল জমিদারদের হাতেই দেশের পুলিশের [শান্তিরক্ষার] ভার ন্যস্ত ছিল। এরপর যথারীতি পুলিশ

ও শাসন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর জমিদারদের নিকট এদের কোনও প্রয়োজন থাকে নি। এই সকল বরখাস্ত লাঠিয়ালদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্যে তৎকালীন ডাকাতদের সর্দারদের নিকট কর্মে বহাল হ'তে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে এই সময় বাঙ্গালার জেলায় জেলায় অনেকগুলি দুর্ধর্ষ ডাকাতদল সংগঠিত হয়েছিল। আজকাল কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় ডাকাতরা যে এই সকল যোদ্ধবংশেরই অযোগ্য [অধঃপতিত] বংশধর তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার বাগ্দী জাতির কথা বলা চলে। এই বাগ্দী জাতির কয়েকটি শাখাকে অধুনাকালে তাদের আক্রমণাত্মক স্বভাবের জন্যে স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির [Criminal Tribe] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বাগ্দীজাতি একদা সময় ব্যবসায়ী জাতি সকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। মারাঠাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দী খান তাঁর পরিবারবর্গকে নিরাপত্তার জন্যে যে সময় নাটোর রাজপরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় অর্ধস্বাধীন নাটোর সরকারের অধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের বগ্দী সৈন্য এবং বিহারের ভোজপুরী সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল। এই বাগ্দী জাতীয় সৈন্যদের উপর অত্যন্তরূপ আস্থা থাকার কারণেই নবাব আলীবর্দী খান এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বাগ্দী সৈন্যদের বীরত্ব ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। এইরূপ সৈন্যের সাহায্যে বিষ্ণুপুর বহুদিন পর্যন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান সকল এই বাগ্দী সৈন্য দ্বারাই পরিচালিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বাগ্দী জাতীয় লোকদেরই কোনও কোনও দল পরবর্তীকালে ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল। আবহমানকাল ধরে অর্জিত যুদ্ধস্পৃহা এরা আজও বোধ হয় ত্যাগ

করতে পারে নি, তাই এতদিনের চেষ্টাতেও এই সকল স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির স্বভাব বদলান যায় নি।

[ইহার অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্মী স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় বেকার জাতি। এরা পূর্বে টিপুসুলতানের অন্যতম সেনা ও সেনানী রূপে বহাল ছিল। কিন্তু ঐ রাজ্যের পতনের পর হতে আজও পর্যন্ত তারা ডাকাতি করেই বেড়ায়।]

আমার মতে এই সকল স্বভাব-দুর্বৃত্তদের সামরিক বিভাগে ভর্তি ক'রে এদের মজ্জাগত যুদ্ধস্পৃহার উপশম ঘটিয়ে এদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সকল উপজাতীয় লোকদের অনেকে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত যুদ্ধস্পৃহা তারা হারায় নি। আজও জমিদারী দখল নিয়ে যখন তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তখন তারা এই দাঙ্গার মধ্যে যুদ্ধবিদ্যাই প্রদর্শন করে থাকে। গ্রাম হ'তে দূর প্রান্তরের মধ্যে এসে এরা যুদ্ধ করে। একজন হয় তো এপার হ'তে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "করিম ভাই, সামাল নাও, না-আ-ক, নাক লক্ষ্য করে কোঁচা ছুড়লাম।" করিম ভাই এর পর তাড়াতাড়ি বাঁশের তৈরি ঢালের সাহায্যে নাক বাঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রাধু খুড়ো, চোখ বাঁচাও, ভাইরে চোখ। এই ছুড়লাম সড়কী, সা-মা-সামাল।" এই ভাবে এরা খালের ধারে বা প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করলেও এরা কখনও গ্রামের মধ্যে এসে শান্তি ভঙ্গ করে নি। পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে মাত্র এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে। উহার মধ্যে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক দোষ যাঁরা দেখে থাকেন তাঁরা ভুলই করেন। ঐ যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের নারীরা স্ব স্ব দলের পুরুষদের খাদ্য দিত ও শুশ্রূষা করত। কিন্তু ঐ সময় তারা কাহারও ক্ষুণ্ণ

নিগৃহীত হয় নি। এই সকল উপজাতীয় লোকেরা সড়কি ব্যতীত এক প্রকার কানা ভাঙা পিতলের বা কাঁসার থালিও ব্যবহার ক'রে থাকে। ভাঙা থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন জোরে এরা ছুড়ে দেয় যে উহারা মুণ্ড কর্তনে সক্ষম হ'তে পারে।* পূর্বকালে ডাকাতরা এবং যোদ্ধারা এইরূপ কানা ভাঙা থালি যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার করেছে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে বর্তমান কালের উপজাতীয় ডাকাতদলের জন্ম-কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল যুদ্ধব্যবসায়ী জাতীয় লোকেদের যে সকল দল চাষবাসের কার্যে নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনধারা বদলাতে পারে নি, তারাই পূর্বকালের ডাকাতদলের এবং বর্তমান কালের কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির সৃষ্টি করেছে।

[বাঙ্গালী যোদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে বাগদী ও ডোম জাতি ছিল অন্যতম। আগডম বাগডম ঘোড়াডুম—একটা প্রাচীন প্রবাদ, অর্থাৎ আগে ও পাছে পদাতিক ডোম ও সেই সঙ্গে আছে অশ্বারোহী। ইংরাজেরা প্রথমে বাঙ্গালী ডোম প্রভৃতিদের সংগ্রহ করে দেশীয় বাহিনী সৃষ্টি করে। এদের সাহায্যে মাদ্রাজ, মাদ্রাজীদের সাহায্যে রেহাই এবং এদের সকলের সাহায্যে ভারতের অন্য প্রদেশ এবং পরে পাঞ্জাবী, মারাঠী ও গুর্খাদের সাহায্যে সমগ্র ভারত ওরা জয় করেছিল।]

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই সকল সামরিক জাতির লোকদের দ্বারা গঠিত বহু ডাকাতদল ভারতের জেলায় জেলায়

* দড়ির গিঁটের সহিত ইষ্টক খণ্ড ন্যস্ত করে এবং উহা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন ভাবে ওরা ছুঁড়ে যে উহা গুলির মতই বেগে ছুটে এসে মানুষ হত্যা করতে সক্ষম হয়।

ঘুরাফিরা করত। বাংলার ডাকাতদের মধ্যে গোরে বেদে ও রঘু ডাকাত ছিল অন্যতম। এদের উভয়েরই বাস ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিশহর পরগণায়। নৈহাটীর সন্নিকটে মাদরাল গ্রামের প্রান্তদেশে রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। স্থানীয় লোকেদের ধারণা এই যে এখনও আশে-পাশে জঙ্গলে জমিগুলা খুঁড়লে ডাকাতদের পুঁতে রাখা গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে।

ঐ সময় কোনও দূর গ্রামে যেতে হ'লে গ্রামবাসিগণ প্রায়ই উইলাদি লিখে বা জমিজমার স্থায়ী বিলি ব্যবস্থা করে তবে বাড়ির বার হত। কারণ এঁদের প্রতিটি মুহূর্তেই ডাকাতের বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা রেখে এই সময় এঁদের পথ চলতে হ'ত। এখনও এমনি অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ বা ডাকাতে কালীর কাহিনী গ্রামে গ্রামে শুনা গিয়ে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কোনও জমিদারবাড়িতে আহার করতে এলে কখনও নুন খেত না। অর্থাৎ কি'না এরা নুন বিহীন আহার করে যেত। কারণ এরা জানত এই সকল জমিদারের সহিত চিরদিন তাদের ভাব নাও থাকতে পারে। গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধানে এরা পুরুষদের খোঁটায় বেঁধে কলকের ছ্যাঁকা দিয়েছে। কিন্তু মা-জননীদের গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের গাত্র হ'তে একটি গহনা খুলবারও কখনও প্রয়াস পায় নি। কিন্তু অধুনাকালের ডাকাতদলের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিক ডাকাতরা কোনও কোনও সময় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার ক'রে থাকে।

অধুনাকালের ডাকাতদলের মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় তুঁতিয়া মুসলমান এবং বাগ্দী জাতি ও ডোম জাতি অন্যতম। এরা আজও

ডাকাতির সময় ঢেঁকিকল ব্যবহার করে থাকে। এই ঢেঁকিকল একটি সাধারণ ধান ভাঙা ঢেঁকিমাত্র। পল্লীগ্রামের ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বাড়িতেই ইহা দেখা যায়। এই দুর্বৃত্তগণ কোনও এক গরীবের ঢেঁকিঘর হ'তে একটি ঢেঁকি অপহরণ ক'রে উহা তিনটি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে ভূমি হ'তে কিছু উপরে ঝুলিয়ে দেয়। এইরূপে তৈয়ারি যন্ত্রকেই বলা হয় ঢেঁকিকল। য়ুরোপীয় যোদ্ধারাও প্রাচীনকালে দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গের জন্যে এই ধরনের এক যন্ত্র ব্যবহার করত। ইহাকে বলা হত ব্যাটারী র‍্যাম [Battery Ram]। নিম্নে এই ঢেঁকিকলের প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। এই ঢেঁকিকল ধনী ব্যক্তির গৃহের দুয়ারের সামনে এনে এরা ঐ ঝুলানো ঢেঁকির দড়ি ধরে কিছুটা দূরে টেনে এনে উহা সবেগে

দুয়ারের উপর ঠেলে দিত। এই ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে যে কোনও দুয়ার বা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর ভেঙে পড়েছে।

ভুঁতিয়া মুসলমানরা ঐরূপ ধানভাঙা ঢেঁকির সাহায্য নেওয়া ছাড়া দেওয়ালের খড়া ব'য়েও উপরে উঠে থাকে। এইভাবে এদের একজন বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে সদরের দরজা খুলে দিলে দলের বাকি লোকেরা চীৎকার করতে করতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে। এরা ডাকাতির পূর্বে আশ-পাশের গৃহস্থদের বাটীর দরজার কড়াগুলা দড়ির দ্বারা বেঁধে রাখে, যাতে ক'রে চীৎকার শুনলে তাদের কেহ আক্রান্ত লোকেদের সাহায্যে আসতে না পারে। এরা তরোয়াল, মশাল ও লাঠির সাহায্যে ডাকাতি করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা ছোট ছোট শিশুদের মাটিতে উপুড় করে ফেলে তাদের পিঠে পা রেখে কোমরের সোনার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। এই ডাকাতদল মেয়েদের গাত্র হতেও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়েছে। পলায়নের সময়, "মাছি, ঘন জাল গুটো"—এই শব্দটি তারা ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, "মাছিরা উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটোও, অর্থাৎ কি'না এইবার সরে পড়!" এই সকল ডাকাত অভিযানের সময় বা প্রত্যাগমনের সময় শিয়ালের অনুকরণে চীৎকার করে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়ে থাকে। এই ভুঁতিয়া মুসলমানের ন্যায় মঘেরা ডোমরাও এইরূপ করে থাকে। সাধারণতঃ যশোহর, মেদনীপুর, নদীয়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় এরা ডাকাতি করে বেড়ায়। হিন্দুদের মধ্যে পোদ, বাগ্দী, কেওরা ও থারু জাতীয় লোকেরাও ডাকাতি করে। হিন্দি ভাষী হিন্দুদের মধ্যে চম্পারণের কুর্মী, পালওয়ার, দুসাদ এবং রায়বোধলী, বারাবাংকির পাশীরাও বাংলা দেশে ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মানভূমের ভীমজী এবং বিহারের ভোব নামক সম্প্রদায়

জাতিরাও ডাকাতি করে বেড়ায়।* এরা ডাকাতির জন্যে তরোয়াল, সড়কি, কুড়ুল, মশাল এবং সময় সময় বন্দুক-ডিনামাইটও ব্যবহার ক'রে থাকে। এ ছাড়া এরা একপ্রকার মুখোসও ব্যবহার করে থাকে। এদের কেহ কেহ সারা মুখময় এমনভাবে আলকাতরা মাখে, যাতে কেহ তাদের চিনতে না পারে। আক্রমণ, প্রত্যাগমন এবং গমনাগমনের সময় এরা যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে, তা হ'তে এ বেশ বোঝা যায় যে এরাই পূর্বকালের যোদ্ধৃদল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি মাত্র এইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ উদ্ধৃত করা হ'ল—"ব্রো" অর্থাৎ কিনা "যাও"[Quick march]। "বে ব্রো" অর্থাৎ কিনা "শীঘ্র যাও" [Double march]। এ ছাড়া এই স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

পুরাকালের ডাকাতদলের মধ্যে ঠগী ও পিণ্ডারী ডাকাতদল ছিল অন্যতম। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'—তৎকালীন বিখ্যাত জনপ্রবাদ। কোনওরূপ বাধা না পাওয়ায় এরা সংখ্যাবহুল হয়ে উঠে। সাধারণতঃ এরা পথিকদেরই অর্থাদি অপহরণ করেছে। এরা একটা রুমাল, গামছা বা বস্ত্রখণ্ডের একটি খুঁটে একটা পয়সা বেঁধে ঐ খুঁটটি আক্রান্ত ব্যক্তির গলদেশে এমনভাবে ছুড়ে দিত যাতে করে উহা ফাঁসের আকারে গলায় আটকে যায়। এইভাবে এরা মানুষ হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিত। এদের দলপতিগণ বিকৃত সংস্কৃত শব্দে এবং হিন্দীতে আদেশ প্রদান করতেন। যথা (১) চলে না দেশম্। অর্থাৎ অতিক্রম ও হত্যা কার্য শুরু করো। (২) 'তামাকু লে আও' অর্থাৎ 'অল্ ক্লিয়ার'। এদের দলে হিন্দু ও মুসলিম ছিল। কিন্তু অপকর্মে সাফল্যের জন্য উভয়েই কালীপূজা করতো।

এদের কেউ কেউ ডাইনী পূজাও করেছে। এদের দমনের জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ডাকাতদল এক্ষণে নিঃশেষিত হয়েছে।

সে যুগের অনেক জমিদারও এদের গোপনে সাহায্য করেছে। ভুল ক'রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মনিব জমিদারের জামাতাকেই পথিমধ্যে হত্যা ক'রে তার সোনার হার ও আংটি তারই শ্বশুরকে এনে দিয়েছে। এমন বহু কাহিনী এদেশে শোনা গিয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক ডাকাতদল জীবজন্তুর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। দলপতিরা প্রায়ই ইহার দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে জড় হবার জন্যে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি আজও এই ধরনের ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমার বাস ছিল বর্ধমান অঞ্চলের এক পল্লীগ্রামে। বহু বৎসর পূর্বের কথা—আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতা-ঠাকুর পাড়ার মুখুয্যে মশাই-এর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ একটা শিয়ালের ডাক শুনা গেল, 'হুয়া-য়া-য়া, হু-উ-উ বল-হুয়া।' মুখুয্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে শুধালেন, 'উহু বাঁড়ুয্যে! গতিক সুবিধে নয়। এ যে এক শিয়ালীর ডাক!' এক-শিয়ালীর ডাক এক ভয়াবহ ব্যাপার। সাধারণতঃ কখনও মাত্র একটা শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক শিয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও এক

দস্যু সর্দার শিয়ালের ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে তার অনুচরদের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হ'তে বলছিল। মুখুয্যেমশাইয়ের কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিঁড়ি বন্ধ করলেন। মুখুয্যেমশাইও আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হ'লেন। সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতরা পাড়ার মনো স্যাকরাকে কেটে দু'খানা ক'রে তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে।"

হিংস্র জীবজন্তুমাত্রই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করবার পূর্বে একটা বিকটরূপ ডাক ডেকে' নেয়। এই হাঁক বা চীৎকার শুনে দুর্বল জীবরা এমনই নিস্তেজ এবং ভীত হয়ে পড়ে। এদের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা! এই অবস্থায় তারা পলায়নে পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ রক্ত তাদের হিম হয়ে যায়। স্নায়ুর শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলে। এর অল্পকাল পরেই এই হিংস্র জীবরা তাদের শিকারের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাদের বধ ক'রে থাকে। ব্যাঘ্র-সিংহাদি তাদের সিংহনাদ এই কারণেই ক'রে থাকে। এদেশের ডাকাতদলও এইরূপ রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। এরা কোনও গৃহস্থ বাড়িতে হানা দিবার পূর্বে এই সব জীবজন্তুর অনুকরণে মুহুর্মুহুঃ হাঁক দিতে থাকে। এই হাঁককে "জীর্গা" হাঁক বলে থাকে। চলতি কথায় এই হাঁককে বলা হয় "জীর্গা দেওয়া"। যথা—"আবা-আবা-আবা-আ। ইয়া-য়া-য়া—" কিংবা "ও ও ও ো,—এ-এ-এ-ে"—কিংবা "রে রে রে-এ-এ—" ইত্যাদি। এ দেশের নমঃশূদ্র, বাগ্দী প্রভৃতি সমরপ্রিয় জাতিরা প্রায়ই এইরূপ জীর্গা হাঁক হেঁকে থাকে। হঠাৎ এদের কাউকে দেখে কোনও গৃহস্থ যদি জিজ্ঞাসা করে, "কেডা রে?" তাহলে উত্তরে এরা

এইরূপ বলে থাকে, "তোর যম্" বা "তোর বাবা" ইত্যাদি।*

আজকালকার কোনও কোনও ডাকাতদল এক অভিনব উপায়ে গৃহস্থদের দরজা খুলে দিতে প্ররোচিত করে। রাত্রিকালে এদের একজন এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পোস্টাল পিওনের অনুকরণে চেঁচাতে থাকে, 'বাবু, টেলিগেরাম, টেলি আছে—এ—'। টেলিগ্রাম এ দেশে সাধারণতঃ দুঃসংবাদই বহন ক'রে আনে, শুভকার্যে টেলিগ্রাম করার রীতি এদেশে প্রচলিত নেই। টেলিগ্রাম আসার সংবাদ শুনা মাত্র গৃহস্থগণ [দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে] তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজা খুলে দেয়। এর পর দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ডাকাতরা সদলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে এরা লক্ষ্য করে কখন গ্রাম্য গৃহস্থ রাত্রে বাহ্যে বা প্রস্রাবের জন্য বাড়ির বার হয়। এই সুযোগে তারা বাড়ি ঢুকে বস্ত্র দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ করে। লুঠ করার পর এরা বাহির হতে বাড়ির দরজা বন্ধ করে। এর পর এদেরকে চীৎকার করার সুযোগ না দিয়ে এরা সরে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের একটা দল যাত্রা বা কবিদল সেজে গ্রামের প্রান্তরে নাচ বা যাত্রা বসিয়ে গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঐ স্থানে আটকে রাখে এবং এই অবসরে এদের অন্য দল গ্রামের অপর সীমানায় অবস্থিত একটি ধনী গৃহস্থের বাটীতে হানা দিয়ে কার্য সমাধা করে। কখনও এদের একজন গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে

* এদেশে এমন অনেক শীর্ণকায় লোকও দেখা যায় যাদের ডাকাত মনে করতে মন চাইবে না। কিন্তু দুই ভাঁড় তাড়ি পেটে পড়া মাত্র এরাই হয়ে উঠে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ডাকাত—এই সময় তাদের স্বভাবগত শান্ত ভাব আর থাকে না।

খবর দেয় কোনও এক গ্রামে ডাকাতি হবে। পুলিশ এই খবর পেয়ে তাদের সমুদয় দলবলসহ সেই গ্রামে জমা হয়। ইত্যবসরে ঐ ডাকাতদল অপর আর এক গ্রামে হানা দিয়ে সারারাত লুঠতরাজ করতে থাকে। শহরের অপরাধীরা আজকাল এক অভিনব উপায়ে লুঠতরাজ বা রাহাজানি ক'রে থাকে। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। মাসাধিককাল বস্ত্রের অভাবে আমার ব্যবসা যাবার দাখিল হয়েছে। ইতিমধ্যে এক দালালের মারফৎ খবর পাই অমুক ব্যক্তি ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু কাপড় বিক্রয় করবে। এর পর বন্দোবস্ত মত আমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হই। অকুস্থলে হাজির হওয়া মাত্র একদল লোক ছুরি হাতে আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমার টাকাগুলা সব কেড়ে নিয়ে প্রস্থান করে—আমি হাতে ও পিঠে ছুরির দ্বারা আহতও হই।"

এইভাবে কাহাকে বাড়ি ক্রয়ের কারণে, কাহাকে বা নিষিদ্ধ দ্রব্য দিবার অছিলায়, কোনও এক নিভৃত স্থানে ভুলিয়ে এনে এরা এদের অর্থাদি কেড়ে নিয়ে থাকে। এইরূপ অপকর্মের কাহিনী বড় বড় শহরে প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন বিড্‌ গ্যাম্বলার বা নওসেরা চিট্ রূপেই এদের দলে ভর্তি হই। এদের আড্ডায় এসে কিন্তু দেখি যে তাস বা জুয়ার কোনও খবর নেই। সেরেফ ভুলিয়ে এনে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াই দেখি এদের একমাত্র কাজ। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এই ডাকাতদের দল হ'তে সরে পড়ে' আমি এক আসল নওসেরা দলের সন্ধানে বহির্গত হই।"

কিছুকাল পূর্বে রাজসাহীর কোনও এক গ্রামের জমিদারবাড়িতে এক অভিনবরূপে ডাকাতি হয়। এই অপকার্যে ডাকাত দল বিবাহের শোভাযাত্রী দল সেজে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হয়েছিল। এদের কাছে স্টেশন হতে গ্রাম পর্যন্ত পথ-নির্দেশক একটি প্ল্যানও দেখা গিয়েছে। অধুনাকালের ডাকাতির মধ্যে রেলওয়ে রবারি এক অন্যতম অপরাধ। এই অপকার্যে দলের একজন ট্রেনেই অবস্থান করে এবং ব্যবস্থামত ট্রেনটি একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে এলে শিকল টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়। দলের লোকেরা ঐ স্থানে পূর্ব ব্যবস্থামত পূর্ব হতেই হাজির থাকে এবং ট্রেনটি দুর্বৃত্তদের মনোনীত স্থানে আসা মাত্র এরা ট্রেনে উঠে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। অধুনা-কালের কোনও কোনও ডাকাতদের অকারণে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে দেখা যায়—এমন কি সামান্য অর্থের জন্যে বিনা প্রযোজনেও এরা মনুষ্য হত্যাও করে থাকে। এইরূপ মনোবৃত্তি অত্যন্তরূপ বস্তুতান্ত্রিকতার কারণেই এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এ জন্যে অধুনাকালীন ধর্ম-বিশ্বাস-হীনতাই দায়ী। এরা সাধারণতঃ প্রাথমিক অপরাধী হ'য়ে থাকে। এদের মতে পাপ বা পুণ্য মনের এক বিকারমাত্র। এ'ছাড়া এদের কেহ কেহ অকুস্থলে এসে এমন নারভাস্ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে যে, এই সময় এরা বুদ্ধিবিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় এরা যাকে সম্মুখে পায় নির্বিচারে তাকেই হত্যা করে থাকে। এই সময় অভ্যাসের অভাবে এরা স্নায়বিক রোগীবিশেষে পরিণত হয়। দুরূহ কার্যে এদের ধৈর্য, সাহস ও চিত্ত সংযমের অক্ষমতাই ইহার কারণ; কিন্তু প্রকৃত বা পেশাদারী ডাকাতদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ, এরা অপকর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরা ভালরূপেই বুঝে যে, এইরূপ অহেতুক নিষ্ঠুরতা এদের ব্যবসায়ের

ক্ষতিকারক। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এদের নিজস্ব মতবাদও থাকে। এই কারণে বেশি কান্নাকাটি করলে এদের কেহ কেহ গৃহস্থদের অপহৃত দ্রব্যের কিয়দংশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েও এসেছে। এরা অকুস্থলে এসে কদাপি স্থৈর্য ও ধৈর্য হারায় না।

এদেশে এমন ডাকাতও আছে যারা কেবলমাত্র একটা উত্তেজনা উপভোগ করার জন্যে বা একটা রোমান্সের কারণেই ডাকাতি করে থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও এক ভদ্র ডাকাতের একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"মনে করুন কোনও এক বাড়ির কথা। সদলবলে আমি পাঁচিল টপকে কোনও এক বাটীতে প্রবেশ করছি। বাড়ির স্ত্রীপুরুষেরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করেছে, আর আমি একজন বিজয়ী বীরের ন্যায় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এর চেয়েও বড় রোমান্স কি আপনি কল্পনা করতে পারেন ?"

অধুনাকালে কোনও কোনও [স্থানীয়] ডাকাত দেখা যায়, যারা মোটর আরোহীদের লুণ্ঠন করবার জন্যে রাজপথে বাঁশ বেঁধে রাখে। এরূপ ঘটনা শহর হতে দূরে ঘটে। এ সম্বন্ধে নিয়ে একটি চিন্তা-কর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি সপরিবারে মোটরযোগে অমুক জায়গায় যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পাই একদল লোক রাস্তার উপর একটা বাঁশ তুলে ধরেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি বুঝে নিই এবং সজোরে গাড়িটা ব্যাক্ ক'রে নিয়ে অনেকদূর পিছিয়ে আসি। তারপর উহা ঘুরিয়ে নিয়ে সরে পড়ি। ডাকাতদল দৌড়ে আসে বটে কিন্তু আমাদের আর তারা নাগাল পায় না।"

[সলমান আমলে এই ডাকাতদল বহুস্থানে প্যারেলাল গভর্নমেণ্ট

স্থাপন করেছিল। অবশ্য স্থানীয় জমিদাররাও এই বিষয়ে এদের সাহায্য করেছে। মুসলমানগণ হিন্দুস্থানের শহরসমূহে এবং রাজধানীতে আধিপত্য স্থাপন করলেও গ্রামাঞ্চলে বা দেশের অভ্যন্তরাঞ্চলে এঁদের কোনও প্রতাপ ছিল না। ঐ সকল স্থানে জমিদারগণ এবং ডাকাতদের নেতাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই কারণে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতির উত্থানে মোগল সাম্রাজ্য সহজেই ভেঙে পড়েছিল।]

মোটর ডাকাতি বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষ অবদান। এ দেশে এই প্রকার ডাকাতি [রাজনৈতিক ও সাধারণ ডাকাতি] মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের

যুবকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ও শিখরা তাদের ট্যাক্সির নম্বর বদলে বা উহার এক' বা দুইটি ডিজিট পাল্টিয়ে বা উঠিয়ে ঐ সব যানে বন্দুক ও তরবারি সহকারে ডাকাতি করেছে। বাঙ্গালীরা পিস্তল, স্টেন্‌গান, হাতবোমা প্রভৃতি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ছুরিকা, পিস্তল ও জিপ্লো আদি এই অপকার্যে ব্যবহার করেছে। এই জিপ্লোর স্বরূপ ও ব্যবহার চাতুর্য পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে অ্যাংলো অপদল ও রেড্‌হট্ স্করপিয়ন গ্যাঙ্

সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বপৃষ্ঠায় ঐরূপ এক অস্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল।

সাধারণতঃ কয়েকটি মোটর গাড়ি এই অপকার্যে, সংগ্রহ বা চুরি করা হয়। এর পর রাত্রে দ্বারবানের ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে এরা পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে। ঘটনাস্থলে এসে সিডন্ বডি কারের ছাদে উঠে এরা গ্যাস ও অন্যান্য স্ট্রিট-লাইট প্রথমে নিভিয়ে দেয়। এর পর ওরা একটি বেঞ্চ বা বংশদণ্ড সংগ্রহ করে উহা মোটরের সম্মুখের অংশে এবং দোকান প্রভৃতির দুয়ারের উপর সংলগ্ন করে ঐ মোটরকার সতেজে সম্মুখে চালিয়ে ঐ দুয়ার ভেঙে ফেলে। কখনও কখনও লৌহ শিকলের এক মুখ জুয়েলারী দোকানের লৌহ গরাদে এবং উহার অপর মুখ মোটরকারের পিছনে বেঁধে ঐ গাড়ি সম্মুখে সবেগে চালিয়ে ঐরূপ লৌহ কপাটও উপড়ে ফেলেছে। ঘরে ঢুকে এরা কেহ জলন্ত বিজলী বাতি ত্বরিত গতিতে জিম্মোর বা যষ্টির আঘাতে ভেঙে দিয়েছে। দোকানী বা অপর কেহ চেঁচালে এরা তাদের মুখে তোয়ালে-গামছা গুঁজে উহা অপর এক বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে দেয়। তবে প্রায়ই ছুরিকা বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের নিস্তব্ধ করা হয়ে থাকে। এই সময় এদের দুই-একজন বাহিরের পাহারাদার মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ করতে থাকে যাতে ঐ শব্দে আক্রান্তদের চীৎকারের শব্দ ডুবে যায়। এর পরে ঐ মোটরকারগুলিতেই লুঠের দ্রব্য তুলে তারা দ্রুতগতিতে সরে পড়ে। এই সময় জনতা তাদের তেড়ে এলে তারা মোটর হ'তে হাতবোমা নিক্ষেপ করে তাদের হটিয়ে দিয়েছে। এরা দুইটি ক্ষুদ্র লৌহ তার মধ্যস্থলে সংযুক্ত করে চারিটি ফলকযুক্ত কণ্টক মণ্ডপ তৈরি ক'রে তা অনুসরণকারী মোটরের সম্মুখে ছড়িয়ে দেয়। এই মণ্ডপের যে কোনও তিনটি ফলক নিয়ে

জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে উহার চতুর্থটি ঊর্ধ্বমুখী হয়ে টায়ার পাঙচার করে দেয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অর্থ সংগ্রহের অজুহাতেও ডাকাতি করা হয়। এইরূপ ডাকাতি সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে রাজনৈতিক অপরাধ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আজকাল অবশ্য এইরূপ ঘটনা বিরল। কারণ, দেশের লোককে এমনভাবে এরা আর চটাতে চায় না।

ট্যাক্স ফাঁকি

ট্যাক্স ফাঁকিকে অপরাধ না বলে উহাকে পাপ বা অন্যায় বলা চলে। বহু ব্যক্তি উহা ইচ্ছা করে ফাঁকি দেয় না। উহা তারা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়। বহু ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল ব্যতিরেকে দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয় কর ও আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে 'ট্যাক্স ধার্যক' কর্মীদের বাড়াবাড়ির জন্য লোকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে। ঐ সম্পর্কিত আইন সরলীকৃত না থাকাতে লোকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয়। এই বিষয়ে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমাকে হিসাব দাখিল করতে বলা হলে আমি তাদের বলি যে আমি পৈতৃক বাগানের আম গাছ বিক্রি করেছি। সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ঐ গাছের গোড়াতে কি জল দিতেন? জল ঢাললে উহা এগ্রিকালচারাল হবে। উহা তাহলে

ইনকাম ট্যাক্সের বাইরে পড়বে। কিন্তু গাছের গোড়ায় আপনি জল দেন নি। অতএব উহা ভারত সরকারের প্রাপ্য ইনকাম্-ট্যাক্সের আওতায় পড়লো। আপনাকে তাহ'লে বিক্রয় লব্ধ টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। এ বিষয়ে একটা রুলিং আছে। সৌভাগ্য ক্রমে অন্য আদালতের ঐ বিষয়ে ভিন্ন রুলিং থাকাতে ঐ সব হতে অব্যাহতি পাই।"

অধুনা এ দেশে গৃহ সমস্যা সর্বাধিক। সরকার গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দিতে চান। বহু গরিব লোক সর্বস্ব খুইয়ে উহা তৈরি করেন। কিন্তু এতেও ইনকাম্-ট্যাক্স কর্মীরা হৈ হৈ শুরু করে দেন। যেন একটা মহা অপরাধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি নির্মাতা যেন মহা ঘৃণ্য একজন আসামী। তাকে টানা হিঁচড়ানোর অন্ত নেই। বাড়ি তৈরির দেনা শোধ হয় নি। তদুপরি উকিলের পিছনে খরচ-খরচা। এ অবস্থাতে মনে হয় এর চাইতে বাড়ি ভাড়া বকেয়া রেখে ভাড়াটিয়া থাকা ভালো। বাড়ি তৈরিতে ব্যয়িত টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে তবু ভালো সুদ পেতাম। তাতে সংসারটা অন্ততঃ চলে যেতো। আমার মতে—ছোট ছোট বাড়ির মালিকদেরকে এ'ভাবে ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। ঐ বাড়ি তৈরির ব্যাপারে হিসাব বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমি একজন পরামর্শদাতার শরণাপন্ন হই। এই ইনকাম্-ট্যাক্স সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ শুনে আমি বলি—'এঁ্যা! সে কি মশায়, এ কি আপনি বলছেন? এতো আমাকে জুয়াচুরি শেখাচ্ছেন!' ভদ্রলোক আমাকে এ'ভাবে আঁৎকে উঠতে শুনে বললেন—'আরে মশাই! সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে [নিজেকে] জুয়াচুরি শিখতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐ জুয়াচুরি পুত্রকেও শেখাতে হবে। এমন কি—সময় পেলে আপনার পৌত্রকেও ওটা শেখাতে

হবে।' এর পর সভয়ে আমি তাঁর বাটী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইনকাম্-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। জনস্বার্থের কারণে উহার অবৈধ উপায়গুলি এখানে বিবৃত করবো না। এখানে মাত্র উহাব বৈধ উপায়গুলি উদ্ধৃত করলাম।

( ) হিসাব দেখানোব স্থবিধার জন্য বহু ব্যক্তি কিছু চাষের জমি রাখেন। এই চাষের আযের উপর রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার আছে। কিন্তু ঐ আয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার নেই। ইনকাম্-ট্যাক্স ভারত সরকারের একটি বিভাগ। ৭০ বিঘার [কিংবা ৮০] উপরে [সিলিং] কারুর জমি থাকলে কৃষি কর দিতে হয়। উহার আয় বাৎসরিক ন্যূনাধিক ৩৬০৲ হলে ঐ ট্যাক্স প্রদেয় হয। কিন্তু ঐ সিলিং বহির্ভূত মাত্র ৪০ বিঘা জমির [ইনটেনসিভ্ চাষ] আয বাৎসরিক দশ হাজার হলেও কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। বহু ব্যক্তি বাধ্য হয়ে ঐ ভাবে কৃষি আয় দেখিয়ে ইনকাম্-ট্যাক্সওয়ালাদের কবল হতে রক্ষা পায়।

বিঃ দ্রঃ—ধরা যাউক কোন ব্যক্তি নিজের স্থপারভিশনে একটি বাড়ি তৈরি করলো। স্বভাবতঃই সে ঘুরে ঘুরে সস্তাতে মাল মশলা কিনে আনলো। মাপে চুরি, দড়িতে চুরি, মশলাতে মজুরীতে চুরি এখানে হলো না। কণ্ট্রাকটারের ৩০ ভাগ অর্থ বেঁচে গেল। এভাবে ভদ্রলোকের চল্লিশ হাজারে [টাকা] বাড়ি তৈরি শেষ। কিন্তু ইনকাম্-ট্যাক্স বাবুরা কণ্ট্রাক্টারী রেটে স্কোয়ার ফুট মেপে ওর মূল্য নব্বই হাজারে দাঁড় করালেন। এক্ষেত্রে নানারূপ বৈধ উপায় আবিষ্কার করে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে নি।

[ব্যবসাযে ইনভেস্টমেণ্ট (অর্থলগ্নী) করাতে অপরাধ হয় না। তেমনি বাড়ি নির্মাণও একপ্রকার ইনভেস্টমেণ্ট। ব্যবসায়ে নানাবিধ

খরচ দেখিয়ে এবং সাবালক স্বজনদের পার্টনার করে ইনকাম্ ট্যাক্স কমানো হয়। কিন্তু বাড়ির জন্য দরোয়ান রাখা, পাম্প মিস্ত্রি রাখা বা কমন সিঁড়ির আলোর খরচ, মেথর ও সুইপারের বেতন— ট্যাক্সকর্মীরা নাকচ করে দেন। রিপেয়ার বাবদ খরচ সামান্য মঞ্জুর করা হয়। অথচ ভাড়াটিয়াদের বেপরোয়া ভাঙ্গাভাঙ্গির অন্ত নেই। পরের বাড়ির প্রতি কারুরই মমতা থাকে না।]

বিঃ দ্রঃ—বহু ব্যবসায়ী নিজেদের চাকর, পাচক, দারোয়ান ও গাড়ির ড্রাইভার প্রভৃতির বেতন ফ্যাক্টরি কর্মীদের হিসাবে দেখান। ফলে, এদের জন্য এঁদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু খরচ করতে হয় না। শিল্পপতিরা ফ্যাক্টরির খরচে বহু গেস্ট হাউস এবং শৌখিন গাড়ি রাখেন। কিন্তু ঐ গাড়ি তাঁরা পরিবারবর্গের কাজে ব্যবহার করেন। ঐ গেস্ট হাউসও তাঁদের ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বহুবিধ খরচ-খরচা দেখিযে তাঁরা ফ্যাক্টরির দেয় ট্যাক্স কমিয়ে দেন। কেউ ভাড়া করা বসত বাড়ির এক অংশ ব্যবসায়ের জন্য ভাড়া নেওয়া অফিস বলে কিছুটা খরচ বাঁচান। বলা বাহুল্য, অসৎকর্মীদের কিছু কিছু উৎকোচ যে এঁরা না দেন তাও নয়। ফলে সৎলোকেরা এদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়। এমন বহু আয়কর অফিসার আছেন যাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যায বৎসরে ট্যাক্স বাবদ অর্থ তুলে দিতে হয়। ঐ অর্থ সংগ্রহ করে ট্যাক্স তুলে উর্ধ্বতনদের মন রাখতে তাঁরা বাধ্য। এজন্য বাধ্য হয়ে সৎ মানুষকেও পোষ্যবর্গের নামে নামে সম্পত্তি বেনামী করতে হয়। ভাড়াটিয়ারা বৎসরাধিক কাল ভাড়া দিচ্ছে না। দেশের আইন তাদেরকে রক্ষা করছে। কিন্তু বাড়ির মালিককে ভাড়ানুযায়ী ইনকাম্ ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল

ট্যাক্স দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন না হওয়াই আশ্চর্য। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও প্রশাসন বাবদ ব্যয় বাড়ছে। সেই ঘাটতি অর্থ তুলতে ট্যাক্স বাড়ছে। অজুহাত - জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি। সেই একই অজুহাতে প্রদের ট্যাক্সই বা না কমবে কেন? বহু ব্যবসায়ী এ জন্য লস্ [Loss] পর্যন্ত কিনে থাকেন। দেনাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে এঁরা আয়করের স্ল্যাব বাঁচান।

এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধে বলা যাক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদেব উপর এর চাপ অধিক পড়ে। অনেকে গৃহের একাংশে থেকে অন্য অংশ ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকা হতে তাঁরা ট্যাক্স দেন। কিন্তু ভাড়া বাকি পড়ে ও তার ফলে বাড়ি বিক্রয় হয়। অকুপেশন ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছ হতে আদায়ের রীতি নেই। করপোরেশন প্রভৃতি ঐ ট্যাক্স ভাডাটিয়ার কাছে আদায় করলে ইহার সমাধান হয়। বহু ব্যক্তি বেশি ভাড়া কবুল করে বাড়ি ভাড়া নেয়। কিন্তু দুমাস ঐ হারে ভাড়া দিয়ে ভাড়া বন্ধ করে। অথচ ঐ ভাড়ার হারে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হবে। [হয়তো ঐ বাড়ির ভাড়া এর অর্ধেক হয়ে থাকে।] ফলে গৃহস্থকে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার বহু উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। উহার কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(১) ভাড়া না দিয়ে তিন বৎসরের জন্য রেজিস্টারী করে লিজ দেওয়া হয়। শর্ত থাকে ঐ সময়ের পরে নূতন লিজ করতে হবে। কিংবা তৎক্ষণাৎ ঐ বাটী ছেড়ে যেতে হবে। ভাড়াটিয়াকে উঠানো শক্ত। কিন্তু লিজ হোল্ডার উঠতে বাধ্য। নচেৎ শর্তানুযায়ী তাকে দৈনিক ক্ষতিপূরণ উচ্চহারে দিতে হবে। এইখানে ভাড়ার বাড়ি ১০০৲ টাকাতে ভাড়া দেওয়া হয়। ওদিকে প্রাইভেটে [হিসাব

বহির্ভূত ভাবে] বাকি ২০০ টাকা হারে একত্রে তিন বৎসরের মোট টাকা নিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মাসিক ১০০ টাকা ভাড়ার হিসাবে ভ্যালুয়েশন করে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হয়। আইন মত মাসিক ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসে। এ ভাবে এরা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়।

(২) সাধ্যাতীত ট্যাক্স দিতে অপারক হয়ে মানুষ আত্মীয়দের ভাড়া দিয়ে রসিদ দেয় না। কারণ, ভাড়াটিয়া না থাকলে ট্যাক্স কম হয়ে থাকে। কখনও পূর্ব বন্দোবস্ত মত কম টাকার ফলস্ বিল দেওয়া হয়। এই ফলস্ বিল অনুযায়ী ট্যাক্সের বিল আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এটা যারা না করে তাদের বাড়ি-ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে বাড়তি খরচ উঠাতে গরিব মালিকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে। ছোট বাড়ির মালিক ও ছোট দোকানীদের দিকে তাকাবার কেউ নেই।

পারণ-পদ্ধতি

যে সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকে বলেছি, উহাদের দুইটি মূল বিভাগে ভাগ করা যায়, যথা সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট। কোনও পদ্ধতি কেবল মাত্র অপকর্ম সমাধা করার জন্য গৃহীত হলে উহা সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি। এই পুস্তকের প্রতিটি পাতায় ঐরূপ বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যেমন দোকানের ছাদ ফুটা করে দড়ি ধরে মেঝে এসে কিংবা উহার পাশের ঘর ভাড়া করে দেওয়াল ফুটা করে চুরি করা ইত্যাদি; নওশেরা ঠগীদের তাস সাজাবার কায়দা ইহার অপর দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ছবিকে এরা ঘোঁড়া বলে। সাজানোর

কায়দাতে প্রথমবার ভিকটিম জিতবে। কিন্তু হাতের কায়দায় অলক্ষ্যে একটি মাত্র তাস সরালে রাজা বা নবাবের জিত হতে থাকবে। কিন্তু এইগুলি ছাড়া এমন বহু কাজ অপরাধীরা করে যার সঙ্গে মূল অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও কোনও সিঁদেল চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এরা গৃহস্থদের গৃহে এসে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা ভাত খেয়ে নেয়।* এদের কোনও কোনও শহুরে সহধর্মী ধনী গৃহস্থের গৃহে ঢুকে প্রথমে ব্রাণ্ডি বা মদ প্যানট্রি থেকে তুলে খেয়ে নিয়েছে। এক-একজন এক-একটি খাদ্য খেতে ভালবাসে। এদের মধ্যে আবার এমন চোরও আছে যারা প্রথমে ঐ গৃহ মধ্যেই নিজেদের কাপড় ছেড়ে গৃহস্থদের কাপড় পরে নেয়। বেদিয়া প্রভৃতি গ্রাম্য চোররা তুকরূপে শিকড়, কড়ি, লাল সুতা প্রভৃতি গৃহস্থ গৃহে ফেলে রেখেছে। এই সকল কার্যকে অপকর্মের অসংশ্লিষ্ট কার্য বলা যেতে পারে। এদের কেউ কেউ চুরির পর ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে ঐ গৃহে বিষ্ঠা ত্যাগ করে যায়।

অপকর্ম বিষয়ে এদের এমন বহু আজব পদ্ধতি আছে ; উহা আপাত দৃষ্টিতে অসংশ্লিষ্ট পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অপকর্মের সঙ্গে উহাদের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলওয়ের ওআগন ব্রেকারদের কথা বলা যেতে পারে। লোডিং স্টেশনে দুর্বৃত্তরা যে ওআগনে মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকে, সেই ওআগনের গায়ে বহু সাঙ্কেতিক শব্দ লিখে রাখে, যথা, "চল্ চল্ রে নওজোয়ান, বন্দেমাতরম্, দিল্লী চলো",

---

* আমার জনৈক রক্ষী-বন্ধু বলেছিলেন যে, এতদ্বারা তারা [চেতন মনে ?] বুঝাতে চায় যে তারা অন্নাভাবে চুরি করে। কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে তারা নিজেরা গরিব হয়ে গরিব-গৃহস্থদের পান্তাভাত খাবে কেন ?

ইত্যাদি। পরে সুবিধাজনক স্থানে [ইঞ্জিন চালকের যোগসাজসে ?] মালবাহী ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হলে দুর্বৃত্তরা ঐ লেখা হতে ত্বরিত গতিতে বুঝে নেয়, কোন ওআগন ভাঙলে তারা আশানুযায়ী দ্রব্যাদি পাবে।

এই সংশ্লিষ্ট অপপদ্ধতিকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ পদ্ধতি অসাধারণ প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ প্রভৃতি অপকর্মে অপরাধীরা কিরূপে মানুষের মনকে প্রলুব্ধ ক'রে অস্বাভাবিকরূপে বোকা করে তুলে ঠকায় তা আমি বলেছি। ঐ ক্ষেত্রে অপরাধীরা বাগ্‌জাল ও পরিবেশ দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে সাময়িকভাবে তাদের বিচারশক্তি রুদ্ধ করে। এই অবস্থায় আপন স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োগ করে নি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তাকে যা তা বিশ্বাস করানো সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থার মূলে অবশ্য থেকেছে লোভজনিত মানুষের সুপ্ত অপস্পৃহার * বহির্বিকাশ। কারণ এই বিশেষ অপরাধে মানুষ

* প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত অপস্পৃহা আছে এবং যে কোনও মুহূর্তে তা কৃত্রিম উপায়ে বহির্গত করা যেতে পারে ইহা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায়। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি এমন লোভাতুর হয়ে উঠলাম যে ঐ দিনেই বর্ধমানে পেঁীছ এক কল্পিত বিপদের অজুহাতে মেশোমশাই-এর নিকট দশ হাজার টাকা কর্জ চাইলাম। তিনি উহা প্রদানে অপারক হলে দেওঘরে ভগ্নীপতির নিকট যাই। দশ হাজার টাকাতে দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ। কিছুতেই ঐ লোভ আমি দমন করতে পারি নি। ভগ্নীপতি আমার পীড়াপীড়িতে বলে উঠলেন—'বুঝেছি। তুমি নিশ্চই নবাবের পাল্লায় পড়েছো। আমাকেও ওদেব আড্ডাতে এনে উনি বলেছিলেন—'এই আমি রাখলাম বিশ হাজার, তুমি যতো জমিতে রাখবে তার তিন গুণ আমি রাখবো'। যাই হোক সে যাত্রাতে ভগ্নীপতি আমাকে রক্ষা করেছিলেন।"

স্মাগলাররা গাড়ির রঙ ও নম্বর তো বদলাবই, উপরন্তু বহু ক্ষেত্রে তারা প্রতি মাসে নূতন গাড়ি ঐ উদ্দেশ্যে কিনে নূতন লোকও ঐ কাজে নিয়োগ করে।

অসাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার সাধারণ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলব। অপরাধের সাধারণ পদ্ধতিতে মানুষ তার স্বাভাবিক মন নিযেই ঠকে থাকে। বহুপ্রকার সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং চুরি ডাকাতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে মূল অপপদ্ধতিসমূহকে আমি উপরোক্ত তালিকানুযায়ী কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি।

[এই অপপদ্ধতিকে দশটি অংশে ভাগ করে কিরূপে অপরাধ নির্ণয় সম্ভব তা আমি পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডের শেষাংশে বিশদরূপে বিবৃত করেছি।]

এ ছাড়া পথ-ঘাট, বিপণি-গৃহ—ভারতীয় বা য়ুরোপীয়, স্টেশন,

মেলা, যানাদি প্রভৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সুযোগ এবং নরনারীর জাতি বর্ণ সেক্স ও অভ্যাসও বিভিন্ন অপপদ্ধতির উদ্ভবের কারণ। এদের কেহ কেহ রাত্রে যখন সকলে ঘুমায় কিংবা দুপুরে যখন পুরুষ বাড়ি থাকে না, কিংবা রাত্রে গৃহস্থ যখন বাড়িখালি করে সকলে সিনেমা যায় তখন চুরি করে। এইগুলিও এক-একটি দলের এক-একটি পদ্ধতি। এই জন্য দেখা গিয়েছে যে, একটি বিশেষ পবিস্থিতি ও সুযোগের বিলুপ্তির সহিত অপপদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধন হয়েছে। কিন্তু ঐরূপ সুযোগ ও পরিস্থিতির পুনঃ আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুরানো ও পরিত্যক্ত পদ্ধতিই পুনঃ গৃহীত হয়েছে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, প্রাচীন কলকাতার অপপদ্ধতি এক্ষণে ঐ শহরে অচল হলেও উহা হাল-ফিল উঠ্‌তি শহরে পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে। এই কারণে আমি প্রাচীন ও আধুনিক—উভয়বিধ পদ্ধতি সাদরে সঙ্কলন করে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি।

এই অপরাধসমূহকে আমরা ঐতিহাসিক সূত্রে এবং জাতিগতভাবেও বিভক্ত করে নিতে পারি। সাধারণতঃ আমরা বাঙ্গালী, উড়িয়া, মাদ্রাজী ও মাড়বারীদের দক্ষ প্রবঞ্চকরূপে, হিন্দিভাষী দেশবাসী ও নেপালীদের দক্ষ সিঁদেল চোবরূপে এবং পাঞ্জাবী ও কোনও কোনও দেশবাসীদের দক্ষ ডাকাতরূপে এবং মুসলমানদের [বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী] দক্ষ পিকপকেটরূপে দেখে থাকি। বিশেষ অপরাধে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা যায় যে, তাদের খাদ্য ও দৈহিক গঠন এবং স্বভাব ও কৃষ্টি বহুল পরিমাণে বিবিধ অপরাধের নিয়ন্ত্রক। অবশ্য এই তালিকা হ'তে প্রতিটি প্রদেশের ভ্রাম্যমাণ বা স্থায়ী বাসিন্দা স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের বাদ দিয়েছি। কারণ স্থানীয় জল-বায়ু ও পরিবেশ পুরুষানুক্রমে

অর্জিত স্বভাবকে স্বল্প সময়ে পরিবর্তিত করতে সকল ক্ষেত্রে পারে নি। এই ক্ষেত্রে আমি মাত্র সাধারণ মানুষের অন্তর্গত অভ্যাস [স্বভাব-নয়] অপরাধীদের সম্বন্ধেই বলেছি। দেশে মুসলমান অপরাধীরা মাত্র ছুরি মারতে ওস্তাদ, অপর দিকে অমুসলমানরা [বিভিন্ন কৃষ্টির কারণে] লাঠিবাজিতে দক্ষ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বহু ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দুকে ছুরি মারতে ও ডাকাতি করতেও দেখেছি। এর প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে হলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে ইতিহাসের। ছুরি মারতে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রথম অভ্যস্ত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধার্থে ও প্রতিশোধার্থে এবং ডাকাতি আদি কার্য তারা প্রথম শিক্ষা করে রাজনৈতিক কারণে। তাই আজও পর্যন্ত মাত্র এক শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী ছেলেদের দ্বারাই এই দুই প্রকার অপরাধ সম্ভব। ধনিক এবং সাধারণ বাঙ্গালীরা এই সব কাজে আজও দক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে নিম্ন শ্রেণীর বহু বাঙ্গালী গোষ্ঠী পূর্বের ন্যায় আজও [খাদ্য, পানীয় ও কৃষ্টির ঊর্ধ্বে উঠে] ডাকাতি করে কেন ? আমার মতে এই সবের প্রকৃত মীমাংসা করতে গেলে মনস্তত্ত্বের সহিত ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণারও প্রয়োজন আছে। কারণ, ঐ তিনটি বিষয় পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

[পুস্তকের এই খণ্ডে মাত্র অযৌনজ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপরাধের নারীঘটিত বা যৌনজ পদ্ধতিসমূহ, রাজনৈতিক অপরাধ-পদ্ধতি এবং জুয়া, আবগারী, গুণ্ডামী, খুন প্রভৃতির অপপদ্ধতি ইহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে। তা'ছাড়া

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিসমূহের অপপদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে ইহার অষ্টম খণ্ডের শেষাংশে।]

এই সকল অপরাধের কতকগুলি চক্ষের সম্মুখে সমাধা হয়, যেমন প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। কিন্তু উহাদের কতকগুলি সমাধা হয় চক্ষের অগোচরে, যেমন চুরি ইত্যাদি। এই জন্য আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায় চোরদের নিকটও এই সম্বন্ধে বহু বিবৃতি সংগ্রহ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বিবৃতি ভাষার উৎকর্ষতার জন্য আমাকে নিজ ভাষায় লিখে নিতে হয়েছে।

[পুস্তকের এই খণ্ডে আমি বহুবিধ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছি। ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলিতে আরও বহু প্রকার অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। স্বভাবতঃই মনে হবে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সৃষ্টি করলেন কেন? বহু বিষাক্ত ঘৃণ্য সর্পের সৃষ্টি সম্পর্কেও এই প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এই ক্ষতিকর সর্পবিষ হতে বহুবিধ অমৃত সমতুল ঔষধের সৃষ্টি হয়। নকল বা জাল করা, উৎকোচ গ্রহণ, দস্যুবৃত্তি, চৌর্যকার্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠে থাকে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে অনাবিল ক্ষতি করার জন্য পৃথিবীর কোনও পদার্থ সৃষ্টি হয় নি। এই অপরাধীদের হতে সাবধান হবার জন্যে বা উহাদের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্যে বর্তমান উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এরা মানুষকে আয়েসী হতে না দিয়ে সর্বদা সক্রিয় করে রাখে। কেহ কেহ এদের মধ্যে উপকারিতা আবিষ্কার করবার জন্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের কয়েকটি ঘটনার বিষয় বলা হয়ে থাকে।

"উৎকোচ গ্রহণ এক অতি ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু উহার প্রাচুর্য না থাকলে তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তির

উত্থান হতো না। আগ্রা দুর্গ হতে পলায়ন পথে বাঙলার প্রান্তে এসে ধরা পড়লে ফৌজদারকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করে ছত্রপতি শিবাজী স্বরাজ্যে উপস্থিত হয়ে পুনরায় দেশোদ্ধারে ব্রতী হন। ইংরাজদের মধ্যে জলদস্যু না থাকলে স্পেনীয় আর্মাডা বাহিনীর কবল হতে ইংলণ্ড রক্ষা পেত না। এই জলদস্যুরাই স্পেনীয় বাহিনীর সমুদ্র পথের আগমন বার্তা স্বদেশে এসে জানান। এমন কি তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা এদের বাধা দান কালে ভালো করে কাজে লাগান। ভারতের বহু স্বাধীন রাজা ও জমিদার তৎকালীন দস্যুদের সাহায্যে স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। ইংরাজরা সমগ্র ভারতকে অন্যায় ভাবে একত্রিত না করলে আমাদের আজকের এই মহাভারত রচনা করতে বেগ পেতে হতো। ইংরাজ পুলিশ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার না করলে এ দেশবাসী এতো শীঘ্র হয়তো জেগে উঠতো না। এজন্য এদেশীয় রূপকরচনাকারীরা বলেছেন যে বন্ধু রূপে সাত জন্মে এবং শত্রু রূপে তিন জন্মে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের কালে শত্রু সাবমেরিনের গোলা ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোমা এড়িয়ে ভারতের ডকে ইংরাজরা যুদ্ধোপকরণ এনেছে। কিন্তু এত কষ্টে আনা ঐ সকল দ্রব্য ডক হতে চুরি করে চোরেরা ইংরাজ বাহিনীকে দুর্বল করে ভারতীয় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সুবিধা করে দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে চুরি ও ডাকাতি দেশের ধন সম্পদের সমান বণ্টনের সহায়ক হয়েছে। বহু দেশীয় নকলকারী বিলাতি কালি ও ঔষধ প্রভৃ'ত দ্রব্য নকল দ্বারা ক্রমশঃ ঐ সকল বিলাতি দ্রব্যাপেক্ষা উত্তম পণ্য দ্রব্য আবিষ্কার করে দেশের শিল্প সম্পদের যথেষ্ট উপকার করেছে।"

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্য বুঝা যাবে যে এই সকল অপকর্ম দেশের ধন সম্পদের ক্ষতি করে এই দেশকে বাসের অযোগ্য

করে তুলেছে। এইভাবে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় তাদের মধ্যে গঠন মূলক উদ্যম অন্তর্হিত হয়েছে। অথচ কর্মালস আদর্শবিহীন ঐ সকল অপহারকদের :এই বিষয়ে কোনও উদ্যম স্বাভাবিক কারণে থাকে না। এর ফলে প্রাচীন সভ্য দেশগুলি আবার আদি কালীন অরাজক অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এইখানে দেখা যায় যে এদের দ্বারা দৈবক্রমে সমাজের শুভাংশের একাংশ মাত্র কালে-ভদ্রে উপকৃত হযেছে। কিন্তু উহাদেব অবর্তমানে আরও নির্ভূলও প্রবল ভাবে দেশ বা সমাজ উন্নত হতে পারতো। অধুনা কালে সাহিত্যের মধ্যে গ্রন্থকারগণ অপবাধীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো একটা বাহাদুরীর বিষয় মনে করেন। এদেব এই প্রকার সহানু-ভূতির সহিত এদেব উপবোক্ত উপকারিতার তুলনা করা চলে। অপরাধীদের প্রকৃত কার্যকরণ সম্বন্ধে শিল্পীদের অজ্ঞতাই ইহার কারণ। আমি মনে করি এই সকল অপরাধীদেব মধ্যে কোনও প্রতিভা সন্ধান করা নিরর্থক। এদেব বিষয় নিযে অযথা মাতামাতি না করে সমবেত চেষ্টাতে যথাসম্ভব এদের সংখ্যা কমানো উচিত। এদের প্রতি অধিক সহানুভূতি দেখানোর দ্বাবা সমাজ উপকৃত হবে না; ববং এতদ্বাবা এইসব অন্ধ লেখক এদের সংখ্যা বর্ধনের সাহায্য করেন।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩/১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

পুনর্মুদ্রণ [অংশ বিশেষ]

অপরাধ-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রচলিত চৌষট্টিটি কলার মধ্যে অপকার্য একটি বিশেষ কলা বা আর্ট। এই বিশেষ কলা [Art] অপরাধীদের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির [Modus-operandi] মধ্যে প্রকাশ পায়। এই সকল অপরাধ-পদ্ধতি অপরাধীরা জন্মগত, কিংবা অভ্যাসগতভাবে লাভ করে—সেই সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "অপরাধ বিভাগ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশেষরূপে আলোচিত হয়েছে। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত সবল, নির্বল, শোণিতাত্মক, সাম্পত্তিক, শোণিত-সাম্পত্তিক, যৌনজ, অযৌনজ প্রভৃতি বিভাগ সকল কতকটা বংশানুক্রম [Heredity] এবং কতকটা মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর গঠিত। এই সকল বিভাগের সাহায্যে অপরাধী বিশেষ কি প্রকারের অপরাধ করবে, অর্থাৎ কি'না সে সবল অপরাধ করবে কিংবা নির্বল অপরাধ করবে, যৌনজ অপরাধ করবে কিংবা অযৌনজ অপরাধ করবে—তা বলে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা তাদের মনোনীত অপরাধটি কিরূপে বা কি উপায়ে সমাধিত করবে, তা নির্ভর করে তাদের [অভ্যাস জাত ?] কার্য-পদ্ধতির [মোডাস-অপরেণ্ডাই] উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শঠতার কথা বলা যেতে পারে। প্রবঞ্চনা তথা চিটিং [Cheating]

একটি নির্বল-সাম্পত্তিক অযৌনজ অপরাধ, কিন্তু এই শঠতা বহুবিধ উপায়ে সংঘটিত হয়—অর্থাৎ কি'না এক-এক জন শঠ এক-এক প্রকার কার্যপদ্ধতিতে লোক ঠকায়।

অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার অপরাধ-পদ্ধতির উদ্ভবের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু আমার মতে কোনও অপরাধী কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা একবার সফলতা লাভ করলে সে মাত্র সেই বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যেই অপকর্ম করতে থাকে। অপর কোনও নূতন অপ-পদ্ধতির কথা সে আর তখন চিন্তা করে না। একই পদ্ধতি পুনঃ পুনঃ অবলম্বন করার ফলে সেই বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে সে এমনি পাকাপোক্ত হয়ে উঠে যে তখন অবলীলাক্রমে, অনায়াসে বা অল্প আয়াসে এবং নির্ভুলভাবে সে উক্ত পদ্ধতি দ্বারা অপকর্ম করতে সক্ষম হয়। স্বভাবতঃ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে বহুদিন সময় লাগে। এই কারণে একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি আয়ত্তে আনা সময় সাপেক্ষ ত বটেই, তা ছাড়া মুহুর্মুহু এইরূপ পদ্ধতি পরিবর্তন করা সকল সময়ে সম্ভবও হয় না। প্রথম অবস্থার অপরাধীরা [প্রাথমিক অপরাধীরা] কোনও কোনও সময় একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে আর একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও প্রকৃত বা শেষ অবস্থার অপরাধীরা কদাচ এইরূপ কার্য করে না। প্রকৃত অপরাধীদের দলগত অভ্যাস, তাদের সংস্কার এবং ঔৎসুক্যের অভাব এইরূপ কার্যের প্রতিবন্ধক হয়। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় পাঁচমেশালী শহরে প্রাথমিক অপরাধীরা একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর আর একটি পদ্ধতি কোনও কোনও সময় গ্রহণ করে বটে। কিন্তু ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনভ্যাসের কারণে তার ধরাও পড়ে অতি সহজে। পরিশেষে এই সব প্রাথমিক অপরাধীরা পাকাপোক্তভাবে মাত্র একটি পদ্ধতি

অবলম্বন ক'রে বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিবৃত শেষ অবস্থার প্রকৃত অপরাধীদের দ্বারা অপরাধ সম্পর্কিত অতিন্দ্রীয়তা অর্জনও উহার অন্যতম কারণ।

প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা তাদের স্ব স্ব গুরুর কাছে এই সব [পৃথক পৃথক] অপরাধ-পদ্ধতি শিক্ষা করে থাকে। স্ব স্ব গুরু, সর্দার বা ওস্তাদ নির্দেশিত পন্থানুযায়ী তারা একই ধরনের অপকর্ম করে চলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ওস্তাদ বা গুরুরা অন্য কোনও পদ্ধতি গ্রহণ না করার জন্যে প্রারম্ভেই সাকরেদ বা শিষ্যদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়েও নিয়েছে। সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে যে পকেটমারগণ সিঁদ কাটে না এবং যারা লোক ঠকায় তারা মানুষ মারে না বা সিঁদ কাটে না। যারা গৃহে চুরি করে, তারা পথে চুরি করে না। এমন কি, যারা রাত্রে চুরি করে তারা দিনে চুরি করে না। একমাত্র প্রাথমিক ও দৈব অপরাধীরাই সুযোগমত এক প্রকার অপরাধ ও উহার পদ্ধতি পরিত্যাগ করে অপর একটি পদ্ধতি গ্রহণে প্রয়াস পায় এবং এজন্য অকুস্থলে তারা অতি সহজে ধরাও পড়ে। এদের অনেকেই কোনও গুরু বা ওস্তাদের কাছে অপকর্ম শিক্ষা না করে অপকর্ম শুরু করে। এই কারণে কোনও একটি সুচিন্তিত অপরাধ-পদ্ধতি বেছে নিতে এরা অপারক হয়। বড় বড় শহরে এই ধরনের বহু প্রাথমিক অপরাধী দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই কারণে অনেকে শহুরে অপরাধীদের বিভিন্নমুখী [ভারসেটাইল] অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁদের এইরূপ বিশ্বাস ভুল। কারণ শেষের দিকে এই প্রাথমিক অপরাধীরাও অপকর্মের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিই বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। যে সকল অপকর্মের জন্য একের অধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয় [টিম্ ওআর্ক] সেই সব অপকর্মের জন্য এক-এক দিন

এক-একটি পদ্ধতি অবলম্বন করাও অসম্ভব। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে "অপরাধীদের বুদ্ধি-প্রেরণা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই অপরাধ-পদ্ধতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

স্ব স্ব অপ-পদ্ধতির প্রতি এদেশীয় অপরাধীদের প্রগাঢ় অনুরাগও দেখা যায়। নিম্নের বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"পকেট-মারির মামলায় এক তালাতোড় চোরকে ভুলক্রমে সিপাহীরা ধরে আনলে সে বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'আমরা গামছা মারি, কিংবা চাবির কাম করি। বাপু! আমাদের কি এই কাম আছে নাকি?' [চাবি ও গামছা অর্থে সিঁদকাটি প্রভৃতি ভাঙন যন্ত্র বুঝায়।] অপর একদিন ডক্-ইয়ার্ড-এর চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে ধরে আনা হলে সে উত্তর করে, 'আমি মশাই কেবিন চোর [জাহাজের], আমি ত ডক্ চোর নই'।"

[সুবিধা-অসুবিধা ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি কারণে অপপদ্ধতির বিবিধ বিভাগ নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিবা ও রাত্রি চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। কোনও এক অ্যাংলো দিবা-চোর আমাকে এইরূপ বলেছিল, 'ডে ইজ্ ফর ওআর্ক। নাইট্ ইজ্ ফর এনজয়মেণ্ট। এই জন্যেই আমি দিনেই চুরি করে থাকি।' দিবা-চোরদের নিকট রাত্রে স্ফূর্তি করার সময়। এই সময়টুকু তারা নষ্ট করতে চায় না। এজন্য তারা দিনেই চুরি করে। এ ছাড়া স্বভাব-চোরদের কাউর কাউর অপস্পৃহা মনস্তাত্ত্বিক কারণে রাত্রে আদপেই আসে না। অপপদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি কারণ সম্বন্ধে বলা যাক। দিবাভাগে পুরুষরা বাড়ি থাকে না বলে বহু অভ্যাস-চোর ঐ সময় চুরি করে। এ ছাড়া আমরা এও দেখেছি

যে, য়ুরোপীয় বাড়ির চোর ও দেশীয় ব্যক্তির বাড়ির চোরও পৃথক হয়ে থাকে। কারণ এদের অভ্যাসজাত সুবিধা-অসুবিধা ঐ সকল বাটীর গঠন, লোকজনদের জীবন-প্রণালী ও উহাদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করে। উন্নতমন্য এবং বনিয়াদি চোররা আবার নিকৃষ্ট প্রকৃতি চোরদেব ঘৃণা করে। আমার মতে ইহাও বিভিন্ন অপপদ্ধতি গ্রহণের অপর এক কাবণ।]

বিবিধ শ্রেণী ও উপশ্রেণীর প্রতিটি অপরাধের জন্য বিবিধ প্রকার অপপদ্ধতি গৃহীত হ'য়ে থাকে। এ সকল অপপদ্ধতির পশ্চাতে বহু ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণও থাকে। পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কবব।

ভারতীয় অপরাধীদের কোনও কোনও অপরাধ-পদ্ধতির সহিত পারস্য, চীন এবং য়ুরোপের মধ্যযুগীয় অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতির মিল দেখা যায়। ইহা দ্বারা এইরূপ মনে করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে এই সকল দেশ পরস্পর পরস্পরের সহিত বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বোধ হয় বাণিজ্য এবং রাজ্য বিস্তারের সহিত এক দেশের অপরাধীদের সহিত অপর দেশের অপরাধীদের মিলন ঘটেছে। আমার মতে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র আছে। এই সকল অপপদ্ধতির কয়েকটি প্রাচীন এবং কয়েকটি আধুনিক ও অতি-আধুনিক; কিন্তু পুরাতন পদ্ধতিগুলি কিছুকাল পরিত্যক্ত হয়ে পুনরায় পুরানো যুগেব গহনার ন্যায় অপরাধীদের দ্বারা পুনঃ গৃহীতও হয়ে থাকে।

অপরাধীদের অপরাধ-পদ্ধতিকে আমরা চারিটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, * যথা—(১) কি ধরনের অপকর্ম অপরাধীরা ক'রবে, (২)

[* কারুর বসত বাটীর গঠন এবং গৃহস্বামীর জাতি এবং তৎজনিত তাঁদের আচার-ব্যব-

মনোনীত অপরাধটি তারা কোন সময়ে সমাধা করবে, (৩) ঐ অপরাধ তারা কি ভাবে ও উপায়ে সংঘটিত করবে, (৪) অপকর্ম দ্বারা তারা কি কি প্রকারের দ্রব্য অপহরণ করবে, ইত্যাদি। অপপদ্ধতির এই বিভাগগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা উপরে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এইবার অপপদ্ধতির অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। প্রথমে অপরাধীরা যাহা কিছু সম্মুখে পায় তাহাই গ্রহণ করে। কিন্তু এই সব দ্রব্য সকল সময় তারা বিক্রয় করতে সক্ষম হয় না। বিক্রয় দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থাদি না পেলে এই সব দ্রব্য অপহরণ করা বা না করা তাদের পক্ষে সমান। এই কারণে অপরাধীরা মাল পাচারের জন্য 'খাউ' বা চোরাই মালের গ্রাহকদের সহিত ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ থাকে। সকল বামাল-গ্রাহক বা রিসিভাররা যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করে না। এক-একজন বামাল-গ্রাহক এক-এক প্রকার দ্রব্য গ্রহণ করে। অনেক সময় এই সকল গ্রাহকদের ফরমাস মত অপরাধীরা দ্রব্য আহরণ করে থাকে। অনেক গ্রাহক আবার বিশেষ শ্রেণীর চোরেদের এজন্য পুষেও থাকে। সাইকেলের গ্রাহকরা কেবলমাত্র সাইকেল এবং ঘড়ির গ্রাহকেরা কেবল মাত্র ঘড়িই গ্রহণ করে থাকে। এই কারণে আমরা কোন অপরাধীকে কেবলমাত্র ঘড়ি এবং কোনও অপরাধীকে আমরা কেবলমাত্র সাইকেলই চুরি করতে দেখি। শহরে কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ দ্রব্য বেশি চুরি হবে তা নির্ভর করে তৎকালীন বাজারের দর, চাহিদা এবং বামাল-গ্রাহকদের প্রয়োজন ও নির্দেশের উপর।

হারের উপরেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ হয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, যারা য়ুরোপীয়দের গৃহে চুরি করে তারা ভারতীয়দের গৃহে চুরি করে না। এ ছাড়া স্থান কাল পাত্র ভেদেও চোরেদের শ্রেণী বিভাগ করা চলে। "চৌর্য-অপরাধ" শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে।]

অপরাধ-পদ্ধতির প্রতিটি প্রধান বিভাগ সম্বন্ধে বলা হল। উহাদের অপরাধের ন্যায় অপপদ্ধতিও বহু উপশ্রেণীতে বিভক্ত। উহাদের মধ্যে যৌনজ ও অ-যৌনজ শ্রেণীর অপরাধীরও পৃথক অস্তিত্ব আছে। এইবার অপরাধসমূহের বিভিন্ন রূপ অপরাধ-পদ্ধতির সম্বন্ধে বলা যাক। এই অধ্যায়ে কেবল মাত্র অযৌনজ প্রবঞ্চনার পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আমি ব্যাখ্যা করবো।

প্রবঞ্চনা অপরাধ

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ নির্বল অপরাধ। প্রবঞ্চক অপরাধীদের ছল-চাতুরীর অন্ত নেই। এদের মধ্যে বহু স্বভাবের ব্যক্তি দেখা যায়। বাকচাতুর্য এদের অপকর্মের প্রধান সহায় হয়। তবে এরা যে অত্যন্ত চতুর ও কর্মতৎপর তাতে সন্দেহ নেই। উঁচু শ্রেণীর প্রবঞ্চকদের অধিকাংশ প্রাথমিক অপরাধী। এদের মধ্যে সুশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত তিন প্রকারের মানুষ আছে। কিন্তু এদের প্রত্যেকে মিথ্যা ভাষণে ও ছল-চাতুরীতে অতি দক্ষ। নিম্নোক্তরূপ বিবিধ স্বভাবের প্রবঞ্চক আছে।

(১) কর্মঠ—এরা সত্যকার বহু গুণাগুণের অধিকারী। কেউ কেউ একাউণ্টে পারদর্শী। কারুর ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক জ্ঞান প্রখর। স্বভাব-অলস হলেও কিছু সময় এরা কর্মতৎপরতা দেখায়। কিন্তু অলসতার কারণে এরা মধ্যে মধ্যে অন্তর্ধান হয়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ করতে এরা অপারক। গৃহীত অর্থ খরচ করে ফিরে এসে তারা অজুহাত ও

কৈফিয়ৎ দেয়। এরা প্রচুর আশা দেয় কিন্তু কথা রাখে না। প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উভয়কে এরা ঠকায়।

(২) অভাবী—এরা অভাবগ্রস্ত ভদ্র মানুষ। অভাব মেটাতে এরা চুরি করতে অপারক। পরিশেষে এরা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। এরা নিজেরা ঠকে ঠকে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যেভাবে এরা নিজেরা ঠকেছে—সেইভাবে অপরকে ঠকিয়ে ওরা অর্থ পুনরুদ্ধার করে। এরা অবস্থাপন্ন হলে নিজেদের শুধরে নেয়।

(৩) সরব—এরা সব সময় রোয়াব দেখিয়ে কথা বলে। ধমকা-ধমকিতে এরা বিশেষ ওস্তাদ। এদের 'কর্নার্ড্' করলে চেঁচিয়ে এরা বাজিমাৎ করে। নিজেদেরকে এরা বুদ্ধিমান বুঝাতে ও অন্যকে বোকা প্রমাণ করতে ব্যস্ত। এরা অযথা অন্যের শুভাকাঙ্ক্ষী সাজে। এদের মধ্যে চঞ্চলতা, মুখরতা ও [ক্ষণস্থায়ী] তৎপরতা দেখা যায়। মিথ্যার পর মিথ্যা বলতে এদের বাধা নেই। পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে এরা শিকার বেছে নেয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এদের মধ্যে বহু অলীক [Pseudo] গুণ্ডা আছে। আসলে গুণ্ডামীর ক্ষমতা এদের নেই। এরা ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতির। বহু নির্বিষ সর্প আকারে প্রকারে ও ফোঁস-ফোঁসানিতে সবিষ সর্পের অনুকরণ করে। শত্রুকে প্রবঞ্চনা দ্বারা ভয় দেখিয়ে ওরা আত্মরক্ষা করে। বিজ্ঞানীরা এই গুণকে [mimiory] বলেন। এই অলীক গুণ্ডা নিজেদের গুণ্ডা বুঝিয়ে ভয় বা লোভ দেখিয়ে অর্থ নেয়। কিন্তু এদেরকে তেড়ে গেলে এরা পলায়নপর হয়। গুণ্ডা নিয়োগকারী মানুষ এদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। এই অলীক গুণ্ডারা তাদের সত্যকার কোনও কাজ করে নি।

অবশ্য কিছু উঁচুদরের গুণ্ডা একাধারে স্বল্পাধিক গুণ্ডামি ও প্রবঞ্চনা

করেছে। এরা কোনও এক দুর্ধর্ষ গুণ্ডা হয় না। সাধারণতঃ এরা প্রাথমিক অপরাধী। এর সাংসারিক ও স্ত্রীপুত্র প্রয়াসী হয়ে থাকে।

(৪) নীরব—এরা খুব নম্র ও ধীর হয়। এদের চাটুকবিতা ও চুকলামী করার শক্তি আছে। এরা অপকর্মের পূর্বে নির্লিপ্ত ভাব দেখায়। এরা খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে না। এরা চাকরি-বাকরি ও কাজ কর্ম করে থাকে। চাকরি না থাকলে এরা প্রবঞ্চনা অপকর্ম করে। চাকুরির ফাঁকে ফাঁকেও এরা ঐ ভাবে অর্থ উপার্জন করে। এদের অপমান করলে এরা সে বিষয়ে নির্বিকার থাকে। প্রথম প্রথম বহু উপকার করে এরা মানুষকে মুগ্ধ করে তুলে।

শঠতা বা প্রবঞ্চনা একটি অযৌনজ * নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধ। এই অপকর্মের জন্য কোনওরূপ দৈহিক বলপ্রকাশের প্রয়োজন হয় না। আঘাত হানা প্রবঞ্চক তথা শঠেদের পক্ষে রীতি এবং স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার। আত্মরক্ষার্থে এরা কখনও কাউকে আঘাত হানে না। পৃথিবীতে শঠেদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এদের কার্যপদ্ধতিগুলির সংখ্যাও সর্বাপেক্ষা অধিক দেখা যায়। বুদ্ধিমত্তায় এরা পণ্ডিতমণ্ডলীকেও মুগ্ধ করে দেয়। মেরে ধরে কেড়ে নেওয়াই বোধ হয় পৃথিবীর প্রথম বা সনাতন অপরাধ-রীতি। পরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিরা বোধ হয় না-বলে-নেওয়া বা [গোপনে] চুরির পক্ষপাতী হয়। এর পর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতি এবং চুরির বিরুদ্ধে লোকে সজাগ হয়ে নানারূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এর ফলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা

---

* যৌনজ প্রবঞ্চনা অপরাধেরও অস্তিত্ব আছে। পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উহাদের সম্পর্কে সম্যক আলোচনা পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে করা হয়েছে।

শঠতার বা চিটিং-এর আশ্রয় নেয়। এই শঠতা অপরাধ সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে বিস্তার লাভ করেছে।

অপরাধ-পদ্ধতি সকল দু'টি বিশেষ পর্যায়ে সংঘটিত হয়। প্রথম পর্যায়ে অপরাধীরা শত্রুর বেশে সোজাসুজি আঘাত হানে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ে পড়ে। ইহা মানুষের জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতসারে সমাধা করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে অপ-রাধীরা বন্ধুরূপে আলাপ জমিয়ে গৃহস্থদের বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সর্বনাশ ঘটায়। বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ এই পর্যায়ের অপরাধ। এই অপরাধ সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জ্ঞাতসারে সমাধা হয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা কেবলমাত্র প্রবঞ্চনা সম্বন্ধেই আলোচনা করব। এই প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপকর্ম মূলতঃ দুই প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। যথা—(১) সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং (২) অসাধারণ প্রবঞ্চনা। ইহা ব্যতীত ইহাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপবিভাগও আছে। প্রবঞ্চনার এই বিভাগ ও উপবিভাগ সম্বন্ধে আমি পৃথক পৃথক রূপে ব্যাখ্যা করব। প্রবঞ্চনার প্রতিটি বিভাগ ও উপবিভাগ সম্পর্কীয় অপরাধ সমূহের প্রত্যেক অপরাধ আবার দুইটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছে। যথা, যৌনজ প্রবঞ্চনা ও অযৌনজ প্রবঞ্চনা।

প্রথমে সাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। সাধারণ প্রবঞ্চনা দ্বারা গৃহস্থেরা স্বাভাবিক মন নিয়ে সুস্থ অবস্থায় ঠকে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, ধরুন, আপনার গোয়ালা এসে জানালে, সে আপনাকে খাঁটি গরুর দুধ দেবে ; আপনি তাকে বিশ্বাস ক'রে দুধও ক্রয় করলেন। সে আপনাকে "খাঁটি গরুর" দুধ দিলেও গরুর "খাঁটি দুধ" দিল না। এইখানে তার ঐ গরুটা খাঁটি হলেও ঐ গরুর দুধ খাঁটি নয়।

আসলে সে আপনাকে দিল জল মেশানো দুধ। এই দুধে জল মেশানো হয়েছে জানলে বা বুঝলে নিশ্চয়ই তা আপনি ক্রয় করতেন না। আপনি উহা ক্রয় করলেও ওর দাম দিতেন আরও কম। এই ক্ষেত্রে ঘোষের-পো প্রবঞ্চনা দ্বারাই জল মিশানো দুধকে খাঁটি দুধ বলে আপনাকে গছিয়ে দিয়েছে, তা না হলে অত অধিক মূল্যে ঐ জলীয় দুধ আপনি কখনও ক্রয় করতেন না। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে বলা হয়

'সাধারণ প্রবঞ্চনা'। মানুষ অন্ধ ভালবাসা বা ভক্তি ও স্নেহ দ্বারা অভিভূত হলে এই ভক্তি, ভালবাসা বা স্নেহের পাত্রেরা তাকে আরও সহজে ঠকাতে পারে। এই ভক্তি, ভালবাসা ও স্নেহ, ক্রোধ ও লোভের ন্যায় মানুষের বিচার বুদ্ধির বিনাশ ঘটিয়ে তাকে হাস্যকর ভাবে বোকা করে তুলে। এইরূপ অবস্থায় তারা দুর্বৃত্তদের অত্যধিকরূপে বিশ্বাস করে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়ে থাকে। মানুষ ঠকে তখনই যখন সে কাউকে

ভালবেসে ফেলে। এইরূপ অবস্থায় সে দেখেও দেখে না বা শুনেও শুনতে পায় না।

"সাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা হ'ল। এইবার "অসাধারণ প্রবঞ্চনা"র কথা বলা যাক। অসাধারণ প্রবঞ্চনার দ্বারা মানুষের মন অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অসুস্থ হয়ে উঠে। লোভের কারণেই এইরূপ ঘটে থাকে। এই অবস্থায় ফরিয়াদী নিজেই কতকটা অপরাধীর পর্যায়ে এসে পড়ে। এ বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলা যাক্। ধরুন, কোনও এক প্রবঞ্চক আপনাকে এসে জানাল যে এক যায়গায় জলের দরে সোনা বিক্রয় হচ্ছে। আপনি এও বুঝলেন ও জানলেন যে, ঐ গহনাগুলি চোরাই গহনা। তা না হলে এত সস্তায় সোনা বিক্রয় হয় না। প্রথমে হয়ত আপনি চোরাই গহনা কিনতে রাজি হলেন না। কিন্তু সেই ব্যক্তি নানাভাবে আপনাকে প্রলুব্ধ করে গহনা কিনতে রাজি করাল, অর্থাৎ কিনা বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত অপস্পৃহাকে জাগ্রত করে আপনাকে সে লোভী করে তুলল। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আপনি গোপনে গহনাগুলি কিনলেন। আসলে কিন্তু আপনি কোনও সোনা কিনলেন না, আপনি সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনলেন গিণ্টি করা কতকগুলি পিতল। এই ক্ষেত্রে আপনি অপরকে ঠকাতে গিয়ে কিংবা অপরের অপহৃত দ্রব্য আত্মসাৎ করতে গিয়ে নিজের দ্রব্য বা অর্থই আপনি হারিয়ে ফেললেন। এই অসাধারণ প্রবঞ্চনা দ্বারা ঠগীরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তির অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক [সুপ্ত] অপস্পৃহা জাগ্রত করে তাকে লোভী করে তুলে। এই ভাবে প্রবঞ্চিত না হলে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অবস্থায় এইরূপ অপকর্ম সম্বন্ধে হয়ত চিন্তাও করত না, বরং ঐরূপ কার্যকে সে অন্তরের সাথে ঘৃণাই করত। এই ধরনের প্রবঞ্চনাকে আমরা 'অসাধারণ প্রবঞ্চনা' বলে থাকি।

[প্রবঞ্চকগণ বন্ধুরূপেই নাগরিকদের অর্থাপহরণ করে। বস্তুতঃ মানুষের ক্ষতি করা শত্রুতা অপেক্ষা বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে আরও সহজে সম্ভব হয়। এই কারণে পণ্ডিতেরা বলেন, "যদি কারও ক্ষতি করতে চাও ত প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তার দুর্বলতাসমূহ জেনে নাও।" বিশেষ করে বিপক্ষ পক্ষ যদি সাবধানী, শক্তিমান ও দুর্দান্ত প্রকৃতির হয তা হলে এই পন্থাই প্রকৃষ্ট। ঠগীরা এই সত্যটি বিশেষ রূপে মেনে নিয়েছে। ঠকামীর দ্বারা অর্থাপহরণ অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। এই কারণে পৃথিবীতে ঠগীদের সংখ্যা অন্যান্য অপরাধীদেব তুলনায় অনেক বেশি। ঠগীরা সাধারণতঃ দুর্বল ও ভীরু প্রকৃতির এব অত্যধিক চতুর হয়ে থাকে। তারা সাধারণতঃ খুন-জখমেব ধার দিয়েও যায় না। বরং তাদের একান্ত রূপে নিরীহ ও বিনয়ী মানুষের মতহ দেখা যায়। এ কথা স্বীকার্য যে চুরির তুলনায় জোচ্চুরি করা অনেক নিরাপদ। এইবার আমি এই প্রবঞ্চক অপরাধীদের সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করবো।]

এই অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঠগী নওসেরা', 'টপকা ঠগী', 'নোট ডবলিঙ' প্রভৃতি অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এগুলি অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত। অনুরূপ ভাবে যৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনারও অস্তিত্ব আছে। মানুষ মাত্রের মধ্যেই যে যৌনজ ও অযৌনজ অপস্পৃহা সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান আছে এবং উহাদেরকে কৃত্রিম উপায়ে যে বহির্গত করা যায় তাহা এই সকল অসাধারণ প্রবঞ্চনাসমূহ প্রমাণিত করে। প্রথমে বিবিধ প্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ঠগী নওসেরা

নওসেরা পদ্ধতির অপর নাম বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ [Bead Gambling]। ইহা একপ্রকার অযৌনজ অসাধারণ প্রবঞ্চনা। এই পদ্ধতিতে অপরাধীরা Bead বা ঘুঁটির সাহায্যে জুয়ার অভিনয় ক'রে লোক ঠকায়। অনেকে ঘুঁটির বদলে তাস প্রভৃতির দ্বারাও এই খেলা খেলে থাকে। আসলে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য একেবারে জুয়া নয়। নওসেরা দলে প্রায়ই বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত থাকে। ইহাকে একটি বাস্তব অভিনয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। এক-এক জন ব্যক্তি এক-একটি অংশ অ্যাক্ট বা প্লে করে যায়। এদের মধ্যে কেহ সাজে রাণী, কেহ সাজে রাজা, জমিদার বা বড় বড় ব্যবসাদার, কেহ বা উহাদের ম্যানেজার সাজে। দারোয়ান, বেয়ারা, ঘাতক, খাতাঞ্চি প্রভৃতি সাজবারও লোকের অভাব হয় না। প্রথমে 'নওসেরা' নামে পশ্চিমা অপরাধী দল দ্বারা [মতান্তরে দিল্লীর এক শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা] এই অপরাধ প্রবর্তিত হয়। পরে বাংলাদেশের পতনোন্মুখ ধনী বংশের দুলালরা অর্থের প্রয়োজনে এর উন্নতিসাধন করেন। * আজ এদের গতিবিধি পৃথিবীর সর্বত্রই। বড় বড় শহরে এরা আস্তানা গেড়ে লোক ঠকায়। ভারতে সর্ব প্রদেশের ব্যক্তিদের নিয়েই এদের দলগুলি গঠিত। এদের মোহিনী-শক্তি অল্প কথায় ব্যক্ত করা যায়

* কেহ কেহ এ'ও বলে থাকেন যে নয়'শ [৯০০] উপায়ে ইহা সমাধিত হয় বলে এ'কে নওসেরা বলা হয়েছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে বাংলা দেশে এর প্রকৃত উন্নতি ঘটে। এক্ষণে এই অপরাধ পৃথিবীর সকল দেশে প্রচলিত হয়েছে।

না। বাক-চাতুর্য, বচন-বিন্যাস এবং বিভিন্ন রূপ "মেক্-আপ"ই এদের প্রধান সহায়।

নওসেরা অপরাধীরা দল বেঁধে বড বড় শহরে অপকর্ম করে থাকে। এদের আমরা উপরি উক্ত কারণে "অসাধারণ" প্রবঞ্চকদের পর্যায়ে ফেলে থাকি। শহরের বড় বড় পুরানো বনেদী বাটীগুলিতেই এরা অপকর্ম করে থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি শহরে এইরূপ বহু পুরাতন প্রাসাদ আছে। এই সকল বিরাট বিরাট প্রাসাদে উত্তরাধিকারীসূত্রে বাড়ির স্বর্গগত ধনী মালিকের বহু নিঃস্ব বংশধর সপরিবারে ইহার বিভিন্ন অংশে বাস করেন। এই সকল বাটীতে পুরাতন আমলের বড বড় দালান বা "হল" ঘর দেখা যায়। পুরাতন আমলের আসবাবে সজ্জিত হল ঘরটির উপর কিন্তু সকল বংশধরেরই সমান অধিকার থাকে। পৃথক পৃথক রূপে বসবাস করলেও প্রয়োজন মত সকলেই এই হল ঘরটি ব্যবহার করে থাকেন। এই সকল বংশধরদের কাহারও কাহারও অবস্থা উন্নত থাকলেও তাদের অধিকাংশেরই অবস্থা অত্যন্ত রূপ শোচনীয় দেখা যায়। নওসেরা দলের অপরাধীরা অনেক সময় এইরূপ এক বংশধরকে তাদের অংশীদার রূপে বেছে নিয়ে তাদের সহিত যোগসাজসে লোভী বণিক এবং অন্যান্য লোকদের এই সকল হল ঘরে * ভুলিয়ে এনে তাদের সর্বনাশ সাধন করে থাকে। এই কারণে অতগুলি বংশধরদের মধ্যে কোন ব্যক্তির সাহায্যে যে এই অপরাধীরা হল ঘরটি ব্যবহার করেছে তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ সংশ্লিষ্ট বংশধরটি প্রায়ই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকেন এবং

---

* কোনও কোনও ক্ষেত্রে বড় বড় বাড়ি ভাড়া করে উহা 'ভাড়া করে আনা' দামী আসবাবপত্র দ্বারা সাজিয়ে রাখাও হয়। বড় বড় শহরে এরূপ বহু দামী আস্তানা এরা ভাড়া করে নিজেদের দখলে রাখে ও প্রয়োজন মত ব্যবহার করে।

ফরিয়াদীর সামনে কখনও তিনি হাজিরও হন না। এ ছাড়া বিষয়টি এমন ভাবে সাজানো হয় যাতে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই সকল ঝুটা রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদারকেই বাড়ির আসল মালিক বলে সহজেই ভুল করে। দলের অধিকাংশ লোকই কিন্তু দালালের ভূমিকায় কাজ করে। এই সকল দালালেরা শহর, শহরতলী এবং দূর গ্রাম্য জনপদগুলি হ'তে নানা অছিলায় দুর্বলচিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোকদের ভুলিযে এনে কাজ হাঁসিল ক'রে অপর আর এক বড শহরে কিছুদিনের মত সরে পড়ে। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপকর্ম সংঘটিত হয় তা নিম্নের বিবৃতিটি পডলেই বুঝা যাবে।

"মাস দেডেক পূর্বে এক চায়ের দোকানে বন্ধু অজিতের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। অজিতের আগ্রহাতিশয্যে আমাদের এই পরিচয় অচিরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। একটা ব্যবসা ফাঁদবার খেয়াল সেই আমার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। অজিত আমায় বুঝায়, 'ছাখ! ব্যবসা করতে গেলে তিনটি জিনিস চাই—সময় চাই, সুবিধে চাই, পয়সা চাই। তোর তো তিনটে জিনিসই আছে। এবার চল তোকে ভৈরব দাদুর কাছে নিয়ে চলি। মস্তবড় কারবারী লোক তিনি। তিনি ঠিক একটা মতলব নিশ্চয় বাতলে দেবেন।' এর পর অজিত আমাকে ভৈরববাবুর কাছে নিয়ে আসে। প্রথমে ভৈরব দাদু আমাকে এ বিষয়ে কোনও উৎসাহই দেন না। পরিশেষে অবশ্য আমার এবং অজিতের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাকে সাহায্য করতে তিনি রাজি হন। কিন্তু প্রথমেই বেশি টাকা খরচ করতে তিনি আমাকে মানা করে দেন। তিনি আমাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেন—'কত টাকা নষ্ট করতে তুমি রাজি আছ? তোমার সম্বল ত মাত্র হাজার ত্রিশ টাকা। বাপ মরবার সঙ্গে সঙ্গেই সব উড়াতে চাও বুঝি? দেখ বাপু। তুমি অজিতের বন্ধু। তাই তুমি আমার পৌত্র স্থানীয়

ব্যবসা হচ্ছে একটা জুয়া খেলা, হার-জিতের কোনও স্থিরতা নাই। তবে একটা কাজ তুমি করতে পার। তুমি বরং কিছু জমি কিনে ফেল। হুম। বুঝলে? তা কি হে—”

ইতিমধ্যে সেখানে একজন প্রৌঢ় বাঙ্গালী এসে হাজির হলেন। ভৈরববাবু বিরক্ত হয়ে তাকে শুধালেন, ‘এখানে কি চাই হে আবার তোমার? আমি বলেছি তো ও’সবে রাজি নই।’ আমতা-আমতা করে ভদ্রলোক উত্তর করলেন, ‘দেখুন, বাদলপুরের মাতাল জমিদারটা কোল-কাতায় এসেছে। অনবরত হুণ্ডি কেটে জলের দরে বিষয় বিক্রয় করছে।’ তার এই কথাতে চশমাটা কপালে উঠিয়ে ভৈরব দাদু বললেন, ‘আরে! তাই নাকি? আমি খুব চিনি ওদের। ওদের ম্যানেজার আমার বাল্যবন্ধু। কোন কোন্ সম্পত্তি ওদের বিক্রি হবে?’ উৎফুল্ল হয়ে দালাল ভদ্রলোক উত্তর করলেন,‘আজ্ঞে। বীরভূম জেলার দুটো শাল বন। আসল দাম ওর চল্লিশ হাজার হলেও মাত্র সাত হাজার টাকায় বিক্রয় করবেন।’ ‘এ্যাঁ! এ তুমি বল কি? আমি যে একবার নিজে গিছলাম সেখানে। কিন্তু চল্লিশ হাজার তুমি কি বলছ? ওর আসল দাম হবে অন্ততঃ সত্তর হাজার।’ প্রত্যুত্তরে তার প্রতি এইরূপ এক উক্তি করে এরপর ভৈরব দাদু আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘তোমার দাদু একখানা কপাল বটে। একেবারে, মেঘ না চাইতেই জল; কিন্তু সবটা তোমায় দিচ্ছি না তাই। অর্ধেকটা আমি নিজেই রাখব। মাস দুই ধরে রেখে ষাট হাজারে ত বিক্রি করবই। ল্যাণ্ডস্পেকুলেশনই দেখছি বেস্ট বিজনেস্। আমার প্রায় নয় লক্ষ টাকা জুটমিলে আটকে গেল। নইলে কি আর আমি বসে থাকি! যাক, দাদু! তাহলে তুমি কাল সাতটায় এস। যদি কিছু হয় ত তোমার কপালেই হবে। হাজার আটেক টাকা তুমি সঙ্গে এনো। এর বেশি বোধ করি দরকার হবে না।’

এদিকে হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রীঙ ক্রীঙ। রিসিভারটা উঠিয়ে নিয়ে ভৈরবদাদু কথা কইলেন, 'কোউন্? পরিমলবাবু! হাঁ, হাঁ, ও ত হবেই! কেয়া? বাহান্ন হাজার! ওতনা তো আভি গদিমে মজুত নেহি। নেহি নেহি নেহি, কেইসেন হো শেক্তা। ব্যাঙ্ক-উঙ্ক তো আভি বন্দ হো গিয়া। আভি ত্রিশ হাজার হাম্ দেনে শেক্তা। আচ্ছা! আপ আদমি ভেজিয়ে। শুনিয়ে! মুলুক-চাঁদকো ভেজ দিয়ে।' এর পর ভৈরবদাদুর কারবারী অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে আমি এবং বন্ধুবর অজিত সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরি। পরদিন সকাল সাতটায় অজিত আমাকে ভৈরবদাদুর বাড়ি আনে। ভৈরববাবু একটু কিন্তু-কিন্তু করে আমাকে বললেন, 'ড্রাইভারটা তো এখনও এল না। যাক্! তাহলে ট্যাক্সি করেই চলো।' অজিত ও আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে ভৈরববাবু হুকুম দিলেন, 'এই চালাও শোভাবাজার।' কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি ভেবে তিনি অজিতকে বললেন, 'আচ্ছা! অজিত, তুমি আমার অফিসে একটু বস। সিকিমের একজন ব্যবসায়ী আসবেন। তাঁকে বসতে বলবে।' এরপর অজিতকে নামিয়ে দিয়ে তিনি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে স্টার্ট দিতে বললেন। উদ্দাম গতিতে তখন ট্যাক্সি ছুটে চলল। শোভাবাজারে এসে ভৈরববাবুর নির্দেশমত একটা মোটা মোটা থামওয়ালা পুরান বড় বাড়ির সামনে ট্যাক্সিখানা রুখে দিয়ে ট্যাক্সিচালক আমাদেরকে বললো, 'ই তো হামরা মুল্লুককা জমিনদার। আরে এ তো বাদলপুরকো রাজাবাবু আছে।' তার এই স্বগতোক্তির উত্তরে ভৈরববাবু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেন, 'কা? তুম্ চিনতা ইসকো?' ড্রাইভার উত্তরে খুশি মনে তাঁকে বললে, 'আপ কেয়া বলে? বেলিয়ামে তো ইনকো ভারী জমিনদারী হ্যায়। ওনা হ্যায় বাঙলামেভি ইন্‌কো জমিনদারী আছে। আউর বড়ি বড়ি বহুত জদলতী আছে।' 'হুম্! ঠিক হ্যায়,'—এই বলে ভৈরববাবু ট্যাক্সির

তাড়া ঢুকিয়ে আমাকে নিয়ে নামলেন। কিন্তু সেখানে বাদ সাধল গেটের তকমা-আঁটা শান্ত্রীমশাই। পথ আগলে দরোয়ানজী খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'পয়লা এত্তালা দিইয়ে তো ?' দুটা টাকা দরোয়ানের হাতে গুঁজে দিয়ে ভৈরবদাদু হুকুম করলেন,—'তুম্ যাও আভি। মহারাজাকো দেওয়ানজীকে খবর ভেজো-ও-ও।' আমাদের সেলাম জানিয়ে দরোয়ানজী এইবার আমাদেরকে একটা হলঘরে এনে সেখানে আমাদের বসতে বলে দেওয়ানজীকে এত্তালা জানাতে গেল। আমি অবাক হয়ে এই বনেদী বাড়ির আদব-কায়দা পরিলক্ষ্য করছিলাম। আমাকে এধার-ওধার তাকাতে দেখে ভৈরবদাদু একটু হাসলেন ও বললেন,'কি আর এখন দেখছ দাদু! সবই এদের মদে আর জুয়ায় গেছে। রাজার চেহারা দেখলে আরও অবাক হবে। লোকটা ঠিক একটা নিরেট বোকা নর-রাক্ষস।' হঠাৎ গপ্ গপ্ আওয়াজ করে একটা ঘোড়ার গাড়ি গাড়িবারাণ্ডার নীচে এসে দাঁড়াল। সেখানে একজন তকমা-আঁটা লোক। বোধহয় ওদের সহিসই হবে। সে চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছিল,—'হুঁশিয়ার! তফাৎ যাও। রাণীমা আভি।' দূর হতে আমি লক্ষ্য করি যে, একজন শ্যামাঙ্গী প্রৌঢ়া মহিলা গরদের কাপড় পরে বাড়ি ঢুকছেন। তাঁর পিছনে পিছনে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি হাতে আসছে ঝি এবং তার পিছনে পিছনে আসছে এক অপূর্বসুন্দরী সপ্তদশী বালিকা। হঠাৎ একজন বেয়ারা এসে দরজার পর্দাটা টেনে দিয়ে যাওয়ায় এদের আর আমি দেখতে পাই না। এর অল্প কিছুক্ষণ পরেই দোতালার ঘর থেকে অরগ্যানের ঝঙ্কার বেজে উঠে। আমি শুনতে পাই জমিদার-কন্যার অপূর্ব কণ্ঠসঙ্গীত, 'তুমি যে আসিবে তা আমি জানি গো জানি।' আমি মুগ্ধ হয়ে ঐ গীত শুনছিলাম। হঠাৎ দেওয়ানজী চণ্ডীবাবু ঘরে ঢুকে বলে উঠলেন, 'আরে ভৈরব যে, তুমি এতদিন পরে ? ও-ও—সেই

জঙ্গলটার জন্যে বুঝি! কিন্তু তায়া সাত হাজারে হবে না। ওর জন্যে দেড় হাজার আরও চাই। তা ছাড়া আমাকে ভাল কমিশন না দিলে সব ভেস্তে দেব।' উত্তরে ভৈরববাবু মৃদু হেসে তাঁকে জানালেন, 'ওটা না বললেও হত। ও আমি তোমাকে দিতাম।' এর পর দুই বাল্যবন্ধুর মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ব আলাপ জমে উঠল। সংলাপের মধ্যে দেওয়ানজী জানিয়ে দিলেন, জমিদার নাকি রোজ জুয়া খেলছেন, আর হাজার বিশ করে তিনি প্রতিবার হারছেন। এর মধ্যে নাকি দেওয়ানজীরও কারসাজি আছে। তাঁর নির্দেশমত খেললে রাজাকে হারতেই হবে। যে খেলতে আসে সে দেওয়ানজীর শিক্ষামত খেলা জিতে ঘরে ফিরে। দেও-য়ানজীও এদের কাছ থেকে বেশ কিছু কমিশন পেয়ে থাকেন ইত্যাদি। উৎসুক হয়ে ভৈরববাবু দেওয়ানজীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু কারসাজিটা কি? শিখিয়ে দাও না আমাকে। এক হাত নয় আমিও দেখি! কিছু টাকা যদি মুফৎ এসে যায়! তাতে মন্দ কি আর হবে?' 'ও-ও কিছু না, খুব সোজা জিনিস। এই দু হাত গঙ্গা আর দু হাত কালী'—এই বলে দেওয়ানজী ভৈরববাবুকে তাসের কসরৎ দেখাতে লাগলেন। বোঝা গেল ব্যাপারটা খুবই সহজ। শুধু হাতসাফাই-এর কার্য মাত্র। কতকটা তাস সাজাবার কায়দাও বটে! কিন্তু ভৈরব-বাবুর মাথায় বিষয়টা কিছুতেই আর ঢুকে না। অনেক কষ্টে কায়দা-গুলো বোধগম্য করে ভৈরববাবু দেওয়ানজীকে বললেন, 'ও সব এখন থাক ভাই। এয়েছি ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে। ব্যবসায়ে আর সব চলে, কিন্তু জুয়াচুরী চলে না।' উত্তরে দেওয়ানজী কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তা আর তাঁর তখন বলা হল না।

'কাকাবাবু!' বলে জমিদার-কন্যা ঐ হলঘরে ঢুকলেন। হঠাৎ আমা-দের সেখানে দেখে তাঁর আর বাক্যস্ফূরণ হয় না! মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে

তিনি আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে লাগলেন। 'আরে সতী মা! আয় আয়। এঁকে প্রণাম কর। ইনিও তোর একজন কাকা।' সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ভৈরববাবুকে প্রণাম জানাল। সেই সাথে সে দেওয়ানজীকেও প্রণাম জানাতে ভুললো না। আশীর্বাদ করে দেওয়ানজী তাকে বললেন, 'যা তো মা, এঁদের জন্যে চা-টা—' সতীরাণী চলে গেলে দেওয়ানজী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাদুর কানে কানে বললেন—'ওহে! চেষ্টা করে একটু দেখো না। তোমার নাতিটি তো পাত্র হিসেবে ভালই। মরা হাতির দাম এখনও লাখ টাকা। তা ছাড়া ওই ত একটা মাত্র সন্তান। যা অবশিষ্ট আছে তা সবই তো ওর।' 'তা কথাটা তুমি মন্দ বল নি। চল, তাহলে পাশের ঘরে চলো। এ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। এসব আর ছেলে-ছোকরাদের কাছে নয়।' ইশারায় আরও কিছু বলে বন্ধুদ্বয় আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে পরামর্শের জন্য অন্য ঘরে গেলেন। বন্ধুদ্বয় অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে চা নিয়ে হাজির হলেন স্বয়ং জমিদার-কন্যা। দেওয়ানজীদের সেখানে না দেখে ভীতিপূর্ণ স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা! কাকাবাবু কোথায়?' তিনি আমার গা' ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় থাকেন?' উত্তরে আমি তাঁকে বললাম, 'বালীগঞ্জ।' সতীরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি জাত?' উত্তরে আমি জানালাম, 'কায়স্থ।' সতীরাণী উত্তর দিলেন, 'আমরাও কায়স্থ।' সতীরাণী পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনার পদবী কি-ই।' তখন উত্তরে আমি বললাম, 'মিত্তির'। উত্তরে সতীরাণী জানালেন, 'আমরা হচ্ছি বোস।' এই ভাবে আমাদের আলাপ ভালো করে জমে উঠেছে। এমন সময় দেওয়ানজী ঘরে ঢুকলেন, দেওয়ানজীদের দেখে সতীরাণীও ত্বরিত গতিতে সরে পড়ল। ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে জানাল যে, রাজা

সাহেব সেলাম দিয়েছেন। আমরাও কালবিলম্ব না করে দেওয়ানজীর নির্দেশ মত রাজা সাহেবের খাশ কামরায় এলাম। প্রকাণ্ড একটা ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলান কাঁচের সেকেলে ঝাড়-লণ্ঠন। বড় বড় আরশি ও ছবি দিয়ে ঘরখানি সাজান। একটা বড় ফরাসের উপর বসে গড়গড়া টানতে টানতে রাজা সাহেব দু' জন মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলছিলেন। তাঁর পাশে রাখা টিপয়ের উপর একটা রেকাবে সাজান মদের গেলাস। আমাদের সেখানে বসতে অনুরোধ করে তিনি আবার জুয়ায় মনোনিবেশ করলেন। দেখতে দেখতে আমাদের রাজা সাহেব ত্রিশ হাজার টাকা হারালেন। শেষ দানের পর ক্ষেপে উঠে রাজা সাহেব ক্রুদ্ধ ভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ই লোক যাদু জান্‌তা। এ দারোয়ান! নিকাল দেও ই লোককো।' বেগতিক দেখে দরোয়ান আসবার আগেই মাড়োয়ারীদ্বয় কেটে পড়ল। আর এক গেলাস মদ নিঃশেষ করে রাজা সাহেব ডাকলেন, 'দেওয়ানজী!' তাঁর ডাকের উত্তরে দেওয়ানজী বললেন, 'হুজুর!' তখন রাজা সাহেব তাঁকে বললেন, 'আর কেউ খেলবে?' ভৈরবদাদু এই সময় বাধা দিয়ে তাঁকে জানালেন, 'আজ্ঞে আমরা এসেছিলাম শাল বন সংক্রান্ত একটা কথাবার্তার জন্যে।' এবার উত্তরে রাজা সাহেব ভ্রূ কুঁচকে তাঁকে বললেন, 'হাঁ হাঁ। সে ত আপনারই হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমি খেলবো না। আমি কিন্তু খেলবো এখন এর সঙ্গে।' স্বগত স্বরে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ভৈরবদাদু বলে উঠলেন, 'এই খেয়েছে রে! মাতালের কাণ্ড দেখ। শেষ বরাবর দাদুভায়ের উপরই ঝোঁক পড়ল। বেচারা ছেলেমানুষ!' মৃদুস্বরে দেওয়ানজী বলে উঠলেন, 'তা আর কি হবে, খেলুক না। কায়দাটা তো শিখে নিয়েছে। বোকাটা হারুক না। আরও কিছু না হয় যাবে।' ভৈরবদাদু ভৎ'সনার স্বরে উত্তর দিলেন, 'তুমি কি-ই বল ত? এদিকে

জামাই করতে চাচ্ছ, অথচ—' ভরসা দিয়ে দেওয়ানজী তাঁকে বললেন, 'সবই তখন তো ওরই হবে। না হয় আগে থেকেই হাজার ত্রিশ নিল। এখন থেকে এঁকে তো ওকেই সামলাতে হবে! ভগবানের ইচ্ছেয় যদি দু'হাত এক হয়—।' এদিকে রাজা সাহেব তো সেখানে মদ খেয়েই চলেছেন। এদের কথোপকথন তাঁর কানেই যাচ্ছিল না। হঠাৎ মদের গেলাস নামিয়ে রেখে রাজা সাহেব বললেন, 'এই খোকাবাবু, এসো! তাহলে বসে যাও আসনে।' আমি এ প্রস্তাবে প্রথমটায় রাজি হই নি। কিন্তু দেওয়ানজী ও ভৈরবদাদু ভরসা দেওয়ায় রাজি হই। এতে রাজি হই কতকটা লোভে পড়েও বটে। কিন্তু মাত্র দু'বার জেতার পরই আমি হারতে আরম্ভ করি। শেষে আমার সঙ্গে করে আনা দশ হাজার টাকাও হেরে যাই। বেশ বুঝতে পারি যে হাত সাফাইয়ের ব্যাপারে রাজা সাহেব একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং এও বুঝতে পারি যে আমি একটা দস্যুদলের কবলে এসে পড়েছি। ভয়ে ও ভাবনায় এবং অনুশোচনায় আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমাকে চেঁচাতে শুনে রাজা সাহেব ক্রুদ্ধ হয়ে হেঁকে উঠলেন,'বটে। জুয়ায় হেরে আবার চেঁচাচ্ছ মানে? এই! এই দারোয়ান।' দেওয়ানজী এইবার আমাকে সরিয়ে এনে বললেন, 'এখানে ছেলেমানুষী করো না খোকা। জুয়া খেলা সকলের পক্ষেই অপরাধ। চেঁচালে পুলিশ এসে সকলকেই পাকড়াও করবে।' এর পর ফিরে দেখি ভৈরবদাদু অন্তর্ধান হয়েছেন। আমি সেখানে ফাঁকা ঘরে তখন একা আছি। এরপর আমি পরিত্রাহিভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম,'পুলিশ! পুলিশ!' আমি যে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করব তা বোধ হয় এদের পরিকল্পনার বাইরে ছিল। বেগতিক বুঝে সেখানে হাজির হলেন স্বয়ং রাজকুমারী সতীরাণী। তিনি ঝড়ের মত ছুটে এসে চেঁচিয়ে বললেন, 'বাবা! কেন তুমি এইভাবে লোক ঠকাচ্ছ! দাঁড়াও! মা

আসছেন।' ওদিকে দরজার ওপারে চুড়ির ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ শোনা গেল। বেগতিক দেখে রাজা সাহেব, দেওয়ানজী ও দরোয়ানরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল। এর পর সতীরাণী আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর হাত রেখে অনুযোগের স্বরে বলল, 'দেখুন! কিছু মনে করবেন না আপনি। বাবা লোক খারাপ নন। সম্প্রতি ওঁর মাথাটা একটু খারাপ হয়েছে। দেওয়ানজীই মদ খাইয়ে খাইয়ে ওঁর সর্বনাশ করেছেন। কালও ওঁরা একটা লোককে এইভাবে বত্রিশ হাজার টাকা ঠকিয়েছিলেন। মা জানতে পেরে সব টাকা তেনাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। মা বললেন যে, কাল আপনাকে একবার আসতে। আপনি রাত্রে এখানে খাবেন, টাকাগুলোও নিয়ে যাবেন।' আমি তখনও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম! আমার মুখে কোনও উত্তরই যোগায় না। সতীরাণী এইবার তার হীরা ও মুক্তা বসান হার ও বলয় দুটা খুলে ফেলে সেগুলো আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে উঠল, 'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি! আচ্ছা এইগুলো তাহলে রেখে দিন। এই-গুলোর দাম অন্ততঃ চল্লিশ হাজার।' আমি এবার অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর করলাম, 'না না, আপনাকে বিশ্বাস করি। আপনার মাকে বলবেন যে, কাল আমি নিশ্চয় আসব।' অন্তরাল থেকে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, 'আহা! আহা! বাবা আমার! আমার সতীর কি এমন কপাল হবে! এমন ছেলে কি আমরা পাবো? এদের দুহাত কি এক হবে?' 'আসব আসব, নিশ্চয়ই আসবো—' এইবলে আমি সেদিন বাড়িফিরলাম। আমার হৃদয়ে ও মনে অনেক আশা। আমার হারানো অর্থের বিষয়ে তখন আমি নিশ্চিন্তও হয়েছি। পরদিন সন্ধ্যায় দাড়ি কামিয়ে সিল্কের পাঞ্জাবি পরে সতীদের বাড়ি গিয়ে দেখি যে সব ভোঁ-ভাঁ। সেখানে জনমানবের সাড়া-শব্দও নেই। দরজার কাছে দেখি একজন সাহেব ও জন দুই-তিন

বাঙ্গালী দাঁড়িয়ে। সকলেই রাজা সাহেবকে খুঁজতে এসেছেন। সাহেবের কাছে শুনলাম তিনি রাজা সাহেবের কাছ থেকে নেপালের তারাই-এর ছয় হাজার একর জমি কিনবেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা বেহারের একটা অভ্রের খনির খবরে সেখানে এসেছেন, ইত্যাদি। সকলে মিলে দলবেঁধে থানায় এসে শুনলাম যে, আমরা একটা দুর্দান্ত নওসেরা গ্যাঙের খপ্পরে পড়েছি। তদন্তে প্রকাশ পেল যে আমার বন্ধুমন্ত—ঐ অজিত, ভৈরবদাদু, রাজা, রাণী, দেওয়ান, দরোয়ান, মায় ট্যাক্সি ড্রাইভার পর্যন্ত এক দলেরই দলী। রাজ সাহেব এবং ভৈরবদাদুর বাড়ি দুটি ভাড়া করা এবং বাড়ির যাবতীয় আসবাব-পত্তর দোকান থেকে ভাড়ায় আনা হয়েছে। দলটা না'কি ততক্ষণে বোম্বে, দিল্লী বা অন্য কোনও দূর দেশে পিট্টান দিয়েছে। বড় বড় শহরে এসে এই দল একাধিক বাটী সাময়িক ভাবে ভাড়া করে আড্ডা গাড়ে এবং চারি দিকে তাদের এজেন্ট পাঠায়। এই এজেন্টরা আমার মত বোকা দেখে ছেলে-বুড়োকে যোগাড় করে আড্ডায় এনে এইভাবে লোক ঠকায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে শিকার পেলে সতীরাণীর আবির্ভাব হয়। তা না হলে সতী ও তার মার সাহায্য ব্যতিরেকেই সেখানে কার্য সমাধিত হয়।"

মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে সাধারণ ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—যৌনজ এবং অযৌনজ। অর্থাৎ কাহারও ঝোঁক থাকে নারীর উপর, কাহারও ঝোঁক থাকে অর্থের উপর। কাহারও কাহারও আবার নারী এবং অর্থ [সম্পত্তি] এই উভয়েরই উপর ঝোঁক দেখা যায়। প্রয়োজন মত অপরাধীরা ইহার একটি বা অপরটি কিংবা একত্রে দুইটির দ্বারাই দুর্বলচিত্ত মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। উপরি-উক্ত কাহিনীটিতে নওসেরা অপরাধীরা কিরূপ পদ্ধতিতে মানুষের

অন্তর্নিহিত এই যৌনজ এবং অযৌনজ স্পৃহাদ্বয় জাগ্রত ক'রে তারের ঠকিয়ে থাকে তা বলা হয়েছে। এইবার ঠগী দলের আভ্যন্তরিক সংগঠন সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। নওসেরা দলের কার্যকলাপ এবং সংগঠনের মধ্যে আমরা অত্যন্তরূপ মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই। এই সম্বন্ধে নওসেরা দলের একজন অপরাধীর একটি বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। এই চমকপ্রদ বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য। বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের দলের লোকেদের মধ্যে কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ প্রচলিত আছে। এই সকল সাংকেতিক শব্দ আমরা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করি। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাজা, জমিদার বা বড় ব্যবসাদার সাজে, তাকে আমরা বলি 'বৈঠো'। আমাদের দলের মধ্যে যে ব্যক্তি ম্যানেজার বা দেওয়ানজীর ভূমিকা গ্রহণ করে, তাকে আমরা বলি 'মোক্তাব'। নওসেরা দলে যে ব্যক্তি প্রথম জুয়া খেলার স্থচনা করে তাকে আমরা বলি 'ট্রাইম্যান'। আমাদের যে ব্যক্তি দালালের ভূমিকায় অভিনয় করে তাকে আমরা 'দালাল'ই বলি।

এই সকল দালাল নানা স্থান হতে নানা শ্রেণীর লোকদের নানা অছিলায় ভুলিয়ে এনে আড্ডাস্থলে হাজির করে। প্রতারণার অভিপ্রায়ে আড্ডাস্থলে নীত ব্যক্তিদের আমরা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করি এবং তদনুযায়ী আমরা তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকি। এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিদের আমরা যথাক্রমে (১) কোরা, (২) সোনামুড়া এবং (৩) ফুটা বলে থাকি। এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা পূর্বে এইরূপ খেলা খেলে ঠকেছে। এই সকল ব্যক্তিদের আমাদের পরিভাষাতে আমরা বলি 'ফুটা।' এদের মধ্যে যারা এইরূপ খেলা কখনও খেলে নি, কিন্তু নওসেরা প্রতারণার পদ্ধতি সম্বন্ধে গল্প শুনেছে, সেই

সকল ব্যক্তিদের আমরা বলি 'সোনামুড়া'। এদের মধ্যে এমন লোক থাকে যারা এইরূপ খেলা পূর্বে কখনও খেলে নি, কিংবা তারা এইরূপ প্রতারণার সম্বন্ধে কখনও কোন গল্পও শুনে নি। এই সকল ব্যক্তিকে আমরা বলি 'কোরা'। এই 'কোরা' মানুষদেরই বেছে নিয়ে আমরা ঠকিয়ে থাকি। সাধারণতঃ আমরা ঘুঁটির দ্বারাই এই খেলা খেলি। কখনও কখনও আমরা তাসও ব্যবহার করি। এই তাসগুলি কায়দা মাফিক সাজানো হয়। প্রত্যেক বিবি বা গোলাম পিছু আমরা টাকা ফেলি। তাসগুলি একটা বিশেষ কায়দাতে সাজান হয়। এতে ক'রে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দানে কাহারও ভাগে কোনও ছবি পড়ে না। অর্থাৎ, তাতে কেউ জেতেও না, তাতে কেউ হারেও না। তাস সাজাবার কায়দার গুণে চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিই [victim] জিততে থাকে। দুই হাজার টাকা ক'রে তিন দানে ছয় হাজার টাকা জেতার পর [আনন্দের আতিশয্যে] প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অত্যন্তরূপ উত্তেজিত হয়ে উঠে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাকে আমরা বলি 'গরম'। পর পর তিন তিনবার জেতার পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তির উত্তেজনা শেষ সীমায় আসে। এই সময় তার প্রতি ধমনীতে রক্ত অতি দ্রুত প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় তার জিহ্বা ও তালু শুকিয়ে যায়। তখন তার বাক্যস্ফুরণ পর্যন্ত হয় না। এই সময় তার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করে। অর্থাৎ তার মাথা হতে রক্ত নীচে নামে। ফলে মস্তিষ্ক তার অসাড় হয়ে আসে। তার বক্ষ দুরদুর করে এবং হস্তদ্বয় কাঁপতে থাকে। এই অবস্থায় জুয়ায় জেতা মুদ্রা কয়টিও সে পূর্বের ন্যায় নিজের কোলের দিকে টেনে আনতে পারে না। যে দালালটি প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে অকুস্থলে ভুলিয়ে এনেছিল, সেই দালালই তখন প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কোলের দিকে টাকাগুলো টেনে আনে। তখন তারা এমন ভাব দেখায়, যেন সেও তার

স্নত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির মনের এই বিশেষ অবস্থাটিকে আমরা বলি 'ধুর'। প্রবঞ্চিত ব্যক্তির এই 'ধুর অবস্থার' সময়েই আমাদের দলের একজন খেলার ঘুঁটি পাল্টিয়ে বা খেলার তাস উল্টিয়ে বা তা সরিয়ে দিয়ে খেলার মোড ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণতঃ হাত সাফাইয়ের সাহায্যেই আমরা এই কাজ করে থাকি। 'ধুর' অবস্থায় প্রবঞ্চিত ব্যক্তির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে এবং এর ফলে সে আমাদের কোনওরূপ চালাকিই ধরতে পারে না। এইরূপ হাত সাফাই-এর সাহায্যে ঘুঁটি উল্টান বা তাস পাল্টানকে আমরা বলি, 'তোড'। এই 'তোড়ে'র কার্য নির্বিঘ্নে সমাধিত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে যে বৈঠোর ভূমিকায় [রাজা, জমিদার বা ব্যবসাদার] অভিনয় করছে, সেই ব্যক্তি হঠাৎ এক সঙ্গে একেবারে বারো হাজার টাকা, অর্থাৎ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি যত টাকা জিতেছে তার দু'গুণ টাকা বাজি ধরে বসে, অকুস্থলে উপস্থিত কোনও এক শুভাকাঙ্ক্ষীর বার বার নিষেধ সত্বেও। এই সময়ে আমরাও নিম্ন স্বরে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে 'বৈঠো'র এই শেষ প্রস্তাবে রাজি হতে বলি। আমাদের উপদেশে এবং উৎসাহে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি 'বৈঠো'র এই প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু এই শেষ খেলার পর সে দেখে যে, তার প্রথম কয়দানে জেতা ছয় হাজার টাকা তো সে হারিয়েছেই, তদুপরি সঙ্গে করে আনা তার নিজের ছয় হাজার টাকাও তাকে বার করে দিতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে যে দালাল সেজেছে, সে তখন প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এ সময় সে তাড়াতাড়ি প্রবঞ্চিত ব্যক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলে উঠে, 'মশাই। ও—ওটা কিছু নয়। এই হারটা দৈবক্রমে হয়ে গেছে। এর পরের দানে সবটাই উশুল হয়ে যাবে। আপনি দিয়ে দিন দানের টাকা কটা।' এই উপদেশ মেনে নিয়ে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি পকেটের টাকা কয়টা তাদের দিয়ে পরের দানের জন্য প্রস্তুত হয়।

কিন্তু তাস সাজাবার গুণে সে আর একটি বারও জিততে পারে না। এই বাজিমাৎ করার নাম দিয়েছি আমরা 'চোট্'। এই খেলাতে দশ টাকাকে আমরা বলি 'গজ', এবং একশ টাকাকে আমরা বলি 'গিরাই'। এইভাবে টাকার সংখ্যানুযায়ী আমরা গজ, গিরাই,পট্টি, বারি ও বাটা বলে থাকি। অনেক সময় এই প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদেরও আমরা দলে ভর্তি করে নিই। কি করে তা বলছি শুনুন,—এই ধরনের শিকাররা [viotim] প্রায়ই লোভী, অভাবী বা দুর্বলচিত্তের হয়ে থাকে। কাহারো কাহারো মধ্যে অপরাধ-প্রবণতাও দেখা যায়। এইরূপ প্রকৃতির মানুষ না হ'লে অপরকে ঠকিয়ে অর্থ উপায়ের বাসনা তাদের মধ্যে আসতো না। এইরূপ প্রকৃতির মানুষেরা বোকা জমিদারকে ঠকাতে গিয়ে নিজেরাই ঠকে। এই অবস্থাতে তারা আমাদের কাছেই এসে ধরে কেঁদে পড়ে। নিজেরাই জুয়া খেলেছে—এই ভয় ও লজ্জায় তারা এ কথা কাউকে বলে না। এই সুযোগে আমাদের এই অভিনয় চাতুর্য সম্বন্ধে আমরা তাদের ওয়াকিবহাল করে দিই এবং তাদের আমরা জানাই যে তারা অনুরূপ ভাবে আড্ডাখানায় লোক সংগ্রহ করে আনতে পারলে তাদেরকে ঠকিয়ে আমরা যা' অর্থ পাবো তা থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার হৃত অর্থ তো তাকে ফিরিয়ে দেবোই, তা ছাড়া ঐ খেলা বাবদ আরও কিছু টাকা তাকে তার হিস্যা স্বরূপ দেওয়া হবে। অনেক সময় প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা স্ত্রীর বা কোনও আত্মীয়ের গহনা বন্ধক রেখে কিংবা পৈতৃক জমি বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে বা টাকা কর্জ করে লোভে পড়ে এই প্রতারণা-জুয়া খেলতে আসে। এই হৃত অর্থ পুনরুদ্ধার করে যথাসময়ে উহা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে না পারলে তাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। এই কারণে বাধ্য হয়েই তাদের কেউ কেউ আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়। এমন কি এদের কেউ কেউ ধীরে ধীরে আমাদের দলভুক্তও হয়ে পড়ে।

আমাদের দালালেরা বাক্‌জাল সৃষ্টি করে নানা উপায়ে মানুষের মন ভুলোয়। মানুষের মন ভুলোবার অভিনয় পদ্ধতিগুলিকে আমরা বলি 'রগড়া'। আমরা মানুষের পেশা বা স্পৃহা অনুযায়ী তার প্রতি প্রযোজ্য [উপযুক্তরূপে] 'রগড়া' নির্ধারণ করি। ডাক্তারেরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং ব্যবসায়িগণ ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তায় অধিক আগ্রহশীল থাকে। মানুষের চিত্তপ্রস্তুতির [predisposition] কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। এই কারণে আমরা আমাদের শিকার বা ভিকটিম্ [victim]-দের পেশানুযায়ী মুখরোচক বাক্‌জাল সৃষ্টি ক'রে, তাদের সহিত আলাপ জমিয়ে তাদের দুর্বলতাসকল কোথায় সেটা আমরা জেনে নিই। প্রথমে আমরা প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত বা মনোনীত ব্যক্তির প্রফেশন বা পেশা সম্বন্ধে খবর নিই। যদি আমরা বুঝি লোকটি চাউলের ব্যবসা করে, তা হ'লে সোজাসুজি তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা মশাই! এক সঙ্গে সত্তর হাজার মণ চাউল কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন? এ কজন বড় ব্যবসাদার ব্রেজিলে পাঠাবার জন্যে এই সপ্তাহেই সত্তর হাজার মণ চাউল চান। বড উপকার হয় মশাই, যদি সন্ধান দিতে পারেন। মশাই! হঠাৎ বড় বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি আমি। কিছু দালালি মেরে আমার মেয়েটার বিয়েটা দিতে চাই। অত বড় আইবুড়ো মেয়ে! মশাই! রাত্রে ঘুম হয় না।'

এইরূপ রগড়া বা বচন-বিন্যাস দ্বারা স্বভাবতঃই চাউল ব্যবসায়ীর মন আশান্বিত হয়ে উঠবে। ক্রেতার অভাবে তার ব্যবসায় যাবার দাখিল হয়েছে, এ সংবাদ আমরা পূর্বেই জেনে নিয়েছি। এর পর আমরা তাকে রগড়ার পর রগড়া প্রয়োগে অভিভূত করে স্তুতি সহজেই আড্ডাখানায় হাজির করতে পারি। আড্ডাস্থলে সে উত্তেজনাপূর্ণ মন নিয়েই আসবে। উত্তেজনার ফলে মানুষের মস্তিষ্ক অস্বাভাবিক

হয়ে উঠে। এই কারণে তাদের লোভী করে তুলে ঠকানও সহজ হয়।"

সাধারণ ভাষায় প্রতারণার নওসেরা পদ্ধতিকে আমরা বলি 'বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ বা ঘুঁটি খেল্'—আপাতঃ দৃষ্টিতে এই খেলাকে জুয়া বলে মনে হলেও আসলে উহা প্রবঞ্চনার একটি অভিনব পদ্ধতি মাত্র।

এই দলের মধ্যে রগড়া দেবার কাজে বহাল ব্যক্তিদের পরিশ্রম করতে হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। এই 'রগড়া'র বচন-বিন্যাস এবং বাক্যজাল সৃষ্টির মধ্যে এরা প্রচুর চাতুর্য প্রকাশ করে থাকে। তাদের শিকার বা victim-দের খুঁজে বার করতেও তাদের কম বেগ পেতে হয় না। এই 'রগড়া' সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"হাওড়া জেলার অমুক গ্রামে আমার বাস। পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের সেবার উপর নির্ভর করে আমার সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। একদিন ঠাকুর পূজা সমাপন করে বহির্বাটীতে ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখে তিনি ব্যস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাঁ মশাই! এই কি সেই অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ঠাকুরের বাড়ি?' উত্তরে আমি 'হাঁ' বলা মাত্র ভদ্রলোক একটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'আঃ, বাঁচালেন মশাই!' এর পর তিনি ভক্তি গদগদ ভাবে কপালে বার বার যুক্তকর ঠুকে বলতে থাকলেন, 'বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ, বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ।' হতভম্ব হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি মশাই? মশাইয়ের আসা হচ্ছে কোথা থেকে?'

ভদ্রলোককে বিশেষ ক্লান্ত মনে হলো। শুনলাম তিনি বহু দূর

থেকে আসছেন। এই গ্রামটা খুঁজে বার করতেও তাঁকে কম বেগ পেতে হয় নি। একটা মিষ্টি প্রসাদ মুখে দিয়ে একটু জল খেয়ে তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তা আমাকে বললেন।

'আমি মশাই শ্রীপুর গড়ের সাতলাখী জমিদার মহারাজা স্যার মহাভাপ রায় বাহাদুরের একজন অন্দর মহলের কর্মচারী। আমি সেখানে স্বর্গগত বাবা মহারাজের আমল থেকে বহাল আছি। অধমের নাম শ্রীহরিসাধন মৈত্র। সাতক্ষীরের কুলীন ব্রাহ্মণ আমরা। তারপর, হ্যাঁ, আসল কথা বলি শুনুন। সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বড় মহারাণীর তিনি ছিলেন একমাত্র সন্তান। ঠিক যেন ননীর পুত্তলি। হঠাৎ একদিন খেলা করতে করতে ধড়াস করে তিনি মাটিতে আছড়ে পড়লেন। ব্যাস! তারপর আর তিনি উঠেন না। দৌড়ে এসে আমরা সকলে দেখি তড়কা আরম্ভ হয়েছে, ভেদবমিও। কোলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা এলো, লাট সাহেবের সাহেব ডাক্তারও। কিন্তু সকলেই সেই এক কথাই বলে গেলো, সাত দিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। গলার মধ্যে নাকি, কি বলে গেলাণ্ড [gland] না কি হয়েছে। রাণীমা তাই শুনে সেলুন ভাড়া করে সোজা হরিদ্বারে তাঁর সেই সাধক গুরু প্রভানন্দগিরির কাছে চ'লে গেলেন। তাঁর আশ্রমের দুয়ারে এসে উনি আছড়ে পড়লেন। একটি কণাও তিনি খান না দান না। সঙ্গে আছে এই অধমতারণ বুড়ো। কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম মশাই! গুরু মহারাজ মা'কে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে অবশেষে নাচার হয়েই ধ্যানে বসলেন। তিন দিন তিন রাত্রি পরে তিনি কি প্রত্যাদেশ পেলেন জানি না; ঐ সময় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি মা'কে জানালেন, 'যা বেটি, বাড়ি যা! ছেলে এতক্ষণে তোর ভালো হয়ে গেছে।' তা আমি মশাই কোন কালেই ঠাকুর-দেবতার এতটা

বিশ্বাসী ছিলাম না। কিন্তু মশাই, বলবো কি! আমি ফিরে এসে দেখি, যে-ছেলেটার মরবার কথা, সে কি'না রাজবাড়ির হল ঘরে লাট্টু ঘোরাচ্ছে! জয় লক্ষ্মীনারায়ণজী! বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! বাবা-আ। আজ্ঞে! এর পর কি হলো? হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি, দেবতা! বলছি, শুনুন। এর পর গুরুঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আবার আমরা গাড়ি রিজার্ভ করতে যাচ্ছি, এমন সময় হরিদ্বারবাসী সেই গুরুঠাকুরের এক চেলা সেখানে এসে হাজির। তিনি আমাদের সেই রাজপুত্রকে আশীর্বাদ করে আমাদেরকে বললেন:—

'গুরুদেব বলে পাঠিয়েছেন যে, হরিদ্বার যাবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। ছেলেটি বেঁচে গেছে গুরুদেবের স্বর্গগত গুরুদেব প্রতিষ্ঠিত হাওড়া জিলার অমুক গ্রামের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর কৃপায়। সেখানকার জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরই গুরুদেবকে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন। গুরুদেবের আশ্রমের জন্যে আমরা যে লক্ষ টাকা দান করতে মনস্থ করেছি তা তিনি গ্রহণ করবেন না। তাঁর আশ্রমের জন্য একটি মাত্র পর্ণ কুটিরই যথেষ্ট। উহার অতিরিক্ত তাঁর কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর আবাসস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করে দেবার জন্যে গুরুদেবকে স্বপ্ন দিয়েছেন। অতএব আমরা যেন লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর সেবায়েত পরম ভক্ত অমুক গ্রামের অমুকের হস্তে লক্ষ মুদ্রা পত্রপাঠ দিয়ে দিই।'

এর পর সেই ভদ্রলোক 'লক্ষ্মীনারায়ণজী, লক্ষ্মীনারায়ণজী' বাক্য উচ্চারণ করতে করতে কেঁদে ফেললেন। এত বড় একটা সুখবরের পর লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর দয়ার কথা স্মরণ করে আমিও কেঁদে ফেললাম।

আমরা উভয়ে এই ভাবে বহুক্ষণ কেঁদেছি। কতক্ষণ তা আমাদের কারুরই স্মরণ নেই। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখের জল মুছে প্রস্তাব করলেন, 'মশাই! তাহলে এখন চলুন, গাত্রোত্থান করা যাক্। শুভস্য শীঘ্রম্। মহারাজা এখন দমদমার প্রাসাদেই আছেন। মহারাণীও তাঁর সঙ্গে আছেন। রেজিস্টারী কবলা প্রভৃতির ব্যাপারটা পাকাপাকি করে আসা যাক্। রাজা-রাজড়ার মন। বলা তো কিছু যায় না; ক্ষণেক হাসি, ক্ষণেক কাঁসি। এই দেখুন না, দিনে দশবার তাঁরা আমাকে বরখাস্ত ক'রে পুনরায় কর্মে বহাল করছেন। খেয়েদেয়েই রওনা হওয়া যাক। এখানে আমাদের দেরি করা ঠিক নয়।'

অনতিবিলম্বে খাওয়া-দাওয়া সেরে রওনা হলাম। আমরা উভয়ে নির্বিবাদে রাজা বাহাদুরের দমদম বাগানবাড়িতে পৌঁছাই। আমার ট্যাকঘড়িতে তখন বারোটা বেজেছে। প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি। তক্‌মা-আঁটা দরোয়ানের দল এবং নীল কোর্তা পরা চাপরাশীরা ইতস্ততঃ ছুটা-ছুটি করছে। প্রাসাদের উঠবার সিঁড়ির দুইপাশে দুইটা বড় বাঘ সাজানো ছিল। বাঘ দুইটির সহিত সংলগ্ন দুইটি ফোয়ারাও দেখলাম। সিঁড়ির শেষ ধাপটায় পা দেওয়া মাত্র বাঘ দুইটা গাঁক করে ডেকে উঠলো। চমকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে দেখি যে ফোয়ারা দুইটা হতে গোলাপ জল পড়ছে। এই আজব ব্যাপারে আমাকে অবাক হতে দেখে ভদ্রলোক আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'মশায়! ও কিছু নয়। সিঁড়ির তলায় স্প্রিং-এর যন্ত্র লাগানো আছে তাই এমন অদ্ভুত ব্যাপার হয়। রাজা-রাজড়ার কাণ্ড মশাই, কি'ই আর আমি বলব।' এরপর দরবার ঘরে এসে দেখি রাজা বাহাদুর একটা মূল্যবান ফরাস ঢাকা চৌকিতে বসে মখমলে মোড়া তাকিয়ায় হেলান দিয়ে জরির টুপি পরা এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে জুয়া খেলছেন। আমাকে পাশের একটা স্প্রিং-এর সোফার উপর হাতে

ধরে বসিয়ে দিয়ে নিম্ন স্বরে মৈত্র মশাই আমাকে জানালেন, 'চুপ করে বসে থাকুন, কথা বলবেন না। ওঁর মেজাজ এখন গরম। দেখছেন না, জুয়োতে উনি এখন হারছেন!' তেইশ হাজার টাকা হারার পর রাজা বাহাদুর খেঁকরে উঠে বললেন, 'এ বেটা নিশ্চয়ই জাদু জানে। এই দরোয়ান! ইসকো নিকাল দেও।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক চালাক লোক। বেগতিক বুঝে জুয়ায় জেতা টাকাগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাড়ি থেকেও উধাও হতে তাঁর দেরি হয়নি। অনতিদূরে একজন ভাটিয়া ব্যবসায়ী বসেছিলেন। একটু এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে তিনি বললেন, 'রাজাসাহেবের আজ্ঞা হোয় তো মে ভি থোড়া খেল্ চুকে।'

হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধান একটা টিপয় চৌকির সামনে রাখা ছিল। সেই টিপয়টির উপর রাখা ছিল অর্ধপীত মদের গেলাস। টিপয়টির উপর হ'তে গেলাসটা তুলে নিয়ে তাতে চুমুক দিতে দিতে রাজা বাহাদুর উত্তর দিলেন,'নেহি,নেহি, কভি নেহি। তুম্ভি আউর এক শয়তান আছে।' এর পর হঠাৎ রাজা বাহাদুরের লক্ষ্য পড়লো আমার উপর। আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বলে উঠলেন, 'হাম্ ইন্‌কো সাথ খেলেঙ্গে। কি ঠাকুর মোশায়, খেলবেন না কি?' অকুস্থলের কাণ্ডকারখানা আমাকে অবাক করে তুলেছিল। আমার মুখ দিয়ে এর কোনও উত্তরই বার হলো না। মৈত্র মশাই এইবার এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে উত্তর করলেন, 'আজ্ঞে, না। ইনি ওদের কেউ নন। ইনি হচ্ছেন সেই লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের সেবায়েৎ পরম ভক্ত শ্রীযুত অমুক।' আমার পরিচয় পেয়ে রাজাসাহেব অত্যন্ত রূপ লজ্জিত হয়ে উঠে মাথা নুইয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না ঠাকুর মশাই! এই জুয়োই হচ্ছে আমার একমাত্র দুর্বলতা। তা আমি আর কি করব বলুন।

এই সব আমাদের রক্তের মধ্যেই রয়েছে। পূর্বপুরুষদের সুকৃতির ফল আর কি! তা তাঁদেরই তো সন্তান আমি—হে হে হে।' এর পর হঠাৎ রাজাবাহাদুর মৈত্র মশাইকে ধমক দিয়ে বললেন, 'তা তুই ঠাকুর মশাইকে এখানে আনলি কেন? তোর কি এতটুকুও কাণ্ডজ্ঞান নেই? ছিঃ! এটর্নি বাড়ি থেকে মন্দির সংক্রান্ত দলিল-পত্রগুলোও বোধ হয় এখনও আনিস্ নি? অ্যাঁ, কি'রে কথা বলছিস্ না যে, ও'গুলো তুই আনিস্ নি তো? মশাই দেখছেন? দেখছেন তো? ওর কাণ্ডই এই রকম। ওগুলো আগে এনে তবে তো ওঁকে আনা উচিত ছিল? যা, এখন ওঁকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত কর। খবরদার! ওঁর সেবার যেন কোনও ত্রুটি না হয়।' মনিবের তাড়া খেয়ে মৈত্র মশায় আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে এসে গজ্‌রে উঠে বললেন, 'মশাই! আপনি দেখেছেন! দেখেছেন তো আপনি! এখন সব দোষ যেন আমারই।' এর পর মৈত্র মশাই-এর সঙ্গে আলাপ করে আমি জানতে পারি যে রাজাবাহাদুর একটি বোকা জমিদার। জোচ্চোরেরা কায়দা মাফিক জুয়া খেলে প্রত্যহই তাঁকে হাজার হাজার টাকা ঠকায়। কিছুক্ষণ সংলাপের পর মৈত্র মশাই আমাকে প্রস্তাব করে বসলেন,—'মশাই! এক কাজ করুন না? বড় উপকার হয় তা হলে। মেয়ে দুটো আমার বড্ড বড় হয়ে গিয়েছে। বিয়েটা তাদের তা হলে এই মাসেই দিয়ে দিই। আপনার সঙ্গে উনি খেলতে রাজি হয়েছেন। এখন না হয় খেলেই দিন একটা দান। হাজার হোক আমরা ওঁর চাকর লোক। আমরা তো আর ওঁর সঙ্গে জুয়া খেলতে পারি না।'

ভদ্রলোকের এই প্রস্তাবে প্রথমে আমি কিছুতেই রাজি হই নি। কিন্তু ভদ্রলোক একরকম কান্নাকাটিই শুরু করে দিলেন। এইভাবে মেয়ের বিয়ে তিনি এই মাসেই দেবেন। টাকার দরকার।

পরে আমিও লোভে পড়ে রাজি হই এবং জমিদারের সহিত খেলে নগদ তিন হাজার টাকা জিতেও নিই। খেলার কায়দা-কানুন অবশ্য মৈত্র মশাই আমায় শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া খেলার জন্যে প্রয়োজনীয় টাকাটাও দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে পূর্ব বন্দোবস্ত মত মাত্র দুইশো টাকা বাদে বাকি সব টাকা তাঁকেই দিয়ে দিতে হয়। এই উপকারটুকুর জন্যে মৈত্র মশাই আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানান,—আমাকে দশ হাজার টাকা জোগাড় ক'রে পুনরায় সেখানে আসতেও তিনি আমায় উপদেশ দেন। কারণ তা হ'লে মন্দিরের বাবদ এক লক্ষ টাকা তো আমি পাবোই, এ ছাড়া আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা জুয়ায় জিতে আমি ঘরে ফিরতে পারব, ইত্যাদি।

লোভে পড়ে সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরে আমি গিন্নীকে মিথ্যা করে জানাই, 'গিন্নী! বড় সুখবর গিন্নী তোমার। তোমার এক বড় সুখবর। আমার এক স্যাকরা শিষ্যের সঙ্গে আজ পথে হঠাৎ দেখা হলো। কাল আমি তোমার গহনাগুলো পালিশ করিয়ে আনবো। সে বিনা পারিশ্রমিকে ঐগুলি পালিশ করে দেবে, বুঝলে?' পরের দিন আমি গিন্নীর গহনাগুলো পালিশ করাবার অছিলায় তাঁর কাছ থেকে সেগুলো চেয়ে নিয়ে তা বাঁধা দিয়ে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করি। এ ছাড়া পৈতৃক জমিজমাগুলো বাঁধা দিয়ে আরও চার হাজার টাকা যোগাড় করি। সর্বসমেত আট হাজার টাকা সঙ্গে করে শুভক্ষণ দেখে আমি বার হচ্ছি, এমন সময় আমার এক পুরাতন মন্ত্র-শিষ্য এসে সেখানে হাজির। একটু বিব্রত হয়েই আমার প্রিয় শিষ্যটিকে জানালাম, 'তা বাবা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু বাবা, এক্ষুনিই যে আমাকে একটা শুভ কার্যে বেরুতে হচ্ছে।' কথায় কথায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্মাণের সংবাদটাও আমি তাকে জানিয়ে দিলাম।

দমদমার জমিদারের বদান্যতার কথাও আমি তাকে বলতে ভুললাম না। সব কথা শুনে শিষ্যটি আমার আঁৎকে উঠে দুই পা পিছিয়ে এসে বলে উঠলো, 'এঁ্যা! করেছেন কি আপনি, সেখানে গিয়েছিলেন? সর্বনাশ! ওরা যে নওসেরা জোচ্চরের দল! কয়লার একটা বড় কনট্রাকট্ দেবে বলে ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাকেই ওরা পাঁচ হাজার টাকা ঠকিয়েছে! আদালতে ওদের নামে তিন-তিনটে ফৌজদারি মামলা এখনও পর্যন্ত পেণ্ডিঙ্। আর আপনি কি'না—'

শিষ্যের কাছে আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হই। সত্য সমাচার অবগত হয়ে চক্ষু আমার কপালে উঠে। এই সময় আমি বুঝতে পারি যে, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকান্ত জীউ সত্য সত্যই জাগ্রত দেবতা। যথা সময়ে তিনি শিষ্যকে মদ্ সকাশে পাঠিয়ে তিনিই আমাকে রক্ষা করলেন। তা না হ'লে গিন্নীর হাতেই আমার প্রাণটা যেতো। আরে বাপ্ স্! অতগুলো গহনা, ছিঃ! বার বার যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে আমি ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাই—বাবা লক্ষ্মীনারায়ণ! এ অধম ভক্তের উপর অসীম তোমার দয়া।"

অসাধারণ প্রবঞ্চনার এই বিশেষ অপপদ্ধতিতে প্রবঞ্চকগণ বিবিধ রূপ রগড়ার আশ্রয় নেয়। অবস্থা বুঝে এরা প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের সৎ প্রেরণাসম্ভূত আদর্শ উদ্বেলিত করেও উহারই দ্বারা তারা তাদের সুপ্ত অপস্পৃহার বহির্বিকাশ ঘটিয়েছে। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমাকে ওরা ইলেকট্রিক ওয়্যারিঙ-এর একটা কনট্রাক্ট দেবে বলে। আমি সেই লোভে তাদের আড্ডা ঘরে উপস্থিত হই। এই সময় আমি ওদের বসবার ঘরে একটি নিরীহ বৃদ্ধ ভদ্রলোককে শায়িত দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁ মশাই, এইটি কি অমুক বাবুর বাটী?' উত্তরে বৃদ্ধ

ভদ্রলোক 'হাঁ' বলে আমাকে একটি শোফায় উপবেশন করতে বলেন। কিছুক্ষণ পরে অপর এক ভদ্রলোক বাটীর ভিতর হতে সেইখানে আসা মাত্র তাঁকে উদ্দেশ করে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'দয়াময় আর কতো ভোগাবেন? কখন আপনাদের কর্তা আসবেন বলুন তো? ঐ দেখুন আরও এক ভদ্রলোক ওঁর খোঁজে এসেছেন।' কিছুক্ষণ পর আমার পরিচিত ঐ বাটীর মালিক বাহির হতে এসে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির কলহের অভিনয় শুরু হ'ল। কলহের বিষয়বস্তু হতে আমি বুঝলাম অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়েই এই কলহের সৃষ্টি। পরে আমার ঐ পরিচিত ব্যক্তি আমাকেই মধ্যস্থ মেনে আদ্যোপান্ত ঐরূপ একটি ঘটনা সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করে দিয়ে বললেন, 'মশাই! বলুন তো আমার অপরাধ কি? ঐ বোকা জমিদারটিকে জুয়ায় হারাবার কায়দা-কানুন তো ওঁকে আমিই শিখিয়েছি। আর এই জন্যই তো তা হতে আমার প্রাপ্য হিস্সা আমি কেটে নিয়েছি। আমরা তার বেতন-ভোগী নোকর না হলে ওঁর সাহায্য না নিয়ে আমি নিজেই ঐ বোকা শয়তানটার সঙ্গে জুয়া খেলে টাকাটা জিতে নিতে পারতাম।' প্রকৃত বিষয় অবগত হওয়া মাত্র আমার মন আমার ঐ পরিচিত ব্যক্তির উপর স্বভাবতঃই বিরূপ হয়ে উঠছিল। আমার মনের এই অবস্থা বুঝে ঐ ভদ্রলোক তখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললেন, 'জানেন! সাধে কি আমি ওর এই ভাবে সর্বনাশ করছি? আমাকে গোমস্তার চাকরিটা দিয়ে বলে কি'না আমার ভগিনীকে টাকায় বিনিময়ে তার উপভোগের জন্য এনে দিতে। জানেন আপনি ও এই ভাবে এই দেশের কত সতীসাধ্বী কন্যার সর্বনাশ সাধন করেছে? ঐ শয়তান লোকটাকে জুয়ায় ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করলে কোন পাপ নেই। আমি চাই শুধু ওর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে। আপনিও আসুন না, স্যার! আপনাকে

দিয়েও কয় হাত ওর সঙ্গে খেলিয়ে কয়েক হাজার টাকা লুটে নেই। উঃ! রাগে ও ক্ষোভে আমার রক্ত এখনও টগবগ করে ফুটে উঠছে! চলুন কালই ওর সেই বাগানবাড়িতে আপনাকে আমি খেলবার জন্ম নিয়ে যাব।"

বহু ক্ষেত্রে এই সকল দালালরা তাদের 'শিকার'দের সহিত নানা উপায়ে আলাপ জমাবার পর তাকে সঙ্গে করে নিমন্ত্রণের অছিলায় তার স্ব-বাটীতে নিয়ে গিয়েছে। এমন সময় পথিমধ্যে ঐ দলের অপর আর এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও করে ঐরূপ কলহের অভিনয় শুরু করে দিয়েছে। এই কলহের কারণ ও বিষয়বস্তু অবশ্য বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। মূল উদ্দেশ্য থাকে অবশ্য যে কোনও প্রকারে 'শিকার' বা 'ভিক্‌টিম'কে ঐ অভিনব জুয়ার কার্যকরণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত করে তাকে প্রলুব্ধ করে তুলা। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি কলকাতা হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারকের পুত্র। আমি নিজে একজন ব্যবসায়ী ও একটি ছোট-খাটো ফ্যাক্‌টরির মালিক। অমুক ব্যক্তি একদিন আমার অফিসে এসে আমাকে ৮০০০০৲ টাকার একজন ফাইনেন্‌সিয়ার যোগাড় করে দেবে বলে। এর পর একদিন ভদ্রলোক সস্ত্রীক আমার বাটীতে এসে বেড়িয়েও যান। কিন্তু তার পর দুই মাস আমি তাঁর আর কোনও খবরই পাই না। পরে একদিন তিনি পত্র দ্বারা আমাকে জানান যে, ইতিমধ্যে তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় আমার কোনও খোঁজ নিতে পারেন নি। এই সঙ্গে তিনি আমাকে এ'ও জানান যে, তাঁর মনিব অমুক রাস্তার অতো নম্বর বাটীতে এখন অবস্থান করছেন এবং তাঁর ঐ মনিব আমার ফার্মের একজন ফাইনেনসিয়ার হতে রাজি হয়েছেন। এইরূপ আরও দুই-তিনটি পত্র

বিনিময়ের পর আমি ভদ্রলোকের নির্দেশ মত তাঁর ঐ বাটীতে এসে উপস্থিত হই। ভদ্রলোক আদর-আপ্যায়ন করে আমাকে তাঁদের বৈঠকখানায় বসালে একজন মাড়োয়ারী এসে জানালো যে ঘোড়ার ব্যাপারে সে ঐ জমিদার বাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মাড়োয়ারী লোকটির বক্তব্য শুনে আমার ঐ বন্ধুবর খেঁকরে উঠে বললেন, 'কেয়া বাত্ বলতা আপ? যো বোলনে হোয় হামকো বলো। বাবুকো পাশ আপ নেহি যানে শেখথা।' এর পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোক হাত কচলাতে কচলাতে অনুযোগ করে বললে, 'হুজুর সাহেব খুদ হামকো বোলায়া। উস রোজ [ঘোড়দৌড়] রেস'মে উনসে মুলাকাত হুয়া থে।' ঠিক এই সময় জমিদারবাবু অর্ধ পানোন্মত্ত অবস্থায় টলতে টলতে ঐ ঘরে এসে একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে বসলেন। উনি এমন ভাব দেখালেন যেন ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে তিনি কোনও দিনই দেখেন নি। এর পর ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক তাঁকে ঐ সকল পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, 'আপ তো ঘোড়াকো বাস্তে বাহারমে বহুত লোকসান দিয়া। লেকেন আপকো হাম আভি নয়া ঘোড়াকে এক খেল দেখলায়গা।' 'কেয়া? কেয়া? কোন্হী ঘোড়াকে খেল', জমিদার সাহেব নির্লিপ্ত ভাবে উত্তর করলেন, 'ঘোড়া কাঁহা হ্যায়? তোমরা পকেটমে?' তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন, 'হাঁ, বিলকুল ঠিক বাত হুজুর! আপ ঠিক বাত বাতায়া হ্যায়। ঘোড়া হামরা পকেটমে মজুত হ্যায়।' এই বলে ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক পকেট থেকে প্রায় বিশটা গোল ঘুঁটি বার করে জমিদার সাহেবের সম্মুখের টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললে, 'আপ দেখিয়ে না। আভি কেউসেন ইনলোক জোর কদমমে দৌড়েয়া গা।' আমি কৌতুহলী হয়ে টেবিলের দিকে চক্ষু ন্যস্ত করা মাত্র ঐ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক খেলার কায়দায় মহড়া শুরু

করে দিলে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে 'বোকা' ঐ জমিদারও বাজি হারতে শুরু করে দিলে। এই দেখে আমার বন্ধুবর নিম্নস্বরে আমাকে বললে, 'এখন বুঝলেন তো ব্যাপার? আপনি দেখে রাখুন খেলাটা।' ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে তাগিদ আসায় জমিদার সাহেব অল্পক্ষণের জন্য অন্দর মহলে গেলে বন্ধুবর মাড়োয়ারীকে সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি বাপু, চালাকী রাখো। আমাকে ও আমার এই বন্ধুকে বখরা না দিলে বাবুসাবকে আর খেলতেই দেবো না।' মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলল, 'আচ্ছা! ঠিক হ্যায়। বখরা আপকো মিলেগা! চাহে তো ইস বাবুজী দো এক দান খেল দেনে শেখতা। খেলাকো কায়দা হাম আভি উনকো শিখলায়া দেয়েঙ্গা।"

উপরের বিবৃতিতে দেখা যায় যে 'শিকার'-এর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পর কোনও এক অজুহাতে দুইমাস সময় নেওয়া হয়েছে। এইভাবে কয়েকটি শিকারকে জিইয়ে রেখে ইতিমধ্যে যে সকল 'শিকার' তৈরি হয়ে গিয়েছে তাদের বধ করার পর এই সকল জিইয়ে রাখা শিকারদের উপর একে একে এরা হাত দেয়। ইহাতে সুবিধা এই যে, এতদ্দ্বারা শিকারগণ মনে করে যে তাদের ঐ নূতন বন্ধুর এতে বিশেষ কোনও স্বার্থ নেই। তা না হলে প্রথম কয়দিনের মধ্যে যা করবার তা না করে এত দেরি করেই বা উনি আসবেন কেন? এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে শিকারগণই তাদের আসতে দেরি হতে দেখে যেচে তার বাটী গিয়ে তাকে ঐ ধনী ব্যক্তির নিকট নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে। এই অবস্থায় প্রবঞ্চকগণ তাদের আরও বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য বহু গড়িমসি ও টালবাহনার পরে তবে তাদেরকে ঐ আড্ডায় প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছে।

বহুক্ষেত্রে শিকারদের নিকট পর্যাপ্ত অর্থ আছে কি'না তা পরখ করে

দেখে নেওয়া হয়ে থাকে। এই সময় খেলতে বসে জমিদার হঠাৎ অপমানিত মনে করে বলে উঠেন, 'কিই! আমি এই লোকটার সঙ্গে খেলব! ও দেখাক আগে কতো টাকা ওর আছে। এই আমি রাখলাম পাঁচ হাজার টাকার নোট। এবার রাখুক আগে ও ওর টাকাও এখানে। আমি কোনও ভিখিরীদের সঙ্গে খেলি না।' প্রায়শঃ ক্ষেত্রে নোটের সাইজে কাটা এক বাণ্ডিল কাগজের উপরে ও নিম্নে একখানা করে ১০০৲ টাকার নোট রেখে ঐ বাণ্ডিলটা বেঁধে রাখা হয়। শিকারমগ্ন ব্যক্তিগণ যদি অধিক অর্থ ঐ দিন জমির উপর না রাখতে পারে তা' হলে তাকে বিদেয় দিয়েদলেরই এক ব্যক্তির সহিত খেলার সূচনা করা হয় এবং ঐ শিকারমগ্ন ব্যক্তির সম্মুখেই রাজাবাহাদুর-গণ প্রতিদানেই হেরে যেতে থাকেন। এই সুযোগে দালালগণ ঐ সকল শিকারমগ্ন ব্যক্তিদের পরদিন প্রয়োজনীয় অর্থ সঙ্গে করে আনবার জন্য উপদেশ দিতে থাকেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে সুবিধামত এই সকল লোভী ব্যক্তিদিগকে তাদের শ্রীঅঙ্গের সোনার ঘড়ি, হীরার আংটি বা সোনার বোতামের বিনিময়ে এই খেলা খেলবার জন্য অকুস্থলেই দালালগণ কর্জ দিয়েছেন। কিন্তু আখেরে জুয়ায় হার হওয়ায় এই সকল দ্রব্য তাঁরা আর ফেরত পান নি। এই সকল রাজাবাহাদুর দামী সিল্কের পাঞ্জাবি ও বহু হীরার আংটি পরিহিত হয়ে আসরে অবতীর্ণ হলেও ওঁরাকিন্তু দলে প্রধান ব্যক্তি হন না। প্রায়শঃক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথমে খেলার সূচনা করে সে-ই হয় দলের একজন প্রধান ব্যক্তি।

এই সকল অপরাধীদেরই আমরা নওসেরা ঠগী বলে থাকি। বিচারের সময় এরা আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রায়ই বলে থাকে যে, ফরিয়াদীর সহিত তারা কেবলমাত্র জুয়া খেলেছিল। জুয়ায় হার

হওয়াতে ফরিয়াদী অর্থ হারিয়েছেন। তাদের কেহ তাকে প্রতারণা করে নি। এই জুয়া ঐ সকল ফরিয়াদী স্ব-ইচ্ছাতেই খেলেছে। অতএব আসামীরা প্রতারণার অপরাধে অপরাধী হতে পারে না। অপরদিকে ফরিয়াদীর পক্ষ হ'তে বলা যেতে পারে যে, আসামীরা কেবলমাত্র জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে ফরিয়াদীকে অকুস্থলে আনে নি। তারা তাকে প্রতারিত করার জন্যেই সেখানে ভুলিয়ে এনেছে। প্রতারণা অপরাধের কর্ম পদ্ধতির [Modus operandi] একটি অংশরূপে এই দ্যূত-ক্রীড়ার অবতারণা করা হয়। এই দ্যূতক্রীড়ার মধ্যে এমন অনেক ফাঁকি ছিল, যার জন্যে এই প্রকার জুয়াকে আদপে জুয়া বলা চলে না।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণা অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ: "যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা কি'না, ঐ প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য অপর আর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, (২) কিংবা কেহ যদি কাহারও উক্ত রূপ কার্য বা উক্তি দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলীভূক্ত হতে সম্মতি জানায়, (৩) কিংবা কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হয়ে এমন কোনও এক কার্য করে বসে বা উহা না করে, যে কার্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা তা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করতো না বা তা করতে বিরত থাকতো; প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা অপরাধ বলা হবে।"

এই বিশেষ ক্ষেত্রে উক্তরূপে প্রতারিত না হলে, প্রতারিত ব্যক্তি কখন দ্যূত-ক্রীড়ায় আসক্ত হতো না। প্রতারিত ব্যক্তিরা লোভে পড়ে

জুয়া খেলেছেন। এই ভয়ে ও লজ্জায় তাঁরা প্রায়ই থানায় আসেন না। এঁদের একটা মিথ্যা ধারণা জন্মে যে, সেখানে তাঁরাও জুয়া খেলেছেন, এই কথা থানায় প্রকাশ পেলে তাঁদেরও শাস্তি হবে। প্রবঞ্চক অপরাধীরাও প্রতারিত ব্যক্তিদের এইরূপ ভয় দেখিয়ে থাকে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা ভুল। মানুষের স্বভাবজাত অপস্পৃহার কৃত্রিম উপায়ে বহির্বিকাশ ঘটানোর জন্য ওরাই আসল অপরাধী। বাক্-প্রয়োগদ্বারা যে কোনও দুর্বলচিত্ত মানুষকে উক্তরূপে লোভী করে তোলা সম্ভব। নওসেরা পদ্ধতি মানুষের অন্তর্দেশে [দেহকোষে] অপস্পৃহার অবস্থিতি প্রমাণিত করে। [অপরাধ-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড দেখুন]। ভারতীয় পুলিশ নওসেরা পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক দিকটা বিবেচনা করে প্রতারিত ব্যক্তিদের প্রতি বরং সহানুভূতিশীল হন এবং ঐসকল প্রবঞ্চক-দের জন্যে যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করেন। এইরূপ ভাবে প্রতারিত হলে প্রতারিত ব্যক্তিদের যথা শীঘ্র থানায় খবর দেওয়া উচিত।

তিমি মৎস্য নয়। আসলে উহা একটি স্তন্যপায়ী জীব। অনুরূপ-ভাবে বিড্-গ্যাম্ব্লিঙ্ বা ঘুঁটিখেল্, জুয়া নামে অভিহিত হ'লেও আসলে উহা একটি প্রতারণা অপরাধ। এই খেলা যে কোনও এক সত্যকার জুয়া. নয়, আসলে উহা প্রতারণা মাত্র—এই বিশেষ সত্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত। বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝতে গেলে প্রথমে বুঝা উচিত প্রকৃত পক্ষে দ্যূত-ক্রীড়া বা জুয়া কাকে বলে? যে সকল খেলাতে হার-জিত, চান্স [chance] বা দৈবের উপর নির্ভর করে তাকেই বলা হয় জুয়া বা দ্যূত-ক্রীড়া। যে সকল খেলার হার বা জিত কোনও না কোনও পক্ষের নৈপুণ্যের [skill] উপর নির্ভর করে তাকে কেউ জুয়া খেলা বলে না। এই নৈপুণ্য দুই প্রকারের হয়; যথা, অঙ্গ-নৈপুণ্য এবং প্রতি-নৈপুণ্য। অঙ্গ-নৈপুণ্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ অর্জুনের

লক্ষ্যভেদের কথা বলা যেতে পারে। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মূলে ছিল এই অস্ত্রনৈপুণ্য, তাঁর ঐ বিষয়ে সাফল্যের জন্য দৈব দায়ী নয়। কোনও ব্যক্তির মস্তকোপরি ছোট একটি বল রেখে ৭০ গজ দূরে থেকে বলটিকে গুলি বিদ্ধ করা কিংবা ২০০ গজ দূরের একটি ফল তীর দ্বারা বিদ্ধ করা রূপ খেলার মধ্যেও থাকে এই অস্ত্র-নৈপুণ্য। এবংবিধ অস্ত্রনৈপুণ্য বা চাতুর্য দেখিয়ে যদি কেহ অর্থ লাভ করে তাহলে উহাকে জুয়া বলা হয় না। অস্ত্রনৈপুণ্যের বিষয়টি এখানে বুঝিয়ে বলা হ'ল। এবার প্রতি-নৈপুণ্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা যাক্। কোনও পক্ষ এমন চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থা পূর্ব হতেই অবলম্বন করে, যার জন্যে উক্ত তীর বা গুলি যথাস্থানে যথাসময়ে পৌছায় না। এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে উহাকে বলা হবে প্রতিনৈপুণ্য। বিড্-গ্যাম্বলিঙে প্রতারকেরা প্রতিনৈপুণ্যের সাহায্য নিয়ে থাকে। চাতুর্য সহকারে তারা তাস বা ঘুঁটি এমনভাবে সাজিয়ে রাখে বা সরিয়ে দেয়, যা'তে করে এ সকল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা সহজেই হেরে যায়। এ ছাড়া প্রতারকরা প্রতারণার উদ্দেশ্যেই মানুষকে তাদের আড্ডা-স্থলে ভুলিয়ে আনে। অর্থাৎ কি'না শুরু হ'তেই তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রতারণা।

এই সব খেলা সত্য সত্যই জুয়া বা প্রতারণা কিনা তা নির্ভর করে এই 'দৈব' শব্দটির [Chance] প্রকৃত সংজ্ঞার উপর। এই দৈব শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝতে হ'লে আরও দুইটি অনুরূপ শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝা দরকার। উহাদের যথাক্রমে দৈব-দুর্ঘটনা [Accident] এবং দৈব-সম্মিলন [বা chance coincidence] বলা হয়। নৈপুণ্যমূলক খেলার সাফল্যের মধ্যে যেমন থাকে চাতুর্য, তেমনি প্রতিটি দুর্ঘটনার মূলে থাকে ব্যক্তি-বিশেষের অবহেলা বা অসাবধানতা। অপরদিকে কোনও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমরা বিনা প্রচেষ্টায় হঠাৎ যদি পেয়ে যাই,

কিংবা যে লোকটিকে আমার অত্যন্ত প্রয়োজন, হঠাৎ যদি তাকেই আমরা রাস্তায় দেখতে পাই, তাহলে এইরূপ পাওয়া বস্তু বা ব্যক্তিকে আমরা বলে থাকি দৈব-সম্মিলন [chanced coincidence]। এই দৈব-দুর্ঘটনা বা দৈব সম্মিলনের সহিত আসল দৈব বা 'চান্স'-এর কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার মতে দ্যূত ক্রীড়া তথা জুয়া খেলার মূল ভিত্তি, এই দৈব বা 'চান্স'-এর সংজ্ঞা হওয়া উচিত এইরূপ: "যে খেলায় হার জিতের আশা এবং আশঙ্কা থাকে প্রায় সমান সমান বা ৫০%, ৫০%, তাকে বলা যেতে পারে জুয়া খেলা।" আমার মতে হারার আশঙ্কা শতকরা ১০ ভাগের বেশি থাকলে বুঝতে হবে যে এই খেলার মধ্যে কারসাজি আছে। একটি পয়সা যদি বার দশেক "টস্" করা যায় তা হলে কতবার "হেড্" এবং কতবার "টেল্" পড়বে তা বুঝা যায় না। কিন্তু কেহ যদি এই পয়সাটিকে দুই লক্ষ সাতায় হাজার বার "টস্" করেন তা হলে দেখা যাবে, "হেড্" এবং টেলের সংখ্যা হয়েছে প্রায় সমান সমান। এই দৈব বা 'চান্স'-এর প্রকৃত দর্শন বা ফিলসফি হওয়া উচিত এইরূপ। যে সকল খেলায় এই দৈব বা চান্স উপরিউক্ত সংজ্ঞানুযায়ী হয় না, সেই সকল খেলাকে জুয়া না বলে প্রতারণাই বলা উচিত। রেস বা ঘোডদৌড়ের কোন্ ঘোড়াটি প্রথম হবে তা সাধারণতঃ নির্ভর করে দৈব বা চান্স-এর উপর। কারণ, অশ্ব পশু হওয়ায় পশু-জীবের মতিগতির উপর কারো হাত নেই। কিন্তু কোনও "জকি" শেষ সময়ে রাশ টেনে ধরে অশ্বটিকে প্রথম হতে না দিলে উহাকে প্রতারণা বলা হবে। এই সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বলা যাক্।

"কোনও এক শহরের রেইস্‌কোর্সে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। যে ঘোড়াটিকে সকলেই "গুড ফর নাথিং" বলে জানতো সেই ঘোড়াটিই সেইদিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই ঘটনার ফলে বহু লোকের

বহু লক্ষ টাকা ক্ষতি হয় এবং দৌড় ক্লাবের মালিকদের ক্ষতি হয় অসামান্য। তদন্ত দ্বারা পরে জানা যায় যে, ঘোড়াটিকে দৌড়ানর অব্যবহিত পূর্বে মাদক দ্রব্য সেবন করানো হয়েছিল এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অশ্বটি হঠাৎ অত্যন্ত রূপ তেজী হয়ে উঠে। অশ্বটির মূত্র পরীক্ষার দ্বারা এই সত্য প্রমাণিত হয়। জনসাধারণকে এইরূপ ভাবে প্রতারিত করার জন্য স্টুয়ার্টগণ অশ্বের মালিকের শাস্তি-বিধান করেন।"

উপরি উক্ত বিতণ্ডা [Argument] দ্বারা আমরা সহজেই প্রমাণ করতে পারি যে, এইরূপ ঘুঁটিখেলা বা বিড্ গ্যাম্বলিঙ্ আসলে জুয়া নয়। উহা রাষ্ট্রের আইন মতে এক প্রকার প্রতারণা মাত্র। এইরূপ প্রতারণার জন্যে নওসেরা অপরাধীদের দণ্ড হওয়া উচিত। এইরূপ প্রবঞ্চনা অপরাধ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী অবশ্য দণ্ডনীয়।

এই সকল অপরাধীদের সাজা দেওয়ার অপর আর এক অসুবিধা আছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে এমন কতকগুলি অপরাধ সম্পর্কিত ধারা আছে, ঐ সকল ধারানুযায়ী মামলা হলে ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে আসামীর বিরুদ্ধে তাদের নালিশ প্রত্যাহার করতে পারে। ইংরাজিতে এইগুলিকে বলা হয় "কমপাউণ্ডেবল কেস"। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে প্রতারণা একটি কম্পাউণ্ডেবল কেস। এই কারণে ধরা পড়ে চালান হবার পর দুর্বৃত্তেরা ফরিয়াদীকে তার অপহৃত অর্থ ফেরত দিয়ে তার সঙ্গে মামলাটি মিটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষা করে।*

---

* কখনও কখনও নিম্ন আদালতে সাজা হওয়ার পর এরা হাইকোর্টে আপীল দায়ের করেছে এবং ঐ উচ্চ আদালতে শুনানীর সময় মামলাটি তারা ফরিয়াদীর সহিত মিটিয়ে নিয়েছে।

কখনও কখনও এরা ফরিয়াদীকে টাকা খাইয়ে তাকে পুলিশের নাগালের বাইরেও সরিয়ে দেয়। আমার মতে ফরিয়াদীর এই দ্বিতীয়বারের অপরাধ সত্যকার অপরাধ এবং উহা ক্ষমারও অযোগ্য।

এইবার মানুষের এইরূপ হাস্যকর ভাবে ঠকার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। কথিত আছে—লোভ এবং ক্রোধ, এই দুই রিপু মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। এই অবস্থায় তারা কোনও কিছু দেখেও দেখে না, কিংবা কোনও কিছু বুঝেও বুঝে না। এই সময় তারা কোনও বিষয় শুনেও শুনে না। এই অবস্থায় শিশুর বোধগম্য সত্যটিও সে উপলব্ধি করতে অপারক হয়। এই কথাটি অতীব সত্য। এর কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে: প্রত্যেক মানুষের মধেই নির্বুদ্ধিতা এবং চতুরতার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। এই লোভ মানুষের চতুর মনটিকে বিচ্ছিন্ন করে [split up] এমন ভাবে প্রদমিত রাখে যে উহা কিছুক্ষণের জন্য আর তাহার মধ্যে কার্যকরী থাকে না। কোনও সঙ্গত উত্তেজনা বা তীব্র অভাবের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা বাক্‌প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মনের দুর্বল বা নির্বোধ অংশটিকে ভুল বুঝিয়ে তার দ্বারা নানারূপ কার্য করিয়ে নেয়; উপরি উক্ত রূপ অসাধারণ-প্রবঞ্চনা এই মতবাদের একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিষয় বুদ্ধির সাময়িক অবলুপ্তি এবং প্রতিরোধশক্তি অপসরণের কারণে উহা ঘটে। এই কারণে অনভ্যস্ত ব্যক্তিদের পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাব সকল কোনও এক নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা সকল সময়েই যাচাই করে নেওয়া উচিত। লোভ, আশা এবং উত্তেজনা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী বক্তিদের কিরূপ পরিমাণে বুদ্ধিহীন করতে পারে তা এইভাবে প্রতারিত কোন স্কুল মাস্টারের নিম্নোক্তরূপ বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

"আমি পূর্বেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে বরং লজ্জিতই হয়ে উঠি। আমার মত একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে এভাবে ঠকানোর বিষয় ভেবে আমি অবাক হই। আমি নিজেও অনেককে বহুবার নানা ভাবে ঠকিয়েছি। তবু ঠকামীর পন্থাগুলি সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবগত থাকা সত্ত্বেও আমি ঠকলাম। তার কারণ লোভ আমার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি সাময়িক ভাবে অপহরণ করেছিল; তা না হ'লে অত বড় একজন মহাজনের সন্ধানে আমি ঐ সামান্য খোলার বাড়িতে যেতাম না। তারা যখন বলল যে মহাজনটি কোনও এক বিশেষ কারণে এই সময়টায় ঐখানে এসে থাকেন, তখন তাদের এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা আমি অবলীলাক্রমেই বিশ্বাস করি। মহাজনের সাজানো ভৃত্যটি যখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠে জানাল, 'দয়াময়! আপনি আমার মনিবকে বাঁচান। তা না হ'লে ওরা ওঁকে মেরেই ফেলবে।' তার সেই কান্নাকে আমি মায়াকান্না বলে আদপেই বুঝি নি। সাজানো জুয়ায় সর্বস্বান্ত হওয়ার পরই কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে আসে। আমি আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় প্রায় মাইল পাঁচেক উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে হেঁটে চলি। প্রায় সাত-আট দিন এই লজ্জাজনক কথা কাউকে জানাইও না। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের জানালে হয়ত সেইদিনই আসামীরা ধরা প'ড়ত এবং আমার অপহৃত অর্থও হয়ত আমি পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করতে সক্ষম হতাম।"

নওসেরা—অন্যান্য

এই বিড্ গ্যাম্বলিঙ-এর অভিনয় ব্যতীত অন্যান্য রূপ অভিনয়ের দ্বারাও নওসেরা দুর্বৃত্তরা দুর্বলচিত্ত মানুষদের ঠকিয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। অপরাধটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল।

"আমি এই শহরে একজন নূতন ব্যবসাদার। আমার ঔষধপত্রের কারবার আছে। দুষ্প্রাপ্য বিধায় আমার দোকানে কিছু কুইনাইনের ঘাটতি পড়ে। ফলে প্রয়োজনীয় কুইনাইন আমি কালোবাজার [Black-market] হতে সংগ্রহ করতে মনস্থ করি। অচিরে একজন দালালেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান কালে পারমিট্ বা ছাড়পত্র ব্যতীত কুইনাইন্ ক্রয় বা বিক্রয় নিষিদ্ধ। দালালটি আমাকে গোপনে এই কুইনাইন ক্রয় করবার জন্যে পরামর্শ দেন। এই জন্য একজন বড় ভাটিয়া ব্যবসাদারের কাছে তিনিই আমাকে নিয়ে যান। ভাটিয়া ব্যবসাদার ভদ্রলোকটির কাছে আমি এও শুনি যে সরকারী ট্রেজারি হতে কুইনাইনের টিনগুলি কোনও এক ব্যক্তি চুরি করে তাঁর কাছে বিক্রয় করে দেবার জন্যে রেখে গেছে। এই সময় কুইনাইনের আমার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। এতে আমার লোভ বেড়ে যায়। চোরাই জেনেও সস্তা দরে আমি উহা কিনতে রাজি হই। ভাটিয়া মহাজনটি কিন্তু কিছুতেই স্ববাটীতে মাল আনতে রাজি হন না। তিনি আমাকে শহরের একটি নিরালা উদ্যানে দুপুর বেলায় মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা সমেত হাজির থাকতে অনুরোধ জানান। যথা সময়ে নির্ধারিত স্থানে এসে আমি হাজির হই। ঔষধের মূল্য বাবদ চারি হাজার টাকা ব্যাপারীটির হাতে হিসেব মত তুলে দিয়ে মার্কামারা কুইনাইনের টিনগুলো গুনে নিচ্ছিলাম। নিরালা দুপুর। সেই সময় সেইখানে জনপ্রাণীরও আসবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই সেখানে মোটা মোটা জন চার সি. আই. ডি. পুলিশের আবির্ভাব হল।* পুলিশরূপে তাদের বুঝতে পারা মাত্র দালাল ও সেই ব্যাপারীটি উভয়ে

---

* কোনও অপরাধ-পদ্ধতিতে পুলিশের অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকলে, উহাকে বলা হয় "ধড়িসি" পদ্ধতি। বহু ক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত কোনও অসাধু পুলিশও এদেরকে সহায়তা করে।

টাকা নিয়ে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। পালাবার সময় দালালটি অস্ফুট স্বরে আমাকে সাবধান করে বলে গেলো, 'মশাই পালান। শীঘ্র পালান। গোয়েন্দা পুলিশ এসেছে। ঐ।' তাদের পিছু পিছু আমিও সরে পড়ছিলাম, কিন্তু পুলিশ ক'য়জন দৌড়ে এসে আমাকে ধরে ফেলল, তাদের নেতা ছিল একজন ছদ্মবেশী জমাদার। গোঁফ মুচড়ে আমার মাথায় একটা চাঁটি কসিয়ে তিনি আমাকে বললেন, 'শালা! তুম্ বাতায়ে জলদি, কোউন লোগ ভাগা আভী।' এর পর জমাদার সাহেব কুইনাইনের টিন কয়টি আমার নিকট হ'তে কেড়ে নিয়ে সঙ্গের লোকদের হুকুম জানাল, 'লে চলো শালেকো থানামে।' চোরাই মাল ক্রয়ের শেষ পরিণতি যে জেল তা আমার জানা ছিল। আমি নাচার হয়ে কুইনাইনের টিনগুলো এবং সেই সঙ্গে আমার শেষ কপর্দকটিও তাদের উৎকোচ দিয়ে আমি মুক্তি ক্রয় করি। তিন দিন তিন রাত পরে আমি জানতে পারি যে এই লেনদেনটি আসলে ছিল একটি অভিনয় মাত্র। এমন কি পুলিশ কয়জনও আসল পুলিশ নয়। উহারা সকলে নকল পুলিশ মাত্র। দালাল, ব্যাপারী, পুলিশ—সকলেই একই ঠগী দলের দলী। ভয়ে ও লজ্জায় বিষয়টি আমি চেপেই গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে কোনও এক বন্ধুর পরামর্শে আমি থানায় এজাহার দিই। তদন্তের পর পুলিশ অপরাধী কয়টিকে ধরে আনলে আমি তাদের সনাক্তও করি।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অপরাধ-পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু অদল-বদলও দেখা যায়। অর্থাৎ কি'না জাল পুলিশের বদলে প্রথমে এসে হাজির হয় সাজানো গুণ্ডার দল—জন পাঁচ-ছয় ষণ্ডামার্কা লোক হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে উভয় পক্ষকেই মারধর করে এবং অর্থাদি তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে থাকে। এর কিছু পরেই আবির্ভূত

হয় জাল [নকল] পুলিশের দল। এই নকল পুলিশের আবির্ভাবে সাজানো গুণ্ডারা পলায়ন করে এবং পলায়নে অপারক হয়ে প্রতারিত ব্যক্তি যথারীতি ধরা প'ড়ে উৎকোচ দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

উপরের ঘটনাটি অসাধারণ প্রতারণার একটি বিশেষ উদাহরণ। আমি এমন অনেক ব্যক্তির কথাও শুনেছি যে গোপনে নিষিদ্ধ কুইনাইন কিনে দেখেছেন টিনগুলিতে কুইনাইনের বদলে ময়দা ভরা রয়েছে। এইভাবে প্রতারিত হওয়া সত্ত্বেও এ কথা তাঁরা পুলিশকে জানান নি। কারণ তাঁদের ধারণা, নিষিদ্ধ পণ্য বে-আইনি ভাবে সংগ্রহ করতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছেন, এ কথা স্বীকার করলে পুলিশের কবলে পড়ে তাঁদেরও হয়ত সাজা পেতে হবে। কিন্তু তাঁদের এইরূপ ধারণা ভুল। নওসেরা দুর্বৃত্তদের প্রত্যেকটি অপরাধ-পদ্ধতি সম্বন্ধেই পুলিশ অবগত আছে। কি রূপে মানুষের অন্তর্নিহিত অপরাধ-স্পৃহা জাগ্রত করে নওসেরা দুর্বৃত্তরা মানুষকে লোভী করে তুলে তাদের ঠকিয়ে থাকে, তা পুলিশ ভাল ভাবেই জানে। এই সব অপরাধ সম্বন্ধে প্রতারিত ব্যক্তিরা থানায় যথাসত্বর এজাহার দিলে তাঁরা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণের উপকারই করবেন—এই ক্ষেত্রে সত্য কথা বললে তাঁদের কোনওরূপ বিপদেরই সম্ভাবনা নেই।

সাধারণতঃ নওসেরা অপরাধীরা অপকর্মের সময় কোনওরূপ বল প্রকাশ করে না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগেরও কথা শুনা গিয়েছে। প্রতারণার জন্য অকুস্থলে নীত ব্যক্তিদের কেহ কেহ দুর্বৃত্তদের এই অভিনয় [মধ্যপথে] ধরে ফেলে স্থান ত্যাগ করতে চায়। সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে তাদের অক্ষত দেহে যেতে দেওয়াই হয়। কিন্তু এইরূপও শোনা গিয়েছে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অবস্থায় তাদের অর্থাদি বলপ্রয়োগ দ্বারা অপহরণ করা হয়েছে। এইরূপ

অপরাধকে রাহাজানি [Robbery] অপরাধ বলা হবে। উহাকে কখনও প্রতারণা অপরাধ বলা হবে না। সাধারণতঃ ঠগী দলের অপরাধীরা নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে। এই কারণে অপরাধের এইরূপ দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। বলপ্রয়োগের কথা শোনা গেলে বুঝতে হবে আসলে অপরাধীরা নওসেরা দলের নয়, কিংবা ঐ দলে এমন কাউকে কাউকে [নবাগত] নেওয়া হয়েছে, যাদের নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী মনে হলেও আসলে তারা সবল শোণিতাত্মক অপরাধী।

টপকা ঠগী

টপকা ঠগী বা টপকাওয়ালারা অসাধারণ প্রবঞ্চকদের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। প্রায়শঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানীরাই এক বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। টপকা ঠগীদের দলগুলি সাধারণতঃ চার কিংবা পাঁচজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। এরা পালিশ করা সোনার বাট বা বালার আকারের পিতলের টুকরাকে সোনার দ্রব্য বলে চালিয়ে লোভী লোকেদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ এরা মজুরদের হপ্তার দিনে তাদের যাতায়াতের পথে কিংবা পল্লী অঞ্চল হ'তে আগত যাত্রীদের অপেক্ষায় রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে ওৎ পেতে বসে থাকে। শহুরে লোকেরা এদের টপকা ঠগী বলে থাকে। পল্লীগ্রামের লোকেরা এদের বলে থাকে বালা খেলার দল।

চম্পারণ এবং নেপালের মুনিয়া, মজঃফরপুরের সোনার, দুসাদ্ ও মুণ্ডা মুসলমান প্রভৃতি স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির লোকেরা পল্লী অঞ্চলে এই খেলার সাহায্যে লোক ঠকিয়ে থাকে। এরা পিতলের বালাকে

সোনার বালা বলে চালিয়ে লোক ঠকায় ; এই কারণে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিকে কেউ কেউ 'বালা খেল' বা 'বালাট্রিক্'ও বলে। প্রদেশের রেলওয়ে স্টেশন সকল ও রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টগুলিই এদের প্রধান কার্যক্ষেত্র। শহরে টপকা ঠগীরা বালার পরিবর্তে বার বা বাট্ ব্যবহার করে। বিড্ গ্যাম্বলিঙ-এর ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব অভিনয়। এই প্রবঞ্চকদের মধ্যে কেহ সাজে পথচারী, কেহ সাজে স্যাকরা, কেহ সাজে ভিখারী, কেহ বা সাজে পুলিশের সিপাহী। কিরূপ পদ্ধতি দ্বারা টপকা ঠগীরা বড় বড় শহরের পথচারীদের ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠাকুরমার অনুরোধে আমি পঞ্চাশ টাকা ছোটকাকাকে মনিঅর্ডার করবার জন্যে পোস্ট আফিস যাচ্ছিলাম। রৌদ্রের প্রখর তাপে ফুটপাথগুলো তেতে উঠেছে। আমি ঐ দিন অতি কষ্টে পথ চলছিলাম। হঠাৎ একজন আধাবয়সী গেঁইয়া গোছের লোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'মশাই আপনি কইতে পারেন? সোনাপট্টি কোন দিকে যাতি পারবো?' ভদ্রলোককে কোলকাতায় নবাগত বলে মনে হলো; তাই একটু সহানুভূতির স্বরে আমি তাঁর এই প্রশ্নের উত্তর দিলাম, 'কোলকাতায় আপনি নূতন বুঝি? তা ওটা বেশি দূর নয়। এই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যান।' ঠিক এই সময়েই পাশের গলিটা থেকে একদল লোক সেখানে এসে ভিড করে দাঁড়ালো। তাদের কথাবার্তা হতে বুঝা যায় যে তারা কাল্লুভকত নামে একখানা হিন্দী ছবি দেখতে চলেছে। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি ভিড় ঠেলে অদৃশ্য হবামাত্র সেখানে ঠং করে একটা আওয়াজ হলো। শব্দটি লক্ষ্য করে চোখ নামাতেই আমি দেখতে পেলাম নীল কাগজে মোড়া একটি সোনার বাট রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বেশ বোঝা গেল যে, সোনাটা ওই ভদ্রলোকের

পকেট থেকেই পড়েছে। এই সময় একজন সরল-মনা পথচারী যুবক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন ভিখারী গোছের লোক সোনার বাটটা কুড়িয়ে নিয়ে ওই যুবককে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ মশাই এটা কি সোনা?' এই টপকা ঠগী দলের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আমি শুনেছিলাম। তাই কৌতূহলবশতঃ কাউকে কিছু না বলে ব্যাপারটা আমি পরিলক্ষ্য করতে থাকি। ইতিমধ্যে সোনাপট্টিগামী গেঁইয়া লোকটি সেখানে ফিরে এলেন। গেঁইয়া লোকটিকে ফিরে আসতে দেখে সেই ভিখারী লোকটি বিনা বাক্যব্যয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। গেঁইয়া ভদ্রলোকটি সেই পথচারী সরল-মনা যুবককে শুনিয়ে শুনিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশাইদের কি কেউ এখানে একটা সোনার বাট কুড়িয়ে পেয়েছেন? পাঁচ হাজার টাকা দাম মশাই। হায়! আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এইখানটায় বোধ হয় ওটা পড়েছে। হায় হায় হায়!' এর পর প্রায় পাগলের মত হয়ে ভদ্রলোকটি স্থান পরিত্যাগ করলেন। সেই ভিখারী লোকটি এইবার পুনরায় সেইখানে হাজির হয়ে সোনাটা পরীক্ষা করছিল। এমন সময় ভিড়ের ভিতর থেকে আর একটা লোক বেরিয়ে এসে বলে উঠল, 'মাইরি মাইরি। এ তো সোনা—সোনা।' 'দেখি দেখি দেখি—' ইতিমধ্যে অপর আর একজন গুণ্ডাগোছের লোক এগিয়ে এসে বলে উঠল, 'এই! খবরদার বলছি! ঐ ভদ্রলোকের পকেট থেকে ওটা পড়েছে। আমি নিজে ওটা পড়তে দেখেছি। ডেকে আন্ লোকটাকে, না হয় থানায় জমা দে।' ঘাবড়ে গিয়ে তাদের সকলেই সোনাপট্টিগামী ভদ্রলোকটিকে অনেক খোঁজাখুঁজি করল। কিন্তু তাঁর কোনও সন্ধানই আর পাওয়া গেলো না। এর পরে সকলেই সোনাটা থানায় জমা দেবার জন্যে প্রস্তাব করলে। কিন্তু

যে লোকটি সোনাটা পেয়েছে সে কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে একটা উল্টো প্রস্তাব আনল। মাথা ও হাত নেড়ে সে বলে উঠল, 'আরে রেখে দেন মশাই, পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা। পুলিশের পেটে না দিয়ে আসুন এটা আমরা নিজেরাই ভাগ করে নিই। ক'টা টাকা পেলে যে আমরা এক্ষুণি মেট্রোয় যাব, কাল্লু ভকতের নটী চামেলীবিবির বাড়িতেও যেতে পারবো। কি মশায় আপনারা রাজি আছেন তো?' অত দামী একটা সোনার বাট অত সস্তায় কিনতে কে না রাজি হয়? সকলেই ঝুঁকে প'ড়ে সোনাটা বারে বারে পরীক্ষা করতে শুরু করল। এদের মধ্যে একজন লোভী-মনা-লোক বলে উঠল, 'দেন মশায়, দেন, আমিই নেব। কিন্তু আমার কাছে আছে মাইরি এই কুল্লে পঞ্চাশ টাকা।' কিন্তু সেই ভিখারী লোকটা কিছুতেই আশি টাকার কমে সেটি ছাড়তে রাজি হয় না। পথচারী সেই সরল-মনা যুবকটি এতক্ষণ অবাক হয়ে বিষয়টি পরিলক্ষ্য করছিল। এদের মধ্যে একজন এইবার সেই যুবকটির কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'আমার হাতের এই সোনার ঘড়িটা বন্ধক রেখে আমাকে ত্রিশটা টাকা ধার দিতে পারেন? কালই আমি টাকাটা আপনার বাটীর ঠিকানায় দিয়ে আসব।' এই লোকটাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে সামনের আর একজন লোক বললে, 'শুনবেন না মশাই, ওর ঐ আজে-বাজে কথা। আমি দিচ্ছি পঞ্চাশ টাকা আর আপনি দিন পঞ্চাশ। আসুন আমরা দু'জনে মিলে সোনাটা কিনে নিই। সোনাটা অবশ্য আপনিই রেখে দিন। আমি বিক্রি করতে গেলেই তো পুলিশে আমায় পাকড়াও করে বলবে, আরে শালা বিড়িওয়ালা! তোর বাবা তোর জন্যে সোনা রেখে গেছে, না? আপনারা মশাই তো ভদ্দরলোক আছেন। আপনারা ঠিক বিক্রি করে নেবেন। নিন্-নিন্ মশাই, সোনাটা কিনে নিন্।' পথচারী সেই সরল-মনা যুবকটি এরপর আর

লোভ সামলাতে পারল না। প্রায় একশত টাকা সঙ্গে নিয়ে সে'ও কাউকে মনিঅর্ডার করবার জন্যে পোস্ট অফিসে চলছিল। মনে মনে সে ভেবেছিলো যে সোনাটি এক্ষুণি সোনাপট্টিতে বিক্রয় করে হাজার দুই টাকা সে লাভ করতে পারবে এবং তারপর তা থেকে একশ' টাকা বার করে নিয়ে মনিঅর্ডারটা না হয় সে পরের দিনেই করে দেবে। ইতিমধ্যে রাস্তার ওপারের ফুটপাতের উপর জন দুই-তিন হিন্দুস্থানী এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সকলের হাতে ছোট ছোট বেঁটে লাঠি। সেই লোকগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে একজন বলে উঠল, 'এই গোয়েন্দা পুলিশ এসে গেছে। এটা নেবেন তো তাড়াতাড়ি নিয়ে নিন্।' লোভে পড়ে যুবকটি তাড়াতাড়ি একশত টাকা পকেট থেকে বার করে সোনাটা কিনে নিচ্ছিল আর কি। এমন সময় আমি এগিয়ে এসে ছোকরাটিকে নিরস্ত করে বললাম, 'আরে! এ তুমি কি করছ খোকা? ওর ঐ বাট কখনো সোনা নয়। ওটা একটা চক্চকে পেতল। এরা সব টপকা ঠগীর দল; এমনি করে লোক ঠকায়।' এরপর ঠগীগুলোকে আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'চালাকি পেয়েছ সব, না?' আমার কথা শুনে যুবকটি ভড়কে গিয়ে সরে দাঁড়াবা মাত্র অপর আর একজন ভদ্রবেশী পথচারী এগিয়ে এসে সোনাটা আশি টাকায় কিনে নিয়ে বলে উঠলেন, 'না মশাই! এ সোনাই। সিলেটে আমাদের দোকান ছিল যে।' এর কিছু পরেই ঠগীর দল সোনা বলে পিতলটি ভদ্রলোককে গছিয়ে দিয়ে একে একে সেখান থেকে সরে পড়ল। ঠগীর দল চলে যাবার পর ভদ্রলোকটি ফুটের সানের উপর সোনার বাটটি একটু ঘষে নিলেন। এতক্ষণে বেশ বোঝা গেল যে বাটটা পিতলের, সোনার নয়। একটু-আধটু পরীক্ষার পর উনি বুঝলেন যে ওটা একটা পিতলের বাট। ভদ্রলোকটি একেবারে অস্থির হয়ে কেঁদে ফেলে আমাকে বললেন, 'কেন

আপনার কথা শুনলাম না, মশাই! আমাকে আপনি এবার বাঁচান একটু। সামনের ঐ গলিটার মধ্যে ওরা একটু আগে ঢুকেছে। আসুন একটু খুঁজে দেখি।' ভদ্রলোকের এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তার উপর আমার দয়া এসেছিল। তাঁর সেই কান্নাকাটি আমাকে অভিভূত করে দিল। দয়াপরবশ হয়ে ভদ্রলোকটিকে নিয়ে আমি কলাবাগান বস্তির একটা নির্জন গলির মধ্যে দুর্বৃত্তদের সন্ধানে ঢুকে পড়লাম। এই নির্জন গলিটার ভিতর এসে ভদ্রলোকটির চেহারাটা হঠাৎ যেন বদলে গেল। পকেট থেকে চক্‌চকে ধারাল ছোরা বার ক'রে সেটা আমার মাথার উপর উঠিয়ে ভদ্রলোক হেঁকে উঠলেন, 'এবে শালা জান বাঁচাও। ভাগাও হামাদেব শিকার!' দেখতে দেখতে সেখানে আরও সাত-আটজন গুণ্ডা এসে হাজির হল। তাদের কারুর হাতে ছিল লোহার ডাণ্ডা, কারুর হাতে লাঠি, কারোর হাতে ধারালো চক্‌চকে ছুরি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি একে একে আমার হাতের আঙটি, মানিব্যাগ, সোনার ঘড়ি, ফাউণ্টেনপেন, এমন কি পেনসিলটা পর্যন্ত তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হই। এইরূপে তাদের ব্যবসা মাটি করে দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্বস্বান্ত হয়ে আমি অবসাদে ক্লান্ত দেহে থানায় এসে এজাহার দিই। মনে মনে আমার একটা দম্ভ ছিল যে আমি চালাক এবং বড় সাবধানী। কিন্তু সেই দম্ভ আজ আর আমার একটুকুও নেই। এই গুণ্ডার দল আমার সেই দম্ভ ভেঙে দিয়েছে।"

এই টপকা ঠগীরা অপরাপর ঠগীদের ন্যায় নির্বল অযৌনজ সাম্পত্তিক অপরাধী হয়ে থাকে। পারতপক্ষে তারা কারুর উপর বলপ্রকাশ করে না। নির্বল সাম্পত্তিক প্রবঞ্চনার দ্বারাই এরা মানুষের অর্থ অপহরণ করে থাকে। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে এই দলের

কাউকে কাউকে আমরা বলপ্রকাশ করতেও দেখি। এর কারণ স্বরূপ শহরে অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলের কথা বলা যেতে পারে। সবল এবং নির্বল—এই উভয়বিধ ব্যক্তিদেরই নিয়ে এই দল গঠিত হয়। তবে এইরূপ মিশ্র দল এখনও পর্যন্ত কদাচিৎ দেখা যায়; সাধারণতঃ এই টপকা ঠগীরা নির্বল অপরাধীই হয়ে থাকে। এরা অপকর্মের সময় কখনও কাউকে আঘাত হানে নি। সক্রিয় অপরাধীদের সহিত তাদের প্রায়ই কোনও রূপ সম্পর্ক থাকে না। এই মিশ্র দল সম্বন্ধে আমি অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। বুঝবার সুবিধার জন্যে উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। [অপরাধ-বিজ্ঞান প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।]

"সাধারণ ভাবে আমরা দেখে এসেছি যে পকেটমার, ছিঁচকে চোর, ঠগী প্রভৃতি অপরাধীরা ধৃত হওয়ার কালীন কাহাকেও কখনও আঘাত হানে নি। কারণ উহারা নির্বল সাম্পত্তিক অপরাধী, শোণিতপাতে স্বভাবতঃই তারা অনভ্যস্ত। কিন্তু অধুনাকালে কোনও কোনও ক্ষেত্রে পকেটমারদের আত্মরক্ষার্থে ছুরিকাঘাতেব কথা শুনা গিয়েছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ বলা যেতে পারে। আসলে এই সকল অপরাধী থাকে শোণিত-সাম্পত্তিক অপরাধী। জনবহুল শহরে সুবিধার জন্যে এরা পিক-পকেটদের কার্য পদ্ধতির অনুসরণ করে—কিন্তু অনভ্যাসের কারণে তারা ধরা পড়ে, এবং ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এদের আসল স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এরা তখন আত্মরক্ষার্থে ছুরি ব্যবহার করে। আসলে ইহারা পিক-পকেট করে না, ইহারা করে সবল রাহাজানি [Robbery] এবং উহা তারা করে পকেটমারার অছিলায়। উহা তাদের অপপদ্ধতির পূর্বাংশরূপে প্রকাশ পায় মাত্র।

আজকালকার পিক-পকেটরা সেফটি-রেজার ব্লেড্ ব্যবহার করে।

ইহারা কথনও ছুরি ব্যবহার করে না, এমন কি ইহারা ছুরি সঙ্গেও রাখে না। ইহা ছাড়া বড বড শহরে চণ্ডুখানা, জুয়ার আড্ডা প্রভৃতি স্থান অপরাধীদের ক্লাবঘর বা আড্ডাখানার কাজ করে। এই সব আড্ডায় এবং বেশ্যাগৃহে নির্বল অপরাধীদের সহিত সবল অপরাধীদের মেলা-মেশার স্থযোগ ঘটে। একটি বোমারু বা বোমাবর্ষী বিমানকে যেমন বহু পাহারাদার বা ফাইটার প্লেন ঘিরে নিয়ে চলে, তেমনি বন্ধুত্ব বশতঃ একজন নির্বল পিক্-পকেটকে তার দল হতে ভাংগিয়ে নিযে একজন সবল অপরাধীর অপকর্মে বহির্গত হওয়াও অসম্ভব নয়। এইরূপ ক্ষেত্রে কথিত সবল অপরাধীটি তাদের পাহারাদারের কাজ করে। এই স্থলে নির্বল অপরাধীটি ধরা পডলে সবল অপরাধীটির পক্ষে বন্ধুর উদ্ধারের জন্যে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এইরূপ ঘটনা এখনও পর্যন্ত বিরল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।"

টপকা ঠগী প্রভৃতি নির্বল প্রবঞ্চকদের পক্ষেও তাদের সবল অপরাধী বন্ধুদের নিয়ে ঘুরাফিরা করা অসম্ভব নয়। এই সব ঠগীরা প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থ অপহরণে অসমর্থ হলে এদের এই সকল বন্ধুরা নিবাক দর্শকের ন্যায় আর নির্বল থাকতে পাবে না। এরা তখন ধৈর্যহারা হয়ে পথচারী ব্যক্তিটির উপর বল প্রকাশে উদ্যত হয়। এই কারণে কখনও কখনও সোনা ক্রয়ে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি এদের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনীও শুনা গিয়েছে। আমাদের মতে শহরের অপরাধীদের মধ্যে দৃষ্ট মিশ্র দলই অপরাধীদের এইরূপ ব্যবহারের একমাত্র কারণ।

নোট ডব্‌লিঙ

নোট ডব্‌লিঙকে কেহ কেহ দোনাখেল পদ্ধতিও বলে থাকে। পূর্বোক্ত অসাধারণ প্রবঞ্চনার ইহা অন্যতম উদাহরণ। এই ঠগীরা

সরলচিত্ত লোকদের বুঝায় যে তারা যে কোনও একটি কারেন্সি নোটের ন্যায় হুবহু অপর একটি অনুরূপ নোট রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে তৈরি করতে সক্ষম। সরল প্রকৃতির ব্যক্তিটি দুর্বৃত্তদের এই মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস ক'রে তার হাতে একখানি হাজার টাকার নোট তুলে দেয়। তাদের আশা যে ঐরূপ দুইটি নোট্ তারা ফেরত পাবে। কিন্তু একখানিও তারা আর ফেরত পায় না। কতকগুলি ফটোগ্রাফিক কেমিক্যাল এবং সেন্‌সিটিভ পেপারের সাহায্যে দুর্বৃত্তরা সরল প্রকৃতির মানুষদের বুঝায় যে সত্য সত্যই একটি নোটকে দুইখানি করা সম্ভব। কিরূপ পদ্ধতিতে তারা মানুষকে তার অর্থাদি দ্বিগুণ করে দেবার লোভ দেখিয়ে ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"ঠগী লোকটির কথা প্রথমে আমি বিশ্বাস করি নি। আমি প্রথমে তার এইরূপ ক্ষমতা সম্বন্ধে তাকে পরখ করতে চাই। লোকটা তখন আমার কাছ থেকে একটা দশ টাকার নোট চেয়ে নিয়ে একটা ফটোগ্রাফিক ফ্রেমে এঁটে দেয় এবং তার পর নোটের মাপ অনুযায়ী কাটা একটি সাদা কাগজ নোটখানার সামনে মেলে ধরে—এই কাগজটায় সে কি সব রসায়ন মাখিয়েও দিয়েছিল। এরপর সে উভয় কাগজটি আলোর দিকে সরিয়ে আনে। এই ভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আমি নোটের ছবির মত অনুরূপ একটা ছাপ সাদা কাগজটার উপর পড়তে দেখি। ঠগী লোকটি তখন আমায় বুঝায়, 'এই দেখুন ধীরে ধীরে আপনার এই নোটখানিই দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ ঐরূপ আর একখানি দশ টাকার নোট তৈরি হচ্ছে।' এর পর দুর্বৃত্তটি আমাকে বুঝায় যে, পুরোপুরি নোটখানি তৈরি হতে খরচ হবে একশোর উপর। এজন্যে দশ টাকার নোটে খরচ পোষাবে না! ঐ দুর্বৃত্তটি এর পর আমাকে একটি হাজার টাকার নোট জোগাড় করতে বলে। সে বলে যে তাহলে

মাত্র একশো টাকা খরচে হাজার টাকা পাওয়া যাবে। আমি তার এই কথা বিশ্বাস করি। এইভাবে নোট ডবল করে গভর্নমেণ্টকে ঠকান একটি বে-আইনি কার্য। এই কারণে বিষয়টি আমি তৃতীয় ব্যক্তিরও কানে তুলি না। এর পর আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে একটি হাজার টাকার নোট সংগ্রহ করে আনি। দুর্বৃত্তটি তখন নোটের মাপে কাটা একটি সাদা পার্চমেণ্ট কাগজ হাজার টাকার নোটের উপর নিক্ষেপ করে। পূর্বের মতই সাদা কাগজটার উপর হাজার-টাকা নোটের একটা হুবহু ছাপ আমি পড়তে দেখি। এর পর দুর্বৃত্তটি দুইখানি নোটই [আসল নোট এবং ছাপপড়া কাগজ] একটা কাগজে বেঁধে দিয়ে আমাকে মোড়কটি দুই দিন পরে খুলবার পরামর্শ দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। এদিকে কখন যে হাত সাফাই-এর সাহায্যে তিনি আসল নোটটি সরিয়ে ফেলেছেন তা আমি জানতেও পারি নি। দুই দিন দুই রাত্রি পরে মোড়কটি আমি খুলে দেখি আমার সর্বনাশ হয়েছে। আসল বা নকল কোনও নোটই মোডকটির মধ্যে নেই। সেখানে আছে শুধু নোটের সাইজে কাটা দুইখানি সাদা কাগজ। দুর্বৃত্তটি আমাকে বুঝিয়েছিল যে দুই দিন দুই রাত্রি পরে অপর কাগজটি হুবহু আসল নোট হবে। কিন্তু এর পূর্বে ওগুলো আলোয় আনলে উহা আর তা হবে না। এই কারণে তার উপদেশ মত আমি দুই দিন দুই রাত্রি অপেক্ষা করেছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সেন্‌সিটাইজড্‌ পেপার হাত সাফাইএর সাহায্যে সরিয়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা সেখানে একখানি সত্যকার নোট এনে সরল প্রকৃতির মানুষদের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। ছাপ ধরা কাগজটা হঠাৎ সত্যকার নোট হয়ে উঠায় তখন আর তার কোনও সন্দেহ থাকে না। এর পর অনুরূপ ভাবে হাতের কায়দায় দুইখানি

নোটই সরিয়ে ফেলে মোড়কের মধ্যে মাত্র দুইখানি সাদা কাগজ ঢুকিয়ে তার উপর প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে অ্যাসিড ঢালবার উপদেশ দিয়ে দুর্বৃত্তটি বামালসহ নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে।

দোনা খেল—অন্যান্য

দোনাখেল অপরাধীরা নানারূপে শহর ও পল্লীর লোকদের ঠকিয়ে থাকে। কোনও কোনও সময় এরা প্রচার করে এদের কোনও এক ব্যক্তি দশখানা হাজার টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে। যেহেতু হাজার টাকার নোট ভাঙ্গান তাদের মত গরিব লোকদের পক্ষে নিরাপদ নয়, সেই হেতু মাত্র একশো টাকার খুচরা নোটের বিনিময়ে হাজার টাকার নোটগুলি তারা বিক্রয় করতে প্রস্তুত। সরল প্রকৃতির লোভী মানুষরা তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করে নোটগুলি দেখতে চায়। এই সকল দুর্বৃত্তদের নিকট প্রায়ই দুই তিন খানি হাজার বা একশো টাকার জাল নোট মজুত থাকে। নোটের মাপে কাটা খানকতক কাগজের উপরে ও নিম্নে জাল নোটগুলি রেখে দূর থেকে সেগুলো প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের দেখিয়ে তারা তাদের বিশ্বাসও উৎপাদন করে। এর পর নির্ধারিত দিনে রাত্রিকালে কোনও নির্জন স্থানে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি অর্থসহ উপস্থিত হয় এবং সেই শুভমুহূর্তেই কতকগুলো গুণ্ডা লোক এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাদেরকে মার-ধর করে তাদের অর্থ কেড়ে নেয়। কিংবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে জাল [নকল] পুলিশ এসে উভয় পক্ষকে গ্রেপ্তার করে মারধর করে। পরে উৎকোচস্বরূপ উভয়পক্ষেরই অর্থাদি হস্তগত করে তারা স্থান পরিত্যাগ করে। তবে সব সময়েই যে জাল পুলিশ বা জাল গুণ্ডার আবির্ভাব হয় তা নয়। অধিক ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা প্রথমে

আসল বা জাল নোট দেখিয়ে পরে কতকগুলো কাগজের একটা বাণ্ডিল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিদের [Victims] হাতে হাত সাফাই-এর সাহায্যে গছিয়ে দেয়। এই সব ঠগীদের মধ্যে যারা রেলওয়ের কুলি সাজে তারা বলে নোটগুলি তারা ট্রেনের কামরায় কুড়িয়ে পেয়েছে এবং যদি তারা রাজমিস্ত্রি সাজে তাহলে তারা বলে একটা ভাঙ্গা বাড়ি সারাতে গিয়ে সেগুলো তারা হস্তগত করেছে। কেউ কেউ ভান করে থাকে যে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তারা গুপ্তধন পেয়েছে। কোনও একটা বড় ট্রেন দুর্ঘটনা বা বড় একটা জাহাজ ডুবির খবর কাগজে বেরুলে এই সব ঠগীদের অত্যন্তরূপ সুবিধা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নোটের বদলে সোনার গহনা পেয়েছে—এইরূপও তারা বলে থাকে। প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা এই গহনা গোপনে কিনতে গিয়ে তারা সোনার গহনা না কিনে সহস্র সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে কিনে আনে কতকগুলো পিতলের বা গিল্টি করা গহনা।

পল্লী অঞ্চলে নিম্নবঙ্গীয় ব্যাধ নামধেয় দোনাখেল অপরাধীরা এক অদ্ভুত উপায়ে সরল প্রকৃতির গ্রামবাসীদের ঠকিয়ে থাকে। লোক ঠকানোর এই অভূতপূর্ব পদ্ধতিকে বলা হয় "লক্ষ্মীর ভর" পদ্ধতি। এরা মানুষকে বুঝায় যে তাদের কাছে একটি অক্ষয় ঘট বা কলস আছে। মোহর ভরা মন্ত্রপূত এই কলসের অর্থ কখনও ফুরাবে না। আসলে কিন্তু কলসটি মাটি দিয়ে ভর্তি করে উপরে কতকগুলো গিল্টি করা মুদ্রা বা চকচকে পয়সা রেখে তারা রাত্রিকালে গৃহস্থদের তা দেখিয়ে থাকে। লোভী গৃহস্থদের কেউ কেউ বহু অর্থের বিনিময়ে উপরি উল্লিখিত "লক্ষ্মীর ভর" কিনে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এইরূপ বহু কাহিনী বঙ্গীয় পুলিশ বিভাগের গোচরে এসেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব ঠগীরা মোহর ভরা কলস মাটি খুঁড়ে পেয়েছে—এইরূপ কাহিনী বলে

গ্রামবাসীদের কাছে অনুরূপ মাটি ভরা কলস বিক্রয় করতে সমর্থ হয়েছে। এই সব ঠগীদের কাছে কয়েকটি সত্যকার আকবরি মোহর মজুত থাকায় এই সব অপকার্যে তাদের বিশেষ সুবিধা হয়। গ্রাম-বাসীরা এই সব মোহর প্রথমে স্যাকরা দ্বারা যাচাই করে নেয়। কিন্তু এত সাবধানতা সত্বেও তাদের আমরা প্রবঞ্চিত হতেই দেখি—এর একমাত্র কারণ অতি লোভ। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" প্রবচনটি অতীব সত্য কথা। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতিকে বলা হয় **Treasure Trove Trick** বা গুপ্তধন প্রাপ্তির পদ্ধতি।

নওসেরা পদ্ধতি ভারতে উদ্ভাবিত হলেও একটু অদল-বদল করে উহা য়ুরোপ প্রভৃতি দেশেও গৃহীত হয়েছে। য়ুরোপে কোটিপতি-গণের [মিলিয়োনিয়ার] মৃত্যুর পর দরিদ্র দূরসম্পর্কিত আত্মীয়দের প্রায়ই তাঁদের উত্তরাধিকারী হতে দেখা যায়। এঁদের খুঁজে বার করবার ভার পড়ে স্বর্গত ধনকুবেরদের উইল প্রস্তুতকারক অ্যাটর্নিদের উপর। এই সব ক্ষেত্রে অ্যাটর্নিরা এদেরকে সংবাদপত্র মারফৎ তাদের অফিসে আহ্বান করে আনেন। এইজন্য ঐ দলের একজন পথের মধ্যে সংবাদপত্রের ঐরূপ এক বিজ্ঞাপনের কাটিং সহ মোড়ক নিক্ষেপ করে পরে ওটা শিকারমগ্ন ব্যক্তির সম্মুখে খোঁজাখুঁজি করেন এবং তাতে অসফল হয়ে উনি স্থান ত্যাগ করলে অন্যেরা সেটা খুঁজে পায় ও সেটা সেই শিকার-মগ্ন ব্যক্তিকে দেখাতে থাকে। কখনও ঐ নকল উত্তরাধিকারী শিকারমগ্ন [ভিকটিম্] ব্যক্তির নিকট টাকা কর্জ নেওয়ার চেষ্টা করে এই বলে যে সম্পত্তি পাওয়ার পর তাকে প্রচুর অর্থ সে বকশিস্ দেবে।

বহুক্ষেত্রে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতন রাষ্ট্রকেও এই দলের লোকেরা এই পদ্ধতি দ্বারা অভিনব উপায়ে ঠকিয়ে থাকে। এই সম্পর্কে একটা

চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো। এরা সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক প্রবঞ্চক হয়ে থাকে।

"আমি অমুক মোটর কার এজেন্সির ম্যানেজার। ঐ শনিবার সকাল ১০টাতে জনৈক সুবেশ বাঙালী ভদ্রলোক আমার অফিসে এলেন। টকটকে লাল তাঁর চেহারা। পরনে য়ুরোপীয় পোশাক। ঠোঁটে জলন্ত চুরট ও মুখে ইংরেজি বুলি। ভদ্রলোক আঠারো হাজার টাকার দামের একটি মোটর কার কিনতে চাইলেন। তবে হাঁ—নগদ তখুনি তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন বটে কিন্তু বাকি টাকাটা ব্যাঙ্কের চেকে প্রদান করবেন। গাড়িটা কিন্তু তাঁর তখুনি চাই। আমি অচেনা ভদ্রলোকের ঐ প্রস্তাবে 'কিন্তু কিন্তু' ভাব দেখালাম। ভদ্রলোক তা বুঝে ভ্রূ কুঁচকে বললেন—'এই দেখুন আমার লয়েডস্ ব্যাঙ্কের পাশ বুক। ওতে আটাশ হাজার টাকা জমা রয়েছে। লাস্ট উইথড্রয়াল মাত্র কালকে।' আমি পাশ বুকটা পরীক্ষা করে দেখলাম ওটা আপ্-টু-ডেট্ করা আছে। তা ছাড়া ওঁর নামের পাশ বুকের সঙ্গে আনা চেক বুকও দেখলাম ও পরীক্ষা করলাম। অতো দামী গাড়ির খদ্দের কালে-ভদ্রে পাওয়া যায়। এই সুযোগ পরিত্যাগ করতে আমি পারি নি। ভদ্রলোক নগদে ও চেক যোগে মূল্য মিটিয়ে গাড়ি নিয়ে [স্বয়ং চালিয়ে] চলে গেলেন। এরপর বেলা প্রায় একটার সময় একজন গোঁফওয়ালা বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর আমাদের সেই বিক্রীত মোটর গাড়ি ও হাতে আমাদের কোম্পানির ঐ গাড়ি সম্পর্কিত ব্লু বুক [যা নাম পরিবর্তনের জন্য পূর্বেকার ক্রেতা ভদ্রলোককে দেওয়া হয়েছিল।] এই নূতন আগন্তুক ভদ্রলোক আমাকে ঐগুলি দেখিয়ে বললেন—'আমিও মোটর সম্পর্কিত একটা

'ডিড' ভেরিফাই করতে এসেছি। আমি আজকে কিছুক্ষণ আগে অমুক ভদ্রলোকের নিকট হতে এই গাড়িটা মাত্র দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনলাম। আমি জানি এটার দাম আঠার হাজারের উপরে হবে। কিন্তু ওটা কেনার মাত্র দু'ঘণ্টা পর আমাকে ওটা এতো সস্তাতে উনি বিক্রি করলেন। এতে কিছু সন্দেহ হওয়াতে বিষয়টা আপনাদের কাছে [এক বন্ধুর পরামর্শে] যাচাই করতে এসেছি। ঐ ভদ্রলোক আরও জানালেন যে কথোপকথনের মধ্যে তিনি আরও জেনেছেন যে সেই ভদ্রলোক ঐ দিন সন্ধ্যা ছয়টাতে উড়োজাহাজে [প্লেনে] দমদম বন্দর থেকে রেঙ্গুন যাত্রা করবেন। এরপরে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে ঐ চেক্ বুক জাল চেক্ বুক এবং আমি গাড়ি বিক্রয় বাবদ বক্রী আট হাজার টাকা সম্পর্কে প্রবঞ্চিত হয়েছি। এদিকে ঐ দিন শনিবার হওয়াতে ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোনও কিছু পূর্বাহ্ণে পাকা করে নেওয়া ঐ দিন সম্ভব হবে না। এজন্য সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা না করে আমি ঐ ব্যক্তির পরামর্শে গোয়েন্দা পুলিশের আফিসে পুলিশ সাহেবকে সকল বিষয় জানালাম। তখুনি স্বয়ং পুলিশ সাহেব এবং তাঁর সহকারীদের সাথে আমি দমদম এরো-ড্রোমে এলাম। সেই আসামী-মন্য ভদ্রলোক তখন রেঙ্গুনগামী প্লেনে উঠবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন। আমরা ওঁকে ঐ মোটর ক্রয় ও ব্যাঙ্কের চেকের ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমাদের বললেন—'এ্যাঁ! এ আমার খুশি আমি কম দামে [আণ্ডার সেল্] গাড়ি বিক্রি করেছি। কি? ঐ দিন কিনেই ঐ দিনেই বিক্রি করলাম কেন? সেটা আমার খুশি। ও গাড়ি আমার আর দরকার নেই—তাই। উনি চেক্ নিতে রাজি হয়েছেন। আমিও চেক্ ওঁকে দিয়েছি। এতে অপরাধ আমার কোথায় তা বুঝি না। হ্যাঁ!

ঐ চেক্ ডিস্অনার্ড্ হলে অবশ্য আমি অপরাধী হবো। সোমবারে আপনাদের ঐ চেক ক্যাশড্ও হয়ে যাবে। আমি একটা গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে রেঙ্গুনে যাচ্ছি। ঠিক সময়ে না পৌঁছুলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকার আরনেস্ট মনিই দালালরা ফরফিট করবে। আমাকে আপনারা আটকালে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে দু'লক্ষ টাকার ড্যামেজ স্থট আনবো।' এই ভাবে কথা বলে ভদ্রলোক হৈ-হাল্লা করে এরো-ড্রোমের উচ্চপদী [অফিসার] কর্মীদের সেখানে জড় করে তাদের সাক্ষী করে তাদের কাছেও উপরোক্ত রূপ অভিযোগ জানালেন। প্রথমে আমরা ভড়কে গেলেও পরে পুলিশ সাহেব তাকে প্রবঞ্চক বলে বুঝলেন এবং বললেন যে ঐ ব্যাঙ্কের চেক্ কস্মিনকালে ক্যাশড্ [ভাঙানো] হবে না। আমরা ঐ অবস্থাতে ঐ বেয়াদব ভদ্রলোকটিকে গ্রেপ্তার করার ঝুঁকি নিলাম। সোমবার সকালে ব্যাঙ্কে ঐ চেক্ প্রোডিউস করা মাত্র উহা ক্যাশড্ হ'য়ে গেলে আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। ঐ ভদ্রলোক তাঁর কথা মত আমার কোম্পানি এবং প্রদেশ সরকারের [পুলিশের] নামে দু'লক্ষ টাকা ড্যামেজ স্থটের মামলা আদালতে আনলেন। তখন রেঙ্গুনে তদন্ত করে জানা গেল ঐ ভদ্রলোকের কথা সব সত্য। পরে জানা গেল যে দ্বিতীয় ব্যক্তি [গোঁফওলা ক্রেতা] মায় রেঙ্গুনের দালাল কোম্পানি একই দলের [ইনটার-ন্যাশনাল গ্যাঙ্গ] দলী। ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিরই পাঠানো ব্যক্তি। আদালতের ঐ মামলা আমরা ও গভর্নমেণ্ট বহু অর্থ খেসারাতি [গচ্চা] দিয়ে মিটমাট করতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

বহু ক্ষেত্রে অপরাধীরা নওসেরা পদ্ধতিতে একক চেষ্টাতেও ঐরূপ প্রবঞ্চনা অপরাধ করে থাকে। বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও এদের কুহক-জাল

ছিন্ন করতে না পেরে প্রবঞ্চিত হন। নিম্নে এই সম্পর্কে এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হলো।

"হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের আফিসে এসে গ্যাট্ হয়ে বসে এক গ্লাস জল খেতে চাইলেন এবং বললেন যে তিনি গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার। এখুনি থানাতে একটা ফোন করবেন। এর পর অনুমতি নিয়ে টেলিফোনে ইন্‌চার্জ অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর এপারের কথাবার্তা হতে আমরা বুঝলাম যে নিকটের গলিতে এক গাড়ি চাউল ধরা পড়েছে এবং সেখানে পুলিশের পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা আরও বুঝলাম যে ইন্‌চার্জবাবু তাঁকে অকুস্থলে নিলাম করে উহা বিক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন। কারণ থানাতে স্থানাভাব এবং ঐ সম্পর্কে হুকুম পূর্ব হতেই নেওয়া আছে। তবে র‍্যাশন কার্ড হোল্ডারদের কাছে উহা বিক্রয় করতে হবে। এরপর আমাদের প্রদত্ত লেমনেড্ খেতে খেতে তিনি আমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে বললেন—'আরে মশাই! যা মাইনে পাই তাতে চলে না। এক কাজ করুন না আপনারা। আপনাদের র‍্যাশন কার্ড অনুযায়ী দশ কিলো করে চাউল কিনুন ও রসিদ নিন। আর সেই সঙ্গে মাথা পিছু বে-সরকারী ভাবে আধা দরে দুই মণ করে নিন। থানাতে জমা দেবার সময় আমি আটক্ চাউল কম করে দেখাবো।' এই প্রস্তাবে আমরা সকলে রাজি হয়ে একত্রে ৫০০৲ টাকা ঐ ভদ্রলোকের হাতে দিলাম। আমাদের হেড্ক্লার্ক-বাবু আফিসের ক্যাশ ভেঙে ঐ দিনের মত ঐ টাকা নিজেকে ও অন্যদেরকে কর্জ দিলেন। পুলিশ কর্মচারী ঐ টাকা গ্রহণ করে বললেন যে তিনি পুলিশের গাড়িতে বাড়ি বাড়ি ঐ চাউল পৌঁছিয়ে দেবেন। 'এখুনি গাড়ি সমেত আমি আসছি'—এই বলে উনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু আর কোনও দিনই তিনি সেখানে ফিরলেন না। থানায়

বড়বাবু সব বিষয় শুনে একেবারে হতবাক ও অবাক। আমরা পরদিন গহনা বন্ধক দিয়ে টাকা ধার করে হেড্ ক্লার্ককে তা ফিরত দিয়ে তাঁর তহবিল এবং চাকুরি রক্ষা করি।"

উপরোক্ত কাহিনীগুলি অসাধারণ প্রবঞ্চনার এক-একটি দৃষ্টান্ত। এই 'অসাধারণ অপরাধের' দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমি একজন প্রৌঢ় চিকিৎসা ব্যবসায়ী। এই দিন সকালে আমি আমার বহিঃকক্ষে বসেছিলাম। এমন সময় একজন সুবেশ যুবক ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকাবাবু ভাল আছেন?' এর পর সে আমার পদধূলি গ্রহণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও এই যুবকটিকে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। বিব্রত ও তৎসহ কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কৈ, বাবা! তোমাকে তো চিনতে পারছি না?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতীব নম্রভাবে যুবকটি বললে, 'এঁ্যা! সে কি কাকাবাবু? এ কি আপনি বলছেন? আমাকে আপনি চিনতে পারলেন না! আমাকে খুবই ছোট দেখেছিলেন কি'না, তাই! আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর ছোট ছেলে।' এই সুব্রতবাবু ছিলেন আমার বাল্যবন্ধু। তবে বছর কুড়ি হল তিনি পাটনায় কর্মবাহাল ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কোলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ত। মাত্র বছর দুই পূর্বে অবসর গ্রহণ করে তিনি বালিগঞ্জে বাড়ি করেছিলেন।' আমি খুশি হয়ে তাকে সম্বোধন করে বলে উঠলাম, 'আরে তাই না'কি, তুমি এত বড় হয়েছ! তা তোমার মেজদা কোথায়?' 'মেজদা, মেজদা? মেজদা কাকাবাবু?' আদুরে আদুরে ভাব দেখিয়ে ঠিক পূর্বের মতই হাত কচলাতে

কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, 'মেজদা কাকাবাবু এখন মস্ত বড় অফিসার। ইম্‌পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা ভাল কাজ পেয়ে গিয়েছেন।' 'এ্যাঁ তুমি বল কি?' এবার অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ-এ কি বলছ তুমি? দেড় মাস হল তোমার বাবার সঙ্গে ক্যালকাটা ক্লাবে দেখা হয়েছিল। বেশ মনে পড়ে উনি সেদিন আমাকে বলেছিলেন যে—তোমার মেজদা বর্মায় আটকা পড়ে গিয়েছে। সে তো অনেক দিন ধরে যুদ্ধের ব্যাপারে এখানে ওখানে ঘুরছে। তোমার বাবা খুবই চিন্তিত তার জন্যে দেখলাম।' কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে যুবকটি উত্তর করল, 'হাঁ! বাবা ঠিকই বলেছিলেন কাকাবাবু। কিন্তু—কাকাবাবু! মাসখানেক হ'ল দাদা ফিরে এসেছেন। পায়ে স্প্লিণ্টার লেগে পা'টা একটু জখম হয়েছিল। সেই সুযোগে উনি ডিস্‌চার্জড্ হতে পেরেছিলেন। ফিরে এসেই মেজদা এই চাকুরিটা জোগাড় করে নিয়েছেন। এ সবই ভগবানের দয়া কাকাবাবু।' এর পর আমি যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বেশ! তা এখন ব্যাপার কি বল।' হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি বলল, 'কাকাবাবু! পরশু আমার ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে। মা বিশেষ করে আপনাকে যেতে বললেন।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বোন? বোন তোমার ছিল না'কি?' আবার হাত কচলাতে কচলাতে যুবকটি উত্তর দিলে, 'হাঁ কাকাবাবু! আমার পরেই তো আমার বোন। আপনি সব ভুলে গিয়েছেন কাকাবাবু। আমাকেই আপনি খুব আদর করতেন ছোট বেলায়। তাই আপনার শুধু আমাকেই মনে আছে। আমার বোনটা তখন মাত্র এক মাসের। আপনি তো বহুদিন আমাদের বাড়ি যান নি। তা হলে কাকাবাবু উঠি এবার। প্রায় আটশো লোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে, সব আমাকেই করতে হচ্ছে।' আটশো

লোককে নিমন্ত্রণ করার কথায় আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ্যাঁ! সে কি? এত রেশন জোগাড় করলে কি করে!' উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, 'সে কথা কেন জিজ্ঞেস করেন কাকাবাবু! চাল তো জোগাড় করেছিই, তা ছাড়া বিশ গাঁট কাপড়ও।' 'এ্যাঁ!' বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'বিশ গাঁট কাপড়? অত কাপড় কি করবে? পেলেই বা এতো কি করে? আমরা ত কিছুই পাই না!' আমার এই উত্তরে যুবকটি আমতা আমতা করে জানাল, 'আমি এখন যে টাউন হলের রেশন অফিসার। সিভিল সাপ্লাইতে আমি গোড়া থেকেই আছি।' এর পর আমিও আমতা আমতা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা বাবাজীবন! আমাকে কয়েক জোড়া কাপড় জোগাড় করে দিতে পার?' আমাকে লজ্জিত করে তুলে যুবকটি উত্তর করলে, 'তা কি করে হয় কাকাবাবু! এ আপনি আমাকে বড় মুস্কিলে ফেললেন।' এর পর সে কিছুতেই রাজি হয় না। কিন্তু আমিও তখন নাছোড়বান্দা। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর যুবকটি যেন অনিচ্ছা সত্ত্বে রাজি হয়ে বললে, 'তাহলে কাকাবাবু এক গাঁট কাপড়ের দাম ১০০৲ টাকা দিন। খুচরা কাপড় বার করা সম্ভব হবে না। আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে না হয় ওগুলো বাঁটোয়ারা করে নেবেন।' এই দুষ্প্রাপ্যের বাজারে আমি কৃতার্থ হয়ে ১০০৲ টাকার একটা নোট আমার ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্র অজিতের হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, 'যা তো তোর এই দাদার সঙ্গে এই টাকা নিয়ে। একটা ট্যাক্সি করে কাপড়গুলো ওখান হ'তে নিয়ে আসবি।' হাঁ হাঁ করে উঠে যুবকটি বললে, 'সে কি কাকাবাবু! আপনি কি শেষে আমাকে বিপদে ফেলবেন না'কি! কাপড় যে কনট্রোলড্। আমাদের লরি করে আমিই এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব। অজিত টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে

আজই চলুক। এক্ষুনি ওদের এই টাকা জমা দিতে হবে।' অজিতকে কিন্তু আড়ালে ডেকে আমি বলে দিলাম, 'দেখ খোকা! কাপড় নরিতে না তুললে কিন্তু টাকা দিস্ নি।' এর পর যুবকটি আমার পদধূলি গ্রহণান্তে অজিতকে নিয়ে বার হয়ে গেল।

যুবকটি মাত্র এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। এর মধ্যে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা আমার কল্পনারও বাইরে। এছাড়া টাকা কয়টা আমিই জোর করে তার হাতে তুলে দিয়েছি। বরং তাকে এই ব্যাপারে জোর করেই আমাকে সাহায্য করতে রাজি করিয়েছি। তাই এর মধ্যে আমার সন্দেহ করবার কিছু ছিল না। কিন্তু ছয়-সাত ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমার পুত্র বাড়ি ফিরছিল না। পরিশেষে আমি থানায় গিয়ে বিষয়টি জানাতে বাধ্য হলাম। সকল কথা শুনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার আমায় অভয় দিয়ে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আপনার ছেলে এক্ষুনি ফিরে আসবে।' প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে বললাম, 'কিন্তু টাকা যে জিনিস না পেলে তাকে দিতে আমি বারণ করেছি। সে যদি অস্বীকৃত হয় আর তার ফলে তারা যদি তাকে মারধর শুরু করে?' হেসে ফেলে ইনেস্‌পেক্‌টার ভদ্রলোক বললেন, 'ও আপনি কিছু ভাববেন না। বাপ যখন দিয়েছে, ছেলেও তাহলে দেবে। ছেলে আপনার ফিরে এল বলে।' ইনেস্‌পেক্‌টারবাবু এ বিষয়ে ঠিকই বলেছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতে পুত্রও আমার থানায় এসে হাজির হ'ল। মুখটা কাঁচুমাচু করে সে আমায় জানাল যে, তার কাছ হতে যুবকটি টাকা ক'টা ধাপ্পা দিয়ে চেয়ে নিয়ে তাকে একটি আফিসের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে 'এক্ষুনি আসছি' বলে চলে যায়। পুত্র আমার তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃথাই অপেক্ষা করে এইমাত্র ফিরে এলো। এর পর থানা হ'তে

আমি রায় বাহাদুর সুব্রতবাবুর বাড়িতে ফোন করে জানতে পারি যে, তার কোনও কন্যা নেই। ঐ প্রবঞ্চক নিমন্ত্রণের মুদ্রিত পত্র আমাকে দিলেও বুঝা যায় যে, এই বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারটিও আগাগোড়া মিথ্যা। আমার ধারণা ছিল আমি একজন চতুর এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কিন্তু এই দিন আমি বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে বুদ্ধির ন্যায় নির্বুদ্ধিতাও আছে।"

[উপরের কাহিনী হ'তে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। এই সত্যটি হচ্ছে এই যে, স্বার্থ ও লোভ মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট করে তাকে বোকা করে তুলে এবং সেই সময়ে যে কোনও সাজেস্শন (বাক-প্রয়োগ) তার উপর কার্যকরী হয়। এইজন্য রায় বাহাদুরের কন্যা নেই জেনেও ডাক্তারবাবুকে বিশ্বাস করানো গিয়েছিল যে তাঁর কন্যা আছে। এ'ছাড়া মানুষের মনে 'আছে বা নেই'—এই সম্বন্ধে যদি সন্দেহ থাকে বা তাদের তা স্মরণ না থাকে তখন বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শন দ্বারা তাদের সেই সম্বন্ধে 'হাঁ বা না' রূপে বিশ্বাস করানো সম্ভব।]

অলীক-উদ্বাহন

অসাধারণ প্রবঞ্চনা অপরাধ অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতি দ্বারাও সমাধিত হয়। অর্থাৎ কেহ ভুলে টাকার লোভে, কেহ বা ভুলে স্ত্রীলোকের মোহে। কাহাকেও কাহাকেও আবার উভয় প্রকারেই ভুলানযায়। মানুষের অন্তর্নিহিত যৌনজ বা অযৌনজ স্পৃহার পৃথক পৃথক বা একত্র অবস্থিতি ইহা প্রমাণিত করে। মানুষের এই উভয় প্রকার দুর্বলতা সম্বন্ধেই দুর্বৃত্তরা অবহিত। অসাধারণ প্রবঞ্চনার

অযৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এইবার ইহার যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। উদাহরণ স্বরূপ "অলীক উদ্বাহন" বা ভূয়া বিবাহের কথা বলা যেতে পারে। ইংরাজিতে ইহাকে বলে বোগাস্ ম্যারেজ ট্রিকস্ [Bogus marriage tricks]। এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা দুর্বৃত্তরা বিবাহেচ্ছু, লোভী যুবক বা তার অভিভাবককে বুঝায় যে তারা পাত্রপক্ষের জন্যে একজন ধনীলোকের একমাত্র কন্যাকে বধূ রূপে এনে দিতে পারে। এ'জন্য তাকে যে বেশি কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে একথাও সে তাদের জানিয়ে রাখে। এই প্রস্তাবে রাজি হলে একদিনে রাজা এবং রাজ-কন্যা লাভ হবার সম্ভাবনা। এই কারণে দুর্বৃত্তদের এই প্রস্তাবে পাত্র-পক্ষ খুশি হয়েই একশ' বা দুইশ' টাকা এদের অগ্রিম দেন। এদিকে বরপক্ষের যাবতীয় দুর্বলতা সাবধানে গোপন রাখা হয়; এই কারণে বিবাহের ব্যাপারে যা কিছু কথাবার্তা তা দুর্বৃত্তদের মারফৎই চলতে থাকে। আসলে কিন্তু দুর্বৃত্তরা একটি বেশ্যাকন্যাকে জমিদার-কন্যা সাজিয়ে পাত্র পক্ষকে বধূরূপে গছিয়ে দিয়ে থাকে। এজন্য ভদ্রপল্লীতে বড় বড় বাড়ি ভাড়া করে, উহা ভাড়া করে আনা দামী আসবাবপত্রে সাজিয়ে রাখা হয়। এই সব বাড়িতে দুর্বৃত্তরা কোনও এক প্রৌঢ়া বেশ্যাকে গৃহিণী সাজিয়ে এবং নিজেরা বাড়ির কর্তা প্রভৃতি সেজে দুই এক মাস সকন্যা বাসও করে থাকেন। এর পর দুই-একদিনের মধ্যে আসল ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে পড়ে। বরপক্ষ তখন বধূ এবং দ্রব্যাদির উপর কোনও রূপ আর দাবী-দাওয়া না রেখে কারুর কাছে কোনরূপ নালিশ না জানিয়েই মানে মানে সরে পড়েন।

অবশ্য সাধারণ প্রবঞ্চনার সাহায্যে সত্যকার ধনী ভদ্রকন্যাদেরও এরা যে সর্বনাশ না করেছে তা'ও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে

দুর্বৃত্তরাই বরপক্ষ সেজে উক্তরূপ অভিনয় দ্বারা একটির পর একটি সালঙ্কারা রূপবতী ধনী কন্যাদের বধূরূপে সংগ্রহ করে নগদে ও অলঙ্কারে বহু সহস্র টাকা উপায় করেছে। বিবাহের কয়েকদিন পরেই এরা বধূটির অলঙ্কারগুলি এবং আসবাবপত্র সকল অপহরণ করে সদলে ভাড়া করা বাটীটি হঠাৎ পরিত্যাগ করে চলে যায়। এইরূপ দুই-একজন বিবাহ-বিশারদ অপরাধীর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। ভালরূপ তথ্য তল্লাস না করে বিবাহ দেওয়ার জন্যেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বরকে উপযুক্ত কনে এবং কনেকে উপযুক্ত বর জুটিয়ে দেবার অজুহাতে আজকালকার স্বাবলম্বী বর এবং স্বাবলম্বিনী কন্যাদের কাছ থেকে দুর্বৃত্তরা প্রতি বৎসর বহু অর্থ ঠকিয়ে নিয়ে থাকে।

এছাড়া এদেশে এমন অনেক নির্বোধ ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁদের প্রাইভেট গার্ল বা গৃহস্থ কন্যাদের উপর ঝোঁক দেখা যায়। শহরে এমন অনেক ধূর্ত ও বদ দালাল আছে, যারা এঁদের উপভোগের জন্যে গোপনে গৃহস্থ কন্যাদের সংগ্রহ করে আনে। এই সব দালালেরা এঁদের বুঝায় যে গৃহস্থ কন্যারা পেটের দায়ে গোপনে ব্যবসা করছে মাত্র; কখনও তারা মিথ্যে বলে অলীক ধনীর কন্যাদেরও তাঁদের এনে দেয়। এই দালালরা তাঁদের বুঝায় যে ঐ সব কন্যা কেবলমাত্র আত্মচরিতার্থতার কারণেই দেহ দিতে চায়। তারা পয়সা উপায়ের জন্যে ঐ যৌনজ কাজে নামে না। আসলে কিন্তু এই সব দালালেরা বা নারী কুটনীরা বেশ্যা-কন্যাগণকে ভদ্রকন্যা সাজিয়ে তাদের কাছে এনে দেয়। অবশ্য শহরাঞ্চলে প্রাইভেট রূপজীবিনীর অস্তিত্ব যে নেই তাও নয়। এই সম্বন্ধে পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে আমরা আলোচনা করব। তবে এই সব হতভাগ্য ভদ্রসন্তানদের বুঝা উচিত যে, এইসব তথাকথিত প্রাইভেট গার্লস কেবলমাত্র তার একার জন্যেই সংগৃহীত হয় না। এক দিক থেকে এরা সাধারণ বেশ্যা

অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। সাধারণ বেশ্যাদের তাদের দয়িতদের বেছে নেবার অধিকার আছে। এই সকল মেয়েরা কিন্তু ঐ বিষয়ে এতটুকু স্বাধীনতাও পায় না। এ বিষয়ে তাদের দালালদের উপরই তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। পূর্বেই বলেছি যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গৃহস্থ কন্যাগণও এইরূপ ভাবে ব্যবসা যে না চালায় তা নয়। কিন্তু তাদের সহিত সাধারণ বেশ্যাদের কি কোনও প্রভেদ আছে? এই ভাবে প্রতারিত হয়ে অর্থের বিনিময়ে এরা লাভ করে কুৎসিত ব্যাধি। পাঠকবর্গ হয় তো বলবেন যে এতে তো উভয় পক্ষই দেখা যায় সমান অপরাধী; অর্থাৎ ইহা তো একটা সহযোগীয় তথা কনট্রিবিউটিঙ্ অফেন্স। তাহলে এই প্রকার অপরাধকে প্রতারণা অপরাধ বলা হচ্ছে কেন? এর উত্তর ইতি-পূর্বে বহুবার দিয়েছি। মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক যৌন-স্পৃহা জাগ্রত করে যারা মানুষ ঠকায় তারাই আসল অপরাধী। এ ছাড়া দেশের আইনের উদ্দেশ্য সহানুভূতি দেখানো বা সমাজ সংস্কার করা নয়। মানুষের প্রতি সুবিচার করা বা তাদের দুর্বৃত্তদের হাত হতে রক্ষা করাই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে সামাজিক ভাবে এই দুর্বলচিত্ত ভদ্রসন্তানদল নিন্দনীয় হ'লেও আইনের চক্ষে তারা এতদ্দ্বারা কোনও রূপ অপরাধ করেনি। অধিকন্তু তাদের এই ভাবে ঠকানোর জন্যে ঐ সব দালাল বা কুটনীরাই হয় আইনের চক্ষে একমাত্র অপরাধী। এইরূপে প্রবঞ্চিত হওয়ামাত্র ভদ্রসন্তানদের লজ্জিত না হয়ে থানায় এসে এজাহার দেওয়া উচিত। এই সব অপকর্মের জন্যে দুর্বৃত্তরা শহরে অনেক "এম্পটি হাউস" বা খালি বাড়ি ভাড়া করে থাকে। এই সকল বাটী দিবাভাগে খালি থাকলেও রাত্রে নরনারীর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে। শহরের কোনও কোনও "হোটেল কিপার"ও এই বিষয়ে দুই-এক ঘণ্টার জন্যে এক-একখানি কামরা দুর্বৃত্তদের ভাড়া দিয়ে তাদের সাহায্য

করে। এই সকল বাড়িতে বা হোটেলে তথাকথিত গৃহস্থ কন্যাদের আনবার সময় দালাল বা কুটনীরা একরকম নিষ্প্রয়োজনেই অত্যন্তরূপ সাবধানতার ভান করে থাকে।

এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক। বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"দালাল ভদ্রলোক আদালতের একজন মুহুরী। এইজন্যে আমি তাকে অবিশ্বাস করি নি। সে আমাকে জানায় যে তার সন্ধানে এমন অনেক গৃহস্থ-কন্যা আছে, যাদের সে তাদের অভিভাবকদের অজ্ঞাতে আমার ভোগের জন্যে এনে দিতে পারে। এই সকল মেয়েদের কেউ বা থাকে হোস্টেলে, কেউ বা থাকে স্বগৃহে। এই ভাবে সে আমাকে ভদ্রকন্যাদের প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলে। সে আরও বলে যে সে কোনও কন্যার ভাইয়ের এবং কোনও কন্যার বা পিতার বন্ধু। এই জন্যে বাড়ির লোকে নিঃসন্দেহে তার সঙ্গে মেয়েগুলিকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমি তার নির্দেশমত চৌরাস্তার মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করি। "ঐ আসছে, এই এল বলে"—ইত্যাদি স্তোকবাক্য দিয়ে সে আমাকে সেখানে প্রায় দুই ঘণ্টারও অধিক অপেক্ষা করিয়ে রাখে। আমাকে উতলা করে ভুলিয়ে রাখার এটা ছিল একটা চালাকি মাত্র। কিন্তু মন উতলা থাকায় তা আমি সেদিন বুঝি নি। ভদ্রঘরের কন্যাদের যে অত সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে আনা যায় না, এইটেই এইরূপ বিলম্ব দ্বারা দালাল ভদ্রলোক আমাকে বুঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি-ভ্রংশের কারণে সেদিন আমি তা না বুঝলেও আজ আমি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে কন্যাটি রিক্সায় করে বাড়ির ঝিকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে আমি গাড়িতে তুলে হোটেলের নির্ধারিত কামরায় এনে উপভোগ

করি। কিন্তু বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে আমাকে তার নাম বা বাড়ির ঠিকানা বলে নি। থেকে থেকে তাকে আমি লজ্জায় অধোবদন হতে দেখি। অপকর্মটি যেন তার এই প্রথম। একবার সে এজন্যে কেঁদেও ফেললে। এ জন্যে যেন সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না; এ কথা সে আমাকে বারে বারে জানাতে থাকে। এইভাবে আরও দুই-তিন বার তার সঙ্গে সম্মিলিত হই। পরিশেষে আমাদের আলাপ এত অধিক জমে উঠে যে কন্যাটি আমাকে গোপনে তার বাড়িতেও নিয়ে যায়। একদিন গোপনে পিছনের দরজা দিয়ে রাত্রিযোগে তার ঘরে এসে আমি অর্গল বন্ধ করছি, এমন সময় উকিলের পোশাক পরে সেখানে তার বড দাদা এসে হাজির। আমার ঘাডটা চেপে ধরে তার উকিল ভাই হেঁকে উঠলেন, 'হারামজাদা! দাঁড়াও এইবার ঠিক করছি তোমায়।' এদিকে বড় ভাইকে সেখানে দেখে প্রিয়তমা আমার অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এর পর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই হাজার টাকা তার উকিল ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে আমি থানা-পুলিশ বা মামলার দায় এড়াই। সেই সঙ্গে মান-সম্ভ্রমহানি ও লজ্জার হাত হতে রক্ষা পাই। অতি কষ্টে আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা হয়। এর দুই মাস পরে আমি জানতে পারি, কথিত কন্যাটি দুই পুরুষের বেশ্যামাত্র এবং তার উকিল ভাইটি আসলে উকিল বা ভাই নয়। সে একজন নিকৃষ্ট ধরনের দালাল মাত্র। বর্তমানে সেই ঐ কুলটা মেয়েটির উপপতি। এরা সকলে অভিনয় দ্বারা আমাকে প্রতারিত করেছে মাত্র।*"

এই সকল বেশ্যা মেয়েরা তাদের ব্যবসার সুবিধার জন্যে আজকাল মাস্টার রেখে কিছু কিছু পড়াশুনাও করে থাকে। এ ছাড়া যে সকল

* বিবৃতিটির কিয়দংশে ব্ল্যাক মেইলিং-এর সন্ধান পাই। এদের এই মিশ্র দলই এর কারণ। ঐ দলের মেয়েটি নির্বল অপরাধী হলেও তার ভাইটি ছিল সবল অপরাধী।

নাবালিকাদের বেশ্যালয় হতে প্রতি বৎসর [নূতন আইনানুসারে] উদ্ধার করে পুলিশ হোমে বা স্কুলে পাঠায় তাদের বয়স আঠারো বৎসর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা ছাড়া পায়। হোমে বা স্কুলে থাকাকালীন তারা রীতিমত শিক্ষা পেয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষাসহ এদের কেউ কেউ তাদের পালিকা মাতার কাছে ফিরে আসে। এই সব মেয়েদের কথাবার্তা শুনলে তারা যে উচ্চ শিক্ষিতা এবং বড় ঘরের মেয়ে তা মনে হবে। এজন্য এইরূপ ভুল করা কাহারও পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। এ ছাড়া ভদ্রসন্তানদের সহিত সংলাপের মধ্যে তারা যে দুই-একটা ইংরাজি কথা বা বুকনি শিক্ষা করে তা'ও তাদের এইরূপ ব্যবসার অনেক সুবিধা করে দেয়। এই সকল সুবিধার সুযোগ এই সব মেয়েরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। এরা ভদ্রসন্তানদের জানায় যে তারা শহরের কোনও এক মহিলা কলেজের ছাত্রী। তাদের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করলে তারা যেন অমুক কলেজের গেটের কাছে চারটার সময় দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে মেয়েটি একগোছা কলেজের বই হাতে করে বেলা তিনটা থেকে সেই কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে থাকে। তারা এমন ভাব দেখায় যেন এইমাত্র গেটের ওপার থেকে বেরিয়ে এলো। এইরূপ অভিনয় দ্বারা এই সব মেয়েরা প্রায়ই ভদ্রসন্তানদের ঠকিয়ে থাকে।

[হোম হতে ছাড়া পাবার নির্ধারিত দিনে পালিকা বেশ্যা মাতারা ঘোড়গাড়ি করে হোমের গেটের সামনে অপেক্ষা করে এবং সাদরে তাকে গাড়িতে তুলে তাদের পূর্বগৃহে নিয়ে আসে। বহু বেশ্যানারী এজন্য নিজেরাই তাদের পালিতা কন্যাকে পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে হোমে পাঠিয়েছে। এতে পালন করার খরচার দায় হ'তে তারা অব্যাহতি পায় এবং ঐ কন্যাদের ব্যবসার সুবিধার্থে চৌকসও করে তুলা হয়। তবে তাদের মমতা বোধ জাগিয়ে রাখবার জন্য ঐ পালিকামাতারা

মধ্যে মধ্যে ভালমন্দ দ্রব্য নিয়ে কন্যাদের সঙ্গে হোমে গিয়ে দেখা করে আসে। এদের জন্য 'আফটার্ কেয়ার হোমের' ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এইরূপ অঘটন ঘটে।]

এই শহরে এমন অনেক প্রবঞ্চক পেশাদার তথাকথিত গৃহস্থ কন্যা আছে—যারা ভদ্রসন্তানের সহিত সিনেমা দেখে হোটেলে সান্ধ্যভোজন করে শেষ বরাবর একটা দোকানে ঢুকে অনেক দ্রব্যাদি কিনে নেয়—খরচ-খরচা অবশ্য ভদ্রসন্তানটিকে একরকম বাধ্য হয়ে সভয়ে বহন করতে হয়। এমনি ভাবে অনেকটা সময় অতিবাহিত হ'লে মেয়েটি সভয়ে বলে উঠে, "ওমা-আ! এর মধ্যে রাত ন'টা বেজেছে? দেখুন, আমার বড্ড ভয় করছে। এত দেরিতে বাড়ি ফিরলে মা আর বেরুতে দেবে না। লক্ষীটি! আজ আপনি আমাকে মাপ করুন। আজ আর আপনার সঙ্গে [নিভৃত স্থানে] কোথাও যাবো না। কাল হেদোর মোড়ে এসে সাতটার সময় অপেক্ষা করবেন। আপনার সঙ্গে আজ থেকে রোজই ঐখানে আমি দেখা করব।" তাড়াতাড়ি কথাগুলা বলে চট্ করে একটা রিক্সায় উঠে সেখান থেকে সে সরে পড়ে। পরের দিন ভদ্রসন্তানটি হেদোর মোড়ে সন্ধ্যা সাতটা হ'তে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কারুর দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ওই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক এইখানেই শেষ হয়ে যায়। মেয়েটি এইবার অপর আর একটি ভদ্রসন্তানের সন্ধানে বাহির হয়। আমি এইরূপ তিনটি প্রবঞ্চক মেয়ের কথা শুনেছি। ভদ্রসন্তানরা এদের নাম দিয়েছেন মিস্ চিপ [Cheap], মিস্ চিট [Cheat] এবং মিস্ ব্লাফ [Bluff]। আমি শুনেছি, এরা এই ভাবে না'কি বহু অর্থ উপায় করে থাকে।

[আশাহত ভদ্র সন্তানদের মনের এই চাঞ্চল্য তাদের মন ও স্নায়ুর

উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। তাদের এই স্নায়বিক ক্ষয়-ক্ষতির কুফল সুদূরপ্রসারী হয়। প্রবঞ্চক কন্যাদের এইরূপ অপকীর্তি এক প্রকার সামাজিক অপরাধ। ভদ্র সন্তানদের উতলা করে সরে পড়া তাদের পক্ষে একটি পাপ কার্য।]

এছাড়া অনেক দুর্বৃত্ত আছে—যারা নিজের বা কোনও বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী বা ভগ্নীকে [তাদের অজ্ঞাতে] দূর থেকে ভদ্রসন্তানদের দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে। ভদ্রসন্তানদের তারা এই বলে যে, শীঘ্রই ঐ সব মেয়েদের তাদের কাছে এনে দেবে। সাধারণতঃ সিনেমা, থিয়েটার বা প্রদর্শনীতে এইরূপ দেখাশুনার পর্যায় সমাপ্ত হয়। এইভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভদ্রসন্তানদের অর্থ অপহরণ করে ভদ্রঘরের দুর্বৃত্তরা বেমালুম সরে পড়ে। ঐ ভদ্রসন্তানগণ তখন আর তাদের কোনও খোঁজ-খবরই পায় না।

এই ধরনের যৌনজ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্তস্বরূপ অপর আর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করে আমি বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করব। এই বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বর্তমানে যে সরকারী অফিসে কাজ করি, সেই অফিসে একটি শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে কাজ করতে আসে। জানি না কেন, মেয়েটিকে আমার অত্যন্ত রূপ ভাল লেগেছিল। কিন্তু সাহস করে একদিনও আমি তার সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি নি। তবে প্রায়ই আমি তার যাতায়াতের পথে ওত্‌ পেতে অপেক্ষা করতাম। একদিন সে নিজে হ'তেই আমাকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা! আপনি তো দেখি যে রোজই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকেন। কিন্তু কৈ আমাকে তো একদিনও ডাকেন না?' হাঙলা ছেলের মত জিভ বার করে আমতা আমতা করে আমি উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে হ্যা! আপনাকে

আমার সত্যি খুব ভাল লাগে। কিন্তু ভয় করতো বলে কথা বলতে পারি নি!' এর পর মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকে তো আপনি মাইনে পেয়েছেন! এ মাসে কত টাকা মাইনে আপনি পেলেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতার্থ হয়ে আমি মেয়েটিকে জানালাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডিআরনেস্ অ্যালাওয়েন্স নিয়ে এই মাত্র ৯৫৲ টাকা।' এইবার মেয়েটি নিজেই আমাকে অনুরোধ করল, 'চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি, যাবেন?' আমি এতে যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেলাম! আমার ভাগ্য যে এতদূর সুপ্রসন্ন হবে তা আমি কল্পনাই করি নি। আরও কৃতার্থ হয়ে আমি তাকে উত্তর করলাম, 'যাবেন? সত্যি যাবেন, কোথায় যাবেন?' আমাদের সম্মুখ দিয়ে একটি ট্যাক্সি চলে যাচ্ছিল। মেয়েটি আমার মতামতের আর অপেক্ষা না করে ট্যাক্সিটাকে থামিয়ে আমাকে নিয়ে তাতে উঠে বসল। শ্রীমতী এইবার আমাকে নিয়ে এলেন একটা হোটেলে এবং সেখানে আমারই খরচায় প্রায় টাকা পনেরোর খাদ্যসামগ্রী খেলেন এবং কিনলেন। এর পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে নিয়ে তিনি ঢুকলেন একটা দোকানে। দোকান থেকে যে জিনিসটি তিনি কিনলেন তার বিল হ'ল ত্রিশ টাকার। বাধ্য হয়ে লজ্জার খাতিরে বিলটা আমিই চুকিয়ে দিই, কারণ দোকানদার বিলটা আমার দিকেই এগিয়ে দিল। এর পর আমাকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে উনি হুকুম করলেন, 'চলো আভি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিধা।' উদ্দাম গতিতে ট্যাক্সিখানি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটে চলল। পথের উপর ট্যাক্সি যতই চলে ততই আমি তার মিটারের দিকে তাকাই। মিটারে ততক্ষণে বার টাকা উঠে গেছে, আর সেই সাথে তেরর একটা অক্ষরও। এবার আমার বুক দুর দুর করে উঠে। শ্রীমতীর সঙ্গে কথা কওয়া তো দূরের কথা, তার দিকে আর তাকাতেও ইচ্ছে

হয় না। শ্রীমতী আমার কাঁধটা ধরে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথা কইছেন না যে, বাঃ। বেশ আমিও তাহ'লে কথা বলব না।' আমার সারা দেহ হতে ঘাম বেরিয়ে আসছিল। চোখ দিয়ে জলও সেই সাথে বার হয়। এর উত্তরে একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে আমি জানাই, 'না তা নয়। আমার শরীরটা কি রকম ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। কেন এরকম হচ্ছে তা জানি না।' এর পর পলতার হোটেলে আর এক প্রস্থ চা পান করে আমি যখন শ্রীমতীকে তার বাড়ি পৌঁছে দিলাম ট্যাক্সির মিটারে তখন উঠেছে ত্রিশ টাকা। পরের দিন আফিসে এসে ভাবছি এ মাসের সংসার খরচের জন্যে কারুর কাছে গোটা সত্তোর টাকা ধার করা যাবে কিনা। এমন সময় আফিসের একজন বেয়ারা এসে আমাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। চিরকুটটিতে শ্রীমতী লিখে পাঠিয়েছেন, 'আজ বিকালে বেড়াতে যাবেন তো? যাবেন কিন্তু—।' চিরকুটটি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দিয়ে আমি বেয়ারাকে জানালাম, 'আচ্ছা। তুম্ যাও আভি।' মনে মনে আমি বলে উঠলাম—বা-বাঃ, আবার—ছিঃ—"

[অনেক সময় জনবহুল পথে ট্যাক্সি থামিয়ে এই সব মেয়েরা এমন ভাবে হাত ধরে শিকারমগ্ন যুবকদের উহাতে উঠার জন্য অনুরোধ করতে থাকে যে পরিচিত ব্যক্তিদের চোখ এড়ানোর জন্য ও সম্মানহানির আশঙ্কায় অনিচ্ছা সত্বেও ঐ সকল যুবকদের ট্যাক্সিতে উঠে জনবহুল স্থান ত্যাগ করে নিরালা স্থানে আসতে বাধ্য হতে হয়েছে।]

এই সব মেয়েরা নানাস্থানে নানা অছিলায় যৌন লোভী যুবকদের সহিত আলাপ করে, কিন্তু কদাচ নিজেদের প্রকৃত নাম-ঠিকানা তারা তাদের জানায় না। প্রায়শঃক্ষেত্রে কোনও একটা গলির মুখে তারা

ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছে এই বলে যে, অমুক স্থানে অমুক দিন ঐ সময়ে সে তাদের সঙ্গে দেখা করবে। তাদের অজুহাত এই যে অপরিচিত যুবকদের সাথে স্ববাটীর ধারে-কাছে যেতে তাদের যা কিছু আপত্তি।

ধর্মীয় প্রবঞ্চনা

'ধর্মেণ হীনা পশুভি সমানা'—এই শাস্ত্র বাক্যটি মিথ্যা নয়। কিন্তু এই 'ধর্ম' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি? এই ধর্ম শব্দটির প্রকৃত অর্থ যদি ইংরাজি প্রিন্সিপল হয়, তাহলে প্রতিটি পশুর নিজস্ব প্রিন্সিপল আছে। কিন্তু বহু মানুষের মধ্যে উহার অভাব থাকে। কিন্তু অধুনা ধর্ম শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে পথঘাট ও যানবাহনের অভাব ও অসুবিধা ছিল। এজন্য রাষ্ট্রীয় শাসন গ্রামাঞ্চলে ঠিক পৌঁছুতে পারতো না। এই কালে ধর্মের প্রভাব মানুষকে অপরাধবিমুখী করতো। মানুষের চক্ষুকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে কি করে? ধর্মনেতাদের পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত এই উপদেশ বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হতো। ফলে অধিকাংশ প্রজাকুল নিরপরাধ থেকেছে। অবশ্য গ্রামীণ শাসকরা এদেরকে দৈহিক, আর্থিক ও সামাজিক শাস্তির ভয়েও ভীত করে রাখতো। অবিশ্বাসী অপরাধীদের জন্য এই রাষ্ট্রীয় ভয়ের প্রয়োজন হতো। তবে ধর্ম-বিশ্বাসের হানি ও ঈশ্বর ভীতির লোপ অপরাধীর সংখ্যা বাড়ায়। অবশ্য এই সত্য মাত্র অভ্যাস ও দৈব অপরাধী সম্পর্কে প্রযোজ্য। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য। ইংরাজিতে এই ধর্মবিশ্বাসকে টাবুউ [Taboo] বলা হয়।

"আমার মূল্যবান ফলের বাগানের দ্বারদেশে গ্রাম-দেবতার মন্দির

গড়ে দিয়েছি। প্রতি মাসে ওখানে আমি ২৫৲ টাকা প্রণামী দিয়ে থাকি। পরিবর্তে আমাকে দ্বারবান রাখতে হয় না। এতে আমার মাসিক বহু অর্থের সাশ্রয় হয়। দ্বারবানের বদলে ঐ গ্রাম্যদেবী আমার বাগানের ফল রক্ষা করেন। তাঁর বিরাগের ভয়ে কেহ বাগানের ফলের উপর কখনও লোভ করে নি।"

উপরোক্ত সত্য প্রাথমিক অপরাধীদের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয় বটে। কিন্তু উহা সকল প্রকার পেশাদারী প্রকৃত অপরাধীদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। জনসাধারণের অধুনা ধর্ম বিশ্বাসের হানি ঘটেছে। এইজন্য দেব-মন্দির হতে বিগ্রহ ও তাঁর গহনা চুরি হয়ে থাকে। কিন্তু অন্য বহু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আজও দেবতা প্রতিষেধকের কার্য করে। প্রায়ই দেখা যায় শিষ্যরা ভক্তিমান হলেও বহু ধর্মব্যবসায়ীর নিজেদের এতে বিশ্বাস নেই। নিম্নের বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণিত হয়।

"অমুক ঠাকুরবাড়ির বিগ্রহের দেহ হতে বহু অলঙ্কার চুরি যায়। আমি তদন্তে ওখানে গেলে সেবায়েত ভদ্রলোক বললেন,—'গহনাগুলি উদ্ধার করতে না পারলে একটা কাজ করুন। শ্রীমা নিজের গহনা নিজে রক্ষা করতে পারেন নি। এ জন্য প্রণামী এখানে এখন কম পড়ছে। আমি সকলকে বলেছি মা স্বপ্ন দিয়েছেন। এই গহনার অবস্থান আমি পুলিশকে জানিয়েছি। এবার অনুরূপ গহনা গড়িয়ে মা'র গায়ে তুলবো। আপনি শুধু বলবেন যে গহনাগুলি আপনি মা'র প্রত্যাদেশ অনুযায়ী উদ্ধার করে এনেছেন।' ঐ ভদ্রলোকের ভণ্ডামীর কথাগুলি শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তার চাইতে রটানো ভালো যে মা তার ভক্ত চোরকে ঐ গহনা দিয়েছিলেন। কিংবা উনি বীতরাগ হয়ে কিছুদিনের জন্য ঐ বিগ্রহ হতে অন্তর্ধান·

হয়েছেন। মশাই! এইরূপ এক বিশ্বাসযোগ্য স্বপ্ন দেখুন ও গহনা খরিদা বাবদ আপনার অর্থ বাঁচুক।" [পূজারিগণ ও সেবায়েতরা অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে থাকেন।]

বহু জ্যোতিষী আমার কাছে এসে অনুরোধ করে গিয়েছেন—'মশাই! ভক্তদের আমি গুণে বলেছি যে পক্ষকালের মধ্যে পুলিশ অলকায় উদ্ধার করবে। এখন দয়া করে আপনারা চেষ্টা করলে সুনাম রক্ষা হয়।' এই জ্যোতিষিগণ এক প্রকারের ধর্মব্যবসায়ী। কারণ—জ্যোতিষশাস্ত্রাতিরিক্ত তান্ত্রিক সাধনারও এঁরা আশ্রয় নেন। এঁরা নির্বিচারে বিশ্বাসীদের বলে থাকেন যে ওঁরা রাত্রে নরমুণ্ডের সাথে কথা বলেন। কোনও সদুত্তর সাথে সাথে দিতে অক্ষম হলে—ওঁরা বলেন যে মা'কে [ঠাকুরকে] জিজ্ঞাসা করে বলবো। হিমালয়ের উপর এ'দেশের মানুষের অসীম মোহ। তাই এঁরা নিজেদেরকে হিমালয়-প্রত্যাগত বলেন এবং সাংখ্য নবদ্বীপে, বেদান্ত কাশীতে, পুরাণ মিথিলাতে, যোগ কাঞ্চি নগরে ইত্যাদি স্থানে অধ্যয়ন করেছেন ও শিখেছেন বলেন। বহু মূর্খ চতুর ব্যক্তিকে উহা আমি বলতে শুনেছি। রাজা আর এদেশে নেই। কিন্তু—বহু রাজজ্যোতিষী আছেন। নিজেদেরকে পঞ্চম জর্জের কুষ্ঠী বিচারক বলেন, এমন মানুষও আছেন। [এখানে অবশ্য ভালো মন্দ দুই আছে।] এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, তাহলে এতো লোক ওঁদের ওখানে যান কেন? ওঁদের কাছে বিশ্বাসী মানুষরা শুধু আসে। অবিশ্বাসীদের ওঁরা তাঁদের কাছে ঘেঁসতে দেন না। এই বিশ্বাসীরা কিরূপ প্রকৃতির মানুষ তা নিম্নের বিবৃতি হতে বুঝা যাবে।

"আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললাম—না না। মাদুলি আমি দোবো না। ও সব স্বস্ত্যেন শান্তির কাজ ছেড়ে দিয়েছি। যা যা—দূর হ।

আমি যতই তাকে তাড়াতে চাই, সে ততই আমার পা' দুটো জড়িয়ে ধরে। পরিশেষে এমন ভাব দেখাই যেন আমার দয়া হলো। তখন তাকে আমি ২৫৲ টাকা ঠাকুরকে ভোগ দিতে বললাম। সে'ও বুঝলো যে আমি কতো বড়ো নির্লোভ ব্রাহ্মণ ; তাকে আমি বুঝালাম যে ·ার উপকার করার অর্থ আমার নিজের ছয় মাস আয়ুর ক্ষয়।"

বক্তব্য বিষয়টি বুঝতে গেলে পারসেন্টেজ বুঝার প্রয়োজন আছে। যদি ১০০ জন ভক্ত আসে তাহলে ওদের শতকরা কুড়ি জনের উপকার হবে। অবশ্য ঐ সুফল গুরুর দয়া ব্যতিরেকেই হতো। এই বিশ্বাসী লোকরা ৫০৲ টাকা প্রণামী দিলেও ভদ্রলোকের মাসে বহু টাকা লাভ হয়। এরপর ঐ ক'টি ব্যক্তি ও তার পরিজনগণের প্রোপাগাণ্ডাতে সেখানে আরও বহু ব্যক্তি এসে থাকে। একদল ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারায় এবং অন্য দলের বিশ্বাস পাকাপোক্ত হয়। কিংবা ওঁর শিষ্যরা বলবে যে গুরুর বাণী ওঁরা ঠিক বুঝেন নি—তাই। এই সম্পর্কে নিম্নে একটি মুখরোচক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হলো।

"অমুক মা হাইকোর্টের লিস্ট হতে বাদী ও প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করতেন। এর পর তাদের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা করতেন ও বলতেন যে ওঁরা মামলাতে জয়ী হবেন। বাদী ও প্রতিবাদী—উভয়ের মধ্যে একজন মামলাতে জিতবেই। এই জয়ী ব্যক্তি ঐ দিন হতে তাঁর ভক্ত হবেন। এতে আর আশ্চর্য কি আছে !"

এঁদের কাছে দুই প্রকারের লোক এসে থাকে—(১) ভয়াতুর বিপদগ্রস্ত লোক। এরা বিপদ হতে মুক্ত হতে চায়। (২) লোভী সম্পদাভিলাষী মানুষ। এরা স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়। এই লোভ ও ভয় মানুষের বিচারবুদ্ধি হরণ করে ও তাদের মনের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়ে দেয়। ফলে, গুরুদেবের বাক্-প্রয়োগ এদের উপর

কার্যকরী হয়। ভক্তের মুখ দেখে গুরুদেব বুঝেন যে তাঁদের বিপদ কি? অবশ্য তার আগে ভদ্রলোকের পেশা ও স্ত্রী কন্যা পুত্র সম্পর্কে উনি জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এভাবে ঐ ক্ষতি তার ব্যবসায় বা চাকুরি ক্ষেত্রে বা পারিবারিক বিষয়ে তা তাঁরা তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা বিচার করে বুঝতে সক্ষম। বহু ক্ষেত্রে অলীক ও সাজানো শিষ্যরা গুরুর অন্য ভক্তদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। পরীক্ষায় ফেল করে ছাত্ররা টাকা ফেরত চাইলে এঁরা বলেন—তোমরা ভালো করে পড়ো নি কেন? মাদুলি দিলেও তোমাদেরকে পড়তে আমি বারণ করিনি। এঁদের ছল-চাতুরী দক্ষ মনোবিজ্ঞানীদেরও হার মানায়। এঁদের অনেকে তান্ত্রিকাচার্য, জ্যোতিষাচার্য প্রভৃতি নামে পরিচিত হন। কারুর কারুর ঘরে কঙ্কাল মুণ্ডের পঞ্চমুণ্ডের আসন তৈরি থাকে। এভাবে ওঁরা ভক্তদের মনে ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের নামে এবং জাতীয় জীবনে ধর্মের অজুহাতে এক মানুষ অপর মানুষের যত ক্ষতিসাধন করেছে, তত ক্ষতি অপরাধী নামধেয় কোনও ব্যক্তির দ্বারা কখনও সাধিত হয় নি। বর্তমান পরিচ্ছেদে এদেশে ধর্মের নামে সংঘটিত অপরাধসমূহ সম্বন্ধে বলা হবে। ধর্মপ্রাণ ভারতবাসীদের ধর্মের নামে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে; বিবিধ পদ্ধতিতে উহাদের দ্বারা ওই সব অপরাধ সংঘটিত হয়। ঐ সকল পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার কিছু বলা যাক। আলোচ্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবরণটি হ'তে বক্তব্য বিষয়টি সম্যক রূপে বুঝা যাবে। সাধারণতঃ সরলবিশ্বাসী এবং অজ্ঞ গ্রামবাসীদের এই পদ্ধতিতে দুর্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। এই বিবরণটি এই সম্পর্কে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমার তখন বয়স বাইশ কিংবা তেইশ হবে। ঐ সময় আমি

গ্রামের স্কুলে পড়াশুনা করতাম। হঠাৎ একদিন দেখি দলে দলে লোক দীঘির পুব পড়টার দিকে ছুটে চলেছে। শুনলাম প্রকাণ্ড এক সাধু কোথা থেকে এসে সেখানে উদয় হয়েছেন। এরই মধ্যে রটে গিয়েছে যে তিনি একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। সম্প্রতি তিনি কাশী থেকে সেখানে এসেছেন। কাশীর বিশ্বনাথও না'কি শীঘ্রই সেখানে আসবেন। তিনি তাঁর অগ্রদূত মাত্র, ইত্যাদি। কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি শূন্য থেকে নেমে এসেছেন। কেউ কেউ আবার এমনও মনে করেন যে তিনি মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠেছেন। এমনি বিশ্বাস্য এবং অবিশ্বাস্য বহু কাহিনী লোকের মুখে মুখে ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছে। এর পর আর আমি চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। কৌতূহলী হয়ে আমিও সাধু দর্শনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হলাম। অকুস্থলে হাজির হয়ে দেখি যে সাধুবাবা ধ্যানে বসেছেন। তাঁর আসনের সামনেই একটি নাতিউর্ধ্ব ভূখণ্ড। সাধুবাবার নির্দেশমত শিষ্যের দল ব্যোম ব্যোম শব্দে গগন মুখরিত করে চিহ্নিত ভূখণ্ডটির উপর কলসের পর কলস জল ঢালছেন এবং সাধুবাবার শিষ্যদের সঙ্গে ভক্ত ও বিশ্বাসী গ্রামবাসীরাও যোগ দিয়েছে। বহু ব্যক্তিই সেখানে এসে জড় হয়েছেন। সকলের মুখেই সেই এক কথা শুনা যায়। শিবঠাকুর নাকি পাতাল হতে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠবেন। দিনের পর দিন চলে যায়, জল ঢালার কামাই নেই। আমরা হাসি ও উপহাস করি। তবু প্রতিদিন একবার অকুস্থলে বেড়াতে যাই। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমরা লক্ষ্য করি মাটিটা একটু চিড় খেয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই লক্ষ্য করি ধরিত্রী দেবী আরও একটু ফাঁক হলেন। এর পর আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। ভক্তের দল কিন্তু অধিকতর উৎসাহে জল ঢালতে থাকে। আমরা সভয়ে লক্ষ্য করলাম যে শিবঠাকুর ধীরে ধীরে মাথা তুলছেন।

দেখতে দেখতে প্রায় দুই হাত উঁচু কুচকুচে কালো কষ্টি পাথরের একটি শিবলিঙ্গ ধীরে ধীরে মাথা তুলে মর্ত্যে উঠলেন। চক্ষের সামনে শিবঠাকুরকে মাটি ফুঁড়ে উপরে উঠতে দেখে সকলে মোহিত হয়ে গেল। এমন কি, নাস্তিক জমিদার হয়কান্তবাবুর পর্যন্ত সেই একই অবস্থা। সাধুবাবার জন্যে জমিদার তৎক্ষণাৎ সেখানে একটা কুঠি বানিয়ে দিলেন। এর পর হতে দূর দূর গ্রাম হ'তে লোক এসে প্রণামী দিয়ে যায়। গ্রামের স্থানীয় লোক তো অর্থাদি দলে দলে এসে দেয়ই। টাকাকড়ি সোনাদানায় সাধুর পকেট নির্বিবাদে ভর্তি হতে থাকে। মাঝে মাঝে সাধুবাবার উপর ভর হ'লে তিনি তখন নানারূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী বলতে থাকেন। উহার কতক মেলে কতক বা মেলে না। কিন্তু তাহলেও লোকে তাঁকে বিশ্বাসই করে যায়। কোনও কথা না মিললে লোকে বলে যে শুনতে তাহলে ভুল হয়েছে। উনি যা বলেছেন তার প্রকৃত অর্থ হবে এইরূপ, ইত্যাদি। সাধুবাবার দিনগুলো শ্রীশ্রীদেবাদিদেবের কৃপায় ভালই চলছিল। কিন্তু বাদ সাধলেন ভগবান দেবাদিদেব শ্রীশ্রীমহাদেব নিজেই। হঠাৎ একদিন এই সাধুর সন্ধানে গ্রামে পুলিশের আবির্ভাব হ'ল। শুনা গেল যে সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার আসামী। দারোগার আদেশে সিপাইরা শিবঠাকুরকে উঠিয়ে ফেললে। এরপর তারা মাটির নীচে অনেকখানি খুঁড়ে ফেলল। মাটির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল এক পিপে জলে ভিজে ফুলে উঠা ছোলা। এই ছোলার দানাগুলার উপরই এ শিবটা বসানো ছিল। আসলে ব্যাপারটি হয়েছিল এইরূপ: সশিষ্য সাধুবাবা রাত্রিযোগে শুখ্‌না ছোলা ভর্তি একটা পিপে মাটির তলায় পুঁতে রেখে তার ঠিক উপরেই শিবটা বসিয়ে রেখেছিলেন। শিবের মাথাটা শুখ্‌না মাটি ও ঘাসের চাপড়া দিয়ে ঢেকে দিয়ে রাত্রিযোগে তাঁরা সরে পড়েন। ক্রমাগত জল ঢালায় ফলে

ফাঁপা মাটির মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নীচে নেমে পিপের ভিতরকার শুখ্‌না ছোলাগুলোকে ভিজিয়ে দিয়ে সেগুলাকে ফুলিয়ে দেয়। এব ফলে শিবঠাকুরও ধীরে ধীরে উপর দিকে ঠেলে উঠে ভূপৃষ্ঠে উদয় হন। মহাদেবের হঠাৎ আবির্ভাবের মূল কারণই ছিল এইরূপ। পুলিশ সাধু এবং তাঁর শিব, উভয়কে নিয়েই অজ্ঞ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস না ভাঙ্গিয়েই গ্রাম পরিত্যাগ করেন। তাই তারা এখনও বিশ্বাস করে মহাদেব ঠিকই এসেছিলেন। কিন্তু জমিদারের পাপে তিনি সেখান হতে অন্তর্ধান হয়েছেন। যে দিনটিতে প্রথম শিবঠাকুর ওখানে উঠেছিলেন, প্রতি বৎসর সেই দিনটায় ঐ স্থানে গাঁয়ের লোক জড হয়ে আজও জল ঢালে। পরবর্তীকালে সেইখানে সত্যিকার একটি শিবও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

গ্রামবাসীদের এবংবিধ অন্ধ-বিশ্বাসের স্থযোগ নিয়ে ভণ্ড তপস্বীরা কিরূপ নৃশংসভাবে তাদের ঠকিয়ে থাকে তা শহরবাসীদের কল্পনারও বাইরে। এর কারণ, ধর্ম মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অপহরণ করে সময় সময় তাকে অমানুষ করে তুলে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা অপহরণ তার ঐশ্বর্য অপহরণ অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর। চিন্তাশীল ও বিদ্বান্‌ ব্যক্তিমাত্রই এ কথা স্বীকার করবেন। সাধারণতঃ দেখা গেছে যে নাস্তিক ভাবাপন্ন বা কম ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরাই এই সকল কপট সাধুদের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এই কারণে আমি মনে করি যে, ধর্মকে আজ বিজ্ঞান ও যুক্তি এবং স্নায়ের কাঠামোতে ফেলে জাতির কল্যাণের জন্যে তাকে নূতন করে রূপ দেবার প্রয়োজন হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশগুলির দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি আমরা উপলব্ধি করতে পারব। মানবতার দিক হ'তে বিবেচনা করলে দেশপ্রেম আদর্শের ক্ষেত্রে পুতুল পূজা মাত্র। অনুরূপ ভাবে জাতির অগ্রগতিকে

পথে ধর্ম মধ্য-যুগের একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার হলেও আধুনিক যুগে উহা একেবারে অচল; এমন কি, ক্ষেত্র বিশেষে উহা ক্ষতিকরও বটে। দেশপ্রেমের নামে ভণ্ড রাষ্ট্রনায়কেরা পৃথিবীর মানুষের অমানুষিক ক্ষতি করে এসেছে। কিন্তু চুরি-ডাকাতির দ্বারা তদনুরূপ ক্ষতি পৃথিবীর হয় নি। অন্ধ ও উৎকট ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কদের প্রয়োজন হলে যেমন ছলের অভাব হয় না, স্বার্থান্ধ ধর্মব্যবসায়ীদেরও তেমনি কখনও কৌশলের অভাব হয় না। সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন উভয় স্তরেই আমরা ভণ্ড তপস্বীদের সন্ধান পেয়ে থাকি। এইসব ভণ্ড সাধুরা মুখে বিজ্ঞানের নিন্দা করলেও কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিয়ে থাকেন। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে কিরূপ পদ্ধতিতে তাঁরা লোক ঠকিয়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে নিম্নে কোনও এক ভণ্ড তপস্বীর বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতিটি এ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"সূর্যদেব তখন প্রচণ্ড প্রতাপে ঠিক মাথার উপর বিরাজ করছিলেন। ঠিক সেই শুভ মুহূর্তটিতে শিষ্যকে আমি দীক্ষা দিতে মনস্থ করলাম। শিষ্যটিকে আমি মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে মুখ ক'রে করজোড়ে দাঁড়াতে বললাম এবং আমি দাঁড়ালাম সূর্যের দিকে পিছন ফিরে। এর পর আমি শিষ্যের হাতে ধান ও দূর্বা দিয়ে সূর্যদেবের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে সূর্যস্তব পাঠ করতে বললাম। জলন্ত সূর্যদেবের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে শিষ্য স্তব পাঠ করতে লাগল, "জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্—" ইত্যাদি। এর কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে আমি আমার দিকে তাকাতে বললাম। স্বাভাবিক কারণে শিষ্য আমার কথা শুনতে পেলেও আমাকে সে দেখতে পেল না। সে মনে করল আমি অন্তর্ধান হয়ে গেছি। কেঁদে উঠে শিষ্য আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'গুরুদেব,

গুরুদেব, দেখা দাও। এখুনি কোথা গেলে তুমি?' উত্তরে আমি তাকে অভয় দিয়ে জানালাম, 'ভয় নেই বৎস! আমি এইখানে তোমার নিকটেই আছি। বৎস! তুমি শীঘ্রই আমাকে দেখতে পাবে।' কয়েক মিনিট পরেই শিষ্যের চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হ'ল এবং আমিও পুনরায় প্রকট হয়ে উঠলাম এবং এই সুযোগে আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, 'বৎস! তোমার প্রথম দীক্ষা শেষ হ'ল। এইবার তোমার দ্বিতীয় দীক্ষা শুরু হবে।' প্রথম দীক্ষার বিষয় বলা হলো। এইবার দ্বিতীয় দীক্ষার কথা বলবো। দ্বিতীয় দীক্ষার সময় আমি সারা অঙ্গে সাদা বিভূতি মেখে [উদ্দেশ্য—দেহটি শ্বেতবর্ণের করা] শিষ্যের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনে রাখলাম একটি লাল রঙের কাঁচের পাত্রে লাল রঙ করা গঙ্গোদকমন্ত্রা জল। এর পর শিষ্যকে আমি আদেশ করলাম, 'বৎস! এবার স্থির দৃষ্টিতে লাল পাত্রটির দিকে তাকিয়ে থাক।' শিষ্য আমার আদেশ প্রতিপালন করল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর আমি শিষ্যকে আমার মুখের পানে তাকাতে বললাম। শিষ্য আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি দেখছো, বৎস? আমার সারা অঙ্গে কি তুমি সবুজ আভা দেখতে পাও?' এই প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য আমাকে বলল, 'হাঁ গুরুদেব! আপনি সবুজ হয়ে উঠেছেন।' উত্তরে আমি তাকে জানালাম, 'হাঁ বৎস! এইটেই পৃথিবীর আসল রূপ।' এর পর আমার সাকরেদরা এসে লাল পাত্রটি সরিয়ে নিয়ে আমার নির্দেশমত সেখানে একটা পীতোদক ভরা পীত বর্ণের কাঁচপাত্র রেখে যায়। আমি পূর্বের ন্যায় শিষ্যকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাত্রটির দিকে চেয়ে থাকতে বলি। এর পর আমার আদেশ মত চোখ তুলে আমার দিকে চেয়ে শিষ্য দেখতে পায় আমি নীল হয়ে গেছি। আমি তখন মহা আনন্দে শিষ্যকে জানালাম, 'বৎস! এইটেই ঈশ্বরের আসল

রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন এই নীল বর্ণের।' এই সব অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করে শিষ্য আমার অভিভূত হয়ে পড়ে এবং আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠে বলে, 'প্রভু! তোমার অসীম দয়া এই ভক্তের উপর। এই কি সেই বিশ্বরূপ? তুমি কি তা হলে—।' এর পর আমি তাকে আমাকে তার সর্বস্ব সমর্পণ করতে আদেশ দিই। অর্থাৎ কি'না গুরুর পাদপদ্মে, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত এবং নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে তাকে আমি উপদেশ দিই। এইভাবে শিষ্যকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে তার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়ে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ মঠের নামে আত্মসাৎ করে আমি সরে পড়ি।"

এইবার এই বিশেষ পদ্ধতিটির বৈজ্ঞানিক দিকটা আলোচনা করা যাক। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেরই জানা আছে যে লাল রঙের উল্টা রঙ সবুজ এবং হরিদ্রা বা পীত রঙের উল্টা রঙ নীল। ইহাদের যথাক্রমে রেড্-গ্রীন প্রসেস্ এবং ইয়োলো-ব্লু প্রসেস্ বলা হয়। মস্তকের মধ্যকার ঝিল্লীর [মগজ] মধ্যে এইগুলি অবস্থান করে। দুই ইঞ্চি স্কোয়ার পরিমিত একটি লাল চৌকা কাগজের প্রতি কেহ যদি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি রেখে পরে হঠাৎ সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায় তা হলে সে সবুজ রঙের অনুরূপ পরিমাপের ছাপ দেওয়ালের উপর দেখতে পাবে। কারণ লাল রঙের উল্টা রং সবুজ। এই একই কারণে পীত রঙের কোনও একটি বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেওয়ালের দিকে হঠাৎ তাকালে সেখানে দৃষ্ট হবে নীল রঙের ছাপ। কারণ এই যে, পীতের উল্টা রঙ নীল। এইভাবে হলদের দিকে তাকালে নীল, নীলের দিকে তাকালে হলদে মানুষ দেখে থাকে। মানুষের মস্তিকের মধ্যকার রেড্-গ্রীন প্রসেস্ [লাল-সবুজ দণ্ড] এবং ইয়োলো-ব্লু প্রসেস্ [পীত-নীল দণ্ড] এইরূপ ব্যবস্থার জন্যে দায়ী। ইহা একটি নিছক বৈজ্ঞানিক ব্যাপার মাত্র। এর

মধ্যে বাহাদুরির বা কেরামতির কোনও কিছুই নেই। এই কারণেই সাধুবাবা একবার সবুজ এবং একবার নীলবর্ণের হ'তে পেরেছিলেন।

সূর্যের খররশ্মির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরালেই মানুষ কিছুক্ষণের জন্য আঁধার দেখে। এই সময়ের মধ্যে সামনে কোনও মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে এবং সে নড়াচড়া না করে স্থিরভাবে থাকলে তাকে [সেই ব্যক্তিকে] কিছুক্ষণের মত সে দেখতে পায় না। সূর্যের প্রখর রশ্মি চক্ষুমণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় যে মানুষ তার চক্ষু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় না আসা পর্যন্ত সামনের কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে সে আর দেখে না। এই কারণেই সাধুবাবা কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্ধান হয়ে শিষ্যকে চমৎকৃত করতে পেরেছিলেন।

এই সকল বিজ্ঞ ভণ্ড সাধুরাই যে এইভাবে লোক ঠকিয়ে থাকে তা নয়। অজ্ঞ গ্রাম্য সাধুরাও লোক ঠকাবার জন্য এইরূপ ভেল্কিবাজির সাহায্য লন। নিম্ন বঙ্গের ব্যাধজাতি, পাটনার যদুয়া ব্রাহ্মণ, যোধপুর এবং উদয়পুরের বৈদ মুসলমান নামধারী ভ্রাম্যমাণ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির ঠগীরা প্রায়ই এইভাবে গ্রাম্য লোকদের ঠকিয়ে থাকে। এই সকল দুর্বৃত্তরা যোগী ও সাধুর বেশে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করে শিষ্য সংগ্রহ করেন। এর পর তাঁরা উপরি উক্ত উপায়ে নিজেদের অন্তর্ধান করেন। তাঁরা কখনও বা শিষ্যদের রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে মা লক্ষ্মী * দেখান। কখনও বা হয়ত তাঁরা হাত সাফাইএর

---

*সাধুবাবারই এক সাকরেদ লক্ষ্মীমাতা সেজে জঙ্গলের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এবং জঙ্গলের মধ্যে মাতৃ দর্শনের ব্যবস্থা হয়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়া সাধুবাবার সাকরেদদের পূর্বগামী একটা দল, চাষী ও ব্যবসায়ীর বেশে গ্রামের মধ্যে ঘুরাফিরা করে তথ্যাদি সংগ্রহ করে সাধু-বাবাকে পূর্ব হতেই তা জানিয়ে দেয়; এতে করে সাধুবাবার ভবিষ্যবাণী করার ও হাত দেখার সবিশেষ সুবিধে হয়।

সাহায্যে পিতলকে সোনা বানিয়ে গ্রামবাসীদের মোহিত করে তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। তারপর এঁরা লোকেদের জানান তাঁরা রুপা বা সোনাকে পূজার্চনা ও প্রতিক্রিয়াদির দ্বারা দ্বিগুণ ক'রে দিয়ে লোকের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্ষম। সংসারে সকলেই চালাক লোক নয়। তাদের মধ্যে বোকা লোকও থাকে। কয়েকজন বোকা গ্রামবাসী সাধুর কথা বিশ্বাস করে এবং তাদের যাবতীয় সঞ্চিত সোনা রুপা সাধুবাবার কাছে গোপনে এনে দেয়। সাধুবাবা তখন এই রুপার ও সোনার অলঙ্কারাদি একটা মাটির তালের মধ্যে পুরে মৃত্তিকার তলায় প্রোথিত করেন এবং এরপর ওর উপরকার সেই ভূমিখণ্ডের উপর পূজা হোম যাগ যজ্ঞ চলতে থাকে। এদিকে সাধুবাবাও অলঙ্কার কয়টি গোপনে বার করে নেবার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা চরণামৃতের নামে শিষ্যদের সোমরস [সিদ্ধি, ভাঙ বা মদ] খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। একদিন এ বিষয়ে সুযোগও মিলে যায়। সাধুবাবা তৎক্ষণাৎ অলঙ্কার-গুলি মৃত্তিকার তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এক বিশ্বাসী চেলার মারফৎ সরিয়ে দেন। এদিকে যাগ-যজ্ঞ কিন্তু সমানভাবেই চলতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সাধুবাবার ষোড়শোপচারে পূজাও। এর দুই দিন পরে সাধুবাবা শিষ্যকে জানান যে, সোনা এবং রুপা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে, তবে এই দ্বিগুণ হওয়া অলঙ্কার বা সোনা সাত দিন পরে সে যেন উঠায়। এর অন্যথা করলে তাদের সর্বনাশ হতে পারে। এর পর শিষ্যকে আরও সাত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে উপদেশ দিয়ে সাধুবাবা দেবীর প্রত্যাদেশে সদলে দেশ ত্যাগ করেন। এই নয় দিনের মধ্যে সাধুবাবা কোনও এক দূর দেশে সরে এসে একান্তভাবে নিরাপদ হ'তে সক্ষম হন। এই নয় দিন পর শিষ্যরা সাধুবাবার উপদেশ মত মাটি খুঁড়ে দেখে যে তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাবতীয় অর্থাদি

অপহৃত হয়েছে। কোনও ক্ষেত্রে এইসব সাধুবাবারা হাত সাফাই-এর [Sleight of hands] সাহায্যে প্রথম চোটেই মূল্যবান অলঙ্কারাদি সরিয়ে ফেলে তৎপরিবর্তে পিতলের অনুরূপ অলঙ্কারাদি শিষ্যদের চোখের সামনেই মৃত্তিকা তলে প্রোথিত করে দেন। লোক ঠকানোর এই বিশেষ পদ্ধতির দুর্বৃত্তরা নাম দিয়েছে, "সোনাখেল"। এই সব অপরাধী ঠগীদেরও বলা হয় সোনাখেল-ঠগী।

[সাধু এবং গুরুজন সাধারণতঃ চারি প্রকারের হয়ে থাকে—(১) ভগবৎ-বিশ্বাসী ও সৎ, (২) প্রবঞ্চক বা অলস, (৩) নিউরেটিক এবং হিস্ট্রিয়া-গ্রস্ত, (৪) ধর্ম-ব্যবসায়ী মানুষ। বহু গুরু ইমপোটেন্ট্ হয়ে থাকেন। এঁদের মধ্যে পারভার্সিটি অধিক থাকে। এঁরা নারী-শিষ্যাদের দ্বারা গা-হাত-পা টিপিয়ে এবং তাদেরকে কিছু কিছু আদর করে যৌন তৃপ্তি পান। এঁদের যৌন-সম্মিলন [sex-satisfaction] হয় না বটে, কিন্তু যৌন-উপশম দ্বারা [sublimation] এঁরা প্রচুর আনন্দ পান। অন্যদিকে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুরু সংসর্গে কাটালে নারীদের অপবাদের ভয় নেই।]

অযৌনজ অপরাধ সকলের ন্যায় যৌনজ অপরাধ সকলও অনেক সময় ধর্মের পোশাকে সংঘটিত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গুরু নামধেয় দুর্বৃত্তরাই এই সকল অপকর্মের হোতা হয়ে থাকেন। ভাড়াটে গুণ্ডা বা ভাড়াটে সৈন্য নিয়োগের পদ্ধতি পৃথিবীতে আবহমানকাল হ'তে প্রচলিত আছে। অনুরূপ ভাবে অর্থ দিয়ে পুরোহিত নিযুক্ত ক'রে ঈশ্বরের কাছে আবেদন-নিবেদন পৌছানোর পদ্ধতিও এ পৃথিবীতে দেখা যায়। এ দেশের অনেকেরই ধারণা পুরোহিত এবং গুরুরা উকিলের ন্যায় ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের দরবারে ওকালতি না করলে ভক্তদের সকল আবেদন ঈশ্বরের দরবারে হয়তো সঠিক ভাবে পৌছাবে না।

পুরোহিতগণ অনেকটা উকিল বা পেশকারের পর্যায়ে পড়েন। গুরুরা কিন্তু আরও উর্ধ্বে স্থান পান। শেষ বরাবর তাঁরা ঈশ্বরের একজন সোল এজেণ্ট হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের সুপারিশ এবং সাহায্য ব্যতিরেকে যেন ভগবানের ত্রিসীমানায় পৌঁছানও অসম্ভব। এই সম্বন্ধে আমি এক গুরু নামধেয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের তো সম্পর্ক পিতাপুত্রের। আমরা নিজেরাই তো সরল ভাষায় তাঁকে আমাদের নিবেদন জানাতে পারি। এর মধ্যে আপনাদের সাহায্যের কি কোনও প্রয়োজন আছে?' গুরু নামধেয় ভদ্রলোকটি নির্বিকার চিত্তে উত্তর দেন, 'দেখ, গুরু হচ্ছে একটা দর্পণ, বা আরশি। গুরু রূপ দর্পণের সাহায্য ব্যতিরেকে ভগবৎ সন্দর্শন হয় না।' এর পর গুরুঠাকুর আমাকে আরও বোঝান যে গুরু হওয়া এক জন্মের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় না। এর জন্যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র উপযুক্ত ভক্তদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার জন্যে গুরুদেব পৃথিবীতে এসেছেন। পৃথিবীটা না'কি সবই মায়া এবং এই মায়াজাল ছিন্ন করে একমাত্র তিনিই ভক্তদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে সক্ষম। গুরুঠাকুর অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ এমনি সব বাক্যজাল সৃষ্টি করতে শুরু করলেন। এতে ক'রে আমার মত লোকও কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে উঠে। সত্য কথা বলতে গেলে গুরুদেবের মুখনিঃসৃত 'বিরাট ব্যোম' রূপ অর্থহীন অথচ অর্থপূর্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থটি আজও পর্যন্ত আমার বোধগম্য হয় নি।

চিত্ত প্রস্তুতির [Predisposition] কারণেই এইরূপ সম্ভব হয়। এই চিত্তপ্রস্তুতির কারণে ধর্মের নামে সহজেই আমরা উতলা হ'য়ে উঠে আমাদের বিবেচনা-শক্তি হারিয়ে ফেলি। আবাল্য বাক্-প্রয়োগ [suggestion] এবং ধর্ম, সংস্কার ও কতকটা জাতীয় অভ্যাস এই জন্যে দায়ী।

এদেশের ভগবৎ-বিশ্বাসী লোকদের [বিশেষ ক'রে মেয়েদের] সব চেয়ে বড শত্রু ছোক্‌রা গুরু। গুরু অনেক প্রকারের হয়, যথা— উদাসী, বিদেশী, [আরণ্য] গৃহী, সস্ত্রীক গুরু, ছোকরা গুরু ইত্যাদি। এমন বহু গুরু সস্ত্রীক গুরুগিরি করেন। অর্থাৎ কি'না খোকা মহারাজ [গুরুপুত্র] বিলাত যাবেন, টাকা যোগাবেন শিষ্যরা। খুকী মাতার [গুরুকন্যা] বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যেরা বহন করবেন। কোনও এক সস্ত্রীক গুরু প্রতি বৎসরই সপরিবারে প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করে শিষ্যদের অর্থে মধুপুরে যেতেন। এই সম্বন্ধে আমি তাঁর কোনও এক অন্ধ-ভক্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! উনি সাধু হবেন তো অরণ্যে না গিয়ে প্রতি বৎসর উনি মধুপুরে যান কেন? কামিনী কাঞ্চনই বা উনি ত্যাগ করেন না কেন? প্রতি বৎসরই শহরে ওঁর একটা ক'রে বাড়ি উঠছে। এত অর্থের বা ওঁর প্রয়োজন কি? এর কি কোনও সদুত্তর আপনারা দিতে পারেন?' এই সব প্রশ্নে ভক্ত শিষ্যটি কিছুমাত্র বিব্রত বোধ না করে এইরূপ উত্তর দেন, 'ওঃ, এই কথা? গুরুদেবকে আমরা এ কথা কি জিজ্ঞাসা করিনি? আমরা তাঁকে এসব জিজ্ঞাসা করেছি বই কি? গুরুদেব কি বলেন জানেন? গুরুদেব আমাদের বুঝিয়ে বললেন, 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগ। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা নিজে ভোগ করে তিনি ভক্তদের তা থেকে মুক্ত করতে চান।' অপর আর এক ভক্ত শিষ্যকে আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করি, 'আচ্ছা! গুরুঠাকুর শুনেছি মানুষের ব্যাধি নিরাময় করতে সক্ষম। তাহলে সেবার ওঁর নিজের নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগ হল কেন? ওঁর জন্যে বড় বড় ডাক্তার-বৈদ্যই বা ডাকতে হয় কেন?' উত্তরে শিষ্য মশাই আমাকে এই বিষয় বুঝিয়ে বলেছিলেন, 'রোগটা আসলে হবার কথা ছিল গুরুঠাকুরের কোনও এক শিষ্যের। ভক্ত শিষ্যের সেই কাল-ব্যাধি

গুরুঠাকুর তাঁর নিজ দেহে তুলে নিয়ে তাঁর সেই ভক্ত শিষ্যকে তিনি এ যাত্রা রক্ষা করলেন মাত্র।'

পুনঃ পুনঃ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা মানুষকে কতদূর নির্বোধ এবং নির্বাক করে তুলতে তাঁরা সক্ষম তা উপরি উক্ত উক্তিগুলি অনুধাবন করলে সহজেই বুঝা যায়। অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসী লোকেদের এই সকল দুর্বলতার সুযোগ বিজ্ঞ দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকেন। এই সম্বন্ধে জনৈক ছোকরা গুরুর একটি চমকপ্রদ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। বিবৃতিটি পাঠ করলে আলোচ্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গুরুগিরি করতে হ'লে দুইটি জিনিস জানা দরকার, যথা : মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি, আর কিছুটা ম্যাজিক। এই দুইটি জিনিসের মার প্যাচে আমি একটি সদ্য বিবাহিত তরুণ শিষ্যকে আয়ত্তে আনি। আমার উপদেশে [আদেশে] সে অচিরে তার পিতামাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি আত্মীয়দের বিদেয় দেয়। তার স্ত্রীটি ছিল অপূর্ব সুন্দরী। প্রথমে সে কিছুতেই আমার ভক্ত হ'তে চায় নি। এতে বিরক্ত হয়ে আমি শিষ্যটিকে ব্রহ্মচর্য পালনে আদেশ দিলাম। এমন কি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা আমি তাকে তার স্ত্রীর উপর নানারূপ অত্যাচার করতে প্ররোচিত করি। এইরূপ কার্যের মধ্যে আমার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য, স্বামীর উপর তার বিরক্তি আনা। স্বামী-সাহচর্য হ'তে তাকে বঞ্চিত করে তার যৌনবোধকে তীক্ষ্ণ করা। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, গোপনে আমি আমার শিষ্যকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেও প্রকাশ্যে কিন্তু আমি তাকে তার স্বামীর অত্যাচার হ'তে ইচ্ছা ক'রেই রক্ষা করতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল—তার মনটাকে স্বামীর বিরুদ্ধে বিরূপ করে আমার দিকে টেনে আনা। এর পর আমি সুযোগের অপেক্ষায় থাকি। শিষ্যকে আমি সারা রাত জাগিয়ে রেখে ধর্মকথা

শুনাতাম। সারা রাত জাগিয়ে রেখে তাকে দিনের বেলায় আমি অফিসে পাঠাতাম। সারাদিন আমি ঘুমালেও শিষ্যকে কিন্তু ছুটির দিনেও আমি ঘুমাতে দিই নি। ঘুমাবার সে কোনও সুযোগই পেত না। রাত্রে চরণামৃতের নামে তাকে আমি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়েছি। এ ছাড়া তাকে কখনও পরলোকের ভয় দেখিয়ে, কখনও বা তাকে নানারূপ অশুভ দুর্ঘটনার সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে সর্ব সময়ই আমি তার মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলতাম। ঘুমের অভাবে তার মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে আসত। তার উপর চরণামৃতের নামে আরক পান আছে। এইরূপ ভাবে অচিরেই তাকে আমি পাগল বিশেষে পরিণত করি। এ অবস্থাতে দেখেও সে দেখে না, বুঝেও সে বুঝতে পারে না। এদিকে বাড়িতে তখন আমি একমাত্র পুরুষ। স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি একেবারে বিষিয়ে উঠেছে। তার উপর তার আর কোনও সহচর বা সম্বল নেই। একটি পয়সার দরকার হলে তাকে তা আমার কাছেই চাইতে হয়। ওদিকে স্বামীর কঠোর ব্রহ্মচর্য। স্বামীর এইরূপ ব্যবহারের জন্যে তার মন প্রতিশোধ নিতে চাইছে। ঠিক এই সময় আমি তার মুখে সুধার পাত্র তুলে ধরলাম। হতভাগা শিষ্য এ'সব বুঝেও বুঝল না, চোখে দেখেও সে তা দেখল না। বরং অপকার্যে প্রকারান্তরে সে আমার সহায়তাই করল। কারণ তখনও পর্যন্ত সে আমাকে ঈশ্বরের অবতার রূপেই জ্ঞান করছে। পরিশেষে কিন্তু শিষ্যের চেয়ে শিষ্যাই আমার বেশি ভক্ত হয়ে উঠে।"

এইরূপ গুরুগিরি অবশ্য বেশি দিন চলে নি। মেয়েটির বাপ এবং ভাই খবর পেয়ে মেয়েটিকে জোর করে নিয়ে যায়। পাড়ার লোকেরা বাড়ি ঢুকে গুরুকে মারধর ক'রে বার করে দেয়! শিষ্য মশাই দোতলা থেকে আস্ফালন করলেও গুরুরক্ষায় তিনি অপারক হন। এর পর

শিষ্যমশাই ধীরে ধীরে সেরে উঠেন। পূর্বের কথা স্মরণ করে তিনি এখন বিশেষ লজ্জিত। হঠাৎ সেরে উঠার কারণ সম্বন্ধে তিনি আমার নিকট নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন।

"চোখের সামনে দেখতে পেলাম যে, শ্রীশ্রীভগবান নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারলেন না। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এত সত্ত্বেও আমি যীশুর কাহিনী স্মরণ করে মনকে সুস্থির করি। দুই দিন ও দুই রাত্রি আমি ঘুমালাম এবং কাঁদলাম। ঘুম ভাঙার পর বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র, হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, নিচের ভাড়াটিয়াটা অকথ্য ভাষায় আমায় গাল দিচ্ছে, 'হারামজাদা! নেমে আয় দেখি। তোর জন্যেই তো আমার এই সর্বনাশ হ'ল। তুই-তো জোচ্চরটাকে সাধু বলে আমায় তার শিষ্য করিয়েছিলি।' ভদ্রলোকের কথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মাসখানেক আগে সে গুরুদেবের কাছে এসে স্বেচ্ছায় তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সে আমার চেয়েও তাঁর বেশি ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তার ভক্তি দেখে আমার হিংসা হ'ত, কিন্তু আজ তার এ কি পরিবর্তন! তবে কি—। আমার মনে সন্দেহ জাগাতে, আমি তাকে বলি, 'ওপরে আসুন না মশাই! যা আপনার বলবার আছে তা ওপরে এসে বলুন। খামকা গাল পাড়েন কেন?' আমার অনুরোধে লোকটি উপরে উঠে এসে আমাকে বললে, 'শুনুন তবে বলি সব কথা। গুরুর নির্দেশ মত দরজা বন্ধ করে আমি পূজা করছিলাম। হঠাৎ কোনও এক ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় গুরুদেবের বাক্সটা খুলে ফেলি। বাক্সের ভিতরের কাগজপত্র থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তিনি একজন ঠগ্। আমাকে, আপনাকে এবং আরও অনেককে তিনি ঠকিয়েছেন।' আমি সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠার পর ভদ্রলোক আমাকে জানান যে, জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে আমাকে রক্ষা করার জন্যেই তিনি

ঐ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে সেদিন তিনি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাকে এবং আমার গুরুদেবকে গাল দিচ্ছিলেন। আমারই মত একজন গুরুভক্তকে গুরুনিন্দা করতে শুনেই আমি সত্বর নিরাময় হই।"

এই গুরুটি আরও অনেক শিষ্য-পত্নীর অনুরূপ ভাবে সর্বনাশ করেছেন। এইরূপ এক শিষ্য-পত্নীকে আমি জানতাম। অনুযোগ করাতে তিনি আমাকে জানান, 'দেখুন স্বামীর মূর্খতা ও অত্যাচারের জন্যে তাঁর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই আমি গুরুদেবকে দেহ দান করি।' উত্তরে আমি তাঁকে এইরূপ উপদেশ দিই, 'তা বোন্! বেশ করেছ, লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু যা করেছ তা করেছ। এখন আর তা ক'রো না। আর যা বলেছো তা আমাকে বলেছ। আর কাউকে এ কথা বল না। কারো কাছে এ কথা স্বীকার করতে নেই। জানতে পারলেই এটা মস্ত দোষ হতো। কিন্তু তা না জানতে পারলে দোষ নেই। মানুষ মাত্রেরই ভুল-চুক হয়ে থাকে। তোমার স্বামী ছিলেন তখন একজন রোগী। কোনও রোগীর উপর রাগতে নেই। এখন তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। এইবার একনিষ্ঠ হয়ে ঘরকন্না কর। পূর্বের ঘটনাগুলিকে দুঃস্বপ্নের মত উপেক্ষা করে সুখী হও। এই আমার কামনা ও আশীর্বাদ।'

এই সকল ছোকরা গুরু হ'তে পূর্বাহ্লেই সাবধান হওয়া ভাল। এমন অনেক দুর্বৃত্ত গুরু আছেন, যাঁরা শিষ্যদের বিশ্বাস করান যে, তিনি ভগবান এবং শিষ্যা ও শিষ্য উভয়েরই দেহ ও মনের অধিকারী। শিষ্যার যৌন-সংযম পরীক্ষার ভান করেও তাঁরা অগ্রসর হন। এইরূপ এক ছোকরা গুরু কোনও এক মহিলাকে বুঝান যে, তিনি [গুরু] সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তাঁর [শিষ্যার] দুই [বয়স্থা] কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর

অংশ মাত্র। প্রতি দিন গভীর রাত্রে তিনি রূপার বাঁশী নিয়ে কন্যাদের সমভিব্যাহারে নৃত্য করতেন। এইরূপ অবস্থায় গুরুসেবার দ্বারা কন্যা বিশেষের সন্তান সম্ভাবনা হওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এই মনোরোগীর আত্মীয়দের এবং পড়শীদের এই সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

উপরি উল্লিখিত ছোকরা গুরু ছাড়া আর একপ্রকার ছোকরা গুরু দেখা যায়। এঁরা ভান করেন যে, কোনও এক দেবতা তাঁর উপর ভর করেছেন এবং এই ভাবে তাঁরা লোকচক্ষে হঠাৎ একদিন দেবতা হয়ে উঠেন। এইরূপ প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। এদেশের অধিকাংশ লোকই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একেশ্বরবাদী হলেও বহুদেবদেবীতে বিশ্বাসী ব্যক্তিরও এদেশে অভাব নেই। অনেকে আবার এই সকল দেব বা দেবীকে একই ঈশ্বরের এক-একটি রূপ বা অংশ রূপে কল্পনা ক'রে থাকেন। এই সকল দেব বা দেবীর [কিংবা খোদ্ ঈশ্বরের] নামে দুর্বৃত্তরা কিরূপ প্রণালীতে ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে বুঝা যাবে।

"সাধারণতঃ ছেলে-ছোকরারা হঠাৎ গুরু বা সাধু হ'য়ে উঠলে প্রাচীন লোকেরা তাদের আদপেই আমল দেন না। অথচ এ সম্বন্ধে প্রবীণরাই একমাত্র সমঝদার। এদের মস্তিষ্ক এই সময়ে একটি পাকা রিসিভারের মত হয়ে উঠে। এই কারণে এদের যা তা বিশ্বাস করানও সহজ হয়। বহু বৃদ্ধাদের সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। পরলোকের পথে এগিয়ে এসে মৃত্যুবিশ্বাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মৃত্যুভয় অতিষ্ঠ ক'রে তুলে। পিছনের জীবন-ইতিহাস পর্যালোচনা করে এঁরা কোনও রূপ পাথেয়র সন্ধান পান না। এর ফলে হঠাৎ এঁরা পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন। জীবনব্যাপী অতৃপ্ত বাসনার কারণে এবং আত্মপ্রবঞ্চনার

ফলে তাঁরা প্রায়ই স্নায়বিক রোগে ভুগে থাকেন। এইরূপ স্নায়বিক রোগের সহিত সন্নিবেশিত থাকে কুসংস্কার এবং অজ্ঞতা। পরলোকের চিন্তা তাঁদের এই সময় অত্যন্ত রূপ উদ্বিগ্ন করে তুলে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের এই দুর্বলতা আমি বিশেষরূপে লক্ষ্য করি এবং তাদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে আমি মনস্থ করি।

কিন্তু আমি স্বল্প শিক্ষিত যুবক মাত্র। আমার অমৃতবাণী কে বিশ্বাস করবে? অনেক ভেবেচিন্তে আমি একটা মতলব ঠিক করে ফেলি। একদিন ঠাকুর ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমি বিভোর হয়ে কেঁদে উঠি এবং তার অব্যবহিত পরেই আমি অজ্ঞান হয়ে ভূমির উপর লুটিয়ে পড়ি। আমার মা, পিসিমা ও ঠাকুমা নিকটেই ছিলেন। আমাকে এই ভাবে পড়ে যেতে দেখে তাঁরা তো ছুটে এলেনই, তা ছাড়া পাড়াপড়শীদেরও অনেকের সেখানে আগমন হ'ল। কিছুক্ষণ পরে আমি উঠে ব'সে চোখ পাকিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মা, মা, জানো? জানো, আমি কে?' ইতিমধ্যে পাশের বাড়ি থেকে কাকা-কাকীমাও সেখানে এসে গেছেন। নানা লোকে আমাকে প্রশ্ন করলেও আমি কারও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিই না। হঠাৎ মা আমার কেঁদে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে বাবা তুমি? আমার বাছার উপর ভর করছ?' উত্তরে চোখ পাকিয়ে আমি তাঁকে বলে উঠি, 'কে? কে জানিস আমি? আমি শ্রীশ্রীরামচন্দ্র।' আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ বা তা করে না। কেউ বা বিশ্বাস করে বলে উঠে, 'না ভাই ছেলেটা তো এ রকমের নয়। নাঃ, ওর উপর ভরই হয়েছে। এ সব ঠাকুর দেবতারই ব্যাপার।' এর পর আমি সমাগত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বাণীর পর বাণী দিতে থাকি। আমার মুখনিঃসৃত কতকগুলা কথা কারুর কারুর সম্বন্ধে মিলেও যায়।

বলা বাহুল্য, এই সকল গোপন কথা আমি পূর্বাহ্ণেই অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছিলাম। এর কিছুক্ষণ পরে আমি হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠে বসে চারিদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাকি। মা এইবার ছুটে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছো বাবা? কি হয়েছিল তোমার বাবা? একটুও ভাল মনে হচ্ছে তো?' অবাক হয়ে যাওয়ার ভান করে আমি উত্তর দিই, 'না মা, না তো। কিছু হয়নি তো আমার।' অধিকতর অবাক হয়ে মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওমা, সে কি রে! এই যে তুই কি সব বলছিলি। তুই না'কি রামচন্দ্র?' আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি নি এইরূপ ভাব দেখিয়ে উত্তর দিই, 'আমি রামচন্দ্র? মানে? সে আবার কি?'

বিষয়টি সজ্ঞানে এইভাবে অস্বীকার করায় আমার উপরে সকলের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর পর হতে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আমার ওপর শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ভর হতে থাকে। এই সময় আমি ভূত ভবিষ্যৎ সমেত নানারূপ জানা ও অজানা তথ্যাদি বলে যেতাম। এর কতক মিলে যেতো, কতক বা মিলতো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বাণী শুনবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে লোক এসে আমার কাছে হত্যা দিতো। ভরের সময় আমি আগন্তুকদের ঔষধাদির সন্ধান বলে দিতাম। এমন কি, ছেলেপুলেদের আশীর্বাদ করে তাদের রোগও সারিয়েছি। আমি ভক্তদের সাবধান করে বারে বারে তাদের জানিয়ে দিতাম, 'দেখ বাপুরা, ডাক্তার দেখাচ্ছিস্ দেখা। খবরদার গরিবের পয়সা কটা যেন মারা না যায়। তবে এর রোগ আমি অবশ্য সারাব।' ডাক্তারের ডাক্তারী চলার ফলে রোগী এমনিই সেরে উঠত। কিন্তু নাম ডাক্তারের না হয়ে নাম হ'ত এই আমার। এ ছাড়া ভরের সময় খুড়ো মশাইএর

মাথায় নির্বিবাদে আমার শ্রীচরণ তুলে দিয়ে আমি জানিয়ে দিতাম, 'এ বেটার কিছু হবে না। এ বেটা সুগ্রীব আছে।' খুড়া মশাই পূর্ব জন্মে সুগ্রীব রূপ ভক্তবীর ছিলেন। এই কথা জ্ঞাত হয়ে তিনি বরং খুশিই হয়ে উঠতেন। এজন্যে রাগ তিনি করতেন না। এছাড়া মাড়োয়ারী এবং ভাটিয়া ব্যবসায়ীরাও আমার মন্দিরে এসে ধর্ণা দিতে থাকে। বাড়ির সামনে রোলস্রয় ও মিনার্ভা কারের গাঁথি লেগে যায়! টাকা পয়সা ও গিনি মোহরে আমার সিংহাসনের তলাকার রৌপ্য রেকাবগুলি প্রতিদিনই কাণায় কাণায় ভরে উঠত।

এমনিভাবে আমার দিনগুলো বেশ ভালভাবেই চলছিল। আরও কিছুদিন হয়ত আমার এই ভাবেই চলত, কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার মাথায় এক দুর্বুদ্ধির উদয় হল। হঠাৎ একদিন পূর্বের মত অজ্ঞান হয়ে পড়ে আমি বলে উঠলাম, 'মা, জান? জান তুমি আমি কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে আমার যশোদা মাতা জানালেন, 'জানি বই কি বাবা। তুমি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। এ জন্মে অভাগিনীকে দয়া করেছ।' গম্ভীরভাবে আমি উত্তর দিলাম, 'হুঁ, ঠিক বলেছ তুমি। এখন যাও, সীতাকে নিয়ে এস।'

এই ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে আমি বিবাহ করেছিলাম। এতদিন পর্যন্ত মায়ের সঙ্গে আমার স্ত্রীও নির্বিবাদে আমার সেবা করে আসছিলেন। সীতাদেবীর কথা শুনে ভীত নয়নে আমার স্ত্রী আমার দিকে [রামচন্দ্রের দিকে] তাকালেন। ব্যগ্রভাবে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কি বলছ বাবা? সীতা? কোথায় আছেন তিনি?' জলদ গম্ভীর স্বরে আমি তাঁকে উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আছে নিকটেই। যা—চলে যা সোজা চীৎপুরের মোড়ে। পুলের তলায় হলদে রঙের টিনের বাড়ি। প্রতুল চক্রবর্তীর ঘরে জন্মেছে সে তার

মধ্যম কন্যারূপে। যা যা, ভাল চাস্ তো এক্ষুনি তাকে নিয়ে আয়। সীতা, সীতা, আমার সীতা—।' আমার এই শেষ আদেশ জানিয়ে দিয়ে 'সীতা—সীতা' বলতে বলতে আমি পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। জ্ঞান হওয়ার পর সকলে ছুটে এসে আমাকে সীতা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলেন। এইরূপ ভান করতে থাকি, যেন এই সম্বন্ধে কিছুই জানি না। এর পর অনেক সলা-পরামর্শের পর বাড়ির লোকেরা এবং অপরাপর ভক্তেরা সীতা অন্বেষণে বহির্গত হন। শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতুল চক্রবর্তীর বাড়িটা তাঁরা সহজেই খুঁজে বার করেন। প্রতুলবাবুর মধ্যম কন্যা সীতাদেবীরও তাঁরা দর্শন পান। বলা বাহুল্য, কিছুদিন যাবৎ এই সীতা নাম্নী কন্যাটির সহিত আমার প্রণয় চলছিল। এই সুযোগে আমি তাকে বিবাহ করতে মনস্থ করি। এর পর মহা ধুমধামের সঙ্গে আমি আমার সীতাকে বিয়ে করে ভরের মুখেই ঘরে ফিরি। বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার শিষ্যরাই বহন করেন। আমার প্রথমা স্ত্রীকে দিয়েই আমার মা নববধূকে বরণ করান। যশোদা মাতার আদেশে বেচারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাদের ফুলশয্যার বিছানা প্রস্তুত করতেও বাধ্য হয়। এর পর বেশ আনন্দেই আমাদের দিনগুলা কাটা উচিত, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়ে গোল বাধাল আমার প্রথমা স্ত্রী। একদিন নাচার হয়ে ভরের মুখে আমার প্রথমা স্ত্রীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বলে উঠলাম, 'মা, মা, জানো ও কে? ওই সেই শূর্পণখা। এক্ষুণি ওর নাসিকা কর্তন কর।' জ্ঞান হওয়ার পর আমি আমার উক্তরূপ আদেশ সম্বন্ধে অস্বীকার করি। এদিকে রামচন্দ্রের আদেশে আমার মা, খুড়ামশাই এবং ভক্তবৃন্দ বিব্রত হয়ে উঠেন। কি ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ প্রতিপালিত করা যাবে, সেই সম্বন্ধে তাঁদের বহুবিধ গবেষণা চলে।

ব্রিটিশ রাজ্যে হঠাৎ একজনের নাসিকা কর্তন সম্ভব নয়। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের আদেশও প্রতিপালিত হওয়া চাই। তা না হলে হয় তো তিনি এ গৃহ ত্যাগ করে যাবেন। এতে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অবশেষে বধূমাতার [আমার প্রথমা স্ত্রীর] নাসিকার কিয়দংশ নরুণের সাহায্যে একটু চিরে দেওয়াই ঠিক হ'ল। অনেকটা ধর্মীয় নিয়ম রক্ষারই মত উহা করা হয়। আমার প্রথমা স্ত্রী কিন্তু [নাসিকা কর্তনরূপ] এই সাধু প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। অবশেষে বাড়িসুদ্ধ লোক জোর করে তাকে শুইয়ে ফেলে নরুণ দিয়ে তার নাকের কিয়দংশ চিরে দিলেন। পাড়ার নাস্তিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা সংবাদটি শুনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমার প্রথমা স্ত্রীর পিতা-মাতাকে সংবাদ পাঠান। তেনারা দল বেঁধে এসে প্রথমা স্ত্রীকে অনেক হাঙ্গাম হুজ্জুতের পর উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে যান। তারপর এ বিষয়ে তাঁরা পুলিশেও খবর পাঠান। এইভাবে শ্রীরামচন্দ্রের এই শেষ লীলারও অবসান ঘটে।"

সকল সময়েই যে এই সব ভর হওয়ার ব্যাপারের মধ্যে বজ্জাতি ব বুজরুকি থাকে তা নয়। অনেক সময় ভাবাবিষ্ট ব্যক্তি সাময়িকভাবে বিশ্বাস করে যে, সে সত্য সত্যই একজন দেবতা। ইহা এক প্রকারের হিষ্ট্রিয়া রোগ মাত্র। এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ দেব বা দেবীর নামের উচ্চাঙ্গের বুলি আওড়ায়। আমরা তাদের ভরগ্রস্ত [inspired] বলি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় উপনীত মানুষ সম্পর্কে আমরা বলি যে তার উপর কোনও দেবতার ভর হয়েছে। সেই ব্যক্তি ভূত-পেত্নী বা ব্রহ্মদৈত্যের নাম নিয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করলে ও অন্যভাবে কথা বললে আমরা বলি তাকে ভূতে পেয়েছে [possessed]। আসলে কিন্তু [উভয় ক্ষেত্রেই] উহা একপ্রকার স্নায়বিক রোগ

মাত্র। সাময়িকভাবে কোনও কোনও ব্যক্তি এই রোগে ভুগে থাকে। এই সময় তারা চেতন মনের অজ্ঞাতে অবচেতন মনের রত্নভাণ্ডার উজাড় করে কথা বলতে থাকে। জ্ঞান হওয়ার পর এর কোনও কথাই কিন্তু তার আর স্মরণ থাকে না। মনের কতকাংশ মূল মন হ'তে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন [Split up mind) হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। এই রোগ হতে রোগীরা কখনও দিনে একবার বা দুইবার কিংবা কখনও বা সপ্তাহ ভর ভুগে থাকে। উৎসাহ পেলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই রোগ বহুকাল স্থায়ী হয়। কোনও কোনও রোগী বা রোগিণী সামান্য মাত্র চিন্তা দ্বারা যখন তখন তাদের এই পোষা রোগ ডেকে আনতেও সক্ষম হয়।

এই ধরনের ব্যক্তিদের অজ্ঞ ব্যক্তিরা মধ্য-ব্যক্তি বা ভরগ্রস্ত [মিডিয়াম] বলে থাকেন। এই ভরগ্রস্ত বা অনুপ্রেরিত এবং তথাকথিত আবিষ্ট [ভূতাবিষ্ট] ব্যক্তিদের কথাবার্তা প্রায়ই সহজাত বুদ্ধি [instinct] প্রণোদিত হয়ে থাকে। তাদের দৃষ্টি প্রবল এবং শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি এই সময় প্রখর হয়ে উঠে। এই সময় এরা দূরাগত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শব্দের প্রভেদ বুঝতেও সক্ষম। দূর হতে কাকা বা পিতার জুতার শব্দ শুনে এরা বলে দিয়েছে কাকা বা পিতা আসছেন। কিন্তু এইরূপ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম শব্দ অপর কেহ শুনতে পায় নি! সহসা আসা 'হাইপার-সেনসিবিলিটির' কারণে এইরূপ হয়ে থাকে। বহুদিন অসুখ ভোগ করার পর সাধারণ মানুষও ইহা প্রায়ই উপলব্ধি করেছে। এই সময় তারা নিজেদের মূল মনের অজ্ঞাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টিতে কথা বলতে থাকে। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে দৃষ্ট বহু ব্যক্তিত্ব বা দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কারণেও এইরূপ ঘটে থাকে। বিচ্ছিন্ন মন বা [Split up mind] ইহার কারণ। এই সব ব্যক্তিত্বের [personality]

একটি থাকে জাগ্রত এবং অন্যটি [কিংবা বাকিগুলি] থাকে সুপ্ত। এই সুপ্ত ব্যক্তিত্বের একটি ব্যক্তিত্ব হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে মূল ব্যক্তিত্বটিকে প্রদমিত করে কর্মতৎপর হওয়ার কারণেই এইরূপ হয়ে থাকে। মানুষের এই সুপ্ত ব্যক্তিত্ব অলক্ষ্যে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ রাখে এবং সে যাহা কিছু শুনে বা দেখে তা সে মনে রাখে, যদিও কি'না তার জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় শুনেও শুনে না, কিংবা সে তা দেখেও দেখে না। অর্থাৎ কি'না এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় সে নির্লিপ্তভাবে এড়িয়ে যায়। ভরের সময় উপরের জাগ্রত ব্যক্তিত্বটি হয়ে যায় সুপ্ত এবং নিম্নের সুপ্ত ব্যক্তিত্বটি হয়ে উঠে জাগ্রত। এই কারণে আমরা সাধারণ ভাবে দৃষ্ট মূর্খ ব্যক্তিদেরও ভরের মুখে বহু ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা বলতে শুনে থাকি। ইংলণ্ডের কোনও এক মুচী রাত্রে উঠে বসে ভাবের মুখে বহু কবিতা লিখত এবং সে কবিতাগুলো বিক্রয় করে বহু অর্থ উপার্জনও করেছে। কিন্তু দিবাভাগে সে এই কবিতার "ক"ও সে কখনও লিখতে পারে নি; কারণ এই সময় সে তার মনে ভাব [Mood] আনতে পারে নি। কোনও কোনও ব্যক্তি এক সঙ্গে এবং একই সময় দুইটি কাজ সমান ভাবে করে যেতে সক্ষম হয়। এরা একজনের সঙ্গে একটি গুরুতর বিষয়ে আলোচনা করতে করতে অন্য একটি বিষয় সম্বন্ধে পাতার পর পাতা নির্ভুলরূপে লিখতে পারে। উপরি উক্ত কারণগুলাই এজন্য দায়ী। ভরগ্রস্ত ব্যক্তিদের অপরাধী বলা চলে না। কিন্তু যে সকল ধূর্ত ব্যক্তি জেনে শুনে এই সব রোগীর সাহায্যে ব্যবসা চালিয়ে অর্থোপার্জন করে তারা অপরাধী।

এই সকল গুরু, সাধু, দেবতা বা অপদেবতার কবলে পড়ে ব্যক্তি বা পরিবার বিশেষের সর্বনাশ হওয়ার দৃষ্টান্ত এদেশে বিরল নয়। এমন

অনেক বিধবা মহিলাকে আমি জানি যারা তাদের যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি গুরুর পাদপদ্মে উৎসর্গ করে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এই সকল বকধার্মিকগণ দেশের কত সরল প্রকৃতির সমৃদ্ধ পরিবারের যে সর্বনাশ সাধন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আমার মতে এই সকল দুর্বৃত্তদের শায়েস্তা করার জন্যে সাধারণ আইনের বহির্ভূত একটি বিশেষ আইন [ordinance] প্রণয়নের সময় এসেছে। একটি 'গুরু অ্যাকট্' প্রণীত হলে আরও ভালো হয়। এই সকল দুর্বৃত্ত বিবিধ পদ্ধতিতে প্রতারণার উদ্দেশ্যে শিষ্য সংগ্রহ করে। সেই সব অপরূপ পদ্ধতি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করবো।

সাধারণতঃ এই সকল দুর্বৃত্ত কতকগুলি প্রচারক পুষে থাকেন। এই সকল প্রচারক ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের কাছে স্ব স্ব গুরু বা সাধুর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে প্রচার করে বেড়ান। ভক্তদের সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ করা হয়। নানারূপ বচন-বিন্যাসের সাহায্যে এই সকল প্রচারক বা দালালেরা ভক্তদের মন সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে এইরূপ কয়েকটি বচন-বিন্যাস উদ্ধৃত করা হ'ল।

"হাঁ মশাই, তাহলে বলি শুনুন। এ মশাই আমার শোনা কথা নয়। আমার নিজের চক্ষে দেখা এসব। আমি তখন দানাপুরের স্টেশন মাস্টার। অফিসে বসে হিসাব মেলাচ্ছি। এদিকে ট্রেনও এসে পড়েছে। আমরা সকলেই কাজকর্মে খুব ব্যস্ত। হঠাৎ বাইরে একটা মহা হট্টগোল শোনা গেল। আমি বেরিয়ে এসে দেখি যে, সাড়ে সাত ফুট লম্বা এক সাধুকে চার-পাঁচজন অ্যাংলো চেকারে জোর করে ট্রেন হতে নামিয়ে আনছে। এর পর ঐ সাধুবাবা সেখানে কি করলেন জানেন? বলি শুনুন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে

রইলেন। ব্যস্—ইঞ্জিন একেবারে নিশ্চল। আমরা ঘন্টি দিচ্ছি। ইঞ্জিন সিটি দিতে থাকে। কিন্তু ভোঁস ভোঁস করলেও তা চলে না। বেশ বুঝা গেল সবই সাধুর কীর্তি। সাধুকে টেনে প্ল্যাটফরমের বাইরে আনার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রেনটাও চলতে শুরু করে দিল। যাক্! সাধুবাবা তো প্ল্যাটফর্মের বাইরে এলেন। কিন্তু এসে সেখানে তিনি কি করলেন জানেন? হাঁ বলি শুনুন। সে এক অবাক কাণ্ড। তিনি দুই হাতের দশটা আঙুল তাঁর লম্বা লম্বা দাড়ির ভিতর সেঁদিয়ে দিয়ে টিকিট বার করতে শুরু করলেন। সেখানে দেখতে দেখতে ভিড়ও জমে গেল বিস্তর। সাধুবাবা একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে তুমি কোথায় যাবে?' উত্তরে লোকটা বললে, 'আজ্ঞে, দিল্লী'। দাড়ির ভিতর আঙুল চালিয়ে একটা দিল্লীর টিকিট বার করে সাধু বললেন, 'নাও।—আর তুমি?' একজন বললে, 'আজ্ঞে—পুরী।' দাড়ির ভিতর হতে আর একটা পুরীর টিকিট বার করে সাধুবাবা বলেন, 'নাও।' এমনি করে কাউকে দিলেন তিনি মোগলসরাই-এর টিকিট, কাউকে বা তিনি দিলেন বেনারসের টিকিট। মথুরা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দার্জিলিং, ঢাকা, লাহোর, পেশোয়ার, যে যেখানে যাবে বলে, তাকে তিনি সেইখানকার টিকিট দিতে থাকেন। টিকিট কেউ আর কেনে না। টিকিট ঘর এমনিই বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তখন বাধ্য হয়ে এজেন্টকে 'তার' করলাম। সদর হতে এজেন্ট এল, ডি টি এস এল। সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব তো এলেনই। তাঁদের মধ্যে অনেক সলা-পরামর্শ হ'ল। এর পর এজেন্ট হাতির দাঁতের প্লেটের উপর নিজের হাতে খোদাই করে চারজনের মত একটা পাশ সাধুবাবাকে লিখে দিলেন, তাঁদের মধ্যে যে কেউ কি'না সারা ভারতবর্ষ ইচ্ছা মত ভ্রমণ করতে পারেন।

"এই তো গেল মাত্র একদিনের ঘটনার কথা। আমি আর একদিনের ঘটনা এবার বলবো। এই সময় আমি হেড অফিসে বদলি হয়েছি। দরকারি কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। হঠাৎ চোখ তুলে চেয়ে দেখি সেই সন্ন্যাসী। বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আরে আপ্ হিঁয়াপর?' কোনও কথার উত্তর না দিয়ে সাধুবাবা টেবিল থেকে কয়েকটি দরকারি সরকারী কাগজ উঠিয়ে নিলেন। আমি 'হাঁ হাঁ হাঁ' করে বলে উঠলাম, 'আরে এ কেয়া করতা মহারাজ! ইয়ে বহুৎ জরুরী কাগজ হ্যায়! ইসমে মেরি নোকরী চলি যায়গা।' আমার কথা শুনে সাধু মহারাজ একটু হেসে নিলেন। কি মিষ্টি সে হাসি। এর পর সস্নেহে একটা হাত আমার পিঠের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসিকো বাস্তে নকরী করতি বেটা?' আশ্বস্ত হয়ে আমি উত্তর করলাম, 'রুপেয়াকে বাস্তে মহারাজ!' উত্তরে সাধুবাবা বললেন, 'কেয়া? রুপেয়াকো বাস্তে? হুঁ—।' এর পর হঠাৎ সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে তিনি সেই কাগজগুলা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'লেও।' মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সেই টুকরাগুলা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। চমকে উঠে সকলে চেয়ে দেখি যে, খাস সম্রাট পঞ্চম জর্জের আমলের টাঁকশালে তৈরি; গরম গরম সিকি, আনি, দুয়ানি, আর আধুলি এধার ওধার গড়িয়ে পড়ছে। এর কতদিন পর আমি চাকুরি হতে পেনসন্ নিয়েছি। তার পরও আরও কতদিন আমার এমনি সুখে-দুঃখে চলে গেছে। এতদিন পর আজ হঠাৎ আমি আবার তাঁর সন্ধান পেলাম। সকালে স্ত্রীকে নিয়ে মর্নিং ওআক করে ফিরছি, হঠাৎ দেখি তিনি একটা ধুনী জেলে গঙ্গার ধারে বসে আছেন। আমাকে ডাক দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; 'কেয়া বেটা চিনেতা

হায়া ? তবিয়েত সে ঠিক আছে তো ?' কেঁদে উঠে আমি জানালাম, 'সবই ভাল প্রভু। কিন্তু জামাইটা আমার বাঁচে না।' একটু হেসে ঝুলির ভিতর থেকে একটা শিকড় বার করে সেটা আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'সে যক্ষ্মা রোগ হো ? বড় খারাপ রোগ মা। লেকেন এটা তো তাকে খাইয়ে দে'।"

খোদ্ সাধুবাবারা সাধারণতঃ নির্বল অপরাধী হযে থাকেন। অর্থাৎ পারতপক্ষে তাঁরা কাউকে আঘাত হানেন না। এমন কি, প্রবঞ্চক রূপে ধরা পড়ার পরও এরূপ কার্য তাঁরা করেন নি। সাধারণতঃ তাঁরা নির্বল ভাবে প্রবঞ্চনার দ্বারা ধর্মের নামে গৃহস্থদের অর্থে অলস জীবন যাপন করেন। কিন্তু তাঁর দলের এই সব প্রচারকদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা চলে না। এই সব প্রচারকরা সাধারণতঃ গৃহী হয়ে থাকেন। এঁদের কেউ কেউ এই সকল সাধুবাবাদের স্ব-গৃহে পুষেও থাকেন। প্রচার কার্যে বাধা পেলে ধর্মের নামে তাঁদের প্রায়ই মারপিট করতে দেখা যায়। কোনও এক প্রচারকের উপরি উক্তরূপ প্রচার-কার্যের প্রত্যুত্তরে আমার কোনও এক বন্ধু নিম্নোক্ত রূপ একটি কাহিনীর অবতারণা করেন। এর ফলে ছদ্মবেশী প্রচারকটি মারমুখী হয়ে আমার বন্ধুকে প্রহার করেছিলেন। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক বিধায় পাঠকদের অবগতির জন্যে উহা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি বলি তবে শুনুন মশাই। আমেরিকার কেণ্ট জার্নালে বিষয়টি বেরিয়েছিল। আমেরিকার এক বড় বৈ ানিক ঐ অদ্ভুত যন্ত্রটির আবিষ্কারক। যন্ত্রটির মধ্যে একটি রকুনা বাছুর ঢুকিয়ে দিয়ে হাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে দেন তো দেখবেন যে, তার একটা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে ছুরি, কাঁটা, নস্যির কৌটা ইত্যাদি, অর্থাৎ কি'না শিং ও ক্ষুর থেকে যা তৈরি হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই যন্ত্রের দ্বিতীয় মুখ থেকে বেরিয়ে

আসতে দেখবেন চপ, কাটলেট, ওমলেট, স্থপ, অর্থাৎ কিনা মাংস দিয়ে যে সব খাদ্য তৈরি হয়। এরপর এর তৃতীয় মুখটা দিয়ে আপনারা বেরুতে দেখবেন, স্থটকেস্, মনিব্যাগ, বেল্ট, চামড়ার পেটিমার্ন্ট্, জুতা বাঁধা ফিতা ইত্যাদি। অর্থাৎ কিনা যে সকল দ্রব্য গরুর চামড়ায় তৈরি হয় এবং এর শেষ মুখটা হতে আপনারা বেরুতে দেখবেন ছানা, ঘি, মাখন, সন্দেশ, দই ইত্যাদি, অর্থাৎ কিনা যে সকল সামগ্রী দুধ হ'তে তৈরি হয়। আর সর্বশেষে কি পদার্থ বার হবে জানেন? সব শেষে যন্ত্রের তলাকার একটা দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসবে একটা আস্ত কৈলে বাছুর, অর্থাৎ কিনা 'নো লস্ অব এনার্জি', এই অদ্ভুত শক্তির কোনও ক্ষয়ই হয় না, বুঝলেন'।"

[এঁরা মানুষের শিক্ষাদীক্ষা ও কালচার অনুযায়ী বাক্য প্রয়োগ করে থাকেন। কারণ—একজন মূর্খ ও অজ্ঞ বা নির্বোধ ব্যক্তির উপর যে কাহিনী প্রযোজ্য তা শিক্ষিত ও চতুর ব্যক্তির প্রতি কদাচ প্রযোজ্য নয়। এ জন্য বাক্-প্রয়োগ বা সাজেস্শনগুলি মানুষের 'চিত্ত-প্রস্তুতি' তথা প্রিডিসপজিশন এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস অনুযায়ী তৈরি করা হয়ে থাকে।]

আমি আমার বন্ধুটির নিকট শুনেছি যে, ধর্ম সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি আগন্তুকগণ পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস এবং উপভোগ করলেও তার এই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আজগুবি গল্পটি তাঁরা বরদাস্ত করেন নি। এই ভাবে তাঁরা একজন ধর্মগুরুকে বিদ্রূপ করার জন্য বন্ধুর উপর ক্ষেপে উঠেন। আগন্তুকদের মধ্যে একজন ভট্টপল্লীর লোক ছিলেন। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বন্ধুকে বলেছিলেন, 'জানো-ও! ভট্টপল্লীর মধ্যে প্রাপ্ত হ'লে গাত্র হতে তোমার চর্ম স্খলিত করে নিতাম, ইত্যাদি।' এ ছাড়া পণ্ডিত ভদ্রলোকটি তাঁকে নাকি অর্বাচীন, মূর্খ প্রভৃতি

সম্বোধনেও ভূষিত করেছিলেন। এই ধরনের মনোবৃত্তি এ দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য মাত্র। কোনও এক হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে কোনও এক মন্ত্রগুরু বলেছিলেন, 'আমি অমুক গ্রামে থাকি এবং আমার পেশা গুরুগিরি।' হাকিম মহোদয় তাঁর এই উত্তরের ইংরাজি করেছিলেন এইরূপ—'আই অ্যাম্ এ রেসিডেন্ট্ অব্ [সো এণ্ড সো প্লেস] হোয়ার্ আই অ্যাম্ এ রিলিজিয়াস ক্রড্।' পাঠকবর্গকে আমি কথাটা ভেবে দেখতে বলি। স্বীকার করতে হবে যে, এর মধ্যে যথেষ্ট সত্য আছে। আমি এমন অনেক অল্প বয়স্ক গুরুঠাকুরকে জানি, যে কিনা মুমূর্ষু বা মরণযাত্রী অতি বৃদ্ধ শিষ্যা বা শিষ্যদের মস্তকে পা তুলে দিয়েছে। তার উদ্দেশ্য এই মৃত্যুমুখী ব্যক্তিকে এইভাবে স্বর্গে পাঠানো। অপরাপর বিষয়ের ন্যায় ভণ্ডামীর এবং ভণ্ডামী সহ্য করারও একটা সীমা আছে। দেহহীন নর-নারীর কিরূপে স্বর্গ বা নরক ভোগ সম্ভব তা' আজও আমাকে কোনও সাধু বুঝাতে সক্ষম হন নি। বাক্জাল সৃষ্টি করে অজ্ঞ শিষ্য-শিষ্যাদের ঠকাবার ক্ষমতা এদের অসীম। কোনও এক ঠাকুরমশাইকে একদা জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আচ্ছা, ওই যে এয়ারোপ্লেনটা উড়ছে, ওটা কি একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়? আপনার অলৌকিক গল্পগুলি কি এর চেয়েও আশ্চর্য?' বলা বাহুল্য, অজ্ঞ শিষ্যকে ঠাকুরমশাইয়ের কবল হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রশ্নটি উত্থাপন করি। ঠাকুরমশাই কিন্তু এতে না দমে শিষ্যকে শুনিয়ে শুনিয়ে উত্তর দেন, 'ওটা কিই আর ভারি-ই আশ্চর্য! আরে, ওড়বার জিনিস উড়ছে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। ওকে তো সৃষ্টি করাই হয়েছে উড়বার জন্যে। ওড়াও তো বাবা ওই চেয়ারটা বা টেবিলটা, কত বড় তোমার বিজ্ঞান দেখি।' এই বিষয়ে অপর একটি চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাক।

"কোনও এক ঠাকুরমশাই শিষ্যবাড়ি গিয়ে স্বপাক ভোজন করতেন। কারণ তিনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং শিষ্যরা করেন আমিষ ভোজন। হঠাৎ একদিন আমি এই ঠাকুরমশাইকে একটা মৎস্য হস্তে গৃহে ফিরতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'এ্যাঁ! এ কি ঠাকুরমশাই? মাছ হাতে যান্ কোথা?' উত্তরে নির্লজ্জের মত ঠাকুরমশাই আমাকে জানান, 'তা বাবা বাড়িতে একটা বিড়াল-শিশু আছে কিনা?' ইত্যাদি। এর কয়েকদিন পর আমি তাঁর এক ধনী শিষ্য সমভিব্যাহারে ঠাকুরমশাইএর গৃহে এসে দেখি তাঁর উঠানে চার-পাঁচটি বড় বড় মৎস্য বঁটির সাহায্যে কুটা হচ্ছে এবং ঠাকুরমশাই তাঁর অহিংস-নীতি ও নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা বা প্রমাণ স্বরূপ স্বয়ং মৎস্য কুটার তদ্বির করছেন। আমাদের হঠাৎ সেখানে আসতে দেখে কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'এসো বাবাজীবন, এসো। এ মৎস্য-যজ্ঞ অনুষ্ঠান হচ্ছে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর এ যজ্ঞ মদ্‌গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। তা বাবা প্রসাদাদি পেয়ে যাবে। তোমাদের [শিষ্যদের] আর গাঁয়ের গরিবদের জন্যই যা কিছু সব। আমরা তো আর, হে হে হে—"

বহু সাধুকে বহু ব্যক্তি বাল্যকাল হতে জানেন। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ সাধুদের বিষয় শুনলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এঁরা যে, যে কোনও সাধারণ মানুষ হতে নগণ্য তা তাঁদের পরিচিত ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। কারুর কারুর কাছে এঁদের ঠগী ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় নেই। অথচ তাঁরা স্থানান্তরে আস্তানা গেড়ে নূতন মানুষদের নিকট আসর জমাতে সক্ষম। [এই জন্য বাংলাদেশের এক প্রবাদ—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।] কোনও পরিচিত লোক এঁদেরকে কোনও ভক্তের বাড়িতে চিনে ফেললে এঁরা প্রমাদ গুনেন। এ সময় এঁরা আজের না চেনার ভান করে

অন্যদিকে মুখ ফিরান কিংবা আড়ালে তাদের অনুযোগ করে তাঁর প্রকৃত পরিচয় না জানাতে অনুরোধ করেন। কেউ কেউ উৎকোচ স্বরূপ তাঁদের ক্ষমতাসীন শিষ্যদের বলে তাদের বহু উপকারও করেন। এমন বহু গুরু মাসিক পাঁচ শত টাকা আয়ের নিম্নে শিষ্য রাখেন না। বহু শিষ্য প্রতি মাসে বা বৎসরে নগদ মূল্যে এঁদের প্রণামী পাঠান। কয়েক ক্ষেত্রে এঁদের বাৎসরিক আয় লক্ষ টাকারও উপরে উঠে। অথচ এঁদের আয়কর প্রভৃতি কর দিতে হয় না। এর সবটাই এঁরা জনহিতে বা পূজাতে মিথ্যা করে খরচ দেখান। ঐ অর্থ হতে মাত্র সামান্য অংশ তাঁরা বাৎসরিক উৎসবে শিষ্যদের প্রসাদ বিতরণে খরচ করেন বটে, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে বাড়তি প্রণামী আদায় করে তা তাঁরা পূরণ করে নেন। এইরূপ ভূমিহীন জমিদারীর উচ্ছেদ এদেশে এখনও সমাধা হয় নি। এঁদের বিলাসী শ্রমবিমুখ মোটর-বিহারী বহু পুত্রকন্যাও আছে। এরা মঠের আয় হতে পুরুষানুক্রমে বা শিষ্য পরম্পরায় জীবিকা নির্বাহ করতেও সক্ষম। এই সব 'ভোগের মধ্যেই ত্যাগ'—এই মন্ত্রধারী গুরুরা একাধিক পত্নী গ্রহণ করেছেন। কেহ ভগবান রূপে শিষ্য-পত্নীর তুচ্ছ দেহকেও তাঁর পূজার উপকরণ করেছেন। এদের মধ্যে কারুর কারুর পারভারসিটি থাকায় মাত্র নারীর সঙ্গ দ্বারা তাদের যৌন-তৃপ্তি ঘটে। আমি কয়জন নারীকে একদা এক গুরুর উরুদেশ পর্যন্ত হাত দিয়ে টিপতে [পদসেবা] দেখি। আমি এতে প্রথমে কোনও দোষ দেখি নাই। কিন্তু আমাকে দেখা মাত্র ঐ গুরুকে পা-দুটো ত্বরিত গতিতে সরাতে দেখে বুঝি যে তাঁর মনের কোথায়ও পাপ ছিল। এইভাবে অনেকে এঁদের বিকৃত যৌনবোধের কথঞ্চিৎ তৃপ্তি ঘটান। তবুও বলবো যে অন্য কোনও নিদারুণ বিপদ হতে এই বিকৃত যৌনবোধী গুরুরা তাদের নারী শিষ্যাদের পক্ষে কম বিপজ্জনক। সৌভাগ্যক্রমে

আজ নারীরাও পুরুষ গুরুদের সাথে এ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এতে অন্ততঃ নারীদের ঐরূপ বিপদ কমছে। এই সব ঠগী গুরুরা বিপদ বুঝলে ভারতের একাংশ হতে অন্যাংশে বহুকাল আত্মগোপন করেন। এঁদের মধ্যে বহু জেল-খাটা বা ফেরার আসামীসহ বরখাস্ত সরকারী কর্মী আছেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে বহু নিরীহ সাধু চরিত্রের ব্যক্তি আছেন। কিন্তু তাঁরা অলস এবং পরগাছা জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এঁদের কেউ কেউ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। মন্ত্রপূত উদকের নামে [জলপড়া] ঠিক মত ঔষধ বিতরণ করেও এঁরা ভক্তের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। আমার চেনা-জানা জনৈক মূর্খ কূপমণ্ডুক যুবকের বাটীতে একদা নিম্নোক্ত রূপ এক সাইনবোর্ড দেখে অবাক হই :

"হিমালয়-প্রত্যাগত তিব্বত-প্রবাসী মহাযোগী। ইনি কাশীতে পুরাণ, নবদ্বীপে ন্যায়, মিথিলাতে বেদ, দাক্ষিণাত্যে যাগ-যজ্ঞ শিক্ষা করেন। তিব্বত বাসকালে এঁর তন্ত্রে জ্ঞান লাভ হয়। ইনি হস্তরেখা বিশারদ রাজজ্যোতিষী ১০২ শ্রী শ্রীমৎ ভক্ত প্রবর অমুক। জগতের মঙ্গল কামনাতে ইনি ধ্যানরত আছেন। এখানে কোনও প্রকার বাদ্য বা শব্দ দয়া করে যেন কেহ না করেন।"

এই ভদ্রলোক সিভিল এবং অন্যান্য আদালত সমূহে বাদী ও বিবাদীর নির্ঘণ্ট [লিস্ট] সংগ্রহ করতেন। এরপর পৃথক পৃথক ভাবে একজনের অজ্ঞাতে অপরকে আশীর্বাদান্তে ব'লে আসতেন যে উনি ঐ মামলাতে নিশ্চয়ই জয়ী হবেন। এই সময় ইনি এঁদের কপর্দক মাত্র প্রণামী গ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে বলতেন যে মামলাতে জয়ী হলে যেন উনি তাঁর আশ্রমের ঠিকানাতে এসে দেখা করেন। বলা বাহুল্য, এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ হাকিমের রায়েতে জয়ী হতেন। ঐ সময় তাঁরা স্বেচ্ছাতে দেখা না

করলে ঐ মাদুলী-দাতা আশীর্বাদক সাধু কিংবা তাঁর এক শিষ্য তাঁর সাথে দেখা করে প্রাপ্য আদায় করতেন।

মাদুলী ও আশীর্বাদে ও পূজাতে কথনও কথনও ফল লাভ হয়। কিন্তু এখানে বিবেচ্য এই যে শতকরা কতো ভাগ উহা সত্য হয়। বলা বাহুল্য, একটি নগণ্য অংশের এই উপকার লাভ একটি দৈব সুঘটন মাত্র। ঐরূপ আশীর্বাদের বহর ব্যতিরেকেও উহা ঘটতে পারতো। [একশো ছাত্রকে 'তোমরা পরীক্ষাতে পাশ করবে' বললে ওদের মধ্যে সত্তর জন নিশ্চয়ই পাশ করে। বাকি ফেল করা ত্রিশ জনের মধ্যে বিশ জন ঐ জন্য প্রবঞ্চকের গৃহে কলহ করতে আসে না। এদের বাকি দশজন অর্থ ফিরত নিতে এলে তাদের বলা হয় যে, তারা পড়াশুনা একেবারে করে নি বলেই ফেইল করেছে। এই ফেইল করা ছাত্ররাও এজন্য খুউব বেশি হুজ্জুত-হাঙ্গামা করে নি।]

এইবার মানী, গুণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কেন সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে তাহা বিবেচ্য। আমি বহু সুঠাম ব্যক্তিত্বপূর্ণ রাজপুরুষদেরও এদের কাছে অসহায় ব্যক্তির মত হাত জোড় করে বসে থাকতে দেখেছি। কাহারও কাহারও পক্ষে এইভাবে গুরু পোষণ এবং তোষণ একটা শখমাত্র। ইহার বিবিধ চিত্তাকর্ষক কারণ সমূহ নিয়ে উদ্ধৃত করা হলো।—

(১) বহু ধনী পরিবারে একটি মোটর গাড়ি, একটি অ্যালসেসিয়ান কুকুর, একটি সুগায়িকা কুমারী কন্যা [নিজের না থাকলে] পালন এবং একজন গুরু পোষণ একপ্রকারের বিলাস মাত্র। বহু ব্যবসায়ী এইগুলির সহিত একজন অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদী রাজকর্মচারীকে নিষ্প্রয়োজনে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের কোনও এক কর্মে বহাল করেন। এই ধরনের পরিবারের সংখ্যা অবশ্য এখনও নগণ্য! তবে এঁদের অস্তিত্ব এই শহরে

আছে। এঁরা এগুলিকে অর্থোপার্জনের আড়কাঠি রূপেও ব্যবহার করেন। এতদ্বারা এঁরা বহু নির্বোধ ব্যবসায়ী এবং রাজপুরুষদের আয়ত্তে আনেন।

(২) বহু দুর্বলমতি লোভী গৃহস্থ এদেশে আছেন। এঁরা সট্‌কাট্‌ দ্বারা স্বল্পায়াসে বা অনায়াসে জীবনে উন্নতি করতে চান। এই সকল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁদের নিজেদের এবং পুত্রকন্যাদের উন্নতির চিন্তাতে সদা উদ্বিগ্ন। এই সময় বহু ভ্রাম্যমাণ সাধুদের নিযুক্ত আড়কাঠি তাদের সকাশে প্রস্তাব করে—'আরে! আপনি এতে চিন্তা করে কষ্ট পাচ্ছেন! অমুক বাবার কাছে গেলে একটা না একটা পন্থা তিনি বাতলে দেবেন। এমন কতো দরিদ্র লোক ওঁর সংস্পর্শে এসে ধনী হয়ে গেল' ইত্যাদি। এই সকল স্বার্থপর অভাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উপর বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা সহজ। [পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উক্ত 'সম্মোহন বিদ্যা' শীর্ষক আখ্যান ভাগ দ্রষ্টব্য।]

এই সকল গুরু বেছে বেছে ক্ষমতাবান রাজপুরুষদের শিষ্য করতে উন্মুখ থাকেন। এদের মাধ্যমে এঁরা রাষ্ট্রীয় শাসন কার্যে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করেছেন। এঁদের আশীর্বাদ ভিন্ন বহু অফিসারের প্রমোশন পর্যন্ত বন্ধ হয়। এর ফলে বহু অধস্তন অফিসার ঐ বিভাগীয় কর্তার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ঐ মহাকর্তার অন্যত্র বদলি হওয়া মাত্র তাঁরাও তাঁর শিষ্যত্ব ত্যাগ করেন। অতি উচ্চ পদের কর্মকর্তার গুরু গ্রহণ ও পালন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা উচিত। বহু ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির চাকুরিতে স্বাভাবিক কারণেই উন্নতি হয়। তবুও আমি এইরূপ এক সদ্য প্রমোশন প্রাপ্ত আবাধ্য-মন্ত্র শিষ্যকে তাঁর ঐ প্রবঞ্চক গুরুকে তিরস্কার করে

বলতে শুনেছি—'আমিই তোকে তুলেছি, আমিই তোকে নামাবো'। এই ভর্ৎসনার বাণী শুনে ঐ শিষ্য ঠক ঠক করে ভয়ে কেঁপে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, এই সব দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিরা অন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও মনের ঐ একটি কেন্দ্রে তাঁরা একপ্রকার পাগল মাত্র। ঐ সম্পর্কে একটা প্রচণ্ড আঘাত কিংবা যুক্তিপূর্ণ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা এঁরা নিরাময় হন। এঁদের মধ্যে এমন গুরু অন্বেষী ব্যক্তি আছেন যাঁরা পথে-ঘাটে ভিখারীদের মধ্যে গুরু অন্বেষণ করেন। এই সময় [মনোবিকারের] যে কোনও চতুর ব্যক্তি এঁদের গুরু হতে পারেন।

[একজন তান্ত্রিক সাধক দুর্ঘটনা নিবারণ মাদুলী বিতরণ করতেন। কিন্তু, নিজেই একদিন দুর্ঘটনাতে জখম হলেন। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন—'এতে আমার মৃত্যু হতে পারতো। কিন্তু, কবচের জন্য স্বল্প আঘাতে পরিত্রাণ পেলাম।']

(৩) হঠাৎ শোক ও দুঃখ পেলে মানুষ অস্থির-মনা হয়। এই সময় তাদের চিত্তচাঞ্চল্য চরমে উঠে। কারুর পুত্র, কন্যা বা স্ত্রীর মৃত্যু হলে মানুষের মধ্যে ধর্মভাবের উদয় হয়। এ সময় তারা পরলোক সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসু হয়ে উঠে। এ সময় তাদের মনে একটু মাত্রও শান্তি থাকে না। আবেগের মুখে তারা এক স্থানে স্থির হয়ে বসতে পর্যন্ত পারে না। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে পাগল হয়ে লোকে গুরুর কবলে পড়ে। ঠিক এই সময় প্রবঞ্চকরা তাদের মুখে ধর্মীয় মাদকের পাত্র তুলে ধরে।

[এদেশে এক শ্রেণীর সাধারণ দালাল, ইনসিওরেন্স্ এবং ব্যবসায়ী এজেন্ট আছেন। এঁরা খদ্দের সংগ্রহার্থে বহু ধনী ব্যক্তিদের সাথে আলাপ করার জন্যে লজ্ ও ক্লাবের মেম্বার হন। ঠিক ঐ একই উদ্দেশ্যে বহু-শিষ্য-সম্বল গুরুদের মন্ত্রশিষ্য হয়ে এঁরা অন্যান্য ধনী দীক্ষক

ও সরকারী কর্মীদের গুরুভাই হন। এঁরা জানেন যে ধর্মীয় কারণে এই সকল গুরুভাইগণের পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার নৈতিক দায়িত্ব আছে। সাক্ষাৎভাবে সরকারী কর্মীদের উৎকোচ না দিয়ে গুরুকে তাঁদের সমক্ষে অর্থ প্রদান করে তাঁরা তাঁদের প্রয়োজনীয় কার্য ঐ সকল ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা করিয়ে নিতে পারেন। কয়েক ক্ষেত্রে গুরুদেবকে খুশি করে তাঁর দ্বারা সুপারিশ করানোও যেতে পারে। বহু বিপথগামী যুবক আছে যারা গুরুভাই রূপে গুরুভগ্নীদের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে তারা গুরুর আশ্রমে ঘন ঘন যাতায়াত করে। অভিভাবকরা রাজি না হলে এরা তাদের উপর গুরুর আদেশ সংগ্রহ করে অসম বিবাহে তাদের সম্মতি আদায় করেছে।]

সাধারণ ভাবে এদেশে এক অন্ধ বিশ্বাস আছে যে গুরুত্যাগ করতে নেই। অর্থাৎ তাদের মতে গুরু কারুর দু'বার হতে পারে না। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও দেখা গিয়ে থাকে। এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূর্ব গুরু ত্যাগ করে অন্য গুরু কাড়তে দেখে আমি অবাক হই ও তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। ভদ্রলোক এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়েছিলেন—'একজন ভালো মাস্টারের কাছে আমি পড়ছি; কিন্তু তার চাইতে ভালো অন্য মাস্টার পেলে কি তাকে আমরা গ্রহণ করি না?' কোনও কোনও ডাক্তারদের মত ঠগী গুরুরাও শিষ্য ভাঙাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে নিন্দা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে থাকেন।

এই সকল গুরু ও সাধুগণ কতদূর পর্যন্ত সর্বনাশ করতে সক্ষম তা নিম্নের বিবৃতিটি হতে বুঝা যায়। বক্তব্য বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ দেশে ফিরে শুনি যে আমার শ্বশুরালয়ে এক সন্ন্যাসীর

আবির্ভাব হয়েছে। আমার শাশুড়ী, শ্যালিকাদ্বয় এবং সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীও সাধুসেবায় নিযুক্তা। এমন কি, তাদের আহার-নিদ্রারও সময় নেই। প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করা মাত্র আমি এ বিষয়ে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাই। কিন্তু এ বিষয়ে অপর কোনও লোক ত দূরের কথা, আমার নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই না। একদিন শ্বশুরমশাই আমার শিশু শ্যালকটিকে ধমক্ দিয়ে বলছিলেন, 'হতভাগা, পড়াশুনা করছিস্ না, খাবি কি করে?' প্রত্যুত্তরে আমার ঐ শ্যালকটি সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল, 'কেন? গুরুগিরি করে?' আমি অবাক হয়ে ভাবি যে এতটুকু একটি বালকও যা সহজে বুঝেছে, তা আমার শ্বশুর মশায়ের মত জ্ঞানী ও গুণী লোক এবং তাঁর মত অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা বুঝছেন না কেন? এরপর আমি ঔৎসুক্যজনিত এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সাধুবাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে আমাকে এইরূপ অভিশাপ দেন, 'নির্বোধ অবিশ্বাসী। শীঘ্রই তোর সর্বনাশ হবে।' এর মাস দুই পরে আমার একমাত্র জামাতা মারা যায়। কন্যা আমার বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসে এবং মাতার নির্দেশে সেও সাধুসেবায় নিযুক্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যেও সকলে আমাকেই দায়ী করে। এর কয়েকদিন পরে আমার মধ্যম পুত্র টাইফয়েড্ রোগে আক্রান্ত হয়। এর ফলে আমার উপর আরও ভীষণ পীড়াপীড়ি চলতে থাকে। সকলেরই মতে আমার সাধুবাবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। ঐ সাধুবাবা কিন্তু কিছুতেই আমাকে ক্ষমা করেন না। তিনি বলেন যে, আমি নীচে হ'তে ওপর পর্যন্ত প্রত্যেকটি সিঁড়ি জিহ্বা দ্বারা চেটে চেটে উপরে উঠে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তিনি আমার পুত্রের জীবন রক্ষা করতে পারেন। সাধুবাবা তখন

ত্রিতলের একটি নিরালা কক্ষে বাস করছিলেন। আমি নিরুপায় হয়ে সর্বশুদ্ধ আটাশটি সিঁড়ির ধাপ জিহ্বার দ্বারা চাটতে চাটতে উপরে উঠি। অপত্যস্নেহে আমি তখন এমনিই অন্ধ যে আমার একবারও মনে হ'ল না যে, সাধু-সন্ন্যাসীর কোপ ব্যতিরেকেও এইরূপ কত দুর্ঘটনা ঘরে ঘরে ঘটে থাকে। আমার এই কৃচ্ছ্রসাধনা বোধ হয় সাধুবাবাকে নিরুদ্বেগ করতে পেরেছিল। সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আমার গৃহে এসে রুগ্নপুত্রের শিয়রে বসলেন। তিনি আমার স্ত্রীর সাহায্যে আমার পুত্রের চিকিৎসাতে নিযুক্ত সকল ডাক্তার-বৈদ্যকে বিদায় করলেন। অপর কাহারও সাহায্য ব্যতিরেকেই তিনি আমার পুত্রকে নিরাময় করতে সক্ষম। ভক্তদের সকাশে সাড়ম্বরে তিনি এইরূপ বারতা প্রচার করতে থাকেন। ইন্‌জেকশন্ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পুত্রের অবস্থা খারাপ হতে আরও খারাপ হতে লাগল। সেদিন সন্ধ্যের সময় ঘরে ঢুকে দেখি পুত্রের আমার শ্বাস আরম্ভ হয়েছে। এই দেখে আমি ঐ সময় ক্ষেপে উঠে তখন সাধুকে শুধাই, 'একি? এ যে শ্বাস আরম্ভ হয়েছে?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে খেঁকিয়ে উঠে সাধুবাবা আমাকে বলেন, 'দেখতে পাচ্ছিস্ না! ওকে নিয়ে হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় হচ্ছে। অর্থাৎ যমে একদিকে টান্‌ছে, আর আমি একদিকে টান্‌ছি।' এরপর আমি বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে এনে সাধুবাবাকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেই। এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে আমি দুইটি পরিবারকে রক্ষা করি। পরে জানতে পারি সাধুসেবার ব্যয় বাবদ এক বৎসরের মধ্যে শ্বশুরমশাই-এর বসত বাটীটা পর্যন্ত বন্ধক পড়েছে। নগদ টাকা যা কিছু ছিল, তা তো ওঁর গর্ভে গেছেই, এমন কি ওঁর জমি-জমাগুলো পর্যন্ত নীলামে উঠেছে।"

এইবার কেন শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সময় সময় সাধুভক্ত হয়ে উঠে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

দৈহিক রোগের ন্যায় মানুষ বহুপ্রকার মানসিক রোগেও ভুগে থাকে। মানসিক রোগ দৈহিক রোগ অপেক্ষা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কিন্তু মানসিক রোগকে আমরা রোগ রূপে স্বীকার করি না, পুরাপুরি পাগল না হয়ে উঠলে অনেক সময় এই সকল মানসিক রোগ দৈহিক রোগ রূপেও চালু হয়। এই মানসিক রোগের বিষয় রোগীরা পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় না। দিনের পর দিন মনের মধ্যে একটা নিদারুণ অশান্তি নিয়ে তারা এই রোগে ভুগে। কিন্তু লজ্জায় এই রোগের কথা তারা কাউকে বলে না। এই কথা বলতে পারলে তারা নিরাময় হতে পারতো, যুক্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা এর ঔষধের সন্ধান মিলত। আমি এমনও বহু রোগীকে জানি যে তার রোগের কথা অপরকে বলার পরেই ভাল হয়ে উঠেছে। এই বলতে না পারাই ছিল তার মানসিক অশান্তির একমাত্র কারণ। অনেকে এই সব মানসিক রোগ স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারা সারিয়ে ফেলে। কারও বা পরবাক্-প্রয়োগের [outside suggestion] প্রয়োজন হয়। ব্যর্থ, আশা আকাঙ্ক্ষা, দমনীত স্পৃহা বা ইচ্ছা এবং দমনীত [Repressed] ভয় বা দমনীত যৌনবোধের কারণে এই সব রোগের উৎপত্তি হয়। হঠাৎ শোক বা ভয় পেলেও এই সব রোগ এসে থাকে। এই সকল রোগ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে কোনও একটি বিশেষ চিন্তা মানুষের অপরাপর চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে নিয়ত আঘাত হানে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষের মন কোনও একটি চিন্তা অধিকক্ষণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়। একটির পর একটি চিন্তা তার মনে এসে মুহুর্মুহুঃ তাকে বিরক্ত করে। এইরূপ

অবস্থায় মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। কয়েক ক্ষেত্রে ভগবৎ জিজ্ঞাসাও মানুষের মনকে উত্ত্যক্ত করেছে। মৃত্যুর পরের কথা তারা জ্ঞাত হতে চায। বহু বৃদ্ধের মন মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে সান্ত্বনার বাণী কামনা করে। স্ববাক্-প্রয়োগে এই রোগ সারাতে মানুষ অক্ষম হলে অনেক সময তারা তাদের এই মানসিক রোগের কথা সাধু-সন্ন্যাসীদের বলে বসে; চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হলে মানুষ সাধু বা গুরুর কাছে আসে। এই গুরু বা সাধুগণও মানুষের এই সকল দুর্বলতা সম্বন্ধে ভাল রূপেই অবগত থাকেন। এঁরা তখন নানারূপ বাক্-প্রয়োগ দ্বারা এই সকস রোগ বা অশান্তি হতে মানুষকে মুক্ত করে দেন। বলা বাহুল্য যে, কোনও আত্মীয়স্বজন দ্বারাও এই কার্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারত। কয়েক মিনিট বাক্-প্রয়োগ এবং কারণ নির্দেশের পব রোগী এমনিতেই নিরাময় হয়ে উঠে। এজন্যে সাধু-সন্ন্যাসীর দরকার হয় না। এই ভাবে নিরাময় হওয়াষ পর মানুষ এই সব সাধুদের অত্যন্তরূপ অনুগত হয়ে উঠে। অনেক সময় এই সব চিন্তারোগ বা অশান্তির পুনরাবির্ভাবও হয। মানুষ তখন পুনরায় উপকারী সাধুটির কাছে আসে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বা ভাইটামিন এবং হরমনের ঘাটতিতেও এরূপ স্নায়বিক ও মানসিক রোগ হয়। কোনও কোনও সাধু বাক্-প্রয়োগের দ্বারা মানুষের মধ্যে এই সব মানসিক রোগ সৃষ্টি করেন। মানুষের মন এই ভাবে অতি মাত্রাতে অশান্ত হয়ে উঠলে সেই সাধু আবার উল্টা বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাকে নিরাময় করে বশীভূত করেন।

বহু ব্যক্তি ম্যাজিকের মারপ্যাঁচ দ্বারাও এই অপকার্য করে থাকেন। ম্যাজিক মাত্রই হাত সাফাই বা কতকগুলি রসায়ন দ্রব্যের মারপ্যাঁচ মাত্র। একথা বর্তমান পৃথিবীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের

জানা আছে। এই ম্যাজিকের সাহায্যে কোনও কোনও সাধু নানারূপ গন্ধ বার ক'রে গন্ধ-বাবা সাজেন এইরূপ ভেল্কির সাহায্যে অলৌকিক শক্তি দেখিয়েও কেহ কেহ শিষ্যদের বশীভূত করে থাকেন। শিষ্যদের বশীভূত করার জন্যে সাধুবাবারা আরও একপ্রস্থ এগিয়ে যান। পরপুরুষ সাহচর্যের স্পৃহা প্রায় সকল মেয়েদের ভিতরই কম-বেশি বর্তমান থাকে। বলা বাহুল্য, এই বিশেষ স্পৃহা স্ত্রী মাত্রেরই আদিম স্পৃহা। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবী তার এই আদিম স্পৃহা ত্যাগ করেছে। কিন্তু তা হলেও যে কোনও দুর্বল মুহূর্তে সে এই বিশেষ স্পৃহার কবলে পুনরায় পড়তে পারে। ভয়, ভাবনা, আত্মসম্মান এবং কর্তব্যবোধ মানবীকে তার এই স্বাভাবিক স্পৃহা হতে রক্ষা করে। অপরাধ-বিজ্ঞানের তৃতীয় এবং প্রথম খণ্ডে বিষয়টি সম্যকরূপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গুরু-সেবার মধ্যে লজ্জাবোধের কারণ নেই। মেয়েরাও এই সুযোগে তাদের এই সুপ্ত স্পৃহার [গুরুসেবা দ্বারা] উপশম ঘটায়। তবে উহা অবচেতন মনের মধ্যেই অধিক ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকে। বাহিরে বা চেতন মনে উহা কদাচিৎ প্রকাশ পায়। তবে তাদের মনে এই ইচ্ছা বা স্পৃহা প্রকাশ পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে প্রায়শঃ গুরু বা সাধুর বয়স বা ইচ্ছার উপর। আসলে বাক্-প্রয়োগ এবং অভিনয় দ্বারা সাধু-সন্ন্যাসীরা শিষ্য ও শিষ্যাদের বশীভূত করেন। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক গল্প উদ্ধৃত করলাম। এই গল্পটি হচ্ছে আমার শোনা একটি গণ-গল্প। এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হলেও এর বৈজ্ঞানিক দিকটা কখনই অবিশ্বাস্য নয়। সাধু বাবাদের প্রচারকগণ [tout] মুখে মুখে এইরূপ বহু গল্প রচনা করে তা রটনা করেন। অন্য দিকে সাধুদের

বিপক্ষ পক্ষীয়রাও বহু অনুরূপ গালগল্প সমূহ এতৎসম্পর্কে প্রচার করেছেন।

"অমুক ষ্ট্রীট্ দিয়ে আমি গন্তব্য স্থানে যাচ্ছিলাম। হঠাং আমি দেখি সামনে এক সাধুবাবা। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি একটা খড়ি দিয়ে রাস্তার এপার হতে ওপার পর্যন্ত একটি দাগ কেটে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ভো ভাই সব! মাৎ যাও উধার। যো উধার যায়েগা উ জল যায়গা!' ঠিক এই সময় একজন পোস্টাল পিওন এসে সেখানে হাজির। মানা সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়া মাত্র সাইকেল সমেত ছিটকে পড়ে সে কেঁদে উঠল, 'ওরে বাবা জলে গেলাম, ওঃ।' তার হাতের মনিঅর্ডার ফর্ম ও তার টাকা কয়টাও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সরকারী টাকা-কড়ি ও কাগজপত্র রাস্তা থেকে উঠিয়ে নিয়ে সাইকেলে মুহুর্মুহুঃ ঘণ্টি দিতে দিতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। এর পর খড়ির দাগের ওপারে আর কেউ এগুতে সাহস করে না। দেখতে দেখতে সেখানে প্রায় দুই শত লোকের বিরাট ভিড় জমে গেল। এর কিছুক্ষণ পরে সেখানে এসে হাজির হলেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। হাতে তাঁর দধির হাঁড়ি ও সন্দেশের ঝুড়ি। আমরা অনেকেই তাঁকে ওপারে যেতে মানা করলাম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই কারও কোন মানাই কানে নিলেন না। 'যত সব—'বলে তিনি দাগের ওপারে একটি মাত্র পা বাড়িয়েই 'জলে মলুম, জলে মলুম' শব্দে উপুড় হ'য়ে পড়ে গেলেন। তাঁর হাতের দধি ও সন্দেশের পাত্র দুইটিও চুরমার হয়ে রাস্তার উপর ভেঙে পড়ল। এর পর সেখানে এসে হাজির হলেন একজন অ্যাংলো সাহেব ও তাঁর মেম। গট্ গট্ করে এগিয়ে এসে দাগের ওপর পা দেওয়া মাত্র তাঁরাও এক লাফে পিছিয়ে এসে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওঃ মাই গড্, বারনিং সেনসেশন্!' এর পর সাধুবাবা

একটু হেসে দাগটা পা দিয়ে মুছে ফেলে বললেন, 'ঠিক হ্যায়, হো গিয়া। আপ লোক যানে শেক্তা আভি।' ততক্ষণে সেখানে প্রায় হাজার দশ লোক এসে জমেছে। এরপর সাধুবাবা লম্বা লম্বা পা ফেলে মাইল খানেক হেঁটে এসে তাঁর আস্তানায় উঠলেন। সাধুবাবার পিছন পিছন তাঁর আস্তানা পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক লোক এসে গেল। আস্তানার ভিতরকার একটা হলঘরে প্রায় জন দশ-বারো ভক্ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনতে পেলাম যে, সাধুবাবার বয়স নাকি একশ সাতাত্র বৎসর। কায়কল্পের দ্বারা নাকি তিনি এত অল্প বয়স্কের মত রয়ে গেছেন। তা ছাড়া ধ্যানে বসার সময় না'কি তিনি মাটি হতে প্রায় ইঞ্চি দুই উপরে উঠেন। এ ছাড়া এঁর কাছে না'কি লর্ড ক্লাইভের লেখা একখানা চিঠিও আছে। চিঠিখানাতে লর্ড ক্লাইভ তাঁকে 'মাই ডিয়ার ইয়ং সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করে তাঁর কাছে তিনি সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন, ইত্যাদি। এর পর দেখতে দেখতে হলঘরে সাজানো রেকাবিগুলি সিকি, আনি ও টাকাতে ভর্তি হয়ে উঠতে থাকল।

আমি প্রত্যহই এসে এই সাধুকে একবার করে দর্শন করে যেতাম। এর কয়দিন পরে সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত হলো। সাধুবাবা না'কি একজন ফেরার খুনে আসামী, তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। পুলিশের ধমকে সাধুবাবা মিনতি জানিয়ে বলে উঠলেন, 'কেন স্যার আমাকে দিক্ করছেন? সর্বশুদ্ধ এ কয়দিনে আমার আয় হয়েছে মাত্র সাত শ' পঞ্চাশ। এ থেকে আমাকে সেই পিওনটাকে দিতে হয়েছে দেড় শ' টাকা। খাবার শুদ্ধ পড়ে যাওয়া প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে আমি দিয়েছি আড়াই শ' টাকা। এ ছাড়া সেই সাহেব ও তার মেমসাহেবকে দিতে হ'ল এক'শ করে দুই

শ' টাকা। এই সব খরচ-খরচা বাদে আমার ভাগে পেয়েছি কুল্লে মাত্র দেড় শ' টাকা। হুজুর এবারকার মত ছেড়ে দেন। আসলে আমার কপালটাই হলো মন্দ। তা না হলে একটা মাসও সবুর সইল না, আপনাদের—"

এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি হয় তা'হলে বড় বড় ব্যারিস্টার, প্রফেসার, হাকিম এবং জমিদাররা, এমন কি ধুরন্ধর ব্যবসাদাররাও এই সব সাধুবাবাদের ভেল্কিবাজিতে ভুলে যান কেন? এর উত্তরে এইরূপ বলা যেতে পারে: মানুষের মনোদেশে অনেকগুলি কেন্দ্র বা পয়েন্ট থাকে। একটি কেন্দ্রে সে মূর্খ রোগী পাগল হলেও অন্যান্য পয়েন্ট বা কেন্দ্রে সে একজন সহজ বা স্বাভাবিক মানুষই থাকে। যান বিশেষের চাকার অনেকগুলি পোক [poke] বা কাটি থাকে, এর একটি পোক্ কেটে বা ভেঙে গেলেও চাকাটি সমান ভাবেই ঘুরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটু-আধটু খট্ খট্ শব্দ হয়, এই যা। এই ভাবে মনের একটি কেন্দ্রে মানুষ দুর্বল থাকলেও তার অপর কেন্দ্রগুলি সবলই থাকে। এজন্য অপরাপর বিষয়ে তাদের সহজ মানুষের মতই দেখা যায়।

এই সকল সাধু-সন্ন্যাসী বা গুরুদেবেরা অনেক সময় বিকল্পের সাহায্যেও মানুষ ঠকিয়ে থাকেন। বিকল্প দুই প্রকারের হয়, যথা—(১) বহির্বিকল্প, (২) অন্তর্বিকল্প। রজ্জু-সর্প, মায়া-মরীচিকা প্রভৃতি বহির্বিকল্পের [illusion] দৃষ্টান্ত। এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই বিকল্প [ভুল দেখা] চক্ষু হ'তে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্য দিকে অন্তর্বিকল্পের [hallucination] মধ্যে কোনও রূপ বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অন্তর্বিকল্পের বিষয়বস্তু চিন্তার দ্বারা মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয় এবং পরে উহার ছবি মস্তিষ্ক হ'তে চক্ষুর দিকে প্রবাহিত হয়। এইরূপ অবস্থায়

আমরা ভূত, বিভীষিকা প্রভৃতি দেখে থাকি। কেহ কেহ এই অবস্থায় স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার অলীক ছবিও দেখে থাকেন। অর্থাৎ কি'না প্রথম ক্ষেত্রে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রম হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সর্প বা রজ্জু কোনটিরও অস্তিত্ব থাকে না। অথচ মানুষ ভুলে সর্প দেখে থাকে। তাদের উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কারণেই এইরূপ ঘটে। এই ধরনের ভুল পরিদর্শনকেই আমরা অন্তর্বিকল্প বলি। ঠগী অপরাধীরা মানুষের এই সব স্বভাবগত বিকল্প সম্বন্ধে অবহিত থাকে এবং তারা প্রায়ই কখনও বাক্-প্রয়োগ [suggestion] দ্বারা কখনও বা হাত সাফাই বা ম্যাজিকের সাহায্যে দুর্বল-চিত্ত মানুষের মধ্যে বিকল্পের সৃষ্টি ক'রে নানা রূপে তাদের ঠকিয়ে থাকে। মাদক দ্রব্য সেবন, অতিরিক্ত শ্রম, দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনতার কারণেও অন্তর্বিকল্পের সৃষ্টি হয়। এইরূপ অবস্থায় কোনও কিছু চিন্তা করা মাত্র উহার একটি ছবি মস্তিষ্কের মধ্যে জাত হয়ে থাকে। আমরা প্রায়ই দেবতার দুয়ারে হত্যা দিয়ে ঔষধ লাভের বা স্বপ্নদেখার কাহিনী শুনে থাকি—বলা বাহুল্য, ইহাও এক প্রকারের অন্তর্বিকল্প মাত্র। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম।

"বৃদ্ধা মহিলাটি পুত্রের রোগ নিরাময়ের জন্যে প্রায় সাত মাইল হেঁটে আমাদের ঠাকুর বাড়িতে এসে পৌঁছান। এ ছাড়া নিয়ম মত সমস্ত পথ তিনি ভূমি চুম্বন করতে করতে এসেছেন। ঐ সময় পথশ্রমে তিনি অতিমাত্রাতে ক্লান্ত। অতি পরিশ্রমের ফলে পেশীসকল তাঁর অসাড় হয়ে এসেছে। তার উপর তাঁর তিন দিন তিন রাত উপবাস। এই সময় তাঁর মানসিক অবস্থা কিরূপ হ'তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই সুযোগে চরণামৃতের নামে তাঁকে আমরা মাদক দ্রব্য সেবন করিয়ে দিই। এইরূপ অবস্থায় বৃদ্ধা মন্দিরের দুয়ারে শুয়ে পড়েন। তিনি

এইভাবে শুয়ে পড়ে হত্যা দেবার পূর্বাহ্নেই যদি তাঁকে বাক্-প্রয়োগ [suggestion] দ্বারা বলে দেওয়া যায়, যে তিনি এই দেখবেন বা শুনবেন তা হলে স্বপ্নে তিনি সেই সবই দেখেন বা শুনে থাকেন। সাধারণ নিয়মানুসারেই এইরূপ হয়ে থাকে। কিন্তু পূজারীরা সকল সময়ই এইরূপ পন্থা অবলম্বন করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে শুয়ে পড়লেও এই অবস্থায় মানুষ বহির্জগতের সহিত একেবারে সম্পর্ক শূন্য হয় না। আমি একজন তথাকথিত জাগ্রত দেবতার পূজারী। তাই বিশেষ সত্যটি সম্বন্ধেও আমি অবগত ছিলাম। বৃদ্ধা হত্যা দিয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি রাত্রিযোগে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতে থাকি, 'অয়ি বৃদ্ধা, ভয় নেই। তোমার পুত্র নিরাময় হবে। পুকুর পাড়ের সিঁড়ির শেষ ধাপে একটা শিকড় আছে। সেটি নিয়ে পিষে তাকে খাইও।' চিন্তাক্লিষ্ট বৃদ্ধার এই সময় অল্পমাত্র জ্ঞান ছিল। চোখ বুজে আমার কথাগুলো শুনার পর সে ঘুমিয়ে পড়ল। এদিকে আমরাও যথাস্থানে বৃদ্ধার জন্যে শিকড়টি রেখে এলাম। কোনও কোনও সময় আমরা এই সকল ব্যক্তিদের হাতের মুঠার মধ্যে ঔষধাদি গুঁজেও দিয়ে থাকি। অকস্মাৎ ক্লান্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক বিকারের কারণে আমাদের এই কারসাজি তারা বুঝেও বুঝতে পারে না। বহুক্ষেত্রে আগে-ভাগে সাজেসশন দিয়ে রাখলে বিশ্বাসী লোক তাই স্বপ্ন দেখে। এমন কি অপরে যা দেখেছে বা পেয়েছে বলে সে শুনেছে—তাই সে আশা করে এবং তা সে স্বপ্নেতে দেখে। অনেক সময় স্ববাক্-প্রয়োগ দ্বারাও সুফল ফলে। স্ববাক্-প্রয়োগের [auto-suggestion] কারণে তারা স্বপ্ন দেখে, অমুক জায়গায় গেলে সে একটা কিছু পাবেই। কথিত জায়গায় গিয়ে সে 'যা কিছুই' দেখে, তার মনে হয় 'তাই' যেন সে স্বপ্নে দেখেছে। দ্রব্যটি

সম্বন্ধে অবসাদ-ক্লান্ত দেহে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা মাত্র মনে ধ্রুব বিশ্বাস হয় যে সেই দ্রব্যটিই সে স্বপ্নে দেখেছে। এই কারণে হত্যা দিতে আসা ভক্তদের আশে-পাশে আমরা নানারূপ দ্রব্যাদি ছড়িয়ে রাখি। হত্যা দেবার পূর্ব হতেই সে ঐ সব দ্রব্য দেখে বটে, কিন্তু মনোবিকারের কারণে উহা তারা সেই সময় দেখেও দেখে না। আসলে ঐ সব দ্রব্যাদির স্মৃতি তাদের অবচেতন মনে থাকে। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের অবচেতন মন হ'তে সেই সকল দ্রব্যের স্মৃতি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে চেতন মনে উপনীত হয়। এই কারণে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা দ্রব্য তার হাতের মুঠার কাছে পড়ে থাকতে দেখে তারা অবাক হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এ সময়ে বলে উঠে, 'বাবা দেবাদিদেব! দয়া তা হলে তুমি করলে, বাবা।' 'হত্যা দেওয়ার' দ্বারা স্বপ্নাদ্য ঔষধাদি প্রাপ্তির মূল তথ্য আসলে এইরূপই হয়ে থাকে।"

[বহু সাধু স্টেশন হতে বহু দূরে আশ্রম করেন। পথেতে যাত্রীদের মধ্যে বহু ছদ্মবেশী চর থাকে। এরা তাদের সাথে কথোপকথনের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য জেনে তা সাধু বাবাকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যে এদেরকে আশ্রমে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়েও রাখা হয়েছে।]

এতদ্‌ব্যতিরেকে বহু ব্যক্তি নিজের মনকে ও অপরকে বুঝানোর জন্যে এ বিষয়ে বহু মিথ্যে কথাও বলে থাকে। এগুলিকে বলা হয় প্যাথোলজিক্যাল লাইস।

এইবার এই সম্পর্কে আমাদের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে, আচ্ছা! তাই যদি সত্য হয় তা হলে এই স্বপ্নাদ্য ঔষধাদির দ্বারা সময় সময় মানুষের ব্যাধি আদি নিরাময় হয় কেন? এর উত্তর স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, হ্যাঁ, কদাচ রোগ সারে বটে! কিন্তু তা সারে

কেবলমাত্র বিশ্বাসের কারণে বা মনের জোরে। বিশ্বাস মানুষের স্নায়ু সকল সতেজ করে তুলে। স্নায়ু সকল এইভাবে সবল হওয়ায় দেহাভ্যন্তরের প্রতিষেধক ব্যবস্থাগুলি কর্মতৎপর হয়ে উঠে—এই কারণে সময় সময় একমাত্র বিশ্বাসের কারণেও মানুষকে নিরাময় হতে দেখা যায়। এছাড়া অধিকক্ষেত্রে মানসিক রোগ সকল দৈহিক রোগ রূপে চালু হয়ে যায়। দৈহিক রোগ বিধায় আমরা দৈহিক রোগের চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফলও পাই না। উদর এবং হৃৎপিণ্ডের রোগের মূলে প্রায়ই মানসিক রোগ থাকে। এই অবস্থায় এই সব মাদুলি মন্ত্র আদি বাক্-প্রয়োগের স্থলাভিষিক্ত হয়ে রোগীদের নিরাময় করতে সক্ষম হয়। এইভাবে চিকিৎসা বিনা অর্থ ব্যয়ে পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনরাও করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার কোন এক প্রতিবেশী বহু বৎসর ধরে শ্বাস [হাঁপানি] রোগে ভুগছিলেন। আমি বাক্-প্রয়োগ দ্বারা তাঁর এই রোগের চিকিৎসা করতে মনস্থ করি। একদিন কথোপকথনের সময় আমি তাঁর কাছে একটি অলীক গল্পের অবতারণা করি, 'দেখুন! একজন বড় বৈজ্ঞানিক দুই বৎসর আগে ভারতবর্ষে এসে হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে একটি মূল্যবান হীরক খণ্ড সংগ্রহ করেন। এই হীরক খণ্ডটি তাঁর গ্রাণ্ড হোটেলের কক্ষ থেকে চুরি যায়। আমি অতি কষ্টে তদন্ত দ্বারা এই মূল্যবান হীরক খণ্ডটি এক পুরনো চোরের নিকট হ'তে উদ্ধার করি। সাহেব তখন খুশি হয়ে আমাকে একটা লালরঙের ঔষধ দিলেন। এই অমূল্য ঔষধ ছিল হাঁপানির। সাহেব বলেন যে, এক শিশি ঔষধের দাম দশ হাজার টাকা। কারণ, এর একটি ফোঁটা এক-একজন হাঁপানি রোগীকে চিরকালের মত নিরাময় করতে সক্ষম। এই ঔষধটি আমি

দুইটি রোগীর উপর পরীক্ষা করেছিলাম। এই দুইটি রোগীই আশ্চর্য-জনক ভাবে সেরে উঠেছে। ঔষধটি আমি আমার দেশের বাড়িতে রেখে এসেছি। তাতে মাত্র আর একজনকে সারাবার মত ঔষধ আছে। আপনার জন্যে ঔষধটা আমি আনিয়ে রাখব।' বলা বাহুল্য, কাহিনীটি সর্বৈব মিথ্যা ছিল ; কিন্তু ভদ্রলোক আমার কথা রীতিমত বিশ্বাস ক'রে আমাকে ঔষধটি আনিয়ে নেবার জন্যে বিশেষরূপ পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। আমি আজ নয় কাল হবে, কাল নয় পরশু হবে—এইরূপ স্তোকবাক্য দ্বারা তাঁকে অত্যন্তরূপ উতলা করে তুলি। শেষ বরাবর ভদ্রলোক রেগে গিয়ে আমার এই ইচ্ছাকৃত ভুল বা দীর্ঘসূত্রতার জন্যে আমাকে অনুযোগ করতে থাকেন। শেষে একদিন সত্যই ঔষধটি আমি তাঁকে এনে দিই। ঔষধটি কয়েকদিন সেবন করার পর তিনি সত্য সত্যই সেরে উঠলেন। আসলে কিন্তু একটু মধু কিনে তাতে লাল রং করে ঐ রং করা মধুটুকু একটা দামী বিলাতি শিশিতে ভরে সেটা তাঁকে আমি এনে দিয়েছিলাম।"

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিশ্বাস সকল সময় কার্যকরী হয় না। বিশ্বাসের সহিত প্রকৃত ঔষধেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, বীজাণু তার আপন কার্য করে যায়। এ ছাড়া শিশুদের এবং জড় [idiot] ও নির্বোধদের উপর এইরূপ বাক্-প্রয়োগ একেবারেই কার্যকরী হয় না। এই স্থলে প্রবঞ্চকগণ ধর্মের নামে এদের শুধু প্রবঞ্চনা ও সেই সাথে হত্যাও করে। বহুদিন পূর্বে আমি কোনও এক গ্রামে "বুড়ো শিবতলায়" বেড়াতে গিয়েছিলাম। বহু লোক সেখানে এসে শিবঠাকুরের মাথায় ডাবের জল ঢালতেন। সেই জল একটা নালা ব'য়ে অদূরের একটি গর্তের মধ্যে জমা হ'ত। দূর-দূরান্তর থেকে মেয়েরা রুগ্ন শিশু পুত্রদের সেখানে এনে সেই বিল্বপত্র পচা জল তুলে তাদের পান

করাতেন। এর বিষময় ফল সম্বন্ধে চিন্তা করে আমি শিউরে উঠি এবং স্থানীয় ডাক্তারকে এই সম্বন্ধে আমি আমার অভিমত জানাই। উত্তরে ডাক্তারবাবু বলেন, এর অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে কোনও ফল হবে না বরং নালাটা সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে গর্তের জল প্রতিদিন বদলানোর ব্যবস্থা করাই আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে। এ ছাড়া আমি এও লক্ষ্য করি যে অকুস্থলে আনীত শিশুগুলির গলদেশে নানা প্রকারের বহু মাদুলী ঝুলানো রয়েছে। এই তাম্র মাদুলী-গুলি তারা মুখে পুরে সেগুলা জিভ দিয়ে চুষছিল। এর পর আমি ভাল রূপেই বুঝতে পারি যে পল্লী অঞ্চলে শিশু মৃত্যুর হার এত বেশি কেন?

পল্লীবাসীদের অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসই এই সব অঘটনের একমাত্র কারণ। এই সব ধর্ম বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কত সহজে তাদের ঠকানো বা জব্দ করা যায়, তা নিম্নের বিবৃতিটি থেকে বুঝা যাবে।

"আমরা বাল্যকালে গ্রামের কাউকে জব্দ করার জন্যে আমরা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করতাম। কালী, কার্তিক বা সরস্বতী পূজার পূর্ব দিনে আমরা একটি কালী মাতার বা কার্তিকের বা সরস্বতী ঠাকুরের মূর্তি কিনে এনে আমাদের শত্রুদের বাড়ির উঠানে রাত্রি যোগে রেখে আসতাম। এই সব লোকেরা আমাদের এজন্য সন্দেহ করে গাল দিত বটে, কিন্তু কর্জ করেও এই সকল প্রতিমার তারা পূজার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হ'ত।

এ ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারাও আমরা প্রতিবেশীদের ঠকিয়েছি। আমাদের মধ্যে একজন দাড়ি ও পরচুল পরে কসাই সাজত। তার সঙ্গে থাকত একটা নিটোল বক্না গাভী। এদিকে আমরা মিথ্যে করে রটিয়ে দিতাম যে কসাই লোকটা জবাই করবার

জন্ত গাভীটি নিয়ে যাচ্ছে। এই বলে আমরা পল্লীবাসীদের নিকট হতে পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে ঐ গাভীটিকে কসাই-এর কবল হতে মুক্ত করবার জন্যে চাঁদা স্বরূপ ষাট-সত্তর টাকা আদায় করেছি। আমাদের পাঠাগারের জন্যে পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজনেই এই ভাবে প্রয়োজনীয় অর্থাদি আমরা সংগ্রহ করতাম। কারণ আমরা জানতাম যে, ধর্মের নামে অকাতরে অর্থ দিলেও জনহিতকর কার্যের জন্যে কখনও একটি পয়সাও এরা দান করবে না। এ ছাড়া সাধুসন্ন্যাসীদের অনুকরণে পরচুলা পরে সাধু সেজে আমরা কাউকে সন্তান হবার জন্যে, কাউকে বা রোগ হতে নিরাময় করবার জন্যে মাদুলী বিতরণ করেও প্রচুর অর্থ উপায় করতাম।

বিদ্যাটা বাল্যকাল হতেই আমি অভ্যাস করেছিলাম। তাই এই বিদ্যার দ্বারাই আমি সংসার-যাত্রা নির্বাহ করি! দেখুন, স্যার! অমুক ধনী ব্যবসায়ীকে আমি গুণে বলে দিয়েছি যে সে তার অপহৃত দ্রব্য ফিরে পাবে। দেখুন না আপনি মশাই, যদি দয়া করে তদন্ত করে আপনারা চোরের সন্ধান করে দ্রব্যগুলি উদ্ধার করতে পারেন। আমার রোজগার-পত্র একেবারে কমে গেছে। এখন আমি কি করব বলুন, মশাই; ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে চুরিটা তো আর করতে পারি না। এ্যাঁ, ও আপনি কি বলছেন? আমি মা কালীর সঙ্গে কথা কই কি'না? তা ওকথা সকলকে বলতে হয় তাই বলি। আপনি আসল বিষয় সবই বুঝতে পারছেন। তান্ত্রিক সাধু সেজে কয়েকটি মড়ার খুলি যোগাড় করে আসন না-বানালে লোকে ভয় পাবে কেন? অনেকে যে ভয় পেয়েই বেশি প্রণামী দেয়। তারা ভাবে প্রণামী কম দিলে মা কালীর ভূত-পেত্নীরা হয়ত তাদের অনেক ক্ষতি করে দেবে, ইত্যাদি।

এর আগে কিছুদিন আমি নবদ্বীপে এসে বৈষ্ণব সাধুও সেজে-ছিলাম। কি উপায়ে ব্যবসাটা আমি প্রথম সেখানে শুরু করি সেই সম্বন্ধে বলছি। শুনুন! নবদ্বীপের কোনও এক মন্দিরের বিগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন আমি কেঁদে উঠি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিযে কাঁদতে কাঁদতে আমি বলতে থাকি, 'এ কি-ই মুর্তি-ই। এ কি-ই আমি দেখছি-ই ইত্যাদি।' সেই সময় সেখানে অনেকগুলি ভক্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। আমার কপালের শ্বেত চন্দনের ফোঁটা ও লোহিত বস্ত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে একজন প্রৌঢ়া মহিলা বলে-উঠলেন, 'কে বাবা তুমি? এ্যাঁ? এ যে রাজপুত্তুর।' বলা বাহুল্য, আমার চেহারাটি ছিল ঠিক ননীর পুতুলের মত। এ ছাড়া কণ্ঠ-সঙ্গীতে আমি ইতিমধ্যেই নাম করেছিলাম; এর পর আমি সুললিত স্বরে নাম গান করতে করতে গৃহাভিমুখে চলতে থাকি এবং আমার পিছন পিছন চলতে থাকেন অসংখ্য দেবভক্ত নরনারী। ব্যবসাটি সেখানে আমার বেশ জমে উঠেছে। এমন সময় এক নারীঘটিত ব্যাপারে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় আমি হঠাৎ একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করে কলকাতায় এসে পঞ্চমুণ্ড আসনধারী মহাযোগী পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধু হয়েছি। এই পদ্ধতিতে সুবিধা অনেক, এমন কি, স্ত্রী সম্ভোগ ও মদ্যপানেরও।

এইবার কি উপায়ে আমরা হাত দেখি বা প্রশ্ন গণনা করি, সেই সম্বন্ধে বলি, শুনুন। আমাদের কাছে বহু প্রকারের লোক আসে, যথা বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসী। এদের আমরা অতি সাবধানে চিনে নিই। অবিশ্বাসী লোকদের আমরা আদপেই আমল দিই না। এদের আমরা পাপী ব'লে তৎক্ষণাৎ বিদায় করে দিই। কিন্তু বিশ্বাসী লোকদের আমরা আদর করে কাছে ডাকি। এমনি নানা কথাবার্তা

এবং যত্ন আয়ত্তির মধ্যে সে নিজের অসতর্কতাতে নিজেদের সম্বন্ধে অনেক কথা বলে ফেলে। কিন্তু পরে তাদের এই সব কথা প্রায়ই স্মরণ থাকে না। উত্তেজিত মন ও বিভ্রলতার কারণেই ইহা ঘটে থাকে। এর পর অন্য কথাবার্তার দ্বারা তাকে একটু অন্যমনস্ক করে দিয়ে অনেকক্ষণ পর তার কাছ থেকে কথায় কথায় বার করে নেওয়া কাহিনীগুলিই হাতের রেখা গণনার ছলে তাকেই আমরা শুনিয়ে দিই। একটা দারুণ উদ্বেগ এবং উত্তেজনা তাদের মনের মধ্যে সব সময়ে বিরাজ করাব জন্যই আমাদের এই চালাকি তারা ধরতে পারে না। সাধারণতঃ শোকতাপ বিপদগ্রস্ত বা অভাবী অন্নক্লিষ্ট ও লোভী লোকেরাই আমাদেব কাছে এসে থাকে। এই কারণে তাদের মনকে নানা উপায়ে চঞ্চল করে পূর্বাহ্নেই তাদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নেওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটি মাত্র কাহিনীর কিছু জেনে নিলে বাকি কাহিনীটুকু বা তাদের পরবর্তী কাহিনীগুলি অনুমান করে নেওয়া খুবই সহজ। কারণ জীবনের একটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ আর একটি ঘটনা ঘটে থাকে। একটি ঘটনার সহিত অপর একটি ঘটনার প্রায়ই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। ধরুন, প্রতি মাসে আমাদের কাছে গড়ে একশ' জন ভক্ত আসে। এদের মধ্যে আমাদের পনের জনকেই খুশি করতে পারাটা কি আমাদের সুনামের পক্ষে যথেষ্ট নয়! এই পনের জন আমাদের কি সুনামই না যত্রতত্র গেয়ে বেড়ায়? কোনও লোক আমাদের কাছে এলে প্রথমে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার বেশভূষা ও চালচলন পরিলক্ষ্য করি। এই বেশভূষা ও চালচলন থেকে আমরা বুঝে নিই যে সমাজে তার স্থান কোথায়। সে একজন ব্যবসায়ী, চাকুরে বা জমিদার, তা থেকে সহজেই বুঝা যায়। তার বয়স ও শরীরের গঠন দেখে আমরা সে বিবাহিত বা অবিবাহিত কিংবা সে

কি প্রকৃতির লোক তাও বলে দিতে পারি। পরিবার ভারাক্রান্ত লোকের চেহারই হয় আলাদা। এ ছাড়া মানুষের ক্রোধ, বিতৃষ্ণা, দুঃখ ও অভাবাদির পৃথক পৃথক রূপ আছে। মানুষের মুখে চোখে এই সব রূপ প্রশ্ন করার সময় তীব্রভাবে ফুটে উঠে। সাধারণ মানুষের অগোচর এমন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পরিবর্তন তাদের মুখে দেখা যায় বা ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষদের চোখে অতি সহজে ধরা পড়ে। প্রশ্নের মধ্যেও মানুষ তার নিজের অসতর্কতায় একটা সূত্র ধরিয়ে দেয়। এই সব সূত্রের সাহায্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অনেকের অনেক পূর্বকাহিনী বলে দিতে সক্ষম। গোলমাল বুঝলে আমি ভক্তদের জানিয়ে দিতাম, 'আচ্ছা কাল মাকে [মা কালীকে] জিজ্ঞাসা করে আপনাকে জানাব।' ইত্যবসরে আমার সহকারী চেলারা ছদ্মবেশে পাড়া ঘুরে তাদের সম্পর্কে বহু সংবাদ আনে। অনেক সময় আমরা মিথ্যা করে ভক্তদের ভয় দেখিয়েছি, 'দেখুন! শীঘ্রই আপনার একটা বিপদ আসছে—এমন কি জীবনহানিরও সম্ভাবনা আছে।' এইরূপ বাক-প্রয়োগের কুফল সুদূরপ্রসারী হয়। এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা মানুষ রোগগ্রস্তও হয়ে পড়ে। এই সুযোগে আমরা যাগ-যজ্ঞ বা মাদুলী বিতরণ করে বেশ কিছু অর্থও ভক্তদের কাছ হ'তে পেয়ে থাকি। কারুর উপর ক্রুদ্ধ হলে তার নামে উল্টা তুলসী দেব এইরূপ ভয় দেখিয়ে তাদের আমরা জব্দও করে থাকি। ভক্তদের মনে বিশ্বাস আনবার জন্যে আমরা নানারূপ উপায় অবলম্বন করি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি পন্থার কথা বলি, শুনুন।

গতকল্য একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার কাছে তার ভাগ্যের ফলাফল জানতে এসেছিল। আমি একটা পৃথক কাগজে 'জবা ফুল, এই কথাটি লিখে কাগজটি তারই মুঠার মধ্যে গুঁজে দিই। এর পর

তাকে আমি একটা ফুলের নাম করতে বলি, বিশেষ ক'রে যে ফুলটা কি'না সে বেশি পছন্দ করে। লোকটা উত্তর দেয়, 'জবা'। আমি তখন কাগজটা তাকে খুলে দেখতে বলি। সে কাগজের মোড়ক খুলে দেখে যে তাতে 'জবা'ই লেখা রয়েছে। এদিকে তার অলক্ষ্যে আরও দুই-চার টুক্‌রা কাগজে যথাক্রমে মল্লিকা, গোলাপ ইত্যাদি ফুলের নাম আমি লিখে রেখেছিলাম। যদি সেই লোকটির উত্তর হ'ত 'গোলাপ', তা হলে তার হাতের মোড়কটা ক্ষণিকের জন্যে স্পর্শ করে হাত সাফাই-এর দ্বারা গোলাপের মোড়কটা তার হাতে গুঁজে দিতাম। ঐ সময় 'জবা' লেখা মোড়কটা আমি অলক্ষ্যে সরিয়ে নিতাম। সাধারণতঃ মধ্য-বয়স্ক ধর্মপ্রাণ লোকেরা জবা ফুল এবং যুবকেরা গোলাপ ফুলই প্রথম মনে করে। বহু দিনের অভিজ্ঞতা হ'তে আমরা এইরূপ জেনেছি। এইভাবে লোকের মনের মধ্যে প্রথম হতেই বিশ্বাস উৎপাদন করে ধর্মের নামে তাদের আমরা ঠকিয়ে থাকি।"

এই সব ব্যক্তিগত অপরাধ ছাড়া ধর্মের নামে দলগত অপরাধও দেখা যায়। এদেশে অনেক মঠ ও আশ্রম কার্যক্ষম সুস্থদেহ যুবকদের আটকে রেখে দেশের পুং শক্তিকে [Manpower] খর্ব করে। এই সকল শক্তিমান যুবক সেইখানে অলস-ভাবে পরগাছার ন্যায় জীবনযাপন করে। এই সকল মঠেও দুই শ্রেণীর যুবক দেখা যায়, যথা—(১) ব্রহ্মচারী এবং (২) অধিকারী। যে সকল যুবক অবিবাহিত, তাহাদের বলা হয় ব্রহ্মচারী। এদের বিবাহ করতে দেওয়া হয় না। কোনও যুবক বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আপন স্ত্রীকে চির জন্মের মত ত্যাগ করে এলে তাদের বলা হয় অধিকারী। যে দেশের মেয়েদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ সেই দেশে এই 'অধিকারী' প্রথা কিরূপ ক্ষতিকর তা সহজেই অনুমেয়। আমার

মতে এই অধিকারী প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করা উচিত। এইরূপ আইন প্রণয়ন দ্বারা আইনকারগণ অনেক সতী-লক্ষ্মীর শুভেচ্ছাই লাভ করবেন। পূর্বকালে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসী প্রথাও প্রবর্তিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে বর্তমানকালে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে। বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা দেশের যুব-শক্তিকে ধর্মের নামে ঘরছাড়া করে যারা তাদের ভিক্ষালব্ধ অর্থে অলস জীবন যাপন করে তাদের অপরাধী ছাড়া কি'ই বা আর বলা যেতে পারে! সহস্র সহস্র যুবককে মঠে ও মন্দিরে এইভাবে আটকে রেখে অকেজো করে দিলে কি জাতিকে দুর্বল করা হয় না? এ সম্বন্ধে দেশবাসীর অবহিত হ'য়ে চিন্তা করা উচিত যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাজশক্তির ধর্মে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন আছে কি'না?

[হিমালয়ের উপর ভারতীয়দের একটা দুর্বলতা আছে। তাই সাধুরা প্রায়ই হিমালয় প্রত্যাগত রূপে নিজেদেরকে প্রচার করেন। এ ছাড়া এনারা নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার স্থান রূপে নবদ্বীপ কাশী কাঞ্চি ও মিথিলাদির নাম করে থাকেন।]

পর-প্রবঞ্চনা অপেক্ষা আত্ম-প্রবঞ্চনা অধিকতর ক্ষতিকর। আত্ম-প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে 'সাধারণ-প্রবঞ্চনা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে। আমরা ধর্মের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনাই ক'রে থাকি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা যাক।

"কয়েক বৎসর পূর্বে কোনও এক সাধক মহাপুরুষের প্রাসাদতুল্য ভবনে তাঁকে দর্শন করার অভিপ্রায়ে আমি গমন করি। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমি মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাই সাহেবকে তাঁর জনৈক শিষ্যের বয়স্থা কন্যাদের নিয়ে হৈ-হল্লা করতে দেখি। বিষয়টি পরিলক্ষ্য করে আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। তখন সাধুপুরুষকে দর্শন না

ক'রেই আমি প্রত্যাগমন করি। ঘটনাটি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সাধু-পুরুষের কোনও এক শিষ্য আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আরে! ঐ দেখেই আপনি চলে এলেন! ঐ তো সেই কাল-ভৈরব। আপনাকে বাধা দেবার জন্যে ওখানে বসে রয়েছে। এই সব মিথ্যা মায়া দ্বারা আপনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়ে দেবে, যাতে আপনি আর এগুতে না পারেন। কিন্তু এই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রেই তো আপনাকে সাধু সন্দর্শনে যেতে হবে। সাধুসন্দর্শন কি আর সকলের ভাগ্যে হয় মশাই? সকলের ভাগ্যে তা হয় না, এ ব্যাপারে পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকা চাই।"

জানি না এর চেয়েও আত্ম-প্রবঞ্চনার ভাল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে আর আছে কি'না? ধর্ম-প্রবণতা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যাভাষী [pathological lies] করে তুলে এই অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ সজ্ঞানে তার আরাধ্য গুরু বা দেবতাদির অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে বহু মিথ্যা কাহিনী প্রচার করে বেড়ায়। সব সময় সে ইচ্ছা ক'রে মিথ্যা বলে তা নয়। মিথ্যা বলতে তাদের একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়। এই মিথ্যা বলার প্রলোভন একরকম মানসিক রোগ। কখনও কখনও এরা পুনঃ পুনঃ চিন্তার দ্বারা মনের একটি বিশেষ অবস্থায় উপনীত হয়। তখন তারা পূর্বেকার প্রকৃত তথ্য [সময়ের ব্যবধানে] ভুলে গিয়ে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি ঘটনা বোধ হয় তাদের চক্ষের সামনেই ঘটেছে—যদিও কি'না সেই সকল ঘটনা কখনও ঘটেনি বা তা ঘটতে পারে না। ইহাও একরকম আরোগ্যযোগ্য মানসিক রোগ। অনেকে আবার এই ধরনের মিথ্যা বলে আত্মতৃপ্তিও লাভ করেন এবং এইরূপ মিথ্যা না বলে তাঁরা মনে শান্তিও পান না। এ ছাড়া মানুষের স্বাধীন চিন্তার অভাব ঘটলে তার সাধারণ বুদ্ধিরও বিলোপ

ঘটে। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে ভালরূপেই বুঝা যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও একপ্রকার সাময়িক মনোবিকার। এই সম্পর্কে নিম্নের চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"বন্ধু বীরুবাবুর মুখে অমুক পল্লীতে এক পাহাড়ীবাবার আবির্ভাবের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে এলাম। একটা গোটা দ্বিতল বাটী ভাড়া ক'রে শিষ্যাদিসহ তিনি সেথায় জাঁকিয়ে বসেছেন। সঙ্গে আছে একটা ছোট জ্যান্ত গুল বাঘ এবং গোটাকতক বিষাক্ত গোখুরা সাপ। একজন মেমসাহেব টাইপিস্টও এদের সঙ্গে আছেন। রীতিমত এত্তালা পাঠিয়ে তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করা যায়। এও শুনলাম তাঁর কামরায় দুই-তিনটা রেডিও ফিট্ করা হয়েছে। এই রেডিওগুলির একটির মারফৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এবং অপরটির মারফৎ শয়তানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলে, ইত্যাদি। বহু ব্যারিস্টার, উকিল, জমিদার প্রভৃতি জ্ঞানী ভদ্রলোকও সেখানে আনাগোনা শুরু করেছেন!

গোপনে শুনতে পেলাম, ইতিমধ্যে পাহাড়ী যোগী অর্থের বিনিময়ে শয়তানি বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তদের বেছে নিয়ে তাদের একপ্রকার অদ্ভুত মন্ত্রও বিতরণ শুরু করেছেন। এই মন্ত্রের দুইটি বিপরীত গুণ সম্পন্ন শক্তি আছে। যথা: নেগেটিভ্ ও পজেটিভ্। উহাদের নর্থ পোল ও সাউথ পোলের সঙ্গেও তুলনা করা চলে। এ মন্ত্র নিজের স্ত্রীর কানে কানে বললে সে পরের হয়ে যাবে এবং পরের স্ত্রীর [পরস্ত্রীর] কানে কানে বললে তাকে আর কেউই ঘরে রাখতে পারবে না। ঐ নারী সতীসাধ্বী হওয়া সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্রের অধিকারীর অঙ্কশায়িনী হবে। আমি এরপর ছদ্মবেশে সাধুবাবার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আচ্ছা! নিজের স্ত্রীর কানে-কানে মন্ত্রটি বললে তো সে তৎক্ষণাৎ অপরের হয়ে যাবে। ও অবস্থায়

তাঁকে কি আর ফিরানোর কোনও উপায়ই থাকবে না?' পাহাড়ী যোগী একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হ্যা, পারা যাবে। কিন্তু অনেক পরে। অর্থাৎ কি'না সে পরস্ত্রী হবার পর তবে তাকে ফিরানো যাবে।' এই সময় পরস্ত্রী বিধায় তার কানে কানে মন্ত্রটি পুনরায় উচ্চারণ করলে সে আপনার [পূর্ব স্বামীর] কাছে ফিরে আসবে। ব্যর্থ প্রেমিকদেরই সাধুবাবা এ ভাবে অত্যন্ত রূপ আয়ত্তে এনে ফেলেছিলেন। এঁদের তিনি কন্যা বিশেষকে বশ করবার জন্যে বহুশত টাকার মাদুলী ও ঔষধাদিও বিতরণ করেছিলেন। ইতিমধ্যে সাধুবাবার এক সাকরেদ [স্থায়ী শিষ্য] সাধুর এক নবাগত ভক্তের যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে উধাও হলেন এবং ভক্তটি নিরুপায় হয়ে পুলিশে নালিশ জানালেন। প্রায় দুই মাস পরে ভক্ত মহিলাটি কলিকাতায় ফিরে এসে জানালেন যে, তিনি ইচ্ছা করে গৃহত্যাগ করেন নি। তাঁকে কোনও এক মন্ত্রশক্তি দ্বারা গৃহত্যাগ করানো হয়েছিল। পরে অবশ্য তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, আত্মরক্ষার কারণেই তিনি এইরূপ মিথ্যার অবতারণা করেছিলেন। এর পর একদিন প্রতারণার অভিযোগে তাঁকে ট্যাক্সি ক'রে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে আসা হয়। এই ট্যাক্সি ভাড়াটা অবশ্য সাধুবাবাই দিয়েছিলেন। জামীনে মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সাধুবাবা ভক্তদের জানিয়েছিলেন যে, ডেপুটি সাহেবের স্ত্রীর দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্যেই তিনি ইনেস্‌পেকটারকে পাঠিয়ে তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে বে-ইজ্জতের বদলে তাঁর মান-ইজ্জত আরও বেড়ে যায়। এর কয়েকদিন পরেই হঠাৎ একদিন সাধুবাবা শিষ্য সমভিব্যাহারে স্থান ত্যাগ করেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এক জায়গায় বেশি দিন প্রতারণার ব্যবসা চালান সম্ভব নয়। ইহার পূর্বে কিন্তু মন্ত্রটি আমি সাধু-

বাবার নিকট হতে জেনে নিয়েছিলাম। পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে উহার কিয়দংশ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। কোনও এক বিশেষ সময় ও ক্ষণে নাকি উহা উচ্চারণ করা উচিত, 'হুঁ ক্রীং হুঁ ক্রীং হ্রং ক্রীঙ হুম্ হাম্ হুম্ হ্রীঙ ইত্যাদি।" এর চেয়ে আজগুবি ও লজ্জাকর ব্যাপার আর কি হতে পারে?"

এই সকল সাধকগণ লোকচরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। তাঁরা কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা আগন্তুকগণ তাঁর কাছে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে তা প্রথমে অবগত হয়ে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"অমুক আশ্রমে এসে দেখি সেখানে উৎসব শুরু হয়েছে। রুপার সিংহাসনে মূল্যবান সিল্কের পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে গুরুদেব বসে আছেন। তাঁর দুই বুক পকেটে দুইটি স্বর্ণ নির্মিত ঘড়ি ঝুলায়মান। তাঁর দুই হাতেও দুইটি হীরক ও মুক্তা খচিত স্বর্ণ ঘড়ি। এ ছাড়া তাঁর ভেলভেট আবৃত দুইটি জুতার উপরও দুইটি ছোট ঘড়ি আঁটা রয়েছে। কেউ কেউ এ জন্য এঁকে ঘড়িবাবা নামে অভিহিত করতেন। ডান হাতে তাঁর একটি হস্তী দন্তের ছড়ি ও বাম হাতে তাঁর চন্দন কাষ্ঠের মালা। এই সময় এক ভক্ত এসে তাঁকে একটি রৌপ্য ঘড়ি উপহার দিলেন। রুপার ঘড়িটি নিয়ে শিশুসুলভ সরলতা সহ উৎফুল্ল হয়ে গুরুদেব বললেন, 'আরে বেটা! এত ঘড়ি হামি কি করবে? আচ্ছা! হামারটা তুই লিবি আর তোরটা হামি লিব।' এই কথা বলে গুরুদেব তাঁর ডান হাতের মুক্তা ও হীরক খচিত স্বর্ণ ঘড়িটি খুলে ভক্তকে তা পরিয়ে দিতে চাইলেন। ভক্ত কিন্তু এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। বহুক্ষণ যাবৎ বাদানুবাদের পর

এই বিষয়ে ঐ ভক্তেরই জয় হ'ল এবং গুরুদেব রুপার ঘড়িটাও বিনাশর্তে গ্রহণ করতে রাজি হলেন। গুরুদেবের নির্লোভ নিস্পৃহতা পরিদর্শন করে সমাগত ভক্তবৃন্দের মস্তক ভক্তিতে নুইয়ে পড়ল। বিষয়টি ধীরভাবে পরিলক্ষ্য করে আমি একটি মতলব মনে মনে এঁটে নিলাম। আমি সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রদেশ হতে একটি মোষের সিঙ দিয়ে তৈরি ছড়ি কিনে এনেছিলাম। বলা বাহুল্য, ছড়িটি আমার খুব শখেরই ছিল। পরদিন ঐ ছড়ি সমেত ঐ আশ্রমে এসে গুরুদেবের পদতলে ঐ ছড়িটি রেখে ভক্তি গদ গদ স্বরে তাঁকে উহা গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম। আমি নিশ্চিতরূপে ধারণা করেছিলাম যে এবার গুরুদেব আমার ছড়িটি গ্রহণ করে পরিবর্তে তাঁর হাতির দাঁতের ছড়িটি আমাকে দান করবেন। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে! আমি দুইটি ছড়ি কি করবে? আচ্ছা, আমি তাহলে এক কাজ করবে। এই হাতে একটি লিবে আর এই হাতে একটা লিবে। কেমন? এই ভাবে আমি যে আমার ছড়িটা হারাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। সত্যকার ভক্তরা অবশ্য আমার এই সৌভাগ্যে বরং ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল।"

এই সকল সাধুগণ প্রায়ই গরিব শিষ্যদের নিকট দুই-তিনটি মূল্যবান দ্রব্য গ্রহণ করে উহা লাখপতি শিষ্যদের দান করেন। ইহা কিন্তু মাছ ধরার চারের মত এক প্রকার চার ফেলা; কারণ, তাঁরা জানেন ঐ বড় লোকেরা এরপর অধিকতর মূল্যবান দ্রব্য তাঁদের দান করবে। এই জন্য তাঁরা সব সময় বড় লোকদের দান করে নির্লোভী দাতা সাজেন। স্বার্থ না থাকলে গরিবদের এঁরা কম ক্ষেত্রেই দান করেছেন। এমন গুরুপ্রবরও আছেন যাঁকে অন্যান্য শিষ্য-শিষ্যারা পিতা রূপে পূজা করলেও তাদের মধ্যে একজন সুন্দরী নারী তাঁকে

পতিরূপে সেবা করে থাকেন। এই শ্রেষ্ঠা ভক্ত নারীদের মধ্যে বিধবা, সধবা ও কুমারীও দেখা গিয়েছে। ঐ নারীরা স্ত্রীরূপে গুরু-পূজা করেন বলে এঁরা সর্বদা গুরুর পার্শ্বের আসন প্রাপ্ত হ'য়ে থাকেন। এ'ছাড়া এমন বহু বামাচারী সাধু আছেন, যাঁদের একাধিক পত্নী গ্রহণ বা বামা রক্ষণেও আপত্তি নাই। এতদ্ব্যতীত গৃহী-গুরুর ভণ্ডামীও পুরুষানুক্রমে এদেশের লোকেদের সহ্য করতে হয়েছে। এই সকল গুরু পরিবারে ভাই-ভাইয়ে ভিন্ন হওয়ার পর জমি-জমার ন্যায় শিষ্যদেরও তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে নিয়ে থাকেন। অপর দিকে এমন বহু মঠ-মন্দিরের অধিকারী আছেন যাঁদের হাতি রয়েছে। এঁদের অনেকে সরকারী বনভূমি জোরপূর্বক দখল করে মঠ করেছেন। নানাবিধ কর এড়িয়ে ধর্মের নামে এঁরা স্বার্থসিদ্ধ করেন। এঁরা ঘোড়া, প্রাসাদ, জমিদারী ও বহু ধন-রত্নের মালিক। এঁদের ভোগ-বিলাসের সীমা নাই। তবে এঁদের অনেকের বিষয়-সম্পত্তি পুত্রগণ ভোগ না করে তা তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে তাঁর প্রধান চেলা ভোগ করে থাকে। তবে এজন্য ঐ চেলাকে সারাজীবন ক্রীতদাসের মত গুরুসেবা করতে হয়েছে। এদের কেউ কেউ পথ-ঘাট দখল করে শিবলিঙ্গ স্থাপন করে সেখানে বসে গিয়েছে। কেউ কেউ প্রাচীর গাত্রে "প্রাচীর বাবা" লিখে ঐ স্থানের দখলীকার।

এই সকল ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ আধ-পাগল সাধকের বেশে দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি পীঠস্থানে ইতস্ততঃ ঘুরাফিরা করে থাকেন। হঠাৎ কোনও ভক্তমন্য ব্যক্তিকে ওখানে আসতে দেখলে তাকে তাঁরা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেন, 'ওরে তুই বাবা এসেছিস? আজ বিশ বৎসর ধরে তোকে যে আমি খুঁজছি।' এই একটি বাক্য দ্বারা প্রবঞ্চ-করা দুর্বলমতি ভক্তের গুরু হয়ে উঠে।

বাক্-প্রয়োগ লোভী সরলপ্রকৃতির ব্যক্তিদের কতদূর পর্যন্ত নির্বোধ ক'রে তুলতে পারে তা উপরের কাহিনীসমূহ হতে বুঝা যাবে অধুনা যুগে ধর্মকে একটি বিরাট অসংস্কৃত পুরানো দীর্ঘিকার সহিত তুলনা করা চলে। নূতন অবস্থায় ঐ দীর্ঘিকা গ্রামবাসীদের প্রাণস্বরূপ ছিল। কিন্তু সেই দীর্ঘিকাই শত বৎসর পরে সংস্কারের অভাবে মজে গিয়ে সেই গ্রামবাসীদের ধ্বংসের কারণ হয়। মনে হয় দীর্ঘিকাটি না থাকলে হয়তো গ্রামে আধিব্যাধির প্রকোপ এতটা বেশি হ'ত না। বহু ধর্ম সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। এই কারণে যুগে যুগে পৃথিবীতে পুরানো ধর্মকে সংস্কার দ্বারা যুগোপযোগী করে মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে বাঁচাবার জন্যে এক-একজন মহাপুরুষ এসেছেন। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান যুগ অবতারের যুগ নয়। বর্তমান যুগ হলো বৈজ্ঞানিক যুগ। এই যুগে অবতারের আবির্ভাবের কোনও সম্ভাবনা নেই। আজিকার এই গণতান্ত্রিক যুগে অবতারের স্থান নেই। বর্তমান যুগে কোনও কাজ একার দ্বারা সংঘটিত হতে পারে না। পূর্বেও তা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। আধুনিক ধর্মমতগুলির যদি কেহ সত্যকার রূপ দিয়ে থাকেন তো তা দিয়েছেন এই সব অবতারের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে তাঁর সংগঠন-কার্যে অভিজ্ঞ পরিশ্রমী জ্ঞানবান শিষ্যমণ্ডলী; তাঁদেরই সমবেত চেষ্টায় অধুনা দৃষ্ট প্রধান ধর্মমতগুলি ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। আমার মতে ঋক্‌বেদীয় ঋষিদের ন্যায় ভারতের মনীষিগণেরও যথা সত্বর একত্রে সমবেত হয়ে যুগোপযোগী করে স্থানীয় ধর্ম-মতগুলির সংস্কার সাধন করা উচিত *।

---

* বৌদ্ধ ধর্ম কাউন্সিলের অনুকরণে।

[বহু গুরু উচ্চপদী সরকারী কর্মীদের শিষ্য করে নেন। ফলে অধীনকর্মীদের প্রমোশনের আশাতে তাঁদের শিষ্য হতে হয়। 'আমিই তোকে তুলেছি। আবার আমিই তোকে নামাবো'—এই বলে তাঁরা উচ্চপদী শিষ্যদের ভয় দেখান। কথিত আছে যে গুরু গ্রহণ করে তাকে আর পরিত্যাগ করা যায় না। এর উত্তরে বলা হয় বেশি ভালো মাস্টার পেলে কম ভালো মাস্টারকে পরিত্যাগ করা যেতে পারে।]

ভগবান বুদ্ধদেব পরিলক্ষ্য করেছিলেন যে "মানুষ কেবলমাত্র ঈশ্বর আছেন কি'না এবং কি উপায়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায়"—এই অলীক চিন্তাতে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কোনও কাজ সে করে না। এই কারণে তথাগত আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, "অযথা 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে সময় নষ্ট করো না। পৃথিবীতে যখন এসেছ তখন তোমার একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত জীবের কল্যাণকর কার্য করা।" ভগবান বুদ্ধদেব এই কারণে তাঁর ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেন নি। এই জন্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি নীরব ছিলেন। কিন্তু তাঁর ভক্তগণ ভুল বুঝে তাঁকেই [বুদ্ধদেবকে] কয়েক শত বৎসরের মধ্যেই ঈশ্বর বানিয়ে দিয়েছেন। জগতের অপর আর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু মূর্তি পূজার অসারতা উপলব্ধি করে তাঁর কোনও মূর্তি না গড়বার জন্যে ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার উদ্দেশ্য পাছে কেহ বাতিল করা দেব-দেবীর পরিবর্তে তাঁরই মূর্তিপূজা করতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় তাঁর কোনও ভক্ত পীর প্রভৃতির মূর্তি পূজা না করলেও তাঁদের কবরে পূজা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব সর্বজাতির মধ্যে সমন্বয় আনবার জন্যে প্রেমধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবগণ পরবর্তী যুগে তাঁর উদার প্রেমধর্মকে রাধা-কৃষ্ণের

প্রেমে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন। যুগোপযোগী শিক্ষা ও সংস্কারের অভাবে ধর্ম বিকৃত হয়; এই বিকৃত ধর্মমতগুলি মানুষের উপকার না করে অপকারই করে। কোনও কোনও মন্দিরে স্নানযাত্রার পর বিগ্রহের গাত্র-বর্ণ বারি স্পর্শে বিবর্ণ হয়ে যায়। এই সময় পূজারিগণ রটিয়ে দেন দেবতার ব্যাধি হয়েছে। বিগ্রহকে পুনরায় রঞ্জিত করার জন্য কালক্ষয় করার কারণেই পুজারীরা এইরূপ রটিয়ে থাকেন। কিন্তু দেবতার নামে এইরূপ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও প্রয়োজন আছে? সকলে জানেন হিন্দুরা মূর্তিপুজা করে না। মূর্তিটিকে সাময়িকভাবে তারা ঈশ্বরের আসন বা প্রতীক মনে করে মাত্র। "প্রাণম্ বিমুচ্যতে" মন্ত্রটি উচ্চারণের পর উহার সহিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ আর থাকে না, উহাকে তখন সামান্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরখণ্ডই মনে করা হয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর উহাকে পুনরায় আমরা দেবতার আসন বা প্রতীক মনে করি। ইহাই যদি হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মমত হয় তাহলে পূজারীদের এইরূপ মিথ্যা প্রচার কি প্রতারণা নয়? এই বিকৃত ধর্মমত সমাজেরও প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। বক্তব্য বিষয়টি নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"গত বৎসর বসন্তকালে আমি অমুক গ্রামে কিছুদিনের জন্যে স্থান পরিবর্তন করি। একদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় নদীর ঘাটে একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমি অবলোকন করি। ঘাটের চত্বরের উপর একটি ছোট চৌকির উপর বসে জনৈক কথকঠাকুর কথা বলছিলেন,—আলোচ্য বিষয়টি ছিল শ্রীকৃষ্ণের উদরের মধ্যে অর্জুনের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন। কথকঠাকুর সুর ক'রে ক'রে বলে যাচ্ছিলেন, 'অ-আ-আ, সেই শিশুর পেটের ভিতর আমি কি দেখলাম? আমি সেখানে দেখলাম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, কীট-পতঙ্গ, তক্তপোষ, তাকিয়া, খাটি-য়া-য়া' ইত্যাদি। অবাক

হয়ে পরিলক্ষ্য করলাম যে ঠাকুর মশাই-এর এই সব কথা শুনে মহিলা শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। এই সকল দুর্বলচিত্ত জননীদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের কথা চিন্তা করে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে আলোচনা করার পর কথকঠাকুর ঐ সভাতে বলে চললেন তাঁর নিজের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা। একদিন নদীর ওপারে এসে তিনি না'কি দেখলেন ভীষণ ঝড়। ঝড়ের সঙ্গে আছে ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি ও বাত্যা। কি ক'রে পার হবেন তখন তাই তিনি ভাবছিলেন। এমন সময় এক ধীবর-বালক নৌকা বেয়ে এসে তাঁকে জানালে যে জমিদারের আজ্ঞায় কথক ঠাকুরকে সে আনতে এসেছে। ওপারে নেমে পিছন ফিরে কথক ঠাকুর দেখলেন সেখানে সেই বালক বা তার সেই নৌকা নেই। জমিদারবাবু এ সব কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কারণ তিনি এই দুর্যোগে কাউকেই পাঠাতে পারেন নি ইত্যাদি। এই পর্যন্ত বলে কথকঠাকুর ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকেন, 'প্রভো! তুমি দেখা দিয়েও দিলে না' এবং এই সঙ্গে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দও কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা ভাষণের কি কোনও সীমা নেই? এভাবে ধর্মের নামে এইরূপ প্রতারণা আর কতদিন এদেশে চলবে? এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে ঐ কাহিনী ঐ সভাতে বলার পূর্বে তিনি চোখ বুজে পরম পিতা ঈশ্বরের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন।"

উপরি উল্লিখিত বিবৃতিদাতার সহিত আমরাও একমত। ধর্মের নামে এই সকল প্রতারণা বন্ধ করার সময় এসেছে। মূর্তিপূজা করার জন্যে আমরা নিন্দনীয় নই। মূর্তি পূজার মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুটা সার্থকতা আছে। এই সব প্রতারকদের সহ্য করার জন্যে আমরা নিন্দনীয়। যারা গাছ পাথর ও সাপ পূজা করে

তাদের আমরা অসভ্য বলে থাকি। অপরদিকে একেশ্বরবাদীরা মূর্তিপূজা করার জন্যে না বুঝে আমাদের মধ্যযুগীয় মানুষ ভাবে। অপর দিকে যারা নাস্তিক বা শূন্যবাদী তারা একেশ্বরবাদীদের পাগলামীর কথা চিন্তা ক'রে অবাক হয়। মানুষ অদ্যাবধি বহু দেবতার ন্যায় এক ঈশ্বরের অস্তিত্বও প্রমাণ করতে পারে নি। একটি ঈশ্বর থেকে থাকলে বহু ঈশ্বরই বা থাকবে না কেন? এ বিষয়ে চাক্ষুষ প্রমাণ তো কোনওটিরও নেই। এই সব চিন্তা ক'রে আমাদের পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে লজ্জিত হবার কারণ নেই। বরং শূন্যবাদ, একেশ্বরবাদ হ'তে আরম্ভ ক'রে সাধারণ মূর্তিপূজার পদ্ধতি পর্যন্ত এই ধর্মে স্থান পেয়েছে—এই জন্যে এই ধর্মকে পৃথিবীর একমাত্র গণতন্ত্রী ধর্ম মনে ক'রে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। এ বিষয়ে এদের সহনশীলতা ও নিরপেক্ষতা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু জেনে শুনে ধর্মের পোশাক পরিহিত শত শত প্রতারকদের প্রতিদিন বরদাস্ত করার জন্যে আমাদের কি লজ্জিত হওয়া উচিত নয়? কিছুদিন পূর্বে কোনও এক বালিকার অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ রূপে কোনও এক মহিলা আশ্রমের পুরুষ সেক্রেটারি বালিকাটিকে দুষ্টা নামে অভিহিত করলে প্রত্যুত্তরে বালিকাটি বলেছিল, 'হাঁ, আমি স্বীকার করি আমি দুষ্টা। কিন্তু আমি দুষ্টামী করি সাদা কাপড় পরে। আপনার মতন রঙিন কাপড় পরে আমি দুষ্টামী করি না। আপনি গেরুয়া কাপড় ছেড়ে সাদা কাপড় পরে আসুন। আমিও আপনার সঙ্গে দুষ্টামী করব এবং এ বিষয়ে আমি কোনও আপত্তি করব না। আপনিও ইচ্ছা মত দুষ্টামী করতে পারেন। সে অধিকার আপনার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু রঙিন কাপড় পরে ও কাজ করতে আপনি পারেন না।' সহায়সম্বলহীনা

দরিদ্রা অশিক্ষিতা বালিকাটির এই অভিমত সম্বন্ধেও আমি এদেশের সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্রবিদ্ পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

আমরা কাউকে গোপাল দেবতাকে [বিগ্রহ] নিজের শিশু মনে করে তাকে কোলে শুইয়ে দোলাতে দেখলে তার সেই বাৎসল্য ভক্তির রূপ আমাদের মুগ্ধ করে। ঈশ্বরকে যদি পিতা বা বন্ধুরূপে পূজা করা যায়, তাহলে তাঁকে সন্তান রূপেও আরাধনা করা সম্ভব। কিন্তু আমরা বিগ্রহ সেবার অধিকারী হবার জন্যে দুই ভাইয়ে বিরোধ করতে দেখলে সত্য সত্যই অবাক্ হই। আমার মতে মানুষের আত্ম-প্রবঞ্চনার ইহা একটি নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। দেব-বিগ্রহের নামে প্রদত্ত সম্পত্তির লোভে এদেশে নরহত্যার নজীরও আছে। কেউ কেউ দেবতার সম্পত্তির অছিরূপে সেই সম্পত্তি নানা অছিলায় আত্মসাৎও করে থাকেন। বড় বড় মন্দির ও মঠের নামে জনসেবার উদ্দেশ্যে ধনসম্পদ প্রদত্ত হয়েছিল। তখন মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকত বিদ্যালয়, হাসপাতাল, পুস্তকাগার, অনাথ আশ্রম ও পান্থশালা। এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি মন্দিরে প্রদত্ত অর্থ হ'তে সুপরিচালিত হবে, সেকালের বহু বদান্য রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাদের ইহাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সকল লোভী ভণ্ড গৃহী বা সন্ন্যাসীদের কবল হতে এই সকল সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে রাষ্ট্রের পক্ষে উহাদের ভার স্বহস্তে নেবার কি সময় আসে নি? পূর্বেকার রাজন্যবর্গ ও ধনী দাতাগণ আজ পর্যন্ত জীবিত থাকলে তাঁরা দেবসেবায় প্রদত্ত তাঁদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি সকলের এবম্বিধ দুর্দশা পরিলক্ষ্য ক'রে নিশ্চয়ই এই সব দেবালয়ের বর্তমান অধিকারীদের বিপক্ষে আদালতে মামলা রুজু করতেন। দেববিগ্রহের নামে আদালতে মামলা রুজু হতে কিংবা দেবতাকে স্বয়ং আদালতে প্রতিনিধিত্ব [Representation] দ্বারা

মামলা দায়ের করতে দেখলে সত্যই আমরা লজ্জিত হ'য়ে উঠি। তথাকথিত দেববিগ্রহ যেন একজন জন্মগত নাবালক মাত্র [Perpetual Minor]। এরূপ নির্লজ্জ আত্মপ্রবঞ্চনার কি শেষ নেই? আমার মতে এই দেবসেবা প্রথা যদি বহাল রাখারই প্রয়োজন হয় তাহলে দেবতার নামে প্রদত্ত এই সব সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থার [উদ্দেশ্য-প্রতিপালনের] ভার ব্যক্তি বিশেষের পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। ধর্ম যখন এদেশের রাষ্ট্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়েরই মঙ্গলের জন্যে ধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বিভাগ রক্ষা করা অতীব প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি দেশবাসীদের চিন্তা করতে অনুরোধ করি।

[ধর্মের নামে নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীনির্যাতনের দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। এক ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অপর ধর্মাবলম্বীদের বিদ্বেষের কথাও শুনা যায়। এ সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র সর্বধর্ম সমন্বয় দ্বারা এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে রক্ষা পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে সকল ধর্মপুস্তক হতে সার সংগ্রহ করে একটি পৃথক ধর্মপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে। বৌদ্ধ মঠ, মন্দির, মসজিদ এবং গীর্জা প্রভৃতির স্থাপত্য একত্র করে তৈরি করতে হবে উপাসনালয়। সেখানে মানুষ তুলনা মূলক ধর্ম আলোচনা দ্বারা উপকৃত হবে। ঐ আলয়ে শুধু রাখতে হবে বিবিধ ধর্মসম্পর্কীয় পুস্তক। কেবল মাত্র এই ভাবে এই মহাসমস্যার সমাধান হতে পারে।]

প্রবঞ্চনা

প্রবঞ্চনা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়, যথা—সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে কেবল মাত্র সাধারণ প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে বলা হবে। [প্রথম পরিচ্ছেদে সাধারণ প্রবঞ্চনার সংজ্ঞা দেখুন।] এই সাধারণ প্রবঞ্চনাকেও আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা- আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনা। একমাত্র পরপ্রবঞ্চনাকেই আমরা আইনানুসারে অপরাধ বলি। মানুষ যখন নিজে নিজেকে ঠকায় তখন তাকে আমরা বলি আত্মপ্রবঞ্চনা। আমার মতে আত্মপ্রবঞ্চনা প্রকারান্তরে আত্মহত্যারই সামিল। আত্মপ্রবঞ্চনার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম। এই বিবৃতিটি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"—ও কথা আর বলেন কেন মশাই! আমি এবং আমার দুঃখিনী স্ত্রী, উভয়েই আমিষ আহার ছেড়ে দিয়েছি। জানেন তো, বিবাহের দেড় বৎসর পরই জ্যেষ্ঠা কন্যাটি বিধবা হয়ে ঘরে এসেছে, উপরন্তু আমাদের বিধবা পুত্রবধূটিও ঘরে।, বালিকাদ্বয়ের দুঃখ মনে হলে বুক ভেঙে যায়। ওরা যখন মাছ বা মাংস খায় না, তখন আমরাই বা তা খাই কি করে! তাই এই গব্যঘৃতটুকু কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আর খোঁকার ডানলার জন্যে এইগুলাও কিনতে হলো। যা হোক ক'রে মুখে দুটো অন্ন তো দিতে হবে।"

উপরের দুঃখের কাহিনীটুকু যিনি আমাকে শুনাচ্ছিলেন, তিনি

আমারই এক পুরাতন বন্ধু। তাঁর ঘরের সব খবরই আমরা জানতাম। তাঁর স্ত্রী এ বৎসর আর একটি কন্যা প্রসব করেছেন। গত বৎসর তাঁর একটি পুত্রও হয়েছে, যদিও কি'না ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে উঠেছে। এদেশের সামাজিক প্রথানুযায়ী বিধবা অবস্থায় তাঁর পুত্রবধূ ও কন্যাটি সামান্য থান কাপড় পরে নিরামিষ খেয়ে দিন কাটালেও ভদ্রলোকটির এবং তাঁর স্ত্রীর বেশভূষার কোনও অভাব আমি কদাচিৎ দেখেছি। আসলে ভদ্রলোক এই সুযোগে বাড়িতে আমিষ ভোজন বন্ধ করে কিঞ্চিৎ খরচ বাঁচাচ্ছেন। ভদ্রলোকটির কাতরোক্তির প্রত্যুত্তরে আমি তাঁকে সেইদিন এইরূপ বলেছিলাম, 'মশাই! আপনি কি মনে করেন যে মানুষের উদরের ক্ষুধা ছাড়া আর কোনও ক্ষুধা নেই? জীবনটা তো আপনি এবং আপনার স্ত্রী দেঁড়েমুসেই উপভোগ করে নিয়েছেন। তা বুড়া বয়সে একটু নিরামিষ খেলে স্বাস্থ্য আপনাদের ভালই থাকবে। এজন্য আপনাদের দুঃখ করবার কোনও প্রয়োজন নেই। অন্ততঃ যুক্তিসঙ্গত ভাবে এরূপ আমি মনে করি।'

উপরের এইসব উত্তর ও প্রত্যুত্তর হতে পাঠকগণের আত্ম°বঞ্চনার স্বরূপ সম্বন্ধে বোধগম্য হবে। এই আত্মপ্রবঞ্চকদের সহিত দুঃখ-বিলাসীদের প্রভেদ আছে। দুঃখ পাওয়াই যাদের বিলাস বা আনন্দ তাদের বলা হয় দুঃখবিলাসী। কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চকদের সম্বন্ধে এ কথাটুকুও বলা চলে না। আত্মপ্রবঞ্চকরা মনের দুর্বলতাজনিত নানারূপ অসুবিধা ভোগ ক'রে দুঃখ পায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"আমার দৈহিক ও মানসিক আকাঙ্ক্ষা এখনও আমি হারাই নি। অন্তরে অন্তরে প্রতিটি মুহূর্তে আমি আমার পুনর্বিবাহ কামনা করি।

কিন্তু দুইটি পুত্র বর্তমানে বিবাহ করলে লোকে কি-ই বলবে! এই ভেবে আমি বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিই না। যদিও কিনা আমার বর্তমান বয়স মাত্র আটাশ। মুখে আমি সকলকে জানিয়ে দিই—'পাগল! প্রিয়তমার স্মৃতি এত সহজে কি আমি ভুলতে পারি? ছিঃ, এ ছাড়া বাচ্চা দুটোর কি হবে? ওদের যে কষ্ট হবে এতে ইত্যাদি।' এদিকে কিন্তু আমি গোপনে অন্য নারীর সঙ্গ কামনাও করেছি। ওদিকে আমার ছোট ভায়ের স্ত্রী, বড় জায়ের অবর্তমানে বাড়ীর কর্ত্রী হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর নবলব্ধ কর্তৃত্বের অবসান আশঙ্কায় এ বয়সে (?) আমাকে বিবাহ করতে দিতেও নারাজ। এতে না-কি তাঁর পুত্রবৎ প্রতুল [অর্থাৎ আমার পুত্র] কষ্ট পেতে পারে। আমার ইচ্ছা করে ভ্রাতা, ও ভ্রাতৃবধুকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিই; কিন্তু মুখে আমি সকলকে বলি 'না থাক্, ওরাই আমার সব, ওরাই আমাকে দেখবে ইত্যাদি।' আসলে আমি, আমার ভ্রাতা এবং আমার ভ্রাতৃবধু—এই তিনজনেই আমরা আত্মপ্রবঞ্চনা করে আসছিলুম।"

এই আত্মপ্রবঞ্চনা একটি সামাজিক অপরাধ। "সামাজিক অপরাধ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব। এক্ষণে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয় "পরপ্রবঞ্চনা"। এই আত্মপ্রবঞ্চনা এবং পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে "ধর্মীয় প্রবঞ্চনা" শীর্ষক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। পরপ্রবঞ্চনা যৌনজ এবং অযৌনজ, এই উভয় উপায়েই সংঘটিত হয়। প্রথমে পরপ্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্।

পরপ্রবঞ্চনা

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—(১) একক প্রবঞ্চনা ও (২) ব্যাপক প্রবঞ্চনা। একক পদ্ধতিতে মাত্র একজন বা দুইজন বা ততোধিক ঠগী প্রত্যক্ষরূপে সংশ্লিষ্ট থাকে। এতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে অপর কোনও ব্যক্তি এই অপকর্মে জড়িত হয় না। কেহ যদি কাহাকেও সোনা বলে পিতল গছিয়ে দেয় তাহলে সে প্রত্যক্ষভাবে মাত্র একজনকেই ঠকিয়ে থাকে। কিন্তু এমন অনেক প্রবঞ্চনা আছে যা কিনা ব্যাপক আকার ধারণ করে। প্রবঞ্চনার এই ব্যাপক পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে নিম্নের দৃষ্টান্তটুকু প্রণিধান করুন।

"'ক' বাবু একজন তৈল ব্যবসায়ী। তিনি খাঁটি তিল তৈলের নামে অধিক মূল্যে বাদাম তৈল মিশ্রিত তিল তৈল গছিয়ে দিলেন। এর পর 'ক' বাবু অপর আর এক ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবুকে উচিত মূল্যে এই খাঁটি তিল তৈল [বাদাম তৈল মিশ্রিত] বিক্রয় করলেন। এই ছোট ব্যাপারী 'খ' বাবু, তথাকথিত এই খাঁটি তৈল বিক্রয় করলেন এক সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবুকে। এর পর এই সুগন্ধি তৈল ব্যবসায়ী 'গ' বাবু খাঁটি তৈলের নামে মিশ্রিত তিল তৈল জনসাধারণের নিকট বোতলে পুরে বিক্রয় শুরু করলেন। [ভেজাল তেল ব্যবহারে ক্রেতাদের মাথায় চুল উঠে টাক পড়লো।] এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক', 'খ' এবং 'গ' বাবু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাধ্য হয়ে এই প্রতারণামূলক অপকর্মে জড়িয়ে পড়ছেন। এই কারণে উপরি উক্ত ঠগী ব্যাপারীর

পরপ্রবঞ্চনাকে আমরা ব্যাপক প্রবঞ্চনা বলে থাকি। এই ক্ষেত্রে একের অপরাধে বহু লোককে অপরাধীর পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হতে হয়।" [দুঃখের বিষয় রক্ষীকুল এদের শেষ ব্যক্তিকে ভেজাল দ্রব্য বিক্রয়ের অপরাধে ধরপাকড় করেন। এ বিষয়ে এই ব্যক্তির উপর ঐ ভেজাল দ্রব্যের হেপাজতী প্রমাণ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করেন। কিন্তু তার বিবৃতি মত পূর্বাপর ব্যক্তিকে সন্ধান করে তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। এর ফলে এই মহাপাপ কোনও দিনই নিশ্চিহ্ন হয় নি।]

এই সকল বহুদুরস্পর্শী অপরাধ সকলকে আমরা ব্যাপক অপকার্য বলে থাকি। প্রবঞ্চনার ন্যায় অন্যান্য বহু অপরাধের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এমন অপরাধও আছে, যে সকল অপরাধ কোনও এক পুরুষ, তাঁর [বা তাঁদের] জীবিত অবস্থায় করেন। কিন্তু পরবর্তী পুরুষগণকে তাঁদের ঐ স্বার্থান্ধ আত্মসর্বস্ব পূর্বপুরুষের অপকর্মের জন্যে পরম দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। কেবল মাত্র জীবিত মানুষদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন তৈরি হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশীয়দের ভাবীকালের কথা বাদ দিলেও বর্তমান কালেও আমরা এই শ্রেণীর নানারূপ ব্যাপক অপরাধ দেখতে পাই। পিতামাতার ভুলের জন্য সন্তানদের শাস্তিভোগের দৃষ্টান্তও এদেশে দেখা গিয়েছে। রাজা বা ব্যক্তি-বিশেষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অপরাধের কারণে দেশশুদ্ধ লোকের অধোগতির দৃষ্টান্তও এ দেশে বিরল নয়। রোগগ্রস্ত অসৎচরিত্র পিতার অপরাধে পুত্রদের ভোগান্তির বিষয়ও এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। এই সকল বিবিধ ব্যাপক অপরাধ সম্বন্ধে "ব্যাপক অপরাধ" শীর্ষক একটি পৃথক পরিচ্ছেদে আমি আলোচনা করব।

যে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, উহার পিছনে থাকে কোনও

একটি বিশেষ কারণ—বৈজ্ঞানিক ভাষায় উহাকে কার্যকারণ বলা হয়। হঠাৎ একটি বৈদ্যুতিক পাখা ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে একজনের মৃত্যুর কারণ হ'ল। আপাতদৃষ্টিতে উহা দুর্ঘটনা মনে হলেও উহা কোনও না কোনও ব্যক্তির অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে ঘটে থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি বা কোম্পানি ঐ পাখা তৈরি করেছে, কিংবা যে মিস্ত্রি ঐ পাখা ছাদের সহিত সংযুক্ত করেছে, সেও ঐরূপ এক দুর্ঘটনার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী হতে পারে। এই ধরনের অপরাধকেও সঙ্গত কারণে ব্যাপক অপরাধ বলা চলে।

বর্তমান পরিচ্ছেদে মাত্র পরপ্রবঞ্চনার একক অযৌনজ পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব। এই বিশেষ পরপ্রবঞ্চনার বিভিন্ন পদ্ধতি-গুলি সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষে তথা জগতে পরপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করেন "হিতোপদেশ" ও "পঞ্চতন্ত্র" প্রণেতা মহাপণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুশর্মা। শ্রীবিষ্ণুশর্মা-কথিত পরপ্রবঞ্চনার একটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম। এই পদ্ধতিটি হতে পরপ্রবঞ্চনার মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

"কোনও এক ব্রাহ্মণ একটি ছাগশিশু ক্রয় করে গৃহে ফিরছিলেন। কয়েকজন ঠগী-চোর এই ছাগশিশুটি প্রবঞ্চনার দ্বারা অপহরণ করতে মনস্থ করল। তারা তখন সেই ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমনের পথের এক এক জায়গায় এক-একজন পৃথক পৃথক ভাবে অপেক্ষা করতে থাকে। এরা এমন ভাব দেখায় যেন এদের কেউ কাউকেও চিনে না। এরপর প্রথম ঠগী ব্রাহ্মণের পথ অবরোধ করে জিজ্ঞেস করল, 'একি ঠাকুরমশাই! এই কুকুর ছানাটা নিয়ে চলেছেন কোথায়?' ছাগশিশুটিকে এই ভাবে কুকুর ছানারূপে অভিহিত করায় ব্রাহ্মণ প্রথম ব্যক্তিকে তার এবম্বিধ ব্যবহারের জন্যে গাল দিয়েপুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুদূর

চলে এসে তিনি দ্বিতীয় ঠগীটিকে দেখতে পেলেন। ব্রাহ্মণকে দেখে দ্বিতীয় ঠগীটি অবাক হওয়ার ভাণ করে জিজ্ঞেস করে উঠে, 'অপনার এই কুকুর ছানাটা কত দিয়ে কিনলেন ? এ ভাল জাতেরই কুকুর হবে। আমার পূর্বে একটি কুকুর বিক্রির ব্যবসা ছিল' ইত্যাদি। দ্বিতীয় ঠগী ব্যক্তির কথায় ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ জাগে। ছাগটিকে ভাল করে নেড়ে-চেড়ে দেখে পুনরায় তিনি পথ চলতে থাকেন। এর পর পথে ঐ তৃতীয় ঠগীটির সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তৃতীয় ঠগীটি ব্রাহ্মণকে শুনিয়ে অপর আর ব্যক্তিকে বলছিল, 'দেখ দেখ ! ঐ ব্রাহ্মণের কাণ্ড দেখ, কুকুর নিয়ে চলেছেন। কলির ব্রাহ্মণ।' তৃতীয় ঠগীর এবম্বিধ বাক্যে ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। তিনি ছাগটিকে কিছুক্ষণের জন্যে রাস্তায় নামান এবং তারপর তাকে তুলে নিয়ে পুনরায় পথ চলতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে তাঁর দেখা হয় চতুর্থ ঠগীটির সহিত। চতুর্থ ঠগীটির ঐরূপ কথায় ব্রাহ্মণ আর পুরাপুরি অবিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর মনে হয় কি জানি হয়ত কোথায় একটু গোলমাল আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছাগ শিশুটিকে ছাগ শিশুরূপে বুঝেও কুকুর ছানা বিধায় পরিত্যাগ করে স্নান সমাপনে ঈশ্বরের নাম নিতে নিতে গৃহে ফিরেন।"

উপরি উক্ত কাহিনীটি গল্পচ্ছলে বর্ণিত হলেও উহা হ'তে বাক্-প্রয়োগের [Suggestion] অত্যদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। অধিক ক্ষেত্রে বাক-প্রয়োগের সাহায্যে প্রবঞ্চকগণ অপকর্ম করে থাকে কিন্তু বাক্‌প্রয়োগের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হতে পারে এবং তা যত্রতত্র হামেসাই হয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী উদ্ধৃত করা যাক।

"আমার কাছে পাড়ার একটি ছেলে এসে ধরে পড়ল, ঐ বৎসর

তাদের সরস্বতী পূজার জন্ম চাঁদা দিতে হবে। এদিকে টাকাকড়ি যা কিছু আমার ব্যবসার ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয়—এই বিশেষ তথ্যটি ছেলেটির ভালরূপেই জানা ছিল। ছেলেটির পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে, আমি দোকানের ম্যানেজারের নামে নিম্নোক্তরূপ একটি পত্র লিখে ছেলেটির হাতে তা দিই।

প্রিয় অমুকবাবু, বা তাঁর ম্যানেজার ইত্যাদি—

* * * *

আপনার কাছে এই লোকটিকে পাঠাচ্ছি। এর হাতে পাড়ার পূজার চাঁদা স্বরূপ ৫৲ টাকা দিয়ে দেবেন। ইতি—স্বাক্ষর—'অমুক বাবু'।

এদিকে ঠগী ছেলেটি পত্রের শিরোনামটুকু ফুট্‌কি চিহ্নিত অংশ বরাবর সুঠামভাবে বিচ্ছিন্ন করে, নিম্নের অংশটি পৃথক পৃথক খামে ভরে খামের উপর আমার বহু কুটুম্ব আত্মীয়ের নাম লিখে সেই আত্মীয়দের নিকট পত্রটি দেখিয়ে পাঁচ টাকা করে আদায় করে। এর পর প্রবঞ্চকটি আমার এক আত্মীয়ের হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে পত্রের পিছনে (Paid Rs. 5/-) 'পাঁচ টাকা দিলাম' এইরূপ লিখিয়ে নিয়ে কায়দা মাফিক পত্রটি ফিরিয়ে নিতেও সক্ষম হয়। এর পর রবারের সাহায্যে পত্রের পিছনের "পাঁচ টাকা দিলাম" লেখাটি মুছে ফেলে চিঠিটি অপর আর একটি খামে ভরে আমার অপর আর এক আত্মীয়র কাছে তিনি উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, প্রবঞ্চকটির আমার বহু আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের নাম ও ঠিকানা জানা ছিল। কথার মার-প্যাঁচ দ্বারা প্রবঞ্চকটি অনায়াসে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হতে টাকা আদায়ের পর পত্রটি এই ভাবে ফেরত নিতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বশেষে এই প্রতারক যুবকটি আমার দোকানেও যায় এবং তার

প্রাপ্য টাকা কয়টা আদায় করে ঘরে ফিরে। প্রায় ছয় মাস পরে কথোপকথনের মধ্যে দৈবক্রমে আমার এক আত্মীয়ের নিকট বিষয়টি জেনে আমরা উভয়েই অবাক হয়ে যাই। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুদের নিকটও ঐ একই কথা শুনে আমি অবাক হই। কিন্তু আমি প্রতারক যুবকটির আর কোনও সন্ধান পাই না।"

সাধারণ প্রবঞ্চনার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে অপর আর একটি প্রবঞ্চনার পদ্ধতি উদ্ধৃত করলাম। কলিকাতা শহরে এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রায়ই গৃহস্থদের দ্রব্যাদি অপহরণ করে থাকে।

"দশটা পনের মিনিটের সময় আমার স্বামী অফিস রওনা হয়েছেন। এর ঠিক দুই মিনিট পরেই লোকটা এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে,—'দেখুন, অমুকবাবু আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। এই ওঁর সঙ্গে দেখা হল মোড়ের মাথায়; উনি অফিস যাচ্ছিলেন। উনি বললেন, তাঁর শালখানা রিপু করার জন্যে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে। আমার শাল রিপু করার দোকান আছে, মা! বাবুর অফিসের দপ্তরী বদ্রুদ্দীন আমার বড় ভাই। বাবু বলে দিলেন, যে, মা হোক বা মিতু দিদি হোক, যার কাছে হোক চাইলেই হবে।' আমার ছোট মেয়ের নাম 'মিতু'। মিতু নামটা শুনে লোকটার কথা আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া বদ্রুদ্দীন নামটাও আমার শুনা ছিল। লোকটা কদিন ধরে ওৎ পেতে সুড়ুক সন্ধান করেছে এবং আগে ভাগেই খুকীর নামটা জেনে নিয়েছে। কিন্তু তা আমি সেদিন সন্দেহ মাত্র করতে পারি নি। আজ্ঞে, হাঁ মশাই, আপনার সে কথা ঠিক। আমরা প্রায়ই খুকীর নাম ধরে ডেকে থাকি। বাইরে থেকে কারও পক্ষে তা শুনা অসম্ভব নয়। যাই হোক, লোকটাকে বিশ্বাস করে দামী শালটা তাকে আমি দিয়ে দিই। সন্ধ্যার সময় উনি বাড়ি ফিরে সব

কথা শুনে অবাক হয়ে যান এবং আমাকে ভর্ৎসনা করেন। এতক্ষণে আমি বুঝতে পারি যে লোকটা একটা প্রবঞ্চক। সে মিথ্যা ছলনা দ্বারা আমাকে ভুলিয়ে দামী শালটা হস্তগত করেছে।"

এইরূপ অপরাধ সম্পর্কীয় অপর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার পুত্র সান্ধ্যভ্রমণে বার হবার কয়েক মিনিট পরই তার সমবয়স্ক এক বালক আমার নিকট এসে বললে, 'মা! রাজেন্ আমার সহপাঠী। সে একদিনের জন্য আমার ইতিহাসের নোট বইটা চেয়ে এনেছিল। আমার বাবা এক্ষুণি সেটা আমার কাছে চাচ্ছেন। না পেলে বড্ড বকাবকি করবেন।' বালকটির এই কাতরোক্তিতে আমি মনে করলাম, তা সত্যই হয় ত বা তাই হবে। দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে বললাম, "তা বাবা! আমি তো লেখাপড়া জানি না। তুমি বরং ওর টেবিলের উপরকার বইগুলার ভিতর হতে ও বইটা বেছে নিয়ে যাও।' আমার পদধূলি গ্রহণ করে তখন সে আমার পুত্রের টেবিল থেকে বইখানি উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। এরপর আমার পুত্র ফিরে এলে তার কাছে অবাক হয়ে শুনি যে ঐ অজ্ঞাতনামা বালকের সব কথাই মিথ্যা ছিল।"

উপরের প্রবঞ্চনা পদ্ধতি ব্যতীত আরও একটি বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ শহরের লোকেদের বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণ ভাবে লোক ঠকানোর এই পদ্ধতিটিকে "টেলিফোন স্থইণ্ডলিঙ" এই নামে অভিহিত করা হয়। এই পদ্ধতি দ্বারা প্রবঞ্চকগণ প্রথমে টেলিফোন দ্বারা দোকানদারদের সহিত তাদের কোনও এক পরিচিত ব্যক্তির নামে কথোপকথন করে। অনেক সময় সেই পরিচিত বা নামজাদা ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বরও তারা অনুকরণ করে থাকে। এই সময় প্রবঞ্চকটি জানিয়ে দেয় যে, তার ম্যানেজার বা কোনও কর্ম্ম-

চারীকে পত্রসহ সে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছে। দোকানদার যেন তার সেই লোক মারফৎ দ্রব্যাদি পরিদর্শনের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। এর পরক্ষণেই একজন লোক পত্রসহ পদব্রজে বা মোটরে দোকানে এসে হাজির হয়। লোকটি দোকানের রসিদ বইয়ে যথারীতি সই করে দ্রব্যাদিসহ প্রস্থান করে। এর পর আরও কয়দিন অপেক্ষা করে দোকানদার তার সেই ধনী খদ্দেরের বাটীতে বিল পাঠিয়ে জানতে পারে যে তারা প্রতারিত হয়েছে। দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কথিত ভদ্রলোক একেবারেই ওয়াকিবহাল নহেন। এ সম্বন্ধে কোনও একটি প্রবঞ্চকের একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিয়ে তুলে দিলাম।

"আমি কোনও এক পাবলিক টেলিফোনে এক আনা জমা দিয়ে অমুক জুয়েলারী দোকানে ফোন করি, 'দেখুন! আমি অমুক থানার বড়বাবু। আমাকে চিনতে পারছেন তো?' দোকানদার বড়বাবুকে ভাল রূপেই চিনতেন। ভদ্রলোকের জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমিও অবহিত ছিলাম। এই জন্যে এত লোক থাকতে আমি এঁর নামেই ফোন করি। উত্তরে দোকানদার, 'বিলক্ষণ—বিলক্ষণ' বলে উঠে অভিবাদন জানায়। আমি তখন তাঁকে জানাই, 'দেখুন একজন সিপাইকে পত্র দিয়ে পাঠাচ্ছি। দু'ছড়া ভাল নেকলেস্ পাঠাবেন তো! পছন্দ হলে একটা রেখে দেব, হাঁ, ওদের দামটাও লিখে পাঠাবেন।' দোকানদার আমাকেই বড়বাবু ভেবে এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়। এদিকে আমি কয়েকখানা পুলিশের ফর্মও পূর্বাহ্নে জোগাড় করে রেখেছি। পুলিশের সেই ছাপানো ফর্মে বড়বাবুর জবানিতে একটি পত্র লিখে আমি আমার এক হিন্দুস্থানী সহকারীকে পত্রসহ সেই দোকানে পাঠিয়ে দিই। আমার হিন্দুস্থানী সহকারীটি সিপাহী-দের কায়দানুসারে সেলাম করে দোকানদারকে পত্রটি দিলে দোকান-

দারটি দুই জোড়া জড়োয়া নেকলেস্ নিঃসন্দেহে তার হাতে তুলে দেয়।"

নামকরা নাগরিক এবং পদস্থ কর্মচারীদের নামে শহরে এই ধরনের প্রবঞ্চনা হামেসাই হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে কোনও এক পদস্থ কর্মচারীর একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"একদিন আমি অফিসে বসে আছি। হঠাৎ শহরের এক নামজাদা খাবারের দোকানের সরকার এসে হাজির। ভদ্রলোক বিনা বাক্যব্যয়ে ৫৫৲ টাকার একটা বিল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার! অনেক দিন বিলটা পড়ে আছে, আপনি বোধ হয় ভুলে গিছলেন, হে হে হে।' আমি বিলটা পড়ে দেখে অবাক হই। আমি নাকি তিন মাস পূর্বে তাদের দোকান থেকে কয়েক হাঁড়ি দধি ও সন্দেশ কিনেছি। আমি বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে শুধোই—'এ্যঁা আমি কিনেছি! চেনেন আপনি আমাকে?' ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'না, আপনি তো অমুক বাবু নন।' আমি তখন তাঁকে জানাই যে আমিই অমুক বাবু এবং দোকানের বিক্রেতাকে ডেকে পাঠাই। বিক্রেতা এসে আমাকে অমুক বাবুরূপে জেনে অবাক হয়ে যায় এবং নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দেয়—

'তিনমাস পূর্বে একজন মোটা গোছের প্রৌঢ় ভদ্রলোক দোকানে এসে 'আমি অমুক বাবু' ঐ নামে পরিচয় দিয়ে কিছু খাবার বন্ধুসহ খেতে চান। আমরা তাঁকে খাবার খাওয়াই এবং তাঁকে মালিকের বন্ধুরূপে জেনে দাম নিতে অস্বীকৃত হই। কিন্তু তিনি জোর করে দাম দেন এবং ৫৫৲ টাকার মূল্যের দধি ও সন্দেশ তাঁর গাড়িতে তুলে দিতে বলেন। আমরা তাঁর উপদেশমত কাজ করি এবং দ্রব্যাদির মূল্য

বাবদ একটা বিলও তাঁর হাতে দিই। তিনি বিল অনুযায়ী টাকা পাঠিয়ে দেবেন বলে মিষ্টান্নাদিসহ প্রস্থান করেন। আমি ইতিপূর্বে আপনাকে কখনও দেখিনি, তাই সেই লোকটিকেই আমি, 'আপনি' মনে করেছিলাম। হ্যাঁ স্যার, আপনার নাম আমি ইতিপূর্বে বাবুদের মুখে বহুবার শুনেছি, তাই—"

আমি উপরি উক্ত পদস্থ ব্যক্তিটির মুখে শুনেছি যে, তিনি ইতিপূর্বে কার্যব্যপদেশে বহুবার উক্ত দোকানে গিয়েছেন, কিন্তু দোকানের কেহ তাঁহাকে মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করা তো দূরে থাক, অভ্যর্থনা পর্যন্তও তাঁহাকে কেহ করেনি। আসল 'অমুক বাবু' যে খাতির পায় নি, নকল 'অমুক বাবু' সেই খাতির পেল। কিন্তু কেন? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই লোকের মনে আসবে। বিষয়টি আদ্যোপান্ত বিবেচনা করলে, এই সব প্রবঞ্চনার মধ্যে দোকানের কর্মচারীদের যে যোগাযোগ থাকে, এইরূপ মনে করা চলে।

এই প্রবঞ্চনা অপরাধের নিদর্শন স্বরূপ অপর আর এক রত্ন-ব্যবসায়ীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"এ বিষয়ে আমার কি দোষ মশাই। আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু কখনও আপনাকে দেখিনি, এবং এও শুনেছি আপনি একজন দেবতুল্য লোক। সকাল নয়টায় একজন লোক ফোনে জানাল আপনি কথা বলবেন। এর পর আপনার নাম নিয়ে আর একজন ফোন করে জানালেন যে তিনি পত্রসহ দারোয়ান পাঠাচ্ছেন। দারোয়ান এসে আংটি কটা নিয়ে গেল এবং কিছু পরেই আবার সেগুলা ফিরিয়ে এনে জানাল, তার সাহেব মেমসাহেব সমভিব্যাহারে খোদ আসবেন বেলা তিনটায় নিজেরা জিনিস পছন্দ করতে। এর পর বেলা তিনটায় টকটকে বর্ণের লম্বা চেহারার একটা লোক একজন পরমা সুন্দরী

মহিলাকে নিয়ে দোকানে এলেন। আমরা তাঁদেরই 'আপনারা' মনে করে আনন্দে গলে পড়ে খাতির-যত্ন করলাম। সাহেব কম দ্রব্য নিতে চাইলেও মেমসাহেব নিতে চান বেশি জিনিস। সাহেব একটা কম দামের পছন্দ করলেও মেমসাহেব সেটা বাতিল করে দেন কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর মেমসাহেব প্রায় সতের হাজার টাকার মূল্যের দ্রব্যাদি নিয়ে মোটরে উঠলেন। বিব্রত হয়ে সাহেব পাঁচ শত টাকা অগ্রিম জমা দিয়ে বিবর্ণ মুখে বিলটা তাঁর বাড়িতে পাঠাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে মেমসাহেবের পাশে এসে বসলেন। আমরাও যথা-রীতিতে তাঁদের মোটর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দোকানে ফিরলাম। আমাদের একবারও মনে হয় নি যে তাঁরা 'আপনারা' নন।"

এই বিশেষ পদ্ধতি সকল ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতি দ্বারা প্রায়ই ঠগীরা সরল প্রকৃতির ভদ্র দোকানদারদের কলকাতা শহরে ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ঠগী প্রায়শঃ একজন বালক সঙ্গে করে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের দোকানে আসে। এর পর বালকটিকে দোকানে বসিয়ে রেখে ঠগী লোকটা দশ-বারোটি ভাল ভাল দামী শাড়ি বেছে নিয়ে বাড়ির মেয়েদের দেখাবার জন্যে দোকান ত্যাগ করে। বালকটি অছিস্বরূপ বসে থাকায় দোকানদার এই প্রস্তাবে প্রায়ই অরাজি হয় না। অর্ধ ঘণ্টা পরে শিক্ষানুযায়ী ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনও কখনও সে মা বা কাকীমার নাম নিয়ে কান্না শুরু করে দেয়। এই অবস্থায় কোনও কোনও দোকানদার এই সকল ছেলেদের কান্নায় বিব্রত হয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার জন্যে তাদের মিঠাই কিনে দিয়েছে। এরপর দোকানদার অপরাপর খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং বালকটিও ইত্যবসরে আনমনা হয়ে রাস্তায় নামে। এরপর রাস্তার উপর কিছুক্ষণ ঘুরাফিরা ক'রে

সুযোগমত সরে পড়ে ছেলেটি ঠগী লোকটির সহিত এসে মিলিত হয়।

এই সকল বালকগণ সকল সময়ই দোকানদারদের নজর এড়িয়ে সরে পড়তে সক্ষম হয় নি। ঠগী লোকটির অবর্তমানে প্রায়ই দোকানদাররা এদেরই থানায় ধরে' নিয়ে আসে। থানায় এসে এরা কাঁদতে শুরু করে এবং জানায়, লোকটা রাস্তা থেকে তাকে ধরে নিয়ে এসেছিল এবং সে না'কি তাকে ইতিপুর্বে কখনও দেখেনি। লোকটা তাকে চার আনা পয়সা দিয়ে দোকানে সে না ফিরা পর্যন্ত বসে থাকতে বলেছিল, ইত্যাদি। ছেলেটি তার মুঠার মধ্যে রক্ষিত একটিমাত্র সিকিও প্রমাণস্বরূপ পুলিশকে দেখিয়ে দেয়।

সাধারণ দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় ছেলেটি নির্দোষ। দোকান-দারকে এও স্বীকার করতে হয় যে ছেলেটির সহিত তাদের এ সম্বন্ধে কোনও কথা হয় নি। এ ছাড়া দেখা যায় যে, ছেলেটির বাড়ি ঘর ও পিতামাতা বর্তমান। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সকল বালকেরা স্কুলের ছাত্র হয়। এই সকল বালকেরা প্রমাণের অভাবে প্রায়ই মুক্তি পেয়ে থাকে। আসলে কিন্তু এই সকল বালক অত্যন্তরূপ ধুর্ত হয়ে থাকে এবং কিছুতেই সত্য কথা বলতে চায় না। ছোটবেলা হ'তে অপরাধীদের সহিত মিশে এরা এইরূপ হয়ে থাকে। এই ধরনের বালক অপরাধীদের সংখ্যা শহরে অত্যন্তরূপ অধিক। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহরের লোভী দরিদ্র বালকদের এই সব ঠগীরা ভুলিয়ে এনে এইভাবে যে কাজ হাসিল না করে তা'ও নয়।

এছাড়া অপর আর এক অভিনব পদ্ধতিতে শহরে ঠগীরা দোকানদারদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। এই পদ্ধতি অনুসারে দোকানেরই এক কুলিকে দ্রব্যাদিসহ অমুক নং বাড়িতে পাঠাবার জন্যে

অনুরোধ জানিয়ে ঠগী মহাশয় স্থান ত্যাগ করেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতি এই যে জিনিস পৌঁছবামাত্র কুলির হাতেই তাঁরা দাম দিয়ে দেবেন। এদিকে যথা সময়ে ঠগী মহাশয় কথিত বাটীর দরোজার নিম্নে অপেক্ষা করতে থাকেন। এর পর তিনি কুলির নিকট হ'তে দ্রব্যাদি বুঝে নিয়ে দ্রব্যাদিসহ বাটীর অপর আর এক দুয়ার দিয়ে বেমালুম সরে পড়েন। প্রায় অর্ধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কুলি [বা কর্মচারী] বুঝতে পারে যে বাড়িটি খালি বাড়ি কিংবা বাড়িটিতে বহু ভাড়াটিয়া বাস করে। তারা দ্রব্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। বেশ বুঝা যায় বিষয়টি আগাগোড়া প্রতারণা মাত্র।

[বহু গৃহী ঠগী লোকবলহীন অসহায় ব্যক্তিদের বহু কর্ম বিনা অর্থে নিঃস্বার্থভাবে কয়দিন করে দেয়। পরে এরা তাদের ঠকিয়ে অর্থ গ্রহণ করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা ভাষণে দক্ষ। এরা কিছুটা উপকার করতে সক্ষম। এজন্য বারে বারে লোকবলহীন ব্যক্তিরা এদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়। দুর্বল-চিত্ত মানুষ এদের বুঝেও বুঝে না। ফলে তারা বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।]

অস্তিবাজি

অস্তিবাজি বা অন্তমার পদ্ধতি সাধারণ প্রবঞ্চনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণতঃ ইরাণী নামক ভ্রাম্যমাণ স্বভাবদুর্বৃত্ত দলের লোকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে লোক ঠকায়। এই দুর্বৃত্তদল একটি বিশেষ পদ্ধতিতে লোকের অর্থ অপহরণ করে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই পদ্ধতিটি কিরূপ তা বুঝা যাবে।

"আমাদের একজন জনবহুল কোনও এক দোকানে এসে সামান্য কিছু দ্রব্য ক্রয়ের অছিলায় একটা টাকা ভাঙিয়ে নিই। সাধারণতঃ আমরা কোনও দ্রব্য ক্রয় না করেই টাকা ভাঙিয়ে থাকি। এক টাকার রেজগি হাতে তুলে আমরা দোকানদারকে দেখাই এবং মিথ্যে করে বলি যে এর মধ্যে অনেকগুলি জালিমুদ্রা আছে। এর পর আমরা দোকানদারদের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই সিকি দু'আনি বা পয়সা বেছে বা বদলে নিতে থাকি। আমাদের পীড়াপীড়িতে বিরক্ত হয়ে দোকানী এ প্রস্তাবে রাজিও হয়। এই সুযোগে দোকানীর চক্ষের সামনে হাত সাফাই-এর [sleight of hand] সাহায্যে আমরা অনেকগুলি সিকি দু'আনি ইত্যাদি সরিয়ে নিতে সক্ষম হই। কখনও কোনও দোকানীকে তার পয়সাকড়ি গুনতে দেখলে আমরা তাকে জানাই যে, তাদের ঐ মুদ্রাগুলা জালি বা খারাপ মুদ্রা। এর পর ঐগুলি দোকানদারকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাবার অছিলায় আমরা মুদ্রাগুলি স্পর্শ করে হাতসাফাই-এর সাহায্যে, অনেকগুলি মুদ্রা বেমালুম সরিয়ে ফেলে থাকি।"

এইরূপ প্রবঞ্চনাকে প্রবঞ্চনা না বলে চৌর্য-অপরাধ বলা উচিত। কারণ এই পয়সা বা আনিগুলি দুর্বৃত্তরা সরিয়ে ফেলেছিল দোকান-দারের অজ্ঞাতসারে, জ্ঞাতসারে নয়। দোকানদার নিজে দুর্বৃত্তদের হাতে ঐ সব মুদ্রা তুলেও দেয় নি। ঐ দুর্বৃত্তরা দোকানদারের অজ্ঞাতসারে ঐগুলো সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই অস্তিবাজির অধিক সংখ্যক পদ্ধতিই প্রবঞ্চনা অপরাধের পর্যায়ে প'ড়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম।

"শিয়ালদহ স্টেশনে ট্রেনেব অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম একজন লোক কতকগুলো ভাল ভাল শাড়ি সস্তায় বিক্রয় করছে। কয়েকজন ভদ্রলোককে কয়েকখানি শাড়ি সস্তা দামে কিনতেও দেখলাম। অপর সকলের দেখাদেখি আমিও আমার এক শ্যালিকাকে উপহার দেবার জন্যে একখানি শাড়ি কিনে ফেলি। মূল্য বাবদ উনিশটি টাকা গুনে নিয়ে লোকটা শাড়িখানা একটা খবরের কাগজে মুড়ে যত্ন ক'রে সেটা সে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলো। এর পর সোজা শ্বশুরালয়ে এসে শ্যালিকাটিকে কাপড়খানি আমি উপহার দিই। কিছু পরে শ্যালিকাটি কাপড়ের মোড়কটি খুলে দেখতে পায় তার মধ্যে একটা ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া রয়েছে। সেখানে ঐরূপ মূল্যবান কোনও শাড়ি নেই। বিষয়টি সকলে ঠাট্টার সামিল মনে করে হেসে উঠেন। এদিকে আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকি উনিশ টাকা খরচ ক'রে আমি শাড়িই কিনেছিলাম। পয়সা খরচ করে ন্যাকড়া নিশ্চয়ই আমি কিনি নি। এর পর অনুসন্ধান দ্বারা আমি জানতে পারি যে, লোকটা একটা ঠগী হাতসাফাই-এর সাহায্যে আসল শাড়িটা সরিয়ে ফেলে একটা ন্যাকড়া কাগজের মোড়কে পুরে দিয়ে সে আমাকে ঠকিয়েছে যে সকল ভদ্রসন্তানকে ঐ লোকটার কাছ

থেকে আমি কাপড় কিনতে দেখেছিলাম তারাও না'কি ঐ লোকটারই দলের লোক। এর আশে-পাশের লোকগুলো ছিলো সব ঝুটা বা জাল ক্রেতার দল। এই সব জাল ক্রেতারা কখনও বা ভিড় ক'রে. কখনও বা ঐ ভাবে নিরীহ পথচারীকে প্রলুব্ধ ক'রে বস্ত্রবিক্রেতাকে লোকঠকানোর কার্যে সাহায্য ক'রে থাকে ”

সম্প্রতি কতিপয় নীলামদার এক নূতন পদ্ধতিতে লোক ঠকাচ্ছে। এরা ঘণ্টা বাজিয়ে চার গজের এক পিস কাপড় হাতে তুলে চীৎকার করে, 'চার টাকা।' কিন্তু প্রলুব্ধ ক্রেতারা চারি টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া মাত্র তারা পুরা পিস না দিয়ে এক গজ মা· কাপড় তা থেকে কেটে বা ছিঁড়ে তা ক্রেতাদের প্রদান করে। প্রতিবাদ করলেও তারা ঐ অর্থ আর কাহাকেও ফেরত দেয় নি।

ইরানী প্রভৃতি দুর্বৃত্ত দলের মেয়েরাও প্রায়ই তাদের পুরুষদের শিক্ষামত গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি এসে টাকার ভাঙানি বা রেজগি সরবরাহ ক'রে থাকে। গৃহস্থ-কন্যাগণ এদের নিকট হ'তে রেজগি [সিকি, দু'য়ানি ইত্যাদি] গুনে গুনে নেন। কিন্তু এরা চলে যাবার পরই তাঁরা পুনরায় ঐগুলি গুনে দেখেন যে কুড়ি টাকার ভাঙা-নির মধ্যে প্রায় ছয় বা সাত টাকার মত রেজগি কম পড়ছে। সাধারণতঃ হাতসাফাই-এর সাহায্যে এই ইরানী মেয়েরা রেজগিগুলি অপহরণ করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সময় এজন্যে তারা হাতের চেটোয় আঠা মাখিয়ে রাখে। এদের কেহ কেহ হাতের চেটোর মধ্যাংশ সঙ্কোচন ক'রে ভেকুয়ম তৈরি করে। রেজগিগুলি আকর্ষণ [suction] করতেও সক্ষম—অভ্যাস দ্বারা অনায়াসে এইরূপে দ্রব্যাদি আকর্ষণ করা সম্ভব। এইরূপ অবস্থায় রেজগিগুলি হাতের চেটোর মধ্যে সংলগ্ন হয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বচন-বিন্যাস

দ্বারা গৃহস্থকন্যাদের অন্যমনস্ক ক'রে বা তাদের মন অন্যদিকে আকৃষ্ট ক'রে কাজ হাসিল ক'রে থাকে।

এইরূপ পদ্ধতি দ্বারা অর্থ অপহরণ করাকে চুরি কিংবা জুচ্চুরি বলা হবে তা বিবেচ্য। এদের কেহ কেহ পিত্তলের কতকগুলি দানা সোনার দানা বলে' গৃহস্থ কন্যাদের নিকট সোনার দরে বিক্রয়ও ক'রে যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা কয়েকটি আসল সোনার দানা পরীক্ষার্থে গৃহস্থকন্যাদের নিকট রেখে যায়। স্বর্ণকারের সাহায্যে ঐগুলি সত্যই সোনা কি'না তা যাচাই ক'রে নিয়ে গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐ দানাগুলি কিনতে মনস্থ করেন। এরা এরূপ ভান করে যেন ওঁদের সাথে ওগুলির ক্রয়-বিক্রয়ের সময় দরে বনিবনা হচ্ছে না। এই অজুহাতে এরা গৃহস্থ-কন্যাদের নিকট হ'তে দানাগুলো চেয়ে নিয়ে তাদের চক্ষের সামনেই হাতসাফাই-এর সাহায্যে সোনার দানাগুলি বেমালুম ভাবে সরিয়ে ফেলে তারা সেইস্থলে মুঠির মধ্যে কতকগুলা পিত্তলের দানা এনে—সেই পিত্তলের দানাগুলা গৃহস্থ কন্যাগণকে পুনরায় ফেরত দেয়। গৃহস্থ-কন্যাগণ ঐগুলাকেই পূর্বেকার সোনার দানা মনে ক'রে পুনরায় তাদের সহিত দর কষাকষি শুরু করেন। দুর্বৃত্ত স্ত্রীলোকেরা এই সুযোগে গৃহস্থ কন্যাদের প্রস্তাবিত বা ঈপ্সিত মূল্যেই দানাগুলি [Beads] বিক্রয় করতে রাজি হ'য়ে সোনার বদলে কতকগুলি পিত্তল গৃহস্থ কন্যাদের গছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। মাড়োয়ার বাউরি এবং বগরি মাঘেরা নামক স্বভাবদুর্বৃত্ত দলের মেয়েরা এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে প্রায়ই গৃহস্থ কন্যাদের ঠকিয়ে থাকে। প্রবঞ্চনার এই বিশেষ পদ্ধতিকে কেহ কেহ দানা-কুল পদ্ধতি বা বিড্‌স্বইওলিঙ বলে থাকেন।

এদেশে প্রচলিত ভিক্ষা ও দানপ্রথা সাধারণ প্রবঞ্চনার প্রধান

সহায়ক। দান করাকে আমরা পরলোকের জন্ম পাথেয় সংগ্রহের সামিল মনে করি—দানের সব কয়টি মুদ্রাই পরলোকের কোনও ব্যাঙ্কে যেন জমা পড়ছে। দানের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয়ের মনোবৃত্তির সুযোগ প্রবঞ্চকরা এদেশে হামেসাই নিয়ে থাকে। [বহু ব্যবসায়ী ইনকাম ট্যাক্সে রিবেট পাবার জন্যেও কিছু কিছু দান কার্য করে থাকেন।] এদের কেহ কেহ সাধু বা ফকিরের বেশে জনসাধারণের নিকট প্রচার করে যে তারা কোনও এক পুরান মন্দির বা মসজিদ সংস্কারের জন্যে অর্থ ভিক্ষা করছে। এদের কেহ কেহ [একক ভাবে বা দল বেঁধে] অবলা আশ্রম, হাঁসপাতাল, গোশালা নির্মাণ বা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেও অর্থসংগ্রহ করে থাকে। আসলে কিন্তু এরা এইরূপ ভাবে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা উদরসেবা বা উদরপূজা করে মাত্র। প্রদেশের কোনও এক দূর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা মহামারীর সংবাদ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হলে এদের স্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় এবং এই সুযোগে তারা অত্যন্তরূপ কর্মতৎপর হয়ে উঠে। এদের কেহ কেহ কোনও এক নামকরা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জাল এজেণ্ট সেজেও অর্থ ভিক্ষা ক'রে থাকে। এদের প্রায়ই প্রতিষ্ঠান বিশেষের নামাঙ্কিত মোহর দেওয়া বাক্স নিয়ে রাজপথে ঘুরাফিরা করতে দেখা গেছে। এদেশের ভাত্রা, কালান্দার প্রভৃতি স্বভাব দুর্বৃত্ত দলেরাও এইরূপ প্রবঞ্চনার দ্বারা অর্থাপহরণ ক'রে থাকে।

এ ছাড়া এমন বহু প্রকার ঠগী দুর্বৃত্ত দল আছে যাঁরা জনসেবক বা দেশভক্ত সেজে গ্রামে গ্রামে মানুষের দুঃখ লাঘব করবার অছিলায় ঘুরে বেড়ান। এঁদের অনেকে প্রায়ই শিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত হয়ে থাকেন। এঁরা গ্রামে গ্রামে সভা ক'রে দরিদ্রগণকে

তাদের ঋণভার লাঘব ক'রে মহাজনদের কবল হ'তে তাদের রক্ষা করবেন, এইরূপ এক ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নিকট হতে ঐ কার্যের জন্য চাঁদা আদায় ক'রতে থাকেন। এঁরা গ্রামবাসীদের বুঝান, কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন পেশ ক'রে দুঃখ জানাতে হলে এই অর্থের প্রয়োজন আছে। এঁরা মহাজনদের সহিত দেখা ক'রে সমিতির পক্ষ থেকে ভয় দেখিয়ে খাতকদের নিকট হ'তে ক্ষেপে ক্ষেপে তাঁদেরকে অর্থ আদায় করতে বলেন। অপরদিকে এঁরা খাতকদের নিকট হ'তে 'ফি' স্বরূপ আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে তাদের ইনসলভ্যান্সি ফাইল করবার জন্যেও পরামর্শ দেন। এইভাবে মহাজনদের নিকট হ'তে ঘুস্ [উৎকোচ স্বরূপ এবং খাতকদের নিকট হ'তে চাঁদা ও 'ফি' স্বরূপ অর্থ আদায় ক'রে হঠাৎ একদিন এঁরা গ্রাম ত্যাগ ক'রে চলে যান। মহাজন ও খাতকদের যা কিছু মধুর সম্পর্ক তা চিরদিনের জন্য সমূলে বিনষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁরা হঠাৎ সরে পড়েন। এই সব প্রবঞ্চক দুর্বৃত্তদের নাম দেওয়া হয়েছে "ডেট্ রিলিফ প্রোপোগাণ্ডিস্ট" বা ভূয়া জনহিতৈষী [প্রবঞ্চক] দল।

ঠগী-ভিখারী

সাধারণ প্রবঞ্চক অপরাধীদের মধ্যে ঠগী ভিখারিগণ একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে। সাধারণতঃ এরা ভিক্ষা দ্বারাই মানুষকে প্রতারিত করে। নগরে নগরে তথাকথিত বহু দরিদ্র ভদ্রলোক বা ভদ্রকন্যাকে আমরা ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। এঁরা প্রায়ই পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁরা না'কি পূর্বে অবস্থাপন্ন পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। অনেক সময় এঁরা মিথ্যা বলে' কোনও এক নামকরা লোকের নিকট আত্মীয়ও সেজে থাকেন। কেহ কেহ নামজাদা ব্যক্তিদের সই করা জাল পরিচয়-পত্রও এই জন্যে যোগাড় করেছেন। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, একজন প্রৌঢ়া মহিলা আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে মহিলাটি মাথার কাপড়টা সলজ্জভাবে আরও একটু নামিয়ে দিলেন। কিন্তু পরে নিজেই তিনি উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। কথায় কথায় আমার পরিচয়টা জেনে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'হা আমার কপাল! তুমি তা হলে অমুক গ্রামের মধুবাবুর নাতি! উনি যে আমার নিজের মেসো হতেন।' এর পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি অনেক কথাই বলে' চললেন। যথা—'আর বাবা! সেদিন কি আর আমার আছে? না বাবা, বড় মানুষ আত্মীয়দের কাছে আর যাব না। কোথা থেকে কোথায় এসে পড়লাম দেখো। এ

সবই বাবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। আসলে আমাদের রক্তের টান যাবে কোথা?' ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, নগদ দশ টাকা সাহায্য নিয়ে সেদিন তিনি আমায় রেহাই দেন। এর পরের দিন তাঁর প্রদত্ত ঠিকানায় আমি খোঁজ ক'রে জানতে পারি, সেরূপ কোনও ব্যক্তি ঐ ঠিকানায় কস্মিনকালেও ছিলেন না।"

কলকাতা শহরে প্রায়ই ভদ্রবেশী মহিলাদের রুগ্ন শিশু ক্রোড়ে ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। অনুসন্ধান ক'রে দেখা গেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভিখারীদের নিকট হতে ঐ সকল রুগ্ন শিশুকে তাঁরা ভাড়া ক'রে এনেছেন। মাতা এবং শিশুটির স্বাস্থ্যের দিকে দৃক্‌পাত করে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই প্রকৃত তথ্যটি প্রতীয়মান হবে। শুনা গেছে, যে শিশুটি যত বেশি রুগ্ন তার ভাড়া না'কি তত বেশি হয়ে থাকে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে নিশ্চল অবস্থায় শুইয়ে রাখবার জন্যে এই সকল শিশুদের কাহাকে কাহাকে অহিফেন মিশ্রিত জলও খাওয়ান হয়।

সাধারণ ভিখারীরাও অনেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা ভিক্ষা বৃত্তি ক'রে থাকে। আমি এমন বহু প্রবঞ্চক ভিখারীকে জানতাম। এদের একজনকে পায়ে পুরু ন্যাকড়া জড়িয়ে ছিন্নবাসে সারাদিন ভিখারীদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা যেতো। কিন্তু সন্ধ্যার পরই সে তার রক্ষিতার গৃহে ফিরে দামী সাবানের সাহায্যে পরিষ্কার হয়ে সিল্কের পাঞ্জাবী পরে বিজলী পাখার তলায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে রাত্রি যাপন করতো। এমন কি, তার সগৃহিণী সিনেমা দেখারও শখ ছিল। 'ভিখারী সমাজ' সম্বন্ধে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে উহার কোনও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শহরের ভদ্র দুর্বৃত্ত দালালেরা ভদ্র গৃহস্থদের ঠকাবার জন্যে কোনও কোনও

ক্ষেত্রে এই সব ভিখারীদের সহায়তা কামনা করে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"শুনুন বলি, কি ক'রে আমি ভদ্রলোকটির নিকট হ'তে দেড় হাজার টাকা আদায় করি। একদিন রাত্রে একজন ভিখারী কম্বল মুড়ি দিয়ে নয়া রাস্তার উপর শুয়েছিল। ঐ নিরীহ ভদ্রলোক সাবধানেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু মাঝ রাস্তার উপর কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকায় তিনি মানুষটাকে দেখতে পান নি। এ ছাড়া হঠাৎ গাড়িটাকে তার দিকে আসতে দেখে সে উঠে পড়ে ছুট দেয়। এই ভাবে হঠাৎ সে-ই গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল। তাকে বাঁচাবার জন্যে ভদ্রলোক চেষ্টার কোনওরূপ ত্রুটি করেন নি। তদন্ত দ্বারা পুলিশ ভদ্রলোককে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। এই সময় আমি শ্যামবাজার থেকে এক ভিখারী কন্যাকে সংগ্রহ ক'রে তাকে নিহত বৃদ্ধার কন্যা সাজিয়ে তাকে দিয়ে ভদ্রলোকের নামে আদালতে একটা মামলা রুজু করিয়ে দিই। গৃহহীন আত্মীয়বিহীন বৃদ্ধা ভিখারীর হঠাৎ একজন ওয়ারিশ এসে জোটায় ভদ্রলোক এবং তদন্তকারী পুলিশ উভয়েই অবাক হয়ে যান। এর পর আমি সুযোগ মত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে উক্ত সাজানো কন্যাকে তিন হাজার টাকা দান করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে বলি। এই ভদ্রলোকটিও ছিলেন নিরীহ ভদ্রলোক মাত্র, আদালতের ঝঞ্ঝাটে তিনি লিপ্ত হতে চাচ্ছিলেন না—আর কে-ই বা আর তা চায়। ভদ্রলোক আমার মারফৎ ভিখারী মেয়েটিকে তিন হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দান করেন। এই অর্থ হ'তে আমি মাত্র দুই শত টাকা ঐ মেয়েটিকে এই অপকার্যে আমাকে সাহায্য করার জন্যে পারিশ্রমিক স্বরূপ দিই এবং পুরা অর্থ বাবদ একটা সাদা কাগজে মেয়েটির টিপসহি নিয়ে বাকি টাকাটা আমি

নিজেই আত্মসাৎ করি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই সব সাজানো কন্যার কান্না দেখে অভিভূত হয়েও এই সব ধনী মোটরবিহারী ভদ্রলোকেরা অর্থ প্রদান করেছেন। অনেক সময় সাজানো কন্যাগণ দ্বারা ওয়ারিশবিহীন মানুষদের দাহ কার্যও সমাধা করানো হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই এদেরকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সাজানো সম্ভব হয়।”

এদের বহু ব্যক্তি নামী ভদ্রলোকদের নিকট হতে ধাপ্পা দ্বারা পরিচয় পত্র সংগ্রহ করতেও পেরেছে। এমন কি, ভূয়া দাতব্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইনকাম্ ট্যাক্স এক্সেম্পশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে দানার্থে প্রতিষ্ঠিত বহু এনডাউমেণ্ট ফাণ্ড হতে সহজে দান গ্রহণ করেছে।

[এই সব ভিখারীরা নানারূপে ভদ্র গৃহস্থদের ঠকিয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিলাতি গল্প-গল্পের অবতারণা করা যাক। ওদেশে মিউনিসিপালিটি বা করপোরেশনের লাইসেন্স ব্যতীত ভিক্ষাবৃত্তি দণ্ডনীয়। ওদেশের কোনও এক শহরে এক ব্যক্তিকে ভিক্ষা করতে দেখা যায়। লোকটির বুকের উপর করপোরেশনের মোহর অঙ্কিত একটি বোর্ড ঝুলানো ছিল। বোর্ডটিতে লেখা ছিল—“অন্ধ।” কোনও এক পথচারী দয়াপরবশ হয়ে লোকটিকে একটি মুদ্রা দান করেন। মুদ্রাটি হাতে পেয়ে খুশি মনে অন্ধটিকে উহা নিরীক্ষণ করতে দেখা যায়। ভদ্রলোক এইরূপ ভাবে অন্ধকে চেয়ে থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন, “তবে না বেটা তুই অন্ধ?” ঠগী ভিখারী এতে বিব্রত হয়ে না'কি বলে উঠেছিল, “আজ্ঞে না, আসলে আমি অন্ধ নই, আমি হলাম কালা [বধির], ওটা করপোরেশন লিখতে ভুল করেছে।” এর পর পথচারী ভদ্রলোকটি অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে ধমকে উঠলেন, “এ্যাঁ! কি বল্লি? ফের মিথ্যে কথা!” ভিখারী লোকটা

কেঁদে ফেলে না'কি তখন উত্তর দিয়েছিল, "আজ্ঞে তা নয়। আমি তো কালা নই। স্যার! আমি একজন বোবা [মূক]।"]

কলকাতা শহরের ন্যায় বড় বড় শহরে বংশ-তালিকা তো দূরের কথা, কাহারও প্রকৃত নাম ও পিতার নাম সংগ্রহ করাও দুষ্কর হয়ে উঠে। দুই পুরুষ গৃহহীন পরিচয়হীন ভাবে বাস করেছে, এমন লোকেরও এখানে অভাব নেই। এই কারণে এইরূপ কোনও এক মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ সেজে লোক ঠকানো এখানে সহজসাধ্য। এইরূপ প্রবঞ্চনার কাযে দুর্বৃত্তদেব শহরের কোনও কোনও অসৎ উকিল ও মুহুরীরা প্রায়ই অধিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সাহায্য ক'রে থাকেন। কোনও এক মোটর দুর্ঘটনাব পর দুর্বৃত্তরা মোটর চালকদের প্রায়ই ব্ল্যাক-মেইল ক'রে থাকে। এই ভিখারীদের কথা বাদ দিলে গরীব বস্তিবাসী গৃহস্থরাও এ বিষয়ে পিছপাও নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিব পিতামাতাও এই কার্যে দুর্বৃত্তদের অর্থ প্রাপ্তির আশায় সাহায্য করেছে। এমন সব পিতাকেও আমি দেখেছি যারা কিনা আপন পুত্র এই ভাবে গাড়ি চাপা পড়ায় কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে।

এমন বহু ভিখারী ঠগী আছে যারা তৈল-রঙের দ্বারা তাদের পদদ্বয় চিত্রিত করে নিজেদের কুষ্ঠরোগীরূপে প্রচার করেছে। রঙিন মোমের সাহায্যে তারা চামড়ার উপর ক্ষত তৈরি করে থাকে। এই ভিখারী ঠগীদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নের কাহিনী দুটি হ'তে এই ভিখারী ঠগীদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"মৌলালীর নিকটস্থ কোনও এক স্থানে ফুটের উপর জনৈক বৃদ্ধ অন্ধকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে দেখা যেত। প্রতি দিন একজন বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে অতি কষ্টে অকুস্থলে হাজির হত। সন্ধ্যার

সময় যথারীতি এই বালকটিই বৃদ্ধকে হাতে ধরে গৃহে নিয়ে যেত। এদিকে কলকাতা পুলিশে খবর এল যে ঐ বৃদ্ধটি একেবারেই অন্ধ নয়। আসলে সে এক পিকপকেট দলের সর্দার এবং আশ্রয়দাতাও। বহু বালককে সে ভুলিয়ে এনে আশ্রমে ভর্তি করেছে এবং তার আড্ডায় খোঁজ করলে 'চুরি ক'রে আনা অনেকগুলি অপরিচিত বয়স্ক বালকেরও' সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

সেদিনও সন্ধ্যার পর একটি ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত মলিন ও অনাহার-ক্লিষ্ট বালকের স্কন্ধে ভর ক'রে যষ্টি হস্তে নুইয়ে পড়া দেহটাকে অতি কষ্টে উপরে তুলে তাকে ধীরে ধীরে পথ চলতে দেখা গেল। এদিকে পুলিশ যে তাকে অনুসরণ করছে তা আদপেই সে বুঝতে পারে নি। বৃদ্ধের পিছন পিছন পুলিশও একটি নোঙরা বস্তির মধ্যে এসে পৌঁছল। বাসগৃহের কাছে এসে বৃদ্ধটি চোখ দুটা দুই হাতে একবার কচলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মাট-কোঠার মধ্যে তখন ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছিল। চোরাই মাল সমেত অনেকগুলি ছোকরাকেও সেখানে দেখা গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বৃদ্ধের নজর পড়ল পিছনের গোয়েন্দা পুলিশের দলের উপর। অকুস্থলে পুলিশ দেখে বৃদ্ধ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিল। এদিকে পুলিশও ছিল প্রস্তুত। ঐ বৃদ্ধের পিছন পিছন ধাওয়া করতে তাদেরও একটুও দেরি হয় নি। আঁকা বাঁকা বস্তির পথ ধ'রে বৃদ্ধ অবলীলাক্রমেই তার অন্ধতা সত্ত্বেও ছুটে চলছিল। ধরা পড়ার পর বৃদ্ধের চক্ষুর দিকে তাকিয়ে পুলিশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন বৃদ্ধের চক্ষুর মধ্যে স্থূল নিষ্প্রভ শ্বেত মাংস পিণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এক্ষণে তার চক্ষুর শ্বেত অংশের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণের চক্ষুমণি দুইটি প্রকট হয়ে উঠেছে। এর পর তাকে আর কোনও ক্রমে অন্ধ বলা যায় না।

এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে পুলিশ জানতে পারে যে, বৃদ্ধ বহুদিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধন [অভ্যাস] দ্বারা চক্ষুর মণি দুইটি এমন ভাবে উপরে উঠাতে পেরেছিল, যাতে করে উহা বাহির হ'তে কিছুতেই আর পরিলক্ষ্য হয় না। বৃদ্ধ চক্ষুর মণি দুইটি একবার উপরে উঠিয়ে এবং একবার নিম্নে নামিয়ে তার এই বিবৃতির সত্যতাও প্রমাণ করে!"

এইবার ব্যাখ্যাসহ অনুরূপ অপর একটি কাহিনী সম্বন্ধে বলা যাক্।

"কোনও এক জনহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারীর নিকট একটি মূক [বোবা] বালক ভিক্ষার জন্মে আসে। তার মুখ-বিবরের মধ্যে জিহ্বার বদলে একখণ্ড স্থূল মাংসপিণ্ড দেখা যায় মাত্র। কোনও এক বিশেষ কারণে-সেক্রেটারী ভদ্রলোকের মনে সন্দেহ জাগে এবং তিনি বালকটিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করেন। ডাক্তারী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ছেলেটি আদপেই মূক বোবা নয়। আসলে সে বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা জিহ্বাটি এমন ভাবে ভিতরের দিকে গুটিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, যাতে ক'রে কি'না আপাতঃ দৃষ্টিতে তাকে মূক [বোবা] বলেই মনে হয়।"

এই ভাবে ভিখারী ঠগীরা নগরবাসীদের প্রায়ই প্রতারিত ক'রে থাকে। এমন অনেক ভিখারী আছে যারা তাদের হাতের ও পায়ের ক্ষত আদি কিছুতেই নিরাময় হতে দেয় না। অনেকে আবার ভিক্ষা না দেওয়ার কারণে তার ক্ষতপূর্ণ হস্ত দ্বারা নগরবাসীদের জড়িয়ে ধরে' তাদের ভয় দেখিয়েছে। এই শহরে এমন অনেক বীভৎস কাহিনীও শুনা গেছে। এই সকল ভিখারীদের অপরাধী ছাড়া আর কি'ই বা বলা যেতে পারে!

এই ভিখারীরা মূলতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা 'একক' ও 'সমাজবদ্ধ'। ভিখারী সমাজ ও উহার সংগঠন সম্বন্ধে পুস্তকের

প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি ভিখারী কর্তৃক প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে মাত্র বলতে চেয়েছি। ভিখারীদের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে অপর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। এই শহরে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে।

"একদিন আমি ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এগারো বৎসর বয়স্ক একটি বালক আমার পথ রোধ ক'রে সাহায্য ভিক্ষা করল। আমি একে একে তাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, সে এমন ভাবে সেইগুলির উত্তর দিল যে আমার মন করুণায় ভরে' উঠল। তার কাহিনীটুকু আমি নিম্নে তুলে দিলাম।

—'হাঁ. মশাই! দুই বছর পূর্বের ঘটনা—আমি তখন খুবই ছোট। আমার পিতাকে মনে পড়ে বই কি, তিনি আমাদের কত-ও ভালবাসতেন। আমার মাকেও তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন। কিন্তু কিছু পরে হঠাৎ তাঁর চাকরি যায় এবং আরও কিছুদিন পরে হঠাৎ তাঁকে মার সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি। আমাদেরও এ সময় তিনি কটু কথা বলতেন। এর পর প্রায়ই তাঁকে রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেখিনি। গত দুই বছর হ'ল কোথায় তিনি উধাও হয়ে গেছেন। হাঁ, মার খুব অসুখ, ছোট ভাইটারও তাই। সে বোধ হয় আর বাঁচবে না। সাত মাস আমাদের বাড়ি ভাড়া বাকি। কাল বোধ হয় আমাদের ওরা তাড়িয়ে দেবে। হাঁ! এই পানের খিলিগুলা বিক্রি হ'লে ভাইটার জন্যে দুধ কিনব। আজ্ঞে! আমার মায়ের ঔষধ? না তা আর কেনা হবে না। তার জন্যে পয়সা কই?'

এর পরের দিনই ছেলেটির সঙ্গে আমার পুনরায় দেখা হয়। এদিন সে আর আমাকে চিনতে পারে নি। সে আমার কাছে এগিয়ে এসে ভিক্ষা চায়; কিন্তু আমি অবাক হয়ে শুনি তার কাছে অপর

একটি সম্পূর্ণরূপ নূতন কাহিনী। পূর্বের কাহিনীটির সহিত পরের এই কাহিনীর একটু মাত্রও মিল ছিল না। আমি তখন অবাক হয়ে যাই। এত মিথ্যে কথাও বলতে পারে ঐটুকু একটা ছেলে—"

এই ভিক্ষাবৃত্তি সম্বন্ধে অপর আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"আমি প্রায়ই দেখতাম এক ব্যক্তি এক অদ্ভুত উপায়ে ভিক্ষা করছে। লোকটি সাষ্টাঙ্গভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে প'ড়ে সম্মুখে একটা দাগ কেটে উঠে পড়ছিলো। এর পর সেই দাগ বরাবর পা রেখে দাঁড়িয়ে আবার সে ভূমি চুম্বন করছিল। এইরূপ ভাবে না'কি সে কোনও এক তীর্থ পর্যন্ত যাবে—ঠাকুরের কাছে মানত করতে। প্রতিবারেই সেই ভিক্ষায় রেকাবীটা সম্মুখে রেখে দিচ্ছিল এবং সেখানে পয়সাও পড়ছিল বিস্তর। নিয়ম মত তাকে না'কি ভিক্ষা করতে করতে এই ভাবে গণ্ডি কাটতে কাটতে তীর্থে যেতে হবে। আমি কিন্তু দেড় মাসের মধ্যেও তাকে শহর ত্যাগ ক'রে তীর্থের দিকে একটুও এগুতে দেখি নি। এইরূপ ভাবে অসাধু উপায়ে ভিক্ষাকে প্রতারণা ছাড়া আর কি'ই বা বলা যাবে।"

ভুয়া চাকুরি

বোগাস্ সার্ভিস ব্যুরোকে বাংলাতে ভূয়া চাকুরি সংস্থা বলা হয়। মিথ্যে প্রলোভন দ্বারা চাকুরি দিবার অছিলায় প্রতারকরা শহরের ও গ্রামের বেকার যুবকদের প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। অধুনাকালে বেকার যুবকদের সংখ্যা ক্রমান্বয়েই বর্ধিত হচ্ছে। এই জন্যে কলকাতা শহরে চাকুরি দিবার লোভ দেখিয়ে দুর্বৃত্তেরা প্রায়ই বেকার যুবকদের ঠকিয়ে থাকে। এই শ্রেণীর একজন দুর্বৃত্তের একটি বিবৃতি আমি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"আমি এই বিশেষ পদ্ধতি দ্বারাই লোক ঠকিয়ে খাই। প্রথম প্রথম আমি বেকার যুবকদের জানাতাম যে অমুক অফিসের হেড্ ক্লার্ক আমার আত্মীয়। তবে ছোট সাহেবকে দেড়শো টাকা ঘুষ দেওয়া চাই। তা না হলে চাকুরি জোটা মুস্কিল হবে ইত্যাদি। ঐ টাকাটা দিলেই তিনি সত্তর টাকা মাইনের একটি চাকুরি পেতে পারেন। বেকার যুবকগণ এর পর মায়ের গহনা বন্ধক রেখে টাকা যোগাড় ক'রে তা আমাকে এনে দিত। তাদের এই আশা যে চাকরি হ'লে মাইনে হ'তে প্রতি মাসে কিছু কিছু বাঁচিয়ে মার টাকা কয়টা তারা শোধ ক'রে দেবে। এই ভাবে বহু বেকার যুবকদের কষ্টার্জিত অর্থ আমি আত্মসাৎ করেছি। হতভাগা যুবকগণের একবারও মনে আসে নি যে, চাকুরি জোগাড় করে দেবার ক্ষমতা আমার থাকলে আমি নিজে এমনি ভাবে বেকার জীবনযাপন করছি কেন? এই

ভাবে আরও কিছুদিন লোক ঠকানোর পর আমি আমার কার্য-পদ্ধতির কিছুটা অদল-বদল করি। এই সময় আমি বেকার যুবকদের জানাতাম যে, আমি রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর একজন অফিসার এবং তাদের আমি ভাল চাকুরি যোগাড় করে দিতে সক্ষম। আমি সাধারণতঃ এদের এই বড় অফিসের গেটের সামনে নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করতে বলতাম। ঐ সময় আমি গোপনে পিছনের গেট দিয়ে ঢুকে সামনের গেটে এসে এদের সঙ্গে দেখা করতাম এমন ভাব দেখিয়ে, যেন এই মাত্র আমি অফিস থেকে বেরিয়ে আসছি। বড় বড় অফিসের চাপরাশী সকল অর্থের বিনিময়ে সর্বসমক্ষে আমাকে সেলাম জানিয়ে এ বিষয়ে আমাকে সাহায্যও করেছে। এই-ভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয়। এখন আমি নিজেই একটি সাজানো অফিস খুলেছি। "কর্মখালি আছে, এক টাকার টিকিট সমেত দরখাস্ত চাই, জমার জন্যে দেয় মাত্র ২০০৲ টাকা"—ইত্যাদি লিখে কাগজে অমি বিজ্ঞাপনও দিয়েছি। এই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আমি দরখাস্ত পেয়েছি প্রায় ২৭০ খানি। আর সেই সঙ্গে জামিনের টাকাও পেয়েছি অনেক। ভাবছিলাম এইবার আমরা পাততাড়ি গুটিয়ে সরে পড়ব। আর এই সময়ই কি'না আপনারা এসে হাজির হলেন।"

অধুনাকালে এই অপরাধ এক নূতন পদ্ধতিতে কলকাতা শহরে শুরু করা হয়েছে। সাধারণভাবে আমরা এই পদ্ধতিকে বলে থাকি জব-চিটিং [Job cheating]। এই বিশেষ প্রবঞ্চনার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দুর দুর দেশ থেকে দুঃস্থ যুবকদের এই শহরে এনে তাদের এক অভিনব পদ্ধতিতে ঠকানো হয়ে থাকে। এই সকল যুবক-দের কেহ কেহ বিধবা মাতার শেষ গহনা পর্যন্ত বাঁধা দিয়ে বা বিক্রি করে সেই কষ্টলব্ধ অর্থ এই সকল দুর্বৃত্তদের হাতে সরল বিশ্বাসে

তুলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এই অপপদ্ধতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমরা একটি ঝুটা ব্যবসা কেন্দ্র খুলে কোনও এক অবসরপ্রাপ্ত খেতাবধারী হাকিম বা সুপারকে মোটা মাইনের সেক্রেটারি বা ডিরেক্টর নিযুক্ত করতাম। তারপর কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ত,—'মাসিক একশত টাকা বেতনে বহু ক্যানভাসার ও শেয়ার বিক্রেতা চাই, কিন্তু পূর্বাহ্নে একশত বা দুই শত টাকা সিকিউরিটি মনি জমা দিতে হবে। অবসরপ্রাপ্ত হাকিম রায়সাহেব বা রায়বাহাদুর অমুকের নিকট আবেদন করুন।' রায়সাহেব প্রভৃতি খেতাবধারী সরকারী কর্মচারীর পূর্বতন পদমর্যাদার জন্যে নিঃসন্দেহে বহু ব্যক্তি অফিসে এসে অর্থ সহ ধন্না দিত। ঐ সকল রায়সাহেব প্রভৃতিকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আমাদের এই পাপ মতলব সম্বন্ধে কখনও এতটুকুও আমরা জানাই নি। তিনি পর্দা ঘেরা অফিসে বসে কেবলমাত্র নিষ্প্রাণ নির্দোষ নথিপত্রে সই করে যেতেন। এদিকে আমাদের নিকট কয়েকটি শেয়ার ক্রয় সম্বন্ধে বহু তথ্য সহ ছাপা ফর্ম থাকত। আমরা ঐ সকল ব্যক্তিদের অর্থ গ্রহণ করে চলাকীর সহিত এমন সব কাগজপত্রে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিতাম যাতে প্রমাণ করা যাবে যে তারা আমাদের ফার্মের শেয়ার মাত্র ক্রয় করেছে। চাকুরির জন্য এখানে তারা কোনও অর্থ সিকিউরিটি রূপে জমা দেয় নি। বলা বাহুল্য যে, আমাদের ধাপ্পাবাজিতে তারা না পড়েই প্রতিটি ছাপা ফর্মে একটি করে সই দিত। শক্ত ইংরাজিতে লেখা নানা তথ্য ভারাক্রান্ত ফর্মের লিখিত অর্থ তারা বুঝতে পারে না। এর পর আমরা তাদের কয়েকটি বাজে দ্রব্য দিয়ে তা বাজারে চালাতে বলতাম এবং তা তারা স্বভাবতঃই চালাতে পারে নি। ইতিপূর্বে বাজারে জিনিষ চালাতে না পারলে তাকে বিদায় দেওয়া হবে—এইরূপ প্রস্তু

মুদ্রিত স্বীকৃতি-পত্রে তাদের দ্বারা আমরা সই করিয়ে নিয়েছি। এই সব কারণে তারা আমাদের নামে মামলা করে তাদের পূর্ব অর্থ কোনও দিনই আদায় করতে পাবে নি।"

প্রবঞ্চনা—অন্যান্য

"রেশনড্ এবং কণ্ট্রোলড দ্রব্যাদি, যথা—কাপড়, চিনি, তৈল ইত্যাদির জন্যে পারমিট্ বা ছাড়পত্র কিংবা বাড়ি বা গাড়ি সংগ্রহ করে দিব"—এই অজুহাতেও খাদ্য এবং দ্রব্য রেশনের যুগে দুর্বৃত্তরা দেশবাসীদের অর্থাপহরণ করে থাকে। প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এ বিষয়ে এদের স্বর্ণ সুযোগ এনে দেয়। নানারূপ কৃত্রিম বাধা-নিষেধের ফলে একে ওকে উৎকোচ প্রদানের প্রশ্নও এরা এই সময় উঠিয়ে থাকে। "অমুককে উৎকোচ স্বরূপ এত টাকা দিতে হবে বা অমুকের সঙ্গে আমার এইরূপ হৃদ্যতা আছে"—এইরূপ বচন বিন্যাস দ্বারা দুর্বৃত্তরা সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নিকট হ'তে বহু অর্থই আদায় করেছে। কখনও এই সব দুর্বৃত্তরা সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের জাল অফিসার সেজে পল্লী অঞ্চলে সফরে বাহির হয়। সঙ্গে থাকে গভর্নমেন্টের মোহর অঙ্কিত তকমা আঁটা নকল চাপরাশী। এই পিতলের চাপরাশটি তারা বাজার হ'তে তৈরি করিয়ে নিয়েছে। এই ভাবে মফঃস্বলের দোকানগুলিতে হানা দিয়ে উৎকোচ স্বরূপ তারা প্রায়ই অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দোকানদারেরা ভয়ে ভক্তিতে প্রথমতঃ এঁদের জলযোগের যোগাড় করে দেয়। তার পরে এঁদের

নির্দেশমত তাঁদের চাপরাশীকেও ব্যাপারীরা খাইয়ে দেয়। এর পর এরা পারমিট্ আদি প্রাপ্তির আশায় অর্থাদি উৎকোচ দিয়ে এঁদের কাছেই "ফি" বাবদ টাকা জমা দেয। এরা যথারীতি অকুস্থলেই রসিদ পায় বটে কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও এরা ডাকঘরের মারফৎ কোনও পারমিট্ বা ছাড়পত্র কখনও পায় নি।

এছাড়া জাল পুলিশ এবং জাল ইন্‌কাম্ ও সেলস্-ট্যাক্স অফিসার সেজেও দুর্বৃত্তরা প্রতারণা করে থাকে। জাল পুলিশ সেজে খানা-তল্লাসী করে দুর্বৃত্তরা যথারীতি সাক্ষীর সামনে লিস্ট করে গৃহস্থদের অলঙ্কারাদি চোরাই মাল সন্দেহে গ্রহণ করে সরে পড়েছে। এইরূপ চৌর্য-বৃত্তির কাহিনীর কথাও এদেশে শোনা গেছে।

কোনও কোনও প্রতারণা অপরাধ এমন সাবধানে পরিকল্পিত হয়, যাতে করে প্রতারকরা সহজেই প্রচলিত দণ্ডবিধিকে এড়িয়ে চলতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। এই চিত্তাকর্ষক বিবৃতিটি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

"একদিন আমি অফিস ঘরে বসে আছি। এমন সময় একটি দালাল ভদ্রলোক এসে হাজির। কিছুদিন যাবৎ ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা চলছিল। তিনি আমাকে জানান যে, খড়্গপুরের কোনও এক বড় রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর তাঁর কণ্ট্রাক্টের কাজের জন্যে একটি ফায়ার ইঞ্জিন কিনতে চান। এ জন্য নাকি তিনি চল্লিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে রাজি আছেন। আপাততঃ তিনি এ জন্যে কলকাতায় এসে অমুক হোটেলে বাসা নিয়েছেন, ইত্যাদি।

এর পর আমি দালাল ভদ্রলোকের পরামর্শ মত কিছু দাঁও মারবার আশায় সারা শহরে উক্ত রূপ ইঞ্জিনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু আমরা ঐরূপ কোনও পুরানো ইঞ্জিনের সন্ধান পাই না। এর পর

দালাল ভদ্রলোক আমাকে একটি নামকরা ওআর্কশপে এনে হাজির করে। এখানে আমরা কুড়ি হাজার টাকা মূল্যের একটি ইঞ্জিনের সন্ধান পাই। আর তৎক্ষণাৎ অমুক হোটেলে এসে উক্ত কন্ট্রাক্টরের সহিত মুলাকাৎ করি। তাঁর বেশভূষা এবং আদবকায়দা ও ভদ্রতাও আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পরের দিন ব্যবস্থামত কন্ট্রাক্টর মশাই একজন সাহেব ইঞ্জিনিয়ার সহ আমাদের সমক্ষে ইঞ্জিনটি পর্যবেক্ষণ করে মত দেন যে চল্লিশ হাজার টাকায় তিনি উহা কিনতে রাজি আছেন, এবং ঐ সময় এও ঠিক হয় যে আমরা যেন ইঞ্জিনটি ওঁর ওখানে পৌঁছে দিয়ে প্রাপ্য মূল্য বাবদ চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে আসি। পরের দিন আমি নগদ কুড়ি হাজার টাকা মূল্যে ইঞ্জিনটি ক্রয় করে উহার ডেলিভারি দিতে গিয়ে দেখি উক্ত কন্ট্রাক্টর মশাই উধাও হয়েছেন। এর পর আমি জানতে পারি যে উক্ত ইঞ্জিনটির আসল মূল্য দুই হাজার টাকারও কম। প্রতারণাটি আসলে কন্ট্রাক্টর, দালাল এবং জাল ইঞ্জিনিয়ারের যোগসাজসে উক্ত মেসিন বিক্রয়কারী ব্যাপারীটির দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু আইনতঃ এ জন্যে তাঁকে কোনও রূপে দায়ী করা যায় নি। কারণ যন্ত্রাদি কণ্ট্রোলড্ না হলে ফ্যান্সি প্রাইস্-এ যে কোনও মূল্যে উহা বিক্রয় করা আইনতঃ অপরাধ নয়।"

এই বিশেষ প্রবঞ্চনা অপরাধ সম্বন্ধে অপর আর একটি ফরিয়াদীর বিবৃতি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম।

"আমার কাছে একদিন রতনবাবু এসে জানালেন যে, হরি সিং নামক এক বিদেশী ব্যবসায়ী এই নমুনার বহু যন্ত্র সাপ্লাই চায়। কয়েকদিন পরে এই দালাল রতনবাবুই আমাকে নিয়ে বহু দোকানে ঘুরে একটি দোকানে ঐরূপ কয়েকটি যন্ত্র খুঁজে বার করলেন। প্রতিটি যন্ত্রের জন্ত ঐ দোকানী মাথুরাম ৫০৲ টাকা চেয়ে বসলেন। ওদিকে কিন্তু

দালাল রতনবাবু আমাকে জানিয়েছেন যে, ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং প্রতিটি যন্ত্র পিছু ১০০৲ টাকা দিতে রাজি। এর পর আমরা ঐ যন্ত্রের নমুনাসহ ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং-এর কাছে উপস্থিত হই। ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ডিক্সন সাহেব দ্বারা ঐ যন্ত্রের নমুনা পরীক্ষা করিয়ে আমাকে অনুরূপ ৪০০০ পিস্ যন্ত্র তাঁদের সাপ্লাই দেবার জন্য অর্ডার দিয়ে দিলেন। আমি প্রথম লটে ঐরূপ দুই হাজার পিস্ যন্ত্র কিনে আমার গুদামে মজুত করি। কিন্তু তার পরই দেখি ঐ বিদেশী ব্যবসায়ী হরি সিং তাঁদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে কোথায় সরে পড়েছেন। এর পর আমরা বাজারে যাচাই করে দেখি যে ঐরূপ যন্ত্র বাজারে প্রতি পিসে পাঁচ টাকাও কেউ দিতে চায় না। আমি অচিরে বুঝতে পারি যে, ঐ বাঙালী দালাল, পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী ও তার সাহেব ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ মাড়োয়ারী দোকানী প্রভৃতি সকলেই একই দলের দলী।

আমি এর পর ঐ মাড়োয়ারী দোকানী মাথুরামের দোকানে এসে তাকে চ্যালেঞ্জ করলে তিনি নির্লজ্জভাবেই উত্তর দিলেন, 'আরে আপনি যে বুদ্ধিতে হেরে গেছেন। এই সহজ কথাটাও এখনও আপনি বুঝছেন না। এখন নিয়ে আসুন আপনার মত আর এক মক্কেলকে ভুলিয়ে আমাদের কাছে। তা' হলে আপনি আপনার হারানো অর্থ তো ফিরে পাবেনই, তা ছাড়া আপনি ঐ বাবদ আরও কিছু হিস্যা বা ভাগ পাবেন।' এর পর আমি ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের নামে কেস্ করব জানালে দোকানী ভদ্রলোক শান্তভাবে উত্তর করলেন, 'আচ্ছা! এ সম্বন্ধে একটা মিটমাট করব। কিন্তু এ সপ্তাহে তা হবে না। আচ্ছা! আপনি দিন তো এই কাগজে লিখে আপনার নাম ও ঠিকানাটা, যাতে আপনাকে দুই-তিন দিনের;

মধ্যে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই কথা বলে লোকটি একটা ভাঁজ করা কাগজের উপর দিকটা মুঠি করে ধরে তার নিচেটা আমাকে দেখিয়ে দিলে। আমি অর্থনাশের কারণে এমন হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, এবারও আমি তাদের ধাপ্পায় ভুলে সেইখানে আমার নাম ও ঠিকানা স্বহস্তে লিখে দিলাম। এর পর ঐ লোকটি পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ঐ কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলে দেখলাম যে, আমার সইয়েব পাশে একটা রেভিনিউ টিকিট এঁটে তাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে এবং উহার উপরেই মানানসই রূপে টাইপ করে ইংরাজিতে লেখা রয়েছে, 'আমি অমুকের নিকট হতে এই বাবদ এত টাকা ফিরত পাইলাম।' আমাকে হতভম্ব হয়ে যেতে দেখে লোকটি অট্টহাসি হেসে বলে উঠল, 'এই দেখুন দ্বিতীয়বার আপনি ঠকলেন। অর্থাৎ বুদ্ধির লড়াইয়ে আবার আপনি হারলেন'।"

[মূল্যবান অথচ বাজারে অচল এমন বহু দ্রব্য আছে, যেমন এরোপ্লেনের পার্টস। এইগুলিই প্রবঞ্চনার কর্মে ব্যবহৃত হয়। এক প্রবঞ্চিত ভদ্রলোককে পূর্বাহ্নে সাবধান করাতে সে আমাকে বলেছিল, —'না, না। আমি লোভ সামলাতে পারছি না। দুটাকাতে ২০ টাকা লাভ।' ব্যবসা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ ও লোভী ব্যক্তিরাই এইরূপে ঠকে।]

কালীঘাটের কালী মন্দিরের নিকট সম্প্রতি এক অভিনব উপায়ে লোক ঠকানোর পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। এই প্রবঞ্চনার জন্য অজ্ঞ গ্রাম্য তীর্থযাত্রীদেরই বেছে নেওয়া হয়ে থাকে। এই অপকর্মের জন্য জনৈক দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি সুন্দর ফটো দেখিয়ে বলে যে, তার এইরূপ এক ফটো ১৲ টাকা মূল্যে সে তুলে দিতে পারবে। এর পর ঐ দালাল প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে একটি ফটোর দোকানে বসিয়ে

দিয়ে অলক্ষ্যে সরে পড়ে। তার পর ফটোওয়ালা ক্যামেরায় কোনও প্লেট না দিয়ে মিথ্যা করে ফটো তোলার অভিনয় করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির নিকট মূল্য চায়। এর পর প্রবঞ্চিত ব্যক্তি দালালের কথামত তাকে একটি টাকা দেওয়া মাত্র ক্রোধের ভান ক'রে ঐ দোকানী বলে উঠে, 'সে কি মশাই! কে বললে এক টাকায় ফটো উঠানো যায়? এক-খানি ফটো প্লেটের মূল্যই যে ৩৲ টাকা। শীঘ্র নিয়ে আসুন আরও চার টাকা।' প্রবঞ্চিত ব্যক্তি ঐ টাকা না দিতে পারলে তার সেই একটি টাকা তারা ফটো না দিয়েই বাজেযাপ্ত করে নেয়। তবে যদি বাকি চার টাকা তারা দিতে পারে তাহলে পরে সত্যকার ফটো প্লেট দিয়ে তার একটা মামুলী ফটো তারা তুলে দিয়েছে।

চাকুরি এই বাজারে দুর্লভ হয়ে উঠায় চাকুরি-প্রত্যাশী ব্যক্তি-দেরই ঠগীরা অধিক সংখ্যায় ঠকাতে সচেষ্ট হচ্ছে। সাধারণতঃ মধ্য-বিত্ত পরিবারের শিক্ষিত বেকার যুবকরা এর শিকার হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"ঐ দিন একটা রুইকগাড়ি করে একটি সুবেশ দীর্ঘকায় ভদ্রলোক আমাদের বাটী এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক বাবু কি বাড়ি আছেন?' উত্তরে সসম্ভ্রমে আমি তাঁকে জানালাম, 'আজ্ঞে, বাবা তো দিল্লী গেছেন।' 'ওঃ তাই না'কি?' একটু চিন্তিত ভাবে ভদ্রলোক বলেন, 'তবে তো মুস্কিল হ'ল। তিনি কার একটি চাকুরির জন্য আমাকে বলেছিলেন। একটা ৪০০৲ টাকা মাহিনার সাব-ইঞ্জিনিয়ারের চাকুরি। আজই যে লোকটিকে দরকার ছিল। আচ্ছা! তিনি ফিরলে এই কার্ডখানা তাঁকে দিও।' ঐ কার্ডখানাতে লেখা ছিল, মিঃ এস বোস, B. E. A. N. C. I. E. [cuperhill] Supdt. Eng.। আমি বিব্রত হয়ে'বললাম, 'আজ্ঞে আমি একজন B. E., আমার জন্য তিনি

বলেছিলেন। এখুনি কি কোথাও যেতে হবে? তা চলুন তাহলে যাব আমি।' 'তাই না'কি! আরে গুড, গুড, তবে এস শীঘ্রি', বলে ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসলেন। আমি আর দ্বিরুক্তি না করে একটা স্যুট পরে তাঁর পাশে এসে বসেছি। এমন সময় আমতা আমতা করে তিনি বললেন, 'কিছু মনে করো না, একটা ভুল হয়ে গেল। আমার কাছে অবশ্য একশ' টাকা আছে, কিন্তু আরও দু'শো টাকা চাই। একটা কিছু কিনে ডাইরেক্টার সাহেবকে প্রেজেন্ট দেওয়া দরকার। দেখ তো মার কাছে শ' দুই টাকা হবে কি'না? অগত্যা আমি বাড়ি ফিরে মার কাছ হতে দু'খানা একশ' টাকার নোট এনে ভদ্রলোকের হাতে তা তুলে দিলে ভদ্রলোকটি বলেন, 'তা হলে চল মিউনিসিপ্যাল মার্কেটটা ঘুরে ওখানে যাই।' এর পর ধর্মতলায় এসে আমার চুলের দিকে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে! এ কি করেছ তুমি? এই রকম একটা ফার্স্ট ইম্প্রেশন সাহেবকে তুমি দেবে! ছিঃ, যাও চুলটা সেলুন থেকে তাড়াতাড়ি ছেঁটে নাও।' আমি তাঁর কথামত একটা সেলুনে ঢুকে চুল ছেঁটে বেরিয়ে এসে দেখি ভদ্রলোক টাকাসহ ঐ গাড়ি করেই অন্তর্ধান হয়েছেন।"

প্রবঞ্চনার পদ্ধতিসকল বিবিধ রূপের হয়ে থাকে। নিম্নে অপর আর এক প্রকার প্রবঞ্চনা সম্পর্কীয় বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমাদের এক বন্ধু সকাল আটটার সময় অমুক বিখ্যাত জহরীর দোকানে একশ' টাকা ভাঙিয়ে মাত্র দশ টাকা মূল্যের একটা গহনা কিনে নিয়ে এল। দোকানটি খরিদ্দারবহুল হওয়ায় ঐরূপ বহু একশ' টাকার নোট সেখানে জমা পড়ে। আমরা কিন্তু ঐ একশ' টাকার নোটটির নম্বর পূর্বাহ্নে টুকে রেখেছিলাম। এর পর বিকাল তিনটায় আমি ঐ দোকানে এসে একটি দশ টাকার নোট দিয়ে পাঁচ টাকা

মূল্যের একটি রুপার কৌটা কিনি। ঐ কাউণ্টারের বিক্রেতা আমাকে পাঁচ টাকা ফেরত দিলে আমি সবিস্ময়ে বললাম, 'এ্যাঁ, এ'কি মশাই! আমি যে একশ' টাকার নোট দিয়েছি!' তত্ক্ষণে ঐ দোকানী ঐ দশ টাকার নোটটি বহু একশ টাকার নোটের সঙ্গে মিশিয়ে এই বাক্সে রেখে দিয়েছেন। দোকানী এই ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে আমি আমার নোট বুকে লিখা একশ' টাকার নোটের নম্বরটি তাঁকে দেখিয়ে বললাম, 'দেখুন দেখি এই নম্বরের নোটটি আপনাদের ঐ বাক্সে আছে কি'না?' দোকানী খুঁজে তার বাক্স হতে ঐ নম্বরের একশ' টাকার নোটটি বার করে অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলেন, 'ওহো! তা'হলে আমারই ভুল হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু ঐ দোকানী যদি তার পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন তা'হলে আমি থানায় এসে নালিশ জানিয়ে পুলিশের সাহায্যে ঐ নোট দোকান হতে বার করে প্রমাণ করতাম যে ঐ নোট আমারই।"

অভাব অনটনে মানুষ বেপরোয়া হয়ে উঠায় তাদের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। এই সময় নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো সে ভাসমান খড়-কুটোও ধরতে রাজি। এইরূপ মানসিক অবস্থাতে তারা আশাভঙ্গজনিত দুঃখ পেতে চায়নি। বহু ক্ষেত্রে জুয়া খেলার [চান্স ট্রাই] মতো তারা এগোয়। এই সম্বন্ধে নিয়ে একটি ঘটনামূলক বিবৃতি উদ্ধৃত করে দিলাম।

"ঐ ভদ্রলোকটি বারাকপুর মহকুমার এক ফ্যাক্টরির কর্মচারী। আমাকে এসে জানালো যে ৩০০৲টাকা লেবার অফিসর এবং ওয়ার্কস্ ম্যানেজারকে দিলে তবে আমার চাকুরি হবে। সে এও বললে যে তাদের ফ্যাক্টরির বড়ো ম্যানেজার উৎকোচ গ্রহণ করেন না। আমি পড়শীদের কাছে ধারধোর করে ১০০৲টাকা সংগ্রহ করে তাকে তা দিই।

সে উহা গ্রহণ করে কি ভেবে রুখে উঠে তা আমাকে ফেরত দিয়ে বললে,—'না না মশাই! যদি ৩০০৲টাকা যোগাড় করতে পারেন তো আসুন, নইলে আমার দ্বারা আপনার চাকুরি যোগাড় অসম্ভব।' এই ভাবে ঐ টাকা ক্রোধের সাথে ফেরত দেওয়াতে তার উপর আমার বিশ্বাস বাড়ে। এর পর আমি তার পরামর্শ মত স্ত্রী ও মা'র গহনা খুলে তা তারই পরিচিত এক সেকরাকে বাঁধা দিয়ে বাকি ২০০৲ টাকা সংগ্রহ করি। আমি পরে শুনি যে ঐ ব্যক্তি এই ভাবে বহু ব্যক্তিকে, মায় তার নিজের ও কাজিন ভাইদের এবং তার নিজ খুড় শ্বশুরকে চাকরির লোভ দেখিযে ঠকিয়েছে। আমি ঐ ১০০৲ টাকা বাদে আর টাকা তাকে না দিলে সে ঐ ১০০ টাকাই গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করতো। এরূপ ঘটনাও দুই এক ক্ষেত্রে ঘটেছে। কয়েক ক্ষেত্রে সে অপরের জমি দেখিয়ে ২০০ টাকা গ্রহণান্তে বায়না পত্র করেছে। এর পর মূল দলিল তৈরি করবার অজুহাতে সে সেটা চেযে নিযে আব ফেবত দেয় নি। কম মূল্যে জমি সংগ্রহে প্রয়াসী বহু নির্বোধ ব্যক্তিকে সে অপরের জমি বিক্রয় করে। এমন কি এক অনভিজ্ঞ সদ্যাগত পূর্ব দেশের বাস্তহারাকে সে গড়ের মাঠের মনুমেণ্টের নিচে এক বিঘা জমি বিক্রয় করবে বলে। এই ব্যক্তির প্রধান সহায়ক তার নিজেরই এক ভ্রাতা। সে দূরে নিরাপদে থেকে তারই সহায়তায় প্রবঞ্চনা দ্বারা উপার্জিত অর্থের ভাগ নেয় এবং আদালতে তদ্বির তাগিদ করে। কখনও কখনও গুণ্ডা আমদানী করে এরা নিজেদের শক্তি বর্ধন করে। এই ভয়ে অনেকে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে সাহসী হয় না। এই ব্যক্তি এতো লোককে ঠকিয়েছে যে তাদের ভয়ে তার কর্মস্থলে যেতে পর্যন্ত সে অপারক। এখন সে ক্ষুধার তাগিদে এই ভাবে এখনও লোক

ঠকায়। সে তার নিজের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকেও অপকার্যে তার সহায়ক রূপে নিযুক্ত করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তার অন্য ভ্রাতাটির সক্রিয় সাহায্য মধ্যে মধ্যে বন্ধ হলে সে সৎভাবে জীবন যাপনে প্রয়াস পায়। আরও আশ্চর্য এই যে, তার ঐ ভ্রাতাটি তারই কর্মস্থলে বেশি মাহিনার এক চাকুরে। এক প্রবঞ্চক উকিল ভদ্রলোক এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করে। ইনি স্থানীয় সরকারী কর্মীদের উপর এদের রক্ষার্থে প্রভাব প্রযোগও করে থাকেন।"

মিথ্যা বিজ্ঞাপন

মিথ্যা [ভূয়া] বা অলীক বিজ্ঞাপনের ইংরাজি নাম 'বোগাস এডভারটাইজমেণ্ট'। এরূপ বিজ্ঞাপন পত্রিকাদিতে দিয়ে দুর্বৃত্তরা সরল চিত্ত ভদ্রলোকদের ঠকিয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন দ্বারা মানুষের মন ভুলিয়ে দুর্বৃত্তরা মন্দ দ্রব্য ভাল বলে প্রায়ই দেশবাসীকে অধিক মূল্যে গছিয়ে দিয়েছে। এই বিজ্ঞাপন বাকপ্রয়োগের কাজ করে। এই কারণেই ইহা সম্ভব হয়ে থাকে। এদের অনেকে ভি, পি, করে মফঃস্বলে মাল পাঠায়। কিন্তু তারা আসল মাল না পাঠিয়ে পাঠায় নকল মাল। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। বহুদিন পূর্বে কোনও এক শহরে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় "ছারপোকার অব্যর্থ ঔষধ ; দুই টাকা মনি অর্ডার করে পাঠান চাই। এ ছাড়া পত্রের সঙ্গে এক আনা মূল্যের একটা 'ডাক টিকিটও।" যে সকল ভদ্রলোক এই বিজ্ঞাপন অনুযায়ী টাকা পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা কয়েকদিন পরে

"ছারপোকার ঔষধের" বদলে এক পত্র পান। পত্রটিতে এইরূপ লেখা ছিল—"ধরো আর মারো।"

যৌন ব্যাধি ও যৌন-শক্তিহীনতার ঔষধ সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপন দ্বারা অধিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের ঠকান হ'য়ে থাকে। এই অপরাধ নিবারণের জন্য বিশেষ একটি আইনও সম্প্রতি প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাধি গোপন করার প্রবণতার জন্য উহা কার্যকরী হয় নি।

এ ছাড়া অপর আর একটি অপরাধও এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে দুর্বৃত্তরা করে থাকে। এই বিশেষ প্রবঞ্চনাকে ইংরাজিতে বলা হয় সাইকেল চেন [cycle chain]। বিজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষণা করা হয়: "কেউ পাঁচ টাকা পাঠালে পঞ্চাশ টাকা পাঠানো হবে।" দুর্বৃত্তরা এজন্য রীতিমত অফিসও খুলে থাকে। এরা মানুষকে বুঝায় যে, এই চেন্ কখনও ছিন্ন হবে না। অনন্ত কাল ধরে এক দল টাকা দেবে এবং অপর আর এক দল উক্ত হারে টাকা পাবে। এঁরা বলেন, পৃথিবীতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির হার এমনিই বেশি। পৃথিবীর মানুষ নিঃশেষিত না হলে এই চেন্ কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না, ইত্যাদি। কিন্তু ইহা অতীব মিথ্যা। পৃথিবীর সব মানুষ এই ভাবে ঐ অফিসেই টাকা পাঠালেও প্রত্যেক অর্থ-প্রেরক প্রেরিত টাকার অতগুণ বেশি টাকা পেতে পারে না। আসলে এই সব দুর্বৃত্তরা মাত্র কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতি মত টাকা পাঠায়। এতদ্দ্বারা মানুষের লোভ বেড়ে গেলে শেষে এদের কয়েকজন পাঁচ টাকার বদলে এক সঙ্গে পাঁচশ', হাজার বা ততোধিক টাকা পাঠায়। ইহার দশ গুণ বেশি টাকা ফিরে পাবার আশায় তারা এতে রাজি হয়। ঠিক এই সময়ই দুর্বৃত্তরা অর্থাদি সহ অফিস বন্ধ করে সরে পড়ে। পুলিশের চেষ্টায় এই সব দুর্বৃত্তরা নিঃশেষিত হয়েছে। কোনও কোনও দুর্বৃত্ত এই ব্যাপারে আত্মপক্ষ

সমর্থনে বলে থাকে যে, তাদের এই টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে উহা বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনাও ছিল এবং এই জন্য পাঁচ টাকায় পঞ্চাশ টাকা পাঠান তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি, ইত্যাদি। কিন্তু তদন্ত দ্বারা দেখা গেছে যে তাদের এরূপ ব্যাখ্যা সর্বৈব মিথ্যা।

অধুনা কালে এই পদ্ধতির একটু আধটু অদল-বদলও হয়েছে। এই নূতন পদ্ধতিতে প্রথমে এক টাকা মূল্যের একটা ফর্ম বিতরণ করা হয়—গ্রাহক এই ফর্মে পাঁচজনের নাম লিখে উহা ঐ অফিসে পাঠিয়ে দেয়। অফিস তখন ঐ পাঁচজনের নামে এক-একটা ফর্ম পাঠায় এবং এক-এক টাকা প্রতি ফর্মের জন্য মূল্য বাবদ তারা আদায় করে। এই ভাবে তারা তাদের কাজ হাসিল করবার জন্যে বহু গ্রাহককে যোগাড় করতে সক্ষম হয়। এই সকল পদ্ধতিকে নিঃসন্দেহে অপপদ্ধতি বলা যেতে পারে ; অন্ততঃ আমার মত অনেকেই এইরূপ মনে করেন।

[এ ছাড়া ভেজাল খাদ্যকে খাঁটি বলে ও নকল ঔষধকে আসল বলে চালিয়ে মানুষ মানুষকে ঠকাচ্ছে তো বটেই ! এমন কি উহার দ্বারা তারা তাদের প্রাণহানিরও কারণ ঘটাচ্ছে। আধুনিক বাঙালীর মেধা ও স্বাস্থ্যহানির কারণ এই ভেজাল খাদ্যের অতি প্রসার। এ'ছাড়া প্রসাধন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জাল করেও প্রবঞ্চনা কার্য করা হয়ে থাকে।]

তেতাস ও ফিতা খেলা

কার্ড ট্রিক্স বা তেতাস এবং ফিতা খেলা রূপ প্রবঞ্চনা এ দেশে নিম্ন শ্রেণীর অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। ফিতা খেলাকে ইংরাজিতে বলা হয়, "টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্"। প্রথমে এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ সম্বন্ধে বলা যাক্। বিড্ গ্যাম্বলিঙ্-এর ন্যায় এই টেপ্ গ্যাম্বলিঙ্ও আসল জুয়া নয়। উহা এক প্রকার প্রতারণা মাত্র। এই সব প্রতারকরা প্রায়ই দিবা ভাগে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় এবং এই জুয়া দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিদের ঠকিয়ে থাকে।* ফিতা খেলায় প্রতারকরা একটি সুতার লেস্তিকে একটি পেন্সিলের চারি পাশে জড়িয়ে নেয়। এর পর পেন্সিলটি বার করে নিয়ে উহা শিকারদের [victim] হাতে তুলে দিয়ে তারা পেন্সিলটিকে পুনরায় এই জড়ানো সুতার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলে। এর পর সুতার একটি মুখ ধরে টান দিলে যদি উহা ফেঁসে যায় তাহলে তার হার হলো। অর্থাৎ পেন্সিলটি সুতার ফাঁকে আটক না পড়লে শিকার বা ভিকটিমের হার হবে। এইরূপে ফেঁসে যাওয়া বা না যাওয়ার উপর বাজি ধরা হয়।

---

* কেহ কেহ মনে করেন, পুলিশের অসাধু সিপাই-জমাদারদের সহিত এদের যোগসাজস্ আছে। ভারতীয় পুলিশ সম্বন্ধে ইহা সর্বৈব মিথ্যা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ইহা প্রমাণিতও হয়েছে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ইহা সত্য নয়।

এই সুতা জড়ানো এমন কায়দার সহিত সমাধিত হয় যাতে করে প্রবঞ্চিত ব্যক্তি হেরে যেতে বাধ্য। নিম্নের চিত্র দুইটি লক্ষ্য করলে বিষয়টি বুঝা যাবে। প্রথম চিত্রে সুতাটি স্বাভাবিক ভাবে জড়ানো হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে এই সুতা জড়ানোর মধ্যে একটি বিশেষ কায়দা বা ফাঁকি পরিলক্ষিত হবে।

প্রথম চিত্রের ক এবং খ দড়ির প্রান্ত দুইটি ধরে টান দিলে পেন্সিলটি আটকে যাবে। কিন্তু পব পৃষ্ঠায় গ ও ঘ চিত্রে প্রদর্শিত দড়ির

প্রান্ত ধরে টান দিলে পেন্সিলটি কিছুতেই আটক পড়বে না। এই বহু নিন্দিত ফিতা খেলা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার তেতাস জুয়া খেলা সম্বন্ধে বলব। তেতাস খেলার মধ্যেও এইরূপ অনেক ফাঁকি থাকে। তাস সাজাবার কায়দার গুণেই এইরূপ সম্ভব হয়। অনেক সময় হাত

সাফাইয়ের দ্বারা বিবি বা গোলামখানা সরিয়েও ফেলা হয়, কারণ এই বিবি বা গোলামের উপরই হার-জিত নির্ভর করে। তেতাস খেলোয়াড়দের ইংরাজিতে বলা হয় "কার্ড সারপার"। সাধারণতঃ একখানি গোলাম বা বিবি এবং দুখানি অন্য তাস নিয়ে এই খেলার সূচনা করা হয় এবং পরে বিবি বা গোলামখানি সরিয়ে অন্য একটি সাধারণ তাস মূর্খ মানুষদের ঠকাবার জন্যে তৎস্থলে নীত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ গরিব শ্রমিক শ্রেণীর নির্বোধ লোকেরাই এই সকল প্রবঞ্চনার শিকার হয়।

এই সব অপরাধীরা প্রথমে নিজেদের লোকদের দ্বারাই এই খেলা শুরু করে দেয়। সাধারণ পথিকরা এদের জিততে দেখে প্রলুব্ধ হয়ে এই খেলায় যোগ দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়। এই অপরাধীরা গিল্টি করা

সোনার হার গলায় দিয়ে ঘুরাফিরা করে। দরিদ্র মূর্খ শ্রমিকেরা এই হার দেখে এদের ধনী লোকই মনে করে—এতে তাদের ধারণা হয় এরা প্রচুর অর্থ দান করতে সক্ষম। কখনও কখনও এরা অর্থ পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অর্থাদি কেড়ে-কুড়েও নিয়েছে। ঐ সব ঘটনা ওদের মিশ্র দলের কারণেই ঘটে থাকে।

যৌনজ প্রবঞ্চনা

এই সাধারণ প্রবঞ্চনার অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও দৃষ্ট হয়। এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা অপরাধীরা বহু অবলা বালিকার সর্বনাশ সাধন করেছে। এই সব ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা সরলমতি বালিকাদের কিংবা এই সব বালিকাদের অভিভাবকদের বুঝায় যে তারা ঐ কন্যাদের বিবাহ করবে। অভিভাবকরা এদের অবাধ মেলামেশায় বাধা তো দেনই না, বরং আশাপ্রদ বুঝে একটু আড়ালে তাঁরা সরে থাকেন—বড়লোক জামাই কে না চায়, বিশেষ ক'রে এই দুর্মূল্যের যুগে। এ ছাড়া মেয়েরাও গরিব পিতামাতার স্কন্ধ হ'তে নামতে পারলেই বাঁচে।

এরা প্রায়ই নানা অজুহাতে বিবাহের দিন পিছিয়ে দেয়। এই সময় বালিকারা এদের নিশ্চিত রূপে ভবিষ্যৎ স্বামী জ্ঞান করে প্রায়ই দেহ দান করে থাকে। কিন্তু পরে কোনও-না-কোনও এক অছিলায় এই দুর্বৃত্তরা তাদের পূর্ব সঙ্কল্প ত্যাগ করে নির্বিঘ্নে সরে পড়ে। লজ্জার খাতিরে এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে এই সব বালিকারা এবং

তাদের অভিভাবকগণ প্রায়ই এদের উপর আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অক্ষম হন। এই সব সামাজিক দুর্বলতার সুযোগ দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। "বিবাহ করবো" এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পেলে এই সব বালিকারা দেহদান রূপ কার্য হতে বিরত থাকত। এই কারণে প্রবঞ্চনা-অপরাধের সংজ্ঞানুযায়ী এই দুর্বৃত্তরা প্রবঞ্চক মাত্র। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৫ ধারায় প্রতারণার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কেহ প্রতারণার দ্বারা অসদুদ্দেশ্যে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, (১) যার দ্বারা প্রবঞ্চিত ব্যক্তি সহজেই আপন দ্রব্য অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করে, কিম্বা (২) কেহ যদি কাহারও উক্তরূপ কার্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার দ্রব্যাদি অপর কোনও এক ব্যক্তির দখলী-ভূত হতে দিতে সম্মতি জানায়, কিম্বা (৩) কেহ যদি উক্তরূপে প্রতারিত হযে এমন কোনও এক কার্য করে বসে বা উহা না কার, যে কার্য করা বা না করার জন্যে প্রবঞ্চিত ব্যক্তির দৈহিক, আর্থিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা হতে পারে—যাহা কি'না প্রতারিত ব্যক্তি ঐরূপ ভাবে প্রতারিত না হলে কখনই করত না বা তা করতে বিরত হ'ত ; প্রবঞ্চকদের এই সকল প্রবঞ্চনা রূপ কার্যকে শঠতা, প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা বলা হবে।"

শঠতার উপরি উক্ত সংজ্ঞা হ'তে প্রতীত হবে যে, কেবল মাত্র দ্রব্যাপহরণ দ্বারাই মানুষ মানুষকে ঠকায় না। অন্যান্য ভাবেও মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে। "দ্রব্যপ্রদানের" বদলে কোনও "কার্য করান বা না করানর" উপরও প্রবঞ্চনা অপরাধ সংঘটিত হয়। যৌন রোগগ্রস্ত নারী যদি কোনও যৌন রোগ-ভীত সাবধানী ভদ্র-লোককে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে তার কোনও যৌন রোগ

নেই এবং ঐরূপ ভাবে তাকে বিশ্বাস করিয়ে তার সঙ্গে যৌন মিলনে তাকে সম্মত করায় তা'হলে ঐ নারীব উক্তরূপ কার্যকে আইনানুসারে প্রবঞ্চনা বলা হবে। কারণ এতদ্দারা ঐ ভদ্রলোকের দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি হয় বা তা হ'তে পারে। অনুরূপ ভাবে কোনও ভদ্রলোক যদি কোনও বালিকাকে প্রবঞ্চনা দ্বারা বিশ্বাস করায় যে, সে তাকে বিবাহ করবে [মনে মনে এইরূপ কোনও ইচ্ছা পোষণ না করেই] এবং ঐরূপ ভাবে প্রবঞ্চনা দ্বারা যদি সে সেই মেয়েটিকে তার সঙ্গে যৌন সম্মিলনে সম্মত কবায়—যাতে কি'না সেই মেয়েটি কখনই সম্মত হ'ত না যদি না সে উক্তরূপে প্রবঞ্চিত হ'ত, তা হ'লে ভদ্রলোকের উক্ত কার্যটিকে আমরা প্রবঞ্চনা বলব। আইনানুসারে ইহা ৪২০ ধারা মতে দণ্ডনীয অপরাধ।

কোনও এক বালিকাকে এই সম্বন্ধে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা! খুকি! তুমি বলতে পাব তোমরা এত সস্তা হও কেন?" উত্তরে প্রবঞ্চিতা বালিকাটি বলে—

"কি করব আমি বলুন। সত্যি কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে কিছুতেই রাজি হই নি। সে হঠাৎ ভিখারীর মত আবেগপূর্ণ স্বরে বলে বসল, 'না রাণী! এ কিছুতেই হবে না। আজকের এই জ্যোৎস্না রাত্রিটি চলে গেলে তা কি আর ফিরবে? তোমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে তুমি এতটুকুও বিশ্বাস করতে পারছ না! যাকে তুমি দু'দিন প র মাল্যদান করবে, তাকে কি তুমি এমনিই হীন মনে কর?' এর পর আমারও মনে কিছুটা দুর্বলতা আসে। আমার ভবিষ্যৎ-স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করা আমি সেদিন সমুচিত মনে করি নি। এর কিছুক্ষণ পরে আমি কেঁদে ফেলে তার গলা জড়িয়ে বলে উঠি, 'এ কি করলে তুমি? সত্যি! আমাকে তুমি বিয়ে করবে তো?' আমি কি তগ্রন

জানতাম যে, এই কাজের পরও সে আমাকে বিয়ে না করে এমনি ভাবে পালাবে?"

এই সম্বন্ধে আদালতে নালিশ জানালে আত্মপক্ষ সমর্থনে অপরাধীরা প্রায়ই বলে, "হাঁ, যখন আমি তাকে উপভোগ করেছিলাম তখন আমি প্রতিজ্ঞামত বিবাহ করব বলেই আমি তা করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও এক বিশেষ কারণে আমি আমার পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি।" এ বিষয়ে প্রায়ই প্রবঞ্চিত বালিকাটির পরবর্তীকালীন চরিত্র দোষের কথাও বলা হয়। এই অপরাধ অপরাধী পূর্বকল্পিত রূপে করেছে, অর্থাৎ কি না শুরু হ'তেই তার মনে অসদুদ্দেশ্য ছিল—এইরূপ প্রমাণ করতে না পারলে কেস্ প্রায়ই টিকে না। এই ধরনের একটি কেস্ কিছুদিন পূর্বে আমার গোচরে এসেছিল। এই স্থলে যুবকটি যথাক্রমে দুইটি মেয়েকেই একই সময় কথা দেয় যে মাত্র তাকেই বিবাহ করবে। বলা বাহুল্য, এই দুইটি মেয়েকে সে পৃথক পৃথক ভাবে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই মেয়ে দুইটির পরস্পারের মধ্যে কোনও রূপ জানা-শুনা না থাকায় তারা সহজেই প্রতারিত হয়। এই দুইটি মেয়েই স্বাবলম্বিনী এবং বিত্তশালিনী ছিলেন। দুর্বৃত্তটি যথাক্রমে কিছুদিন করে উভয় কন্যার বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী রূপেই বসবাস করত। এই মেয়ে দুইটি স্বগৃহে থাকাকালীন তাদের ভবিষ্যৎ-স্বামীর জন্যে নানাভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছে। কিছুদিন পরে দৈবক্রমে বিষয়টি উভয় কন্যারই কর্ণ-গোচর হ'লে উভয় কন্যাই সেই লোকটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে লোকটির এই অপরাধ যে পূর্বকল্পিত ছিল, তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়; কারণ সে একই সময়ে দুইটি কন্যাকেই বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৈহিক সুবিধা গ্রহণ করেছিল। এই সকল বিবাহেচ্ছু

ধনী আধুনিক ভদ্র সন্তানদের সহিত মেয়েদের সাবধানে মেলামেশা করা উচিত—কারণ,'বিশেষ ক্ষেত্রে সামান্য খোরপোষের মামলা ছাড়া এইসব প্রতারকদের অন্য কোনও রূপে শায়েস্তা করা সকল সময়ে সম্ভব হয় না।

সাধারণ প্রবঞ্চনার যৌনজ পদ্ধতির অপর একটি নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত হল। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একটি বিশেষ চালাকীর সহিত ইংরাজ দুহিতাটিকে প্রলুব্ধ ক'রে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত করাই। আমার বাস ছিল "অতো" নম্বর গোয়ালটুলি লেনে। আমি মায়ের বাক্সো ভেঙে অর্থ ও গহনা চুরি করে এক জাহাজে চাকুরি সংগ্রহ করে বিলাতে আসি। এই বিলাতে এসে ঐ মেয়েটির সহিত আমি আলাপ জমাই এবং তাকে আমি 'প্রিন্স অব্ গোয়ালটুলি', এই বলে নিজের পরিচয় দিই। এর পর আমি বেঙ্গলের ম্যাপ্ খুলে চিটাগাঙের কোল হতে মেদিনীপুরের কোল পর্যন্ত রেখা টেনে গোয়ালটুলি স্টেটের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাকে পরিজ্ঞাত করাই। এই ইংরাজ দুহিতার ভারতের মহাধনী নেটিভ্ প্রিন্সদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। তাই সহজেই আমার সাথে বিবাহ করতে তাকে রাজি করাই।"

এইভাবে যে মাত্র ওদেশের মেয়েরাই ঠকে থাকে তা নয়। এ দেশের মেয়েদের আরও সহজে দুর্বৃত্তরা ঠকিয়ে থাকে। আমি এমন একটি কন্যার কথা শুনেছি যাকে, "চল আমরা চলে যাই, কেমন সুন্দর ভাবে আমরা থাকব। লেকের ধারে হলদে রঙের বাড়ি করবো। সবুজ রঙের একটা নৌকা থাকবে। মধু যামিনী ভর সেখানে চাঁদ উঠবে। আমরা তখন মোটরও একটা আয়ত্তে রাখব" ইত্যাদি কথা বলে জনৈক অতি নিঃস্ব দুর্বৃত্ত তাকে সহজেই আয়ত্তে আনতে পেরেছিল।

এই যৌনজ পদ্ধতি দ্বারা, যে ছেলেরাই মেয়েদের ঠকিয়ে থাকে তা

নয়। বহু ক্ষেত্রে মেয়েরাও এই পদ্ধতিতে সরলচিত্ত ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। সাধারণতঃ "বাহানার" সাহায্যেই মেয়েরা এই সম্বন্ধে ছেলেদের ঠকিয়ে থাকে। "বাহানা" পরিশব্দ অপরাধ-বিজ্ঞানের দুর্বৃত্তদের দ্বারা ব্যবহৃত একটি পরিভাষা। এই বাহানা রূপ পরিভাষাটি সম্বন্ধে এইবার আলোচনা করা যাক। সাধারণতঃ রূপজীবিনীরা বিশেষ করে এই বাহানার অভ্যাস করে থাকে। কিন্তু দুশ্চরিত্রা গৃহস্থ নারীদের এই পন্থা আজ আর অজ্ঞাত নয়। এদের কেউ কেউ দাদা বলে কাউকে জড়িয়ে ধরে তাদের পকেট বেমালুম হাতড়ে নিয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি পাঠ করলে এই "বাহানা" শব্দটির প্রকৃত অর্থ বুঝা যাবে।

"কিছু দিন পূর্বে আমি কোনও এক রূপজীবিনীর সংস্পর্শে এসেছিলাম। এই জাতীয় মেয়েদের সহিত সেই ছিল আমার প্রথম ও শেষ সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, আমি ঐ মেয়েটিকে ভাল বেসেছিলাম। এমন কি তাকে আমি বিবাহও হয় তো করতাম। ঐ মেয়েটি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে, এই ধারণাটা আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে এসেছে এই সময় একদিন অসময়ে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আমি তাদের বাড়ি এসে হাজির হই। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শুনতে পাই. আমার ঐ প্রিয়ার মায়ের গলা। তিনি টেলিফোন করছিলেন— 'হ্যালো, কে? বল বাবা, নাম বল। আমার কাছে লজ্জা কি? আমি চামেলীর মা, কে? রতীশবাবু!'

জানালার কাছে এসে দেখি প্রিয়া আমার ছুটে গিয়ে রিসিভারটা মার হাত থেকে সোৎসাহে এবং আবেগের সঙ্গে কেড়ে নিল। এর পর প্রিয়তমাকে বলতে শুনলাম, 'এই দুষ্টু, পাজী কোথাকার, খুব কথার ঠিক থাকে তোমার, বাঃ! আজ কিন্তু ঠিক আসা চাই, হাঁ—'

ততক্ষণে আমি ওদের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ আমাকে সেখানে দেখে চামেলী হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝোঁকটা কোনও রকমে সামলে নিয়ে চামেলী বললে, 'আরে তুমি? আরে? এস এস, ও মা!' একটু বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে ফোন করছিলে?' দ্বিধাহীনভাবে চামেলী আমাকে উত্তর করল, 'দাদাকে—দা-দা।' হঠাৎ চামেলীর মা বাইরে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওরে ও চামি, বিনু এসেছে।'

বিনুর আগমনের বার্তা কানে যাওয়া মাত্র চামেলীর মুখটা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বেশ বোঝা গেল যে, সে শুধু বিব্রত নয়, এবার সে বেশ একটু সন্ত্রস্তও হয়ে উঠেছে। কোনও রূপে তার সেই বিব্রত ভাব দমন করে চামেলী আমার দিকে একবার চাইল। তারপর উৎফুল্ল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল. 'কে—বিন্‌দা? এই বিন্‌দা?'

চামেলী বিন্‌দার নাম শুনে আমাকে আর কোনও কৈফিয়ৎ না দিয়েই ঝড়ের মত বার হয়ে গেল। এত দাদার উৎপাত আমি পূর্বে সেখানে কখনও দেখি নি। দশ মিনিট পরে চামেলী ফিরে এল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চামেলী বলল, 'একলাটি অনেকক্ষণ বসে রয়েছ, না?' গম্ভীর-ভাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কে এলেন?' মুখে চোখে একটা সারল্যের ভাব ফুটিয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ মিটিমিটি করে সে চেয়ে রইল এবং তারপর হেসে ফেলে সে বলল, 'ওঃ হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা ভয় নেই! ও আমার দাদা, পিসতুতো ভাই।' সন্দিগ্ধভাবে আমি তখন উত্তর করলাম, 'আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে না?' উত্তরে চামেলী আমাকে বললে, 'বাঃরে! লজ্জা করে না বুঝি?' এর পর, 'আসছি পাঁচ মিনিটের

মধ্যে' বলে চামেলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম যে পাশের ঘরে অপর একজন অতিথিকে আপ্যায়িত করবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। বোধ হয় তাকেও 'পাশের ঘরে কাকাবাবু এসেছে। এই আসছি এক্ষুনি—' বা ঐ রকম একটা কিছু বুলি বলে কিছুক্ষণের জন্য আমাকে সে সামলে গেল। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোককে একটু খুশি করে বিদেয় দিয়ে হয় তো সে আমার সঙ্গে সম্মিলিত হত। কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করি নি। পেপার ওয়েটের তলায় তিনখানা দশ টাকার নোট চাপা দিয়ে রেখে আমি চলে আসি। এর পর আর কখনও আমি সেখানে যাই নি।"

উপরি উক্ত রূপ বাঁধা বুলিগুলিকে বেশ্যা সমাজের লোকেরা "বাহানা" বলে থাকে। নিম্নে এ সম্বন্ধে আরও একটি বিবৃতি দেওয়া যাক্।

"উপরে উঠে গদির উপর বসে পড়তেই রাধার মা এসে পাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে বললে, 'আহা। বাবার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। ওরে ও রাধু! ওরে ও মুখপুড়ী, এ ধারে আয় না। বাবা যে কতোক্ষণ বসে রয়েছেন।' কিছুক্ষণ পরে সাজগোজ করে রাধু এসে হাজির হ'ল। বেশ একটু সোহাগ ভরে অভিমানের সুরে সে বলে উঠল, 'বারে! এতদিন পরে আসা হ'ল। আমার মন কেমন করে না, বুঝি!' এর কয়েক মিনিট পর বাইরে থেকে রাধুর মা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও রাধু! পাঁচটা টাকা তুই দিয়ে যা, দুধওয়ালা বড্ড গোলমাল করছে।' প্রত্যুত্তরে রাধু আমাকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বারে! টাকা পাব কোথায় আমি? বললাম তো তখন দুধ আমায় খাইও না।' বলা বাহুল্য যে এর পর টাকা পাঁচটা বাধ্য হয়ে আমাকেই পকেট থেকে বার করে দিতে হয়; ঐরূপ পরিস্থিতিতে

এইরূপ করা ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না। পরে আমি শুনেছি যে, এগুলি টাকা আদায়ের এদের বাঁধা বুলি বা বাহানা।”

ভদ্র সমাজের কোনও কোনও কুলটা নারীও এইরূপ বাহানার দ্বারা স্বামীকে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে ঠকিয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে কোনও এক ভদ্র নারী ত্রিতলের কক্ষে উপপতির [স্বামীর বন্ধু] সহিত প্রেমালাপের পর নীচে নেমে স্বামীকে অনুযোগ করে, “যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। এতক্ষণ ধরে একলা থাকতে আমার ভাল লাগে না'কি ! ও কি নিষ্ঠুর গো তুমি ?” উপপতিটিও [স্বামীর বন্ধু] বন্ধুপত্নীর সহিত নেমে এসে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর বৌদির উক্তিটি সমর্থন করে বন্ধুকে ভর্ৎসনা করে বললেন, “সত্যি ! এ তোমার ভারি অন্যায়। এতক্ষণ ধরে বৌদি এই সব দুঃখই করছিলেন। কাল থেকে একটু সকাল সকাল বাড়ি এস। বুঝলে ?”

ইহা অবশ্য আমার শুধু শোনা কথা নয়। বহু অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। এই ধরনের “বাহানার” দ্বারা স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে এবং বন্ধু বন্ধুকে প্রায়ই ঠকিয়ে থাকে। বস্তুত পক্ষে এ পৃথিবী এ যুগের ‘মেক্ বিলিভের’ পৃথিবী।

চৌর্য অপরাধ

"চুরি বিদ্যা বড বিদ্যা, যদি না আমি পড়ি ধরা।" পৃথিবীব চৌষট্টিটি কলা বিদ্যার মধ্যে ইহা একটি অন্যতম কলা। ইহাকে মহা-বিদ্যাও বলা হয। অনেকেব মতে চুরিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিদ্যা। দ্রব্যাদিব স্বত্বাধিকারিত্বেব সৃষ্টিব সহিতই ইহার উৎপত্তি। পৃথিবীতে এমন এক দিন ছিল, যখন মানুষ বনেব ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। অবশ্য তখনকার অরণ্যাদিতে ফলমূলও ছিল অপর্যাপ্ত। এই কাবণে সঞ্চযের মনোবৃত্তিও তখন কাহারও মনে স্থান পায় নি। প্রত্যেককেই স্ব স্ব খাদ্যাদি পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে বাধ্য হ'তে হ'ত। এব পর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটে। মানুষ তখন ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সঞ্চয় করতে শুরু করে। প্রথম প্রথম পচ্যমান বিধায় অধিক শস্য সঞ্চয় করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে মুদ্রানীতি প্রচলনের পর তাদের এই অসুবিধা দূরীভূত হয়। সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাদ্যবস্তু এবং অর্থ সঞ্চয় কবা সম্ভব হয না। ফলে পৃথিবীতে ধনী ও নির্ধনের এবং নিরলস ও অলস লোকের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে যে সকল লোক কর্মালস ছিল, তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ চুরির অভ্যাস করে। পরবর্তীকালে মানুষ এই চুরির বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠলে এদের মধ্যে যারা অতি ধূর্ত তারা প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। তবে চুরিই যে পৃথিবীর প্রথম অপবিদ্যা তাতে সন্দেহ নেই। এই সকল ব্যক্তিদের মধ্যে শক্তিমান ব্যক্তিরা অপরের সঞ্চিত দ্রব্য কেড়েও নিত এবং এদের মধ্যে যারা

দুর্বল ছিল তারাই করত চুরি। এই চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সম্পত্তি রক্ষার কারণেই মানুষ প্রথমে সমাজ এবং পরে রাষ্ট্র গঠন করে। এ কথা স্বীকার্য যে এই চৌর্য প্রভৃতি অপরাধের প্রাদুর্ভাবই মানুষকে সভ্য করেছে।

কেহ কেহ বলে থাকেন যে মানুষ চুরি বিদ্যাটি পশুপক্ষীদের নিকটেই প্রথম শিক্ষা করে। বস্তুতঃ, এক পশুর সংগৃহীত খাদ্য অপর পশু প্রায়ই চুরি করে থাকে। পশুদের সংগৃহীত খাদ্যাদি মানুষও যে চুরি করে নি তা'ও নয়। আজও পর্যন্ত মানুষ মৌমাছিদের সংগৃহীত মধু, পক্ষীকুলায় হতে পক্ষীশাবক ইত্যাদি চুরি করে থাকে। এমন কি, ব্যাঘ্রকুল সংগৃহীত মৎস্যও মানুষ চুরি করে থাকে। সুন্দরবনের মধ্যে এমন অনেক নদী আছে যার জল না'কি ভাঁটার সময় অতি সত্বর সরে যায়। এক শ্রেণীর ব্যাঘ্র না'কি এই সময় ভাঁটার কারণে অপসারিত স্রোতের সহিত ছুটে চলে এবং ঐ সময় তারা সম্মুখে মৎস্য পেলেই উহা বালির তলে পুঁতে রাখে ; এই ভাবে মাছ পুঁততে পুঁততে সে নদীর মোহনার মুখ পর্যন্ত চলে যায় এরপর সে ফিরে এসে মাছগুলা একে একে না'কি উঠিয়ে নিয়ে ভক্ষণ করে। এদিকে শিকারী মানুষরা ঐ ব্যাঘ্রের পিছু পিছু ধাওয়া করে ব্যাঘ্রের কষ্টলব্ধ মৎস্যগুলিকে তার অগোচরে উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ঘটনাটি অবশ্য আমার শোনা কথা হলেও উহা অবিশ্বাস্য নয়—যে মানুষ ব্যাঘ্রের দ্রব্যাদি চুরি করতে সমর্থ, সে সুবিধে পেলে মানুষের দ্রব্য চুরি করবে এতে আর আমাদের আশ্চর্য হবার কি আছে ? যাই হোক, মানুষ মানুষের দ্রব্য চুরি করলে মনুষ্য সমাজে উহাকে অপরাধ বলা হয়। এই সম্বন্ধে অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। এস্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইবার এই

চৌর্য অপরাধের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ১৭৮ ধারায় চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ—

"কেহ যদি অপরের দখলীভূত কোনও অস্থির বা অস্থাবর দ্রব্য দখলীভূত ব্যক্তির বিনানুমতিতে আত্মসাৎ বা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপসারণ করে তো তার এই কার্যকে [অপকার্যকে] চৌর্য কার্য বলা হবে।"

সাধারণভাবে আমরা এই চৌর্য অপরাধকে দুই ভাগে বিভক্ত করে থাকি, যথা—বহিঃচৌর্য এবং গৃহচৌর্য। এই গৃহচৌর্য তিন প্রকারে সমাধিত হয়। উহাকে আমরা যথাক্রমে সরলচৌর্য, সবল-চৌর্য এবং ভৃত্যচৌর্য বলে থাকি। সাধারণ ভাষায় আমরা সরলচৌর্যকে বলি বাড়ির চুরি বা হাউস্ থেফট্, সবলচৌর্যকে বলি সিঁদেল চুরি বা বারগলারী [Burglary] এবং ভৃত্যচৌর্যকে বলি চাকর হিসাবে চুরি বা থেফট্ অ্যাজ সারভেন্ট্। এই বিভাগ কয়টির যথার্থ সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০, ৪৫৪ ও ৪৫৭ এবং ৩৮১ ধারায় দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে বহিঃচৌর্যকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করে থাকি। যথা—(১) গাঁটকাটা, (২) জেবকাটা, (৩) পিকপকেট বা পকেটমার। এই পকেট মারের বাইরে আছে ছিঁচকা বা ছিন্নক চোর বা ছিনাদ্দার [Snatcher] যারা শিশু এবং মেয়েদের হার ইত্যাদি ছিনিয়ে নেয়। এই প্রকার চোরেদের বলা হয় ছিঁচকা চোর। আরও আছে উত্তোলক চোর বা চোরোত্তো-লক। এই উত্তোলক চোর [লিফটার] তিন প্রকারের হয়; যথা—শকট-উত্তোলক [cart lifter], বিপণি-উত্তোলক [shop lifter], এবং পাশব-উত্তোলক [cattle thief]।

এই ছিন্নক চোর বা স্ন্যাচার, জেবকাট চোর [pick-pocket], এবং উত্তোলক চোরদের কার্যকে একত্রে বলা হয় সহজচৌর্য। এই সকল অপরাধীরা কোনও অবস্থাতেই বলপ্রয়োগ করে না। আঘাত হানা এদের স্বভাব বিরুদ্ধ ব্যাপার। ব্যক্তির পোশাক বা দেহ হতে কিংবা তার সন্নিকট হ'তে চুরিকে সহজচৌর্য বলা হয়।• কোনও ব্যক্তির পকেট, গাত্র বা হস্ত হ'তে বা তার সন্নিকট হ'তে দ্রব্যাদি অপহরণ করার বৈজ্ঞানিক নাম সহজচৌর্য। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পিক্‌পকেট বা পকেটমার এই সহজচৌর্যের অন্তর্গত একটি অপরাধ। পুরাকালে মানুষ যখন কোর্তা পরত না এবং টাকাকড়ি প্রায়শঃই গাঁটে বা ট্যাঁকে রাখতো, তখন সেখান থেকে টাকা অপহরণ করা হ'ত। এই জন্যে তখনকার যুগের এইরূপ অপরাধীদের বলা হ'ত গাঁট-কাটা। এক্ষণে জেব বা পকেটের সমধিক প্রচলনের ফলে এই গাঁট-কাটাইদের নূতন নাম হয়েছে জেবকাটা বা পকেটমার। মানুষের পোশাক ও ব্যবহারের পরিবর্তনই ইহার অন্যতম কারণ। এক্ষণে বড়বাজার অঞ্চলে মাত্র কয়েকজন গাঁটকাটা আছে। এরা মাড়বারীদের কাপড়ের গিঁট কেটে অর্থাপহরণ করে। অধুনা কেউ কাপড়ের গাঁঠে বা খুঁটে টাকা না রাখাতে এরা আজ বিলুপ্তির পথে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে চৌর্য অপরাধকে নিম্নোক্ত রূপ কয়েকটি শ্রেণী ও উপশ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। কারণ, অপরাধীদের শিক্ষা-দীক্ষা

• অসাধারণ চৌর্যও এই সহজচৌর্যের একটি উপশ্রেণী। এই সম্বন্ধে পরে আমরা আলোচনা করব। অসাধারণ চৌর্যের সাথে অসাধারণ প্রবঞ্চনার কিছুটা মিল আছে।

ও উহাদের দৈহিক গঠন এবং প্রকৃতি ও স্বভাবের সহিত এই সকল শ্রেণী ও উপশ্রেণীর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ দেখা যায়।

পকেটমার

পকেটমার তথা পিকপকেটররা তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। কালের গতিতে পোশাকের পরিবর্তনের সাথে উহার উদ্ভব। উহাদের যথাক্রমে, গাঁটকাট্টাই, জেবকাট্টাই ও তুলমারীরা বলা হয়। এদের প্রাথমিক অপরাধীরা একক ভাবে কাজ করে ও বারে বারে কার্যপদ্ধতি বদলায়। কিন্তু এদের পুরানো পাপীরা একই প্রকার কার্যপদ্ধতি রক্ষা

করে। এরা সর্দারের অধীনে ছোট ছোট দলে [স্ব স্ব পদ্ধতি অনুযায়ী] কাজ করে।

(১) গাঁটকাট্টা—পূর্বের মানুষ ধুতি ও চাদরে শোভিত হতো। এ সময় এরা পরিধেয় বস্ত্রের [কোমরের নিচে] গাঁটে বা টেঁকে অর্থ রাখতো। এই গাঁট তারা ছুরি দিয়ে কাটতো বলে এরা ছিল গাঁটকাটা। এখন মানুষ কোট ও প্যান্ট পরতে অভ্যস্ত হওয়াতে এই অপরাধীদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবে বড়বাজার অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ী আজও গাঁটে অর্থ রেখে ঘুরাফিরা করে। এখন ওদের কম সংখ্যার জন্য ঐ অঞ্চলে নয় জন গাঁটকাটা আজও টি'কে আছে। মোটরের প্রাদুর্ভাবের পর ঘোড়ার গাড়ির মত ওরা একেবারে বিদায় নেয় নি।

(২) জেবকাট্—আজকাল মানুষ পকেটে টাকা কড়ি রাখে। এজন্য এরা ব্লেড বা ছুরি দিয়ে এদের পকেট কাটে। এদের চাপ জ্ঞান অত্যধিক। কতটা চাপ দিলে শুধু পকেট কাটবে এবং গায়ের চামড়া কাটবে না—তা এরা এদের চাপবোধের কারণে জানে ও বুঝে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে। এদের কার্যপদ্ধতি পরে বিবৃত করা হবে।

(৩) তুলমারী—এরা হাতের আঙুলের সাহায্যে পকেট হতে কায়দা মত ব্যাগ তুলে নেয়। এদেরকেই ইংরাজিতে পিকপকেট ও বাঙলাতে পকেটমার বলা হয়ে থাকে। এদের বিবিধ দলের বিবিধ কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বিবৃত করা হবে।

বিঃ দ্রঃ—সিঁদেল চোরদের মত এরাও সর্দারের অধীনে ছোট-বড়ো দলে কাজ করে। বস্তুর বিরুদ্ধে [যন্ত্রের দ্বারা] বলপ্রয়োগী সবল অপরাধী বিধায় বাধা পেলে সিঁদেল চোর কখনও কখনও ব্যক্তিকেও আঘাত করেছে। কিন্তু পকেটমারগণ বস্তু বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে

বলপ্রয়োগী অপরাধী নয়। তাই এরা ধরা পড়লেও কাউকে কখনও আঘাত করে না। প্রকৃত পিকপকেট অপরাধী সম্পর্কে ইহা অতীব সত্য। তবে প্রাথমিক তথা উঠতি অপরাধীদের পক্ষে কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম হতে পারে। বেশ্যা-সম্ভোগ, বস্তিবাস, হুল্লোড়, অর্থ পাচার-কারী [নম্বরীনোটের ক্ষেত্রে] প্রকৃত [উৎকট] পিকপকেটদের আচরণ সিঁদেল চোরদের সমতুল। তবে এরা সিঁদেল চোরদের মত অতো উগ্র প্রকৃতির হয় না। পকেটমাররা প্রথমে পরস্পরের পকেট মেরে প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে। স্বয়ং সর্দার এদেরকে কায়দা-কানুন শিক্ষা দিয়ে পাকাপোক্ত করে তুলে। এদের বেপরোয়া করবার জন্যে এদের জেল ঘুরিয়ে আনারও রীতি আছে। এইভাবে এদের জেল ও পুলিশ ভীতি দূর করা হয়ে থাকে। নিম্নের বিবৃতি হতে উহা বুঝা যাবে।

"সাক্ষাৎ ভাবে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে সে আমাকে নিয়ে ট্রামে উঠলো। এর পর সে একজনের পকেট সাফ করে ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে গা' ঢাকা দিলে। সে সরে পড়তে পারলেও আমি বামাল সমেত ধরা পড়লুম। পথে ও থানাতে বেদম মার খেলাম। এর পর আমার মেয়াদও হয়ে যায়। খালাসের দিন সর্দারের হুকুমে সে জেলের বাইরে অপেক্ষা করছিল। সে আমাকে পাকড়াও করে সর্দারের কাছে আনলে সর্দার বললো—ঠিক হ্যায় বাচ্ছা। ডরো মাৎ। তুম ভুরণ শেয়না হোগী। এর পরের কাজগুলিতে আমি বহুদিন ধরা পড়ি নি।"

[সিঁদেল চোর ও পকেটমারদের দলপতি তাদেরকে বহুবিধ শিক্ষা দেয়। ওদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মার সহ্য করার শিক্ষা। নূতন বালক দলে ভর্তি হলে সর্দার তাকে বেপরোয়া মার দিতে থাকে। এতে তার

ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ে ও মুখ ফুটবলের মত ফুলে উঠে। কিন্তু অততেও সে বালকের চোখ দিয়ে জল পড়ে না। এতে সর্দার খুশি হয়ে তাকে কাছে টেনে আদর করে বলে—'সাবাস। পুলিশ পিটনেভী এ কুছ নেহী বাতাবে। তুরণ এ রঙরুটসে লায়েকী বেনে যাবে! কুছ রোজ বাদ হামাদের মত উ পক্কা শেষনা বনবে।' এর পর এর মুখে চোখে ঔষধ লেপন করা হয়। এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষা এরা পেয়ে থাকে।]

এদেরকে কচি নাউ-এর উপর ভিজা ন্যাকড়া জড়িযে ঐ কাপড় ব্লেড দিয়ে কাটতে অভ্যাস করানো হয়—এমন ভাবে যাতে শুধু ঐ কাপড়ই কাটা পড়ে, কিন্তু নাউ-এর গায়ে ছুরির আঁচড়ও না পড়ে। এ'ছাড়া এরা গালের কসির ভিতর কৃত্রিম থলির মধ্যে লাল রঙের গুট পুরে রাখে। ধরা পড়ার পর নিজেরাই প্ররোচনা দিয়ে মারধর খেতে থাকে। ঐ অবস্থাতে তারা মুখ হতে ঝলকে ঝলকে কৃত্রিম রক্ত বমন করতে শুরু করে। পরে এরা মৃতের মতন শুয়ে পড়লে খুনের দায় এড়াতে জনতা সেখান থেকে সরে পড়ে।

এদের কর্মক্ষেত্রের স্থানীয় টপোগ্রাফি সম্বন্ধে এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্মস্থানের অলিগলি ও পলাবার বা লুকবার প্রতিটি স্থান ও উপায় এদের নখদর্পণে আছে। এইজন্ত নিমেষে অদৃশ্য হতে এরা সক্ষম।

পকেটমারগণ নির্বল-চৌর্যাপরাধীর একটি উল্লেখযোগ্য উপশ্রেণী। এরা প্রায়ই দল বেঁধে কাজ করে। সাধারণতঃ এরা পঙ্কিল বস্তিগ্রামে বাস করে। এদের অধিকাংশই মোসলেমধর্মী হিন্দীভাষী। কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী ও পশ্চিমী হিন্দুও এদের মধ্যে আছে। এরা প্রায়ই তাদের সর্দারদের অধীনে কাজ করে। এদের এক একটি দলে ১০—১২

জনেরও অধিক ব্যক্তি যুক্ত আছে। কখনও কখনও ওরা এককভাবে কার্য করে থাকে। কখনও কখনও বা এরা দল বেঁধে অপকর্মে বাহির হয়। পূর্বে এদের দলগুলি অত্যন্তরূপ সুগঠিত হ'ত। পূর্বে এদের নিজস্ব অফিসও ছিল। এই অফিসগুলি চলন্ত [moving] ছিল। পুলিশের ভয়ে এরা প্রতিদিনই এক বস্তি হতে অপর এক বস্তিতে এদের অফিস বা আড্ডাঘর স্থানান্তরিত করেছে। দলের লোকেরা দিনান্তের স্ব স্ব উপার্জিত বস্তু বা অর্থাদি এই সব অফিস বা আড্ডা-ঘরে এনে সর্দারের নিকট জমা দিত। সর্দারজী এই সব অপহৃত অর্থ সমান ভাবে সাকরেদদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। এতে এদের দলের সকলেরই সমান সুবিধে হ'ত। কোনও দিন কোনও ব্যক্তি কোনও অর্থ সংগ্রহ করতে না'ও পারলে তার কোনও অসুবিধা নেই। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সেও সেদিন কিছু হিস্যা নিয়ে ডেরায় ফিরতে পারবে। এ সবের বড় হিস্যাটি অবশ্য সর্দারজীই নিতেন। পরিবর্তে চোরাই মাল পাচারের এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার এবং তাদের দায়-অদায়ে দেখার ভার এই সর্দারজীর উপব বর্তাতো।

এই অফিস বা আড্ডাঘর সম্বন্ধে আমি একজন পুরানো অফিসারের মুখে অনেক কিছু শুনেছিলাম। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই আড্ডাঘর সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। আজও কয়েকস্থানে উহার প্রচলন আছে।

"বহু কষ্টে তাদের আড্ডাঘরটি সম্বন্ধে আমি খবর পাই—একজন ইনফরমারের সাহায্যে। মাত্র দিন দুই পূর্বে এরা অমুক বস্তি থেকে এখানে উঠে এসেছে। এর দুই দিন পরে এখান থেকেও তারা অন্যত্র সরে পড়বে। এদের মধ্যে পূর্ব হতে এইরূপ এক বন্দোবস্তও

ছিল। আমি যথাসম্ভব সদলে রাত্রি দশটায় এদের আড্ডাঘরে এসে হানা দিই। কারণ, রাত্রি দশটার পরই সকলে এসে এখানে জমা হবে। আড্ডাঘরের কাছে এসে লক্ষ্য করি যে দুইজন লোক উপরে উঠছে। একজনের পরনে ছিল সার্জের কোট ও মিহি ধুতি এবং অপর জনের পরনে ছিল ছেঁড়া গেঞ্জি ও লুঙ্গি। বিভিন্ন বেশী এই দুই ব্যক্তিকে গলা জড়াজড়ি করে উপরে উঠতে দেখে আমার বুঝতে আর বাকি থাকে নি। এরা যে কারা তা এদের চলন থেকে আমি বুঝতে পারি। এর পর হঠাৎ দেখতে পেলাম যে একটা ছেলে দৌড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটে চলেছে। এই ছেলেটিকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমি মোড়ের মাথায় আনচান ভাবে ঘুরতে দেখেছিলাম। আসলে এই ছেলেটি ছিল এদের পাহারাদার। আমি তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ধরে ফেলে একজন সিপাই-এর হেপাজতে তাকে দূরে সরিয়ে দিই। এ জন্যে ওরা আমাদের আগমন সম্বন্ধে কোনও খবর পায় না।

আড্ডাঘরটা ছিল একটা মাঠকোঠোয় দ্বিতলের ঘরে। বাড়ির নিচে কোনও জানালা বা দরজা নেই। উপরের ঘরগুলা ঘিরে একটা কাঠের বারান্দা আছে। ঐ বারান্দার কোণ থেকে একটা কাঠের নড়নড়ে সিঁড়ি নেমে এসেছে। আমরা অতি সন্তর্পণে উপরের বারান্দায় উঠে পড়ি। শেষের দিককার একটা ঘর থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। এর পর পিছনের বারান্দা দিয়ে ঐ ঘরটার পিছনে এসে দাঁড়াই। পিছনের দেওয়ালে ছোট ছোট কতকগুলি ফুটা ছিল। এক-একটি ফুটার মধ্যে চোখ রেখে আমরা আড্ডাঘরটি পরিলক্ষ্য করি। আড্ডা তখন পুরাদমেই বসে গিয়েছে। মেঝের উপর সারি সারি বাইশ-তেইশটা ছেঁড়া মাদুর। ঘরে দুই-একটা পুরানো ট্রাঙ্কও দেখা গেল। দেওয়ালের ব্রাকেটগুলোতে গোটা পাঁচ-

ছয় গরম কোট, শাল ও ফ্লানেলের শার্ট। এমন কি, সেখানে কয়েকটা বিলাতি স্যুটও ঝুলানো রয়েছে। বুঝলাম, প্রয়োজন মত সর্দারের নির্দেশে এরা এই সব পোশাক অপকার্যের সুবিধার জন্যে ব্যবহার করে। মাদুরগুলার উপর প্রায় জন পঁচিশ বিভিন্ন প্রদেশের লোক তাদের বিভিন্ন প্রকার বেশভূষার মধ্যে আত্মগোপন করে বসে আছে। এদের কেউ কেউ বড় বড় নলে মুখ রেখে চণ্ডু খাচ্ছিলো। কোণের দিকে একটা ছেঁড়া গদির উপর বসে সর্দারজী তখন টাকা গুনছিলেন, দু কুড়ি সাত, তিন কুড়ি বারো, ইত্যাদি শব্দে। টাকা ও নোটের আলাদা আলাদা থাক দিতে দিতে সর্দারকে বলতে শুনলাম, 'এই ঢোলিরাম! কেতো টাকা পেলি সেই সোনাকো ঘড়ি বেচে?' উত্তরে ঢোলিরাম সর্দারকে বলল, 'উ তো জরুর দেড়শো রুপেয়াকা হোবে। লেকিন ছট্টুলাল পঞ্চাশের বেশি একদম দিলে না।' এর উত্তরে সর্দার খেঁকরে উঠে তাকে বলল, 'তুই কুছু কামকো নেহি আছে। আচ্ছা! যো মিলা উহি লে আও।' এর পর টাকার আরও কয়েকটা থাক দিয়ে সর্দারজী বলে উঠলেন, 'আচ্ছা! আভি এক এক আদমি আ-যাও।' সর্দারের কথায় প্রায় দশ-বারোজন হুড়মুড় করে সামনে এগিয়ে এল। সর্দারের পাশে গোল টুপীপরা একজন হিন্দুস্থানী হিসেব লিখছিল। সে এবার সকলকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'এক সাথমে নেহি আও। পয়লা আও বংশীলাল, উসকো পাছু হোসেনি।' ইতিমধ্যে একজন মুসলমান রুক্ষ মেজাজে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে সর্দারজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে! কেয়া খবর? ওকিল বাবুসে উসকো কুছ পাত্তা মিলা? উ লোক কাঁহা পাকড় গিয়া?' নবাগত লোকটি ক্রুদ্ধভাবে সর্দারের প্রশ্নের উত্তর

দিল, 'কোহি নেহি পাকড় গিয়া হ্যায়। উকিলবাবু সে কোর্টসে খবর লিয়ে বলিয়ে দিলেন। উ লোক রুপেয়া লেকে সেরেফ ভাগা। হামরা গোয়েন্দাকো ভি খবর এহি আছে।' সব কথা শুনে দলের একজন আস্তিনার তলা থেকে একটা ছুরি বার করে সর্দারকে শুধাল, 'মে তৈয়ার সর্দার, হুকুম ফরমাইএ। বেইমান লোককো মে—' পরে আমি জেনেছিলাম যে এই ছুরি-হাতে লোকটি নিজে পিকপকেট ছিল না। সে মাঝে মাঝে আড্ডায় এসে চণ্ডু খেত ও সেই সাথে সে সর্দারের এটা ওটা ফাইফরমাজও খাটত। এর পর আর আমরা দেরি না ক'রে হুড়মুড় করে আড্ডাঘরের সামনে এসে দাঁড়াই। এদিকে ভিতর থেকে হঠাৎ একজন বলে উঠে, 'খবরদার ভাই, পুলিশ আ গিয়া।' বোধ হয় আমাদের জুতার শব্দ শুনে এরা বুঝেছিল পুলিশ এসেছে। সকল কথা শুনে দলের একজন বলে উঠল, 'কেয়া সর্দার, হম্ লড় যায়?' উত্তরে সর্দার বলল, 'কেয়া লড়েগা দু'-ঘণ্টাকো বাস্তে।' আড্ডা ঘরের পাশেই একটা জানালা ছিল। এই জানালা দিয়ে এরা তখন ছুরি, কাঁচি ও খালি মনিব্যাগগুলি ছুড়ে ছুড়ে বাইরে ফেলতে থাকে। এদিকে ঘরের ভিতর ঢুকে আমরা দেখি সর্দার একটা গজলগান শুরু করেছে এবং তাকে ঘিরে সকলে মিলে হাততালির সাহায্যে তাল দিয়ে চলেছে। আমাদের দেখে সর্দারজী সেলাম জানিয়ে বলে উঠল, 'সেলাম হুজুর! এ পঞ্চায়েতি হোতা, কুছ বেকানুন নেহি হ্যায়। এই, বড়বাবু আ গিয়া, জবান ঠিক রাখো, এই—"

এ ছাড়া মূল্যবান দ্রব্যাদি এবং হাজার টাকার নোট সর্দারজীর সাহায্য ব্যতীত ভাঙানোও অসম্ভব। বড় বড় ব্যবসায়ীদের সহিত ব্যবসা সূত্রে আবদ্ধ থাকায় সর্দারজী এই সব দ্রব্য পাচার করতে

সহজেই সক্ষম হন। দলের কোনও ব্যক্তি ধরা পড়লে এই সব সর্দাররা তাদের জামিনের ব্যবস্থা ও মামলার তদ্বিরও অলক্ষ্যে থেকে করে থাকেন। এই দলপতির সহিত অনেক নামজাদা ব্যবসায়ীরও সবিশেষ ঘনিষ্ঠতার কথা শুনা গেছে। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"কোনও এক নামজাদা ব্যবসায়ীর গদিতে কার্য ব্যপদেশে আমাকে যেতে হয়েছিল। গদির মালিক ক্যাস ঘরের টাকার ঝন-ঝন আওয়াজে মসগুল হয়ে কাজকর্ম দেখছিলেন। পাশে চার-চারটা টেলিফোন পর পর সাজানো রয়েছে। বোধ হয় সেখানে লাখ লাখ টাকার কারবার হয়। এমন সময় একজন কোট-প্যাণ্ট-পরা চোয়াড়ে চেহারার লোক সম শ্রেণীর দুইজন লুঙ্গিপরা যুবককে নিয়ে ঘরে ঢুকে বলে উঠল, 'রাম রাম! ছেলাম বাবু সাব!' তাকে দেখে দোকানের মালিক খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে বহুৎ দিন বাদ আসেছে, পান সিগারেট মাঙায়ে?' এই সময় গদির মালিকের উপরিউক্ত যুবকদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য পড়ল। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ওই লোকটার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'উ লোক কোউন আছে? সব বিশ্বাসী তো? সে দেখবেন মুস্কিল উস্কিল—'। প্যাণ্ট-পরা লোকটা অভয় দিয়ে তাঁকে বললে, 'সব শেয়ানা আছে, সাব। হামিলোককো বাদ উনলোকই মালিক হোবে। হামিলোক কেতো দিন আর বাঁচবে বোলেন। ইনলোককোভি একটু দেখবেন।' এর পর চুপি চুপি তাদের মধ্যে কি কথা হ'ল তা তারাই জানে। হঠাৎ আমার কানে এল ব্যবসায়ী ভদ্রলোক বলছেন, 'লেকেন হাজারমে হাম দেড়শো রুপেয়াকো যাস্তি নেহি দেবে।' উত্তরে আগন্তুক তাঁকে জানাল, 'ঠিক হ্যায়। নম্বরী নোটকো বাস্তে যো দস্তুর আছে উহিই দিবেন।' এর

পর আমার বুঝতে বাকি থাকেনি যে এরা কারা এবং কি জন্যই বা এরা গদিতে এসেছে।"

এই সকল পকেটমারদের এক-একটি দল পরস্পরের মধ্যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাও ভাগ করে নিত।* এক-একটি দল এক-একটি স্থানে শিকারের সন্ধানে ঘুরা-ফিরা করে। একজন অপব দলের নির্ধারিত স্থানে হানা দিলে মারপিট হয়। এজন্যে এরা অপরের এলাকায় কদাচিৎ এসে থাকে। এই সব ঝগড়া-ঝাটির সুযোগ গ্রহণ করে পুলিশ একদলের নিকট হতে অপর দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে অইনানুমোদিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি দেওয়া হ'ল। এই বিবৃতিটি হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি একজন পুলিশের পুরানো ইনফরমার। সেইদিন হুবহু যা যা দেখেছিলাম তা বলে যাচ্ছি শুনুন। আমি হ্যারিসন রোডের মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ঐ সময় আমার লক্ষ্য পড়ল একদল লোকের প্রতি। তাদের বেশভূষা বা ভাষার মধ্যে থেকে তাদের জাত নির্ণয় করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ওদের দলের মধ্যে

---

* একদল কোনও মোড়ে এসে দাঁড়ালে সেখানে পশ্চাদগামী দল আর দাঁড়ায় না। কারণ দুই দলের এক জায়গায় অপকর্ম করা সম্ভব নয়। তখন ওরা অপর এক স্থানের সন্ধানে অগ্রসর হয়। এই ভাবে দল বিশেষের স্থান সম্বন্ধে অধিকার দাঁড়িয়ে যায়। ভিখারীদের ভিক্ষা করার এবং ফেরিওয়ালাদের ফেরি করার মধ্যেও এইরূপ স্থানাধিকার দেখা গেছে।

একটা গাট্টাগোট্টা লোক ছিল। সে বোধ হয় তাদের সর্দার-টর্দার হবে। হঠাৎ সে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, 'এই শালা লালু, তুই ঠিকসে ফেল। এখনও একটা লোকও পড়ল না।' উত্তরে লালু তাকে বলল, 'আরে সে ঠিক মানুষ আসে তবে তো! এবে কুত্তাও শিকারই লেই?' লালু একটা ফলের দোকান হতে নির্বিচারে একটা করে আম তুলে খোসা ছাড়াচ্ছিলো। এরপর ছাড়ানো খোসাগুলা সে তাগসই মাফিক ফুটপাতের উপরই ফেলছিল। একজন মধ্যবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্রলোক সেই পথে আসছিলেন। হঠাৎ খোসার উপর পা পড়ায় সড় সড় করে পিছলে তিনি পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকটি নির্বিকার চিত্তে ফুটপাতের উপর শুয়ে পড়লেও হাতের ব্যাগটি ছাড়লেন না। ব্যাগটি আঁকড়ে ধ'রে তিনি উঠবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় সন্দেহজনক লোকগুলা ছুটে এসে তাঁকে ধরে ফেলল। ভদ্রলোকটির প্রতি তাদের যত্ন দেখানোর একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। কেউ দেয় ভদ্রলোকের কাঁধ ঝেড়ে, কেউ তাঁর জামাটা টেনে দেয়। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের পকেটটা একটু নেড়ে দিতে দিতে বলল, 'দেখেন তো বাবু! আউর একটু হলে আপনি নেঙড়া বেনে গেছলেন। আপনার সে খুব চোট লাগে নি তো?' ভদ্রলোকটি ছিলেন কলিকাতার পুরানো বাসিন্দা। এদের চিনতে তাঁর বাকি থাকে নি। ব্যাগটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তিনি উত্তর করলেন, 'আমের খোসা ফেলতা যব, তব জানতা নেহি যে চোট লাগতা? তুমলোক হামসে চালাকি মাৎ করো।' ভদ্রলোকটির এই বিদ্রূপ-বাণীর প্রত্যুত্তরে দলের মধ্যে থেকে একজন বললো, 'আপনি তো মশাই খুব ভদ্রলোক আছেন। ব্যাগে তো আছে সে মাত্র দুইখানা কাপড় আর আপনার পকেটে তো একটা পয়সাও

নেই।' ভদ্রলোকটি চলে গেলে লোকগুলা আবার তাদের পূর্বস্থানে ফিরে এল। আমি কৌতূহলী হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এদের হালচাল পরিলক্ষ্য করছিলাম। এদের মধ্যে থেকে একজন বলে উঠল, 'শালা বহুৎ হুঁশিয়ার আছে।' উত্তরে আর একজন ব'লে উঠল, 'তো শালার চোখই লেই, শালা সব মাটি করে দিলি। মাদ্ শালা তোকে এত শেখালে—'। এর পর এদের একজন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'এই শালারা, পালা এখন তোবা। ওদের সে দল এখানে এইসে গেছে।' কিন্তু ঠিক সময়ে পালান আর এদের হ'ল না। অপর দল ততক্ষণে তাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। আগন্তুকদের দল থেকে একজন লম্বা গোছের লোক এগিয়ে এসে প্রথম দলের একটা লোকের গলাটা বাম হাতে টেনে ধবে শুধাল, 'তু শালা নিজের এলাকা ছেড়ে হেনে এয়েছিস্। যা শালা তোর মির্জাপুরের মোড়ে।' লোকটি কিন্তু সহজেই অপমানটা হজম ক'রে নিল। বেশ বুঝা গেল তারা লুকিয়ে অপর দলের এলাকায় কাম করতে এসেছে। একটু আমতা আমতা করে সে উত্তর করল, 'মাইরি মামু! আম খাচ্ছিলাম। তুই শুন মাইরি।' মামু কিন্তু তার কোনও কথাই শুনল না। সজোরে তার গালে একটা চড় কসিয়ে সে উত্তর করল, 'ভাগ্ শালা। কাম করতে আইয়েছিস্, ফিন্ মিথ্যাভি বলছিস্।' অপর দলের দলপতি এর পর গুমরতে গুমরতে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করল। দলবল নিয়ে চলে যেতে যেতে সে বলে গেল, 'দাঁড়া শালে, বড়িবাজারে [থানায়] সটিনবাবু আইয়েছে। উনে হামিভি খবর ভেজিয়ে দিচ্ছি।' প্রত্যুত্তরে মামু তাকে জানাল, 'আরে আরে কেতো থানেদার হামিভি দেখিয়েছি। তোর জান তো হামি আগে লিবে।'

এর পর নূতন দলের কার্যকলাপ সেখানে নির্বিরোধে শুরু হল।

আমিও যথাস্থানে দাঁড়িয়ে এদের কার্যকলাপ দেখতে থাকলাম। এই নূতন দলের একজন লোক হঠাৎ তার সাথীর কাঁধে একটা গাঁট্টা কসিয়ে বলে উঠল, 'চুপ কর্, শালা।' পাশের একজন পথিকের পকেট থেকে বেমালুম একটা ফাউনটেন পেন উঠিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করল, 'কেন রে?' প্রত্যুত্তরে তাকে হাঁটুর গুঁতা মেরে প্রথম ব্যক্তিটি ঐ সময় বলে উঠল, 'চুপ শালা! শিকার। পকেটে সে মাল আছে মনে হয়, আগে পরখ করে দেখ্।' এর পর এদের একজন জনৈক পথচারীর গা ঘেঁসে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে তাঁর পকেটে একটা আঙ্গুলের টোকা মেরে আবার পিছিয়ে পড়ল। তাকে পিছিয়ে পড়তে দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, 'কি, মাল তো আছে? না সব বাজে কাগজ!' অপর লোকটি উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তর দিলে, 'আরে! সব লোট্ মাইরি। তুই জলদি ওদের ইখানে ডাক্।'

ফুটপাতের অপর পারে জন-দুই লম্বা-চুল বাঙ্গালী, কয়েকজন ঘাড় ছাঁটা দেশোবালী ও জন-চার পাঁচ লুঙ্গিপরা মুসলমান দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়ি ফুঁকছিল। তাদের দিকে একটা ইশারা করে প্রথম ব্যক্তি এক ছুটে ভদ্রলোকের পাশ ঘেঁসে অনেক দূর এগিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁর পিছন পিছন চলতে শুরু করে দিল কি মতলবে তা সেই জানে। এত বড় একটা ষড়যন্ত্র যে তাঁকে উপলক্ষ্য করে হয়ে গেল তা সেই ভদ্রলোকটি মোটেই জানতে পারলেন না। আপন মনেই তিনি পথ চলছিলেন। হঠাৎ উপর থেকে কাগজে মোড়া কি একটা তাঁর মাথার উপর এসে পড়ল। গোবর কি বিষ্ঠা— তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তা তাঁর গাল বেয়ে নেমে এসে তাঁর জামার অনেকখানি নষ্ট করে দিলে। ভদ্রলোকটি চমকে উঠে উপর

দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'দেখতো, দেখতো, যত বেল্লিক সব।' কানে বিড়ি গোঁজা মুসলমান কয়জন ভদ্রলোকটির পিছিন পিছন আসছিল। হঠাৎ তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদের মধ্যে একজন ভদ্রলোকের অবস্থা পরিলক্ষ্য করে বলে উঠল, 'এ কেয়া তাজ্জব, ছো ছো ছো। এ কোউন কিয়া রে?' সামনের ফলের দোকান থেকে একজন আধা ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী লাফিয়ে পড়ে বলল, 'আপনাকে তো বড় মুস্কিলে ফেলিয়েছে। হাপনি পানি লিবেন তো আসেন এহানে।' দেখতে দেখতে সেখানে বড় রকমের একটা ভিড় জমে গেল। কোথা থেকে আবার আর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী এক বালতি জল এনে তাঁর জামা কাপড় কতক কতক ধুয়ে দিযে বললে, 'বাবুজী! মাথা সে একটু নীচু করেন। হামি সে বেশ করে ধুইয়ে দিই। হাপনি ভদ্দর লোক আছেন মশয়।' দলের প্রথম ব্যক্তিটি ভদ্রলোকের পিছনেই দাঁড়িয়েছিল, সেই সঙ্গে আমিও সেখানে ছিলাম। জল ঢালতে ঢালতে সেই শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটি ঐ প্রথম ব্যক্তিটিকে চোখ টিপে ইশারা করে ভদ্রলোকটিকে শুধাল, 'হাপনি সে আউর একটু নীচু হবেন। হামি সে হাপনাকে বেশ করে—'

ভদ্রলোকটি দ্বিরুক্তি না করে মাথাটা আরও একটু নীচু করলেন। নীচু হবামাত্র প্রথম ব্যক্তিটি ছুটে এসে একটা রেজার ব্লেড বার করে ভদ্রলোকের বুক পকেটের তলায় খানিকটা বেমালুম কেটে দিল। তারপর ব্লেডটা ফুটপাতের উপর ফেলে দিয়ে দুটা মাত্র আঙুলের সাহায্যে নোটের বাণ্ডিলটা পকেট থেকে বার করে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

এ ধারে কিন্তু জল ঢালার পালা সমানে চলছিল। মাথাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে ভদ্রলোক কোঁচায় খুঁট দিয়ে চুলগুলা মুছে

ফেলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর পকেটের দিকে নজর পড়ায় তিনি চমকে উঠলেন। মুখ দিয়ে তাঁর আর কথা বার হল না, অস্ফুট আর্তনাদে তিনি তখুনি রাস্তার ঐ ফুটের উপর বসে পড়লেন।

যে লোকটা এতক্ষণ তাঁর মাথায় জল ঢালছিল, সে একটু ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, 'কি মশাই? আউর জল ঢালবে না'কি? এখন হাপনি উমন করছেন কেন?' ভদ্রলোকটি এইবার চীৎকার করে উঠলেন, 'আরে! হামরা সর্বনাশ হো গিয়া। পুলিশ বোলাও, পুলিশ বোলাও।' এতক্ষণে একজন বাঙ্গালী যুবক তাঁর নিকট এগিয়ে এসে বললেন, 'কি, পকেট মেরেছে বুঝি? তাতো মারবেই, অমন জায়গায় রাখে?' সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন সে-দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁকেও বাঙ্গালী বলে মনে হ'ল। তিনি বেশ বিশেষজ্ঞের মতই তাঁর মত বলে গেলেন, 'ও মশাই ওঁর নিজের টাকা নয়। নিজের টাকা হলে ওরকম জায়গায় রাখে? পুলিশ শুনলে এ কেস লেবেই না!' অপর আর একজন সেই সময় বলে উঠল, 'আর পুলিশ ডেকে কি হবে। ও আর পেয়েছেন, বাড়ি যান মশায়। আর ঝামালা করবেন না।' শেষ কথা বলে গেল একজন মাড়োয়ারী। ভিড়ের ভিতর থেকে ভদ্রলোকটিকে সম্বোধন করে ভাঙা বাঙলায় তিনি বললেন, 'হাপনি মশয় বোকা লোক আছেন। এ কলকাত্তা শহর। বড় বড় কাজ কারবার হেনে হয়। বোকা লোকের হেনে থাকা কামই লয়। বুঝলেন মশায়?'

এইবার এল এখানে একজন বাঙালী ছোকরা। সে বোধ হয় কোন কলেজের পড়ুয়া হবে। বই হাতে করে সেই পথ দিয়ে আসছিল। ভিড় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে মশাই?' ভিড়ের ভেতর থেকে দলের একজন ছোকরাকে একটা ধাক্কা দিয়ে

বলে উঠল, 'ও কিছু নয়। সরে পড়েন মশয়, আপনিও সরে পড়েন।' এর পর সকলে মিলে ছোকরাটিকে ধাক্কা দিতে দিতে একেবারে কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে নিয়ে গিয়ে ফেল্লে। আর ছোকরাটি সামলে নিয়ে ঠিক ভাবে দাঁড়াবার আগেই ভিড়ের লোকগুলা এক-একজন এক-এক দিকে সরে পড়ল। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে তাদের কাউকে আর সেখানে দেখা গেল না।"

উপরের কাহিনী কয়টি হ'তে এই পকেটমার বা গাঁটকাটাদের আভ্যন্তরিক সংগঠন ও কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে সবিশেষ ধারণা করা যায়। এই অপকর্মের অব্যবহিত পরে যে সকল সন্দেহজনক ব্যক্তি দরদ বা সহানুভূতি দেখায় তাদের তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করলে অনেক সময় এই সব চুরির কিনারা হয়ে যায়। এইবার এই পকেটমারদের অপর আর একটি পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা যাক। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি পড়ে দেখুন। এই পিকপকেটদের এক এক দলের কার্যপদ্ধতি এক এক রকমের হয়ে থাকে। এই পৃথক পৃথক কার্যপদ্ধতি হ'তে এদের কোন দলটি কোন অপকর্মটি করেছে তা বলে দেওয়া যায়।

"আমি শহরের একজন পুরানো পিকপকেট হুজুর। সেদিন এক ছোকরা সাকরেদকে নিয়ে পথ চলছিলাম। আমার পরনে ছিল চোস্ত বিলাতী স্যুট। তা ছাড়া দেখছেন তো. আমার রঙটাও একটু কটা। আমার সাকরেদটি হঠাৎ একজন ছোকরা পথিকের পকেট থেকে ব্যাগটা টেনে বার করে নিল। ছোকরাটিকে সে যতটা অসাবধান মনে করেছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ততটা অসাবধান সে ছিল না। ছোকরাটি সঙ্গে সঙ্গেই আমার শিষ্যের হাতটা চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "চোর—চোর!" আমার চেলা একটা ঝটকান মেরে ছোকরাটির হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিল।

ইতিমধ্যে আমার অপর কয়জন সাকরেদও সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সমবেত জনতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও "চোর—চোর" বলে বন্ধুর পিছন পিছন ছুটে চলল। উদ্দেশ্য সুবিধা মত তাকে জনতার হাত হ'তে উদ্ধার করা। কয়েকজন সাইক্লিস্ট তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা জোরে সাইকেল চালিয়ে এসে আমার লোকটিকে ধরে ফেললে। আমিও এতক্ষণে ছুটতে ছুটতে এসে বাম হাতে তার গলাটা টিপে ধরলাম। তার পর ডান হাত দিয়ে তাকে কয়েকটা চড় কসিয়ে বলে উঠলাম, 'শালে হামরা পকেট তুম্ মারেগা। লে আও হামরা রুপেয়া, ব্লাডি সোয়াইন।' সাকরেদটি তখন ব্যাগটি আমার হাতে তুলে দিয়ে সকাতরে বলে উঠল, 'লিজিয়ে আপ সাব, আপকো রুপেয়া। হামকো পুলিশমে মাৎ দিইয়ে। হাম এইসেন কাম আউর নেহি করেগা।' এর উত্তরে আমি চেঁচিয়ে উঠে তাকে বললাম, 'চোপরাও। আলবৎ তুমকো পুলিশমে দেগা। এই ট্যাক্সি, ট্যাক্সি!' দৈবক্রমে একখানি ট্যাক্সি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। আমি সাকরেদের চুলের মুঠিটি ধরে ট্যাক্সিতে উঠিয়ে নিয়ে—উভয়েই আমরা সরে পড়লাম। আমাকে সাহেব দেখে কেউ আর আমার সঙ্গ নিল না। আসল ফরিয়াদী হাঁপাতে হাঁপাতে অকুস্থলে পৌঁছানোর আগেই আমরা বামাল সহ সরে পড়ি।"

শহরের বিভিন্ন এলাকা এরা বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগ করে নেয়। বাস ট্রাম আদি পরিবহন সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। কারুর এলাকা মৌলালী হতে শ্যামবাজারের বাস বা ট্রাম রুট। কোনও দলের এলাকা মৌলালী হতে ধর্মতলা পর্যন্ত বাস বা ট্রাম রুট্ ইত্যাদি।

এই পিকপকেটদের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাক।

"আরে মশাই! আমি ওদিন ক্যানিং স্ট্রিট্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই ছেলেটা আমার পায়ে পা বাধিয়ে সটান শুয়ে পড়ে কেঁদে উঠল। আমি মনে করলাম সত্যিই পড়ে গেল বুঝি। আমি হাত ধরে একে উঠাতে যাচ্ছিলাম। আমি সবে মাত্র একটু নীচু হয়েছি, অমনি এক বেটা কোথা থেকে এসে আমার পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে দে ছুট। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত ব্যাপারটা আমি বুঝে নিলাম। আর তখুনি আমি ধরে ফেললাম এই ছেলেটাকে।"

এই পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপর আর একটি কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"রাত তখন প্রায় দশটা বেজেছে। রাস্তা দিয়ে আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় একটি কঠিন বস্তু আমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম যে সেটি কোনও দ্রব্য নয়। সেটা ছিল একটা জলজ্যান্ত মানুষ। লোকটা ততক্ষণে আমার পায়ের উপর পড়ে গোঙরাতে শুরু করেছে। আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল, 'কি রে বাবা! লোকটা মাতাল নাকি?' লোকটা এইবার দুই হাতে আমার পা দুটা জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলল, 'না, বাবা! আমি একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। তবে একটু বেশি খেয়েছি—এই যা। আপনি দয়া করে যদি একটা রিক্সা ডেকে দেন। মাইরি বাবা—'

মানুষটাকে দেখলে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়; শুধু তাই নয়। সে ধনী লোকও বটে। সোনার বোতাম ও রিস্টওয়াচ তো আছেই, তা ছাড়া একটা হীরার আঙটিও তার হাতে দেখলাম। এইরূপ

অবস্থায় তাকে ফেলে গেলে তার বিপদ ঘটতেও পারে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনার বাড়ি কোথায়? আপনার বাড়ি কদ্দুর এখান থেকে? শান্তভাবে আসেন তো পৌঁছে দিতে পারি।' ইতিমধ্যে একটা রিক্সাও সেখানে এসে গেল। আমি জোর করে মাতালটিকে রিক্সায় তুলে দিই। কিন্তু মাতালটা আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে আর বলে, 'তুমি আমার বাপ ভাই। এই কাঁকুড়গাছির মোড়ে একটু পৌঁছে দাও' ইত্যাদি। ইতিমধ্যে আরও দুই একজন লোক সেখানে জড় হয়েছে। সকলে মিলে তাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানায়। এর পর আমি রিক্সায় উঠে মাতালটির পাশে বসে পড়ি একরকম বাধ্য হয়েই। ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি করে পথের উপর রিক্সা ছুটে চলল। কিন্তু ঐ মাতালটা কিছুতেই শান্ত হয়ে বসতে চায় না। কখনও সে ঠেলে দাঁড়িয়ে উঠে। কখনও বা সে নেতিয়ে পড়ে। কখনও বা দুই হাতে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে। এমন বিপদে আমি জীবনেও পড়িনি। কাঁকুড়গাছির মোড়ে এসে কিন্তু লোকটা শান্ত হয়ে উঠল। ছোট একটা হাই তুলে সে বলে উঠল, 'বাঃ, বেশ হাওয়া বইছে তো! আরে, আপনি কে মশাই! এ্যা, কে আপনি? এই রিক্সা, এই রোকো।' বেশ বোঝা গেল লোকটার নেশা কেটে গেছে। প্রকৃত বিষয়টি তাকে বুঝিয়ে বলতেই সে রিক্সা থেকে নেমে পড়ে একটি দশ টাকার নোট আমার হাতে বকশিস্ স্বরূপ গুঁজে দিল। বলা বাহুল্য, আমি তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদের সহিত তার এই দান প্রত্যাখ্যান করি। এর পর লোকটা শিশ্ দিতে দিতে রিক্সা ভাড়া না চুকিয়েই সামনের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। এদিকে রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। মাতালটার পিছন পিছন আর

ধাওয়া করা নিরর্থক। রিক্সা ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিতে মনস্থ করে হাত উঠাতেই লক্ষ্য করলাম, আমার বুক পকেটটা কাটা—এবং আমার ব্যাগ সমেত সমুদয় অর্থ অপহৃত হয়েছে। এর পর আমি দৌড়ে চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ি, কিন্তু ততক্ষণে সে সেখান থেকেও উধাও হয়েছে। আমি আর তাকে ধরতে পারি নি। আমি বুঝতে পারি যে, আসলে লোকটা মাতাল নয়। সে একজন ওস্তাদ পিকপকেট মাত্র এবং এও বুঝতে পারি যে, তার দলের লোকরাই মাতালটাকে বাড়ি পৌঁছবার জন্যে আমায় অনুরোধ জানিয়েছিল।"

কিছুকাল পূর্বে ঝিনঝিনিয়া নামক এক রোগের কথা শুনা গিয়েছিল। এই রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ত। যদিও কিনা এই রোগ সংক্রান্ত সকল কাহিনীই ছিল কল্পিত বা গুজব মাত্র। এই সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ এক পথিককে বেছে নিয়ে তার মাথায় জল ঢালতে শুরু করেছে "ঝিনঝিনিয়া হয়েছে" এই কথা বলে এবং তারপর তার পকেট থেকে তারা অর্থ অপহরণ করেছে,—এইরূপ অনেক কাহিনীও ঐ সময় শুনা গিয়েছে। এই ধরনের আর একটি কাহিনী সম্বন্ধে নিয়ে বলা যাক্।

"রাস্তা দিয়ে সেদিন একটা পকেটভারী লোক যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমরা তার কাছে ছুটে যাই। আমাদের মধ্যে একজন বলে উঠে—এই পড়ে গেলেন বুঝি? আমাদের অপর আর এক বন্ধু ভদ্রলোককে বলে উঠে—অত কাঁপছেন কেন? ওঃ, চোখ দুটো আপনার বড্ড লাল হয়েছে। এর পর ভদ্রলোককে আর কোনও রূপ উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়ে তার গলার কম্ফর্ট ও গায়ের জামাটা খুলে দেয়। এর পর তাকে আমরা বাতাস করতেও শুরু করি। এদিকে

রাস্তায় ভিড় জমে যায়। কিন্তু কেউই ভিতরের আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারে না। ইত্যবসরে আমাদের একজন ভদ্রলোকের পকেট হ'তে যাবতীয় অর্থ অপহরণ করে সরে পড়ে এবং কিছু পরে আমরাও ঐরূপ ভাবে সরে পড়ি। সেখানে মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই সকল কায সমাধা করা হয়।"

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পিকপকেটদের মধ্যে যে পকেট কাটে, সে কখনও বামাল তার সঙ্গে রাখে না। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থাদি অপর এক ব্যক্তির সাহায্যে পাচার [pass] করে দিয়ে থাকে। এই হাত সাফাই-এর কার্যে এরা সকলেই সুদক্ষ থাকে। এই কারণে এই ব্যক্তি অকুস্থলে ধরা পড়লেও তার কাছে অপহৃত দ্রব্য বা অর্থ প্রায়ই পাওয়া যায় না। পূর্বে এরা পকেট বা গাঁট কাটার উদ্দেশ্যে বোতল ভাঙা কাঁচ ঘষে একপ্রকার ক্ষুর-ধার ছুরি তৈরি ক'রত। কিন্তু আজকালকার পিকপকেটরা চাকু ব্যবহারও করে না, এরা সকলেই এখন রেজার ব্লেডের সাহায্যে পকেট কেটে থাকে। এদের একজন দলের লোকের সুবিধার জন্যে এক বাণ্ডিল রেজার ব্লেড সহ রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং একটি অপকার্য সমাধা হওয়ার পর অপর কার্যের জন্যে সে তৎক্ষণাৎ আরেকখানি ব্লেড দলের লোকদের সরবরাহ করে দেয়। এরা দুইটি আঙুলের সাযায্যে পকেট কাটা সমাধা করে; পিকপকেটরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে ব্লেডটিকে নিম্নে রাস্তার উপর ফেলে দিয়ে ঐ দুইটি আঙুলের সাহায্যেই নোটের বাণ্ডিলাদি পকেট হ'তে বার করে নেয়। এইজন্য এক একটি ব্লেড দ্বারা মাত্র একটিবার পকেট কাটা চলে। কারণ অকুস্থলের রাস্তা হতে নিক্ষিপ্ত ব্লেডটি পরবর্তী অপকর্মের জন্যে উঠিয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে ঐ সময় আর সম্ভব হয় না।

এইবার পিকপকেটদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করা যাক। এ সম্বন্ধে জনৈক পিকপকেটের নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধান-যোগ্য। এই বিবৃতিটি পকেটমারদের মনস্তত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

"পকেট মারার পূর্বে আমরা মানুষকে জোরে একটা ধাক্কা দিই এবং এর পরেই আমরা তার পকেটটা কেটে ফেলি। ফলে পকেট কাটার জন্যে ছোট ধাক্কাটি সে আর অনুভব করে না। মানুষ তখন বড় ধাক্কার কথাই ভাবে এবং অসাবধানে পথ চলার জন্যে আমাদের গাল পাড়ে। এক কথায় বড় ধাক্কাব আওতায় ছোট ধাক্কাটি আর অনুভব হয় না। এ ছাড়া আমাদেব কেউ কেউ পকেটে একটা টোকা মেরেই বুঝতে পারে যে লোকটার পকেটে নোট কিংবা কাগজ আছে।"

উপরের কাহিনী হতে বুঝা যাবে যে, পিকপকেটদের স্পর্শ বোধ [touch sensation] অত্যধিক। ইহা তারা অভ্যাস ও স্বভাব-গতভাবে অর্জন করে। এদের নিয়ে যান্ত্রিক পরীক্ষা দ্বারা আমি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি।

উপরে দলবদ্ধ পিকপকেটদের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া একক পিকপকেটও দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ রেল, স্টিমার ও পোস্ট অফিসের ও ব্যাঙ্কের কাউণ্টারে ভিড়ের মধ্যে এসে পকেট মেরে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে এরা ফরিয়াদীদের অনুসরণ করেও তাদের পকেট কেটে থাকে। এদের কেহ কেহ ভিড়ের সময় বাস ও ট্রামে উঠেও পকেট মেরেছে। হাটে ও বাজারে এবং মেলাতেও এদের গতিবিধি দেখা যায়। ট্রামে ও বাসের পাদানিতেই অপকর্মের সুবিধার জন্যে এরা অধিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রামের বা বাসের কোনও

কোনও কন্‌ডাকটারের সহিত এদের যোগসাজস থাকে। কয়েকটি সঙ্গত কারণে এইরূপও কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তবে ইহা সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য মনে করা সমীচীন হবে না।

কোনও কোনও ভদ্রবেশী পিকপকেট শালের জোড়া গায়ে বা গরদের পাঞ্জাবি পরে ট্রামে উঠে কোনও যাত্রীর পাশে এসে বসে। তার হাতের দামী ঘড়ি ও হীরার আঙটিটা দেখে যাত্রীটি সসম্ভ্রমে তাকে তার পাশে বসতে সাহায্যও করে। এর পর নানা কথায় যাত্রীটিকে অন্যমনস্ক করে পিকপকেটটি বেমালুম তার পকেটটি খালি করে নেমে পড়ে। এ সম্বন্ধে কোনও এক মামলার ফরিয়াদীর বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি ঐ দিন ট্রামে বসে আছি। এমন সময় চোস্ত বিলাতি স্যুট পরা এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলেন। এর পর চুরুটটা ধরিয়ে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হোয়াট দি টাইম-প্লিজ্‌?' আমি আমার হাতের ঘড়িটি তুলে ধরতেই কখন যে তিনি আমার পকেটের ব্যাগটা সরিয়ে ফেলেছিলেন তা আমি টেরও পাই নি।"

এই সকল পিকপকেটরা প্রায়ই নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি হয়ে থাকে এবং এদের কেহ কেহ কাজের সুবিধার জন্যে দুই একটা ইংরাজি বুকনিও শিক্ষা করে। এরা হিন্দি ভাষা ও বাংলায় কথা বলতে পারে। এদের কেহ কেহ চোস্ত উর্দুও বলতে পারে। এই পিক-পকেটদের চাপ-জ্ঞান অত্যন্তরূপ অধিক। কতখানি চাপ দিলে শুধু পকেটের উপরটা কাটবে, নীচের জামা বা গাত্রচর্ম কাটবে না প্রখর কাইনেটিক্‌ সেনসেসনের সাহায্যে তা তাদের বেশ ভাল রকম জানা আছে। অধুনাকালে অনেক ভদ্রঘরের বাঙালী পিকপকেটও শহরে দেখা যাচ্ছে।

এদের সময়ের পরিজ্ঞান থাকে অতীব তীব্র। কোনও এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার এক সেকেণ্ড পরে বা পূর্বে পকেট মারলে তারা ধরা পড়তে পারে। এইজন্য পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গেই তারা পকেট কেটে থাকে এবং এই জন্য তারা ধরাও পড়ে না। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ইহাদের প্রতিক্রিয়াকাল তথা সময়ের । পরিজ্ঞান [Reacti n Time] অতীব প্রখর।

পূর্বকালে এই পিকপকেটরা কলকাতায় কিরূপ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল তা নিম্নের কাহিনীটি হ'তে বুঝা যাবে।

"প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্বের কথা। এই সময় কলকাতার মধ্যাংশে বহু বড় বড় বস্তি বিদ্যমান ছিল। কলকাতার এই বস্তিসঙ্কুল অংশের সহিত গহন বনানীর তুলনা করা চলত, কারণ এই বস্তির বাসিন্দাদের সহিত শহরের ভদ্রশিক্ষিত ব্যক্তিরা কমই পরিচিত ছিলেন। এই সকল ঘন বস্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের অপরাধিগণ নির্ভয়ে তাদের স্ব স্ব ডেরা স্থাপন করতে পারত।

এই সময় কোনও এক ধনী ব্যক্তির পকেট হ'তে একটি রুপার ঘড়ি চুরি যায়। এই ঘড়িটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুকরূপে পেয়েছিলেন। এই জন্যে ঘড়িটির উপর তাঁর বিশেষ দরদ আছে— এই বলে তিনি কোনও এক উর্ধ্বতন অফিসারের নিকট কেঁদে পড়লেন। উর্ধ্বতন অফিসারটি সব কথা শুনে সহানুভূতিশীল হয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে যেরূপেই হোক ঐ দ্রব্যটি উদ্ধার করবার জন্যে অনুরোধ করেন। এই সময় ঐ অঞ্চলে বড়মিয়া নামক এক ব্যক্তি পিকপকেটের সর্দার রূপে পরিচিত ছিল। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন, 'বাপু! যে রকমেই হোক এই

ঘড়িটা তোমায় উদ্ধার করতে হবে।' পিকপকেট সর্দার রাজি হয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা! আপনার ঘড়িটি কোথায় অপহৃত হয়েছিল?' উত্তরে ভদ্রলোক তাকে বললেন, 'আজ্ঞে সিঁদুরে পটির মোড়ে।' 'ওঃ আমি বুঝেছি, তবে আসেন আমার সঙ্গে।' এই বলে পকেটমার সর্দার তাঁকে একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে তুলে তাঁর চোখ দু'টা পুরু কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। এর পর ঘোড়ার গাড়িটি একটি বিরাট বস্তির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়ালে ভদ্রলোকের চোখের বন্ধন খুলে দিয়ে তাঁকে একটি প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ভদ্রলোকটি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, ঐ হলঘরের মাটির দেওয়ালের উপর সোনার ও রুপার বহু মূল্যবান ঘড়ি পাকাটির পেরেকের উপরে সারি সারি টাঙান রয়েছে। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়ল একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ির দিকে। ঘড়িটির একাংশে একটি হীরা ও কয়েকটি মুক্তা বসানো ছিল। ভদ্রলোককে হতবিহ্বল ভাবে চেয়ে থাকতে দেখে পিকপকেট সর্দার বলে উঠল, "কৈ বাবুসাব! এর মধ্যের কোন ঘড়িটি আপনার? এর মধ্যে সেটা আছে? আপনি বেছে নিন।' প্রলুব্ধ হয়ে ভদ্রলোক ঐ মুক্তা ও হীরা বসানো ঘড়িটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আজ্ঞে! ঐ ঘড়িটাই হচ্ছে আমার!' 'এ্যাঁ, এ আপনি বলেন কি? তা— তাই না'কি?' ক্রুদ্ধ হয়ে পকেটমার সর্দার এবার উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে, না! ওটা আপনার ঘড়ি নয়। আপনার হচ্ছে কোণের দিকে ঝুলানো ঐ রুপার ঘড়িটা। আপনি দেখছি আমাদের চেয়েও বড় অপরাধী ও লোভী ব্যক্তি। আসুন। আপনি চলে আসুন শীগ্‌গির। আপনার উপযুক্ত শাস্তিই আপনি পেয়েছেন।' এর পর পকেটমার সর্দার পুনরায় ভদ্রলোকের চোখ দুটো বেঁধে দিয়ে ঘড়িটা

তাঁকে ফিরিয়ে না দিয়েই ঘোড়ার গাড়ি করে তাঁকে চৌমাথা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে যায়।"

অধুনাকালে কোনও কোনও পকেটমার দলবলসহ ট্রামে উঠে ডান হাত দিয়ে উপরের রড্ বা ডাণ্ডা ধ'রে ঈপ্সিত শিকারের [Victim] কাঁধের উপর ঐ হাতের বাহু ন্যস্ত করে। এই ভাবে বাহুর ধমনীর সহিত শিকারমন্ত ব্যক্তির কাঁধের ধমনীব সংযোগ স্থাপন করে রক্তসঞ্চালন হতে বুঝতে চেষ্টা করে ঐ 'শিকার' ভদ্রলোক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইহা বুঝা মাত্র সে ইশারায় সাথীদের জানিয়ে দেয় যে ভিড়ের মধ্যে কাজ হাসিল করার সময় হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ সংযোগ স্থাপন করার পর সর্দারজী সন্দেহ এড়াবার জন্য তার মুখটি সর্বদাই শিকারমন্ত ব্যক্তির বিপরীত দিকে ফিরিয়ে রাখে।

এই পিকপকেটদের কার্যকরণ সম্বন্ধে নিম্নে একটি পকেটমার-প্রধানের বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"স্কুল কলেজ ও অফিসে যাবার সময় বাসে বা ট্রামে উঠে আমরা লেডিস সিটের পিছনে এসে দাঁড়াই। এই লেডিস্ সিট উঠা-নামার দরজার নিকটে থাকলে আমাদের আরও সুবিধে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে যুবকগণ মেয়েদের সহিত নামবার সময় সন্ত্রস্ত, উৎফুল্ল কিংবা ভাবে বিভোর থাকে। এই সুযোগে সারা গাত্র আলোয়ান আবৃত করে তাদের পাশে দাঁড়ালে এরা অন্যমনস্কভাবে ঘড়িশুদ্ধ হাতটা আমাদের আলোয়ানের ভিতরেই প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।"

এরা ডান হাতের বাহু দ্বারা মানুষকে ধাক্কা দিয়ে বাম হাতটি ডান হাতের তলা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে মানুষের পকেট কাটে। এদের কেহ কেহ দুইটি আঙুলকে কর্তনক্ষম কাঁচির ন্যায় করে লোকের পকেট

হতে দ্রব্যাদি তুলে নেয়। এদের কেহ কেহ হাতের প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্গুলি একদিকে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলি অপর দিকে রেখে এইরূপ কাঁচি তৈরি করেছে। কখনও কখনও এরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের দ্বারা কাঁচি তৈরি করে তাদের বাকি অঙ্গুলিগুলি মুঠির আকারে বুড়া অঙ্গুলি সহ হাতের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে। এদের কেহ কেহ আঙুল বা ব্রেসলেটের মধ্যে ক্ষুদ্রাকার ছুরিকা লুক্কায়িত রেখে পথ চলে। অর্ধঅঙ্গুলির ন্যায় বাঁকানো ক্ষুদ্র ছুরিকা এদের কেহ কেহ জিহ্বার তলদেশে রেখে থাকে। সাধারণতঃ এরা দোকানে বা ব্যাঙ্কে গমন ক'রে দেখে কেউ টাকার লেনদেন করল কি'না। তারপর তারা তাকে অনুসরণ করে সুবিধাজনক স্থানে ও মুহূর্তে তার পকেট খালি করে।

[এরা পলায়নের জন্য অলিগলি ও লুকানো স্থানের খবর রাখে। ছোট্ট একটি ঢিবি বা আবর্জনা স্তূপের পিছনে লুকাবার কায়দা কানুনও এরা জানে। বন্ধু ভাবাপন্ন এবং নির্লিপ্ত ও ভীতু লোকদের বসতির মধ্য দিয়ে এরা পলায়ন করে।]

ছিন্নক চোর

ছিন্নক চোর বা ছিঁচকা চোর নির্বল চৌর্য শ্রেণীর অন্তর্গত সরল চৌর্যের একটি উল্লেখযোগ্য বিভাগ। এদের দলে দুই বা তিনজনের অধিক ব্যক্তি প্রায়ই যুক্ত থাকে না। সাধারণতঃ এরা এককই একইরূপ পদ্ধতিতে একই অপকার্য করে থাকে। এই সব ছিন্নক চোরেরা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এবং সুবিধামত নারী ও শিশুদের গলা ও বাঁহু হতে তাবিজ, হার আদি অলঙ্কার ছিনিয়ে নেয়। এদের ইংরাজিতে বলা হয় স্ন্যাচার [Snatcher]। পূর্বে এরা অলঙ্কারাদি টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ছুটে পালাত, কিন্তু অধুনাকালে এই কার্যে এরা কর্তন যন্ত্র [wire cutter] ব্যবহার করে থাকে। এতদ্বারা নিমেষের মধ্যে অতি সহজে তারা তাদের কাজ হাসিল করতে সক্ষম হয়। কর্তন যন্ত্রাদির প্রতিকৃতি অনেকটা প্লাস [plus] বা সাঁড়াশীর মত দেখতে হয়। এর মুখে কিন্তু দাঁতের বদলে কাঁচির মত ধার থাকে। এরূপ বহু কাঁচির ডাঁটীতে উহার ফলদ্বয় উঠানো নামানোর সুবিধার্থে স্প্রিঙ্‌ যুক্ত থাকে। ইহা একটি অতি সাধারণ কর্তন যন্ত্র মাত্র। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল অপরাধী অত্যন্তরূপ ধূর্ত হয়। এই সম্বন্ধে কোনও এক ছিন্নক চোরের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হল। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"অপকর্মের সুবিধার জন্যে আমরা এক অদ্ভুত উপায়ে গালের

কসির মধ্যে থলি বানাই। ছোট ছোট নুড়িতে চূণ মাখিয়ে সেগুলি গালের কসিতে পুরে কসির মধ্যে ফুটা করি। চূণের দ্বারা গালের ভিতরকার ছাল ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িত হয়ে ছিদ্র তৈরি হয়। এর পর এই ছিদ্রের মধ্যে আরও বড বড় নুড়ি পুরে ছিদ্রটি বড় হতে আরও বড় করে উহাকে একটি গুপ্ত থলি বিশেষে পরিণত করি। গহনা বা অর্থাদি ছিনিয়ে নিয়ে উহা আমরা তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলি। সাধারণতঃ লোকে মনে করে আমরা ঐগুলি গিলেই ফেললাম। আসলে কিন্তু ঐগুলি আমরা গিলে ফেলি না। আমরা ঐগুলি গালের ভিতরকার ঐ থলির মধ্যে লুকিয়ে ফেলি। এই কারণে 'এক্স-রে' করেও কেহ আমাদের উদরে কোনও দ্রব্যাদির চিহ্ন দেখতে পায় না।"

শহরের পুলিশ এই সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে প্রথমেই এদের গলদেশের ঐ সব থলির সন্ধান করে। গণ্ডের দুই দিকে অঙ্গুলির দ্বারা ঈষৎ চাপ দিলেই এরা থলির মধ্যে রক্ষিত দ্রব্যাদি উগরে ফেলে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা অপহৃত দ্রব্য যে গিলে না ফেলে তাও নয়। বহুবার এক্স-রে [X-Ray] দ্বারা ইহা প্রমাণিতও হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় জোলাপ দিলে ঐ দ্রব্য বিষ্ঠার সহিত বার হয়ে আসে—তবে এইরূপ ছিন্নক চোরের সংখ্যা খুব কম। এই সব অপরাধীদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে নিম্নে অপর আর একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"অপকর্মের সময় আমাদের কেহ কেহ বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকি। নিম্নে আমরা একটি ইজের বা পাতলা পাতলুন পরি এবং উপরে একটা লুঙ্গি পরি। পাঞ্জাবির উপর একটা কোটও চাপাই। অপকার্যের পর তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে আমরা তাড়াতাড়ি কোট এবং লুঙ্গি খুলে ফেলে অকুস্থলে

ফিরে আসি। এই অবস্থায় আমাদের দেখে ফরিয়াদি এবং আশে-পাশের কোনও লোকেই আর আমাদের চিনতে পারে না। কারণ তাদের দৃষ্টি থাকে লুঙ্গি পরা কোট গায়ে ব্যক্তিদের দিকে। এ সময় পাতলুন ও পাঞ্জাবি পরা ব্যক্তিদের দিকে তারা ফিরেও তাকায় না।"

এদের কোনও কোনও দল গঙ্গার ঘাট, মন্দির বা প্রমোদগৃহের পথে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। বিশেষ করে এরা প্রাচীনপন্থী মহিলাদেরই শিকাররূপে বেছে নেয়। কারণ এই ভদ্রমহিলারা আদালতে সাক্ষ্য দিতে যেতে রাজি হন না। মাড়োয়ারী মহিলাদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এতে নাকি তাদের ইজ্জতহানির আশঙ্কা থাকে।

এই ছিন্নক চোরদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অপর দুইটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম। বিবৃতি দুইটি হতে এদের কার্যধারা সম্বন্ধে সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"আমি মশাই অমুক বাবুর বাড়ির একজন চাকর। মনিবের খোকাকে নিয়ে রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিলাম। এই সময় এই ভদ্রবেশী অপরাধীটিও সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন খোকাকে তাঁর ভাল লেগেছে। সামনের দোকান থেকে খোকার জন্যে তিনি লজেন্সও কিনতে চাইলেন। তিনি সস্নেহে আমার কোল হতে খোকাকে তুলে নিলেন এবং আমার হাতে একটা আধুলি গুঁজে লজেন্স আনবার জন্যে দিলেন। দোকান থেকে লজেন্স কিনে ফিরে এসে দেখি যে খোকা রাস্তার উপর বসে কাঁদছে এবং তার গলার সোনার হারটা খোয়া গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও লোকটাকে কোথাও আর আমি দেখতে পাই না। আসলে লোকটা ছিল একজন শিশু ছিন্নক [Child snatcher]।"

[মনি ব্যাগে একটা আঙটা লাগিয়ে ঐ আঙটাতে তার বা সুতা লাগিয়ে ঐ সূত্রের অপর মুখে একটি বঁড়শী লাগাতে হবে। ঐ বঁড়শী জামার পকেটে এমন ভাবে লাগাতে হবে যাতে ব্যাগ উঠানো মাত্র পকেটে টান পড়ে। এই ভাবে ছিনতাইকারী এবং পকেটমারদের কবল হতে আত্মরক্ষা করা সম্ভব।]

এইবার এদের অপপদ্ধতি সম্পর্কে অপর একটি উদাহরণ সম্বন্ধে এখানে বলা যাক—

"আমি একজন সওদাগরী আফিসের কেরানী। আমি আপন মনে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমি ঘাড়ের নীচে এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করি। বোলতা কামড়াল কিনা—তা অনুভব করার জন্যে পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়েছি মাত্র, এমন সময় কোথা থেকে একটা লোক এসে তাবিজ সমেত গলার সোনার হারটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। এর পর জামার কলারে আমি একটা পাতা দেখতে পাই। আমি পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারি উহা একটি বিছুটি গাছের পাতা।"

কোনও কোনও স্থলে মানুষের গাত্রে গোময় বা বিষ্ঠাও নিক্ষিপ্ত হয়েছে, এইরূপ বহু কাহিনীও শোনা গেছে। আধুনিক দুর্বৃত্তগণ এজন্যে ইরিটেণ্ট পাউডার ব্যবহার করে। প্রাচীনেরা এজন্যে ডেঁয়ো বা কাটপিঁপড়া ব্যবহার করেছে। এইজন্য বিবিধ জাতীয় পিপীলিকা এরা বাটীতে পুষেও থাকে। শিকারের [ভিক্‌টিম্] দৈহিক গঠন ও কৃষ্টি অনুযায়ী কম বেশি বিষাক্ত পিঁপড়া এরা ব্যবহার করে থাকে। সাধারণতঃ ব্যাঙ্ক বা পোস্ট আফিসগামী দরোয়ানদের নিকট হতেই দুর্বৃত্তরা এই উপায়ে নোটের বাণ্ডিল অপহরণ করে থাকে। তবে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

এই ছিন্নক চোরেরা যে কেবলমাত্র হার প্রভৃতি দ্রব্য ছিনিয়ে নেয় তা নয়, সুবিধামত তারা আধুনিকাদের হাত হতে ভ্যানিটি ব্যাগও ছিনিয়ে নিয়েছে। বুদ্ধিমত্তায় [মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানে] এই ছিন্নক চোরেরাও কম যায় না। এ সম্বন্ধে নিম্নে অপর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। এই সম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি হুজুর সাধারণতঃ নিউ মার্কেটে মেমসাহেবদের ব্যাগ ছিনিয়ে নিই। আমরা সেখানে মাত্র আট ঘটিকা হতে বারো ঘটিকার মধ্যে কাজ করি। একমাত্র ভ্যানিটি ব্যাগ ছাড়া অন্য কোনও দ্রব্য আমরা হরণ করি না। যে সকল মেমসাহেব অল্প দিন মাত্র বিলাত হতে এদেশে এসেছে কেবল মাত্র তাদেরই আমি আমার ঈপ্সিত শিকাররূপে বেছে নিই। আমি প্রথমে মেমসাহেবের গাল বা গণ্ডের দিকে লক্ষ্য করি। যদি তার গাল দুইটি অধিক লাল দেখি তা হলে আমি বুঝে নিই যে মেমসাহেব সবেমাত্র এদেশে এসেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক দিন থাকলে গালের এই লালচে ভাব কমে যায়। গণ্ডের মধ্যদেশে মনে মনে একটা বিন্দু এঁকে নিয়ে তার চতুর্দিকের লালাভার বিস্তৃতি হতে আমরা বুঝে নিই যে কতদিন ঐ মেমসাহেব ভারতে এসেছে। নবাগত বিধায় এই ধরনের মেম-সাহেবের হাত হতে ব্যাগ ছিনিয়ে নিলে তারা সহসা চীৎকার করে না। কিছুক্ষণ.অবাক হয়ে থেকে তারা অস্ফুটস্বরে 'উ-উ—' এইরূপ একটা শব্দ করে মাত্র। এই সুযোগে আমরাও সরে পড়তে পারি। এরা হঠাৎ পুলিশ ডাকে না। কর্তব্য ঠিক করতে এরা একটু সময় নেয়।

এ ছাড়া আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা এক দৃষ্টিতে বলে দিতে পারে যে কোন লোকটা ভীরু বা কোন লোকটা

সাহসী, কিংবা কে একা যাচ্ছে বা কার সঙ্গে অনেক লোক যাচ্ছে; এমন কি, কার কাছে কি দ্রব্য আছে তাও তারা অনুমান করে নেয়। এই ক্ষমতার জন্যে এদের আমরা গুণী বলি। কিন্তু যারা কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় তাদের আমরা বলি শেয়ানা। শেয়ানারা ব্যাঙ্কের কাউণ্টার, পোস্ট আফিস ও স্টেশন থেকে শিকার অনুসরণ করে। গুণীরা কিন্তু রাস্তায় এদের দেখেই শিকার বলে চিনে নিতে পারে।"

উপরের কাহিনীটি হতে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় অপরাধীরা কিরূপ 'স্পেসালাইজেশনের' পক্ষপাতী। এই স্পেসালাইজেশন বা একমুখী শিক্ষা এরা ব্যক্তি, কাল, স্থান ও দ্রব্যের পরিপ্রেক্ষিতে করে থাকে। অর্থাৎ (১) এরা শুধু নারী নয়, সদ্যাগত য়ুরোপীয় নারী, (২) অন্য কোনও দ্রব্যের বদলে শুধু ভ্যানিটি ব্যাগ, (৩) অন্য কোনও স্থান নয়, মাত্র মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, (৪) অন্য কোনও সময়ের বদলে মাত্র সকাল আট হতে বারো ঘটিকা তারা বেছে নেয়। কিন্তু য়ুরোপীয় বহু অপরাধীর মধ্যে ভারতীয় প্রাথমিক অপরাধীদের ন্যায় ভারসেটাই-লনেস্ বা বহুমুখী শিক্ষা দেখা গিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় তারাও সম্ভবতঃ য়ুরোপীয় প্রাথমিক অপরাধী। সাধারণতঃ প্রকৃত অপরাধীরাই তাদের কর্মপদ্ধতিতে এই একমুখিতা অবলম্বন করে।*

---

* একজন যদি বোটানি, জুলজি ও জিওলজি এই তিনটি বিষয়েই M. A. পাশ করে তাহলে বুঝতে হবে যে, সেই ব্যক্তি এই বিদ্যাত্রয়ের কোনটিকেই ভালবাসে না। যে জুলজিতে একমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত, তার বোটানি বা জিওলজিতে একমুখী হতে ইচ্ছাই যাবে না।

এই ছিন্নক চোরদের সংগঠন পূর্বকালে অতি উন্নত ছিল তৎকালীন জনৈক অধ্যাপকের নিম্নোক্ত বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে। একদা ইনি আমারই একজন অধ্যাপক ছিলেন।

"এই দিন অমুক রাজপথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে আমার কাঁধে ঝুলানো ছাতাটি নিয়ে অন্তর্ধান হল। ঐ স্থানে এক বস্তি সর্দারের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাকে অনুযোগ করাতে সে আমাকে একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঐ ঘরটিতে দেখি সারি সারি বহু ছাতা সাজান রয়েছে। কিন্তু আমার ছাতাটি সেখানে আমি দেখতে পেলাম না। ঐ কক্ষের অধিকারী তখন আমাকে বললে—বোধ হয় এখনও ছাতাটি এখানে জমা পড়ে নি। ঘণ্টাখানেক পরে এসে দেখবেন তো। এর পর আধঘণ্টা পরে সেখানে এসে দেখি আমার ছাতাটাও অপরাপর ছাতার পাশে সেখানে দাঁড় করানো আছে। আমি এও বুঝতে পারি যে, এই এলাকায় যা কিছু কাজ তা মাত্র এরাই করে থাকে।"

এমন বহু অপরাধী পূর্ব হতে খবর নেয় বাড়ির পুরুষরা কোন সময় বাড়ি থাকে না। এই সময় তারা নানা অজুহাতে গৃহিণীদের দুয়ার খুলতে অনুরোধ করে। কয়েক ক্ষেত্রে বাহিরের কোনও যুবক এসে বলেছে—মাসীমা, এক গ্লাস জল দেবে? তৃষ্ণার জল প্রদান এদেশের নারীরা ধর্মীয় কার্য মনে করে। এদের জলের গেলাসে হাত জোড়া থাকতে ঐ সময় এরা অসহায়। এই সুযোগে ঐ দুর্বৃত্ত তাদের গলার হার ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাটীর বা ফ্ল্যাটের মূল দরজাতে একটা 'পিপ্‌হোল' রাখলে একটা সুরাহা হতে পারে। এই সঙ্কীর্ণ গর্তে উঁকি দিয়ে এরা দেখতে পারে যে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কি না।

একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে এইরূপ অপকর্মের সুযোগ কম। কিন্তু অধুনা অনেকে উহা হতে অব্যাহতি পাবার পক্ষপাতী। এ কারণে কয়েক ক্ষেত্রে এদের অসহায় হয়ে পড়তে হয়। ভৃত্যচৌর্য এবং বহিঃচৌর্য হতে রক্ষা পেতে হলে উহার পুনঃ প্রবর্তন প্রয়োজন। পরিবারগুলির জন্য পৃথক পৃথক মহাল [ফ্ল্যাট] থাকলেও সকলের জন্য কমন পাচক চাকর সহ রসুই-এর ব্যবস্থা থাকলে খরচ কমে অন্য দিকে ওদের দলীয় ক্ষমতা ও নিরাপত্তা বাড়ে। এতে মেসিঙ এবং অন্য দিকে যথেষ্ট আর্থিক সাশ্রয় হয়। কয়েক বিষয়ে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা রেখে অন্য বিষয়ে যৌথ ব্যবস্থা রাখলে যৌথ পরিবারে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। কিন্তু এজন্য ওদের প্রত্যেক অংশীদারকে উদারচেতা ও সহনশীল হতে এবং তৎসহ পরশ্রী কাতরতা বর্জন করতে হবে। এই প্রকার যৌথ পরিবারগুলি রক্তাক্ত সম্পর্কের বদলে সমকৃষ্টির ভিত্তিতে গঠিত হলে উহা বহুকাল স্থায়ী হবে।

বহু বাহিরের ব্যক্তি যৌনজ ও অযৌনজ অপকর্মের উদ্দেশ্যে পারিবারিক বন্ধু সাজে। এরা অযাচিত ভাবে কোনও পারিশ্রমিক ব্যতিরেকে ক্রীতদাসের মত পরিবারের সকল ব্যক্তির সেবা করে। এই অবস্থাতে তারা এঘর ওঘর করলে বা এটা ওটা জিনিস নাড়াচাড়া করলে চক্ষুলজ্জার জন্য কেউ আপত্তি করতে পারেন নি। এই সুযোগে বৎসর কালের মধ্যে তারা ঐ বাড়ির বহু শখের দ্রব্যসহ মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করে।

উত্তোলক চোর

উত্তোলক চোরগণ তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) শকট উত্তোলক [Cart lifter], (২) বিপণি উত্তোলক [Shop lifter], এবং (৩) পশব উত্তোলক [Cattle lifter]।

শকট উত্তোলকদের [অপসারক] কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোনরূপ মার-প্যাঁচ নেই। অসতর্ক বা ঘুমন্ত গাড়োয়ানদের পিছনদিক থেকে শকট হতে মাল সরিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনওরূপ বাহাদুরী নেই। তবে, হ্যাঁ, এদের গতি অতি দ্রুত হওয়া চাই। সাধারণতঃ মন্থরগতি শকটাদি হতেই দ্রব্যাদি এরা অপহরণ করে থাকে। যেমন গো-শকট। শহরে একদল লোক আছে যারা ভোর রাত্রে শহরাগত তরকারীবাহী শকটের পিছন হতে তরকারী অপহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অশ্বযানের পিছনের রেকাবিতে উঠেও এরা ছাদ হতে দ্রব্য চুরি করেছে। কোনও কোনও অপরাধী এই শকট উত্তোলনের সুবিধার জন্যে সাইকেল ও মোটরাদি যানেরও সাহায্য নিয়ে থাকে। এর দ্বারা তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে আসা ও সেখান হতে অনুরূপ ভাবে সরে পড়ার সুবিধা আছে। এদের কেহ কেহ বাস ট্রাম প্রভৃতি দ্রুতগতি যানে আরোহীরূপে উঠে মালপত্র সরিয়ে নিয়েছে। তবে বহুক্ষেত্রে চালক প্রভৃতির সহিত এদের যে সড় থাকেনি তাও নয়।

বিপণি উত্তোলকদের কার্যপদ্ধতির মধ্যে কিন্তু অনেক বুদ্ধির মার-প্যাঁচ দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ উত্তমরূপ বেশভূষায় সজ্জিত

হয়ে দোকানে এসে হানা দিয়ে থাকে। মহিলা উত্তোলকগণ তাদের পরনের শাড়ির মধ্যে দ্রব্যাদি লুকাতে পেরেছে। এস্থলে একজন বিপণি উত্তোলকের একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি তাদের গেঞ্জির উপর একটা রবারের বেল্ট এঁটে তার উপর একটি শার্ট ও কোট চাপায়। দোকান হতে বস্ত্রাদি তুলে নিয়ে নিমেষে সেটি গেঞ্জির নীচে এরা ঢুকিয়ে দেয়। গেঞ্জির নিম্নাংশ রবারের [গোল] বেল্ট দ্বারা বেষ্টিত থাকায় উহা আর নীচে পড়ে না। এর ফলে অপরাধীটি হাত দুলাতে দুলাতে প্রকাশ্যেই বেরিয়ে আসতে পারে।"

যে সকল দোকানের খদ্দেরের সংখ্যা অত্যধিক, সেই সকল দোকানে বিপণি উত্তোলকেরা সাধারণতঃ হানা দেয়। অন্যান্য খরিদ্দারদের নিয়ে ব্যস্ত থাকাকালীন তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এরা কাজ হাসিল করে থাকে। বামালসহ ধরা পড়ার পর এরা নানারূপ মিথ্যা ভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে। এ সম্বন্ধে নিম্নের এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি বৌদির জন্যে কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম। দোকানদার বার-তেরখানি কাপড় দেখায়। কিন্তু কোনটিই আমার পছন্দ হয় নি। শেষে দোকানদার ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠে, এতগুলার পাট ভাঙলেন। আপনি নেবেন না মানে? আপনাকে এগুলো নিতেই হবে। এর পর তর্ক-বিতর্ক এবং গালি-গালাজও আরম্ভ হয়। অবশেষে দোকানদার 'মজা দেখাচ্ছি' বলে এই কাপড়টা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে থানায় ধরে এনেছে। আমি এই বিষয়ে একেবারেই নির্দোষ।"

এই বিপণি উত্তোলকেরা আইনানুসারে গৃহ চৌর্যের পর্যায়ে পড়ে থাকে। উহারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার মতে অভিযুক্ত হ'য়ে

থাকে। যে সকল অপরাধী গৃহ-বেষ্টনীর [enclosure] মধ্য হতে দ্রব্য চুরি করে তাদের গৃহ-চোরই বলা হয়। এর কারণ এই বিপণি সমূহও গৃহ মাত্র। তবে বহু বিপণি বা দোকান উন্মুক্ত স্থানে থাকে। এরূপ দোকান হাটে ও রাস্তায় দেখা যায়। ঐ সব দোকান হতে চুরি হ'লে ঐ চুরিকে গৃহ-চৌর্য বলা হয় না। উহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতে ব্যক্তির নিকট বা সন্নিকট হ'তে চুরি বলা হয়। শকট উত্তোলকগণ এই কারণে ঐ দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারা মতেই অভিযুক্ত হয়ে থাকে। গৃহ-আবেষ্টনীর মধ্য হ'তে স্বাভাবিকভাবে চুরিকে বলা হয় বাটীর চুরি বা গৃহ চৌর্য। ইংরাজিতে ইহাকে বলে হাউস থেফ্ট [house theft]। যে ভাবে মানুষ সচরাচর বাটীর মধ্যে যাতায়াত করে, সেইরূপ সোজা বা স্বাভাবিক পথে, গৃহে, দোকানে বা গুদামে প্রবেশ ক'রে কেহ ঐ সকল স্থান হ'তে দ্রব্যাদি চুরি করলে ঐ সকল চুরিকে বলা হবে 'গৃহ-চৌর্য'।

এই বিপণি উত্তোলক বা শকট উত্তোলক ছাড়া অপর আর এক-প্রকার উত্তোলক আছে। এদের পশু উত্তোলক [cattle thief] বলা হয়। নিম্নে জনৈক পশু উত্তোলকের বিবৃতি তুলে দিলাম।

"ছাগল চুরি সম্বন্ধে আমরা একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করি, যাতে করে ঐ ছাগল ডেকে উঠতে না পারে। আমরা গোটা কয় সরিষার দানা ছাগলের কানের মধ্যে ঢালি। এইরূপ অবস্থায় তারা কখনও ডাকে না। আমরা অভিজ্ঞতা হ'তে এইরূপ জেনেছি। কুকুর চুরির সময় সাধারণতঃ আমরা মাংসের টুকরা দেখিয়ে তাদের বাইরে এনে পশুগুলিকে করায়ত্ত করি। কখনও আমরা পোষা মাদী কুকুরেরও সাহায্য নিয়ে থাকি।"

কোনও কোনও স্বভাব দুর্বৃত্তজাতীয় ব্যক্তিরা এক অদ্ভুত উপায়ে

গবাদি পশু চুরি করে। নিম্নে ঐরূপ এক ব্যক্তির একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"গরু প্রভৃতি চুরি করবার সময় আমরা খড়ের একটি গাত্র-আচ্ছাদন [ক্লোক] বা পোশাক দ্বারা সারা অঙ্গ আবৃত করে নিই। এর পর আমরা চারণরত গবাদির সম্মুখে শুয়ে পড়ে বা বসে ধীরে ধীরে নিরালা স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকি। গরু আমাদের গাত্রের খড় খাবার জন্য আমাদের পিছু পিছু অগ্রসর হতে থাকে। এইভাবে প্রলুব্ধ করে পশুদের সুবিধাজনক স্থানে এনে তাদের অপহরণ করি। বাটীর মধ্য হ'তে গরু চুরি করবার সময় গৃহস্থ জেগে উঠলে আমরা ঐ খড়ের আচ্ছাদনসহ উঠানের খড়-গাদায় শুয়ে নিজেদের তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করি।"

উত্তোলক চোরেরা বহুবিধ মনস্তত্ত্ব ও জৈব জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ মৎস্য উত্তোলক বা মৎস্য চোরদের কথা বলা যেতে পারে। মৎস্য চোরেরা পুকুরের জলের উপরিভাগে রাত্রিযোগে আলোড়ন করে অর্থাৎ 'ঘাই মারে'। এর ফলে বহুক্ষণ উপরে উঠতে না পারায় পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাবে বহু মৎস্য আধমরা হয়ে জলের উপর ভেসে উঠে। ঐ চোরেরা তখন মৎস্য সকল হাতে ধরে উপরে তুলে আনে। কোনও কোনও মৎস্য ভয়ে পাঁকে মাথা গুঁজে ও তার ফলে পাঁকের গ্যাসে আহত হয়ে উপরে ভেসে উঠে। বহু মৎস্যকেই শ্বাস গ্রহণের জন্য যে মাঝে মাঝে উপরে উঠতে হয় তা এই সকল অজ্ঞ চোররাও জ্ঞাত আছে।

এ ছাড়া জাল পোলো বা ছিপ দ্বারাও যে রাত্রিযোগে মাছ চুরি করা না হয় তাও নয়। কিন্তু গৃহস্থগণ এর প্রতিষেধকরূপে পুকুরের তলায় কাঁটা ও বহু ডালপালা ও কঞ্চি ডুবিয়ে রাখায় সব সময় জালের

সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয় নি। এইজন্য অপরাধীরা উপরোক্তরূপ পদ্ধতি গ্রহণ ক'রে থাকে।

এই পশু চুরি গৃহ হ'তে সমাধিত হলে দণ্ডবিধির ৩৮০ এবং মাঠ বা পথ হ'তে চুরি হলে উহার ৩৭৯ ধারা মতে চোরেরা অভিযুক্ত হয়ে থাকে। বিপণি, শকট ও পথ হ'তে চুরি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার অপর কয়েক প্রকার গৃহ ও বহিঃ চুরি সম্বন্ধে বলা যাক।

এই চৌর্যকার্য অপরাধিগণ পোষা জন্তু-জানোয়ারদের সাহায্যেও সমাধিত করে থাকে। সাধারণতঃ পোষা কুকুর এবং বাঁদরের সাহায্যেই এই অপকার্য সমাধিত হ'য়ে থাকে· বেদিয়া প্রভৃতি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির ব্যক্তিগণ তাদের পোষা কুকুরদের এমন ভাবে শিক্ষিত ক'রে তুলে যে তারা অনায়াসে নর্দমা বা গবাক্ষের পথে বা উন্মুক্ত দুয়ারের মধ্য দিয়ে গ্রাম্য গৃহস্থের গৃহে ঢুকে সুবিধামত জামা কাপড় বা থালা বাসন মুখে করে বেরিয়ে এসে ঐ অপহৃত দ্রব্য সকল মনিবদের নিকট প্রত্যর্পণ করে। কয়েক ক্ষেত্রে শিক্ষিত ভোঁদড় দ্বারাও মৎস্য চুরি সহজসাধ্য করা হয়েছে। অপরদিকে শহরাঞ্চলেও বিশেষ করে কলকাতা শহরে এইরূপ অপকার্যের জন্যে অধিক ক্ষেত্রে বাঁদরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কলকাতা শহরের চৌরঙ্গী রাজপথে ফুটপাথের উপর শ্বেতাঙ্গ পথিকদের উপর এইরূপ বহু উপদ্রব সংঘটিত হয়েছে। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে এই অপপদ্ধতির প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাবে।

"আমি একজন কলিকাতায় নবাগত ইংরাজ নাগরিক। এই দিন আমি আমার মেমসাহেবকে সঙ্গে করে চৌরঙ্গী রাস্তার পূর্বদিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কোথা হতে দুই-দুইটা বাঁদর ছুটে এসে আমাদের কাঁধের উপর চড়ে বসল।

ওদের বড় বাঁদরটি আমার কাঁধে এবং ছোটটি আমার মেমসাহেবের কাঁধে জেঁকে বসেছিল। আমরা হস্ত দ্বারা ঝট্‌কানি দিয়ে তাদের অতিকষ্টে অপসারণ করি। রাস্তার অপর ফুটপাথে দুইজন এদেশীয় ব্যক্তি চেন ও বগলস হাতে অপেক্ষা করছিল। বাঁদরদ্বয় এর পর ছুটে গিয়ে তাদের পায়ের তলায় বসে পড়ল। প্রথমে আমরা এর মধ্যে সন্দেহজনক কিছু মনে করি নি। বরং এটাকে আমরা বাঁদরের বাঁদরামী মনে করে হেসে ফেলেছিলাম। কিন্তু কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমি লক্ষ্য করি যে, আমার বুক পকেট হতে দুইটা দামী ফাউণ্টেন পেন অপহৃত হয়েছে। এই সময় আমার মেমসাহেবও উপলব্ধি করলেন যে তাঁর হাতের রিস্টওআচ্‌টিও তারা টেনে খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

অপসারক চোররা রবার দস্তানা পরে রাজপথের ও রেলওয়ের ইলেকট্রিক ফিটিঙ, গ্যাস এবং ওআটার পাইপের পার্টস এবং অন্য আসবাবপত্রের অংশ চুরি করে জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি করে। অধিক ক্ষেত্রে এরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার চুরি করে জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি করে। বহু ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর ছদ্মবেশেও এরা তামার তার চুরি করেছে।

এরা টেলিগ্রাফের তামার তার কাটার জন্যে মই-এর বদলে একটি অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। এই যন্ত্র সংলগ্ন দণ্ডটি রশিসহ ঠেলে উপরে তুলে নীচে দাঁড়িয়ে ঐ দুমুখো কাঁচি সম যন্ত্র দ্বারা ঐ তার কাটা যায়।

গৃহ-চোর

কলকাতা শহরে লক্ষ লক্ষ বাটী আছে অথচ একটি বিশেষ দিন ও সময়ে একটি বিশেষ বাড়িতেই বা চুরি হল কেন? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই গৃহস্থ লোকের মনে জেগে থাকে। এছাড়া গৃহমধ্যকার মূল্যবান দ্রব্যাদি রক্ষার গুপ্তস্থানগুলিরই বা তারা কোথা হ'তে সন্ধান পেল? মালিকেরা কেউ যে ঐ দিন গৃহে থাকবে না—এই সংবাদই বা তারা কিরূপে জানতে পেরেছে? এই সকল একান্ত রূপে পারিবারিক ব্যবস্থার সংবাদ তারা জানলো কি করে? এ প্রশ্নও ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের মনে বারে বারে জেগে থাকে। আসলে বিষয়টি হয় এইরূপ,—কোনও বাড়িতে চুরি করতে মনস্থ করলে পেশাদারী চোর মাত্রই প্রথমে সুড়ুক সন্ধান নিয়ে থাকে। বিশেষরূপে সন্ধান না নিয়ে এরা কেহ কাজে অগ্রসর হয় না। এই সব সন্ধান তারা বাড়ির চাকর, বা বখাটে [বিপথগামী] ছেলেপুলেদের কাছ থেকেই নিয়ে থাকে। এই সকল চোরেরা বা তাদের নিযুক্ত চরেরা পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রায়ই খোলা যায়গায় বা রকের উপর বসে তাস বা ঘুঁটি খেলতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দুপুর বেলায় বাটীর চাকর-বাকরদের কাজকর্ম থাকে না। এই সময় এরা বাইরে এলে চোরেরা এদের সঙ্গে আলাপ জমায়। এমন কি এরা এদেরকে নিজ খরচে খাওয়ায় এবং সুবিধামত তারা তাদের সিনেমাও দেখিয়ে থাকে। কেহ কেহ এদের কিছু কিছু অর্থ ধার বা দান স্বরূপও দিয়েছে। এই সকল চাকরদের নিকট হ'তে চোরেরা খোঁজখবর

[গল্পের মধ্যে] প্রথমে সম্যকরূপে জেনে নেয়। কখনও কখনও এই সকল চাকরেরা সাক্ষাৎরূপে এদের সাহায্যও করে থাকে। ধীরে ধীরে এদের লোভ বর্ধিত হওয়ার কারণে এইরূপ সম্ভব হয়। এই সময় মাত্র সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে এই চাকরদের কেহ কেহ চোরদের জন্যে রাত্রে বাটীর দরজাগুলি খুলেও রেখে দিয়েছে।* এই চাকরদের সংবাদমত এই গৃহ-চোরেরা যে সকল বাক্সে বা পেটিকায় মূল্যবান দ্রব্যাদি ন্যস্ত আছে, মাত্র সেই সেই বাক্সো প্যাটরা ও আলমারি তারা ভাঙ্গে ও তা থেকে দ্রব্য অপহরণ করে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ হাসিল না করতে পারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে এইরূপ বিলি-ব্যবস্থা না করে বাইরের চোরেরা কোনও গৃহে দ্রব্যাপহরণের কারণে কদাচিৎ প্রবেশ করে। তবে বাড়ির ভিতরের চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। চাকর বা অন্যান্য ব্যক্তি বা আত্মীয়বর্গের মধ্যে যারা বাটীতে বাস করে কিংবা যারা সাধারণতঃ ঐ বাটীতে যাতায়াত করে তাদের দ্বারা কোনও চুরি সমাধিত হলে উহার জন্য দায়ী ঐ চোরদের ভিতরের চোর বলা হয়। ভিতরের চোরদের মধ্যে চাকর-চোরেরা অন্যতম। এ কারণে চাকর হিসাবে চুরির জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি পৃথক

---

* ধরা পড়ার পর এই চাকরদের কেহ কেহ অপরাধ স্বীকার করলেও আসল চোরেদের নাম বা ঠিকানা সম্বন্ধে কোনও কিছুই জানাতে অক্ষম হয়। আসলে চোরেরা তাদের নামধাম সম্বন্ধে এদের বলে না। তারা তা তাদের বললেও ভুল খবর দিয়ে থাকে। অনেক সময় পাওনা বা হিস্যা নেবার জন্যে চোরেদের প্রদত্ত ঠিকানায় এসে এরা তাদের কোনও খোঁজ-খবর পায় নি।

ধারা আছে। চাকর চোরদের ঐ দণ্ডবিধির ৩৮১ ধারায় অভিযুক্ত করা হয়। চাকরেরা বাহিরের কোনও ব্যক্তির সম্পর্ক রহিত ভাবে মনিবের দ্রব্যাপহরণ করলে তাদেরই বলা হয় চাকর-চোর। চাকর-চোরদের সম্বন্ধে পরে বলা হবে। এক্ষণে এই গৃহচোরদের সম্বন্ধে আরও কিছু বলা যাক। নিম্নে একটি গৃহ-চোরের বিবৃতি তুলে দিলাম। বিবৃতিটি হ'তে গৃহ-চোর সম্বন্ধে কিছুটা বুঝা যাবে।

"আমাকে হীরু সর্দার প্রথমে পানের সঙ্গে কোকেন খেতে শেখায়। এই নেশার খাতিরে প্রত্যহই আমি তার সঙ্গে দেখা করতে বাধ্য হই। সর্দারজী আমাকে বায়স্কোপ দেখবার জন্যে প্রায়ই পয়সা দিত। তদুপরি আমাকে সে নানারূপ কু-অভ্যাসও শেখায়। এছাড়া সর্দারজী আমাদের জন্যে কয়েকটি মেয়েও এনে দেয়। আমাদের শিক্ষার জন্যে সর্দারজীর স্বগৃহে একটা স্কুলও ছিল। এইখানে আমরা তালা চাবি তৈরি করতে ও খুলতে শিখি। এর পর এই বিষয়ে আমাদের পরীক্ষার দিন ধার্য হয়। সর্দারজী আমার হাতে একটা কাপড় কাচা সাবান দিয়ে বলেন, 'যা দিকিনি বাড়ি গিয়ে মা'র আঁচল থেকে সিন্দুকের চাবিটি খুলে তার একটা ছাঁচ নিয়ে আয়।' আমি বাটী গিয়ে সুবিধামত মায়ের চাবিটা সাবানের নরম অংশে ঢুকিয়ে দিয়ে ছাঁচ তৈরি করি। সর্দারজীর ডেরায় এই ছাঁচ থেকে চাবি তৈরি হয়। এর পর একমাসের জন্যে আমি মামার বাড়ি চলে যাই। কিন্তু ফিরে এসে শুনি মায়ের সিন্দুকের যাবতীয় গহনাপত্র চুরি গেছে।"

[ভৃত্যচোররা দ্রব্যাদি চুরি করে প্রথমে উহা বাড়ির ভিতরের গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে রাখে। ইলেকট্রিক মিটার বক্স, কয়লার গাদা, জলের ট্যাঙ্ক ও নর্দমা প্রভৃতি ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। কয়দিন পর সন্দেহ মুক্ত

হলে ওরা ঐ দ্রব্য বাহিরে পাচার করে। দ্রব্য চুরির সাথে ভৃত্যের পলায়ন সন্দেহের বিষয়। এই জন্য উহারা ঐরূপ ব্যবহার করে।]

গৃহ-চোরেরা ব্যক্তি বা বস্তুর উপর কোনওরূপ আঘাত হানে না। কয়েক ক্ষেত্রে এরা সুযোগ মত দিনের বেলাতে সহজ ভাবে বাড়ি ঢুকে কোনও গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে রাত্রে দ্রব্য চুরি করেছে। এরা নানারূপ কৌশলের সাহায্যে গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ ক'রে দ্রব্য অপহরণ করে। এই সম্বন্ধে নিম্নে দুইটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল। এই বিবৃতি হতে এদের অপপদ্ধতির ধারা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারবে।

"বাইরের ঘরে বসেছিলাম এমন সময় যন্ত্রপাতিসহ একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে বলল, বড়বাবু তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইলেকট্রিক পাখাটা তেল দিতে এবং মেরামতও করতে। এর পর মিস্ত্রিটি তার দুইজন সহকারীর সাহায্যে কাজে লেগে যায়। আমি অনেকক্ষণ ধরে এদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। এই সময় মিস্ত্রিটি একটুকরা ছেঁড়া নেকড়া এনে দেবার জন্যে অনুরোধ জানায়। সহকারী লোকটি এক গেলাস জলও খেতে চায়। কিছুক্ষণ পরে আমি ন্যাকড়া ও জল নিয়ে ফিরে এসে দেখি যে ঘরের ইলেকট্রিক পাখা, রেগুলেটার ও বাল্ব কয়টি অপহরণ করে দুর্বৃত্তরা উধাও হয়েছে।"

[এই বিশেষ অপরাধকে বলা হয় মিশ্র অপরাধ। এইখানে চুরির সহিত মিশান আছে প্রবঞ্চনা। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে এরা পরে চুরি করে পালিয়ে যায়।] এইবার অপর বিবৃতিটি সম্বন্ধে বলা যাক। অপরটিকে চুরি না বলে জুচ্চুরী বলাই ভাল।

"আমার পুত্র 'অমুক' বার হয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার

পুত্রের সমবয়স্ক একটি ছেলে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, অমুক বাড়ি আছে ?' ছেলেটি আমার পুত্রের সহপাঠী বলে পরিচয় দেয় এবং জানায় যে আমার পুত্র পড়বার জন্যে তার একখানা বই এনেছে। ঐ বইটা এক্ষুনি প্রফেসারের কাছে না নিয়ে গেলে বিশেষ ক্ষতি হবে। এমন করুণ ভাবে সে বাক্যজাল বিস্তার করে যে আমি তার প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করি। আমি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'তা বাবা! আমি তো সব বই চিনি না। ঐ টেবিলটায় ওর বই-টই থাকে। ওখানে দেখে নাও না তুমি।' ছেলেটি এর পর টেবিল থেকে তিনখানি বই তুলে নিয়ে একটি পত্র আমার পুত্রের নামে লিখে আমার হাতে দেয় এবং এর পর আমার পায়ের ধূলা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করে। ঘণ্টাখানেক পরে আমার পুত্র ফিরে এলে সকল সমাচার অবগত হয়ে অবাক হয়ে যায়। প্রকৃত বিষয় বুঝে আমিও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ি। বুঝতে পারি আগে-ভাগে আমার পুত্রের নাম ও কলেজ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ছেলেটা আমায় ঠকিয়ে গেছে।"

যে কোনও গৃহ-চোরেরা বাটীর তালা বা গরাদ ভেঙে, নর্দমা গলে বা পাঁচিল ও ছাদ ডিঙিয়ে অপকর্মের জন্যে গৃহে প্রবেশ করলে তাদের বলা হয় সিঁদেল চোর, তালা তোড় বা সবল চোর। এরা এমন সব পথ দিয়ে [বা এমন ভাবে পথ ক'রে] গৃহস্থদের গৃহে প্রবেশ করে, যেরূপ ভাবে সাধারণতঃ কেহ ঐ সব গৃহে প্রবেশ করে না। আইনানুসারে এই সব চোরেরা ঐ ভাবে সর্বাঙ্গ প্রবেশ না করিয়ে মাত্র তাদের হাত বা পা [দেহের অংশ বিশেষও] কোন গৃহে প্রবেশ করালেও তাকে সবল বা সিঁদেল চোর বলা হয়। অর্থাৎ কেহ রাস্তা হতে জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে বস্ত্রাদি বার করলেও তাকে

সিঁদেল চোর বলা হবে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এই সিঁদেল চোরদের সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করা হবে।

[অধুনা প্রাথমিক অপরাধীরা টেলিফোনে কোনও বাড়িতে জানায় যে তাদের অমুক পুত্র বা কন্যা এক্সিডেণ্টের কারণে সাঙ্ঘাতিক ভাবে আহত হয়ে অমুক হাসপাতালে নীত। বেশিক্ষণ সে বাঁচবে না। বাড়ির প্রত্যেকে তাকে শেষ দেখার জন্য তালা বন্ধ ক'রে হাসপাতালে গেলে ঐ তালা ভেঙে দুর্বৃত্তরা সহজে দ্রব্যাপহরণ করেছে। এক্ষেত্রে তারা বাড়ির পুত্র বা কন্যার নামটি পূর্বাহ্নে জেনে নিয়ে থাকে।]

কোনও কোনও অপরাধী রাস্তা হতে লোহার শিক বা লম্বা আঁকশির সাহায্যেও জানালার ওপার হতে প্রায়ই দ্রব্যাদি বার করে নেয়। অনেক সময় জানালার ধাবে তক্তপোশ বা খাটিয়ার উপর সালঙ্কারা কন্যা বা বধূরা শুয়ে থাকেন। জানালার গরাদের ভিতর হাত ঢুকিয়ে এই সব ঘুমন্ত কন্যা বা বধূদের হাত হতে অলঙ্কারাদিও এবং খুলে নিয়েছে। এইরূপ বহু কাহিনীও এদেশে শুনা গেছে। এইগুলিকে গৃহ-চুরি না বলে সিঁদেল চুরিই বলা উচিত।]

লস্‌ট রিলেশন

লস্ট রিলেশন ট্রিক বা "আত্মজনের পুনরাগমন" পদ্ধতি দ্বারাও পল্লী অঞ্চলের অপরাধিগণ সরলমনা পল্লীবাসীদের অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এই পদ্ধতিকে 'হারানো ছাওয়াল" [পুত্র] পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। এরা প্রথমে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে নেয় কোনও পল্লীবাসীর কোনও পুত্র বহুকাল পর্যন্ত নিরুদ্দেশ আছে কি'না। বিশ বা ত্রিশ বৎসর পূর্বে এইরূপ কোনও পুত্র কাহারও হারিয়েছে জ্ঞাত হওয়া মাত্র এদের একজন ঐ পুত্রের অভিভাবকদের নিকট এসে নিজেকে তাদের সেই হারানো পুত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরা ঐ ছেলেটির ছোটবেলায় ঘটেছে এমন অনেক কাহিনীও তাঁদের শুনিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এই সব কাহিনী তারা খোঁজ-খবর নিয়েই জ্ঞাত হয়ে থাকে। এর পর ঐ পরিবারের সকলেই তাকে আদর-যত্নে আপ্যায়িত করতে থাকে। এই সময় দুর্বৃত্তটি সকলকে জানায় যে সে কি ভাবে এতদিন কোন্ কোন্ সাধুর সঙ্গে কোথায় কোথায় দিন যাপন করেছে। সেই সম্বন্ধে নানারূপ কল্পিত কাহিনী সকলকে এরা শুনাতে থাকে। এই সময় সে এও জাহির করে দেয় যে, সে এমন এক মন্ত্র শিখেছে যাতে সে এক ভরি সোনাকে দু ভরি করে তুলতে সক্ষম। পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই তাকে বিশ্বাস ক'রে স্ব স্ব সোনা-দানা এনে তার হাতে সেগুলি সরল বিশ্বাসে তুলে দেয়। দুর্বৃত্তটি তখন প্রতিশ্রুতি মত যাগযজ্ঞ শুরু করে দেয়। এই সোনা দ্বিগুণ করবার জন্যে দুর্বৃত্তটি ঐগুলি বিল্বপত্র ও ফুলের তলায় রেখে

দেখে এবং পরে সুযোগ মত সে ঐগুলি ঐ স্থান হ'তে সকলের অজ্ঞাতসারে তুলে নিয়ে রাত্রিযোগে পলায়ন করে থাকে।

শহরের লোকেরা কিন্তু পল্লীগ্রামের লোকদের ন্যায় সরল প্রকৃতির নয়। এই সব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে তারা বিশ্বাসীও নয়। এই জন্যে শহরবাসীদের দ্রব্যাদি অপহরণের জন্যে দুর্বৃত্তরা ভিন্নরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রে থাকে। কারণ, সর্বপ্রধান প্রশ্ন হয় 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। শহরে চোরেরা কতদূর ধূর্ত হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমরা কোনও এক আমেরিকান ডিপোতে কাজ করতাম। এই ডিপোর প্রতি গেটেই আমেরিকান পুলিশরা পাহারা দিত। এদের নজর এড়িয়ে কোনও দ্রব্যাদি বাইরে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। আমরা তখন দ্রব্য চুরি করবার একটি সুচতুর মতলবের আশ্রয় নিই। আমাদের মধ্যে একজন ধরা পড়া চোরের অভিনয় করত। কিন্তু বাকি সকলে কি করতো জানেন? তারা এই চোরের মাথায় চোরাই দ্রব্য চাপিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে গেটের নিকট এনে সৈনিক পাহারাদের সম্বোধন করে বলতো, 'সাহেব! এই এক বেটা চোরকে বামাল শুদ্ধ ধরেছি। ওকে এবার থানায় ধরে নিয়ে যাব।' শাস্ত্রী সাহেবেরা, 'ঠিক হ্যায়। লে যাও থানে মে,' বলে আমাদের বামাল শুদ্ধ গেট পার করে দিত। এর পর এ বিষয়ে কে আর কার খবর রাখে। আমরা বাইরে এসে খাউ বা বামাল-গ্রাহকদের কাছে এই সব দ্রব্য বিক্রি করে দিয়ে বাড়ি ফিরতাম।"

আজকাল স্থান বিশেষে এক অদ্ভুত প্রকারের অপকর্মের কথা শুনা যাচ্ছে। শহরের এই সকল অঞ্চলে এমন সব লোক বাস করে যাদের বুদ্ধিমত্তা পল্লী অঞ্চলের লোকের মত সংস্কারাচ্ছন্নও নয়। আবার

শহরের অধিকাংশ লোকের স্থায় এরা অত্যন্তরূপ চৌকসও নয়। এদের বুদ্ধিমত্তা পল্লী এবং নগরবাসী ব্যক্তিদের বুদ্ধিমত্তার মাঝামাঝি ; এদের মধ্যম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিও বলা চলে। এই সকল ব্যক্তিদের বিভ্রান্ত করে অর্থাপহরণ করবার জন্মে এদের বুদ্ধিমত্তা [বুদ্ধির দৌড়] অনুযায়ী অপপদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। নিম্নেব বিবৃতিটি হতে উক্ত প্রকার কর্মপদ্ধতিটি সম্বন্ধে বুঝা যাবে। বিবৃতিব [হিন্দি] বাংলা তর্জমা নিম্নে প্রদত্ত হল।

"আমার পতি [স্বামী] বেরিয়ে যাবার পাঁচ ঘণ্টা পরে একজন মাড়োয়ারী এক ঝুড়ি আম নিয়ে বাড়ি ঢুকল। আমের ঝুড়িটি আমার সম্মুখে রেখে সে বলেছিল, 'মাজী ! এই ফল বাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর বলে দিয়েছেন আপনার হাতের বাজু আর গলার হারটা নিয়ে আসতে। ওগুলো দোকান হতে পালিশ করে নিয়ে আসবেন তিনি।' আমি তার কথায় অবিশ্বাস করি নি। আমি নিঃসন্দেহে তার হাতে গহনাগুলি তুলে দিয়েছিলাম।"

কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেকে হঠাৎ মূল্যবান সোনার গহনা এদের খুলে দেয় নি। কিন্তু গহনার বদলে রিপু করবার বা কাচাবার জন্মে শাল বা বস্ত্রাদি চাইলে দুর্বৃত্তরা সহজেই তা করায়ত্ত করতে পেরেছে।

এদেশের স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে বহু জাতি আছে কেবলমাত্র চুরি ডাকাতির দ্বারা জীবন যাপন করে। এদের এক একটি দল এক এক পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা চৌর্য কার্য করে। ইরানী জিপসী এবং সন্দার জাতীয় পুরুষেরা চৌর্য কার্যের জন্মে প্রায়ই কোনও দোকানে এসে দোকানদারের সহিত কলহে লিপ্ত হয়। ইত্যবসরে এই দলের মেয়েরা দোকানের দ্রব্যাদি বেমালুম

ভাবে চুরি করে বস্ত্রাচ্ছাদন মধ্যে লুকিয়ে ফেলে। এই সকল স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে সানুরিয়া ব্রাহ্মণ, চন্দ্রবেদী নামে এক জাতি আছে। এই জাতির লোকেরা এক অদ্ভুত উপায়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ঠকিয়ে থাকে। এদের মধ্যে একজন স্নানের ঘাটের নিকট হঠাৎ একজন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুকে ছুঁয়ে দিয়ে বলে উঠে, 'ক্ষমা করবেন ঠাকুর, হঠাৎ আপনাকে ছুঁয়ে ফেলেছি। আমি সামান্য একজন মেথর, যেন অকল্যাণ হয় না আমাদের' ইত্যাদি। এর পর ঐ উচ্চ-বর্ণের হিন্দু ভদ্রলোকের স্নান করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এদিকে দ্রব্যাদি ঘাটের চাতালে রেখে ভদ্রলোক জলে নামামাত্র, দুর্বৃত্তটি দ্রব্যাদি চাতাল থেকে তুলে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে। কখনও কখনও এরা বিষ্ঠার হাঁড়ি নিয়েও ভদ্রলোকদের ছুঁয়ে দেয়, উদ্দেশ্য যেন তেন প্রকারেণ তাদের স্নান করানো—উপরের পাড় হতে দ্রব্য চুরি করবার সুবিধার জন্যেই এরা এইরূপ করে থাকে। এরা কোন মহিলাকে পুষ্করিণী বা নদীর পাড়ে দ্রব্যাদি পাহারায় নিযুক্তা দেখলে এমন ভাবে মল বা মূত্র ত্যাগ করতে বসে, যাতে ক'রে মহিলাটি লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হয়; ইত্যবসরে দলের অপর আর একজন ঐ দ্রব্যাদি তুলে নিয়ে এক ছুটে পালিয়ে যায়।

এই চন্দ্রবেদী জাতিরা ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিকে উপরিউক্ত ভাবে বিভ্রান্ত করলেও এরা নিজেরা উচ্চশ্রেণীরই হিন্দু, কিন্তু এরা এদের গোষ্ঠীর মধ্যে এক চামার ও ঝাড়ুদারদের ছাড়া সকল শ্রেণীর হিন্দু-দেরই গ্রহণ করে থাকে। এমন কি মুসলমানদেরও গ্রহণ করতে এদের বাধা নেই। বর্ণহিন্দুদের এই অস্পৃশ্যতা দোষের সুযোগ কোনও কোনও শহরের লোকও নিয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে একজন শহর-বাসী ছোকরার বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"কিছুদিন পূর্বে আমরা দুইজন একটি টি-পার্টি'তে আহূত হয়েছিলাম। আমরা একটি টেবিলে দুইজন টিকিধারী ব্রাহ্মণকে বসে থাকতে দেখে ঐ টেবিলের পাশে স্তত অপর দুইটি চেয়ার দখল করে বসলাম। টেবিলে খাদ্যসহ চারিটি মাত্র রেকাবি রাখা ছিল। আমরা তখন লোক দুইটিকে শুনিয়ে কথোপকথন শুরু করলাম। আমি আমার বন্ধুকে উদ্দেশ করে বললাম, 'জাতিভেদ ভাই একটা পাপ বিশেষ। এই তুই তো ব্রাহ্মণ আর আমি হচ্ছি দুলে বাগ্দী [অচ্ছ্যুত]'—এই পর্যন্ত শুনামাত্র ভদ্রলোক দুজন একটু নড়ে বসলেন। তারপর রেকাব দুটিতে আর হাত না দিয়ে উঠে পড়লেন। এই সুযোগে আমরাও হুপাহুপ করে চারটি রেকাবের খাবার সাবড়াতে আরম্ভ করলাম। তবে আমরা মুখে এসব বললেও আমরা দু'জনেই আসলে ব্রাহ্মণ সন্তানই ছিলাম।"

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে এমন দুই একটি দল আছে যাদের পুরুষরা [প্রাপ্তবয়স্ক] নিজেরা চুরি করে না। তাদের নির্দেশে চুরি করে তাদের ছোট ছোট ছেলেরা। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে বড়রা এসে ঐ সকল ছেলেদের মার-ধোর করে এবং ফরিয়াদীদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে ছেলেগুলিকে মুক্ত করে নেয়। এই সকল দলের কেহ-কেহ সাধু-সন্ন্যাসী সেজেও ঘুরা-ফেরা করে। কেহ কেহ ধরা পড়ার পর নির্বোধ বা পাগলের মতও অভিনয় করে থাকে। কেপমারী দলের ছেলেরা ধরা পড়লে প্রায়ই মূক বা বোবা সাজে। এরা অদ্ভুত উপায়ে এদের জিহ্বা উপরে বা নিম্নে গুটিয়ে নেয়। এমন ভাবে এরা তা করে যাতে তাদের বোবাই মনে হবে। বহু অভ্যাস ও কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ঐ কৌশল তারা আয়ত্ত করেছে। কোনও কোনও সময় এরা ফকিরের বেশে কোনও দোকানে এসে জিনিস কেনবার অছিলায়

করদ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রা প্রদান করে। দোকানদার এই মুদ্রা গ্রহণে অসম্মত হলে সে আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তা'হলে কি এদেশের মুদ্রা ভিন্ন প্রকারের?' এই বলে সে তাদের কাছে তা দেখতে চায়। দোকানদার প্রচলিত একটি রৌপ্য মুদ্রা দেখবার জন্যে তার হাতে তুলে দিলে সে তৎক্ষণাৎ হাত-সাফাই-এর সাহায্যে উহা সরিয়ে নিয়ে ঐ স্থলে একটি জালি মুদ্রা আনে। ঐ মুদ্রাটিই সে দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে থাকে। এই দুর্বৃত্ত জাতিসকল এবং তাদের বিভিন্ন প্রকার অপপদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে পুস্তকের অষ্টম খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এক্ষণে অন্যান্য চৌর্য পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা ক'রে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক।

সবল চোর

সিঁদেল চুরি ভারতের এক প্রাচীনতম অপরাধ। ইংরাজিতে উহাকে বারগলারি বলা হয়ে থাকে। অপরাধীরা ইহাকে 'তালা-তোড়, গামছামারী ও চাবির কাজ [কাম]' নামে অভিহিত করে। এই সিঁদমারী ও ডাকাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে পূর্বে গৃহস্থ বাটীগুলি দুর্গাকারে তৈরি হতো। এজন্য ধনীরা খাড়া পাহাড়ের উপর বাটী তৈরি করতেন। কিন্তু ঐ যুগে খাড়া পাহাড়ে উঠতে এরা শিকল-বাঁধা গোহাড়গিল জীবের সাহায্য নিতো। একালে এরা এ কাজে বহু-বিধ ভাঙন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু এযুগে হালক্যাশানের

বাটীগুলি খোলা-মেলা হয়। ফলে সব ক্ষেত্রে এদের ভাঙাভাঙি করতে হয় না। এই ভাঙাভাঙির কাজ বহু প্রকারের হয়ে থাকে।

(১) সিঁদমারী—সিঁদকাটির সাহায্যে দ্বিবাল খুঁড়ে গর্ত করা হয়। এরা প্রথমে ঐ গর্তের মধ্যে পা বাড়ায়। বহু গৃহস্থ ঠুকঠাক শব্দে জেগে উঠেছে ও কোপ মেরে তার পা' দুখান করেছে। এতে পূর্ব চুক্তিমত দলের লোক তার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এতে ঐ ব্যক্তিকে কেউ সনাক্ত করতে পারে নি। ফলে, সমুদয় দলটি ঐ কারণে ধরা পড়ে নি। কোঠা বাড়িতে সাধারণতঃ দুয়ারের পাশে ঐ গর্ত করা হয়ে থাকে। উহাকে বগলী সিঁদ বলা হয়ে থাকে। এই গর্তে হাত বা বাঁকা শিক্ ঢুকিয়ে খিল খুলা হয়। দুই স্তর ইট বা মাটির দ্বিবালের [মেটে বাড়িতে] মধ্যে একটা করে করোগেটেড্ টিন রাখলে গর্ত কাটা যায় না। কয়েক ক্ষেত্রে ছাদ ফুটো করে এরা দড়ি ধরে ঘরে নেমেছে। কিন্তু ঐরূপ কার্য খালি দোকান ঘরেতে সম্ভব। বাড়িতে শিক্ষিত কুকুর থাকলে ইহাতে অসুবিধা হয়। কিন্তু ঐ কুকুরকে দিনের বেলা লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে রাত্রে ছাড়তে হবে।

(২) চাড়-বাজী—এই পন্থাতে দুয়ারের উভয় পাল্লার মধ্যে পাতলা ছুরি, লৌহ পাত ঢুকিয়ে দুয়ারের পাল্লাদ্বয় ফাঁক করা হয়। কখনও দুই হাতের মোক্ষম ও সতর্ক চাপেও ঐ কাজ সমাধা হয়। পরেতে রুটি কাটা করাতের দাঁতে আটকে ভিতরের খিল নিঃশব্দে ধীরে নীচে নামানো হয়।

(৩) তুরপুনি—এই পন্থাতে বিবিধ তুরপুনের সাহায্যে দ্রুত গভিড়ে দরজার পাল্লাতে ঠিক খিলের উপরে ফুটা করা হয়। এই ফুটাতে বাঁকা তার বা শিক ঢুকিয়ে ধীরে খিল খুলা ও নামানো হয়।

পলায়নের সুবিধার জন্য প্রায়ই এরা যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ঘটনাস্থলে ফেলে যায়। উপরোক্ত এক একটি পদ্ধতি এক এক বারগ্লারদল দ্বারা গৃহীত হয়।

প্রতিষেধক রূপে দুই পাল্লার দুই প্রান্তে দুটি শক্ত [বড়] ছিট-কিনি ও তৎসহ খিল লাগালে দুয়ার খুলা শক্ত হয়। ঐ ক্ষেত্রে চাড়বাজীতে বা অন্য ভাবে দুয়ারের পাল্লাদ্বয় ফাঁক করা যায় নি। অতিরিক্ত আঘাত করলে শব্দ হয় এবং গৃহস্থ জেগে উঠে। দুয়ারের পাল্লাদ্বয়ের উপরাংশের ন্যায় উহাদের নিম্নাংশেও ছিটকানি থাকলে আরও ভালো। অন্ততঃ মূল্যবান দ্রব্য সম্বলিত একটি ঘর ঐরূপে সুরক্ষিত রাখা ভালো। দুয়ারের পিছনে টিনের পাত লাগানো সর্বোত্তম।

[পূর্বে বাড়িগুলির চওড়া দিবালের মধ্যে ফসস্ দিবাল থাকতো ঃ অর্থাৎ উহাদের মধ্যস্থলে কিছুটা ফাঁক থাকতো। দিবাল বেশি চওড়া মনে হতো—কারণ বাহির হতে এই ফাঁক বা ফাঁকি বুঝা যেতো না। মধ্যে এই এয়ার স্পেশ থাকাতে ঘর ঠাণ্ডা থাকতো এবং তৎসহ দিবাল ভাঙা বা তা ফুটা করা সম্ভব হতো না।

লাইব্রেরি, পার্লার, ক্লোক রুম প্রভৃতি সহ লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে মানুষ বাসগৃহ নির্মাণ করে। কিন্তু মাত্র অতিরিক্ত দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করে কেউ তৎসহ একট স্ট্রং রুম তৈরি করে না। অথচ তাদের মূল্যবান জহরত, অর্থ ও গহনাদি ব্যাঙ্কে না রেখে বাড়িতে রাখা চাই।]

(৪) উঠযারি—এই পদ্ধতিতে অপরাধী দিবালের খড়া বা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে। দ্বিতল বা ত্রিতলে চুরি ঐ

ভাবে এরা করে। এদের কেউ কেউ উপরে উঠার জন্য কার্নিকের সাহায্যে খিবালে খাঁজ কেটে নেয়। এরা ছাদে উঠে পরে সিঁড়ির দুয়ার খুলে নীচে নামে। এদের বিড়াল-চোর [CAT BURGLAR] বা বিড়ালী চোর বলা হয়। এই সকল পাইপ বা পাঁচিলে কাঁটাতার দেওয়া থাকলে ওরা কেউ বা জুতা পায়ে কিংবা পায়ে থলে জড়িয়ে উহা অতিক্রম করে। অধুনা কর্তনযন্ত্র দিয়ে তাদেরকে শিককাটতে দেখা গিয়েছে। এই পাইপ বাথরুমের ভিতর দিয়ে নামানো যেতে পারে এবং সাবেকী কায়দায় ছাদে জল নিকাশী মাটির পাইপ বসানো চলে। কিন্তু উহাতে বাড়িগুলির অন্তর্ভাগ সুদৃশ্য দেখা যায় না।

(৫) বাঁকীয়াখুল—এই পদ্ধতিতে জানলার রড, হাতের চাড়ে কিংবা করাত বা অন্য যন্ত্রের সাহায্যে কর্তিত, বাঁকানো বা খুলা হয়ে থাকে। এই প্রকার সিঁদেল চোর মাত্র জানালার মধ্য দিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। এই জানালার রড মোটা হলে উহাদের অসুবিধা হয়। এর প্রতিষেধক সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

(৬) ঘুলঘুলিয়া—এই পদ্ধতিতে অপরাধী একজন [বালক] নর্দমা বা অপরিসর স্কাইলাইটের ফাঁকে বাড়ির ভিতরে যায়। তারপর ঐ বালক ভিতর হতে খিল খুলে বড়দের ভিতরে ঢুকায়। [কাউর মাথা ঢুকলে দেহও ঢোকে। এই বুঝে ফাঁকের মাপ ছোট রাখা ভালো।] এই জন্য এই অপদল ঐ কাজের জন্য বালকদের পুষে থাকে। এজন্য এরা ছোট ছেলে চুরি করে মানুষ ক'রে তাদের ঐ কাজ কাম শেখায়। ছোট বয়সে বিপথগামী বালকরা স্বেচ্ছাতে এদের দলে ভিড়েছে। কোনও কোনও বালকের সঙ্গে এদের অবৈধ যৌন [বিকৃত যৌন-বোধ] সম্বন্ধও থাকে। এই বালকদের কোকেনখোর করে দলে

ভর্তি করা হয়ে থাকে। গৃহহীন ও ভিখারী বালকদের এরা এজন্য সংগ্রহ করে।

বিঃ দ্রঃ—এক এক অপদল এক একটি প্রবেশ পথ ও নিষ্ক্রমণ পথ বেছে নেয়। এই প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ পথ [এন্ট্রি ও এক্সিট] অনুধাবন করে ওয়াকিবহাল রক্ষীকুল কোন দল ঐ চুরি করলো তা বলে দিতে পারে। এই অপদলগুলির মধ্যে বহুবিধ বিরোধ ও শত্রুতা থাকে। এই সুযোগে [বিরোধীয়] অন্য দল হতে বহু সংবাদ সংগ্রহ করা যায়। এই ভাবে চোরদের মধ্য হতে বেতনভূক গুপ্তচর সংগ্রহ করা হয়। প্রবেশ পথ এবং নিষ্ক্রমণের পথ এরা পূর্ব হতে ভেবে রাখে। তবে তাড়াহুড়াতে হেরফের হওয়া অসম্ভব নয়।

সিঁদেল চোরগণ প্রায়ই প্রকৃত অপরাধী হয়ে থাকে। এদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন পরিপূর্ণ দেখা যায়। এরা বেশ্যাবাড়ি হতে বেরিয়ে বেশ্যাবাড়িতে ফিরে আসে। পরে দিবাতে তারা বস্তির ডেরাতে ফিরে যায়। নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা সম্ভোগের ও মহাহুল্লোড়ের ও নেশাভাঙের এরা ভক্ত। এদের মধ্যে কষ্টবোধ অতি কম এবং স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর। ছাদ হতে লাফিয়ে পড়ে এরা পা ভাঙলেও কষ্টবোধের অভাবে এরা হেঁটে চলে যেতে পারে। [প্রথম খণ্ড দেখুন]। কষ্টবোধ মানুষের প্রতি একটা ওআর্নিং। এ থেকে সে বুঝতে পারে যে তার রোগ হয়েছে। এজন্য সে বুঝে যে এবার তাকে সাবধান হতে হবে। কিন্তু কষ্টবোধের অভাবে ওদের রোগ-ভোগ ও দৈহিক ক্ষয়-ক্ষতি সম্বন্ধে ওরা তখুনি অবহিত হতে পারে না। ঐ সময় উত্তেজনার মধ্যে উহা তারা জানতে ও বুঝতে পারে নি।

সিঁদেল চোরগণের দলগুলি ছয় বা সাত জনের বেশি হয় না। এদের দল ডাকাতদের মত বড় দল হলে প্রশাসনীয় ব্যবস্থার প্রয়োজন

হয়। এ ব্যবস্থাতে কিছুটা আইন-কানুন ও [উহা মানার জন্ম] সৎপ্রেরণার দরকার হয়। এ অবস্থাতে এদের আদিম ভাব তিরোহিত হয় ও তার ফলে এরা এদের পূর্ব দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। এই জন্ম এদের দলগুলি বড় হয় না।

[এদের দল দৈবাৎ বড় হলে উহা সর্দারদের অধীন হয়। এদের মধ্যে খাস মজলিস ও আম মজলিস বসে। বিশ্বস্ত সাকরেদদের শুধু খাস মজলিসে প্রবেশ অধিকার। সাধারণ সদস্যরা আম মজলিসে জড় হয়। এদের জমায়েতে সর্দার বহু উপদেশ ও সারমন দেয়। দল বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যে হানাহানি দেখা যায়। ফলে দল ভেঙে পড়ে পুনরায় ছোটদলের সৃষ্টি হয়। জাত-সেয়ানারা ঐ সব বড় দলে যোগ দেয় না।]

দ্রব্য পাচার ও বিক্রয়ার্থে এরা অভ্যাস-অপরাধী ও প্রাথমিক অপরাধীদের সহিত সংযোগ রক্ষা করে। এদের মাধ্যমে ওরা দ্রব্যাদি খাউ তথা বামাল গ্রাহকদের নিকট পৌঁছায়। এইজন্য এদের সর্দারের প্রয়োজন হয়ে থাকে। সদস্য অপরাধীরা প্রায়শঃ স্বভাব-অপরাধী হলেও সর্দার অভ্যাস অপরাধী হয়। দলীয় বারগ্লারদের মত আবার একক সিঁদেল চোরও আছে। এরা একাচারী বস্তিবাসী হয়ে থাকে। ক্ষুধার তাড়নাতে অস্থির হলে এরা চুরি করতে বেরোয়। অন্য সময় এরা অলস জীবন যাপন করে। এই অপরাধীরা প্রায়ই এদের একক শক্তির উপর নির্ভরশীল।

সাধারণ সবল বা সিঁদেল চুরিকে ইংরাজিতে বলা হয় বারগারি [Burglary বা House Breaking]। কোনও চৌর-কার্যে বল প্রকাশ করা হলে সেইরূপ চৌর-কার্যকে বলা হয় সবল চৌর্য। এই বলপ্রকাশ মাত্র সম্পত্তির উপর করা হয়, ঐরূপ বল প্রকাশ কোনও

ব্যক্তির উপর করা হয় না। এমন কি বাধা পেলেও এরা আঘাত হানে না ; তবে কোনও স্থলে প্রত্যাগমনের পথে বাধা পেলে আত্ম-রক্ষার্থে এরা আঘাত হেনেছে। অপকর্মের পূর্বাহ্ণে বাধা পেলে সাধারণতঃ এরা বিনা দ্বন্দ্বেই প্রত্যাগমন করে থাকে। দুয়ার বা তালা ভেঙে যারা চুরি করে বা যারা সিঁদ কাটে বা যারা দড়ির সাহায্যে বা পাঁচিল টপকে পরগৃহে প্রবেশ করে তাদেরকেই সাধারণভাবে বলা হয় সবল চোর, তালা তোড় বা সিঁদেল চোর।

কলিকাতা শহরে সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর বাঙ্গালী, নেপালী এবং হিন্দুস্থানীদেরই দক্ষ তালা-তোড় রূপে দেখা গিয়েছে। স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতির তালা-তোড়রা প্রায়ই প্রত্যাবর্তন কালে ঘটনাস্থলে বিষ্ঠা ও পোড়া বিড়ি ফেলে রেখে গিয়েছে। [কিন্তু অতি দক্ষ প্রকৃত অপরাধীরা ঐ বিষ্ঠা গৃহপ্রবেশের পূর্বে স্নায়বিক কারণে ত্যাগ করে থাকে। এদের কোনও দল প্রাঙ্গণে, কোনও দল আলিন্দায়, কোনও দল প্রবেশ বা নির্গমন পথে ঐ বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে। এই সকল দ্রব্য কোন স্থানে পরিত্যক্ত হয়েছে তা দেখে ঐ অপকর্মট এদের কোন দল দ্বারা সমাধা হয়েছে তা বলে দেওয়া গিয়েছে। বেদিয়া প্রভৃতি দুর্বৃত্তরা তুকরূপে ঘটনাস্থলে শিকড় প্রভৃতি ফেলে রেখে গেলেও এই বিষ্ঠা ও বিড়ি ত্যাগ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তুক-তাক নয়। এদের যারা বিষ্ঠা ত্যাগ করার পর অপকর্মে প্রবৃত্ত হয় তারা উহা মনস্তাত্ত্বিক কারণে করে থাকে। এই অভ্যাসের প্রকৃত কারণ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। এই পুস্তকের বর্তমান খণ্ডেও উহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবৃত করা হবে।

এইবার এই সিঁদেল চোরদের অপকর্মের পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এই সিঁদেল চোরদের দলে সাধারণতঃ চার

হ'তে নয় বা দশজন পর্যন্ত যুক্ত থাকে। এদের কেহ কেহ পাহারার কার্যে নিযুক্ত থাকে। এদের বাকি চোরেরা তখন সিঁদ দিতে শুরু করে। একক সিঁদেল চোরও দেখা যায়। তবে অধিক ক্ষেত্রে এরা দল বেঁধেই অপকর্মে বার হয়।

পল্লীগ্রামের সিঁদেল চোরেরা রাত্রিকালে সর্বাঙ্গ তৈলাক্ত করে কাল লেঙট্ পরে অপকর্মে বার হয়। সর্বাঙ্গ তৈলসিক্ত থাকায় কেহ এদের সহজে ধরতে পারে না। এ অবস্থাতে এদের গায়ে হাত দিলে হাত পিছলে যায়। এই অবসরে চোর মশাই সহজে সরে পড়তে পারে। দেহে বস্ত্রাদি থাকলে অসুবিধা অনেক, কাপড়টা ধরে ফেললেও ঐ অবস্থায় চোর আটকা পড়তে পারে। এই জন্যে চোরেরা অধিক কাপড়-চোপড় দেহে রাখে না। শহুরে চোরেরা লেঙটের বদলে কাল হাফ্ প্যাণ্ট ব্যবহার করে। রাত্রিকালে শ্বেত বস্ত্রাদি এরা একেবারেই নিরাপদ মনে করে না। লৌহ নির্মিত সিঁদকাঠিই সিঁদেল চোরদের আদিম যন্ত্র। এদেশের চাষীরা যেমন আজও পর্যন্ত ঋগ্বেদীয় যুগের লাঙল নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, ভারতীয় স্বভাব-চোরেরাও অনুরূপভাবে তাদের পুরানো সিঁদকাঠি নিয়েই সন্তুষ্ট। কিন্তু এদেশের অভ্যাস-চোরদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। এরা বহু প্রকার আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ভারতীয় সিঁদেল বা সবল বা তালা তোড় চোরেরা অতি সাধারণ [simple] হাল্কা যন্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষপাতী; বিশেষ ক'রে ভারতীয় স্বভাব ও পুরানো চোরদের সম্পর্কে ইহা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। ইউরোপীয় সবল চোরদের ন্যায় এরা উন্নত ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার পছন্দ করে না তুলনামূলক ভাবে দেখা গিয়েছে যে, ইউরোপীয় অপরাধীরা যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর এবং ভারতীয় অপরাধীরা

উহার ব্যবহারচাতুর্যের * উপর নির্ভরশীল। ইহা ব্যতীত নিরপরাধী ভারতীয়দের ন্যায় এই দেশের অপরাধীরাও বহু বিষয়ে পরিবর্তন-বিরোধী বা রক্ষণশীল। এইজন্য অপকার্যে ব্যবহৃত সাবেকী যন্ত্রপাতির মধ্যে সর্ব-প্রাচীন সিঁদকাঠিই এদের পছন্দ।

[স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে যারা আদিমকাল হতেই অপরাধে অভ্যস্ত তারা এই সিঁদকাঠিকে পূজা করে এবং উহাকে এক পবিত্র দ্রব্য মনে করে। কিন্তু ইহাদের যে সকল জাতি আমাদের মতই সভ্য মানুষের অধঃপতিত বংশধর তারা ইহাকে অনুরূপ সম্মান দেয় না। এমন কি সেই সকল অপদলের মেয়েরা উহা স্পর্শ করে নি। এদের মেয়েদের ধারণা ঐ দ্রব্য স্পর্শ করলে তাদের অমঙ্গলই হবে। জাতি মাত্রের মেয়েরাই যে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারক তা এদের এইরূপ আচার-ব্যবহার প্রমাণিত করে ।]

এখানে বিভিন্ন সিঁদকাঠি যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল। দৈর্ঘে অর্ধ হস্ত পরিমিত এই লৌহ সিঁদকাঠির সাহায্যে এরা সিঁদ কেটে থাকে। হাতে ধরার সুবিধার জন্য এই যন্ত্রের পশ্চাৎভাগে গোলাকার খাঁজ কাটা থাকে। কখনও কখনও ন্যাকড়া দ্বারা উহার পশ্চাদভাগ আবৃত রাখা হয়, যাতে ধরবার সময় হাত হতে উহা পিছলে না যায়। দুয়ারের পার্শ্বের কয়েকটি ইষ্টক কিংবা [মেটে ঘর হলে] কিছুটা মাটি এরা সিঁদকাঠির সুচলা মুখ দ্বারা বার করে দেয়। এর পর তারা এই সিঁদের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দুয়ারের খিল, হুড়কা বা ছিটকিনি খুলে

---

* সামান্য ও সাধারণ যন্ত্র তাদের হাতের কায়দা বা ব্যবহার-চাতুর্যের জন্য শক্তিশালী অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিকেও হার মানিয়ে দেয়।

সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকে। দেওয়াল মৃত্তিকা-নির্মিত হলে এরা আরও সহজে কার্য সমাধা করতে পারে। তবে দেওয়ালের মৃত্তিকার অভ্যন্তরে [মধ্যদেশে] করগেটেড্ টিন থাকলে উহা সম্ভব

হয় না। এই ধরনের সিঁদেল কার্যকে এ দেশে "বগলী সিঁদ" বলা হয়। এদের কেহ কেহ গৃহস্বামী জেগে আছে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রথমে একটি পা ঢুকায়। গৃহস্বামী খুট-খাট্ শব্দ শুনে জেগে উঠে দা হস্তে দুয়ারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং চোরের পা'টা কেটে উড়িয়ে দিয়েছেন—এইরূপ কাহিনীও শুনা গেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে দলের লোকেরা অমনি সঙ্গীটিকে ফেলে না পালিয়ে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে পালিয়েছে—এইরূপ বহু নজিরেরও অভাব নেই। এইরূপ অবস্থায় মৃত সঙ্গীটিকে কেহ সনাক্ত করতেও পারে না। মৃত ব্যক্তির দ্বারা দোষ কবুল করানোও সম্ভব হয় না। আত্মরক্ষার

কারণে পূর্ব হতেই এরা পরস্পর পরস্পরকে এইরূপ শর্তে আবদ্ধ করে নেয়। এই জন্যে এদের কাছে এতে দোষেরও কিছু থাকে না। এ ক্ষেত্রে যে যায় সেই যায় এবং যে বাঁচে সেই বাঁচে।

[বাড়িতে কুকুর থাকলে এরা মধ্যে মধ্যে বাড়িতে ফিরিওয়ালা রূপে এসে খাদ্য দ্বারা ওদের বশ করে। কিন্তু ভালো জাতের কুকুরের সাথে এইভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। উহাদের মাদী কুকুর দ্বারাও বশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কুকুর অত্যুগ্র গন্ধবোধ দ্বারা প্রভু, ভৃত্য ও প্রভুর আত্মীয়দের মধ্যে প্রভেদ বুঝে। বলা বাহুল্য, কুকুরের মেমরির কার্ড ইনডেক্স তাদের সূক্ষ্ম গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল। দশ বা বিশ ফুট দূরে মানুষ না নড়লে উহারা তাদেরকে চক্ষুর দ্বারা মানুষ রূপে বুঝে না, কিন্তু গন্ধ বোধ দ্বারা উহারা তাদেরকে মানুষ রূপে চিনে নেয়। এই জন্য অপরাধীরা গায়ে 'ক্যান্‌থারাইডিন' আদি অত্যুগ্র গন্ধ মেখে অগ্রসর হয়। মানুষের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম গন্ধ ঐ সকল উগ্র গন্ধের আওতাতে তাদের অনুভূত হয় না। তারা একটু নড়লেই কুকুর স্বল্প ক্ষণ ডেকে উঠে বটে, কিন্তু তখুনি অপরাধীরা থেমে নিশ্চল দ্রব্যে প্রতীত হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা কুকুরকে 'বাই পাশ' করে এড়িয়ে যায়। পুরানো চোরদের গৃহ তল্লাসী করে ঐ রূপ বহু উগ্র গন্ধের শিশি আমরা পেয়েছি। প্রথমে আমরা মনে করতাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ এড়াতে উহা তারা ব্যবহার করে। কিন্তু পরে উহার প্রকৃত কারণ আমরা জানতে পারি।]

বিঃ দ্রঃ—প্রতিষেধকের অভাব, সাবধানতার অভাব এবং নির্বুদ্ধিতার জন্য গৃহস্থরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। বহু ক্ষেত্রে স্থূল লৌহ দণ্ডের বদলে জানালাতে ক্ষণভঙ্গুর গ্রিল লাগানো হয়েছে। এঁরা শক্ত গডরেজের আলমারি বন্ধ করে উহার চাবি ঐ আলমারির

মাথাতে কিংবা বালিশের তলাতে রাখেন,সর্ব সমক্ষে [ঝি-চাকরের সম্মুখে] উহা তাঁরা বারে বারে বার করে আলমারি খুলেন এবং পূর্ব স্থানে রাখেন। যদি চাবি তাঁরা আঁচলে বা গোপন স্থানে না রাখবেন তো ঐ মূল্যবান স্টিল আলমারির প্রয়োজন কি? বহু ক্ষেত্রে আলমারির ঠিক কোন স্থানে গহনার বাক্সো রাখা আছে তা বাহিরের লোকের পক্ষে অজানা থাকে নি। আমার মতে এই একটি ঘরে ভৃত্যদের ঢুকতে না দিয়ে গৃহিণীদের উহা স্বহস্তে ঝাড়-পোঁছ করা ভালো। অন্যথায় মূল্যবান দ্রব্য ব্যাঙ্কের লকারে রাখা উচিত। অধুনা ব্যাঙ্কে অর্থ ও দ্রব্য থাকাতে বড়ো চুরির সংখ্যা কম। এইজন্য চুরির বদলে প্রবঞ্চনা অপরাধ বাড়ছে। প্রবঞ্চকরা ঐ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলিয়ে আত্মসাৎ করে।

আলমারিগুলির মধ্যে গোপন প্রকোষ্ঠ রাখা যেতে পারে। কতকগুলি স্বর্ণ ও রত্নমন্য ঝুটা চকচকে গহনা আলমারিতে সম্মুখে রাখা ভালো। এই পন্থাকে ক্যামোফ্লেজ বলা হয়। পুরানো চোরেরা খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারে। বেশিক্ষণ তারা ঘটনাস্থলে অপেক্ষা করে না। ডাকাতদের মত তারা একাধিক ঘরে সাধারণত ঢুকে না। অবশ্য ঘরগুলি খালি থাকলে উহা স্বতন্ত্র কথা। উত্তেজনার মুখে অতোগুলি গহনা [ঝুটা] পাওয়া মাত্র তারা ঐগুলি নিয়েই সরে পড়ে। আরও ভিতরের সাচ্চা গহনার বাক্সোটি তারা আর খুঁজে না। ডবল লকের এক আলমারির চাবি অন্য এক আলমারিতে রেখে ঐ দ্বিতীয় আলমারির চাবি অপর এক আলমারিতে রেখে ঐ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আলমারির চাবি আঁচলে বা কাঁকালে রাখা ভালো।

চুরি না করে চাকর হঠাৎ পালালে গৃহস্থের সাবধান হওয়া উচিত। বহু অজুহাতে এরা ছুটি নিয়ে দেশে চলে যায়। কয়েক ক্ষেত্রে ওরা

বাহিরের চোরের প্রবেশের সুবিধা করে দিতে বাড়িতে থাকে। প্রথমে চাকরের কাছ হতে অপরাধীরা সুড়ুক সন্ধান পায়। এর পর ওরা নিজেরা কেউ কল মিস্ত্রি বা অন্য মিস্ত্রি সেজে বাড়ি ঢুকে। এরা ঐ বাড়িতে এসে বলে—'কল সারাবেন, বাসন কিনবেন, কাগজ বিক্রি হবে, সিল কাটাবেন?' এইরূপ লোকের গৃহস্থদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। বাড়িতে মিস্ত্রি খাটলে গৃহস্থদের সাবধান হওয়া উচিত। এরা 'জল খাবো' বলে বা 'একটু ন্যাকড়া দিন' বা অন্য অজুহাতে ভিতরটা দেখে যায়। চুরির আগে বাড়িতে বাসনউলীর আনাগোনা হয়ে থাকে।

সিঁদেল চুরির পর প্রায় ঘটনাস্থলে বা উহার নিকটে বিষ্ঠা, পোড়া বিড়ি দেখা যায়। [উহার কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে।] এরূপ ঘটলে বুঝতে হবে উহা দক্ষ পুরানো চোরের কাজ। এক এক দল এক এক স্থানে বিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। কেহ প্রাঙ্গণে, কেহ আলিন্দাতে, কেহ পথ বা গলিতে, কেহ কক্ষে বা চৌকাঠে, কেহ বা নিকটস্থ মাঠে উহা ত্যাগ করে। এই বিষ্ঠা-তত্ত্ব হতে কোন্ দল ঐ কাজ করলো—তা রক্ষীকুল ওদের অন্য দলের নিকট খোঁজ-খবর করলেই জানতে পারবেন। ঐ সব বিষ্ঠাতে বিশেষ বিশেষ বীজাণু ও জীবাণু থাকে। ঐগুলি ফোরেন্সিক লেবোরেটারিতে পরীক্ষার্থে পাঠানো উচিত। পরে সন্দেহমান ব্যক্তি ধরা পড়লে উহাদের ত্যক্ত বিষ্ঠা ঐভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এই উভয় বিষ্ঠার মধ্যে প্রাপ্ত বীজাণু ও জীবাণু হতে ঐ ব্যক্তি যে ঐ চুরির জন্য দায়ী তা বলা যায়। এই বিষ্ঠাত্যাগী সিঁদেল চোর দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা (১) তুক্‌-তাকে বিশ্বাসী এক দল অপকর্মের পর তুক্ রূপে প্রত্যাগমনের কালে বিষ্ঠা ত্যাগ করে। এরা সাধারণতঃ স্বভাব দুর্বৃত্ত জাতীয় মধ্যম

অপরাধী, (২) অন্য দল অপকর্মের পূর্বে বিষ্ঠা ত্যাগ করে থাকে। এই বিষ্ঠা নির্গত না হলে ঐ দিন তারা গৃহে প্রবেশ না করে সরে পড়ে। এই অপরাধীরা প্রকৃত ও উৎকট ও অতি দক্ষ সিঁদেল চোর হয়। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্বভাব-অপরাধী দেখা যায়। এই শেষোক্ত দলের বিষ্ঠা ত্যাগের গুহ্য কারণ প্রথম খণ্ডে বিবৃত করেছি।

[সিঁদেল চোরগণ দিবা চোর ও রাত্র চোরে বিভক্ত। এতদ্-ব্যতিরেকে ইউরোপীয় বাটীর এবং দেশীয় ব্যক্তিদের বাটীর ঐ চোরও বিভিন্ন হয়ে থাকে। জাতি বিশেষের চাল-চলন, কর্ম, জীবন-প্রণালী ও উহাদের [পছন্দমত] বাটীর গঠন বিভিন্ন হয়। এই কারণে ভারতীয় ও ইউরোপীয় বাটীর চোর আলাদা হয়ে থাকে। এই পুরানো চোরেরা চুরির আগে বা পরে য়ুরোপীয়দের প্যাণ্ট্রি হতে ব্রাণ্ডি ও ভারতীয় গৃহস্থদের রান্নাঘর হতে পান্তা ভাত খেতে অভ্যস্ত। কেউ কেউ শিকড়, সিঁদুর মাখানো পাতা, মাটি প্রভৃতি ঘটনাস্থলে রেখে যায়।

অধুনা কালে সিঁদেল চোরদের মধ্যে যারা অভ্যাস-অপরাধী তারা নানা প্রকার উন্নত যন্ত্রপাতি এবং অ্যাসিড, এসিটিলিন গ্যাস প্রভৃতি বস্তুরও সাহায্য নিয়ে থাকে। অ্যাসিড এবং গ্যাসের সাহায্যে এরা লোহার সিন্দুক ভাঙে। কেহ কেহ এজন্য প্যাঁচকাটা বোরিঙ ইনস্ট্রুমেণ্টেরও [ইস্পাত নির্মিত তুরপুন] সাহায্য নেয়। এরা সিঁদ না কেটে বোরিঙ যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে দুয়ারের স্থানে স্থানে ফুটা করে এবং তার পর এই ফুটার মুখে 'তার' বা সিক ঢুকিয়ে খিল বা ছিটকিনি খুলে ফেলে ঘরে ঢুকে। চিত্রে কয়েক প্রকারের ড্রিল বা বোরিঙ ইনস্ট্রুমেণ্টের প্রতিকৃতি দেওয়া হল।

ক—একটি কাষ্ঠখণ্ড। ইহাতে বিভিন্ন মাপের কয়েকটি চৌকা

ফুটা আছে। ঐ কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে ঐ সব ছিদ্রের মাপে তৈরি কয়েকটি বিভিন্ন মাপের ড্রিল দেখানো হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ সকল ড্রিল ঐ ছিদ্রগুলিতে প্রবেশ করিয়ে উক্ত কাষ্ঠখণ্ডকে হ্যাণ্ডেলে পরিণত

ক

করা হয়। বিভিন্ন পরিধির লৌহ সিন্দুক এবং পেটিকাদি ছিদ্র করবার কারণে ইহা ব্যবহৃত হয়। সাধারণত গা-চাবির উপর দিয়েই এইরূপে ছিদ্র করা হয়ে থাকে। ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ইহা বিভিন্ন সাইজের সরল তুরপুন যন্ত্র। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের প্যাঁচ কাটা [ইলেকট্রিক] বোরিং যন্ত্র ব্যবহার করে।

খ—ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি সাধারণ লৌহ শিক। উহার প্যাঁচকাটা অংশ দ্বারা তালা খোলা যায়। তালার মুখের

খ

মাপ অনুযায়ী প্যাঁচের ছোট বা বড় অংশটি উহার মুখে ঢুকিয়ে

দিয়ে তালা খোলা হয়। এই যন্ত্রের বক্র অংশটি উভয় দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দিযে ভিতরের কাঠেব খিলটি টেনে খুলে ফেলা যায়।

কোনও কোনও অপরাধী দরজার একটি পাল্লা হাত দিয়ে সম্মুখের দিকে এবং উহার অপব পাল্লাটি হাত দিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে পাল্লাব কাঠ বাঁকিযে দিযে উভয পাল্লার মধ্যে একটা ফাঁকের সৃষ্টি করে উহার মধ্যে শিক ঢুকিযে খিল খুলেছে। অপপদ্ধতির এই
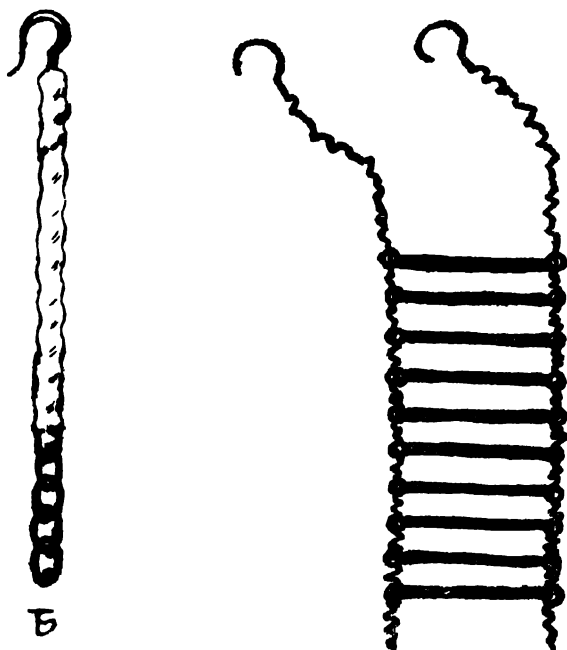
কায়দাকে এরা চাড়বাজি বলে। এখানে দরজাতে এই খিল সমেত উহার উভয় পাল্লাতে ছিটকানি থাকলে কিংবা ঐ খিলের মুখে

ক্লিপ, আঁটা থাকলে উহা সম্ভব হয় না। এদের অনেকে দিবালের খড়া বেয়ে বা জলের পাইপ ধরে উপরে উঠেছে। এই পাইপে বা পাঁচিলে কাঁটা তার থাকলে এরা পায়ে থলে জড়িয়ে নেয়। এজন্য জলের পাইপ ঘরের ভিতরে থাকা ভালো।

চ=ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত একটি লৌহ শিকল। উহা চামড়া বা রবার দিয়ে আবৃত থাকায় উহা ধরে সহজেই উপরে উঠা যায়। হুকসহ শিকলটি প্রথমে উপরের দিকে ছাদের আলিসায়

ছুড়ে দেওয়া হয়। পাঁচিল বা আলিসায় হুকটি আটকে গেলে

চোরেরা এই শিকল ধরে উপরে উঠে। শিকলটি চামড়ার দ্বারা আবৃত থাকায় এদের হাতে আঘাতও লাগে না এবং তাদের হাতটিও পিছলে যায় না। ইউরোপীয় অপরাধীরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে জটিলতর দড়ির মই বা রোপ ল্যাডার ব্যবহার করে। চৌর্য কার্যে ভারতীয় অপরাধীদের ব্যবহৃত ঐরূপ শিকলের পার্শ্বের চিত্রটি দেখুন।

ঙ=একটি ড্রিল। দেশীয় ভাষায় ইহাকে তুরপুন বলা হয়। ইহা দ্বারা দুয়ারের এক পাশে ভিতরের খিলের উপর প্রথমে ছিদ্র করা হয়। [ঞ চিত্র দেখুন]। এর পর ইহার ছিদ্রের মুখে লৌহ শিকের [খ চিত্র দেখুন] বক্র অংশ ঢুকিয়ে খিলটি টেনে খুলে ফেলা হয়। কিন্তু, ঞ চিত্র অনুযায়ী খিলের মুখের উর্ধ্বে কাষ্ঠের বা লোহার ক্লিপ

দেওয়া থাকলে ইহা সম্ভব হয় না। ঐ দুয়ারের দুইটি কপাটে ভিতর হতে দুইটি ছিটকানি লাগালেও উহা সুরক্ষিত থাকে।

ঘ=একটি আধুনিক ড্রিল। ইহার শক্তি সাধারণ ড্রিল অপেক্ষা

অধিক। অনেক সময় ইহা দ্বারা লৌহ বা ইস্পাতও ছিদ্র করা যায়। এদের কেহ কেহ ইলেকৃট্রিক ড্রিলও সঙ্গে রাখে। ঘরের ইলেকৃট্রিক প্লাগে তার সংলগ্ন করে ইহাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়ে থাকে।

গ=একটি চামড়ার থলি। ইহা জল দ্বারা পূর্ণ করে কোমরে আটকে রাখা হয়। লৌহ পেটিকাদি ড্রিল দ্বারা ছিদ্র করার সময় মাঝে মাঝে ছিদ্র স্থানে বারি নিক্ষেপ করতে হয়। ঐ স্থানে জল না দিলে সহজে ছিদ্র করা যায় না। ইস্পাত কাটা করাত বা উকা দ্বারা গরাদ কাটবার সময়ও ঐ ভাবে জল নিক্ষেপের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ ছাড়া লোহা কাটা ছোট করাত বা উকাও ব্যবহৃত হয়। সিঁদকাঠির স্থূল অংশের সাহায্যে তালা বা কড়া ভাঙার কাজ এবং সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে দেওয়াল হতে ইষ্টক সরানোর কাজ সমাধিত হয়।

ইহা ছাড়া একটি পাতলা ও লম্বা লৌহ শলকা বা শিকও ব্যবহার করা হয়। এই শিকের মুখটা কিছু বক্র থাকে। এই শিক উভয় দুয়ারের মধ্যকার ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে খিল বা ছিটৃকিনি খোলা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে রুটিকাটা ছুরির মত [করাতাকার] স্বল্প খাঁজ কাটা ছুরিও ব্যবহৃত হয়। এই ছুরি উভয় দরজার ফাঁকে ঢুকলে ঐ কাঠের খিল ঐ ছুরির খাঁজে আটকে থাকে। এতে উহার সাহায্যে পতনের শব্দ ব্যতিরেকে ঐ খিলকে ধীরে ধীরে নীচে নামানো সম্ভব হয়। কিন্তু কেহ কেহ খিলের উপরে লোহার ক্লিপ এঁটে রাখেন। এই অবস্থায় এই যন্ত্রের দ্বারা খিল খোলা যায় না। [ঞ চিত্র দেখুন।] এ ছাড়া এদের সঙ্গে অনেক ঝুটা চাবি এবং উকাও থাকে। এরা চাবিতালার কাজে এক রকম পাকা-পোক্ত। এদের কেহ কেহ দিনের বেলায় চাবিতালার কাজ করে এবং রাত্রে-

সিঁদ কাটে।* এ ছাড়া এদের কাছে ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিক টর্চও এরা রেখে থাকে। পূর্বে এস্থলে এরা চোরালণ্ঠন ব্যবহার করত।

কোনও কোনও সবল চোর লোহার গরাদ বাঁকাবার বা সরাবার জন্যে ছোট জ্যাক্ যন্ত্রও ব্যবহার করে থাকে। কেহ কেহ জ্যাকের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রও তৈরি করে নেয়। এই যন্ত্রের স্ক্রু গুলি এঁটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরাদগুলাও যায় বেঁকে। এরা তখন সহজেই বেঁকে যাওয়া গরাদের ফাঁকে ঘরে প্রবেশ করে। 'জ' চিত্রে এবং পর পৃষ্ঠার 'ছ' চিত্রে, দুইটি বিশেষ বাঁকন যন্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রথমে 'জ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রটি চিত্রে প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী জানালার গরাদে সংলগ্ন করে যন্ত্রের ডাঁটি দুইটির মুখের বল্টু [bolt] দুইটি প্লাস বা রেঞ্জের সাহায্যে এঁটে দিতে থাকলে উহার চাপে একটি লৌহ গরাদ ধীরে ধীরে বেঁকে—উভয় [১ম এবং ২য়] গরাদের মধ্যে একটি বড় রকমের ফাঁক সৃষ্টি করে। এই ফাঁকের মুখে তখন চোরেরা সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এইবার 'ছ' চিত্রটি পরিলক্ষ্য করুন। যন্ত্রের দুই দিককার ডাঁটি দুইটি দুই পার্শ্বের দুইটি লৌহ গরাদে ক্লিপের সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়েছে। এই যন্ত্রের মধ্যকার ডাঁটিটির উপর আগাগোড়া প্যাঁচ কাটা [screwed] থাকে। এই মধ্য ডাঁটিটি মধ্যকার গরাদের উপর ন্যস্ত করে উহার হ্যাণ্ডেলটি ঘুরালে মধ্য ডাঁটিটির চাপে উক্ত লৌহ গরাদটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বেঁকে যাবে এবং আরও অধিক চাপ পড়লে উহার উভয় মুখ কাঠের ফ্রেম দুইটি হতে খুলেও এসে

---

* কারুর নুতন চাবি তৈরি করবার সময় এরা গৃহস্থদের দ্রব্যাদির অবস্থান সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকে।

থাকে। এই সব জ্যাক্ যন্ত্রের চাপে লোহার ইঞ্জিন, মোটরকার প্রভৃতিও উঠান সম্ভব ; সামান্য গরাদ বাঁকানো তো কিছুই নয়। কিন্তু 'ঝ' চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী এই গরাদগুলির মুখ

ছ
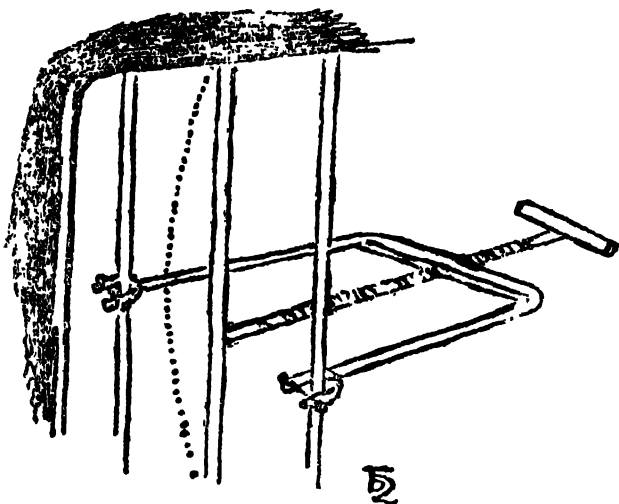
সকল বল্টু দিয়ে আঁটা থাকলে কাষ্ঠ ফ্রেমগুলি হতে গরাদগুলিকে এত সহজে এবং নিঃশব্দে উঠিয়ে আনা সম্ভব হয় না। আমার মতে ঝ চিত্র এবং ঞ চিত্র প্রদর্শিত পন্থানুযায়ী জানালা এবং দুয়ার নির্মিত হওয়া উচিত। এতে এই সব চুরির সম্ভাবনা কম থাকে। গৃহস্থদের ঘরের জানালার লৌহ গরাদগুলিও খুব মোটা হলে ভালো হয়।

ভারতীয় অপরাধীদের দ্বারা আবিষ্কৃত অপর এক সাধারণ ভাঙন যন্ত্রের প্রতিকৃতি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল। ইহা মধ্যম ধরনের স্থূল তিন

টুকরা ফাঁপা লৌহ পাইপ। ভিতর ফাঁপা হওয়ার কারণে ইহা হাল্কা অথচ 'নীরেট দণ্ডের ন্যায়ই শক্ত। এই নাতিদীর্ঘ পাইপগুলির দুই

মুখে প্যাঁচকাটা থাকে। উহাদের দুইটি পাইপ সরল থাকে। কিন্তু উহাদের একটি পাইপের মুখ বেঁকে উর্ধ্বে উঠে পুনরায় সরলাকার

ধারণ করেছে। প্রয়োজন মত এই সবকয়টিকে উহাদের প্যাঁচকাটা মুখে পরস্পরের সহিত যুক্ত করে একটি দীর্ঘ লৌহদণ্ডে পরিণত করা হয়। তার পর উহার পূর্বোক্ত বক্রাংশ জানালার লৌহ গরাদে প্রবেশ করিয়ে চাড় দিয়ে গরাদসমূহ বেঁকিয়ে ফেলা হয়ে থাকে। [ঝ চিত্র দেখুন]। এই সকল যন্ত্র এরা প্রায়ই সন্দেহ এড়াবার জন্যে তরকারির ঝুড়িতে করে বহন করেছে।

জানালাসমূহের শারসির কাঁচসমূহ এদেশের অপরাধীরা বিশেষ চালাকির সহিত ভেঙে থাকে। এরা প্রথমে এক টুকরা কাপড় আটা

ঝ

বা লেইয়ের সাহায্যে ঐ সকল কাঁচের উপর সেঁটে দেয়। তার পর একটা কাপড়ের ছোট ডাণ্ডি যুক্ত বল [কটন হ্যামার] উহার উপর রেখে ঠুকে ঠুকে বা চাপ দিয়ে ঐ কাঁচ ভেঙে ফেলে। এই অবস্থায় কাঁচের টুকরা সকল ঐ আটা মাখানো ন্যাকড়ার সহিত সেঁটে থাকায় ঝন ঝন করে ভেঙে নীচে পড়ে কোনও প্রকার শব্দের সৃষ্টি করে নি।

এদের কেউ টর্চ বা দেশলাই সঙ্গে না নিয়ে মাত্র একমুঠা চাউল সঙ্গে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করে। অন্ধকার ঘরে এই চাউল কণা ছড়িয়ে উহার পতনের শব্দ হতে এই শব্দবিশারদ চোররা বুঝে নেয় কোথায় কোন দ্রব্য ন্যস্ত আছে। ইহাতে শব্দ এতো সামান্য হয় যে উহা কোনও গৃহস্থের গোচরীভূত হয় না। কোনও ক্ষেত্রে ইহা দৈবাৎ শ্রুতিগোচর হলেও গৃহস্থ উহাকে ইঁদুর কৃত শব্দ বলে মনে করে।

এদের কেহ কেহ একজন অপরজনের কাঁধে উঠে স্কাইলাইটের কাঁচ ভেঙেও ঘরে ঢুকেছে। এদেব মধ্যে যারা জলেব পাইপ ধবে উপবে উঠতে সক্ষম, তাদের ইংরাজিতে বলা হয "বিডাল চোর ব' ক্যাট বাবগ্লার"।* কোনও কোনও সবল চোরের দল এজন্য ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। এই সব ছোকরারা নর্দমাব মুখ দিয়ে বা জানালাব কিংবা স্কাইলাইটেব ফাঁক দিযে ঘরে ঢুকে বডদেব প্রবেশেব জন্যে দবজা খুলে দিযে থাকে। এই সবল বা সিঁদেল চোবদেব বর্তমান কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে কযেকটি বিবৃতি দেওয' গেল। এই বিবৃতিগুলি পাঠ করলে এদের কার্যকলাপ সকল সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

"কোনও গৃহে সিঁদ দিতে হলে আমরা একটি বিশেষ উপাযের সাহায্য নিই। প্রথমে আমরা একটা পুবানো মোটবকার বা মোটর সাইকেল সংগ্রহ করি। এর পব উক্ত যন্ত্র-শকটটি মনোনীত গৃহেব সম্মুখে রাস্তার উপর রেখে এইরূপ ভাণ করি, যেন হঠাৎ উহা বিকল হযে গেছে। আমাদেব কযেকজন এই মটোর সারাতে ব্যস্ত থাকে। অনবরত গ্যাসের ভট্‌ ভট্‌ শব্দ বার হতে থাকে। এই মোটর মেরামতের সেখানে খুট্‌খাট্‌ শব্দও হয। দলের অপব ব্যক্তিগণ এই অবসরে গৃহে ঢুকে সিঁদ দিতে শুরু করে। মোটরেব ঘট্‌ ঘট্‌

---

* বহু প্রাচীনকালে এরা গোহাড়গিল জীবের গলার শিকল ধরে পর্বতস্থ দুর্গ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করতেও পেরেছে। মধ্যযুগে ধনিগণ পাহাড়ের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করতেন। ঐ সময় তাঁদের গৃহে সিঁদ দেবার জন্যে ঐ ভাবে তারা পাহাড়ে উঠতো।

আওয়াজে সিঁদ কাটার আওয়াজ আর শ্রুত হয় না। উহা শ্রুত হলেও গৃহস্বামী মনে করে উহা ঐ গাড়িরই আওয়াজ। এই কারণে হাঁরা এ বিষয়ে কোনও রূপ সাবধানতাও অবলম্বন করেন না। আমরা অকুস্থলেই বাক্স ভাঙার কাজও সমাধা করতে সমর্থ হই। আমরা সেখানে নির্বিবাদে চুরি করে ঐ মোটরেই বামালসহ সরে পড়ি। এমন কি পুলিশ ঐ রাস্তায় টহল দিয়ে গেলেও মনে করে আমরা মোটরটা মেরামত করছি। তদুপরি এই মোটর ঐ সকল সিপাইদের আড়াল করেও রাখে। দৈবাৎ গৃহের কেহ চেঁচাতে শুরু করলে ঐ শব্দের মাত্রা আমরা আরও বাড়িয়ে দিই। ওতে ক'রে মোটরের উৎকট শব্দে চিৎকারের শব্দ একেবারে চাপা পড়ে যায়।

"কি করে, এত সব শিখলাম? শুনুন তবে আমি তা বলছি। ছেলেবেলায় আমি পিতার সঙ্গে কোলকাতায় থাকতাম আমাদের বাড়ির পার্শ্বেই ছিল একটা টিন মিস্ত্রির দোকান। ঐ দোকানে সশব্দে কাজ হত। ঠিক সেই সময়ই আমি আমার বাবার হুঁকায় টান দিতাম। পাশের ঘর থেকে বাবা টিন মিস্ত্রির হাতুড়ির আওযাজ শুনতেন এবং ঐ শব্দের আওতায় হুঁকার গুড় গুড় আওয়াজ তাঁর আর কানে যেত না। ওখানে হাতুড়ির শব্দ থামার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আমি হুঁকার নলটিও নামিয়ে রাখতাম। পরে প্রাপ্ত বয়সে আমি চোর হয়ে পড়ি। এই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাল্যকালের কাহিনীটি মনে পড়ে যায়—তখন আমিই আমার সর্দারকে বিদ্যেটা শিখিয়ে দিই।

"কখনও কখনও এই মোটরের সাহায্যে আমরা দুয়ারও ভেঙে বা খুলে ফেলেছি। রাস্তার ধারের দোকানগুলিই এই ভাবে ভাঙা হয়। রাস্তা হ'তে একটা কাঠের বেঞ্চি বা বাঁশ বা লোহার কড়ি

উঠিয়ে নিয়ে উহার একটি মুখ মোটরের পিছনে এবং অপর মুখটি দুয়ারের উপর ন্যস্ত ক'রে—ঐ লৌহ বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর মোটরটি সজোরে ব্যাক্ করে দিই। ফলে মোটরের চাপে দরজাটা এমনই ভেঙে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দরজার গরাদের এবং মোটরের পিছনের সঙ্গে শিকল বেঁধে মোটরটি সামনে চালিয়েও দরজা খুলেছি—তবে এইরূপ ব্যবস্থা কদাচিৎ করা হয়ে থাকে। কখনও কখনও সিড্‌ন্ বডিড্ মোটরের ছাদে উঠে আমরা পথের গ্যাস লাইটসমূহ চুরির পূর্বে নিবিয়েও দিয়েছি।"

"—হাঁ হুজুর, ঐ বাড়ির ঝিটি আমারই উপপত্নী। তাকে তালিম দিয়ে সুড়ুক সন্ধান পূর্ব হ'তে জেনে নেওয়ার জন্যে আমিই ঐ বাড়িতে পাঠিয়েছি। পূর্ব হ'তে চাকর-বাকরদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ না করে আমরা কখনও কারুর বাড়ি ঢুকতে সাহসী হই না। এজন্য বাড়ির চাকরদের আমরা প্রচুর খাওয়াই ও নিজ খরচে তাদের সিনেমাও দেখিয়ে থাকি। এমন কি তাদের আমরা বেশ্যালয়েও নিয়ে যাই। কখনও কখনও চুরির সুবিধের জন্যে বাটীর বিপথগামী সন্তানদের সঙ্গে ভাব ক'রেও আমরা খবর সংগ্রহ করেছি। শহরের বেশ্যালয়গুলি এ বিষয়ে আমাদের সাহায্যে আসে। ওদের বাটীতে এদের সাথে আমাদের আলাপ হয়।"

এই সকল সিঁদেল চোরেরা বাড়ি ঢুকে প্রথমেই যে ঘরে চাকর, দরোয়ান বা বাড়ির পুরুষরা শুয়ে থাকে, সেই সকল ঘরের দরজার কড়াগুলা বাইরে থেকে বেঁধে দেয়, যাতে করে চিৎকার শুনলে সহজে তারা বার হয়ে না আসতে পারে—অবশ্য যদি এইসব চাকর-দরোয়ান-দের সহিত বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হয় তবেই তারা এই পন্থা গ্রহণ করে। এদের কেহ কেহ চুরির পূর্ব রাত্রে ছোট ছোট ইট বা ঢেলা

বাড়িতে ফেলে বুঝে নেয় বাড়ির লোকেদের ঘুম সজাগ কিনা। অনেক সময় এরা দিনের বেলাতেও এইভাবে ঢেলা ছুড়ে, বাড়ির লোকেদের মেজাজ ও প্রকৃতি এবং সংখ্যা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে।

এদেশের শহরের ও পল্লীগ্রামের সিঁদেল চোরেদের বুদ্ধিমত্তা এবং অপপদ্ধতি সম্বন্ধে অপর আর একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত হল।

"আমি হুজুর একজন বাড়ির চোর। ঐ দিন ঐ বাড়িটায় আমিই চুরি করি। চুরির আগের দিন সন্ধ্যায় বড়িটার নীচের একটা খোলা মাঠে আমি সিঁদকাঠিটা পুতে রাখি। অধিক রাত্রে যন্ত্রপাতি শুদ্ধ পথে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ভয়ে আমরা পূর্ব হতে সুবিধামত অকুস্থলের নিকট যন্ত্রগুলি পুতে রাখি। এর পর সন্নিকটস্থ একটা বস্তি বাড়িতে আমি আশ্রয় নিই এবং মনোনীত বাটীর ঝি-এর সঙ্গে আলাপ জমাই। গভীর রাত্রে অকুস্থলে গিয়ে সিঁদকাঠিটা উঠিয়ে নিই এবং পরে পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভিতরের দিকে একটা দড়ি ফেলে দিই। ব্যবস্থা মত বাড়ির ঝি উঠানে সজাগ ছিল। সে তৎক্ষণাৎ জলের কলের পাইপটার সঙ্গে দড়ির একটা মুখ বেঁধে দেয়, আর আমি সেই সুযোগে দ্রুতগতিতে সেই দড়ি ধরে ভিতরে নামি। এর পর পাইপ বেয়ে আমি আরও উপরে উঠি এবং উপরের ঘরের দরজার খিলটা খুলে দিই। ঘরের মধ্যে মশারির ভিতর ফরিয়াদি ও তাঁর স্ত্রী ঘুমাচ্ছিলেন। আমি ডিঙি দিয়ে তাদের শিয়রে এসে বসি। এর পর আমি নিঃশব্দে একটা বিড়ি ধরাই। এই বিড়ি হতে ধোঁয়া বেরোয়, কিন্তু আগুন বেরোয় না। এই বিড়ির মধ্যে কোকেন, চরস, ক্যাম্ফর ইত্যাদি ও একরকম দেশীয় পাতার গুঁড়া থাকে। এই মিশ্র দ্রব্যের ধোঁয়ার মধ্যে একটা ঘুম-পাড়ানী মাদকতা আছে। কখনও কখনও ঐ সকল দ্রব্যের অগ্নিদগ্ধ

ছোট পুটলি বাহির হতে জানালার মধ্য দিয়ে আমরা ঘরের ভিতরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছি। আমরা দেখেছি যে এই ধোঁয়া নাকে গেলে মানুষ অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। এর পর আমি ধীরে ধীরে মহিলাটির গায়ে হাত দিই। প্রথমেই গহনাতে হাত না দিয়ে ঐ সকল নারীদের মাথায় স্কন্ধে হাত দিয়ে কিছুটা সইয়ে নিয়ে পরে গহনার স্থানে আমরা হাত দিয়েছি। কুমারী মেয়েদের গা হতে গহনা খুলবার সময় আমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করি, কোনও বিবাহিতা মেয়েদের বেলায় আমরা অতটা সাবধানতার প্রয়োজন মনে করি না।• কারণ হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় গায় হাত লাগলে বিবাহিতারা মনে করে উহা তাদের স্বামীর হাত; এতে অনভ্যস্ত কুমারী মেয়েরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে স্পর্শ মাত্রেই জেগে উঠে। আমি মহিলাটির গা হতে সকল গহনাই নিঃশব্দে খুলে নিই। তার পর ঝুটা চাবির সাহায্যে আলমারি খুলে অপরাপর দ্রব্য বাহির করি। কিরূপ ভাবে চাপ দিলে বা নাড়লে কোন কোন তালা কি ভাবে খোলা যায় তা আমাদের জানা আছে। আড্ডাখানায় সরু শিকের সাহায্যে তালা খোলা আমরা অভ্যাস করি। এই সব কাপড়-চোপড় ও গহনা একত্রে বেঁধে অচিরেই আমি নেমে আসি। এর পর আমরা নিকটের এক বেশ্যা নারীর গৃহে রাত কাটাই। কারণ রাত্রে বামাল সহ পথ চলা নিরাপদ নয়। হাঁ হুজুর, রাত্রে কোন্ সময় গৃহস্থেরা অঘোরে ঘুমায়, সেই সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে। কতক্ষণ পর্য্যন্ত

• কুমারী মেয়েদের গাত্রে গহনা থাকে না বা কম থাকে এবং এরা স্পর্শ মাত্র জেগে উঠে। এজন্য এই কুমারী মেয়েদের আমরা এড়িয়ে চলি।

ঘরে আলো জ্বলে এইটেই আমরা বিশেষ করে লক্ষ্য করি। রাত্রি দেড়টা বা দুইটার পর আলো নিবলে আমরা বুঝে নিই যে এইবার এরা অঘোরে ঘুমাবে। বাড়িতে কোনও বাচ্চা শিশু আছে কিনা এ সম্বন্ধেও আমরা খবর নিই। কারণ এই সব শিশু হঠাৎ জেগে উঠে। শীতকালের প্রথম রাত্রে এবং গ্রীষ্মকালের শেষরাত্রে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অভিজ্ঞতা হতে আমরা এইরূপ জেনেছি। আমাদের অকুস্থলে এসে আমরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত নারভাস্ হয়ে পড়ি। এ ক্ষেত্রে বিষ্ঠা ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমাদের এই ভয় বা নারভাস্‌নেস্ কাটে না। এই জন্যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে অকুস্থলেই বিষ্ঠা ত্যাগ করি। ঠিক সময়ে বিষ্ঠা ত্যাগ না হলে আমরা অপকর্ম না করেই চলে যাই। কখনও কখনও আমরা দল বেঁধেও সিঁদেল চুরি করে থাকি। এই সময় কয়েকজন ভিতরে ঢুকলেও অন্য সকলে বাহিরে পাহারার কাজে বাহাল থাকে। এদের মধ্যে একজন পাঁচিলের উপর বসে থাকে। এই ব্যক্তি সন্দেহজনক লোক দেখলে শিস্ দিয়ে ভিতরের লোকদের সতর্ক করে দেয়। এ ছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়েও আমরা পাহারা রেখে থাকি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দোকান বা বাজারের দরোয়ানদের সঙ্গেও * আমরা সড় করে থাকি। তবে অধিক ক্ষেত্রে বাড়ির চাকরদের সঙ্গে সলা করি।"

কোনও কোনও সিঁদেল চোরের দল তাদের অপকর্মের সুবিধার জন্যে ছোট ছোট ছেলেও পুষে থাকে। গরাদের ফাঁকে, নর্দমার

---

* কেহ কেহ মনে করেন যে এরা ক্ষেত্র বিশেষে রাস্তার পাহারাদার সিপাইদের সঙ্গে সলা সড় করে নেয়। ইহা মাত্র কয়েকটি অসাধু সিপাইদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মুখে বা স্কাইলাইটের মধ্যে এরা সহজেই ঢুকে পড়তে পারে—ভিতরে প্রবেশ করে এরা বড়দের জন্যে সদর দরজা খুলে দিয়ে থাকে। এই চোরদের দলে এইরূপ অনেক মার্কা-মারা ছোকরা আছে। এই সকল ছোকরা নিয়ে এক দলের সহিত অপর দলের প্রায়ই ঝগড়া-ঝাটি হয়। এমন কি এজন্যে মারপিট খুনোখুনিও হয়ে থাকে। এই সকল বালকদের সহিত এদের বিকৃত যৌন সম্পর্কও থাকে।

বাড়িতে পোষা কুকুর থাকলে চুরি করার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই জন্যে পূর্বাহ্নেই নির্ধারিত বাটীর দুয়ারে এসে এরা আড্ডা জমায়, —উদ্দেশ্য, কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় কুকুরগুলির সহিত পরিচিত হওয়া। এই সব কুকুরদের এরা প্রায়ই এটা-ওটা খাইয়েও থাকে। মনিবরা বাধা তো দেনই না, বরং এতে খুশিই হয়ে থাকেন। এর পর এরা রাত্রে বাড়ি ঢুকলে পূর্ব পরিচিত বিধায় কুকুররা আর চেঁচায় না। কোনও কোনও স্থলে অকুস্থলেই আহার্য দ্বারা কিংবা সঙ্গে আনা কুকুরীর [মাদি] সাহায্যে এরা কুকুরগুলিকে বশ করে নিয়েছে।* কুকুরের মেমরির কার্ড ইনডেক্স গন্ধবোধের উপর নির্ভরশীল। [প্রথম খণ্ড দেখুন।] এজন্য এরা উগ্র ক্যানথারাইডিন গন্ধ মেখে এগোয়। এই উগ্র গন্ধের কভারে মানুষের সূক্ষ্ম গন্ধ ঢেকে যায়। আমি এদের বাড়ি তল্লাসী করে ঐ সেন্টের শিশি পেয়েছিলাম। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে যৌন রোগের দুর্গন্ধ ঢাকতে উহার ব্যবহার হয়। কিন্তু ওদের বিবৃতি হতে প্রকৃত বিষয় আমি অবগত হই।

কোনও কোনও সবল চোর চুরির সুবিধার জন্যে কোনও এক খালি দোকান ভাড়া নেয়। এর পর রাত্রি যোগে ঐ কামরার দেওয়াল

* কুকুরের নিকট পরিচিতের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে এরা না'ও কামড়াতে পারে।

ফুটা করে এরা পাশের দোকানে ঢুকে ঐ দোকানের সমুদয় দ্রব্যাদি চুরি করতে সক্ষম হয়। কোনও কোনও সবল চোর আবার ছাত ফুটা করে দড়ির সাহায্যে গুদামে ঢুকে দ্রব্যাদি চুরিও করেছে। প্রতিরাত্রে অল্প অল্প করে এই ফুটা এরা করে থাকে। পুলিশি তদন্ত দ্বারা এইরূপ জানা গেছে।

কোনও কোনও সবল [সিঁদেল] চোরেরা নাকি ক্লোরোফর্মও ব্যবহার করে থাকে। ঘরের যে জানালাটির উল্টা দিকে অর্থাৎ কিনা যে জানালাটি হ'তে ভিতরের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই জানালাতে এসে বায়ুর মুখে এরা নাকি ক্লোরোফর্মের শিশিটা খুলে রাখে। এদের ধারণা যে এতে করে গৃহস্থদের ঘুম গভীর হবে। কিন্তু এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অনেকের মতে ক্লোরোফর্মের অপ্রত্যক্ষ [indirect] প্রয়োগ কখনও কার্যকরী হয় না।

বাংলা দেশের দিনাজপুর জিলায়, রায় ঘাটোয়াল এবং মাল-পাহাড়ী নামক দুইটি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতি বাস করে। এরা সবল-চৌর্যের সময় এক অদ্ভুত রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। এদের একজন একটি লম্বা সুতার একটি মুখে একটি বঁড়শি বেঁধে ঐ বঁড়শিটি তার কাপড়ের সঙ্গে বিঁধিয়ে রাখে এবং এই অবস্থাতেই সে কোনও গৃহস্থের বাড়িতে চৌর্য কার্যের জন্য প্রবেশ করে থাকে। এই সময় দলের অপর আর এক ব্যক্তি ঐ সুতার অপর মুখটি বাণ্ডিলসহ ধরে বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে থাকে। বিপদের কোনও সম্ভাবনা হলে এই বাহিরের ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ঐ সুতাটির মুখ ধরে টান দিতে থাকে। ভিতরের লোকটির কোমরের বঁড়শিটিতে টান পড়া মাত্র সে বুঝতে পারে যে, বিপদ আগতপ্রায় এবং ইহা বুঝা মাত্র সে দ্রুত পদবিক্ষেপে বাইরে এসে পলায়ন করে থাকে।

গ্রামাঞ্চলে সিঁদেল বা সবল চোরেরা পলায়নের সময়ও নানা রূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকে। মঘেরা ডোম আদি স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিরা পলায়নের সময় শিয়ালের অনুকরণে ডাক তো ডেকেই থাকে; তা ছাড়া এরা হুবহু শিয়ালদের ন্যায়ই চার পায়ে—অর্থাৎ উভয় হস্ত ও পা দ্বারা ভূমি স্পর্শ ক'রে লাফাতে লাফাতে প্রস্থান করে থাকে। এদের কেহ কেহ চুরির মাল অকুস্থলের নিকটেই ভূমির তলে প্রোথিত ক'রে ঐ ভূমির উপর মাদুর পেতে সুখে নিদ্রা যায়। পরে সুবিধামত ঐ দ্রব্য ঐ ভূমির তলা হ'তে উঠিয়ে নিয়ে এরা প্রস্থান করে থাকে। শহরের কোনও কোনও চোর চুরির পর বামাল ও যন্ত্রপাতি তরকারির ঝুড়িতে করে—তরকারির তলাতে রেখে নির্বিবাদে তা পাচার করে থাকে। ভোরের দিকে শহরের রাস্তায় ঐরূপ বহু তরকারিওয়ালাকে বাজারের দিকে যেতে দেখা যায়। এই কারণে এদের উপর ঐ সময় কারও সন্দেহ আসে না। এই সকল সিঁদেল চোরেদের কেহ কেহ বাসনওয়ালী, ছুতার ও রাজমিস্ত্রিদের নিকট হ'তেও খোঁজ-খবর নিয়ে থাকে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোনও একটি নূতন গৃহ নির্মাণের সময় আশে-পাশের বহু বাটীতে চুরি হ'তে আরম্ভ হয়েছে। দিনের সিঁদেল চোরেরা গুদাম আদি স্থানে প্রবেশ করে ধরা পড়লে প্রায়ই এইরূপ বলে থাকে, "আমি অমুক বাবুকে খুঁজতে এসেছি। এই দেখুন না, এ চিঠিটা।" বস্তুতঃ তাদের কাছে ঐ নামের একটা পত্রও পাওয়া গিয়ে থাকে। এটা অবশ্য এদের অপপদ্ধতির একটা চালাকি মাত্র। কোনও কোনও চোর এই অবস্থায় ভাণ করে যে অকুস্থলে মল বা মূত্র ত্যাগ করবার জন্যে সে প্রবেশ করেছে। এ ছাড়া কোনও কোনও সবল চোর পলায়নের সময় নিজেরাই "চোর চোর" বলে ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক ক্ষেত্রে এমন কাহিনীও শুনা গেছে।

এই সকল চোরেরা অপকার্যের স্থবিধার জন্তে নানারূপ সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করে থাকে—অপরাধ-বিজ্ঞানের প্রথম খণ্ডে 'অপরাধ-সাহিত্য' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হয়েছে। এই স্থলে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সকল সিঁদেল চোরেদের যন্ত্রপাতি পূর্বাংশে বলা হয়েছে। এই সব চোরেদের দ্বারা ব্যবহৃত অপরাপর যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডে বিস্তারিত রূপে আলোচনা হয়েছে। পূর্বকালে গ্রাম্য কামাররাই [কর্মকার] এই সব যন্ত্রপাতি চোরেদের জন্তে নির্মাণ করে দিত। এ সম্বন্ধে চোরেদের সহিত গ্রাম্য কামারদের একটা সংস্কারগত সম্বন্ধও আবহমান কাল হ'তে চলে এসেছে। এ সম্বন্ধে বাংলা দেশে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে। জনপ্রবাদটি হচ্ছে এইরূপ, যথা—"চোরে-কামারে দেখা নেই, সিঁদ মোহনায় চুরি।"* প্রবাদটির প্রকৃত অর্থ হয় এইরূপ: চোর কামারের অসাক্ষাতে পাঁচপো চাউল এবং পাঁচসিকা, একটা গামছায় বেঁধে কামারশালার দরজায় রেখে যায়। কর্মকার ফিরে এসে

---

* এইরূপ চৌর্য সম্বন্ধীয় বহু জনপ্রবাদ সঙ্কলন করলে প্রচীন ভারতের অপরাধ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান গরিমার অনেক তথ্যই প্রকাশ পেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে, যথা—(১) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, (২) চোরের মন পুঁই আদাড়ে [আঁধারে], (৩) চোরের মন বোঁচকার দিকে, (৪) চোরের সাত-দিন, গৃহস্থের একদিন, (৫) চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা, (৬) চোরের এক পাপ, গৃহস্থের সাতপাপ, (৭) ন্যাঙটার নেই বাট-পাড়ের ভয়, (৮) চোরের উপর বাটপাড়ি, (৯) সাত চোরের মার, (১০) চোরের মায়ের কান্না, ইত্যাদি।

ঐ দ্রব্যগুলি দেখা মাত্র বুঝে নেয় কে বা কারা কি জন্যে ঐ দ্রব্যগুলি ঐখানে রেখে গেছে। এর পর কর্মকার মশাই ঐ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে ঐ স্থানে একটি লোহার সিঁদকাঠি তৈরি করে সকলের অলক্ষ্যে রেখে দিয়ে প্রস্থান করে। চোর মশাই সুযোগ মত ফিরে এসে লৌহ যন্ত্রটি তুলে নিয়ে সরে পড়ে। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কে যে কার জন্যে দ্রব্যটি তৈরি করে দিল, তা চোর বা কামার উভয়ের কেহই জানতে পারে না। এই জন্য ঐ লৌহ কর্মকাব ইচ্ছা করলেও ঐ চোরদের সনাক্ত করতে পারে না।

শহর অঞ্চলে এইরূপ কোনও প্রথার বিষয় কদাচ শুনা যায় নি। শহরের কর্মকাররা চোবেদের ফরমাস মত নানারূপ উন্নত ধরনের এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রায়ই তৈরি করে দিযে থাকে। এই সকল যন্ত্রপাতিদ্বারা সাধারণ গৃহগুলি ভাঙা গেলেও বিশেষ ভাবে নির্মিত লৌহ-কক্ষগুলি [strong-room] ভেঙে ফেলা দুষ্কর। এদেশের অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কবে বাড়ি নির্মাণ করে থাকেন। কিন্তু তৎসহ আরও দুই এক হাজার টাকা ব্যয করে একটি লৌহ-কক্ষ [strong-room] নির্মাণ করার কেহ কোনওরূপ প্রয়োজন মনে করেন নি। এদেশের অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই মূল্যবান অলঙ্কারাদি স্বগৃহে রাখারই পক্ষপাতী। আমার মতে প্রত্যেক আধুনিক ব্যক্তিরই উচিত বাড়ি নির্মাণের সহিত একটি লৌহ-কক্ষ নির্মাণ করা এবং আসবাবপত্র ক্রয় করার সহিত তাঁদের ক্রয় করা উচিত গৃহ-সংলগ্ন পুস্তকাগারের জন্যে কিছু কিছু পুস্তকও। সৌভাগ্যের বিষয় ব্যাঙ্ক প্রভৃতির লৌহ-কক্ষগুলি ভেঙে ফেলার মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশের অধিকাংশ সিঁদেল চোরেরা আজও পর্যন্ত শিখে নাই।

এ দেশের সিঁদেল চোরদের কেহ কখনও লৌহ গলানো গ্যাস

বা অ্যাসিড এখনও ব্যবহার করতে শিখে নি। কারণ এখনও পর্যন্ত এই বিশেষ অপকার্যটি এদেশের নিরক্ষর এবং নিম্ন শ্রেণীর অপরাধী-দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে। ভদ্রঘরের শিক্ষিত অপরাধীদের প্রবঞ্চনা অপরাধটির প্রতিই অধিক লক্ষ্য দেখা যায়। এই সবল চৌর্য রূপ অপরাধের দিকে এখনও তাঁদের নেকনজর পড়ে নি। বোধ হয় এদের দৈহিক পরিশ্রমের প্রতি বিমুখতাই ইহার কারণ। তবে ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

বিবিধ চৌর্য ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অপরাধ সম্বন্ধে বলা হ'ল। এই-বার কিরূপ পন্থায় এই সকল অপকর্মের ক্রমবিকাশ পৃথিবীতে হয়েছিল সেই সম্বন্ধে বলব। প্রকৃতপক্ষে চৌর্য অপরাধ হতেই পর পর দুটি পৃথক ধারার সৃষ্টি হয় —প্রবঞ্চনা ও সবল চৌর্য [burglary]। সুগঠিত গৃহ নির্মাণ ও মানুষের সাবধানতাই উহাদের সৃষ্টির কারণ। মৎস্য হতে সরীসৃপের সৃষ্টির প্রমাণ স্বরূপ আমরা যেমন মধ্যবর্তী জীব ভেকের উল্লেখ করি। তেমনি চৌর্য অপরাধ হ'তে প্রবঞ্চনা অপরাধের উৎপত্তির প্রমাণ স্বরূপ আমরা প্রবঞ্চনা-মিশ্রিত চৌর্য প্রভৃতি বহু মধ্যবর্তী বা মিশ্র অপরাধের নজির দিতে পারি। এই সকল মিশ্র অপকর্ম সম্পর্কে পরে আমরা আলোচনা করব। এই মতবাদের অপর প্রমাণ স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, অধিক ক্ষেত্রে আদিম ও নিম্নশ্রেণীর মানবগণই চৌর্য অপরাধে লিপ্ত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত সুসভ্য মানুষ অধিক ক্ষেত্রে লিপ্ত থাকে প্রবঞ্চনা অপরাধে। মানুষের ক্রমিক বুদ্ধি বিকাশও ইহার কারণ হতে পারে। আরও পরে মানুষ সামাজিক জটিলতাসহ সুসংবদ্ধ হয়ে বাস করার ফলে এই সিঁদেল চুরি [burglary] অপরাধ হতে সৃষ্ট হয় উহার সমশ্রেণীর ডাকাতি [robbery] অপরাধ। এই ডাকাতি ও বারগ্লারি

অপরাধে যথাক্রমে ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হয়। নিম্নে অপরাধ সম্পর্কীয় ক্রমবিকাশ বৃক্ষ হতে এই সকল অপরাধের ক্রমিক উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে বুঝা যাবে।

ভৃত্য-চৌর্য

ভৃত্য বা চাকর চোর অধুনাকালে একটি বিশেষ সমস্যার বিষয়। অনেক সময় ধন, মান ও প্রাণ এই ভৃত্যদের উপর নির্ভর করে। কয়েক ক্ষেত্রে এই সকল অপরাধীরা গৃহস্বামিনীকে একা পেলে তাকে বলাৎকার বা হত্যা পর্যন্ত করেছে। তবে এরা সাধারণতঃ সহজ বা সরল চোর হওয়ায় চুরি ছাড়া আর কোনও অপরাধ করে না। এই কারণে ভৃত্য নিয়োগ অতীব সাবধানে করা উচিত। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের কখনও ভৃত্য রাখা উচিত নয়। নবাগত ভৃত্যদের কার্যে বাহাল করার পূর্বে বা পরে যথা সত্বর গৃহস্থদের উচিত, এদের নাম, ধাম, পরিচয় ও দেশের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে ঐ সম্বন্ধে লিখে

পাঠানো। এইরূপ পত্র পেলে পুলিশ ভৃত্যের দেশের ঠিকানায় এবং অন্যান্য স্থলে খবর নিয়ে বলে দিতে পারে লোকটি ভাল বা মন্দ। কলিকাতার মাননীয় পুলিশ কমিশনার বাহাদুর জনসাধারণের হিতার্থে বহুদিন পূর্বেই এইরূপ সুব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনসাধারণ এই ব্যবস্থার কোনরূপ সুযোগ প্রায়ই গ্রহণ করেন না।

এই চাকরদের মধ্যে দুই প্রকারের চোর দেখা যায়—অভাবী ও পেশাদারী। অভাবী চোরেরা প্রায়ই ততো বিপদজনক হয় না। এদের মধ্যে যারা ড্রাইভার তারা রবারের নলের সাহায্যে পেট্রল চুরি করে। এদের কেউ গাড়ির পুরানো পার্ট‍্স্ সরিয়ে নূতন পার্ট‍্স ক্রয়ার্থে অর্থ গ্রহণ করেছে। কেহ নূতন টায়ার সরি'য় পুরানো টায়ার ফিট্ করে দেয়। অভাবের কারণে বা সামান্য স্বভাব দোষে চাকররা বাজারের পয়সা কিংবা সুযোগমত ঘরের এটা ওটা দ্রব্যাদি সরিয়ে থাকে কোনও পদচ্যুত চাকরের বাক্স তল্লাস করলে এমনি অনেক ছোট-খাটো চোরাই দ্রব্য প্রায়ই পাওয়া যায়। বাড়িতে কোনও নারী না থাকলে এরা বেপরোয়াভাবে চুরি করে থাকে; এই সব বেমালুম ছোট চুরি আবিষ্কার পুরুষদের সাধ্যাতীত। কেবল মাত্র এই চুরি বন্ধের কারণেও ভদ্র মানুষের বিবাহ করা উচিত।

এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি তুলে দিলাম। এ বিষয়ে এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"কোন একটি মেস্‌বাসী ছোকরা প্রায়ই থানায় এসে অর্থাদি চুরির বা হারানোর এজাহার দিত। একদিন তাকে আমি প্রশ্ন করি, 'আচ্ছা মশাই! এভাবে না থেকে আপনি বিয়ে করেন না কেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি আমায় বলেছিল,

'আই ক্যাণ্ট মেইনটেন এ ওয়াইফ।' অর্থাৎ কিনা তিনি একটা বৌও নাকি এফোর্ড করতে পারেন না। আমি তখন গত দেড় বছর যাবৎ তাঁর যত কিছু হারিয়েছে বা খোয়া গেছে বা চুরি গেছে, গত দুই বৎসরের নথিপত্র [record] ঘেঁটে তার একটা হিসাব করে—উক্ত সংখ্যাকে বারো দিয়ে ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছিলাম, যে, গড়ে প্রতিমাসে তাঁর যা খোয়া যায় বা চুরি যায় তা দিয়ে তিনি একটি স্ত্রী তো মেইনটেন করতে পারেনই ; এমন কি ঐ অর্থ দ্বারা তিনি দুটো বৌ মেইনটেন করতে সক্ষম। আমার এই কথাটা আমি বিবাহ-ভীরু বিপত্নীক এবং অবিবাহিতদের ভেবে দেখতে বলি।"

চাকর চোর বলতে সাধারণভাবে আমরা পেশাদারি চোরদেরই বুঝি। এরা একমাত্র চুরি করার উদ্দেশ্যেই চাকুরি নিয়ে থাকে এবং সুযোগের অভাবে চুরি করতে অক্ষম হলে চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এরা [শহরে বা গ্রামে] এক এক বাড়িতে এক এক নামে বাহাল হয়ে থাকে। প্রথম প্রথম এরা বাটীর ছোট বড় সকলকেই তাদের কর্মতৎপরতার দ্বারা মুগ্ধ করে দেয়। এই ভাবে তারা সুযোগ-সুবিধাও অনেক পরিমাণে আদায় করে থাকে। এর পর হঠাৎ একদিন সুযোগ মত দামী দ্রব্য বা অর্থাদি বা অলঙ্কার অপহরণ করে এরা উধাও হয়ে থাকে। এদের কেহ কেহ তাদের কর্মপদ্ধতির কিছু কিছু অদল-বদলও করে থাকে। প্রথম দিনেই এরা অপহৃত দ্রব্য বাড়ির বাইরে পাচার করতে পারে নি। দ্রব্যাদি অপহরণ করে বাড়ির মধ্যেই সাবধানে এবং সংগোপনে কোনও গুপ্তস্থানে ঐগুলিকে এরা লুকিয়ে রাখে। কয়েক দিন পর বাড়ির লোকেরা দ্রব্যগুলির জন্যে খোঁজাখুঁজি করে নিরস্ত হলে পরে সুবিধামত একদিন অপহৃত দ্রব্যগুলি ঐ সকল গোপন স্থান থেকে সরিয়ে হঠাৎ একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে এরা

পলায়ন করে। চুরির দিন সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে হাজির থাকায় সহসা এদের কেহ সন্দেহও করে না। এদের অনেকে বাসন চুরি করে উহাদের গামছায় বেঁধে বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে রেখে নিশানা স্বরূপ নিকটে একটা কঞ্চি পুঁতে রেখে থাকে।

[চাকর চোরদের কেহ কেহ সেবা-শুশ্রূষার ছলে বাড়ির কর্তা বা অন্য কারও বিকৃত যৌন-বোধের উপশম ঘটিয়ে এমন ভাবে তাদের প্রিয়পাত্র হয়েছে যে, বাড়ির অপর সকলে তাকে ভৎর্সনা পর্যন্ত করতে সাহসী হয় নি। সাধারণতঃ পায়ে বা দেহে তেল মালিশ করবার সময় এইরূপ সেবা তারা করে থাকে।]

পরের দ্রব্য না বলে গ্রহণ করলে চুরি করা হয়। চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা অনুযায়ী ঐ দ্রব্য অস্থির বা অস্থাবর হওয়া চাই এবং উহা অসদুদ্দেশ্যে অপসারণ করা চাই। এইরূপ সংজ্ঞানুযায়ী কেহ কাহারও দ্রব্য চুরি করার উদ্দেশ্যে স্বত্বাধিকারীর টেবিল হতে উক্ত দ্রব্য সরিয়ে উহা ঐ টেবিলেরই এক ড্রআরের মধ্যে রেখে দিলেও ঐ অপ-কার্যকে বলা হবে চৌর্য অপরাধ। এই সব চোরদের প্রায়ই অলঙ্কারাদি বাড়ির ভিতরের কয়লা ঘুঁটের গাদার মধ্যে বা ইলেকট্রিক মিটার বক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে দেখা গেছে। এরা কাজ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিশেষ করে বাড়ির কর্তার অত্যন্তরূপ প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হবার চেষ্টা করে।

এই সকল চাকর চোরেরা ধরা পড়ার পর এক অভিনবরূপ মিথ্যাভাষণের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে থাকে। নিম্নের উদ্ধৃত বিবৃতিটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি মশাই একজন নিরপরাধী ব্যক্তি। আমি অপরাধী হলেও চোর নই। ফরিয়াদির যুবতী কন্যার সঙ্গে আমার প্রেম হয়। আমি

গোপনে রাত্রিযোগে ঐ কন্যার ঘরে যেতাম। কিন্তু কাল আমরা ধরা পড়ে যাই। ক্রুদ্ধ হয়ে ফরিয়াদি এই ঘটিটা আমার হাতে দিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছে। লোকলজ্জাবশতঃ আসল বিষয়টি উনি গোপন করেছেন। ফরিয়াদির স্ত্রীও আমাদের এই প্রেম সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তিনিও আমাকে গোপনে বাটি বাটি দুধ খাইয়েছেন।"

চাকর-বাকরদের প্রায়ই এই ধরনের মিথ্যা বিবৃতি থানায় দিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অভ্যাস-অপরাধীরাই এইরূপ মিথ্যার আশ্রয় নেয়। বলা বাহুল্য, চাকর চোররা প্রায় সকলেই অভ্যাস অপরাধী হয়ে থাকে। কোনও এক চাকর-চোর গহনাশুদ্ধ ধরা পড়ার পর এইরূপ উক্তি করে, "ও ত গিন্নীমা আমাকে কর্তাকে না জানিয়ে চুপি চুপি বাঁধা বা বিক্রি করে টাকা আনতে বলেছেন।" অপর আর এক নারী অপরাধী এইরূপ অবস্থায় নিম্নোক্তরূপ উক্তি করে, "দাদাবাবুর সঙ্গে আমার প্রেম হয়। তিনিই আংটিটা চুরি করে আমায় উপহার দেন। এখন ভয়ে ও লজ্জায় উনি এ কথা অস্বীকার করছেন।"

কোনও কোনও ভৃত্যের বাহিরে প্রেয়সী থাকে। তাদের উপহার দেবার জন্যও তারা গহনা চুরি করেছে। কোনও কোনও ঝিরও বাহিরে অনুরূপ চোর উপপতি আছে। এরা নিজের নামে দুজনের উপযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আদি ঘরে নিয়ে যায়। তবে কেহ কেহ চুরির পরই দ্রব্যসহ দেশেও চলে গিয়েছে।

এমন অনেক গৃহস্থ আছেন যাঁরা ছয় মাস পূর্বে চাকর নিয়োগ করেছেন, অথচ তাঁদের চাকরের পুরা নাম বা দেশের ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা তার কিছুই বলতে পারেন না। পীড়াপীড়ি করলে সলজ্জভাবে তাঁরা এইটুকু মাত্র বলবেন, 'তা আমি কি জানি মশাই!

কেষ্ট কেষ্ট বলে তো তাকে ডাকতাম আমরা।' কিছুকাল পূর্বে কোনও এক মাড়োয়ারীর গদি হতে জনৈক দেশবালী বহু সহস্র মুদ্রা অপহরণ করে উধাও হয়। অপরাধীর নাম ও ঠিকানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে সে এইরূপ বলেছিল, "উনকা নাম? উনাকা নাম উ তো বোলা সদাহরী, মতিহারী? নেহি হুজুর রামহ'রি ভি হোনে সেকতা। উনকো দেশকো ঠিকানা উ তো বোলা হোগা মতিহারী—নেহি হুজুর উনে বোলা থে গয়া। নেহি নেহি। বেলিয়া ভি হোনে শেকতা। কেয়া বোলে হুজুব, মেরি সত্যনাশ [সর্বনাশ] হো গয়া।"

অনেকে আবার নবাগত ভৃত্যদের নামধাম সম্বন্ধে অনেক পীড়াপীড়ি করতে নারাজ হন। কারণ এতে করে সে ভয় পেয়ে চলে গেলে তিনি আর চাকর পাবেন না। পেশাদার ভৃত্য-চোরদের হাতের টিপ নিলে বা নামধাম টুকে নিলে তারা ভয় পেয়ে যে সরে না পড়ে তাও নয়। কিন্তু এতে গৃহস্থের ক্ষতি না হয়ে উপকারই হয়ে থাকে। গৃহস্থদের উচিত হবে মাহিনে দেবার সময় চাকরদের সহি এবং তৎসহ তার টিপ সহিও নেওয়া। এতে চুরি করে পালালে তাকে সহজে ধ'রে আনা সম্ভব হয়। অন্যথায় পুলিশের পক্ষে এই সব চুরির কিনারা করা অতীব কষ্টসাধ্য হযে পড়ে। কারণ পুলিশ গৃহস্থদের মতই সাধারণ দ্বিপাদ মানুষ মাত্র।* এছাড়া গহনা বা অর্থাদি

---

* একটু চালাকির সহিত মসৃণ কাঁচের গেলাসে জল আনতে বলে অলক্ষ্যেও এদের অঙ্গুলির টিপ সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই উপায়ে বহু জ্ঞানী-গুণী লোকেরও টিপ তাঁদের অজ্ঞাতে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বার করা বা ন্যস্ত করার সময়—উহা চাকর-বাকরদের সামনে বাহির বা ন্যস্ত না করাই ভাল। এই বিশেষ বাক্যটি সকল সময়ই আমি গৃহস্থদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি। এ ছাড়া সকল বিষয়েই চাকরদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু গৃহস্থালীর কার্য নিজেদের হাতাহাতি করে সমাধান করারও সময় এসেছে। আজিকার দিনে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা আমি উচিত মনে করি। এতদ্বারা বাড়ির পুত্রকন্যাগণ একদিক হতে যেমন কর্মঠ হবে, অপরদিক থেকে তেমনি তারা আত্মনির্ভরশীলও হতে শিখবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ যুগ কতকটা সমাজতান্ত্রিক যুগও বটে।

ইহা ছাড়া এমন অনেক গৃহস্থও এই শহরে আছেন, যেখানে কর্তার চাকরের সম্বন্ধে বাড়ির মেজবাবু কোন কিছুই জানাতে পারেন না—এইরূপ বিলিব্যবস্থার সুযোগও এই সব চাকর চোরেরা প্রায়ই নিয়ে থাকে। বাড়িতে অনেকগুলি ভৃত্য থাকলে কোন ভৃত টি দ্বারা চৌর্য অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে তা জ্ঞাত হওয়াও অত্যন্তরূপ দুষ্কর হয়ে উঠে।

অধুনাকালে কোনও কোনও সুধী ব্যক্তি মনে করেন যে এই সব গৃহ-ভৃত্যদের মোটর চালকদের লাইসেন্সের মত সরকার বাহাদুর কর্তৃক লাইসেন্সের ব্যবস্থা করা উচিত। লাইসেন্স মাত্রই রীতিমত পুলিশ তদন্তের পর দেওয়া হয়। এই কারণে লাইসেন্স প্রাপ্ত ভৃত্যদের সম্বন্ধে কোনওরূপ ভয়ও থাকে না; উপরন্তু ইহা দ্বারা রাজস্বের আয়ও কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা দেশের আইন-সভার বিবেচ্য বিষয়। এ দেশের শাসন বিভাগের এ সম্বন্ধে কোনও কিছু করবার নেই।

[কিন্তু এ ব্যবস্থাতে গৃহস্থদের বিপদও আছে। তাহলে স্বল্প বেতনে ভৃত্য পাওয়া মুস্কিল হবে। এরা দল বেঁধে মাগগীভাতা দাবী করবে। ফলে গৃহভৃত্য রাখা গৃহস্থদের পক্ষে সম্ভব হবে না।]

কোনও কোনও গৃহস্থ ভৃত্যগণকে অত্যন্তরূপ বিশ্বাস করে থাকেন। কিন্তু বাহিরের কোনও ব্যক্তিকে—বিশেষরূপ খোঁজ-খবর না নিযে এতটা বিশ্বাস করা অতীব অন্যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করে বর্তমান পরিচ্ছেদটি শেষ করা যাক্।

"কোনও একটি ভদ্রলোক থানায় এসে জানান, তাঁর বাড়িতে নাকি একটা মিসটিরিয়াস চুরি হয়েছে। তিনি ঐ দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে দেখেন যে, তাঁর স্ত্রী তখনও সিনেমা হতে ফেরেন নি। এরও কতক্ষণ পরে তাঁর স্ত্রী বাড়ি ফিরেন, বাড়িতে তখন অন্য কেহই উপস্থিত ছিল না। এর পর তাঁর স্ত্রী ড্রআর খুলে বস্ত্রাদি ন্যস্ত করতে গিয়ে দেখতে পান যে তাঁর সমুদয় অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়েছে। এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তদন্তের ব্যপদেশে অকুস্থলে এসে হাজির হই। তদন্তের সময় কোঁচা-ঝোলানো টেরিকাটা একটি ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করছিলেন; অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার প্রশ্নের জবাব তিনিই দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন কি, কোন দিক হতে চোরটা এসে থাকতে পারে সেই সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞের মতই তিনি আমাকে এবং বাড়ির আর সকলকে বুঝাবার চেষ্টাও করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা! আপনি এ বাড়ির কে? উত্তরে ভদ্রলোক আমাকে জানালেন, আজ্ঞে, আমি? আমি এ বাড়ির কুক্ [cook]। আমাদের সাথে ঐ ফরিয়াদির স্ত্রীও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এইবার তিনি আমাকে

উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, ও আমার কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।* আমার মতে ও ঠিকই বলছে। এর পর আমি হতভম্ব হয়ে গিয়ে পাশের সোফাটায় বসে পড়ে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি ইংরাজি জান? উত্তরে লোকটি বলে উঠে, আজ্ঞে না, তবে ফ্রেঞ্চ জানি। আমি চন্দননগরের লোক। আমি পুনরায় প্রশ্ন করি, তাই নাকি! তা ফরাসী বলতে পার? উত্তরে লোকটা বলে চলে, নিশ্চয়ই, এই শুনুন না, মসিঁয়ে, বুনজুর মসিঁয়ে, ওয়ারে ভোঁ, লেলেপে। এইবার ফরিয়াদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে আমি বলে উঠি, ইনি তাহলে আপনাদের চাকর? একে আমি আপনার ভাই বা শ্যালক-ট্যালক বা ঐরূপ একজন আত্মীয় মনে করেছিলাম। আপনারা বেশ ভাল চাকর তো আমদানী করেছেন। এ লোকটা এখানে কতদিন আছে? এ ছাড়া মনে মনে তাদের উদ্দেশ্যে আমি এও বলি, মশাই! শীঘ্র বিদায় করুন, নইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানিযেছিলেন, মাস তিনেক হবে বাহাল হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ এবং তদন্তের পর আমি ফরিয়াদিকে জানাই, ঐ চাকরটির উপর আমার অত্যন্তরূপ সন্দেহ হচ্ছে এবং তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় নিয়ে যেতে চাই। আমার অভিমত শুনে ফরিয়াদির স্ত্রী অত্যন্তরূপ নারাজ হয়ে উঠেন। তা ছাড়া আমার প্রস্তাবে তিনি ক্রুদ্ধও হন। মহিলাটি তখন বিরক্ত হয়ে বলে উঠেন, ও সব আপনার বাজে সন্দেহ। ও কি শুধু বাড়ির চাকর! ও আমার ছেলে! যা রে

---

* চাকর এবং রাঁধুনী—এই উভয়েরই কার্য যারা করে তাদের বলা হয় কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড।

যা, তুই কাজ করগে যা। মনিবানীর আদেশ পাওয়া মাত্র লোকটা নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে যায়। দূর হতে চাকরটার কর্মতৎপরতা আমি উপলব্ধি করতে থাকি। নিমেষের মধ্যে সে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেদের পরিচর্যার কাজ শেষ করে দিল। সেই সঙ্গে গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজও ত্বরিত গতিতে সে সমাধা করলে। এদিকে আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে বলি যে ঐ চাকরকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবই। ভদ্রমহিলা এইবার তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন, ওকে আপনি নিয়ে যাবেন কি! আপনি ওকে নিয়ে গেলে আমাকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হবে। পুলিশে খবর দিয়ে তো দেখছি এইটুকুই লাভ্। না মশাই, আমরা আর কেইস করতে চাই না। আমি এই চুরির কেইস তুলে নিচ্ছি। আমি বুঝলাম যে ভদ্রমহিলা একদিনের জন্যও রন্ধনশালায় প্রবেশ করতে নারাজ। এই কারণে তিনি গহনা ছাড়তেও রাজি, কিন্তু চাকর ছাড়তে রাজি নন। আমি কিন্তু এদের কোনও প্রতিবাদই গ্রাহ্য না করে চাকরটাকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। থানায় এসে চাকরটি স্বীকার করে যে গহনা চুরি সেই করেছে। যে দোকানে সে অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে এসেছে, সেই দোকানেও আমাদের সে নিয়ে যায়। কিছু গহনা সে ইলেকট্রিক মিটার বক্সের মধ্যেও লুকিয়ে রেখেছিল। এই ভাবে হাজার টাকা মূল্যের সমুদয় অপহৃত গহনা আমরা ঐ চাকরের কথা [বিবৃতি] মত উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর বিষয়টি আগাগোড়া অনুধাবন করে মহিলাটি বলে উঠেছিলেন, ওরে ও হোরে! এ্যাঁ, তোর মনে এই ছিল? তোর হাতে যে আমি আমার ল।খ টাকার শিশু পুত্রদের ছেড়ে দিয়েছি! সর্বনাশ! তা আপনি মশাই কিছু মনে করবেন না। এখন দেখছি এ বিষয়ে সবটা আমারই ভুল। আপনি কিন্তু কাল

আমাদের এখানে এসে খাবেন। আপনার এখানে নিমন্ত্রণ রইল। হায় রে! এতগুলা গহনা গিয়েছিল আর কি! এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে মহিলাটিকে আমি সেই দিন এইরূপ বলেছিলাম, আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আমার আপত্তি নেই। তবে হাত পুড়িয়ে আপনি রাঁধতে পারবেন তো? আপনার কুকটিকে [cook] তো আমি এখন নিয়ে চললুম।”

চৌর্যবৃত্তি—অসাধারণ

পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে বিবিধ প্রকার সাধাবণ চৌর্য অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ চৌর্য ছাড়া অসাধারণ চৌর্যও দেখা যায়। এই চুরি দুই প্রকারের হয়, যথা সহজ ও মিশ্র। প্রথমে প্রবঞ্চকরূপে অগ্রসর হয়ে পরে চুবির আশ্রয় নেওয়া হলে আমরা উহাকে মিশ্র চৌর্য বলি। ইহার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রবঞ্চনা ও চৌর্য অপপদ্ধতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই চৌর্যপদ্ধতি অবিমিশ্র থাকলে উহাকে আমরা বলি সহজ চৌর্য। প্রথমে এই অসাধারণ সহজ চৌর্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞার মধ্যে কেবলমাত্র অস্থাবর বা অস্থির [movable] দ্রব্য চুরির কথাই বলা হয়েছে। কেহ স্থাবর বা স্থির [immovable] দ্রব্য অধিকার করলে উহাকে চুরি বলে না। উহাকে তখন বলা হয়

অনধিকার প্রবেশ। কিন্তু কোন কোনও ক্ষেত্রে স্থাবর দ্রব্যও চুরি করা সম্ভব হয়। এই স্থলে স্থাবর দ্রব্যকে অস্থাবর বা অস্থির দ্রব্যে পরিণত কবা মাত্র উহা চুরির পর্যায়ে এসে পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, না বলে অপরের গাছ কাটার কথা বলা যেতে পারে। বৃক্ষ একটি স্থির দ্রব্য, উহা চুরি করা যায় না। কিন্তু উহা কাণ্ডচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়লে উহা অস্থির দ্রব্যে পরিণত হবে। এইরূপে কাণ্ডচ্যুত করাকে আইনমত অপসারণ বলা যেতে পারে—এই কারণে বৃক্ষটি মাটিতে পড়ামাত্র বৃক্ষচ্ছেদককে চোর আখ্যায় ভূষিত করা যায়। কর্তনের পর বৃক্ষকাণ্ডটি কার্যতঃ অপসারণ না করলেও কেবলমাত্র কর্তনের কারণেই বৃক্ষচ্ছেদক চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে। নারিকেল চুরি এবং আম ও কাঁঠাল চুরি ইত্যাদি চুরিকেও এই কারণে আইনানুসারে চুরি বলা হয়। কোনও এক লাইট রেলওয়ের ইঞ্জিন চালক পথিমধ্যে ইঞ্জিন থামিয়ে কাঁঠাল চুরি করেছিল। এই অপকর্মের জন্তে তাকে চৌর্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পল্লী-গ্রামে কোনও কোনও বালক ফাঁপা পাঁকাটির সাহায্যে খেজুর গাছের কলসী হতে রস চুষে খায় বা ঐ ভাবে ঐ রস বার করে নেয়। কোনও কোনও দুষ্ট মোটর ড্রাইভার এই একই প্রণালীতে ভেকুয়মকৃত রবার পাইপের সাহায্যে মালিকের অজ্ঞাতে মোটর হতে পেট্রল চুরি করে তা বিক্রি করে থাকে। ইহা একপ্রকার চুরি—ইহা ছাড়া নষ্টচন্দ্রের রাত্রে বালকদের দ্বারা চুরিকেও চুরি বলা যায়।

এই সকল সহজ চৌর্য সম্বন্ধে বলা হল। এইবার অসাধারণ চৌর্য সম্বন্ধে বলব। আমরা পুকুর চুরির কাহিনী শুনেছি, যদিও কিনা পুকুর চুরি সম্ভব নয়। কিন্তু পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও কোনও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বাড়ি চুরিও সম্ভব হয়েছিল। ইহা

অসাধারণ চৌর্যের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।* এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ছিল এইরূপ :

"কলিকাতার উত্তরাঞ্চলবাসী কোনও এক ভদ্রলোকের শহরের দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীতে একটি সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ি ছিল। বাড়িটি তিনি জনৈক তথাকথিত ধনী ব্যবসায়ীকে ভাড়া দেন। ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই বাড়িওয়ালাকে তার প্রাপ্য ভাড়া চুকিয়ে দিতেন। এ বিষয়ে তাঁর কখনও কোনওরূপ ত্রুটি হয় নি। ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের ব্যবহারও ছিল অতি মধুর। একদিন তিনি বাড়ির মালিককে জানালেন, আপনি বুড়ো মানুষ। প্রতিবার কষ্ট করে আসেন কেন? দমদমায় আমার ফ্যাক্টরি আছে, রোজই

পুকুর চুরি সম্ভব না হলেও রাত্রে জাল ফেলে পুকুরের মাছ চুরি সম্ভব। পল্লীগ্রামে ইহা হামেসাই হয়ে থাকে। ক্ষেত বা খামারের কাজের জন্যে অপরের পুকুর হতে জল নিকাশ করে নেওয়ারও নজির আছে। সরকারী খাল হতে বিনামূল্যে জল বার করলেও উহাকে চুরি বলা হয়। এইভাবে গ্যাস বা ইলেকট্রিসিটি চুরি করাও সম্ভব। পুকুর হতে মাছ চুরিকেও চুরি বলা হয়। কিন্তু কোনও নদী হতে মাছ চুরিকে চুরি বলা হয় না। এমন কি যদি কোনও পুকুর, খাল বা নালা দ্বারা এমন ভাবে নদীর সহিত সংযুক্ত থাকে যাতে করে কিনা পুকুরের মাছ ইচ্ছা করলে নদীতে চলে যেতে পারে তাহলে ঐরূপ পুকুর হতে মৎস্য চুরি করলে উহাকে চুরি বলা হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মৎস্যগুলি বন্দীকৃত অবস্থায় [পুকুরের মালিকের হেপাজতে] নেই। উহারা সেখানে মুক্ত অবস্থায় আছে। অতএব ঐগুলি কোনও ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নয়।

তো যেতে হয় ওখানে। যাতায়াতের জন্য আপনার আশীর্বাদে আমার যখন মোটর আছে, এই পথে ফিরবার মুখে ভাড়াটা আমি নিজেই পৌঁছে দেব আপনাকে। এর পর হতে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে ভদ্রলোক নিজেই ভাড়াটা পৌঁছে দেন। বাড়িওয়ালার আর কষ্ট করে একদিনও শহরতলীতে আসতে হয় নি। এদিকে ঠগী ভদ্রলোক পাড়ার লোকদের সহিত অত্যন্ত রূপ মেলামেশা শুরু করে দেন। ঐ বাড়ির নীচের তলাটা পাড়ার ছেলেদের খেলা-ধুলা, ক্লাব ও লাইব্রেরির জন্যে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে আবালবৃদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভূরিভোজও করান হয়—এককথায় পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলেই তাঁর গুণমুগ্ধ। একদিন তিনি পাড়ার ভদ্রলোকদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন,—'হ্যাঁ মশাই! বাড়ি-ওয়ালা বাড়িটা আমায় বিক্রি করতে চাইছেন। আপনারা কি বলেন, কিনবো নাকি?' এইরূপ একটি বিশিষ্ট পরোপকারী ভদ্রলোক পাড়ায় স্থায়ীভাবে থেকে যায়—কে না তা চাইবে। সকলেই এই সাধু প্রস্তাবে তাঁকে উৎসাহিতই করেন। তাঁরা এও বলেন যে, ঐরূপ ভাগ্য কি তাঁদের হবে ইত্যাদি। এর কয়েক দিন পরে তিনি পাড়ায় রটিয়ে দেন, বাড়িটি তিনি এইবার সত্য সত্যই কিনলেন। শুধু তাই নয়, মহা ধুমধামে তিনি গৃহ-প্রবেশেরও ব্যবস্থা করলেন। এই উৎসবে খরচ-খরচা করে যাগ-যজ্ঞ তো হলই; তা ছাড়া পাড়ার স্ত্রী-পুরুষকেও তিনি ভূরিভোজন করাতে কার্পণ্য করলেন না। বাড়ির ভাড়াটা কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাড়িওয়ালাকে বাড়ি বয়ে সমান ভাবেই তিনি দিয়ে আসছিলেন। এরও দুই তিন মাস পরে তিনি সকলকে জানালেন যে এই বাড়িটা তাঁর পছন্দসই নয়। তিনি উহা আগাগোড়া ভেঙে ফেলে ঐ স্থানেই নূতন করে

বাড়ি তৈরি করবেন। এই প্রস্তাবে পাড়ার লোকে অবাক হয়, কিন্তু প্রতিবাদ করে না; তারা মনে করে ভদ্রলোক যুদ্ধের বাজারে প্রচুর উপার্জন করেছেন। এবার কোনও রূপে অতো অর্থ ব্যয় করা তো চাই ইত্যাদি। এর পর সেখানে ভাঙাইওয়ালা ডাকা হয় এবং বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে বাড়ির ইট পাথর লোহার কড়ি বরগা ও জানালা দরজা ইত্যাদি তারা ভেঙে নেয়। যুদ্ধকালীন বাজারের দরুণ এই সব লোহা, ইঁট, কাঠকুঠার অগ্নিমূল্য থাকায় ঐগুলি সহজেই বিক্রি হয়ে যায়। এব পরও মাস দুই ভদ্রলোক যথা নিয়মে বাড়িওয়ালাকে ভাড়া পৌঁছতে থাকেন। বাড়িওয়ালা তখনও পর্যন্ত জানতে পারেন নি যে তাঁর বাড়ি নেই, সেখানে তাঁর আছে শুধু এক-টুকরা জমি। এর পরের মাসে ভদ্রলোককে যথা সময়ে ভাড়াসহ আসতে [ভাড়া দিতে] না দেখে গৃহস্বামী চিন্তিত হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, 'ওরে ও খোকা! এমনটি তো কখনও হয় নি। নিশ্চয় এ ভদ্রলোকের শক্ত অসুখ করেছে। আহা-হা, বড় ভাল লোক তিনি। যা, যা দিকি একবার, দেখে আয়। শহরে কলেরা হচ্ছে, না গেলে খারাপ দেখাবে।' পিতার আদেশে খোকা রাত্রি আটটায় অকুস্থলে এসে হাজির হন, কিন্তু তাঁদের নিজ বাড়িটি বহু চেষ্টাতে খুঁজে পান না। বাড়ি এসে বিষয়টি জানালে পিতাঠাকুর হুঙ্কার দিয়ে ধমকে উঠেন, 'হারামজাদা! কক্ষনো তুই সেখানে যাস্ নি। নিজের বাড়ি খুঁজে পেলিনি, একি একটা কথা নাকি? ছিঃ ছিঃ, ভদ্রলোক কি মনে করছেন বল তো! কেউ একবার তোরা খোঁজও করলি না তাঁর।' পরের দিন বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজেই লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে অকুস্থলে এসে হাজির হোলেন—কিন্তু তাঁর বাড়ি? বাড়ি তাঁর

কোথায়? বিস্মিত হয়ে তিনি পাড়ার একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ মশাই, অমুক নম্বরের বাড়িটা কোনটে বলতে পারেন? আমি চোখে মশাই, সব আর ঠাওর পাই না। আর বয়স তো হয়েছে।' পথচারী ভদ্রলোক ততোধিক বিস্মিত হয়ে উত্তর করলেন, 'সে কি মশাই! আপনার বাড়ি না আপনি বিক্রি করে দিয়েছেন?' সকল সমাচার অবগত হয়ে গৃহস্বামী ভদ্রলোক 'হা হতোস্মি' বলে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও তিনি ঐ ঠগী ব্যক্তির এ পর্যন্ত কোনও খোঁজ পান নি—ঠগী ভদ্রলোক হয় তো এতক্ষণে ভারতের অপর আর এক জনবহুল শহরে গিয়ে আড্ডা গেড়ে লোক ঠকাচ্ছেন বা লোক ঠকাবার তালে আছেন।"

কোনও কোনও শহরে এইরূপ বাড়ি-চুরি পদ্ধতির কিছু কিছু অদল-বদল হয়েও থাকে। দুর্বৃত্তগণ প্রথমে সন্ধান নেয়, যে শহর-তলীতে কোনও বিরাট বাড়ি তৈরি হচ্ছে কিনা! বাড়ির মালিকের বর্তমান অবস্থাই বা কিরূপ? এবং ঐ বাড়ি হতে কতদূরে তিনি বসবাস করেন। এর পর দুর্বৃত্তটি একজন ধনী ব্যক্তি সেজে মালিককে আশাতীত রূপ ভাড়া দিতে চায় এবং এও সে বলে যে সে নিজেই মনের মত করে বাড়ির অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ কার্যটুকু স্বব্যয়ে সমাধা করে নেবে। এর পর দুর্বৃত্তটি বাড়িটি নিজের লোকে-দের দ্বারা তৈরি করতে আরম্ভ করে দেয়—পাড়ার লোকে মনে করে বাড়িটি দুর্বৃত্তের নিজেরই বাড়ি। কয়েক মাস সে বাড়ির মালিককে যথারীতি ভাড়াও দিয়ে আসে। এর পর একদিন সুবিধামত ভাঙাই-ওয়ালা ডাকিয়ে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকায় সমস্ত বাড়িটা ভেঙে মাল-মশলা যা কিছু—কড়ি, বরগা, জানালা, দুয়ার, ইলেকট্রিক

ফিটিংস্, জলের পাইপ, সিস্টার্ন ইত্যাদি বিক্রি করে দিয়ে সরে পড়ে। কিছুদিন পরে মালিকের দরোয়ান এসে বাড়ি না দেখতে পেয়ে মালিককে জানায়—হুজুর উঁহা কুঠি নেহি হ্যায়। উঁহা আভি সেরেফ জমীন্ হ্যায়। মালক মশাই তার এ কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি দরোয়ানকে ধমক দিয়ে বলেন, 'পাগলা হ্যায় তুম! কুঠি কোই উঠাকে লেনে সেকতা। ফিন যাও উঁহা তুম। বাবুকো ব্যামার উমার কুছ জরুর হুয়া,' ইত্যাদি।

এই বিশেষ স্থলে বাড়িটি স্থাবর সম্পত্তি হলেও উহা ভেঙে দেওয়া মাত্র ঐ ভগ্ন দ্রব্যাদি অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে—এই কারণে ঐ সম্পত্তির অপসারণ কার্যকে আমরা চুরিই বলব। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ কয়েকটি চুরি সঙ্ঘটিত হয়েছে।

পরের দ্রব্য না ব'লে নিলে আইন মত চুরি করা হয়। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে নিজের দ্রব্যাদি না ব'লে গ্রহণ করলেও উহাকে চুরি বলা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ধরুন, আপনার একটি ঘড়ি আছে। আপনি এই ঘড়িটি কোনও ঘড়ির দোকানে সারাতে দিলেন। এর পর আপনি মেরামতের দাম না দিয়ে দোকানদারের অজ্ঞাতে ও বিনানুমতিতে যদি ঘড়িটি নিয়ে আসেন তো আপনার এই কার্যকে আইনানুসারে চুরি বলা হবে। এ ছাড়া কেহ বাড়ির কোনও অপ্রকৃতিস্থমনা কিংবা নির্বোধ লোক বা অল্পবয়স্ক বালকের নিকট হতে বাড়ির বড়দের অগোচরে কোনও দ্রব্যাদি চেয়ে নিলেও ঐরূপ অপকার্যকে চুরি বলা হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে চৌর্য অপরাধের সংজ্ঞা [definition] দ্রষ্টব্য।

চৌর্য অপরাধের অযৌনজ পদ্ধতির ন্যায় যৌনজ পদ্ধতিও পরি-

লক্ষিত হয়। প্রেম করবার অছিলায় দুর্বলচিত্ত ধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করে মূল্যবান দ্রব্য এবং অর্থাদি অপহরণ করেছে, এমন কন্যারও পৃথিবীতে অভাব নেই। তবে এদেশে এই প্রকার মেয়ের সংখ্যা এখনও অত্যল্প। এই স্থলে কারুর মন চুরির কোনও প্রশ্ন উঠে না। এখানে মাত্র দ্রব্যাদি চুরির কথাই উঠে। কারণ এই সকল মেয়েদের নিকট মনের কোনও বালাই নেই। এই প্রকারের চুরির দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হল।

"সেদিন ছিল শনিবার। কাজ-কর্ম সেরে আমি উঠে পড়ছিলাম। এমন সময় এক ডাক্তার ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এসে নালিশ জানালেন। নালিশটি ছিল এইরূপ: আমি অমুক গণিকার গৃহে চিকিৎসা করতে গিছলাম। আমার রুপার ঘড়িটা সময় নির্ণয়ের জন্য চৌকির উপর খুলে রেখে আমি মেয়েটির নাড়ি দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জল দ্বারা হস্ত ধৌত করে চৌকির কাছে এসে দেখি যে আমার ঘড়িটি সেখানে নেই। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার ঘড়িটি ঐ মেয়েটিই চুরি করেছে। এই এজাহারটি ছিল চুরির পুলিশগ্রাহ্য অপরাধ। এই কারণে বিষয়টি সম্বন্ধ সম্যক-ভাবে তদন্ত করতে হয়েছিল। তদন্ত ব্যপদেশে কথিত গণিকাটিকে আমি প্রশ্ন করি, ডাক্তার সাহেব যা বলছেন তা সত্যি? গণিকাটি তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে এইরূপ একটি বিবৃতি দেয়—কিছুটা সত্যি, সবটা নয়। উনি ওঁর প্রোফেশনাল কলে আমার বাড়ি আসেন নি, উনি আমার বাড়ি এসেছিলেন আমার প্রোফেশনাল কলে। বিশ্বাস না হয় দেখুন ওঁর ডান উরুদেশে। ওখানে একটা কালো তিল আছে কিনা? এর পর ডাক্তারবাবু একবারমাত্র খিঁচিয়ে উঠেন, কিন্তু তার পরেই তিনি সলজ্জ ভাবে অধোবদন হয়ে যান। কিন্তু

এদের ভিতরের ব্যাপারটি যাই হোক না কেন আসলে এই সুযোগে গণিকাটি তাঁর ঘড়িটি যে চুরি করেছিল তাতে আর সন্দেহ ছিল না।”

বেশ্যালয়ে এইরূপ চুরি হামেসাই হয়ে থাকে। গণিকাদের চাকর-বাকররাও এইভাবে চুরি করে। মদ্যপানে অচৈতন্য যুবকদের পকেট হাতড়ানো বেশ্যালয়ের এক স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই যৌনজ চৌর্য পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি বিশেষ বিবৃতি উদ্ধৃত করা যাক।

“আমি মশাই একজন শিক্ষিত চোর। জনৈক মাড়োয়ারীর গৃহে আমি শিক্ষক নিযুক্ত হই। দুইটি ছোট ছোট শিশুকে আমি ইংরাজি পড়াতাম। দুপুরবেলা কেউ বাড়ি থাকত না। এই সুযোগে আমি মাড়োয়ারীগিন্নির সহিত আলাপ জামাই। আসলে কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল চুরি করা। আমার উদ্দেশ্য প্রেম করা ছিল না। এমনি কিছুদিন যাবৎ সংলাপের পর একদিন আমি এইরূপ এক আবদার করি—আপকো যেতনা আচ্ছি আচ্ছি কাপড়া হায়, উস সব পিনকে মেরি সামনে খাঁড়া হো যাও। হাম ইস রূপ আঁখ ভরকে দেখ লেঙ্গে—মেরি পিয়ারী, এ মেরি ভিক্ষা হ্যায়। আমাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে প্রিয়তমা আমার তৎক্ষণাৎ তার সব চেয়ে ভাল শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে। শুধু তাই নয়, হীরা জহ রৎ বসান তার সমুদয় গহনাগুলিও সে গায়ে দেয়। কপালে টিকলি হতে গলায় হার এবং হাতের বাজু, চুড়ি প্রভৃতি—মণিমাণিক্য খচিত অলঙ্কারে সে ভূষিত হয়ে উঠে। আমি গদগদ চিত্তে সে রূপ নেহারিয়া মুগ্ধ হয়ে বলে উঠি—হ্যায় হ্যায় হ্যায় কেয়া বলে! ইতো আশমান। দুনিয়ামে কাঁহা বেহস্ত হ্যায় তো উ ইহাই। উত্তরে প্রিয়তমা

আমাকে জানায়, হামি তো তুহরি, জনাব। এর পর আমি তার নগ্ন সৌন্দর্য দেখবার অজুহাতে একে একে নিজ হস্তে তার সমস্ত গহনাগুলি খুলে একটা রুমালে বেঁধে তা তার ডান পাশে রাখি। তার মূল্যবান কাপড়-চোপড়গুলি রাখি একটা পুঁটলি বেঁধে তার বাম পাশে। এর পর আমি গদগদ চিত্তে অনুরোধ করি, আচ্ছা! আভি আঁখ বুদ। প্রিয়তমা আমার চক্ষু মুদলে আমি আবেগময় ভাবে বলে উঠি—হায় হায়, কেয়া বোলে, ইত্যাদি। এর পর আমি তাকে চক্ষু খুলবার আদেশ জানাই, আঁখ্ খুল। এই অনুরোধ উপরোধটি খেলাচ্ছলেই হতে থাকে। এইভাবে কয়েকবার সে চক্ষু মুদ্রিত ও উন্মুক্ত করে। শেষের বার সে চক্ষু মুদ্রিত করা মাত্র আমি দুই হাতে দুইটি পুঁটলি গ্রহণ করে দাঁত দিয়ে দরজার খিল খুলে একেবারে রাস্তায় পাড়ি দিই। আমি পরে শুনেছি যে চক্ষু খুলবার পুনরাদেশ না পেয়ে প্রিয়তমা নিজেই চক্ষু উন্মুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে এও বুঝতে পারে যে তার যাবতীয় অলঙ্কারাদি চুরি হয়ে গেছে। সে 'চোর চোর' বলে চীৎকার করে উঠে বটে কিন্তু আসল তথ্যটি কারও কাছে প্রকাশ করে না।"

উপরের দৃষ্টান্তটি হতে চৌর্য অপরাধের যৌনজ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষরূপে বুঝা যাবে। এমন অনেক স্বামী রাত্রিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীর অলঙ্কার চুরি করে এই চৌর্য কার্যের জন্যে বাইরের কোনও চোরকে দায়ী করেছেন। এমন কি এইভাবে তিনি থানায় এসে এজাহারও দিয়েছেন। এ ছাড়া এমন অনেক দুর্বৃত্ত কেবলমাত্র তার গহনা চুরি করার জন্যে সালঙ্কারা কন্যার সহিত প্রেমাভিনয় করেছে। এই সব মেয়েরা তাদের প্ররোচনায় মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও অর্থাদি-সহ এই সব ভাবী স্বামীর সহিত গৃহত্যাগ করে এবং পরে এদের

দ্বারাই সর্বস্বান্ত হয়ে সহায়-সম্বলহীন ভাবে পরিত্যক্ত হয়। এইরূপ এক দুর্বৃত্তের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"মেয়েটিকে তার যাবতীয় গহনাপত্রসহ ফুসলে এনে তাকে অমুক ষ্ট্রীটের একটা কামরায় তুলি। এই সময় সমুদয় অলঙ্কারাদিই তার দেহে পরা ছিল। আমি গদগদ ভাবে তাকে এই সময় জানাই, তুমি যে কত সুন্দর তা আমি আজ বুঝছি। এত কাছে না পেলে এরূপ কোনদিনই আমি উপলব্ধি করতে পারতাম না। আজিকার এ মধু যামিনীতে সামান্য ধাতু নির্মিত গহনা তোমার আমার মাঝে কি প্রাচীর তুলবে? আজিকার এই মধু যামিনীতে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না। এর পর আমার অনুরোধে প্রিয়া আমার তার দেহের সকল গহনাপত্র খুলে রাখে। এর পর গভীর রাত্রে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়লে গহনার পুঁটলিটি নিয়ে আমি চম্পট দিই। বলা বাহুল্য যে আমার নামধাম বা ঠিকানা পদবী সবই তাকে আমি মিথ্যে বলেছিলাম। এর পর মেয়েটির অদৃষ্টে কি ঘটেছিল সেই সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলতে আমি অক্ষম।"

বামাল গ্রাহক

চোরাই মালের গ্রহীতাদের বামাল গ্রাহক, খাউ বা "রিসিভার অব্ স্টোলেন্ প্রপারটি" বলা হয়। এই সকল বামাল গ্রাহকগণ নিজেরা কখনও চৌর-কার্যে লিপ্ত থাকে না—অথচ এই সব গ্রাহকরাই লাভ করে বেশি। পাঁচশত টাকার মূল্যের দ্রব্যাদিও এরা মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকায় চোরদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। বিভিন্ন রূপ দ্রব্য বিভিন্ন প্রকার গ্রাহকগণ নিয়ে থাকে। সাইকেলের দোকানে সাইকেল, কাপড়ের দোকানে কাপড় এবং সোনার দোকানে সোনা বিক্রয় হয়ে থাকে। এ ছাড়া, এমন অনেক দালাল আছে যারা এই দ্রব্য সামান্য মাত্র মূল্যে ক্রয় করে। কলকাতা শহরে এমন অনেক ব্যবসায়ীও আছেন, যাঁরা সামান্যমাত্র মূল্যে হাজার টাকার নম্বরী নোট ক্রয় করে থাকেন—এই সব নোট তাঁদের কারবারে প্রায়ই লেন-দেন হয়। এই কারণে ধরা পড়লেও তাঁদের একটা কৈফিয়ৎ থাকে এবং তাঁরা আইন এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এই শহরে এমন অনেক পোদ্দার আছে যারা গহনাদি পাবা মাত্র তৎক্ষণাৎ উহা গলিয়ে ফেলে সোনার বাট তৈরি করে ফেলে; শুধু তাই নয়, পরদিনই এই সোনার বাট তাঁরা অন্যত্র চালান করে দিয়ে থাকেন। এই সব লেন-দেনের ব্যাপার পরিচিত চোরেদের সহিত হলে তাঁরা এ সম্বন্ধে নথি-পত্রে কোন জমা বা খরচ লেখেন না। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হ'তে পেলে পাঁচ টাকা মূল্যে কিনলেও উহা তাঁরা পঞ্চাশ

টাকায় [উচিত মূল্য] কিনেছেন,—তাঁদের জমা বহিতে [কখনও কখনও] তাঁরা এইরূপ লিখে রাখেন। এমন কি ঐ সকল বিক্রেতার একটি সইও তাঁরা ঐ খাতায় নিয়ে থাকেন।

এই সকল পোদ্দাররা সব সময়ই চোরেদের অপেক্ষায় হাপর জ্বালিয়ে বসে থাকেন। আমার মতে এই সকল পোদ্দারদের লাইসেন্স দ্বারা আয়ত্তাধীন করলে অসাধু পোদ্দারগণ এখনই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। চুরি করে গলানো দ্রব্যের বিক্রয়ের অসুবিধা ঘটলে চোরেরাও চুরি করবে কম। এই সব লাইসেন্স এদের চরিত্র সম্বন্ধে রীতিমত তদন্ত করে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে সাধু চরিত্রের পোদ্দারগণেরই প্রাদুর্ভাব হবে। এই সকল পোদ্দারগণের ন্যায় শহরের পুরানো সাইকেলের দোকানগুলিরও লাইসেন্স হওযা উচিত। এই সকল সাইকেল গ্রাহকগণ চোরাই সাইকেল ক্রয় করা মাত্র উহা ডিস-ম্যাণ্টেল করে [খুলে ফেলে] উহার বিভিন্ন অংশগুলি অন্যান্য সাইকেলের অংশের সহিত বিনিময় করে নেয়। অর্থাৎ এর অংশটি ওর সঙ্গে এবং ওর অংশটি এর সঙ্গে এরা যুক্ত করে দেয়। এর জন্য সাইকেলের মালিক সহজে তার সাইকেলটি চিনে নিতে পারে না। চোরাই সাইকেল এবং টাইপরাইটার প্রভৃতি হতে নম্বরগুলি তুলে ফেলে তৎস্থলে অন্য নম্বর খোদাই করতেও দেখা গেছে। কিন্তু এই সব চালাকি অধুনা যুগে সকল সময় কার্যকরী হয় না। কারণ খোদাই করার সময় যে চাপ পড়ে সেই চাপ সূক্ষ্মভাবে ধাতু নির্মিত বস্তু মাত্রেরই শেষ স্তর পর্যন্ত [সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে] বিস্তৃত হয়ে থাকে। আপাত দৃষ্টিতে এই নম্বর মুছে গেলেও আসলে ঐগুলি আদপে মুছে না। উপরের স্থুল অংশ উখার সাহায্যে উঠিয়ে ফেললেও নিম্নের সূক্ষ্মাংশের বিলোপ ঘটে না। এক রকম কেমিক্যাল

আছে যাহার প্রলেপ ঐ মুছে যাওয়া অংশে নিক্ষেপ করা মাত্র ঐ নম্বর সূক্ষ্মভাবে প্রকট হয়।

বিভিন্ন রূপ চোরাই মালের মধ্যে মূল্যবান মোটরকার একটি অন্যতম সামগ্রী। কিন্তু এই চোরাই মোটরকার কারুর কাছে বিক্রয় করা সম্ভব নয়। এই জন্যে এই সব গ্রাহকগণ মোটরকারগুলি ডিস্‌ম্যান্টেল করে উহার বিভিন্ন অংশগুলি বিক্রয় করে অর্থবান হয়ে থাকেন। এদের কেহ কেহ কলকাতার দ্রব্যাদি বোম্বাই শহরে এবং বোম্বাইয়ের দ্রব্যাদি মাদ্রাজে বা কলকাতায় বিক্রয় করে থাকেন। আজকাল স্থবিধা মত নেপাল প্রভৃতি ভিন্ন রাষ্ট্রে এরা পুরা গাড়িটা চালান করে দেয়।

এই সকল চোরেরা চোরাই মাল দোকানে পৌঁছবার সময়ও অত্যন্তরূপ সাবধানতা অবলম্বন করে। বিশেষ করে রাত্রিকালে এই সাবধানতার প্রয়োজন থাকে। ভারি দ্রব্যাদি হলে ঐ দ্রব্য তারা কোনও এক রিক্সাতে তুলে দেয় এবং নিজে ঐ রিক্সায় দ্রব্যসহ না বসে রিক্সার পিছন পিছন চলতে থাকে। পুলিশ কিংবা অপর কেহ সন্দেহ করে রিক্সা আটকালে এরা পিছন হতে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। রিক্সাচালক বামালসহ ধরা পড়লেও সে আসল চোরের ঠিকানাদি সম্বন্ধে কোনও কিছু জানাতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বামাল রিক্সায় তুলে দিয়ে রিক্সাকে তিন মাইল দূরের কোনও একস্থানে অপেক্ষা করবার জন্যেও নির্দেশ দেওয়া হয়। আসল চোর তখন ট্রামে বা বাসে করে এসে নির্দিষ্ট স্থানে বামাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও রিক্সাওয়ালা বা ঝাঁকা মুটে আদির সঙ্গে তাদের এই বিষয়ে প্রত্যক্ষরূপ যোগসাজস্ থাকে। কোনও রিক্সায় দ্রব্যাদি যাচ্ছে অথচ দ্রব্যের মালিক রিক্সার জায়গা থাকা সত্ত্বেও রিক্সায় না

উঠে পায়ে হেঁটে রিক্সার পিছু পিছু চলেছে—এইরূপ কোনও দৃশ্য দৃষ্ট হলে উহা সন্দেহজনক মনে করা উচিত। এ ছাড়া ভোরের দিকে তরি-তরকারির ঝাঁকার মধ্যে চোরাই মাল সরানো হয়ে থাকে। কারণ এই সময় তরকারিওয়ালারা গ্রাম থেকে শহরের বাজারে আসে। সন্দেহ এড়াবার ইহা এক প্রকৃষ্ট উপায়। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি ও লোহা-লক্কড়ের দ্রব্যাদি তারা শহরের বিভিন্ন কালোয়ার গ্রাহকদের নিকট ঐ ভাবে বিক্রয় করে থাকে। এই সকল কালোয়ার গ্রাহকদের এক-একটি প্রকাশ্য দোকান ও গুদাম থাকলেও এই সকল বামাল নিরাপদে গুদামজাত করবার জন্যে এরা কতকগুলি গোপন গুদামও রেখে থাকে।

এমন সব বামাল গ্রাহক আছে যারা গবাদি জীব ক্রয় করে অ্যাসিড ও অগ্নির সাহায্যে তাদের বাঁকা শিঙ সোজা এবং সোজা শিঙ বাঁকা করে দিয়ে থাকে; উদ্দেশ্য, সনাক্তকরণ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করা। একটি ক্ষেত্রে চুরি করে আনা নিহত সাদা ছাগলের সাদা চামড়া কালো কালী দ্বারা কালো চামড়া করা হয়েছিল। একবার পাঁটী চুরির মামলাতে ছাগ মাংস উদ্ধারার্থে পুলিশ তল্লাসীতে আসছে শুনে কোনও এক দুর্বৃত্ত তাড়াতাড়ি এক পাঁটার অণ্ডকোষ কিনে মাংসের তপ্ত কড়াতে রেখে প্রমাণ করে যে উহা পাঁটা—পাঁটী নয়। কোনও কোনও বামাল গ্রাহক বস্ত্রাদি চুরি করে ঐ কাপড়গুলিকে ছাপিয়ে নেয়। কখনও বা তারা মাড় লাগিয়ে ঐগুলিকে তাঁতের কাপড়ে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়ে থাকে।

শহরে এমন অনেক ভাঙাইওয়ালা এবং বিক্রিওয়ালা আছে, যারা একমাত্র বামাল গ্রহণ দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শহরের বিভিন্ন চোরাবাজার বা চোরাহাট্টার মিশ্র দ্রব্যের

[পুরানো দ্রব্যের] দোকানগুলিও এই সকল চোরাই মাল গ্রহণ করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পুরানো চোরেরাও বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ দোকানের মালিক হয়ে থাকে। অপর দিকে পুরানো পুস্তকাদি বিক্রয় হয় পুরানো বইএর দোকানে। বাটীর বিপথগামী পুত্রেরাও ঐরূপ পুস্তক বিক্রয় করেছে। বলা বাহুল্য, চুরির পরই এই সব বইএর উপর লিখিত মালিকের নাম ও ঠিকানা মুছে ফেলে দেওয়া হয়ে থাকে। তবে সকল সময়ই সকল পুরানো দোকানের মালিকরাই যে জেনে-শুনে চোরাই দ্রব্য গ্রহণ করে তা নয়। এদের মধ্যে বহু সৎ ব্যক্তিও আছে। এরা সন্দেহ হওয়া মাত্র এই সকল বিক্রেতাকে আটকে রেখে পুলিশে খবর দিয়েছে। এই সকল চোরাই দ্রব্যের গ্রহীতাদের কাহাকেও কাহাকেও লোক ঠকাতেও দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে নিম্নের এই সম্পর্কিত বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি চোরাহাট্টার কোনও এক পুরানো দোকানে এলে এক জোড়া বুট জুতা মাত্র দশ টাকায় ক্রয় করি। এই জুতা জোড়া ছিল একেবারে আনকোরা নূতন। উহার আসল মূল্য অনুমান মত অন্ততঃ ত্রিশ টাকা হবে। মূল্য পাওয়া মাত্র দোকানদার সযত্নে জুতা দুটি একটা কাগজের মোড়কে পুরে মোড়কটি সুতা দ্বারা ভাল রূপে বেঁধে দেয়। আমি সানন্দ চিত্তে মোড়কটি নিয়ে গৃহে ফিরি। কিন্তু উহা খোলা মাত্র অবাক হয়ে যাই। সেখানে নূতন বুটের বদলে মোড়কটির মধ্যে ছিল এক জোড়া পুরানো ছেঁড়া বুট। হাতসাফাইএর সাহায্যে দোকানদার কখন জুতা বেমালুম বদলে দিয়েছে। এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও আমি টেরই পাই নি। আমি তৎক্ষণাৎ উক্ত দোকানে ফিরে আসি এবং এ সম্বন্ধে অভিযোগ জানাই। দোকানদার আমার এই অভিযোগ সরাসরি

অস্বীকার করে বলে উঠে—'এ আপনি বলেন কি বাবু! আমরা কি ওই রকম মানুষ! যাক। গোলমাল করে লাভ নেই। আসুন! আমার কাছে আর এক জোড়া নূতন বুট আছে। ওটা আপনি পাঁচ টাকায় নিযে যান। অর্ধেক দরেই ওটা ছেড়ে দিলাম আপনাকে।' আমি ততোধিক আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখি যে দোকান-দার আমার সেই পূর্বপরিচিত বুট জোড়াটাই বার করছে। এর পর আর আমি বোকা বনি নি। আমি বুট জোড়াটা পরিধান করে আমার পুরানো জুতাটা মোড়কে পুরে বাড়ি ফিরি।" *

এদেশে পর্দা প্রথার সমধিক প্রচলন থাকায় অপরাধীরা বামাল পাচারের জন্যে প্রায়ই নারীদের সাহায্য নিয়ে থাকে। খানাতল্লাসীর [বাড়িতল্লাসী] সময় আইনানুযায়ী মেয়েদের সসম্মানে এক কক্ষ হ'তে অপর এক কক্ষে সরে যাবার সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এই সুযোগে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেয়েরা স্বামীর নির্দেশে দ্রব্যাদি বোরখা বা শাড়ির ভিতর করে পর্দার অন্তরালে সরিয়ে নেয়। এইরূপ অবস্থার মধ্যে সন্দেহের কারণ ঘটলে অপর কোনও এক নারীর সাহায্যে এই সব মেয়েদের দেহতল্লাসী নেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু পর্দাপ্রথা প্রচলিত থাকায় ঐরূপভাবে দেহতল্লাসী নেবার মত কোনও স্থানীয় নারী অকুস্থলে পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠে। এই

[ফলমূল এবং অন্যান্য দ্রব্যের দোকানেও এইরূপ হাত সাফাই-এর মারপ্যাঁচ দেখা যায়। ভাল এক টুকরি আম দেখিয়ে পচা আমের টুকরি গছিয়ে দেওয়ারও দৃষ্টান্ত আছে। ডেলিভারি বা সম্প্রদানের কালে সুবিধামত আসল দ্রব্যের বদলে নকল দ্রব্য গছিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।]

সময় নারী-পুলিশের প্রয়োজন অত্যন্ত রূপ উপলব্ধি হয়। আমি এমন অনেক অপরাধীকে জানি যে বোরখাবৃত আপন নারীর দ্বারা বামালাদি অন্যত্র প্রেরণ করত। বোরখার ভিতরে করে জেনানাটি দ্রব্যাদিসহ পথ চলত এবং সে নিজে চলত তার পিছন পিছন—এইরূপ অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ই বামালসহ ধরা পড়ে যায়। পুরুষদের সাহায্যকল্পে কোনও কোনও নারী যৌন-দেশে নোটের বাণ্ডিল এবং কার্তুজাদি লুকিয়ে রেখেছে. এ দেশেতে এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

বামাল গ্রাহকেরা কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্যে লিপ্ত থাকে না। এরা প্রায়ই বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবান হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ নিম্ন শ্রেণীর গ্রাহকদেরও শহরে অভাব নেই। এরা চোরেদের সহিত পরিচিত থাকলেও কখনও সাক্ষাৎ ভাবে চৌর্য কার্যে লিপ্ত হয় না। এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল—মৎ প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত কলিকাতা পুলিশ জর্নাল, ১ম খণ্ড—পাগলা হত্যার মামলা দ্রষ্টব্য।

"জ্যোৎস্নায় আলোকে সাঁতারে গঙ্গা পার হয়ে এপারে উঠে দেখি খো-বাবু তার দল-বল সহ ঘাটের পাড়ে জটলা করছে। এই দলে নিহত পাগলাকেও আমি দেখতে পাই। এ সময় এরা পাগলাকে মদ খাওয়াচ্ছিল। আমিও কিছু চোরাই মাল পাবার আশায় তাদের দলে যোগ দিই। এরা পথ চলতে থাকে, আমিও কিছু দূর অগ্রসর হই। এর পর খো-বাবু সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠেন, 'একে আমরা ট্যাপ করব।' আমি বুঝতে পারি এদের চুরির উদ্দেশ্য নয়। ব্যাপার বেগতিক বুঝে এদের দল হতে আমি সরে পড়ি। আমি একজন চোরাই মালের গ্রাহক।

কোনও খুন-খারাপী বা চুরির মধ্যে আমি যাব কেন? বাবু! ও সবে আমাদেব বড় ভয়।"

[বারগ্লার, পকেটমার, প্রবঞ্চক ও ডাকাত প্রভৃতির গ্রাহক ভিন্ন ভিন্ন হয়। কেবলমাত্র প্রচীন গাঁটকাট্টাদের বামাল গ্রাহক নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে গাঁটকাট্টাদের গ্রন্থিচ্ছেদক বলা হয়েছে।]

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় চোরেরা তাদের দ্রব্যাদি তাদের গ্রামেরই জোতদার প্রভৃতিকে বিক্রয় করে। কয়েক ক্ষেত্রে মাতব্বরগণ না আসা পর্যন্ত ঐ চোরেরা মাটিতে অপহৃত দ্রব্য পুতে ঐ স্থানের উপর মাদুব বিছিয়ে সুখে বহুক্ষণ নিদ্রা দেয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত গ্রাম্য মাতব্বরগণ গরুব গাড়ি করে তীর্থযাত্রী বা ব্যবসায়ীর বেশে এদের পিছু পিছু গ্রাম হতে গ্রামান্তরে গমন করেছে। চৌর অভিযানে বহির্গত এই চোবেরা চুরি করে দ্রব্যাদি পশ্চাদাগত গো-শকট আরোহীদের নিকট পাচার করে দিয়েছে।

রেলওয়ে অপরাধ

স্বল্প দূরের বহু যুবক দল বেঁধে কলকাতাতে বেড়াতে আসে। স্টেশনে এসে তারা শোভাযাত্রার সামিল হয়। এরা শ্লোগান দিতে-দিতে পকেট হতে ঝাণ্ডা বার করে বার হয়ে আসে।

মালগাড়িকে 'বিপথে চালন' তথা ওআগান ডাইভারশন রেলওয়ের অন্যতম অপরাধ। এই মালগাড়ির গন্তব্য স্থল অনুযায়ী তাদের গাত্রে রং দিয়ে এক একটি চিহ্ন অঙ্কিত করা হয়। এর পর এই মাল গাড়ি-গুলি একত্রে কোনও জংশন স্টেশনে এলে উহাদের এক একটি করে সান্টিং দ্বারা আলাদা করে [সর্ট আউট] তাদের প্রত্যেকের গাত্রের আঁকা চিহ্নানুযায়ী এক এক গন্তব্যস্থলে পাঠানোর জন্য এদের এক একটি গুডস্ ট্রেনে সংযুক্ত করা হয়। এই দুর্বৃত্তরা তাদের মনোনীত ওআগানটির গায়ে পূর্ব চিহ্ন উঠিয়ে সেখানে অন্য এক গন্তব্যস্থানের চিহ্ন অঙ্কিত করে। এর ফলে যে ওআগানটির মালদহে বা মেদিনীপুরে যাওয়ার কথা তাকে আসানসোল বা চিৎপুর ইআর্ডে পাঠানো হয়। অপরাধীদের অঙ্কিত ঐ সকল চিহ্নকে ভুয়া চিহ্ন রূপে না বুঝে রেলওয়ে কর্মীরা সরল বিশ্বাসে ঐ রূপ ব্যবস্থা করে থাকে। তবে এ বিষয়ে কোন কোন রেলকর্মীর সড় থাকাও অসম্ভব নয়। এই ভাবে ওআগানকে বিপথে চালান করে তাদের দলের আস্তানার কাছে এরা আনে। ওদিকে ঐ ওআগানটিকে রেলকর্তৃপক্ষ বহু কাল খুঁজে বার

করতে পারে না। এই ভাবে সুবিধাজনক স্থানে এনে অপদল ঐ ওআগান ভেঙ্গে উহার মূল্যবান দ্রব্যাদি লুঠ করে নেয়। এই উদ্দেশ্যে রেল লাইনের দুপার্শ্বে জমি জবর দখল করে এরা কলোনী পর্যন্ত স্থাপন করেছে। ঐ সকল কলোনীতে ডোবা ও পুষ্করিণীতে জলের তলাতে এরা লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি ডুবিয়ে রাখে। এ কার্যে বাধা পেলে ঐ কলোনী হতে শত শত লোক একত্রে মারাত্মক অস্ত্র সহ রেলরক্ষী ও পুলিশের সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রকৃত পক্ষে আজও পর্যন্ত এদেব এই বাসাগুলি ভেঙে দেওয়া হয নি। এই বাসা না ভাঙা পর্যন্ত এদের উৎপাত বন্ধ হবে না। বরং এদেব সংখ্যায় উত্তরোত্তর বর্ধন ঘটবে।

কযেকটি ওআগানে এরা খড়ি দিযে সাঙ্কেতিক ভাষা লিখে—যথা, 'চলরে চলরে নও জোযান।' এই কবিতার পঙক্তি হতে গন্তব্য স্থলে ইহা পৌঁছুলে দস্যুরা বুঝে নেয় যে কোন ওআগানে মূল্যবান দ্রব্য আছে। এরা চলন্ত গাড়িতে উঠতে ও নামতে এবং দ্রুত গতিতে ভাঙাভাঙিতে সদা অভ্যস্ত। এদের উৎপাতে রেল কোম্পানিকে প্রতি বৎসর ক্ষতি পূরণ বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসাযীদের বৃথা গচ্ছা দিতে হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে অসাধু রেলরক্ষী ও পুলিশের সাথে এদের বন্দোবস্ত থাকা অসম্ভব নয়।

প্রায়ই দেখা যায় যে ওআগান ভাঙিয়েদের দ্বারা পরিবৃত স্থানে মালগাড়ি হঠাৎ থামানো হয়। কিংবা উহার গতি মন্থর করা হয়। এর পর ভাঙা-ভাঙির কাজ শেষ হলে উহা চালানো হয়। বহু ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তিন টাকা রোজে ওদের নিয়োগ করেও থাকেন। এমন কি রাস্তার উপর ঐ সব মাল বহনের জন্ত লরি বা টেম্পোও মোতায়েন করে রাখা হয়।

রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধ বহু প্রকারের হয়ে থাকে। এই অপরাধের দ্বারা অপরাধীরা রেলওয়ে যাত্রীদের এবং রেলওয়ে কোম্পানিকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। এই সকল অপকর্ম সম্বন্ধে এইবার একে একে আলোচনা করব। প্রথমে রেলওয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের অপকর্ম সম্বন্ধে বলা যাক। এই প্ল্যাট্‌ফর্মে পিকপকেট চোর এবং ঠগীদের বিভিন্ন দল স্ব স্ব রীতি অনুযায়ী মানুষের দ্রব্য ও অর্থাদি অপহরণ করে। যাত্রীদের নিযুক্ত কুলি হারানো এদেশের একটি সচরাচর ব্যাপার। এ জন্যে যাত্রীদের অসাবধানতা এবং সাশ্রয় প্রীতিই বেশি দায়ী। সস্তার তিন অবস্থা—এ কথা জেনেও এঁরা সস্তায় পাওয়ার জন্যে বাহিরের কুলি নিযুক্ত করেন। এঁরা রেল কোম্পানির নিযুক্ত নম্বরী কুলি নিয়োগে বিরত হন। এদের উভয়ের পারিশ্রমিকের তফাৎ কিন্তু সামান্যই থাকে। প্রায়ই শোনা যায় যে অমুক যাত্রী কুলির মাথায় মাল চাপিযে হাওড়ার পোলের উপর দিযে আসছিলেন। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কুলি মহাশয় দ্রব্য সমেত উধাও হয়েছেন। তাকে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এই সব ক্ষেত্রে যাত্রীরা প্রাযই রেল কোম্পানির নম্বরী কুলি নিযুক্ত করেন নি। এই সব কুলি ছাড়া পিকপকেট, ঠগী এবং চোরেরাও প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর ভিড় জমায়। প্ল্যাট্‌ফর্মের চুরির একটি বিশেষ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে বলা হ'ল। এ সম্পর্কে জনৈক ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধার এই বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধা মহিলা। প্ল্যাট্‌ফর্মের ভিড়ে আমি টিকিট কিনতে পারছিলাম না। এমন সময় একজন ভদ্রলোক দয়া করে উপযাচক হয়ে আমার টিকিটখানা কিনে দিতে চাইলেন। আমি এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঁচটা টাকা দিই। ভদ্রলোক

টাকা ক'টা গুণে নিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন, বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি আর ফিরলেন না।"

এই বিশেষ অপরাধীকে বিশ্বাসঘাতক না বলে চোর বলা হয়। কারণ এই ক্ষেত্রে টাকা কয়টি তার নিকট বৃদ্ধা আইনতঃ গচ্ছিত রাখে নি। টাকা কয়টি তার হাতে বৃদ্ধা তুলে দিলেও উহা তার নিজ অধিকার-ভুক্ত ছিল। এ স্থলে সে এই অর্থের বহনকারী মাত্র।

রেলওয়ে যাত্রীদের ন্যায় রেলওয়ে কোম্পানিকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যেও এই প্ল্যাট্‌ফর্ম ব্যবহৃত হয়। এই সম্বন্ধে আমি জনৈক অপরাধীর একটি বিবৃতি তুলে দিলাম। এই বিবৃতি হতে বক্তব্য বিষয়টি বুঝা যাবে।

"আমাদের ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনেই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করছিলাম। আমাদের একজন মাত্র টিকিট ক্রয় করেছিলাম। একজন প্রথমে ঐ একখানা টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসি। এর পর সেই ব্যক্তি বাকি পাঁচজনের জন্য পাঁচখানি প্ল্যাট্‌ফর্মের টিকিট কিনে পুনরায় ভিতরে ঢুকে। আমরা তখন সকলেই ঐ টিকিটের সাহায্যে বাহিরে আসি। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে আমরা একপ্রকার অভিনয় করি। আমাদের মধ্যে যার কাছে একখানি টিকিট আছে, তাকেই সব কয়টি দেখাতে বলি। সে তখন তার হাতের টিকিটটা বার করে ন্যাকা সেজে বলে উঠে, 'বারে! আমি তো একখানি টিকিটই কিনেছি। বাকি টাকা তো আমার কাছেই রয়েছে।' আমরা তখন ভীষণ ভাবে তার এই বোকামি ও ভুলের জন্য তাকে ধমকাতে শুরু করি। টিকিট চেকার আমাদের এই সকল কথা বিশ্বাস করে এবং যে স্টেশন থেকে ঐ একখানা টিকিট কেনা হয়েছিল, ঐ স্টেশন থেকেই ভাড়া চার্জ করে চেকার ভদ্রলোক আমাদের রেহাই দেন। আরও পিছনের

কোনও স্টেশন থেকে আমাদের এ জন্য ভাড়া বাবদ অধিক মূল্য দিতে হয় না। প্রায়শঃ আমরা আমাদের একজন বাদে বাকি সকলে বিনা টিকিটে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করি। অবশিষ্ট ব্যক্তিটি আমাদের চাপরাশী বা চাকর সেজে তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে উঠে বসে। ধরা পড়ার পর আমরা ঐ তথাকথিত চাপ-রাশীকে আমাদের টিকিট দিতে বলি এবং টিকিট না কেনার জন্যে তাকে ধমকা-ধমকিও করি। ঐ ব্যক্তি তখন টিকিট কিনতে না পারার জন্যে নানা অজুহাত দেখায় এবং আমাদের পাঁচজনের দরুন টিকিট ক্রয়ের জন্যে যে প্রয়োজনীয় টাকা আমরা তাকে দিয়েছিলাম তার প্রমাণস্বরূপ টাকা কয়টা টিকিট চেকারের সম্মুখেই সে আমাদের ফেরত দেয়। চেকার ভদ্রলোক তখন আমাদের কথাতে বিশ্বাস করে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটে পরিদৃষ্ট স্টেশন হতেই তিনি আমাদের ভাড়া চার্জ করেন। তবে এই ভাবে আমরা ক্বচিৎ কদাচিৎ ধরা পড়ে থাকি। রাত্রিকালে সদাসর্বদাই আমরা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাতায়াত করে থাকি। এই সময় সারা রাত্রি আমরা ভিতর হতে ছিটকানি লাগিয়ে দুরজা জানালা বন্ধ করে রাখি। এই ব্যবস্থাতে টিকিট চেকাররা গাড়িতে উঠতে পারে না। কোনও জংশন স্টেশনে এসে স্টেশন কর্মচারীদের আমরা জানাই, 'আমরা প্রিন্স, অব, অমুক এবং তাঁর পার্টি।' এবং বিবক্তির সহিত তাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, 'হাওড়া থেকে কি টেলিগ্রাম পান নি? আমাদের জন্যে কোন্ কামরা রিজার্ভ হয়েছে একুনি দেখিয়ে দিন।' আমাদের পোশাক ও মুখের চুরোট এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখে স্টেশন স্টাফের সকলে ভড়কে যায় এবং ত্রুটি স্বীকার করে তৎক্ষণাৎ প্রথম শ্রেণীর একটা কামরায় রিজার্ভ কার্ড লাগিয়ে দেয়—'প্রিন্স, অব, অমুক এণ্ড পার্টি'

এই কথা কটি তাতে লিখে। আমাদের কাছে একেবারে যে কোনও শ্রেণীরই টিকিট নেই, এই বিষয় এদের কারও মনে স্থানও পায় না। এর পর হতে রিজার্ভ কার্ডের লেখা দেখে কোনও টিকিট চেকার আর আমাদের বিরক্ত করে না। এই ভাবে আমরা অতি সহজেই গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছতে পাবি।"

বহু বিনা টিকিটের নারী ডেলি প্যাসেঞ্জার আছেন। এঁদের কাউকে আটকালে ঐ যুবতী নারী তরুণ টিকিট কলেক্টরের হাত মুঠি করে ধরে গেযে উঠে—আমার হাত ধরে সখা নিয়ে যাও, আমি তো পথ চিনি না। তরুণ টিকিট কলেকটার এতে লজ্জিত হযে উঠে তাকে ছেড়ে দেয।

বিনা টিকিটে ভ্রমণ রেলওয়ের একটি সাধারণ অপরাধ। বহু যাত্রী টিকিট বাবদ সামান্য অর্থ অসাধু রেলকর্মীর হাতে ঘুষ স্বরূপ গুঁজে দিয়ে থাকেন। বহু স্থলে স্বল্প দূরের যাত্রী হাওড়ায় বা শিয়ালদহে তাদের টিকিট কলেক্ট না করিযে সরে পডেন। পরে ফিরে এসে তাদের পূর্ব স্টেশনের টিকিট বিক্রেতাকে ঐ তারিখেই সামান্য মূল্যে উহা বিক্রয় করেন। ঐ অসাধু টিকিট বিক্রেতা ঐ তারিখেই উহা অন্য যাত্রীর নিকট বিক্রয় করে। এমন অনেক লোক আছেন যিনি নিজে টিকিট কিনলেও তাঁর সঙ্গের জেনানা যাত্রীদের জন্যে টিকিট কিনেন না। তাঁর শিক্ষা মত মেয়েরা ঘোমটার অন্তরাল হতে চেকারদের প্রশ্নের উত্তরে জানান—'পুরুষদের গাড়িতে টিকিট আছে,' এদিকে সারা গাড়ি খুঁজলেও চেকার ভদ্রলোক ঐ তথাকথিত পুরুষটিকে খুঁজে বার করতে পারেন না। এদিকে তাঁর কর্তব্যের গন্তব্য স্থানও এসে যায়। টিকিট কলেক্টারটিও ঝঞ্ঝাট না করে নেমে পড়েন। এ ছাড়া কোনও কোনও রেলওয়ে কর্মচারী পাশ পেয়ে থাকেন। এই পাশে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও

নাবালক পুত্রেরা মাত্র ভ্রমণ করার অধিকারী। কিন্তু এ সত্বেও এঁদের কেহ কেহ বাহিরের মেয়েদের নিয়ে তাঁদেরই সাজান স্ত্রী পুত্র বলে চালিয়ে ঐ পাশে ভ্রমণ করে থাকেন। কোনও এক রেল কর্মচারী ঐরূপ ভাবে তাঁর এক শ্যালিকাকে আপন স্ত্রী সাজিয়ে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ মহিলাটি ভদ্রলোককে "জামাইবাবু" বলে সম্বোধন করায় কোনও এক টিকিট চেকার তাঁদের ধরে ফেলেছিলেন। এই সব ক্ষেত্রে সঙ্গের ছোট ছোট বালকদের "পাশওয়ালা ভদ্রলোকটি" তাদের কে হন ?—এই কথা জিজ্ঞাসা করলে সত্য কথা প্রায়ই প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। বিনা টিকিটে ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

"অমুক আমার সঙ্গে মাত্র তৃতীয় মান পর্যন্ত পড়েছিল। তার পর সে স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যায়। বহুদিন পরে হঠাৎ একদিন ট্রেনের এক কামরায় তার সঙ্গে আমার দেখা হল। চোস্ত বিলাতি স্যুট পরে সে ফার্স্ট ক্লাসে বসে চুরুট টানছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম সে এখনও চাকুরির চেষ্টায় ঘুরছে। এমন কি সে রেল ভ্রমণের টিকিটও কিনে নি। ঠিক এই সময় এক টিকিট চেকারও এসে হাজির হলেন। টিকিট চাওয়া মাত্র বন্ধুবর ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাউ লঙ ইউ আর হিয়ার ? ইয়া !' তার এই চোস্ত ইংরাজি শুনে ও তার জিজ্ঞাসা করবার ভঙ্গিমায় ভড়কে গিয়ে আমতা আমতা করে চেকার ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে—আজ্ঞে, স্যার ! আমি এই তিন মাস এখানে আছি।" বন্ধুবর বিরক্তির সহিত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ইট ইজ এ উইক আই অ্যাম হিয়ার, এণ্ড ইউ ডোণ্ট নো ইওর ওন অফিসার,' অর্থাৎ আমি এক সপ্তাহ এখানে এসেছি [বদলি হয়ে] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় নিজেদের অফিসারদেরও

তুমি চেন না। বলা বাহুল্য, এরপর চেকার ভদ্রলোক অত্যন্তরূপ ভড়কে গিয়ে, 'ইয়েস স্যার, ও নো স্যার এবং সরিই স্যার' ইত্যাদি উক্তি করে ও ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছিল। আমি বন্ধুবরের সাহস দেখে সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বন্ধুবর হেসে ফেলে গর্বের সাথে আমাকে বলেছিলেন, বেটা মনে করেছে আমি ওদের নিউলি ট্রানস্‌ফারড কোনও ডি-টি-এস্ বা ঐ রকম একটা কিছু হ'ব আর কি, হে হে হে—"

এমন অনেক ভদ্র ব্যক্তিও আছেন যাঁরা প্রায়ই বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। এঁদের কেহ কেহ কম দূরের একটা টিকিট কিনে বেশি দূর পর্যন্ত ভ্রমণ করেও থাকেন। দৈবক্রমে ধরা পড়লে 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম' কিংবা মত পরিবর্তন করেছি ; আরও দূরে যেতে হচ্ছে' বলে, কিংবা 'এ্যাঁ, ঐ স্টেশন ছেড়ে এসেছি,' এই বলে আঁৎকে উঠে বা বুড়বাক সেজে বা ঐরূপ আর কোনওরূপ একটা বাহানা দ্বারা এঁরা মান বা ইজ্জত রক্ষা করে থাকেন। সঙ্গে অবশ্য এঁরা সব সময়ই প্রয়োজনীয় অর্থাদি মজুত রেখে থাকেন। কারণ এঁরা ভালরূপেই বুঝেন যে প্রয়োজনীয় টাকা টিকিট বাবদ প্রদান করলেই রেলওয়ের কানুন অনুসারে তাঁদের আর কোনও বিপদ নেই।

এই বিনা টিকিটে ভ্রমণরূপ অপরাধের অপর আর একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হ'ল। এইসম্পর্কে এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা সেবার এক অভিনব পদ্ধতিতে বিনা টিকিটে বহুদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা জন পাঁচেক লোক খাঁকি পোশাক পরে শান্ত্রী সাজি এবং আমাদের দলের ষষ্ঠ ব্যক্তিকে পলাতক সিপাই সাজিয়ে তার কোমরে দড়ি বেঁধে নিজেদের হেপাজতে রাখি, এমন ভাব দেখিয়ে যেন আমাদের পাহারাধীনে তাকে লাহোর

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে চেকার মশাইও এসে টিকিট চাইতে থাকেন। আমাদের মধ্যে যে হাবিলদার সেজেছে সে গম্ভীর ভাবে বলে উঠে—'টিকিট কর্নেল সাহেবকো পাশ হ্যায়। 'রিজার্ভ' কামরামে দেখিয়ে না উধার।' চেকার সাহেব অবশ্য খেঁকরে উঠে হুকুম জানান, 'উ হাম নেহি জানতা, লে আইয়ে টিকিট, মাঙকে।' তাকে উত্তরে আমরা জানিয়ে দিই, 'কেইসেন হোনে সেকথা! হুকুম নেহি হ্যায়। আসামী ভাগে গা, তব?' এর পর আর কারুর কথা চলে না। চেকার মশাই কিছুক্ষণ কর্নেল সাহেবের খোঁজ করেন এবং তার পর গন্তব্য স্থানে এসে পড়লে গাড়ি থেকে নেমে যান।"

ট্রাম এবং বাসেও অনেকে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে থাকেন। কণ্ডাক্টার নিকটে এলে আমরা অনেককেই জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসতে দেখেছি। আজকালকার ভিড়ের দিনে পা-দানির নিকট জটলা করেও অনেকে টিকিট কেনার দায় হতে এড়িয়ে যান। ভিন্ দেশীয় ছাত্ররা এক অভিনব উপায়ে ট্রাম কোম্পানিকে ঠকিয়ে থাকেন। অবশ্য এই কাজ তাঁরা খেলাচ্ছলেই করে থাকেন। এঁরা দল বেঁধে ধর্মতলাগামী এক ট্রামে উঠে কালীঘাটের টিকিট চান; যেন পথ-ঘাট সম্বন্ধে তাঁরা একেবারেই ওয়াকিবহাল নন্। নবাগত বিধায় এইসব জ্ঞান-পাপীদের সকলে বুঝিয়ে দিয়ে বলে—'আরে এ কেয়া কিয়া? এত একদম উল্টা হো যাতা।' এর পর অপ্রস্তুততার ভাব দেখিয়ে এঁরা হুড়মুড় করে নেমে পড়ে ঐ ভাবেই পশ্চাদগামী এক ট্রামে চড়ে বসেন। এইরূপে দুই বা তিনটি ট্রামে চড়ে তাঁরা বিনা ব্যয়েই তাঁদের গন্তব্য স্থান ধর্মতলাতেই এসে হাজির হন। কখনও কখনও দুই ব্যক্তি বাসে উঠে একজন চার পয়সার টিকিট এবং অপর জন ছয় পয়সার টিকিট কিনেন। এর পর প্রথম ব্যক্তিটি

চার পয়সার টিকিটটি দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে গন্তব্য স্থানে নেমে পড়েন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন এই দুইখানি টিকিটের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত আসতে সক্ষম হন। মাত্র দুই পয়সা [দশ পয়সার টিকিটে] বাঁচাবার জন্যে এইরূপ শঠতার আশ্রয় নেওয়া অতি লজ্জার।

[ওআগান ব্রেকারগণ অধুনা এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। এক জনবহুল স্থানে সাবান প্রভৃতি স্বল্প মুল্যের দ্রব্য নীচের ভূমিতে ফেলতে থাকেন। বহু ব্যক্তি ভিড় করবে ঐ গুলি কুড়াতে ব্যস্ত থাকে। পরে ওদের নজর এড়িয়ে মূল্যবান দ্রব্য দূর স্থানে এরা নামিয়ে লরিতে তুলে।

এরা অধুনা সশস্ত্র ও দলবদ্ধ হযে খুন জখম করতেও অভ্যস্ত। ভযে এদের বাধা দেওয়ার চিন্তাও কেহ করে না। ভদ্রজন সব বুঝে নীরব দর্শক হয়ে থাকেন।]

চোর-ডাকাতরাও ট্রেনে ভ্রমণকালে কখনও টিকিট কেনে না। এরা বিনা টিকিটেই ঘুরাফেরা করে এবং স্থবিধামত লোক ঠকায় বা চুরি করে। রেলওয়েতে সংঘটিত প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সম্বন্ধে নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'ল। এই প্রকার প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই বিবৃতিটি বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

"হঠাৎ লাহোরের স্টেশনে নেমে আমার সহযাত্রীটি ভীষণভাবে চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে করে-আনা দুইটা বাক্সই চুরি হয়ে গেছে। এতে তিনি একবারে কপর্দকহীন হয়েছেন। আমি দয়া পরবশ হয়ে তাঁকে আমার বাড়ি নিয়ে যাই এবং কিছু অর্থ সাহায্যও করতে চাই। কিন্তু আমার নিকট হতে তিনি কোন অর্থাদি গ্রহণে অস্বীকৃত হন। এর পর তিনি স্বগৃহে [তাঁর পিতার নিকট] টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা পাঠাবার জন্যে একটি টেলিগ্রাম

পাঠিয়ে দেন। আমার ছোট ছেলেই ভদ্রলোকের অনুরোধ মত টেলিগ্রামটা পোস্ট অফিসে গিয়ে 'তার' করে আসে। পরের দিন পাঁচ শত টাকা আমার ঠিকানায় ভদ্রলোকের পিতাঠাকুর টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দেন। এর পর আমাকে সাক্ষী করে পোস্টাল পিওন তাঁকে ঐ অর্থ প্রদান করেন।

এই ঘটনার এক মাস বা দেড়মাস পরে আমার বাড়িতে স্থানীয় পুলিশ তদন্তে আসে। ঐ লোকটা ছিল একজন প্রবঞ্চক অপরাধী; ঐ পথে ট্রেনে ভ্রমণকালে এক ধনী সহযাত্রীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। লাহোরে এসে নিজের ঐ সব কল্পিত দুরবস্থার কথা লিখে সেই লোকটির নামেই তার পিতাকে সাহায্যের জন্যে সে 'তার' করেছিল। যুবকটি বাড়ি ফিরে সকল সমাচার অবগত হয়ে পুলিশে খবর দেয়—পুলিশ এই তদন্ত করবার জন্যে আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করেছেন।"

এই ভাবে ঠগীরা সহযাত্রীদের সহিত আলাপ করে প্রথমে তাঁর হাঁড়ির খবর জেনে নেয় এবং তারপর ঐ ভাবে টেলিগ্রাম করে তাদের আত্মীয়স্বজনকে ঠকিযে থাকে। এই সব ঠগীদের একজন সনাক্ত না করলে পোস্টাল অথোরিটি তাদের অধিক মুদ্রা প্রদান করতে প্রায়ই অসম্মত হয়। এ বিষযে দেরি হলে তাদের ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। এই জন্যে এরা সনাক্ত করবার জন্যে ছলনা দ্বারা শহরে একজন পদস্থ ব্যক্তির সহিত আলাপ করে নেয়। এ ছাড়া ঐ রূপ এক পদস্থ ব্যক্তির ঠিকানায় অর্থ প্রেরকরাও নিঃসন্দেহে টাকা পাঠিয়ে থাকে। বড় ব্যবসায়ীদের এজেন্টগণ কার্য-ব্যপদেশে এক শহর হতে অপর আর এক শহরে প্রায়ই যাতায়াত করেন। এই সব এজেন্টদের সহিত ট্রেনের কামরায় আলাপ করে

ঠগীরা প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জেনে নিয়ে এদের হেড অফিসে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অনুরূপ ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছে—এইরূপ কাহিনীও প্রায়ই শুনা যায়।

এইবার রেলওয়ের চুরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কেপমারী ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্তেরা এই সব চোরেদের মধ্যে অন্যতম। এই সব দুর্বৃত্তের ইংরেজি সমেত অনেকগুলি ভাষা জানা থাকে এবং অত্যন্ত রূপ ভদ্রভাবে সহযাত্রীদের সহিত আলাপ জমায়। রাত্রিতে এরা অমায়িকতার সহিত শয়নের জন্যে তাদের বসবার সিট্‌টি সহযাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে নিজেরা নিম্নে—ভূমিতলে বিছানা করে সময়মত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। এর পর সুযোগ মত তারা চাদরের একাংশ দিয়ে তাদের দেহের সহিত যাত্রীদের বাক্স প্যাঁটরাগুলিকেও ঢেকে দেয়। এর পর চাদরের অন্তরালে এরা অতি সহজেই বেঞ্চির তলায় রাখা বাক্সগুলি ভেঙে ফেলতে [বা খুলতে] পারে। এই ভাবে বাক্সগুলি হ'তে দ্রব্যাদি বার করে ঐ চাদর দিয়েই সেগুলি জড়িয়ে এরা উঠে বসে এবং পরের স্টপেজেই জল সংগ্রহের জন্মে বা অন্য কোনও আছিলায় নেমে পড়ে অন্য কামরায় এসে দ্রব্যাদি তার অন্যান্য সহকর্মীদের কাছে রেখে এসে পুনরায় স্বস্থানে ফিরে আসে।* এইরূপ একটি বিশিষ্ট ভদ্র-যাত্রীকে এই চুরির জন্মে কেহ সন্দেহও করে না।

---

* এদের কেহ কেহ শক্ত আটা বা লেই দিয়ে ছোটখাটো দ্রব্যাদি বেঞ্চির নীচের কাষ্ঠে এঁটে দিয়ে থাকে। এর ফলে বার হতে অন্য কেউ ঐগুলো খুঁজে পায় না। দ্রব্যের জন্য খোঁজ পড়লে এরা নিজেদের বাক্স প্যাটরা ও দেহ তল্লাসে সম্মতি জানায়।

রেলওয়ে টিকিট ফ্রড্ [জাল] করা রেলওয়ে অপরাধের অন্যতম পদ্ধতি। রেলওয়ে টিকিট জাল করার বিষয় প্রায়ই শুনা গেছে। কিন্তু সরাসরি জাল না করেও অপর আর এক সহজ উপায়েও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীরা একটি দূরের বা লঙ্ জার্নির পুরানো ও ব্যবহৃত টিকিট জোগাড় করে। নিয়মমত এই সব টিকিটের পিছন দিকেই তারিখ দেওয়া হয়। এর পর অপরাধীরা সেই দিনের তারিখ দেওয়া অল্প দূরের বা শর্টজার্নির একটি টিকিট ক্রয় করে। এইবার অপরাধীটি উভয় টিকিটই কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রেখে উভয় টিকিটেরই পেছন দিককার তারিখ দেওয়া কাগজ দুইটি উঠিয়ে নেয়। এর পর ঐ নূতন টিকিটের তারিখ দেওয়া কাগজটি পুরানো টিকিটের পিছনে সাবধানে লাগিয়ে দেয় এবং এই ভাবে এরা অতি সহজে দূর যাত্রার একটি জাল টিকিট তৈরি করে ফেলে।

উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া অপর আর এক পদ্ধতিতেও জাল টিকিট তৈরি করা যায়। এমন অনেক রেল স্টেশনে ছাপা টিকিট তো থাকেই না [দূর যাত্রার টিকিট], এমন কি ব্ল্যাঙ্ক টিকিটও সেখানে নেই। এই বিশেষ ক্ষেত্রে "N. B. C." লেখা রিশিপ্টের কাগজে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা পেন্সিলে লিখে টিকিট বানান হয়। অপর দিকে কোনও যাত্রী যদি গন্তব্য স্থান ছাড়িয়ে আরও বহুদূর গিয়ে পড়ে তো তার কাছে বাড়তি ভাড়া [excess fare] ও জরিমানা [penalty] বাবদ অর্থ আদায় করে চেকাররা অনুরূপ একটি রিশিপ্টেই পেন্সিল দিয়ে যাত্রীর সংখ্যা ও গন্তব্য স্থানের কথা লিখে দেন। তবে শেষোক্ত রিশিপ্টে N. B. C. [No Blank Card] লেখা থাকে না। ঐ স্থলে সেখানে লেখা থাকে "Over riding"।

ঠগী দুর্বৃত্তরা এইরূপ ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে রেল কোম্পানিকে প্রায় ঠকিয়ে থাকে। এরা মাত্র এক স্টেশনের জন্যে টিকিট কিনে দুই তিন স্টেশন ইচ্ছা করেই এগিয়ে যায় এবং তারপর টিকিট চেকারকে নিজেই ডেকে এনে বাড়তি ভাড়া দিয়ে ঐরূপ একটি "Over ride" লেখা রিশিপ্ট সংগ্রহ করে এবং পরে ঐ রিশিপ্টের ওপর হতে Over ride কথাটা উঠিয়ে ঐ স্থলে লিখে নেয় "N. B. C."। এর পর তারা পেন্সিলে লেখা গন্তব্য স্থল ও যাত্রীর সংখ্যাও পরিবর্তন করে দূরের যাত্রার জন্যে একট জাল টিকিট বানিযে নিযে থাকে। এই ভাবে জাল টিকিট দুর্বৃত্তেরা তৈরি তো করেই, এ ছাড়া এরা জাল রেলওযে ওআরেন্টও তৈরি করে থাকে। সরকারী কর্মচারীরা সাধারণতঃ এই সব ওআরেন্ট ব্যবহার করে থাকে। ব্যবস্থামত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিযুক্ত এই ওআরেন্ট টিকিট ধরে দিবা মাত্র প্রয়োজনীয় টিকিট পাওয়া যায়। কোম্পানি পরে এই সব ওআরেন্ট সরকার বাহাদুরের হিসাব-নিকাশ অফিসে পাঠিয়ে তাদের প্রাপ্য টাকা আদায় করে নেয়। দুর্বৃত্তগণ এই সকল রেলওয়ে ওআরেন্ট চুরি করে বা জাল করে এই সব ওআরেন্টের উপর বিভাগীয় অফিসারদের সহিও জাল করে উহার সাহায্যে টিকিট ক্রয় ক'রে ঐ টিকিট ব্যক্তিবিশেষের নিকট বিক্রয় করে থাকে।

কোনও কোনও রেলওয়ের দুর্বৃত্ত জাল টিকিট কলেক্টারও সেজে থাকে। এরা কয়েকটা চকচকে পিতলের বোতাম লাগানো একটা সাদা বা কাল কোট পরিধান করে। এইরূপ পোশাকের দ্বারা যাত্রীদের বিভ্রান্ত করে তাদের নিকট হতে পরীক্ষার ছলে টিকিটগুলি চেয়ে নেয়। এদের কেহ কেহ এই ভাবে টিকিট সংগ্রহ করে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। এদের উদ্দেশ্য থাকে বিনা পয়সায় টিকিট সংগ্রহ

করে নিজেদের যাত্রাপথের বিঘ্ন দূর করা। কখনও কখনও এরা হাতসাফাই-এর সাহায্যে অধিক মূল্যের টিকিটটি সরিয়ে ফেলে যাত্রীকে একটি কম মূল্যের টিকিট ফিরিয়ে দেয় এবং এর পর ভয় দেখিয়ে তার কাছে বাড়তি ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করে রিশিপ্ট না দিয়েই সরে পড়ে। এদের কেহ কেহ যাত্রীদের টিকিট কিনে দিবার অছিলায় অধিক মূল্য নিয়ে একটি কম মূল্যের টিকিট যাত্রীটিকে কিনে দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। এই সকল যাত্রীদের অনেকেই কম মূল্যের টিকিটটাই বেশি মূল্যের টিকিট মনে করে নিঃসন্দেহে রেলে উঠে প্রকৃত চেকারদের হস্তে বিপদগ্রস্ত ও অপদস্থ হয়।

রেল এবং ট্রাম কোম্পানি পাশ বা মানথলি টিকিট ইস্যুও করে থাকে। এমন অনেক পরিবারে ছেলেদের নাম যথাক্রমে, জ্যোৎস্না, যামিনী, জ্যোতির্ময়, যোগেন ইত্যাদি। এদের একজন একখানি মাত্র মানথলি টিকিট ক্রয় করে, উহাতে লিখিয়ে নেয় মাত্র “J. Banerjee”। “J” অক্ষরটি উপরোক্ত সকলের নাম সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এ ছাড়া বাড়ির সকল ভ্রাতাই ব্যানার্জি। এই একখানি মাত্র টিকিটের সাহায্যে বাড়ির সকল ভ্রাতাই ট্রামে ভ্রমণ করে থাকেন—ইহাকে এক প্রকার অপরাধ বলা চলে। একজনের নামের টিকিট অপরজন ব্যবহার করলে কানুন মতে উহাকে অপরাধ বলা হবে। এ'ছাড়া নাম ভাঁড়িয়ে একের মানথ্‌লি টিকিট অপর এক ব্যক্তি কর্তৃকও ব্যবহৃত হয়েছে।

এই জাল টিকিট, চুরি, প্রবঞ্চনা আদি অপরাধ ছাড়া ডাকাতি এবং খুনও রেলওয়ে ভ্রমণকালে হয়ে থাকে। তবে এই সকল অপরাধ, যাকে সাধারণ ভাষায় "মেইল রবারি" আদি বলা হয় তা খুব কমই ঘটে থাকে। রেলওয়ে ডাকাতির য়ুরোপীয় পদ্ধতিটি হয়, এইরূপ: কোনও এক নির্জন স্থান বা জঙ্গল বেছে নিয়ে ডাকাত দলের

অধিকাংশ লোক ওৎ পেতে বসে থাকে। দলের কয়েকজন লোক রেলওয়ের ঐ ট্রেনটিতে উঠে বসে এবং ট্রেনটি ঐ নির্দিষ্ট স্থানে আসা মাত্র শিকল টেনে ট্রেনটি থামিযে দেয়। ট্রেন থামিবা মাত্র ডাকাতের মূল দলটি ট্রেনে উঠে ড্রাইভার, গার্ড ও যাত্রীদের মারধোর করে মূল্যবান দ্রব্যাদি অপহরণ করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পলায়ন করে থাকে। এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধীও আছে যারা ট্রেনের ছাদে উঠে বসে থাকে। এমন কি, কেহ কেহ নিম্নের ব্যাটারি আঁকড়েও শুয়ে থাকে এবং সুবিধামত বেরিয়ে এসে কামরায় ঢুকে চুরি করে থাকে। এ ছাড়া রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্টে খুন ও রাহাজানির কথাও শুনা গেছে। এমন অনেক রেলওয়ে অপরাধ আছে যে সকল অপরাধের জন্য অপরাধীর সাজার বদলে সাজা হয় অপরাধীদের পিতামাতার বা অভিভাবকদের। এই সকল অপরাধ কেবলমাত্র অপরিণত বয়স্ক বালকদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। রেলওয়ে আইনানুসারে বালকগণ যদি রেলগাড়ি লক্ষ্য করে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে তা হলে এ জন্যে বালকদের অভিভাবকদের সাজা পেতে হয়। নিতান্ত বালককৃত অপরাধ আইনমত অপরাধরূপে ধরা হয় না। সেই হেতু এই বিশেষ অপরাধের নিবারণের জন্যে একমাত্র অভিভাবকদেরই দায়ী করা হয়ে থাকে। যাত্রীদের রক্ষার জন্যেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রেলওয়েতে এক প্রকার প্রবঞ্চনা অপরাধের কথাও প্রায় শুনা যায়। এক স্থান হ'তে অপর আর একস্থানে মাল পাঠালে রেলওয়ে কোম্পানি এ জন্যে একটা রিসিপ্ট দেয়। এই রিসিপ্টে দ্রব্যের নাম, ওজন এবং মূল্য আদি লিখে দেওয়া হয়। গন্তব্য স্থানে দ্রব্য পৌঁছানোর পর এই রিসিপ্ট দেখালে ঐ মাল ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তরা প্রায়ই এই রিসিপ্টের উল্লিখিত দ্রব্যের স্বরূপ, উহার আসল

পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যাগুলি উঠিয়ে ফেলে সেই স্থলে ইচ্ছামত বহুল বর্ধিত পরিমাণ ও মূল্যাদির সংখ্যা লিখে নেয়। এরপর দুর্বৃত্তরা সরলচিত্ত ব্যবসায়ীদের নামে এই রিসিপ্ট খারিজ করে দিয়ে বহু গুণ অর্থ আদায় করে এবং প্রবঞ্চিত ব্যবসায়ীটি ঐ রিসিপ্টের সাহায্যে দ্রব্যাদি ডেলিভারি নেবার পূর্বেই বেমালুম সরে পড়ে থাকে।

এই রেলওয়েতে এমন অনেক গৃহস্থ চোরও যাতায়াত করেন। আপন লগেজাদির সহিত এঁরা অপর যাত্রীদেরও দুই একটা লগেজ নামিয়ে নিয়ে থাকেন। হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে ত্রুটি স্বীকার করলেই আসল বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এই জন্যে এঁরা ফৌজদারীতে সোপর্দ কমই হয়ে থাকেন। রেলওয়ে হ'তে ছেলে চুরি, মেয়ে চুরিরও নজির আছে। এমন কি বউ চুরিরও। এই সম্বন্ধে একটি হাস্যোদ্দীপক বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমায় বৌকে নিয়ে দেশে আসছিলাম। ফিমেল কম্পার্টমেণ্টে বড় বড় ঘোমটা দেওয়া আরো কয়েকজন বধূ বসেছিলেন। গন্তব্য স্থানে ট্রেনটি পৌঁছালে মেয়েদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াই। মাত্র এক মিনিট ট্রেনটি ঐ স্টেশনটায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই জন্যে আমি অত্যন্তরূপ ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠি—'ওগো, নেমে এসো। ওগো শীঘ্র নামো।' আমার চেঁচামেচি শুনে আমার আপন স্ত্রী তো সেখানে নেমে এলেনই, এমন কি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আরও জন দুই তিন বধূ নেমে পড়লেন। ঘোমটার ভিতর থেকে দেখলেনও না যে ঐ সময় কে বা কারা তাঁদের ডাকছে। ও'দের 'ওগোরা' * ঐ ট্রেনে

* এদেশের গ্রাম্য মেয়েরা স্বামীকে এবং স্বামীরা স্ত্রীকে "ওগো" সম্বোধন করে ডেকে থাকে।

[ভিন্ন কামরায়] বসেছিলেন। ওরা প্রায় সকলে আমার ডাকে নেমে এলেন। আসলেন না শুধু যাঁদের সঙ্গে দাদা, কাকা বা বাবা আছেন।"

ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। তবে এই পর্দাবহুল হিন্দুস্থানে ঐরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়। ধরা যাউক কোনও লগেজের উপর ঘোমটাবৃত বধূ বসে আছে। তাড়াহুড়ার মাথায কোনও কুলির পক্ষে লগেজের সহিত বধূটিকেও লগেজ মনে করে কামরার মধ্যে [প্ল্যাটফর্ম হতে] ছুড়ে ফেলে দেওয়ারও গল্প শুনেছি। এটি গল্প হলেও অত্যধিক পরদা প্রথা ও অজ্ঞতার সুযোগই যে দুর্বৃত্তরা প্রায়ই নিয়ে থাকে এ কথা অতীব সত্য। এ দেশের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা এখনও এত বেশি যে মেয়েদের গাড়িতে শুধু "জেনানা" বাংলা, হিন্দি বা ইংরাজিতে লিখে দিলেই হয় না; ঐ লেখার সঙ্গে সঙ্গে একজন জেনানার ছবিও এই দুযারের উপর এঁকে দিতে হয়। *পুরুষদের পক্ষে ইচ্ছা করে মেয়েদের* গাড়িতে উঠে বসাও একটি অপরাধ। এরূপ অপরাধও রেলওয়েতে হামেশা সংঘটিত হ'তে দেখা যায। ইহা প্রায় জনসাধারণের নিরক্ষরতার কারণেই হয়ে থাকে। অসাবধানতার সহিত ইঞ্জিন চালানো বা ভুল সিগন্যাল দেওয়া এবং তৎজনিত কলিশন দ্বারা বহু লোকের জীবননাশের কারণ হওয়া রেলওয়ে সংক্রান্ত অপরাধসমূহের মধ্যে অন্যতম অপরাধ। এরূপ অসাবধানতা যে কতো গর্হিত তার সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

কোনও কোনও রেল স্টেশনের কর্মচারীরাও বহুবিধ অপকর্ম করে থাকে। বে-আইনী দ্রব্য পাচারের জন্য ঘুষ গ্রহণ এবং স্বয়ংকৃত পার্শেল প্রভৃতি চুরির কথা বাদ দিলেও এদের কারুর কারুর সাহায্যে

মালগাড়ি, পার্শেল ট্রেন প্রভৃতি ভেঙ্গে দ্রব্যাদি অপহরণও করা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ড্রাইভারগণ এক নিরালা স্থানে মাল বা যাত্রী গাড়ি থামিয়েছে কিংবা উহার গতি তারা ইচ্ছা করে মন্থর করে দিয়েছে। সেখানে পূর্ব ব্যবস্থামত দলবদ্ধ দুর্দান্ত স্মাগলারগণ উপস্থিত থাকে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তগণ গাড়িতে উঠে তা ভেঙে দ্রব্যাদি এবং বিবিধ ফিটিঙ্‌ অপহরণ করে। পরিবর্তে তারা অসাধু ড্রাইভার ও গার্ডদের প্রতিশ্রুত মত হিস্যা প্রদান করে। আস্কারা পেয়ে কয়েক ক্ষেত্রে স্মাগলারগণ রেলপথের পাশে নিজেদের কলোনি পর্যন্ত করেছে। এ'ছাড়া বহুক্ষেত্রে ইঞ্জিন ড্রাইভারগণ সুবিধাজনক স্থানে কয়লাও স্মাগলারদের নিকট নিক্ষেপ করে থাকে।

এই রেলওয়ে অপকর্ম সম্বন্ধে নিম্নে একজন অসাধু রেলওয়ে কর্মচারীব বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি ঐ সময় অমুক রেল স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিলাম। যে সকল শহরবাসী [ছোট শহর] আমাদের বিরুদ্ধে দবখাস্ত করতে পারে বলে আমরা মনে করতাম তাদের কর্মচারীদেবকে ঐ স্টেশনে নামতে দেখলে ছুতায়-নাতায় তার নাম জেনে তার অজ্ঞাতে তাদের নামে আমরা মালপত্রের ওভার চার্জ কিংবা বিনা ভাড়ায় আসার জন্য মিথ্যা করে রিসিপ্ট কেটে রাখতাম। ঐ জন্য কোম্পানিকে দেয় অর্থ অবশ্য তাদের অজ্ঞাতে আমরাই জমা দিয়েছি। এর পর ঐ সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের নামে দরখাস্ত করলে আমরা রেকর্ড হতে প্রমাণ করতাম যে এই ভাবে তাদের কর্মচারীদের রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিতে না দেওয়ার জন্য আক্রোশজনিত তারা আমাদের নামে মিথ্যা দরখাস্ত করেছে।"

এ ছাড়া প্যাসেঞ্জারদের নিকট টিকিট না পেলে ঐ টিকিটের

অর্ধেক মূল্য গ্রহণ করে রসিদ না কেটে তা আত্মসাৎও কোনও কোনও টিকিট কালেকটার করে থাকে। শহরের নিকটস্থ স্টেশনের যাত্রীরা কেহ কেহ গন্তব্যস্থানে এসে টিকিটটি কলেক্ট না করিয়ে—ঐ দিনেই পূর্ব স্টেশনে এসে ঐখানকার অসাধু টিকিট-বিক্রেতাকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে তা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং ঐ টিকিট-বিক্রেতা উহা অন্য এক যাত্রীকে পূরা মূল্যে বিক্রয় করে লাভবান হয়েছেন। যাত্রীবহুল রেলপথে একই তারিখে এইরূপ অপরাধ করা সম্ভব।

ব্যবসায়-অপরাধ

ব্যবসায সংক্রান্ত অপরাধ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়ে থাকে ; প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের ঠকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতারা ব্যবসায়ীদের ঠকায়। একজন ব্যবসায়ী অপর আর একজন ব্যবসায়ীকে ঠকানোর দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। বহুক্ষেত্রে ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মীরাও তাদের মনিবদের ঠকিয়ে থাকেন। এদের অনেকে দ্রব্য ক্রয়কালে বিক্রেতাদের সাথে বন্দোবস্ত করে বেশি মূল্যের রসিদ সংগ্রহ করে। এঁদের কেউ কেউ একে ওকে ঘুষ দিতে হয়েছে বলে মনিবদের অর্থ আত্মসাৎ করেন। এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা কম ওজনের নকল বা জাল বাটখারার সাহায্যে কেনা-বেচা করেন। কেহ কেহ আসল বাটখারাগুলি হ'তে আরও কিছু লোহা কুরে বার করে দিয়ে ঐগুলির ওজন কমিয়ে দিয়ে থাকেন। এই সকল বাটখারার সাহায্যে উচিত মূল্য নিয়ে কম দ্রব্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করা অতীব সহজ।

অপরদিকে কোনও কোনও ক্রেতাও ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে থাকে। এইসব দুর্বৃত্তেরা রাজা বা জমিদার সেজে শহরের কোনও একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকেন। কিছুদিন নগদ মূল্যে, এমন কি অধিক মূল্যে দ্রব্য কেনার পর একদিন কোনও অজুহাতে তাঁরা বহু টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ধারে কিনে বসেন এবং বাড়িতে বিল্ পৌঁছিবার পূর্বেই দ্রব্যাদিসহ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে

যান—এইরূপ ভাবে প্রবঞ্চিত এক দোকানদাবের একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"মশাই! আমাকে এতে দোষী করে লাভ নেই। আমি কি আর সাধে তাঁদেব বিশ্বাস করেছি। আমরা কম মূল্যে কোনও দ্রব্য দিলে তাঁবা চ'টে যেতেন। বেশি মূল্যেব দ্রব্য বলে তেনাদের কাছে চালাতে হতো। তাঁরা নিঃসন্দেহে অধিক মূল্যে কম মূল্যের দ্রব্যাদি কিনে নিযেছেন। আমার ধাবণা ছিল যে বোকা পেয়ে আমিই তেনাদেব ঠকাচ্ছি। তেনারা যে আমাকে ঠকাবেন এ আমার কল্পনাব বাইবে ছিল।"

কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতিব ন্যায বাণিজ্যমূলক শহরে [C mmercial City] ব্যবসায সংক্রান্ত অপকর্মের সুযোগ এবং সুবিধা অত্যন্তরূপ অধিক। এ কাবণে এই সকল শহরে বা ব্যবসা কেন্দ্রে এইরূপ অপরাধের সংখ্যা অত্যধিক দেখা যায। কিরূপ পদ্ধতিতে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হযে থাকে তা নিম্নেব বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"আমবা চার বা পাঁচ জনে মিলে প্রথমে একটি ঝুটা, ভূয়া বা নকল [Bogus] ফার্ম খুলে থাকি। আমাদের ব্যবসায় সমবাযের আমরা একটি উচ্চধ্বন্যাত্মক [high sounding] নামও রাখি, যেমন "ইস্টার্ণ এশিয়ান ফেডারেল কোম্পানি" বা "ইনটার ন্যাশনেল ট্রেডিং ফেডারেশন" ইত্যাদি। আসলে কিন্তু দুই শত বা তিন শত টাকারও ক্যাপিটেল বা মূলধন আমাদের কখনও থাকে নি। আমাদের মধ্যে একজন সাজে ম্যানেজার, একজন সাজে কেশিয়ার, কেহ বা সাজে সরকার। এ ছাড়া বেয়ারা, দরোয়ান ইত্যাদি সাজবার লোকেরও অভাব হয় না। প্রথম প্রথম আমরা বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং

ম্যানুফ্যাকচারারদের [শিল্পপতিদের] নিকট হতে নগদ মূল্যে দ্রব্যাদি কিনতে থাকি। এইভাবে আমরা বাজারের আস্থাভাজনও হয়ে উঠি। এর পর আমরা ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে শুরু করে দিই এবং ঐ কর্জের টাকা আমরা ক্ষেপে ক্ষেপে শোধও করতে থাকি। ভবিষ্যতে কোনও মামলা হলে উহা দেওয়ানি মামলায় পর্যবসিত করবার জন্যেই আমরা এইরূপ লেনদেনের অভিনয় করে থাকি। এইভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার পর আমরা ঐগুলি কম মূল্যে বাজারে ছেড়ে দিই। মূল্য কম থাকার জন্যে ঐগুলি অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রয় হয়ে যায়। এমন অনেক অসাধু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকল সমাচার অবগত থেকেও আমাদের নিকট হতে কম মূল্যে এই সব দ্রব্য কিনে নিয়ে থাকে। এইরূপ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা আমরা আরও বড় বড় কারবারীর সহিত কারবারে লিপ্ত হয়ে অনুরূপ ভাবে বহু দ্রব্যাদি সংগ্রহ করি এবং ঐগুলিকে কম মূল্যে [under sale] বাজারেও ছেড়ে দিই। এইভাবে বাজারে আমাদের কর্জের পরিমাণ অত্যধিক রূপ বেড়ে গেলে আমরা হঠাৎ একদিন অফিস বন্ধ করে পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম সরে পড়ি।"

[এইরূপভাবে দ্রব্য গ্রহণ চোরাই বামাল গ্রহণেরই সামিল। এইজন্যে এদের চোরাই মালের গ্রাহক বলে চালান দেওয়াও সম্ভব। এতদ্বারা এই ধরনের অপকর্মের বন্ধ হওয়ারও আশা থাকে।]

এই সকল অপকর্মের দ্বারা অপরাধীরা যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত-ভাবে ব্যবসায়ীদেরই ঠকায় তা নয়। সমষ্টিগতভাবে "কম মূল্যে দ্রব্যাদি ছেড়ে" তারা বাজারেরও ক্ষতি করে থাকে। এইরূপ আণ্ডার সেলের বহর দেখে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে

দোকান বন্ধ করাও অসম্ভব নয়। এই সকল ছোট দোকানদাররা এই সময় দরের সমতা রাখবার জন্যে লোকসান দিয়েও 'আণ্ডার সেল' করতে বাধ্য হয়। কারণ তা না হ'লে তাদের জানা চেনা খদ্দেররা হাতছাড়া হয়ে যাবে।

সকল ক্ষেত্রেই এই সকল ব্যবসায় সমবায় [শুরু হতেই] যে প্রবঞ্চনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় তা নয়। প্রথমে এদের কেহ কেহ প্রকৃতপক্ষে সৎ উদ্দেশ্যেই ব্যবসায় নামে। কিন্তু পরে অকৃতকার্য হওয়ায় অনন্যোপায় হয়ে প্রতারণার পথে অগ্রসর হয়; এজন্য ক্যাপিট্যালিস্ট [পুঁজিবাদী] ও বড় বড় ব্যবসায়ীরাও কতকাংশে দায়ী থাকেন। এঁরা ওই সকল ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কোনও সাহায্য করা তো দূর থাক প্রায়ই এঁরা এঁদের নানারূপে এক্সপ্লয়েটেড্ করে থাকেন—এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা সমবায়ের অকৃতকার্যতার ইহাই সর্বপ্রধান কারণ। এই সকল ছোট ব্যবসায়ীদের কেহ কেহ এই ভাবে প্রতারণার দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ঠকিয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। অনেক সময় এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ী অল্প সময়ের জন্যে "আণ্ডার সেল্" করে ছোট ছোট ব্যবসায়ীর ব্যবসা বন্ধও করে দিয়ে থাকে। সমধিক মূলধনের অভাবে লক্ষপতিদের সহিত প্রতিযোগিতায় ব্যর্থকাম হয়ে এই সকল ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। লেন-দেনের ক্ষেত্রে হুণ্ডি ও কিস্তিদারী প্রথার উন্নয়ন দ্বারা বড় ব্যবসায়ীদের ছোট ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতার স্পৃহা নিবারণ করে এই উভয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হলে এই ধরনের অপরাধ বহুলাংশে কমে যেতে পারে।

আদালতে এই সকল অপরাধীদের অভিযুক্ত করার অনেক

অসুবিধাও দেখা যায়। এরা লেনদেনের বহু কাগজপত্র আদালতে দাখিল করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে ব্যাপারটি আগাগোড়াই দেওয়ানী ব্যাপার। হঠাৎ ব্যবসা পড়ে যাওয়ার জন্যেই এরা দেনদারদের দেনা মেটাতে পারে নি ইত্যাদি। কিন্তু সুযোগ্য ভারতীয় পুলিশের চেষ্টায় এদের এই সকল প্রচেষ্টা সকল সময়ই ব্যর্থ হতে পারে।

আজকালকার কণ্ট্রোলের যুগে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে নানারূপ প্রবঞ্চনামূলক রীতিনীতি প্রবর্তিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইরূপ বলা যেতে পারে: ব্যবসায়ী মাত্রেই কাপড় কনট্রোল দরে বিক্রয় করতে বাধ্য, কিন্তু কোনও দরজী যদি কাপড় উচিত মূল্যে [কনট্রোল দরে] ১০৲ টাকা চার্জ করে, মেকিং [কাট ছাঁট] চার্জ ৭০৲ টাকা ধরে স্যুট বানিয়ে লোক ঠকায় তা হলে আইনানুসারে সে দণ্ডনীয় নয়। আইনের এই সকল ফাঁকির সাহায্যে সহজেই লোক ঠকানো চলে। উচিত [কনট্রোল] মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে উহা পাঠানোর জন্যে নৌকা, গাড়ি বা মুটে বাবদ অধিক মূল্য গ্রহণ করে পুষিয়ে নেওয়ার মনোবৃত্তিও কাহারও কাহারও মধ্যে দেখা গেছে।

এইবার বড় বড় শহরের ব্যবসাক্ষেত্রে কি ভাবে মানুষের মন বিভ্রান্ত করে সময় সময় প্রবঞ্চনা কার্য এই সকল "আইনের ফাঁকি"র সাহায্যে সংঘটিত হয় বা হ'তে পারে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করব। নিম্নের বিবৃতিটি হ'তে বিষয়টি বুঝা যাবে।

"ধরুন কোনও এক কোটীপতি ব্যবসায়ী কোনও এক ফ্যাক্টরির বা কোনও এক ব্যবসা-সমবায়ের সমুদয় শেয়ার বা অংশগুলি কিনে নিতে মনস্থ করলেন। এই জন্যে এঁরা একটি বিশেষ ফাঁদের সৃষ্টি ক'রে থাকেন। প্রথমে তিনি উচিত মূল্যে কিংবা চড়া দরে স্বয়ং

বা লোকমারফৎ ঐ কোম্পানির অনেকগুলি শেয়ার বা অংশ কিনে নেন। এর পর ঐ শেয়ারগুলি কিছুদিন পর্যন্ত ধ'রে রেখে হঠাৎ একদিন ঐগুলিকে আধা বা সিকি দরে বিক্রয় করে দিতে শুরু করেন। এইভাবে ভাল ভাল শেয়ারগুলি কম দরে বিক্রয় হ'তে দেখে ঐ কোম্পানির অন্যান্য অংশীদার বা শেয়ারহোল্ডাররা অত্যন্তরূপ ভীত হয়ে উঠেন। তাঁদের নিশ্চিতরূপ ধারণা হয় যে, ঐ কোম্পানি বা ফ্যাক্টরির শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে এবং ঐগুলি লালবাতি জ্বালালো ব'লে। তা না'হলে অমুক লোকের মত ব্যক্তিও অত কম দরে শেয়ারগুলি ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? নিশ্চয়ই উনি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়ে জেনেছেন যে ঐ প্রতিষ্ঠানটি ফেল হ'তে চলেছে। এইরূপ বিশ্বাস হওয়ামাত্র উহার সকল অংশীদারগণই ভীত হয়ে স্ব স্ব অংশগুলি কম মূল্যেও বিক্রয় করতে থাকেন। এদিকে ক্রোড়পতি ব্যবসায়ীটিও দালাল ও এজেন্ট মারফৎ বেনামীতে ঐ শেয়ার বা অংশগুলি সুবিধাদরে কিনে নিতে থাকেন—এইভাবে ক্রোড়পতি ভদ্রলোকটি ঐ ফ্যাক্টরি বা প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত ক'রে একাই উহার মালিক হয়ে বসেন।"

টাকা খরচ করলে হয় না, এমন কোনও কথা নেই। এমন কি ছোট-খাটো একটা রাজ্যের গভর্ণমেণ্ট টাকা খরচ করে 'ফেল' করে দেওয়া যায়। উপরের উল্লিখিত ঘটনাটি ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রেল স্টেশন প্রভৃতিতে বহু দোকানী চলতি পথের যাত্রীদের বেশি মূল্যে নিকৃষ্ট খাদ্য সরবরাহ করেন। কারণ এঁরা জানেন ঐ ব্যক্তির পক্ষে ভবিষ্যতে তাঁর জীবনে আর একটিবারও ঐ স্থানে পুনরাগমনের সম্ভাবনা নেই।

এইরূপ আরও বহু ঘটনার বিষয় এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে।

কোনও কোনও ব্যবসায়ী বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রেতাদের প্রতারিত করতে বাধ্যও হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ক্রেতারা নিজেরাই এজন্যে দায়ী। এ সম্বন্ধে কোনও বিক্রেতার একটি বিবৃতি নিম্নে তুলে দিলাম।

"আমি এ ক্ষেত্রে আর কি করব মশাই! ভদ্রলোক এসে বেশি দামের চাউল কিনতে চাইলেন। আমার দোকানে সর্বাধিক মূল্যের চাউল ছিল দশ টাকা মণ মূল্যের। আমি প্রথমে তাঁকে আট টাকা মণের চাউল দেখালে তিনি এতে বিরক্ত হয়ে বেশি দামের কি চাউল আছে তা জানতে চাইলেন; আমার দোকানের দশ টাকা মণের চাউলও তাঁর মনঃপূত হ'ল না। এদিকে খদ্দেরটিকে হাতছাড়া করতেও আমার মন চায় না। আমি তখন অন্য আর এক বস্তা হ'তে আট টাকা মণের "একই চাউল" বার করে এনে তাঁকে জানালাম, 'এই আমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম চাউল যার মণকরা মূল্য আঠার টাকা।' খদ্দেরটি তখন খুশি হয়ে ঐ চাউল মণ প্রতি দশ টাকা বেশি দিয়ে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন"

বক্তব্য বিষয় বুঝাবার জন্যে এই সম্বন্ধে অপর দুইটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত হ'ল।

"আমি মশাই এক দেশীয় কবিরাজ। কোনও এক মহারাণীর চিকিৎসার জন্যে আহূত হয়ে তেনাদের দশ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠাই। এত কম মূল্যের ঔষধের কারণে তাঁরা আমার চিকিৎসার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন।* এই খবর পাওয়া মাত্র আমি ত্রুটি স্বীকার করে

---

* *'কি? আমার চাকরের এবং আমার ঔষধের মূল্য হবে একই?'*—এইরূপ এক উক্তি অপর আর এক ধনী ব্যক্তি করেছিলেন।

তাঁদের ২৪৫৲ টাকা মূল্যের ঔষধ পাঠিয়ে দিই এবং ভুল ক'রে একজন সাধারণ লোকের ঔষধ পাঠানোর জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে আসি।"

এই ব্যবসা সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল। এইরূপ পাপ আজ সমাজ দেহে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। অথচ এই পাপের কোনও প্রতিকার নেই।

"আমি মশাই একজন কন্ট্রাক্টার। কোনও এক জমিদার আমাকে একটি বাটী নির্মাণের কন্ট্রাক্ট দেন। মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার মধ্যে বাড়িটি আমাকে নির্মাণ করে দিতে হবে। ওদিকে ওঁর ম্যানেজার আমার কাছ হ'তে কুড়ি হাজার টাকার "কমিশন" চেয়ে বসলেন। তাঁর সাফ কথা এই যে তা না হ'লে অন্য একজন ব্যক্তি ঐ শর্তেই কাজটা পেয়ে যাবে। অবস্থা যখন এইরূপ তখন গত্যন্তর না থাকায় আমি ঐ প্রস্তাবেই রাজি হয়ে যাই। কিন্তু ঐ টাকাটা ম্যানেজারকে ঘুষ স্বরূপ দিলে আমার লোকসান হয়। সত্যই তো লোকসান দিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে পারি না। আমি তখন বাজে বা কম মূল্যের মাল-মসলা দিয়ে ঐ বাড়ির নির্মাণ কার্য শেষ করি। ঘুষের টাকাটা মালিককে ঐভাবে না ঠকালে তো তা উশুল হবে না। এই ভাবেই আমাদের তা উশুল ক'রে নিতে হয়। ঐ টাকা ঘর থেকে আমরা কখনও দিই না। এরপর যদি বাড়িটা প'ড়ে যায় এবং তজ্জনিত যদি জীবনহানি ঘটে তো তার জন্যে দায়ী ঐ জমিদারের ম্যানেজার। কারণ উনি আমাকে এইরূপ অপকার্য করতে বাধ্য করেছেন।"

এমন অনেক ব্যবসায়ী আছেন যাঁরা খদ্দেরকে প্রথমে একটি বা দুইটি জিনিস খুব সস্তাতেই দিয়ে থাকেন। এতে ক'রে খদ্দেরের ধারণা হয় ঐ দোকানের দ্রব্যাদি অন্য দোকানের তুলনায় সস্তায় পাওয়া

যায়। এই সুযোগে খদ্দেরটিকে দুই একটি জিনিস সস্তায় দিয়ে অন্য বহু দ্রব্যাদি অত্যন্ত রূপ অধিক মূল্যে বিক্রয় ক'রে থাকেন। ইহাকে সাধারণ ভাষায় বলা হয় "ট্রেড্ সিক্রেট্" বা গুপ্ত তথ্য। কিন্তু আসলে এইগুলি প্রবঞ্চনারই সামিল।

এমন বহু প্রতারক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দোকানদারদেরও ঠকিয়ে থাকে। এরা কোনও জনবহুল স্থানে একটা বড় বাড়ি ভাড়া ক'রে নিজেদের কোনও নামকরা পরিবার রাজবংশের নামে পরিচয় দিয়ে থাকে। এরপর কোনও স্থানীয় দোকানদারকে বেছে নিয়ে তার দোকান থেকে নগদে ও ধারে দ্রব্যাদি কিনতে শুরু করে দেয়। এইভাবে ঋণ-পরিশোধের দ্বারা এদের উপর দোকানদারের বিশ্বাস এলে এরা একসঙ্গে ঐরূপ বহু দোকান হ'তে বহু দ্রব্যাদি ধারে সংগ্রহ ক'রে ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্যাদিসহ হঠাৎ একদিন অকুস্থল ত্যাগ ক'রে বাড়িওয়ালা, দুধওয়ালা, ফার্নিচারওয়ালা প্রভৃতি এমনি আরও অনেকানেক ব্যবসায়ীকে পথে বসিয়ে সরে প'ড়ে থাকে।

কলিকাতা শহরে এমন অনেক অপরাধী আছেন, যাঁরা প্রায়ই ইন্স্টলমেণ্টে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিনে থাকেন। এঁরা এই সকল দ্রব্যের মূল্য বাবদ মাত্র একটি বা দুইটি ইন্স্টলমেণ্টের অর্থ প্রদান করেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এঁরা এতটুকুও না ক'রে ঐ সকল দ্রব্যাদি অপর কাউকে বিক্রয় ক'রে দিয়ে যথারীতি সরে পড়ে থাকেন। এছাড়া জাল ইন্সিওরেন্স এজেণ্টের ভূমিকায় অভিনয় করেও অনেক দুর্বৃত্ত শহরে অর্থ অপহরণ ক'রে থাকেন। জাল ঘটক বা জাল দালাল সেজেও অর্থ অপহরণ করা এ শহরে সম্ভব হয়েছে। অধুনাকালে "বাড়ি ভাড়া করে দেব" এই স্তোকবাক্যে ভুলিয়েও

কেহ কেহ "অগ্রিম ভাড়া" বা পারিতোষিক বাবদ অর্থাদি নিয়েও লোক ঠকিয়ে থাকেন।

এই শহরে এমন কয়েকটি চায়ের দোকানী আছে, যারা চায়ের জলে অহিফেন ধোয়া জল মিশিয়ে খদ্দেরকে খেতে দেয়। এর ফলে নেশার কারণে খরিদ্দারগণ প্রতিবারেই তাদেরই দোকানে এসে চা'পান করে।

ব্যবসা সংক্রান্ত অন্যতম অপরাধ হচ্ছে খাদ্য প্রভৃতিতে ভেজাল প্রদান। প্রকৃতপক্ষে এদের খুনীর চেয়েও অপরাধী বলা যায়। কারণ, এরা মানুষের সঙ্গে মনুষ্যত্বও হত্যা করে। এই সকল লোভী ব্যক্তিরা সমগ্র জাতিকে বংশানুক্রমে অখাদ্য খাইয়ে পঙ্গু করে তুলে। অপরাধ সম্পর্কীয় পরিসংখ্যা সংগ্রহের সময় এই সকল অপরাধীদের বাদ দেওয়া হয়। অথচ একই অপরাধ স্পৃহা সাধারণ চোর-ডাকাতদের ন্যায় এই ভেজালকারী ও কালোবাজারীদেরও পরিচালিত করে।*
নিম্নে এই ভেজাল সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা হ'ল।

সাধারণতঃ আটা প্রভৃতিতে শ্বেত পাথর গুঁড়া, চায়ের পাতার সহিত চামড়ার গুঁড়া ও ধূলাকুটা, সরিষার তেলে নিম্নশ্রেণীর তেল, শিয়াল কাঁটা, নানারূপ বিচির তৈলাক্ত রস, মোটরের পেট্রোলের সহিত কেরোসিন তেল, ঘৃতের সহিত অনুরূপ গন্ধ সহকারে মোম, ডালদা প্রভৃতি, বিলাতি মাটি বা সিমেণ্টের সহিত গঙ্গামৃত্তিকা, রৌপ্য ও স্বর্ণে খাদ এবং দুধের সহিত ময়দা গোলা, বিলাতী পচা দুধ ও

---

* বিদেশী কোম্পানির মালিকরা বহুদূরে থাকায় তাদের পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্য সস্তায় জাল করা সহজ। এর সাথে সাথে দেশী দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে শহরে নকল করা হয়ে থাকে।

জল মিশানো হয়ে থাকে। শুখনা মোটর দানাকে টাটকা ও কাঁচা বুঝাবার জন্যে উহাদের সবুজ রঙ করে বিক্রয় করা হয়। যে কোনও খাদ্যের গন্ধানুযায়ী গন্ধ সমূহ বাজারে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। এই গন্ধ যুক্ত ঘৃত প্রভৃতি গব্য ঘৃত বলে চালানো হয়। যে কোনও খাদ্যের অনুরূপ গন্ধ ভেজালকৃত খাদ্যে সংযোজনা করা সম্ভব। ঔষধে ভেজাল প্রদান করেও এরা বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে। সাধারণতঃ ঔষধের লেবেল দেওয়া শিশি বোতল সংগ্রহ করে উহাতে জাল ঔষধসমূহ এরা ভর্তি করে থাকে। পচা মৎস্যসমূহ বরফ সহযোগে কঠিন করে উহাদের কানকোতে লাল রঙ প্রবেশ করিয়ে এরা খরিদ্দারদের বুঝায় যে ঐ রক্তাক্ত মৎসগুলি অতীব টাটকা। দুই এক ক্ষেত্রে মাছের পেটে নেকড়া ভরে এরা বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে উহা ডিমে ভরা। 'খয়ের' পর্যন্ত এরা মৃত্তিকা মিশ্রিত করে তা বাজারে চালায়। এমন কি প্রসাধন ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও এরা ভেজাল দেয়। এর ফলে সুগন্ধি তেল মেখে অনেকের মাথার চুল উঠে গিয়েছে এবং সাবান আদি মেখে অনেকের চর্মরোগের সৃষ্টি হয়েছে। শহরে বিলাতী লেখার কালি এবং অন্যান্য বিদেশী দ্রব্যের সাথে সাথে সোডা লেমোনেড প্রভৃতি ও সন্দেশ-রসগোল্লার জন্য তৈরি ছানাতেও ভেজাল দেওয়া হয়। এই ভেজাল আধিক্যের যুগে মানুষ ভেজালের কারণে ধী-শক্তি হারায় এবং রুগ্ন ও দুর্বল হয়।

আলু, ডিম, মাছ, ডাল, মাংস, চাউল প্রভৃতি কয়েকটি খাদ্য জাল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু তা হলেও কাঁকর মিশান চাউল হতে অব্যাহতি নেই। পাথর কুঁচি গুঁড়োর সাথে গমের দানা গুঁড়ানো হয়। তার পর পচা আলু, ঘি প্রভৃতি ও মিশ্রিত ছাগ ও মেষ মাংস

বিক্রয় করে ভেজালকারীরা প্রতিশোধ নেয়। আরও পুরানো কাপড় রঙ দিয়ে ছাপিয়ে তারা উহা নূতন শাড়ি রূপে বাজারে চালিয়ে দিয়েছে।

এমন বলা যায় যে ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতারণার গতি পৃথিবীতে আজ অব্যাহত। এমন অনেক জুয়েলারি দোকানী আছে যারা প্রচুর খাদ-মিশান গহনা বিক্রয় করে ক্রেতাদের বিজ্ঞাপন দ্বারা জানায় যে, তারা ইচ্ছা করলে ঐ গহনা একই দরে এক বৎসরের মধ্যে তাদের নিকটই বিক্রয় করতে পারে। বলা বাহুল্য, এই ভাবে তাদের তৈরি গহনা তাদেরই দোকানে ফিরে এলে তাদের লোকসান তো হয়ই না বরং এতদ্বারা তাদের ঐরূপ প্রতারণা ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

এই ভেজাল প্রভৃতি অপরাধের ব্যাপকতার কারণে উহা মানুষের এমনই গা' সওয়া হয়ে গিয়েছে যে, তারা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো করেই না, বরং তারা মনে করে ইহা বুঝি বা এই সংসারের এক স্বাভাবিক পরিণতি। এই জন্য গয়লা দুধে জল মিশালে তারা মনে করে যে, উহাতে বিশুদ্ধ জল দিয়েছে ত'? অন্য দিকে খাদ্যাদির ভেজাল সম্পর্কে তারা মাত্র ভেজালের পরিমাণের কথাই ভাবে।

[ব্যবসায়ীরা যাদের কাছ হতে দ্রব্য কেনে এবং যাদের কাছে তা তারা বিক্রয় করে, এই উভয়বিধ ব্যক্তিদের নিকট দাঁও মারার মনোবৃত্তি নিয়ে তারা কার্যে নামে। এই কারণে বড় বড় শহরে যেখানে অতিমাত্রায় ব্যবসায় চলে সেখানে অপরাধ-প্রবণতারও প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।]

এই ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে বা সমর্থনে বা প্ররোচনায় বহু

দুর্দান্ত আনুষঙ্গিক অপদলেরও সৃষ্টি হয়েছে। এরা বিবিধ আইনগত বিধিনিষেধ অমান্য করে নিষিদ্ধ পণ্যাদি অবৈধভাবে এক জিলা হতে অপর জিলায়, এক প্রদেশ হতে অপর প্রদেশে এবং অন্য রাষ্ট্রে চালান করে থাকে। এজন্য এরা খুনখারাপি এবং সৈন্য ও পুলিশের সহিত সংঘাত করতেও পিছপাও হয় নি। এইভাবে তারা ব্যাপক অপরাধের সৃষ্টি তো করেছেই, এমন কি সেই সঙ্গে বহু অপরাধী পরিবার ও অপরাধী-কলোনীরও সৃষ্টি করেছে। এই সকল অপরাধিগণ বড় বড় শহরের চতুর্দিক ঘিরে সাঙ্গপাঙ্গ সহ বসবাস করে।

এই সকল কারণে বড় বড় শহর হতে যারা যত দূরে বাস করে তাদের তত কম দ্রব্য সম্ভূত স্পৃহা দেখা যায়। এই সকল শহর হতে বহু দূরে যারা বাস করে তাদের মধ্যে মারপিঠ আদি শোণিতসম্ভূত অপস্পৃহা দেখা গেলেও চুরি-চামারি আদি দ্রব্যসম্ভূত অপস্পৃহা তুলনায় বহু কম দেখা গিয়েছে।

[মোটর মেরামত প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যবসায়ে লোক ঠকানোর সুযোগ অত্যধিক। এখানে ঐ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের সত্য মিথ্যা বহু অবান্তর বলে এটা ওটা কেনার জন্যে অর্থ আদায় করা হয়। এ সম্বন্ধে প্রফেশনাল্ ক্রাইম প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।]

বহু শিল্প মালিক ইচ্ছা করে খেলো ও নিম্ন মানের দ্রব্য তৈরি করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মোটর গাড়ি শিল্পের বিষয় বলা যায়। শক্ত মোটর গাড়ি কিংবা বিদ্যুৎ পাখা তৈরি করলে ঐগুলি বহু বৎসর টেকে। ফলে ওদের বাৎসরিক বিক্রয় সংখ্যা কমে যায়। এরা জানে ঐ সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিত্তবানদের কিনতেই হবে। বিদেশী দ্রব্য আমদানী বন্ধের পর এ বিষয়ে দেশীয় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের

স্বর্ণ সুযোগ। এরা নিজেদের মধ্যে এ'বিষয়ে পরামর্শ করে ক্ষণ-ভঙ্গুর দ্রব্য তৈরি করে করে ক্রেতাদের ক্ষতি করে। ফলে একটা মোটর গাড়ি ভাঙলে সে অন্য গাড়ি কিনতে অপারক হয়েছে। একাধিক ব্যক্তির একই দুরবস্থা দেখে ক্রয়েচ্ছু অন্য ব্যক্তি বৃথা টাকা নষ্ট করে না। এদের অনেকে পুরানো বিলাতি গাড়ি কিনতে উন্মুখ হয। ফলে, বিদেশ হতে দ্রব্যাদি আমদানী করতে দেওযা হলে কেউ একটিও স্বদেশে তৈরি দ্রব্য ক্রয় করবে না। এক-মাত্র ফ্রি কম্‌পিটিশনে ভালো দ্রব্য এদেশে তৈরি হতে পারে । অন্যথায় এ' বিষয়ে রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

নিম্নমানের ও ভেজাল দ্রব্য বিদেশে চালান দিযে এঁরা স্বদেশের বিদেশী মার্কেট নষ্ট করেন। ফলে অন্যদের ভালো দ্রব্যও কেউ সেখানে কিনতে চান নি। আমি নিজে মেহেদী পাতা গুঁড়োর সঙ্গে বালি মিশিযে ঐ মাল বিদেশে চালান দিতে দেখেছি। এই বদনামেব জন্য বিদেশে বহু দ্রব্যের বাজার আমরা হারিয়েছি। রাজ-সরকারের বিদেশে রপ্তানী মালগুলো ভালো রূপে পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেওয়া উচিত। নির্দিষ্ট সংখ্যাতে কিছু বিদেশী দ্রব্য আমদানী হতে দিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে। ব্যবসায় সংক্রান্ত অপরাধের অপর একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হলো।

"অমুক জুট মিলে আমি খুউব কম মূল্যে যন্ত্রাংশ সাপ্লাই করতে থাকি। এত কম মূল্যে বিক্রয় করলে দ্রব্য তৈরির পড়তা পোষায় না। অন্য সকলে এতে অবাক হয়ে যায়। আমি কিন্তু ঐ মিল হতে চুরি করে আনা দ্রব্য নামমাত্র মূল্যে খরিদ করে ঐ মিলেতেই তা লাভে সাপ্লাই করেছি।"

গুদামে আগুন লাগিয়ে ইনসিওর কোম্পানি হতে অর্থ আদায়ও

করা হয়ে' থাকে। তার পূর্বে অধিকাংশ দ্রব্য অন্যত্র পাচার করা হয়েছে।

ইনকাম ট্যাক্স বৈধ এবং অবৈধ ভাবে ফাঁকি দেওযা ব্যবসায়ীদের অন্যতম অপরাধ। বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা আয় হলে ৮২ হাজার টাকা এদেরকে সরকারকে দিতে হয়। এই ক্ষতি তারা অন্য রূপে পুষিয়ে নেয়। এ জন্য ব্যবসায়ীরা তাদের বাড়ির দ্বারবান ও ভৃত্যদের ফ্যাকটরির কর্মীরূপে দেখান। কোম্পানি হতে তাদের বেতন দেওয়া হয়। এমন কি নিজেদের ব্যবহৃত বাগান-বাড়িকে গেস্ট হাউস এবং তীর্থ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে নির্মিত নিজ বাটীগুলিকে রেস্ট্‌হাউস রূপে দেখানো হয়। ঐ বাবদে দেয় ট্যাক্স ও মেরামতি খরচ কোম্পানি দিয়ে থাকে। মালিকরা তাদের মোটর গাড়িগুলিকে কোম্পানির নামে রেজিস্টারি করেন এবং ড্রাইভারদের বেতনও কোম্পানি দিয়ে থাকে। দেশ বিদেশে ভ্রমণ বাবদ অর্থ ব্যবসায় সংক্রান্ত টুরের [Tour] ব্যাপার বলা হয়। এই ভাবে কেবলমাত্র আহার ও বসন-ভূষণ খরচ ব্যতিরেকে এঁদের অন্য খরচ নেই। এঁদের চিকিৎসা পর্যন্ত কোম্পানির ডাক্তাররা করে থাকে। এঁরা বহু আত্মীয়-স্বজনকেও অধিক বেতনে পুষেন। এই খরচ ইনকামট্যাক্স হতে বাদ যাওয়াতে এঁদের এতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। এঁরা বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান তৈরি করে উহা নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখেন। ইনফ্লেটেড্‌ খরচ দেখিয়ে ইনকাম-ট্যাক্স হতে রিবেট্‌ পান। অধিকন্তু এঁরা সরকারী গ্রাণ্টও আদায় করে থাকেন। এই বাবদ এঁদের বাড়তি আয় হওয়াও সম্ভব। কারণ—হিসাব পত্র এঁদেরই হেপাজতে থাকে। উপরন্তু ডিরেক্টর রূপে মোটা বেতনও এঁরা গ্রহণ করেন। পিতা ভ্রাতা পৌত্র—সাবালক

হওয়া মাত্র ডিরেক্টর হন। এমন কি এঁদের বধূরা কার্য না করেও অফিস হতে মোটা বেতন নেন। এঁদের ট্রাস্টেড্ ম্যানেজাররা ঐ বিষয়ে এঁদেরকে সাহায্য করেন।*

উৎকোচ প্রদান এঁদের অন্যতম অপরাধ। এই ভাবে স্বার্থ উদ্ধাবের জন্য এঁরা রাজকীয় কর্মকৃত্যেব সৎ অফিসারগণকে প্রলুব্ধ করে অসৎ করে তুলেন। বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য পাপাচার বন্ধ হবে। এঁদের অন্য আয়ের সোর্স দেখানোর জন্য এঁরা কৃষিকার্য না করেও এঁরা বহু কৃষি জমি ক্রয় করে রাখেন—কারণ কৃষির ইনকামট্যাক্স সাধারণ ইনকামট্যাক্সের মধ্যে পড়ে না। একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সামান্য অর্থলাভের আশায় স্বদেশকে বিলিযে দিতে প্রস্তুত। এমন কি স্মাগলড্ বারুদও সমাজ বিরোধীদেব নিকট এদের বিক্রয করতে বাধেনি। এরূপ ক্ষেত্রে ছোট-বড় সব ব্যবসায'ই রাষ্ট্রাযত্ত করতে হবে।

কোনও ব্যবসায়ী চেক দ্বারা দ্রব্য কেনেন। ব্যাঙ্কের ঐ চেক ডিসঅনার্ড হলে ফৌজদারী মামলা হয়। উহা এড়াতে এঁরা তাড়াতাড়ি কিছু নগদ টাকা দিয়ে বাকি টাকার জন্য অপর এক চেক দেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বিশ্বাস করে উহা গ্রহণ করেন কিন্তু ঐ দ্বিতীয় চেকটিও ডিসঅনার্ড হয়। এই ভাবে প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী উহাকে দেওয়ানী মামলাতে পর্যবসিত করেন।

কোনও এক উকিল বাবু আমাকে বলেছিলেন,—'মশাই ! সম্পত্তি

---

* উচ্চ বেতনের টাইপিস্টরা এঁদের রক্ষিতা। কর্মীদের পত্নীদের উপরও এঁদের লোলুপ দৃষ্টি। পূর্বতন জমিদারদের অপেক্ষা এঁরা সুখভোগী। অবশ্য এঁদের সংখ্যা এখনও অনেক কম।

এবং ব্যবসায় রক্ষা করতে হলে জুচ্চুরী আপনাকে শিখতেই হবে। শুধু তাই নয়। ঐ বিদ্যা আপনার পুত্রকে এবং সময় পেলে পৌত্রকেও তা শিখাতে হবে। অন্যথায় অন্যদের সঙ্গে কমপিটিশনে সব কিছু লোপাট হবে।'

বহু ব্যবসায়ী ফ্যাকটরি বা সম্পত্তি বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক হতে মোটা অঙ্কের অর্থ কর্জ করে তা অন্যত্র ব্যয় বা আত্মসাৎ করেন। ব্যাঙ্ক মামলা করে উহা ক্রোক করার পর দেখেন যে প্রদত্ত অর্থের অর্ধেকও উঠেনি। ব্যাঙ্ক কর্মীদের যোগসাজসে এই অপকর্ম করা হয়।

ব্যাঙ্ক ফ্রড

ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেস্ বা ব্যাঙ্ক সম্পর্কিত মামলাসকল ব্যবসায় সংক্রান্ত অপকর্মের পর্যায়ে পড়ে থাকে। "বেয়ারার চেক" জাল বা নকল করে ব্যাঙ্ক হতে অর্থ আদায় এক অতি সাধারণ ব্যাপার। এই অপকর্মে দুর্বৃত্তেরা কোনও ব্যক্তির নিকট হ'তে কৌশলে একটি ৫৲, ১০৲ বা ৫০৲ টাকার বেয়ারার চেক্ সংগ্রহ করে। এরপর তারা ঐ চেকের সংখ্যাগুলি কোনও এক বিশেষ কেমিক্যালের* সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে, ঐস্থলে ৫০০৲, ১০০০৲ বা ৫০০০০৲ টাকা লিখে ঐ চেক্ ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নেয়। কখনও এরা এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের সহিত ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত থাকে। ব্রাঞ্চ ব্যাঙ্ক-গুলিতে সকল সময় অধিক টাকা মজুত থাকে না। এরা ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের নিকট প্রথমে জেনে নেয় ঐদিন প্রয়োজনীয় টাকা ব্যাঙ্কে জমা প'ড়েছে কিনা। ঐ টাকা ঐদিন যে ব্যাঙ্কে মজুত আছে তা

---

* জনস্বার্থের কারণে এই কেমিক্যালের নাম জানানো হ'ল না। এই কেমিক্যালের সাহায্যে অতি সহজে যে কোনও পেনসিল বা কালির লেখা বেমালুম ভাবে উঠিয়ে ফেলা যায়। তবে কয়েক প্রকার বিশেষ ধরনের কালিতে লেখা হলে উহা উঠানো যায় না। ইহাতে কালি চেকের শেষ ফাইবার পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে।

জ্ঞাত হওয়ামাত্র তারা ঐ জাল চেকটি ব্যাঙ্কে দাখিল ক'রে টাকা উঠিয়ে নিয়ে সরে পড়ে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ও খোদ মালিকরাও এই সকল ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসে সংশ্লিষ্ট থাকেন। এদের ধূর্ততা সুচতুর অডিটাররাও ধরতে অক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে "একাউণ্টে কোনও ভুল নেই", এইরূপ সার্টিফিকেট্ও তাঁরা প্রতি বৎসর দিয়ে থাকেন। এই সকল দুর্বৃত্তদের ষড়যন্ত্রের ফলে সাধু চরিত্রের অডিটাররাও বিনাদোষে বদনামের ভাগী হয়েছেন। আমি একবার কোনও এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্ কেসের অপরাধীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আচ্ছা! আপনি বছরের পর বছর ধ'রে অতগুলি অডিটারকে কি রূপে ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়েছেন?" প্রত্যুত্তরে অপরাধীটি নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে।

"আসলে বিষয়টি থাকে আগাগোড়া মনস্তত্ত্বমূলক। অডিটার প্রথমে "আইটেম্ বাই আইটেমের' অঙ্কগুলি মিলিয়ে নিতে থাকেন, এবং আমিও এ বিষয় তাঁকে সাহায্য করতে থাকি। নিম্নের তালিকাটি দেখলে বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

√২০০০০|০	√৫০০০|০	আইটেম্ নং ১
√৫০০০০|০	√২০০০|০	" ২
√৩০৫০০|০	√১৫০০|০	" ৩
√৭০৩৪৫|০	√৭০৮০|০	" ৪
√২১০০০|০	√১০০০|০	" ৫
টাঃ ৯১৮৪৫ ০৲	টাঃ ১৭৫০ ০ ০৲	

পৃথক পৃথক খাতাপত্র চেক্ ক'রে অডিটার দেখলেন, উহাতে জমা বা খরচ দেখানো হয়েছে, যথাক্রমে ২০০০০৲, ৫০০০০৲, ৩০৫০০৲ ৭০৩৪৫৲ ও ২১০০ ৲ এবং ৫০০০৲, ২০০০৲, ১৫০০৲, ৭০৮০৲, ২০০০৲; ভাউচার রিশিপ্ট প্রভৃতির সহিত এই সংখ্যাগুলির কোনও

অমিলও নেই, ইত্যাদি। অডিটারমশাই বিভিন্ন খাতা-পত্র হ'তে সংখ্যাগুলি যথাক্রমে মিলিয়ে নিয়ে উহার [সংখ্যার] পাশে পাশে একটি ক'রে টিক্ দিয়ে গেলেন। এর পরই তিনি যদি যোগ দিয়ে ফেলতেন, তা হ'লে তিনি দেখতে পেতেন যে, যোগফল অত্যন্তরূপ বেশি করে দেখানো হয়েছে ; এদিকে অডিটারমশাই যে সময় যোগ দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা এক হট্টগোল বাধিয়ে বসি, যাতে করে সেদিনকার মত কাযে তাঁকে ক্ষান্ত দিতে হয়। হঠাৎ উপর হ'তে [ম্যানেজারের বাসা হ'তে] থালি থালি জলখাবার এসে পড়ে। কিংবা হঠাৎ ম্যানেজারের কোনও এক যুবতী ভগিনী বা শ্যালিকা আবির্ভূত হ'য়ে খাবার খেতে অডিটারকে উঠে পড়ে উপরে যাওয়ার জন্য তাগিদ জানায়। এর পর তাঁর উপরে যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। এর পর সেখানে শুরু হয় তাঁর ভগিনী কিংবা শ্যালিকার বা কন্যার গীত ও ওরিয়েণ্ট'ল নৃত্য। অডিটার কর্তব্য কর্ম পরের দিনের জন্যে মুলতুবি রেখে গৃহে গমন করেন বাধ্য হয়েই। কোনও কোনও সময় হঠাৎ সেখানে থিয়েটারের পাশও এসে পড়ে। ম্যানেজারও তখন 'চলুন মশাই থিয়েটার দেখে আসি। এখানে কাজ কর্ম তো আছেই। ও সব কাজ না হয় কালই হবে—' ইত্যাদি বাক্য ব'লে অডিটারকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠেন। কখনও বা হঠাৎ ম্যানেজারের বাড়ি থেকে এক দুঃসংবাদ এসে পড়ে। এর ফলে অডিটারকে এমনিই কার্যে ক্ষান্ত দিতে হয়। কখনও কখনও অকারণে ঝগড়াঝাটি করেও অডিটারকে ঐ দিনের মত কার্যে ক্ষান্ত দিতে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা যোগ দেওয়ার কার্য শেষ না করেই অডিটারকে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরতে হবেই। এমন কি ক্ষেত্র -বিশেষে স্বল্প মাত্রায় আগুন পর্যন্ত লাগিয়ে তা পরে নিবানো হয়েছে।

অডিটার চলে গেলে আমরা প্রয়োজনমত সংখ্যাগুলির পার্শ্বে প্রদর্শিত লম্বালম্বি দাঁড়ি দুইটির ওপারের [চিত্র দেখুন] সংখ্যাগুলি যোগ করে দিই। অর্থাৎ মূল সংখ্যাগুলির সহিত প্রতি লাইনেই প্রয়োজন মত একটি বা দুইটি ডিজিট [সংখ্যা] আমরা যুক্ত করে দিই, যাতে করে যোগফলের মধ্যে কোনওরূপ ভুলচুক ধরা না পড়ে। পরের দিন কাজে এসে অডিটার সাহেব দেখে নেন কোন্ কোন্ সংখ্যার উপর তিনি টিক্ দিয়ে গেছেন। এইগুলি পূর্ব দিন মিলিয়ে নিয়ে তিনি টিক মেরে গেছেন। এই জন্যে ঐগুলি তিনি আর পুনরায় পরীক্ষা করা প্রয়োজন মনে করেন না। এদিকে ঐ সংখ্যাগুলির সহিত যে আমরা প্রয়োজনমত একটি বা দুইটি সংখ্যা যোগ করে দিয়েছি তা তিনি দেখেও দেখতে পান না। তাঁর ধারণা হয় ঐগুলি পূর্ব দিনেও ঐরূপ ভাবে লেখা ছিল। অত খুঁটিনাটি মনে রাখাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। অডিটারমশাই এইবার নিঃসন্দেহে সংখ্যাগুলি যোগ দিয়ে যোগফল মিলিয়ে দেখেন যে, উহাতে কোনও রূপ ভুল নেই। তিনি তখন হেড্ অফিসে [বা গভর্নমেণ্টে] রিপোর্ট দাখিল করে দেন, যে, হেড্ অফিসে বা অন্যত্র পাঠান মূল সংখ্যাতে কোনওরূপ ভুল নেই। খাতাপত্র চেক্ করে তিনিও ঐ সংখ্যাটি [যোগফল] নির্ভুল ভাবে পেয়েছেন, ইত্যাদি।"

এভাবে রিপোর্ট দাখিল করার জন্যে ঐ সকল হিসাব পরীক্ষকও [Auditor] এই সকল তহবিল তছরূপের ব্যাপারে পরোক্ষভাবে একরকম বিনাদোষেই জড়িয়ে পড়ে থাকেন। সাধারণ দৃষ্টিতে এঁদেরও একজন অপরাধী মনে হয়। কিন্তু আসলে এঁরা থাকেন সম্পূর্ণরূপেই নির্দোষ।

এই ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে নিয়ে একটি চমকপ্রদ বিবৃতি তুলে দেওয়া

হল। এই বিবৃতিটি হতে ব্যাঙ্ক ফ্রড্ সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝা যাবে।

"আমি প্রতারণার উদ্দেশ্যে প্রায় বারোটি ছোট ছোট ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলে দিই। এই সকল একাউণ্টে আমরা স্বল্প মাত্র টাকা রেখে থাকি। এর পর আমরা কয়েকটা বোগাস্ অর্ডারের কাগজ তৈরি করে নিই। বড় বড় অফিস হ'তে ছাপানো ফর্ম সংগ্রহ তো আমরা করিই; এ ছাড়া ঐ অফিসের বড় সাহেবদের সইও— আমরা জাল করেছি। প্রায় এক লক্ষ টাকার অর্ডারসহ জাল কাগজপত্র আমরা কোনও একটি ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে উহার স্বপক্ষে আমরা হাজার পঞ্চাশ টাকা কর্জ করে নিই। এক লক্ষ টাকার কাগজপত্র জামিন হিসাবে পাওয়ায় ঐ অর্থের অর্ধেক টাকা আমাদের কর্জ স্বরূপ দিতে ব্যাঙ্ক সহজেই রাজি হয়ে থাকে। এর কিছুদিন পর ব্যাঙ্ক ঐ সকল কাগজপত্র কথিত অফিসে টাকা আদায়ের জন্যে দাখিল ক'রে থাকে—কিন্তু তা করলে কি হয়। ঐ অফিসেরই কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের লোক থাকায় ঐ সকল কাগজপত্র আমাদের কাছেই ফিরে আসে। ওগুলো ঐ অফিসের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট কদাপি পৌঁছায় না। ঐ ব্যাঙ্ক যদি খুব বেশি তাগিদ দিতে থাকে তা হলে ঐ অফিসেরই এক কর্মচারীর মারফৎ মাত্র একটা বা দুইটা বিলের টাকা ঐ অফিসের আসল কর্তাদের অজ্ঞাতেই আমরা জমা দিয়ে দিই। এখন জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে এই টাকাটাই বা আমরা পাই কোথা থেকে? কারণ, চুরির বা জুয়োচুরির টাকাটা আমরা সঙ্গে সঙ্গেই ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিই। আসলে ঐ ভাবে টাকা জমা দেওয়ার ব্যাপারটি হয়ে থাকে এইরূপ: ঐ ব্যাঙ্কের তাগিদ অত্যধিক হ'বা মাত্র আমরা ঐরূপ জাল কাগজপত্র অপর আর একটি ব্যাঙ্কে

জমা দিয়ে ঐ ভাবেই বহু টাকা কর্জ করে নিই এবং এই কর্জ করা টাকার কিছুটা অংশ ঐ ভাবে লোক মারফৎ পূর্বেকার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি। এই ভাবে অত টাকা পরিশোধ করায় আমাদের উপর ঐ ব্যাঙ্কের বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। এর ফলে পরের বার আমরা আরও অধিক কর্জ পেয়ে থাকি। এই ভাবে এক সঙ্গে চার বা পাঁচটি ব্যাঙ্কের সহিত লেন-দেনের কারবার ক'রে শেষ বরাবর আর সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠলে আমরা যা কিছু টাকা পাবার তা পেয়ে নিযে কারবার উঠিয়ে রাতারাতি সরে প'ড়ে থাকি। এতে করে ঐ সকল ব্যাঙ্কাররা আমাদের নাগাল আর পায় না। আমরা সরে পড়ার পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, এত দিন যা কিছু কাজকর্ম বা কারবার তা তাঁরা একটা ঠগী দলের সঙ্গে করেছেন এবং তাঁরা এ'ও জানতে পারেন যে ঐ অফিসের কর্মকর্তারা এই সকল কাগজপত্র সম্বন্ধে একেবারেই ওয়াকিবহাল নন।"

কোনও কোনও সময় দুষ্টপ্রকৃতির পোস্টাল পিওনদের সহযোগিতায় এই ব্যাঙ্কের প্রতারণার কায সমাধিত হয়ে থাকে। অনেক সময় নাগরিকরা খামের ভিতর করে সই করা চেক্ পাঠিয়ে থাকেন। অসৎ প্রকৃতির পোস্টাল পিওনরা ঐ সকল খাম বা লেপাফা তীব্র আলোকের সম্মুখে ন্যস্ত ক'রে বুঝে নেয় যে ঐ খামের ভিতর চেক্ আছে কি'না ? এই ভাবে চেকের সন্ধান পাওয়া মাত্র তারা খামখানি গাপ করে কিংবা উহা ভেপারের [বাষ্প] মুখে ধরে খুলে ফেলে ঐ খামের ভিতর হতে চেকখানি বার করে নিয়ে ঐ সকল দুর্বৃত্তদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। এর পর দুর্বৃত্তরা উহাতে লিখিত (অর্থের) সংখ্যা কেমিকেলের সাহায্যে উঠিয়ে ফেলে

উহা দশগুণ করে জাল সই-এর দ্বারা উহা নিজের নামে এন্‌ডোর্স বা খারিজ করিয়ে ঐ চেক্‌টি কোনও একটি ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে নিজের একাউন্টে জমা করিয়ে নেয়। এই উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা ছোট ছোট ব্যাঙ্কে মিথ্যা নাম দিয়ে [বা স্বনামে] ছোট ছোট কয়েকটি একাউন্টও খুলে থাকে। এই ছোট ব্যাঙ্কটি তখন বড় ব্যাঙ্কে ঐ চেকটা পাঠিয়ে দিয়ে উহা ভাঙিয়ে নিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক থেকে ব্যাঙ্কে চেক্‌ পাঠানোর ফলে কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহেরও উদ্রেক হয় না। এইজন্য ঐ ড্রআরকে সনাক্ত করারও কোনও রূপ প্রশ্ন উঠে না। ওরা সনাক্ত না হলে অতগুলো টাকা হয় ত বড় ব্যাঙ্ক ওদেরকে দিত না। এই ভাবে ছোট ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঐ বড় ব্যাঙ্কটি হতে সমুদয় অর্থ উঠিয়ে নিয়ে দুর্বৃত্তটি শহর ত্যাগ ক'রে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। ছোট ব্যাঙ্কগুলির টাকার খাঁকতি থাকায় উহারা বিনা ইণ্ট্রোডাক্‌শনে সকল ব্যক্তিরই অর্থাদি জমা নিয়ে থাকে।

এই সকল চোরাই চেক অন্যান্য উপায়েও ভাঙিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তরা কোনও দোকানে একটি জাল বা চোরাই চেক প্রদান করে বহু টাকার মূল্যের দ্রব্য কেনে। দোকানী নিজের ব্যাঙ্কের একাউন্টের মাধ্যমে কথিত ব্যাঙ্ক হতে ঐ চেক ভাঙিয়ে নিয়ে তবে দুর্বৃত্তদের বিক্রীত দ্রব্যাদির ডেলিভারি দিয়েছে। পরে পুলিশ ঐ দুইটি ব্যাঙ্কের সাহায্যে ঐ দোকানীকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু ঐ সময় প্রকৃত চোরকে সব ক্ষেত্রে খুঁজে বার করতে না পেরে পুলিশ ঐ জাল চেকের দায়ে ঐ নির্দোষ ব্যাপারীকে হায়রানি করেছে।"

অপর আর এক ব্যাঙ্ক ফ্রড্‌ সংক্রান্ত অপরাধী আমার নিকট এইরূপ এক বিবৃতি দিয়েছিল।

"আমরা প্রথমে একটি জাল রেলওয়ে রিশিপট্ যোগাড় করি—ঐ রেলওয়ে রিসিপ্টে প্রায় ২০০০০৲ টাকার মূল্যের দ্রব্যের কথা লিখা থাকে। এর পর আমরা কোনও এক ব্যাঙ্কে ঐ রিশিপ্ট দাখিল ক'রে উক্ত ব্যাঙ্ককে উক্ত দ্রব্যাদি খালাস করে নেবার জন্যে অথোরাইজড্ করে দিয়ে থাকি। এর পর ঐ দ্রব্যের বিনিময়ে আমরা যৎসামান্য অ্যাডভান্স স্বরূপ চেয়ে নিই। অত টাকার দ্রব্য হেপাজতে থাকায় উক্ত ব্যাঙ্ক আমাকে একটা ৫০৲ বা ৫০০৲ টাকার চেক এমনিই লিখে দিয়ে থাকে। এই চেকটির অঙ্ক আমরা যথা নিয়মে কেমিক্যালের দ্বারা উঠিয়ে ফেলে উহাতে একটা ৫০০০৲ বা ৫০০০০৲ টাকার মোটা অঙ্ক খুশিমত লিখে নিয়ে উক্ত চেক আমরা যথাসময়ে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে সরে পড়ে থাকি। নিম্নের সইটি এবং চেকের নম্বর ঠিক থাকায় ব্যাঙ্ক নিঃসন্দেহে আমাদের উক্ত অর্থ প্রদান করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমরা দূর শহরে একটা ছোট ফার্ম খুলে বড় শহরের কোনও এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে ঐ স্থান হ'তে চিঠিপত্র চালাতে থাকি। এর পর ঐরূপ একটা রেলওয়ে রিশিপ্ট দাখিল করে ঐ ব্যাঙ্কের নিকট আমরা টাকা আমানত চাই। ঐ রিশিপ্টে আমরা লিখিয়ে দিই যে ১০ টিন প্লাটিনাম বা অনুরূপ কোনও দুর্মূল্য দ্রব্যাদির কথা, আসলে কিন্তু ঐ টিন বা পিপাগুলিতে থাকে সিমেণ্ট, টিন বা মাটি। ব্যাঙ্কের লোকেরা যথারীতি রেলওয়ের গুদামে এসে ঐ টিন বা পিপা গুনে দেখে নেয় যে উহা ঠিক আছে কি'না কিংবা কোম্পানির লোকেদের নিকট হ'তে তদন্ত ক'রে জেনে নেয় ঐরূপ পিপা যথার্থই বুক্ করা হয়েছে কি'না। এর পর ব্যাঙ্ক ঐ প্লাটিনামের মূল্যের অর্ধেক টাকা প্রতারকদের কর্জ স্বরূপ প্রদান করে ঐ মাল ঐ রিশিপ্টের সাহায্যে রেলওয়ে হ'তে ছাড়িয়ে এনে গুদামে তুলে দেখতে পায় যে উহাতে

প্লাটিনাম নেই। ওগুলোতে ভরা আছে মাত্র সিমেণ্ট বা মাটি।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কের কোনও কোনও কর্তাব্যক্তিও তাঁদের খাতকদের ঠকিয়ে থাকেন। এঁরা জেনেশুনে এমন সকল ব্যক্তিকে ওভারড্রাফ্‌ট বা কর্জ দেন, যাঁরা কিনা কস্মিনকালেও ঐ টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না। আসলে এই সকল বাহিরের দুর্বৃত্তদের সহিত তাঁদের আধাআধি হিসাবে বখরা হ'য়ে থাকে। এই জন্যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজাররা এমন সব সম্পত্তি জামিনস্বরূপ গ্রহণ করেন "কর্জ দেওয়া অর্থের" তুলনায়, যার কিনা কোনও মূল্য নেই। এখানেও ঐরূপ আধাআধির হিসাবে বখরার বন্দোবস্ত হয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন অমুক ব্যাঙ্কের কর্মচারী, নিজেই নিজেদের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করা শোভা পায় না। তাই আমি আমার এক নামকরা বন্ধুর কাছে এসে প্রস্তাব করি, 'দেখ ভাই, তুমি জানো আমি একজন ব্যবসাদার। প্রায়ই নানারূপ দেনা-পাওনায় আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়। এজন্যে আমি বেনামীতে একটা একাউণ্ট খুলতে চাই। মনে করছি তোর নামেই একাউণ্টটা খুলব। টাকাকড়ি যা জমা দেবার তা আমিই দেব। তুই মাঝে মাঝে একটা করে সই দিয়ে যাবি। এজন্যে মাসে মাসে তোকে আমি ৫০৲ টাকা ক'রে তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ দিয়ে যাব। বন্ধুবর ব্যাঙ্কের কার্য সম্বন্ধে কোনও কিছুই বুঝতেন না। এজন্যে তিনি সহজেই আমার এই প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এর কয়দিন পর হ'তেই আমি আমার 'নিজের সাহায্যেই' আমার ব্যাঙ্ক হতেই ওভার ড্রাফ্‌ট নিতে শুরু করে দিই। এই টাকা হ'তে আমি তিন চারটি কারবারও শুরু

করে দিই। আমাব ইচ্ছা ছিল এই সকল কারবার ফেঁপে উঠলে আমি এই সকল কর্জ বন্ধুর মারফৎ কারবার হ'তেই শোধ করে দেব। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ থাকায় আমার ব্যবসায় ফেল হয়। ঐ টাকা পরিশোধ করতে আমি অপারক হই। এইভাবে আমি নিজের ও ঐ বন্ধুর এবং তৎসহ ঐ ব্যাঙ্করও বিপদের কারণ ঘটাই।"

আত্মীয়বাৎসল্য বা বন্ধুপ্রীতির কারণে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ দ্বারা অবাঞ্ছনীয বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কেব কর্মে নিয়োগ করার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপও অনেক ছোট খাটো নূতন ব্যাঙ্কের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোনও কোনও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ব্যাঙ্কে জমার জন্যে কিছু টাকার আমদানী কবতে সাহায্য করার জন্যেও বিনানুসন্ধানে যা'কে তা'কে ব্যাঙ্কেব কর্মে নিযুক্ত করে থাকেন। এই সকল ব্যক্তি দ্বারা তহবিল তছ্‌রুপ আদি অপকর্ম কবা অসম্ভব নয়। নবজাত দেশীয ব্যাঙ্কগুলির পতনের জন্যে এইরূপ নির্বিচার কর্মচারী নিয়োগও বহুল পরিমাণে দাযী থাকে।

[এমন অনেক ব্যবসায প্রতিষ্ঠানের অসাধু মালিকের কাহিনী শুনা গেছে যাঁরা নানাবিধ কৌশলে প্রথমে ব্যবসাযেব সমুদয় পুঁজিপাত্তি সরিযে ফেলেন। ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে হঠাৎ লিমিটেড্‌ ক'রে শেয়াব বিক্রয কবতে শুরু করেন। এছাড়া এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন যাঁরা ব্যবসাক্ষেত্রে কোনও এক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বহু লাভের কথা ব'লে ব্যবসায় নামিয়ে তার অর্থ অপহরণ করে থাকেন। মানুষের লোভ তার ক্রোধের ন্যায় মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি হরণ করে থাকে। এই কারণে বহু ব্যক্তি দুর্বৃত্তদের সকল কথাই বিশ্বাস করে যান। এইরূপ অবস্থায় কোনও এক অসংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ পক্ষের মতামত নিয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা বিধেয়।]

কোনও কোনও দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ের কারণে পল্লীগ্রামে এসে "দোনাখেল" ব্যাঙ্কেরও প্রবর্তন করে লোক ঠকিয়েছে। এই ব্যাঙ্ক খুলে এরা প্রথমে জানিয়ে দেয় যে, এক টাকা রাখলে দু'টাকা দেওয়া হ'বে। অর্থাৎ কি'না জমা অর্থের দ্বিগুণ অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হ'বে। প্রথম প্রথম এরা কয়েকজনকে প্রতিশ্রুতি মত দ্বিগুণ অর্থ দিয়েও থাকে। কিন্তু পরে অনেক টাকা জমা পড়লে এ'রা একদিন সমুদয় অর্থ নিয়ে সরে পড়ে থাকেন।

আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির স্ট্রঙ্ রুম্‌গুলি দুর্ভেদ্য রূপে তৈরি করা হয়। বহুদিন যাবৎ বহু জনের চেষ্টা ব্যতিরেকে উহা ভাঙা বা লুঠ করা সম্ভব নয়। অধুনা কালে তহবিল তছ্‌রুপ, জালিয়াতী ও প্রতারণা ব্যতীত ব্যাঙ্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব নয়। এ'জন্য এই অপকর্মের সাফল্যের জন্য বহুপ্রকার প্রবঞ্চনা পদ্ধতি সৃষ্ট হয়েছে। ইহাদের একটি চিত্তাকর্ষক বিলাতি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

'আমি অপকর্ম দ্বারা সংগৃহীত পঞ্চাশ হাজার টাকা অমুক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখি। এর পর শেয়ার কেনা-বেচার সংবাদ সংগ্রহের অজুহাতে ঐ ব্যাঙ্কের কর্তা ব্যক্তিদের সাথে আলাপ জমাই। কয়েকবার তাদের ম্যানেজারকে স্ব-বাটীতে নিমন্ত্রণ করে [কক্‌টেলপার্টি] আপ্যায়িত করেছি। একদিন আমি বিব্রত ভাব দেখিয়ে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে বলি,—'মশাই! আমার এক নূতন পার্টনারকে ত্রিশ হাজার টাকার একটা চেক কেটে দিয়েছি। সেটা সে ওখানে ভাঙাতে না পারলে আমার বিপদ। লোকটা স্পর্শকাতর ব্যস্তবাগীশ পাগলা টাইপের অদ্ভুত মানুষ।' আমার উত্তরে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভয় দিয়ে আমাকে জানালো যে—'তাতে আর অসুবিধে কি? আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই ব্যাঙ্কে আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা

এখনও পর্যন্ত জমা আছে। আমি কর্মচারীদের বলে দেবো যে তারা যেন একটুও দেরি না করে তাকে ঐ টাকা দিয়ে দেয়।" আমি এইবার একটু আশ্বস্ত ভাব দেখিয়ে পুনরায় ঐ ম্যানেজারকে অনুযোগ করে বললাম,—'কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে কোন্ কাউণ্টারে উনি যাবেন তার ঠিক কি? আপনাদের ওখানে তো সর্বশুদ্ধ বারোটা কাউণ্টার আছে। ঐ অদ্ভুত রাগী লোক সেখানে একটু মাত্র দেরি হলে রেগে ঐ স্থান ত্যাগ করবে। এতে আমার যে কি ক্ষতি হবে তা আপনি বুঝবেন না। ঐ সকল কাউণ্টারে বহাল কর্মচারীরা আপনার উপদেশের অপেক্ষায় বা খাতাপত্র চেকেতে একটু দেরি করলে উনি অনর্থ বাধাবেন।' আমার এবংবিধ বিব্রত ভাব দেখে ঐ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দয়া পরবশ হয়ে প্রতিটি কাউণ্টারে হুকুম দিলেন যে আমার সই করা অতো টাকার চেক পাওয়া মাত্র এক সেকেণ্ডের মধ্যে যেন ঐ চেকের বাহককে ঐ টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয়। এর পরদিন সকালে বারোটি লোক বারোটি ঐ অঙ্কের চেক্ সমেত ঐ ব্যাঙ্কের বারোটি কাউণ্টারে এসে উপস্থিত হয়। আমার প্রেরিত বারোটি সহকারী ঐ বারোটি কাউণ্টার হতে এক সেকেণ্ডের মধ্যে অতো টাকা তুলে নিতে পারে। এই ভাবে ঐ ব্যাঙ্কে আমার জমা টাকার বহুগুণ বেশি টাকা আমি তুলে ঐ শহর হতে সরে পড়ি।"

ডাকঘরে অপকর্ম

ব্যাঙ্ক ফ্রড প্রভৃতি অপকর্ম সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার পোস্টাল বা ডাকঘর সংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে বলা যাক। ডাকঘরে আমরা চুরি এবং জুয়োচুরি উভয়বিধ অপরাধই সংঘটিত হ'তে দেখি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ডাকঘরের চোরেরা অত্যন্তরূপ চতুর হয়ে থাকে। নিম্নের দৃষ্টান্তটি এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

য়ুরোপে এমন অনেক ডাকঘরের অপরাধী আছে যারা পোস্ট অফিসের মারফৎ একটি কাঠের ছোট বাক্স পার্শেল ক'রে পাঠায়। ঐ বাক্সের উপরে তারা লিখে রাখে "সোনার গহনা, মূল্য ২৫০০০৲ টাকা"। আসলে কিন্তু ঐ পার্শেলে কোনও গহনা থাকে না, গহনার পরিবর্তে তারা কয়েক টুকরা পাথর ও তৎসহ একটি জীবন্ত ইঁদুর অক্সিজেন গ্যাস সহ ঐ বাক্সে পুরে রাখে। এর পর যথারীতি উপরে সীলমোহর এঁটে তারা বাক্সটি পার্শেল করে অপর আর এক অপরাধীর কাছে ডাকঘরের মারফৎ পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ইঁদুরটি বাক্সবন্দি হয়ে বসবাস করতে স্বভাবতঃই রাজি থাকে না। পথিমধ্যেই ঐ জন্তুটি বাক্সটি দন্ত দ্বারা ফুটা ক'রে বেমালুম বার হয়ে যায়। এদিকে যথাস্থানে বাক্সটি পোঁছানোর পর বাক্সটির মধ্যে একটা ছিদ্র দেখা যায়। এই অবস্থায় বাক্সটি প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ অপরাধীটি বাক্সটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয় এবং পোস্ট অফিসের

নিকট পার্শেলের মূল্য বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করে থাকে। স্বভাবতঃ সকলের মনে হয় যে কে বা কাহারা বাক্সটি ঐরূপ ভাবে ফুটা করে গহনাগুলি বার করে নিয়েছে। পোস্ট অফিসকেও বাক্সটির প্রেরককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পার্শেলের মূল্য বাবদ সমস্ত টাকা খয়রাত দিতে বাধ্য হতে হয়।

চৌর্য অপরাধের এই পদ্ধতিটি যে একটি অদ্ভুত পদ্ধতি তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। এদেশেও পোস্টাল পার্শেলগুলি হামেসাই অপহৃত হয়ে থাকে। অনেক সময় পোস্টাল কর্মচারীদের যোগ সাজসেও এই সকল চুরি সংঘটিত হয়ে থাকে। কখনও ঐ সকল কর্মচারীদের কেহ কেহ নিজেরাও চুরি করে থাকেন। কেহ কেহ আবার এইরূপ ছোট-খাট চুরিকে "পাওনা" নামে অভিহিত করে থাকেন। এই সকল কর্মচারীদের পত্নীদের প্রায়ই বলতে শুনা গেছে, "এই সব জিনিস উনি অফিসে পেয়ে থাকেন।" মা লক্ষ্মীরা বুঝেও বুঝতে চান না যে এইগুলি তাঁদের স্বামীরা অফিস হ'তে চুরি করে এনেছেন। কোনও কোনও রেল কর্মচারীর স্ত্রীদেরও ঐরূপ বলতে শুনা গেছে। এই সকল ছোট বড় পার্শেল পোস্ট অফিস ও ষ্টিমার এবং রেল প্রভৃতি স্থান হতে অপহৃত হ'য়ে থাকে। দুঃখের বিষয় এই সকল ভদ্রসন্তানদের ঐসকল দ্রব্যের প্রেরকদের স্ত্রী-পুত্রের কথা একবারও মনে হয় না। ঐ একটুকরা দ্রব্য, তা যত কম মূল্যেরই হোক-না কেন—ঐ দ্রব্যটির জন্যে তাঁদের স্ত্রী-পুত্রেরা কত অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকে। দূরদেশ হ'তে আগত তাদের স্বামী, পুত্রের বা প্রিয়জনের ঐ স্মৃতিচিহ্নসকল তাদের কতটা আনন্দ প্রদান করতে পারে, তার শতাংশের একাংশও বুঝলে ঐ সামান্য দ্রব্যের জন্যে তাঁরা এইরূপ জঘন্য চৌর্য কার্যে কখনও লিপ্ত হতেন না। আমি এই সকল

ভদ্রসন্তানদের নিজেদের স্ত্রী-পুত্রের ও বিদেশস্থ প্রিয়জনদের কথা স্মরণ করে বিষয়টি অনুধাবন করবার জন্যে অনুরোধ করি।

"টেলিগ্রাফ সুইণ্ডিলিঙ" ডাকঘর সংক্রান্ত একটি অন্যতম অপরাধ। সাধারণতঃ টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডারের সাহায্যে এই সকল অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকে। এই সকল অপরাধীরা কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোনও কর্মচারী বা প্রতিনিধি ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য ব্যপদেশে বিদেশে যাচ্ছে কি'না তা সাবধানে খবর নেয়। ঐরূপ কোনও খবর পাওয়া মাত্র এরা ঐ ব্যক্তির পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে তার গন্তব্য স্থানে এসে হাজির হয়। পথিমধ্যে [ট্রেনের কামরায়] ঐ ব্যক্তির সহিত সংলাপ ক'রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তারা সংগ্রহ ক'রে নিতে ভুলে না। এর পর কথিত শহরের বা জনপদের কোনও দোকানে এসে তারা কিছু দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় ক'রে ঐ দোকানদারকে এইরূপ অনুরোধ জানায়—"দেখুন! আরও কিছু দ্রব্যাদি আপনার দোকান হ'তে আমি খরিদ করতে চাই। কিন্তু মশাই, আমাদের টাকার একটু কম পড়ে গেছে। আমাদের কলিকাতার ফার্মে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি, আপনার এই ঠিকানাতেই তারা টাকা পাঠাবে। দয়া করে পিওনকে ও বিষয়ে বলে রাখবেন।" দোকানী দেখে লোকটি তার একটা বড় দরের খরিদ্দার। তাই তার এই প্রস্তাবে তারা আনন্দের সহিতই রাজি হয়ে যায়। সাধারণতঃ অমুক ব্যক্তিরূপে কাহাকেও কেহ রীতিমত সনাক্ত না করলে পোস্টাল পিওনরা অত টাকা কাহাকেও ডেলিভারি দেয় না। এই কারণে দুর্বৃত্তরা ঐ দোকানদারের সহিত ঐরূপ ব্যবস্থা ক'রে কথিত ফার্মের কর্মচারী বা এজেন্টের নাম দিয়ে তাদের ব্যবসায় কেন্দ্রে কোন এক জরুরি কার্যের উল্লেখ করে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ

জানিয়ে "তার" করে দেয়। এর পর যথারীতি ঐ দোকানের ঠিকানায় টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারে টাকা এলে অপরাধীটি ঐ টাকা আত্মসাৎ করে বেমালুম সরে পড়ে থাকে। সাধারণতঃ, ব্যবসা কেন্দ্রের ব্রাঞ্চ অফিসের নাম নিয়ে মূল ব্যবসায় কেন্দ্রগুলিতে ঐরূপ ভাবে টাকা পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করে 'তার' পাঠান হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এই সকল ঠগীরা, যে শহরে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির হেড অফিস থাকে সেই শহর হতে অপর এক শহরের উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির ব্রাঞ্চ অফিসে 'তার' করে জানায় "অমুক ব্যক্তি অদ্যই ওখানে পৌঁছাবে। তাকে এত টাকা আপনারা দিবেন ইত্যাদি।" ব্যবস্থা মত দুর্বৃত্তদল ঐ ছোট শহরটিতে ঐ সময়েই হাজির থেকে পূর্ব ব্যবস্থামত টাকা নিয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রবাসী পুত্র বা ভ্রাতা বা আত্মীয়বর্গের নাম নিয়ে দেশস্থ অভিভাবকদের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেও দুর্বৃত্তরা অর্থাদি অপহরণ করে থাকে। এই সকল অপকর্মে দুর্বৃত্তগণ কোনও কোনও ক্ষেত্রে পোস্টাল-পিওনের যোগ-সাজসে পোস্টঅফিস থেকেই অর্থাদি গ্রহণ ক'রে সরে পড়েছে।

কয়েক বৎসর পূর্বে ঢাকা জিলায় কোনও এক দুর্বৃত্তদল এক অভিনব উপায়ে এইরূপ অপকার্য করতে পেরেছে। এরা টেলিগ্রাফ-লাইনের ধারে একটি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে একটি টেলিগ্রাফিক যন্ত্র বসিয়ে—ঐ যন্ত্রের সহিত সরকারী টেলিগ্রাফ লাইনের সংযোগ ঘটিয়ে বহু জাল [ভূয়া] টেলিগ্রাম বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নামে পাঠিয়ে দিয়েছে। এই দুর্বৃত্তদলের অপরাপর ব্যক্তি যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত থেকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হ'তে অর্থাদি গ্রহণ করে সরেও পড়েছে।

ডাকাতি

ডাকাতি অপরাধের প্রকৃত সংজ্ঞা ভারতীয় দণ্ডবিধি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। কতিপয় ব্যক্তি আপন স্বার্থে একটি বাটী লুঠ করলে আমরা তাকে ডাকাতি বলি। কিন্তু সহস্র ব্যক্তি একত্রে একশত বাটী লুঠ করলে তাকে আমরা ডাকাতি না বলে তাকে বলি জনবিক্ষোভ। কারণ এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তারা মাত্র সংখ্যার জোরে তাদের এই অপকর্মের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছে। অন্যদিকে ঐ প্রথমোক্ত ব্যক্তিবা তাদের সংখ্যার নগণ্যতার জন্য ঐরূপ এক ব্যাখ্যা দিতে পারে নি ব'লে তাদের আমরা বলেছি ডাকাত এবং তাদের ঐ অপকর্ম বোধ করতে না পারায় রক্ষীকুলকে আমরা দায়ী করেছি। আমাদের কেহ কেহ আবার প্রথমোক্তদের প্রতিরোধ না করার জন্য এবং দ্বিতীয়োক্তদের [উৎপীড়ন করা হয়েছে এই অছিলায়] প্রতিরোধ করার জন্য সরকারকে দায়ী করেছে। অপরদিকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্র সৈন্যদের অপর এক দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্যায় অভিযানকে ডাকাতি না বলে বলা হয়েছে যুদ্ধ। নির্মমতার বিষয় বাদ দিলে এই তিন গোষ্ঠীর মানুষই তাদের কম-বেশি সংখ্যানুযায়ী উপরোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। মূলতঃ কিন্তু তাদের সমান্বিত ক্ষতির হার ও উদ্দেশ্য থাকে হারাহারিরূপে একই।

অপরাধীদের সংখ্যানুযায়ী কোনও অপকর্ম ডাকাতি বা রবারি তা নির্ভর করে। রাহাজানিকে ইংরাজিতে বলা হয় রবারি এবং ডাকাতিকে বলা হয় ডেকয়টি। ইহাদের আইনগত পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা আছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯০ ধারায় "রবারির" সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন [Extortion] দ্বারা অর্থ অপহরণ করার অপর নাম রাহাজানি [Robbery]। এই বিশেষ অপকার্যে অপরাধীরা অপকর্মের উদ্দেশ্যে কিংবা অপকর্মের সময়, কিংবা চুরির বামাল নিযে পলায়নের সময়, কিংবা বামালাদি নিয়ে পালাবার প্রচেষ্টায় ইচ্ছাকৃত ভাবে কাহাকেও যদি অঘাত হানে কিংবা আঘাত হানবার চেষ্টা করে কিংবা ঐভাবে কাহারও মৃত্যু ঘটায় কিংবা কাহাকে বেআইনীভাবে আটক রাখে, কিংবা এমন ভাবে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে করে কেহ আশু আঘাত, মৃত্যু বা বেআইনী আটকের ভয়ে ভীত হয়ে উঠে—এই বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি সহযোগে অর্থ বা দ্রব্য অপহরণ করলে ঐ অপরাধকে রাহাজানি অপরাধ বলা হবে।"

রাহাজানি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার ডাকাতি অপরাধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা যাক। এই উভয় অপরাধের মধ্যে আদর্শগত কোনও প্রভেদ নেই। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯১ ধারায় এই অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইরূপ :

"যদি কখনও পাঁচ জন বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে বা একত্রে রাহাজানি অপকর্ম করে কিংবা উহা করার চেষ্টা করে, তা-হ'লে তাদের দ্বারা কৃত ঐ অপরাধকে ডাকাতি অপরাধ বলা হবে, এবং উক্ত অপকর্মকালীন যে সকল ব্যক্তি অকুস্থলে হাজির থাকবে বা উক্ত অপকর্মে সহায়তা করবে কিংবা উহার জন্যে তাহারা চেষ্টা করবে, তাদের সংখ্যা যদি পাঁচ বা ততোধিক হয়, তা হলে ঐরূপ কার্যের জন্য দের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ডাকাত বলা হবে এবং তাদের দ্বারা কৃত ঐরূপ কার্যসকলকে বলা হবে ডাকাতির কার্য।"

আজও পর্যন্ত বহুদূর গ্রামে ধনীরা সর্বসমক্ষে ভদ্র গৃহস্থ ব্যক্তি রূপে

পরিচিত থাকলেও তারা পূর্বকালীন কোনও কোনও জমিদারদের মত ডাকাত দল পোষণ করে, কয়েক ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে এরা নিজেরাই ডাকাত দলের সর্দার। একমাত্র স্বপরিবারের স্ত্রীপুরুষ ব্যতিরেকে অন্য কেহ তাদের প্রকৃত পেশার বিষয় অবগত নয়। এই সম্পর্কে একটি সাম্প্রতিক ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়টি বুঝাবার জন্য নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করা হল।

"আমি শহরবাসী হলেও বহু দূরে গ্রামাঞ্চলে এক জোতদার পরিবারের একমাত্র ষোড়শী কন্যার সাথে আমার বিবাহ হয়। এই দিন ট্রেন ফেইল করাতে বহু রাত্রে আমি ওখানকার এক গ্রামের স্টেশনে নামি। অগত্যা অন্ধকার রাত্রে মাঠের পথ ধরে আমি একাকী অগ্রসর হই। হঠাৎ একস্থানে দশ-বারো জন সশস্ত্র ব্যক্তি আমাকে ধরে। এরা আমার সোনার বোতাম সমেত সিল্কের শার্ট কেড়ে নেয়। এমন কি, এরা আমার সিল্কের গেঞ্জি এবং শান্তিপুরী ধুতিটিও খুলে নেয়। আমার হাতের সোনার আংটি এবং হাত-ঘড়িটিও এদের আমি খুলে দিই। তারপর ঘুরা পথে মাত্র একটা আণ্ডার ওআর [জাঙ্গিয়ার] পরে শ্বশুর বাটীর খিড়কির দুয়ারে এসে ধাক্কা দিই। বাটীর ঝি বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে লজ্জায় হতভম্ব হয এবং চুপি চুপি সে আমার স্ত্রীকে সেখানে ডেকে আনে। আমার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আমার হাতে ধরে তার শয়নকক্ষে আনে। সে তখন ঐ ঘরের আলমারি হতে একটি শান্তিপুরী ধুতি এবং সোনার বোতাম সমেত পাঞ্জাবি আমাকে পরার জন্য বার করে দেয়। আমি অবাক হয়ে এ সময়ে দেখি যে প্রিয়তমা আমারই অপহৃত সিল্কের গেঞ্জি, শান্তিপুরী ধুতি এবং পাঞ্জাবি আমাকে পরতে

দিলেন। আরও অবাক হয়ে আমি আমার হীরক অঙ্গুরী আমার স্ত্রীর অঙ্গুলীতে দেখতে পাই। এই বিষয় আমার স্ত্রীকে আমি জানালে সে ভীত হয়ে পড়ে। এরূপ কোনও অবস্থার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না।'সে তখন আমাকে সকল বিষয় খুলে বলে ও জানায় যে জানা-জানি হয়েছে বুঝলে, তার পিতা প্রাণাধিক জামাইকেও হত্যা করবে। এ অবস্থাতে আমি আমার স্ত্রীর হাতে ধরে গোপনে ঐ গৃহ ত্যাগ করে ভোর রাত্রে এক ক্রোশ দূরে এক থানাতে আসি। সেখানে এজাহার দিতে গিয়ে দেখি, থানার ঐ এজাহার-লিখিয়ে বাবুর হাতে আমারই সেই কেড়ে নেওয়া হাত-ঘড়িটা বাঁধা রয়েছে। এর পর সেখানে কোনও এজাহার না লিখিয়ে আমি দূরের এক রেল স্টেশনে পৌঁছাই। সেখান থেকে বিপরীতমুখী এক ট্রেনে উঠে ওদের এলাকার বাইরে যাই। কারণ, আমার স্ত্রীর সন্দেহ যে, জানতে পারলে আমার শ্বশুর আমাদের উভয়ের নামে থানাতে মিথ্যা করে চুরির উল্টা অভিযোগ করবে। এই অবস্থাতে আমাদের উভয়ের ঐ থানাতে হাজতবাসী হওয়াও অসম্ভব নয়। পরে আমি জানতে পারি যে শ্বশুরের অন্যত্র আরও বহু পত্নী ও উপপত্নী থাকাতে তাঁর বিশেষ কোনও এক সন্তানের প্রতি তাঁর খুব বেশি মাথা নেই। তদুপরি সমগ্র দলের ধরা পড়ার ভয়ে সেখানে তাদের আত্মরক্ষার প্রশ্নই সর্বাগ্রে দেখা দেবে। এর ফলে তাদের ঐ অনিচ্ছাকৃত ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হবে। এর পর হতে আমরা স্বামী-স্ত্রী কেউই আর ঐ ডাকাত শ্বশুরের গৃহে পদার্পণ করি নি।"

পূর্বকালে এমন বহু নামকরা ডাকাতে মাঠ ও ঠেঙাড়ের ভূঁই-এর কাহিনী শুনা গিয়েছে। ঐ সকল স্থানে রাত্রে দল না বেঁধে লোকে পথ চলতেন না। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে সাহেবের আর্দালী

বেয়ারা খানসামা এবং ধনী ব্যক্তিদের দ্বারবান ও চাপরাশী ছুটি নিয়ে ঐ ছুটির সময়ে ঠগী ডাকাতদের সাথে ডাকাতি করতো। পূর্ব কালের বহু জমিদার ডাকাতির অর্থে জমিদারী কিনেছে এবং পরে তা বহু গুণে বর্ধিত করেছে। এ সম্বন্ধে ঐরূপ এক জমিদার বংশের সন্তানের বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী বিনষ্ট হলেও তার শেষ চিহ্ন স্বরূপ দুর্গের মত আমাদের সাবেকী বৃহৎ প্রাসাদের তখনও কিছুটা, অভগ্ন ছিল। এই সময় একটি হলের মেঝেটি সংস্কার করতে গিয়ে আমরা তার নীচে একটি বিরাট গুপ্ত কক্ষ আবিষ্কার করি। সেখানে রাশিরাশি নরকঙ্কাল দেখে আমি অবাক হই। এর পর একদিন বাগানের গাছ কেটে তার তলাতে অনুরূপ নরকঙ্কাল আবিষ্কার করি। এখানে বুঝা যায় যে মাটির তলাতে মৃতদেহ রেখে উপরে গাছ পুঁতা হয়েছিল। আমাদের ভাইয়েদের মধ্যে কেন যে মাথায় অযথা খুন চাপে এবং আমাদের মন কেন যে অপরাধমুখী হয় তা আমরা আমাদের বাটীতে এই সকল অদ্ভুত আবিষ্কারের পর বুঝতে পারি।"

পেশাদারী ডাকাতরা অহেতুক ভাবে জীবনহানির কারণ ঘটাতো না। কিন্তু আধুনিক ডাকাত দল অযথা বহু প্রাণহানির কারণ ঘটায়। এর কারণ ঐসকল ডাকাতরা সকলেই প্রাথমিক অপরাধী। এদের মধ্যে স্নায়বিক দৌর্বল্য এবং অনভ্যাসের কারণেই ইহা ঘটে থাকে। এই সকল ডাকাতদের বিরুদ্ধে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সহ তাদেরকে সদুপদেশ ও পুনর্বাসন দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব। পূর্ব কালে বহু স্বাধীন জমিদারদের ডাকাত পোষণের রাজনৈতিক কারণও ছিল। পাঠান, মুঘোল এবং ব্রিটিশকে এঁরা বিদেশী জবর-দখলকারী মনে করতেন। হিন্দু রাজারা কেহ কেহ পরাস্ত হলেও

এদের সৈন্যদল বশ্যতা স্বীকার না করে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে এই বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করতো। এদের কোনও কোনও দল পরে সাধারণ ডাকাতদের সাথে একত্রে তাদের ভরণ-পোষণের জন্য সামন্ত রাজা তথা জমিদারদের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ না পেলে সাধারণ ভাবে তারা লুঠপাট করতো। সেই সময় ঐ সকল বিদেশী শাসকদের অত্যাচার চরমে উঠলে জমিদাররা আত্মরক্ষার্থে এই গেরিলা সৈন্যের সমতুল স্থানীয় ডাকাতদেরকে ঐ বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত করতো। এইভাবে ওদের সমর-শক্তি অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে এরা প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষা করেছে। এই সকল বিদেশী শাসকগণ ঐ সকল জমিদারদের সাহায্যে এই সকল দেশপ্রেমিক ডাকাতদের নিবারণ করতে সমর্থ হতেন। এই জন্য মোসলেম এবং ব্রিটিশ শাসক [প্রথমাবস্থাতে] হিন্দু জমিদারদের অতি আবশ্যকীয় সহায় সম্বল মনে করতেন। এই কারণে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে হিন্দু জমিদারদের আধিক্য দেখি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বহু তৎকালীন ডেসপ্যাচে দেখা যায় যে ডাকতরা ঐ সময় প্রজাদের কাছে খাজনা পর্যন্ত আদায় করতেন। পরাধীন ভারতের শহরাঞ্চলগুলি বিদেশী শাসকদের কবলিত হলেও দূর গ্রামাঞ্চল এদের শৌর্য বীর্যে স্বাধীনতা ভোগ করতো। এ সম্বন্ধে পুস্তকের অন্য খণ্ডে পুলিশী [প্রাচীন] কর্মকৃত্য শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণসহ আলোচনা করেছি। এই শাসকগণ মাত্র জমিদারদের মাধ্যমে এদের সাথে আলাপ-আলোচনাতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এই সকল আদর্শ প্রণোদিত দেশপ্রেমিক পূর্বকালীন সেনাদলের অধঃপতিত বংশধর ডাকাতদের অবলুপ্তির পর বহু অপরাধপ্রবণ নিষ্ঠুর আদর্শহীন স্বার্থান্ধ ডাকাতদলে সারা ভারতবর্ষ ছেয়ে যায়। মধ্যপ্রদেশের বহু স্থানে এই

ধরনের দুর্বৃত্ত বেপরোয়া ডাকাতদল আজও দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব অভ্যাস ও সংস্কারের কারণে জনসাধারণের বহু ব্যক্তি আজও এদের ঘৃণা করে না, বরং তারা এই সব দুর্বৃত্তদের বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করে। কোনও গৃহস্থ বাটীর কেহ ডাকাত বা সন্ন্যাসী হলে তারা সমাজে আজও শ্রদ্ধেয়। এই ঐতিহাসিক মনোজট্ তথা কমপ্লেক্স হতে বাক্‌প্রয়োগ [সাজেশসন] দ্বারা প্রথমে ঐ স্থানের জনসাধারণকে মুক্ত করতে হবে। মহাপুরুষ বিনোবা ভাবে স্থানীয় জনতাকে ইহা না বুঝিয়ে সমাজ হতে উদ্ভুত ডাকাতদের শোধন করতে যান। আমার মতে এই জন্য এই বিষয়ে তিনি অসফল হয়েছেন।

অধুনা ডাকাতরা তাদের পূর্বতন ঐতিহ্য ত্যাগ করেছে। এখন তাদের ডাকাত না ব'লে সশস্ত্র গুণ্ডা বলা উচিত। এখন কাহাকেও বা নারীর লোভে ডাকাতদলে ভর্তি করা হয়। এই জন্য ঐরূপ বহু অপকার্যে বলাৎকার [RAPE] অপকার্য সমাধা হতে দেখা যায়। প্রকৃত শৌর্যের অধিকারী পূর্বেকার অভিজাত ডাকাত সম্প্রদায় আজ বিলুপ্ত। এখন সবলের ভক্ত এবং দুর্বলের যম রূপ জঘন্য অপরাধী ডাকাতদলের আধিক্য। এরা রক্ষী ও সান্ত্রীদের সাথে যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। কেহ সামান্য আহত হলে এরা ধরা পড়ার ভয়ে পলায়ন করে। এদের সংখ্যা দেখে ভীত না হয়ে একজনকে সামান্য আহত করলেও সুফল ফলে।

পূর্বে গভীর নিশীথে এরা গ্রামের প্রান্তদেশে কোনও গৃহে আগুন লাগিয়ে দিত। গৃহস্থের চিৎকারে গ্রাম শুদ্ধ লোক ঐ আগুন নিভাতে যেত। এই সুযোগে ডাকাতরা গ্রামে অন্য প্রান্তে নির্ধারিত গৃহে ডাকাতি করেছে। এরা অপকর্মের সুবিধার্থে বহু গুপ্তচর নিয়োগও করেছে।

এই রাহাজানি এবং ডাকাতি অপরাধ এদেশের প্রাচীন অপরাধ-সমূহের মধ্যে অন্যতম অপরাধ। ডাকাতি এবং রাহাজানি জলে ও স্থলে, এই উভয় স্থানেই হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে [ড্রাই ডিসট্রিক্ট্] সাধারণতঃ লোকে নানা কার্যব্যপদেশে স্থলপথে যাতায়াত করে থাকে। এজন্যে এই অঞ্চলে এই সকল অপরাধ স্থলেই সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহুল জলা প্রদেশে [Wet District] সাধারণতঃ লোকে জলপথেই অধিক যাতায়াত করে থাকে। এই জন্যে এই সকল অপরাধ এই প্রদেশে জলপথে সংঘটিত হয়। প্রথমে জলপথের অপকর্ম সম্বন্ধেই বলা যাক। এই সকল জলদস্যুরা প্রাচীনকালে ডাকাতির উদ্দেশ্যে দ্রুতগামী ছিপ্ [বিশ-ত্রিশ দাঁড়ের লম্বা সরু নৌকা] ব্যবহার করত। অনেকগুলি দাঁড সংযুক্ত থাকায় এই সকল হালকা জলযান সকল বহু ব্যক্তিকে অতি দ্রুত বহন করে নিয়ে যেতে সক্ষম। সরকার বাহাদুরের প্রচেষ্টায় এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ জলদস্যুর দলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে গেছে ; অধুনাকালে এদেশে তাদের কোনওরূপ সন্ধান আর মিলে না। আজকালকার জলদস্যুরা সাধারণতঃ যাত্রী নৌকাতে ক'রে বড বড় নদীতে ডাকাতি ক'রে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কাছাকাছি কোনও যাত্রী নৌকা দেখলে, ঐ নৌকার যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়ে বলে—"একটু আগুন দেবে গো!" এর পর আগুন নেবার অছিলায় এরা এদের নৌকাটি যাত্রী নৌকার পার্শ্বে এনে সদলে ঐ নৌকাটিকে আক্রমণ করতে থাকে। এদেশে "বিজনা" নামক স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির জলদস্যুরা এই বিশেষ পদ্ধতিতে পদ্মা বক্ষে আজও ডাকাতি করে থাকে। এই সকল কারণে দয়াপরবশ হ'য়ে মহাজনী, গহনার বা যাত্রী নৌকার লোকেদের "আগুন বা তামাক দেবার জন্যে" কখনও

তাদের নৌকা দাঁড় করান উচিত নয়, বরং "আগুন দেবে গো বা তামুক দেবে গো" প্রভৃতি বচন শুনা মাত্র তাদের নৌকাটিকে বহুদূরে সরিয়ে নেওয়া উচিত। এই সকল জলদস্যুদের মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্তজাতীয় সন্দার এবং গায়না দল অন্যতম। এই সকল জলদস্যুরা নৌকায় ঘুরে বেড়ায় এবং মৎস্য শিকার ক'রে আহার সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সব দস্যুদল কতদূর ভীষণ প্রকৃতির হয়ে থাকে তা নিম্নের বিবৃতিটি পড়লে বুঝা যাবে।

"দস্যুদলের অবস্থিতির সংবাদটি পাওয়া মাত্র আমরা নদীর মোহানার দিকে আমাদের নৌকাটি চালিয়ে দিলাম। সামান্য দূর অগ্রসর হয়ে আমরা দস্যুদলের নৌকাটি দেখতে পাই। ঐ নৌকাটিতে চার বা পাঁচ ব্যক্তি সড়কি হাতে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া মাত্র এদের একজন হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আয দেহি কেডা তুই। দশ হাত জলের তলে মাছ রয, ঐ মাছকেই গাঁথিযে তুলছি। তোকে তো হালা দেখা যায়। তোকে তো আমরা গাঁথমুই।' যুক্তি যে অকাট্য তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এদের এই হুঙ্কারে স্বভাবতঃই আমি ভড়কে গিযেছিলাম। কিন্তু তা মাত্র ক্ষণিকের জন্যেই।"

প্রাচীনকালে রাজারাজড়া, নবাব এবং জমিদারের অনেকেই যুদ্ধাদি কার্যে বা জমি দখলের জন্যে এই সকল জলবাসীদের প্রায়ই সাহায্য নিতেন। ঐ সকল জমিদার বা রাজবংশের পতনের পর কিছু-কালযাবৎ এই সকল দল কেবলমাত্র দস্যুবৃত্তির দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়।

এই জলদস্যুদের ন্যায় স্থলদস্যুরাও পূর্বকালে এদেশে অত্যন্তরূপ প্রবল ছিল। স্থলবিশেষে এদের দলপতিরা রাজার ন্যায়ই সমাদর

বা সম্মান পেয়েছে। পূর্বকালে জমিদাররা এদের বার্ষিক কর পর্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছেন। বৃটিশাধীন ভারতের প্রথম দিকটাতেও এদের কম প্রতাপ ছিল না। শুনা গেছে বর্তমান কালের কোনও কোনও নামজাদা জমিদারবংশের পূর্বপুরুষরা পর্যন্ত ডাকাত ছিলেন। এই সকল ডাকাতেরা ডাকাতি করলেও গরিবদের সম্পত্তি এরা কমই অপহরণ করতেন। এদের লক্ষ্য সর্বদাই থাকতো বড় বড় জমিদার-বাড়ি বা মহাজনদের গদির দিকে। এদের একমাত্র বুলি ছিল, "মারি তো গণ্ডার, লুঠি ত ভাণ্ডার।" ভাণ্ডার শব্দটি দ্বারা ট্রেজারি বা রাজভাণ্ডার বুঝায়। এই সকল প্রচলিত কিংবদন্তী বা চলতি কথা হ'তে তৎকালীন ডাকাতদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। এদের কেহ কেহ ধনী লোকের অর্থ লুটে এনে ঢোল সহরত ক'রে গরিবদের অর্থ দান করেছেন—এদেশের ডাকাতদের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কাহিনীও শুনা গেছে। এদের প্রতি দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহানুভূতি থাকায় এদের ধৃতিকরণ বা গ্রেপ্তার করা প্রাচীনকালে অত্যন্তরূপ দুঃসাধ্য ছিল। কাল-ক্রমে ব্রিটিশ শাসন এদেশে কায়েমী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ডাকাত দলও নিঃশেষিত হয়েছে। পূর্বকালের ডাকাতি সম্বন্ধে অশীতিবর্ষ বয়স্কা এক ঠাকুরমাতার নিকট আমি এইরূপ এক কাহিনী শুনেছিলাম।

"৭৫ বৎসর পূর্বে তোদের এই বাড়িতে যখন আমি বৌ হয়ে আসি, তখন আমার বয়স মাত্র পাঁচ। সেদিন তোদের বার-মহলের দেউড়ির পাশের পাঁচিলটা ঐরূপভাবেই আমি ভাঙা পড়ে থাকতে দেখেছি। কেমন ক'রে অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে পড়েছিল, সেই সম্বন্ধে আমি আমার শাউড়ীর কাছে গল্প শুনেছিলাম। আমি

তখনও একটি ছোট্ট মেয়ে, তাই তিনি তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে আমাকেও কত সত্যিকারের গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। তাঁর কাছে শুনা সেই গল্পটা তোদের বলে যাচ্ছি, শুনে যা—

হঠাৎ একদিন এক ঝাঁকড়া-চুলো কপালে সিঁদুর মাখা, বেঁটে কালো হোঁতকা গোছের লোক ভূর্জিপত্রের উপর লেখা এক টুকরা চিরকুট-পত্র এনে কর্তামশাই-এর হাতে দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম জানাল। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—'এবার হতে প্রতি বৎসর কালীপূজার রাত্রে আপনার বাড়িতে আমার লোক ধর্ণা দেবে। আশা করি বাৎসরিক দেয় সিধা এবং পাঁচকুড়ি টেকা পাঠিয়ে বাধিত হবেন। তা না হলে বাধ্য হয়ে তা আদায় করতে আমি নিজেই আসব। রতনপুরের বড়তরফদের দুর্দশার কথা স্মরণ করে ইহা অন্যথা করবেন না, ইত্যাদি।' এইরূপ ভীতিপ্রদর্শনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে তেনা [কর্তামশাই] তাঁর তাঁবেদার কয়েকজন বাছা বাছা লাঠিয়ালকে মহাল থেকে আনিয়ে নিয়ে দেউড়িতে এনে জমা করলেন। এর পর কয়েকদিন পরেই এলো সেই কালীপূজার অমানিশি। মধ্যরাত্রের মহাপূজা সবে মাত্র সমাপন হয়েছে। আমরা যে যার ঘরে এসে শয়নের উপক্রম করছি। এমনি সময় একটা বিকট শব্দে আমরা চমকে উঠলাম। দূর হ'তে একটা বীভৎস আওয়াজ আসছিল, 'রে রে রে-এ'। জানালা খুলে সভয়ে আমি চেয়ে দেখলাম। বাইরের পাঁচিলের ওপারে তখন মশালের আগুনের গাঁতি লেগে গেছে। প্রায় আশিজন ডাকাত মশাল, সড়কি ও তরোয়াল হাতে 'রে রে রে' শব্দে এগিয়ে আসছে। ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমরা অন্দর মহলের দ্বিতলের উপরকার চাপা সিঁড়িটা বন্ধ করে দিই। আর গহনাপত্র যা কিছু চোরকুঠরীটার মধ্যে আমরা

লুকিয়ে ফেলতে থাকি। ঐ যে চিলের ছাদটা—তোরা আজ যা দেখ-ছিস, ওর ওপরেও আর একটা ঘর ছিল। সেবারের আশ্বিনের ঝড়ে সেটা পড়ে গিয়েছে। ওটা দেখতে ছিল ঠিক একটা উঁচু মিনারের মত। শুনেছি ওর ওপর দাঁড়ালে নাকি গঙ্গা পর্যন্ত দেখা যেত। আমাদের তীরন্দাজরা ঐ মিনারের উপর উঠে তীর আর গুলতি ছুড়ে ডাকাতদের বাধা দিতে থাকে। ওদিকে আমাদের বিশ্বস্ত লাঠিয়ালরাও নীচের উঠানে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়েছে। এমন সময় ঢেঁকিকলের সাহায্যে দেউড়ির পাশের অত উঁচু পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ডাকাতরা বার-বাড়িতে ঢুকে পড়ল। চিলের ঘরে রাখা বাঁকা বাঁকা মরচে ধরা ভারি তরোয়ালগুলো দেখেছিস। ঐগুলোই হাতে করে বাড়ির ছেলেরাও সেদিন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়িয়ে আমার শ্বশুরমশাই তখন শিঙ্গা ফুঁকে অদূরের বাগ্দীপাড়ার প্রজাদের এই ডাকাত পড়ার সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছেন। ওদিকে কাছারীর একজন সওয়ার রওনা হয়ে গেছে সদরের তশীলদার ও তাঁর বরকন্দাজদের খবর দিতে। কিন্তু এত কাণ্ড করেও ডাকাতদের কেউ আটকে রাখতে পারে নি। দুচারটা হত্যাকাণ্ড সমাধা করে তারা অন্দর মহলের বাঁকা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে দিল। বাঁকা সিঁড়ির উপরকার চাতালের উপর বস্তা দশেক সরষে রাখা ছিল। আমার দিদিশাশুড়ী ছুটে এসে সেই বস্তা বস্তা সরষে সিঁড়ির উপর ঢেলে দিতে লাগলেন। হুড় হুড় করে সরষে নীচে গড়িয়ে পড়ছিল। এই সরষের উপর পা পড়ায় ডাকাতদের সব কয়জনই পা হড়কে একে-একে নীচের দিকে গড়িয়ে পড়ে আহত হল। ইতিমধ্যে হৈ চৈ করতে করতে এবং 'কালীমায়ী কী জয়' বলে বাগ্দীপাড়ার দুশো ঘর প্রজাও দা-কুড়ুল ও সড়কি নিয়ে হাজির। শুনেছি গোরে বেঙ্গে

ডাকাতদের জীবনের সেই প্রথম পরাজয়। আমাদের মেয়ে-পুরুষের সমবেত সাহস ও বীরত্বই সেইদিন আমাদের মান ও প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল। আমার দিদিশাউড়ীর সাহসের কথা শুনে তোরা অবাক হচ্ছিস, না? সেকালের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্যে এইরূপ সাহস প্রায়ই দেখাতে হোত। এই সে দিনও আমার শ্বশুরের এক বুড়ী ঝি চোরকে ঘরে ঢুকতে দেখে, ঘরের মশারির চারটে খুঁট তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেলে, মশারিটা চোরের ঘাড়ে জালের মত করে চেপে দিয়ে তার উপর উঠে সে নিজে চেপে বসেছিল। চেঁচামেচি শুনে ঝি-এর ঘরে এসে দেখি চোরটা দম বন্ধ হয়ে আধমরার মত হয়ে শুয়ে রয়েছে। এমন কি তার নড়বার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।”

শুনা গেছে, পূর্বকালের ডাকাতরা নিম্নশ্রেণীর হলেও অত্যন্তরূপ কালীভক্ত ছিল। ডাকাতির জন্যে বহির্গত হবার পূর্বে এরা কালী পূজা করে তবে বেরুত। এদের কোনও কোনও দল এই পূজায় নরবলিও দিয়েছে। অনেকের মতে যুদ্ধ-বন্দীদের ধরে এনে বলি দেওয়ার পদ্ধতি হতেই এই নরবলির সৃষ্টি হয়। এই নরবলি সম্বন্ধে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে আমি একটি গল্প শুনেছিলাম। ঐ ভদ্রলোকটি আবার তাঁর ছোটবেলায় অপর এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখে ঐ গল্পটি শুনেছিলেন। গল্পটি ঐ ভদ্রলোকের ছোটদাদুর জীবনের একটি কাহিনী অবলম্বনে বলা হয়েছে। বিবৃতির আকারে উক্ত গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।

“ঐ সময়ে গঙ্গাবক্ষে নৌকা ক'রে ভারতের দূরবর্তী তীর্থস্থানগুলিতে আমরা যাতায়াত করতাম। কাশী হতে ফিরতি মুখে আমরা গঙ্গার এক পাড়ে এসে বিশ্রাম করছিলাম। পড়শীরা আমাকেই

কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনবার জন্তে অনুরোধ জানায়। আমি জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় জন চার-পাঁচ ষণ্ডামার্কা লোক আমাকে ধরে ফেলে। তারা আমার মুখ ও হাত গামছা দিয়ে বেঁধে ফেলে চেংদোলা করে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু ক'রে দেয়। এর পর তারা একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর পাড়ে এনে আমাকে ধপাস করে নামিয়ে দেয়। মুখ ফিরিয়ে দেখি, একটা কালীমূর্তি। ঐ ভীমা করাল মূর্তির লকলকে আধ হাত লম্বা জিভ। মসীঘন নগ্ন হাতে তাঁর সত্যকার একটা কাতান। এরা যে আমাকে মায়ের কাছে বলি দিতে এনেছে তা বুঝতে আমার বাকি থাকে নি। আশেপাশে চেটাই পেতে প্রায় জন ষাটেক লোক বসে বসে তামুক খাচ্ছিল। অদূরে হাঁড়কাঠ আর তার পাশে রাখা মাজা-তোলা খাঁড়াটার দিকে চেয়ে চেয়ে আমি শিউরে উঠছিলাম। এর পর রাত্রি দুইটার সময় পূজার পর এদের জন দুই লোকে আমার বাঁধন খুলে দিয়ে হাত ধরে আমাকে পুকুর পাড়ে স্নান করাবার জন্তে নিয়ে এলো। এদের একজন আমাকে টেনে নিয়ে জলেও নেমে পড়ল। সৌভাগ্যক্রমে আমার উত্তমরূপ ডুব সাঁতার জানা ছিল। আমার বুকের জোর ও দমও ছিল অসম্ভব। ডুব দিবার অছিলায় ডুব মেরে এক ডুবে আমি পুকুরের এপারে এসে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা বড় গাছের মগডালে উঠে নিঃসাড়ে বসে থাকি। ডাকাতরা মশাল জেলে বনে বাদাড়ে আমাকে অনেক খোঁজাখুজি করে শেষে ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে যায়। ইত্যবসরে আমি চুপি চুপি নেমে এসে পা টিপে টিপে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে পরে একদৌড়ে গঙ্গার ধারে এসে আমাদের নৌকাটায় উঠে পড়ি। মা কালীরই দয়ায় সে যাত্রা আমার প্রাণটি কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছিল।

তাই তোমাদের এই গল্পটাও শুনাতে পারলাম। নইলে বন্ধুদের সকলে মনে করত আমাকে বাঘেই নিয়ে গেছে।”

এইরূপ কাপালিক ডাকাতের কাহিনী বাঙলায় ঘরে ঘরে শুনা যায়। জানি না এর মধ্যে কতটা সত্য আছে। তবে জনপ্রবাদ মাত্রকেই অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত। কারুর দেহে ক্ষত থাকলে খুঁত আছে বলে বন্দীকে বলি না দিয়ে এরা ছেড়ে দিত। এ যুগেও কোনও কোনও ডাকাত দলের মধ্যে অত্যন্তরূপ কালীভক্তি

দেখা গেছে। তা ঐতিহাসিক সত্য বিধায় উহা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

প্রাক্তনকালের জলদস্যুগণ দ্রুত গমনাগমনের জন্যে যেমন ছিপ-নৌকা ব্যবহার করত, স্থলদস্যুরা তেমনি দ্রুত গমনাগমনের জন্যে একপ্রকার "রণ-পা" ব্যবহার করতো। এই রণ অর্থে এখানে যুদ্ধ বুঝায়। রণ-পা দুই খণ্ড লম্বা পাতলা বাঁশ দিয়ে তৈরি হয়। এই বাঁশের মধ্যস্থলে একটা করে গাঁইট থাকে। এই গাঁইট দুইটিতে পা দিয়ে অনেক উপরে উঠে ডাকাতরা এই রণ-পার সাহায্যে ঘণ্টায় ১২ মাইল বেগে ধাবিত হ'তে পারত। এই রণ-পার সাহায্যে এরা সদলে খাল, বিল, মাঠ, ধেনো জমি ও কাশবন ভেদ করে অতি দ্রুত অন্তর্ধান হ'তে সক্ষম ছিল। এই রণ পা সম্বলিত ডাকাতদের চলবার সময় মনে হত যেন বড় বড় দৈত্য বিরাট বিরাট লম্বা পায়ের সাহায্যে চলতে শুরু করেছে। এই রণ-পা ব্যবহার অত্যন্তরূপ অভ্যাস সাপেক্ষ হয়ে থাকে। ফিন্ জাতি ব্যতীত যেমন অন্য কোনও জাতি বরফের উপর "স্কিই" ব্যবহার করতে সক্ষম হয় না, ভারতবর্ষে বাঙ্গালী ছাড়া এই রণ পা ও তেমনি অন্য কেহ অনুরূপ ভাবে ব্যবহার করতে পারে নি। এই রণ-পা ব্যবহারে দক্ষ সুশিক্ষিত ডাকাতদের এ যুগের মেকানাইজড্ ট্রুপের সহিত তুলনা করা চলে। বাঙ্গালী রাজাদের আমলে সৈন্য-সামন্তরা গতির কারণে এই রণ-পা ব্যবহার করত। এই কারণে এই কৃত্রিম পা'কে রণ-পা বলা হয়। প্রাচীন ভারতেও রাজাদের যুদ্ধের রীতি ছিল কতকটা এইরূপ। প্রথমে [প্রথম লাইনে] অধুনাকালের বৃহৎ বৃহৎ ট্যাঙ্কের ন্যায় বর্মাবৃত হস্তীচমূ তাদের বিরাট বিরাট দেহ নিয়ে হুড়মুড় করে সকল বাধা-বিপত্তি চুরমার করে দিয়ে পররাজ্যের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলত এবং এই জীবন্ত ট্যাঙ্কবাহিনীর পিছন পিছন ছুটে চলত যুদ্ধ রথ ও অশ্ব-বাহিনী। আধুনিক মোটরবাহিনীর সাথে উহার তুলনা করা হয়।

কিন্তু এই যুদ্ধরীতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের কঠিন ভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলে কার্য্যকরী হলেও বাঙ্গালার স্থলপথ বিহীন ভূমি এবং জলা মাঠ-ঘাটগু'লতে এইরূপ যুদ্ধপদ্ধতি একেবারে অচল ছিল। এই কারণে এদেশে রাজারাজড়ার সৈন্যবাহিনীকে দ্রুত গমনাগমনের জন্তে জলপথে ছিপ-নৌকা এবং স্থলপথে এই রণ-পা'র সাহায্য নিতে হ'ত। এক কথায় এই রণ-পা পদ্ধতি বাঙ্গালী যোদ্ধাদের এক নিজস্ব জিনিস। বলা বাহুল্য, বড় বড় রাজবংশের পতনের পর—তাঁদেরই সৈন্যগণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্বকালে এই সকল ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল। এই রণ পা শব্দটি এবং ডাকাতদল দ্বারা উহার একচেটিয়া ব্যবহার ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে। ৪০৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রত যোদ্ধা মানুষের চিত্রটি হ'তে রণ-পা সম্বন্ধে সম্যকরূপ ধারণা করা যাবে।

আমি অনুসন্ধানে জেনেছি যে, ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালে যে সকল ডাকাত দলের সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল জমিদারদের বরখাস্ত করা বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালগণ। পাঠন রাজত্বের সময় এই সকল জমিদার আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন। এই কারণে বংশপরম্পরায় তাঁদের এই সকল বরকন্দাজ ও লাঠিয়াল বংশকে জমি দান করে স্বরাজ্যে বসবাস করাতে হ'ত। বংশপরম্পরায় এদের পেশাই ছিল জমিদারদের হয়ে লড়াই করা। মোগল শাসনকালে জমিদারদের আভ্যন্তরিক ক্ষমতা সামান্য পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হলেও এই সকল লড়াকুদের নিজ প্রয়োজনে তাঁরা বহুকাল পর্যন্ত ভরণপোষণ করে এসেছেন। ইংরাজ শাসনকালেও কিছুকাল যাবৎ এই সকল জমিদারদের হাতেই দেশের পুলিশের [শান্তিরক্ষার] ভার ন্যস্ত ছিল। এরপর যথারীতি পুলিশ

ও শাসন বিভাগ স্থাপিত হওয়ার পর জমিদারদের নিকট এদের কোনও প্রয়োজন থাকে নি। এই সকল বরখাস্ত লাঠিয়ালদের অনেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্মে তৎকালীন ডাকাতদের সর্দারদের নিকট কর্মে বহাল হ'তে আরম্ভ করে। এই সকল কারণে এই সময় বাঙ্গালার জেলায় জেলায় অনেকগুলি দুর্ধর্ষ ডাকাতদল সংগঠিত হয়েছিল। আজকাল কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় ডাকাতরা যে এই সকল যোদ্ধবংশেরই অযোগ্য [অধঃপতিত] বংশধর তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার বাগ্দী জাতির কথা বলা চলে। এই বাগ্দী জাতির কয়েকটি শাখাকে অধুনাকালে তাদের আক্রমণাত্মক স্বভাবের জন্মে স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতির [Criminal Tribe] অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বাগ্দীজাতি একদা সমর ব্যবসায়ী জাতি সকলের মধ্যে অন্যতম ছিল। মারাঠাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দী খান তাঁর পরিবারবর্গকে নিরাপত্তার জন্মে যে সময় নাটোর রাজপরিবারের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সময় অর্ধস্বাধীন নাটোর সরকারের অধীন সেনাবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের বগ্দী সৈন্য এবং বিহারের ভোজপুরী সৈন্য দ্বারা গঠিত ছিল। এই বাগ্দী জাতীয় সৈন্যদের উপর অত্যন্তরূপ আস্থা থাকার কারণেই নবাব আলীবর্দী খান এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের বাগ্দী সৈন্যদের বীরত্ব ঐতিহাসিক মাত্রই অবগত আছেন। এইরূপ সৈন্যের সাহায্যে বিষ্ণুপুর বহুদিন পর্যন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পেরেছে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান সকল এই বাগ্দী সৈন্য দ্বারাই পরিচালিত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বাগ্দী জাতীয় লোকদেরই কোনও কোনও দল পরবর্তীকালে ডাকাত দলে পরিণত হয়েছিল। আবহমানকাল ধরে অর্জিত যুদ্ধস্পৃহা এরা আজও বোধ হয় ত্যাগ

করতে পারে নি, তাই এতদিনের চেষ্টাতেও এই সকল স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির স্বভাব বদলান যায় নি।

[ইহার অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্মী স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় বেকার জাতি। এরা পূর্বে টিপুসুলতানের অন্যতম সেনা ও সেনানী রূপে বহাল ছিল। কিন্তু ঐ রাজ্যের পতনের পর হতে আজও পর্যন্ত তারা ডাকাতি করেই বেড়ায়।]

আমার মতে এই সকল স্বভাব-দুর্বৃত্তদেব সামরিক বিভাগে ভর্তি ক'রে এদের মজ্জাগত যুদ্ধস্পৃহার উপশম ঘটিয়ে এদের স্বাভাবিক করা সম্ভব। এই সকল উপজাতীয় লোকদের অনেকে পরবর্তীকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও তাদের অন্তর্নিহিত যুদ্ধস্পৃহা তারা হারায় নি। আজও জমিদারী দখল নিয়ে যখন তারা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তখন তারা এই দাঙ্গার মধ্যে যুদ্ধবিদ্যাই প্রদর্শন করে থাকে। গ্রাম হ'তে দূর প্রান্তরের মধ্যে এসে এরা যুদ্ধ করে। একজন হয় তো এপার হ'তে হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, "করিম ভাই, সামাল নাও, না-আ-ক, নাক লক্ষ্য করে কেঁচা ছুড়লাম।" করিম ভাই এর পর তাড়াতাড়ি বাঁশের তৈরি ঢালের সাহায্যে নাক বাঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "রাধু খুড়ো, চোখ বাঁচাও, ভাইরে চোখ। এই ছুড়লাম সড়কী, সা-মা-সামাল।" এই ভাবে এরা খালের ধারে বা প্রান্তরে এসে যুদ্ধ করলেও এরা কখনও গ্রামের মধ্যে এসে শান্তি ভঙ্গ করে নি। পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে মাত্র এই সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে থাকে। উহার মধ্যে কোনওরূপ সাম্প্রদায়িক দোষ যাঁরা দেখে থাকেন তাঁরা ভুলই করেন। ঐ যুদ্ধকালে উভয় পক্ষের নারীরা স্ব স্ব দলের পুরুষদের খাদ্য দিত ও শুশ্রূষা করত। কিন্তু ঐ সময় তারা কাহারও দ্বারা

নিগৃহীত হয় নি। এই সকল উপজাতীয় লোকেরা সড়কি ব্যতীত এক প্রকার কানা ভাঙা পিতলের বা কাঁসার থালিও ব্যবহার ক'রে থাকে। ভাঙা থালি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন জোরে এরা ছুড়ে দেয় যে উহারা মুণ্ড কর্তনে সক্ষম হ'তে পারে।* পূর্বকালে ডাকাতরা এবং যোদ্ধারা এইরূপ কানা ভাঙা থালি যুদ্ধবিগ্রহের সময় ব্যবহার করেছে। এই সকল বিষয় অনুধাবন করলে বর্তমান কালের উপজাতীয় ডাকাতদলের জন্ম-কাহিনী সম্বন্ধে অনেক কিছুই পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল যুদ্ধব্যবসায়ী জাতীয় লোকেদের যে সকল দল চাষবাসের কার্যে নিযুক্ত হয়ে তাদের জীবনধারা বদলাতে পারে নি, তারাই পূর্বকালের ডাকাতদলের এবং বর্তমান কালের কোনও কোনও স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতির সৃষ্টি করেছে।

[বাঙ্গালী যোদ্ধ শ্রেণীর মধ্যে বাগদী ও ডোম জাতি ছিল অন্য-তম। আগডম বাগডম ঘোড়াডুম—একটা প্রাচীন প্রবাদ, অর্থাৎ আগে ও পাছে পদাতিক ডোম ও সেই সঙ্গে আছে অশ্বারোহী। ইংরাজেরা প্রথমে বাঙ্গালী ডোম প্রভৃতিদের সংগ্রহ করে, দেশীয় বাহিনী সৃষ্টি করে। এদের সাহায্যে মাদ্রাজ, মাদ্রাজীদের সাহায্যে রেহাই এবং এদের সকলের সাহায্যে ভারতের অন্য প্রদেশ এবং পরে পাঞ্জাবী, মারাঠী ও গুর্খাদের সাহায্যে সমগ্র ভারত ওরা জয় করেছিল।]

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভকালেও এই সকল সামরিক জাতির লোকদের দ্বারা গঠিত বহু ডাকাতদল ভারতের জেলায় জেলায়

* দড়ির গিঁটের সহিত ইষ্টক খণ্ড ন্যস্ত করে এবং উহা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমন ভাবে ওরা ছুঁড়ে যে উহা গুলির মতই বেগে ছুটে এসে মানুষ হত্যা করতে সক্ষম হয়।

ঘুরাফিরা করত। বাংলার ডাকাতদের মধ্যে গোরে বেদে ও রঘু ডাকাত ছিল অন্যতম। এদের উভয়েরই বাস ছিল ২৪ পরগণায় অন্তর্গত হালিশহর পরগণায়। নৈহাটীর সন্নিকটে মাদরাল গ্রামের প্রান্তদেশে রঘু ডাকাতের কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। স্থানীয় লোকেদের ধারণা এই যে এখনওঁ আশে-পাশে জঙ্গলে জমিগুলা খুঁড়লে ডাকাতদের পুঁতে রাখা গুপ্তধন পাওয়া যেতে পারে।

ঐ সময় কোনও দুর গ্রামে যেতে হ'লে গ্রামবাসিগণ প্রায়ই উইলাদি লিখে বা জমিজমার স্থায়ী বিলি ব্যবস্থা করে তবে বাড়ির বার হত। কারণ এঁদের প্রতিটি মুহূর্তে'ই ডাকাতের বা ঠ্যাঙ্গাড়েদের হাতে প্রাণনাশেব আশঙ্কা রেখে এই সময় এঁদের পথ চলতে হ'ত। এখনও এমনি অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ বা ডাকাতে কালীর কাহিনী গ্রামে গ্রামে শুনা গিয়ে থাকে। এই সকল ডাকাতরা কোনও জমিদারবাড়িতে আহার করতে এলে কখনও নুন খেত না। অর্থাৎ কি'না এরা নুন বিহীন আহার করে যেত। কারণ এরা জানত এই সকল জমিদারের সহিত চিরদিন তাদের ভাব নাও থাকতে পারে। গুপ্তভাণ্ডারের সন্ধানে এরা পুরুষদের খোঁটায় বেঁধে কলকের ছ্যাঁকা দিয়েছে। কিন্তু মা-জননীদের গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, তাঁদের গাত্র হ'তে একটি গহনা খুলবারও কখনও প্রয়াস পায় নি। কিন্তু অধুনাকালের ডাকাতদলের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। আধুনিক ডাকাতরা কোনও কোনও সময় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্যাচার ক'রে থাকে।

অধুনাকালের ডাকাতদলের মধ্যে স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতীয় ভুঁভিয়া মুসলমান এবং বাগ্দী জাতি ও ডোম জাতি অন্যতম। এরা আজও

ডাকাতির সময় ঢেঁকিকল ব্যবহার করে থাকে। এই ঢেঁকিকল একটি সাধারণ ধান ভাঙা ঢেঁকিমাত্র। পল্লীগ্রামের ধনী-দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বাড়িতেই ইহা দেখা যায়। এই দুর্বৃত্তগণ কোনও এক গরীবের ঢেঁকিঘর হ'তে একটি ঢেঁকি অপহরণ ক'রে উহা তিনটি বাঁশের খুঁটির সাহায্যে ভূমি হ'তে কিছু উপরে ঝুলিযে দেয়। এইরূপে তৈয়ারি যন্ত্রকেই বলা হয় ঢেঁকিকল। য়ুরোপীয় যোদ্ধারাও প্রাচীনকালে দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গের জন্যে এই ধরনের এক যন্ত্র ব্যবহার করত। ইহাকে বলা হত ব্যাটারী র‍্যাম [Battery Ram]। নিম্নে এই ঢেঁকিকলের প্রতিকৃতি দেওয়া হ'ল। এই ঢেঁকিকল ধনী ব্যক্তির গৃহের দুয়ারের সামনে এনে এরা ঐ ঝুলানো ঢেঁকির দড়ি ধরে কিছুটা দূরে টেনে এনে উহা সবেগে

দুয়ারের উপর ঠেলে দিত। এই ঢেঁকির পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে যে কোনও দুয়ার বা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর ভেঙে পড়েছে।

ভুঁতিয়া মুসলমানরা ঐরূপ ধানভাঙা ঢেঁকির সাহায্য নেওয়া ছাড়া দেওয়ালের খড়া ব'য়েও উপরে উঠে থাকে। এইভাবে এদের একজন বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে সদরের দরজা খুলে দিলে দলের বাকি লোকেরা চীৎকার করতে করতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে। এরা ডাকাতির পূর্বে আশ-পাশের গৃহস্থদের বাটীর দরজার কড়াগুলা দড়ির দ্বারা বেঁধে রাখে, যাতে ক'রে চীৎকার শুনলে তাদের কেহ আক্রান্ত লোকেদের সাহায্যে আসতে না পারে। এরা তরোয়াল, মশাল ও লাঠির সাহায্যে ডাকাতি করে থাকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরা ছোট ছোট শিশুদের মাটিতে উপুড় করে ফেলে তাদের পিঠে পা রেখে কোমরের সোনার গোট প্রভৃতি অলঙ্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। এই ডাকাতদল মেয়েদের গাত্র হতেও অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নিয়েছে। পলায়নের সময়, "মাছি, ঘন জাল গুটো"—এই শব্দটি তারা ব্যবহার করে থাকে। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এইরূপ, "মাছিরা উড়ছে দলে দলে, এইবার জাল গুটোও, অর্থাৎ কি'না এইবার সরে পড়!" এই সকল ডাকাত অভিযানের সময় বা প্রত্যাগমনের সময় শিয়ালের অনুকরণে চীৎকার করে পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য জানিয়ে দিয়ে থাকে। এই ভুঁতিয়া মুসলমানের ন্যায় মঘেরা ডোমরাও এইরূপ করে থাকে। সাধারণতঃ যশোহর, মেদনীপুর, নদীয়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় এরা ডাকাতি করে বেড়ায়। হিন্দুদের মধ্যে পোদ, বাগ্দী, কেওরা ও থারু জাতীয় লোকেরাও ডাকাতি করে। হিন্দি ভাষী হিন্দুদের মধ্যে চম্পারণের কুর্মী, পালওয়ার, হুসাদ এবং রায়বোধনী, বারাবাৎকির পাশীরাও বাংলা দেশে ডাকাতি ক'রে বেড়ায়। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মানভুমের ভীমজী এবং বিহারের ভোব নামক সমরপ্রিয়

জাতিরাও ডাকাতি করে বেড়ায়। এরা ডাকাতির জন্যে তরোয়াল, সড়কি, কুড়ুল, মশাল এবং সময় সময় বন্দুক-ডিনামাইটও ব্যবহার ক'রে থাকে। এ ছাড়া এরা একপ্রকার মুখোসও ব্যবহার করে থাকে। এদের কেহ কেহ সারা মুখময় এমনভাবে আলকাতরা মাখে, যাতে কেহ তাদের চিনতে না পারে। আক্রমণ, প্রত্যাগমন এবং গমনাগমনের সময় এরা যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকে, তা হ'তে এ বেশ বোঝা যায় যে এরাই পূর্বকালের যোদ্ধদল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি মাত্র এইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দ উদ্ধৃত করা হ'ল—"ব্রো" অর্থাৎ কিনা "যাও"[Quick march]। "বে ব্রো" অর্থাৎ কিনা "শীঘ্র যাও" [Double march]। এ ছাড়া এই স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের মধ্যে অঙ্গুলি বা হস্ত দ্বারা সঙ্কেত করার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে।

পুরাকালের ডাকাতদলের মধ্যে ঠগী ও পিণ্ডারী ডাকাতদল ছিল অন্যতম। 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়'—তৎকালীন বিখ্যাত জনপ্রবাদ। কোনওরূপ বাধা না পাওয়ায় এরা সংখ্যাবহুল হয়ে উঠে। সাধারণতঃ এরা পথিকদেরই অর্থাদি অপহরণ করেছে। এরা একটা রুমাল, গামছা বা বস্ত্রখণ্ডের একটি খুঁটে একটা পয়সা বেঁধে ঐ খুঁটটি আক্রান্ত ব্যক্তির গলদেশে এমনভাবে ছুড়ে দিত যাতে করে উহা ফাঁসের আকারে গলায় আটকে যায়। এইভাবে এরা মানুষ হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিত। এদের দলপতিগণ বিকৃত সংস্কৃত শব্দে এবং হিন্দীতে আদেশ প্রদান করতেন। যথা (১) চলে না দেশম্। অর্থাৎ অতিক্রম ও হত্যা কার্য শুরু করো। (২) 'তামাকু লে আও' অর্থাৎ 'অল্ ক্লিয়ার'। এদের দলে হিন্দু ও মুসলিম ছিল। কিন্তু অপকর্মে সাফল্যের জন্য উভয়েই কালীপূজা করতো।

এদের কেউ কেউ ডাইনী পূজাও করেছে। এদের দমনের জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে একটি বিশেষ ধারাও সংযুক্ত হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই ডাকাতদল এক্ষণে নিঃশেষিত হয়েছে।

সে যুগের অনেক জমিদারও এদের গোপনে সাহায্য করেছে। ভুল ক'রে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মনিব জমিদারের জামাতাকেই পথিমধ্যে হত্যা ক'রে তার সোনার হার ও আংটি তারই শ্বশুরকে এনে দিয়েছে। এমন বহু কাহিনী এদেশে শোনা গিয়েছে।

পল্লী অঞ্চলে এমন অনেক ডাকাতদল জীবজন্তুর ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে পরস্পরকে পরস্পরের অবস্থিতি জানিয়ে দেয়। দলপতিরা প্রায়ই ইহার দ্বারা দলের লোকদের কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে জড় হবার জন্যে নির্দেশ দেয়। এমন অনেক স্বভাবদুর্বৃত্ত জাতি আজও এই ধরনের ডাক ডেকে অপকর্ম করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার বাউরি জাতির কথা বলা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমার বাস ছিল বর্ধমান অঞ্চলের এক পল্লীগ্রামে। বহু বৎসর পূর্বের কথা—আমি তখন বালক। বাইরের ঘরে বসে পিতা-ঠাকুর পাড়ার মুখুয্যে মশাই-এর সঙ্গে পাশা খেলছিলেন। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। হঠাৎ একটা শিয়ালের ডাক শুনা গেল, 'হুয়া-য়া-য়া, হু-উ-উ বল-হুয়া।' মুখুয্যেমশাই চমকে উঠে বাবাকে শুধালেন, 'উঁহু বাঁড়ুয্যে! গতিক সুবিধে নয়। এ যে এক শিয়ালীর ডাক!' এক-শিয়ালীর ডাক এক ভয়াবহ ব্যাপার। সাধারণতঃ কখনও মাত্র একটা শিয়াল ডাকে না। একটা ডাকলেই সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক শিয়াল একসঙ্গে ডেকে উঠে। আসলে কোনও এক-

দস্যু সর্দার শিয়ালের ডাকের অনুকরণে ডাক ডেকে তার অনুচরদের কোনও একটি নির্দিষ্ট স্থানে জমা হ'তে বলছিল। মুখুয্যেমশাইয়ের কথায় বাবা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে চাপা সিঁড়ি বন্ধ করলেন। মুখুয্যেমশাইও আর দেরি না করে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। সকালে উঠে শুনতে পেলাম, গাঁয়ে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। ডাকাতরা পাড়ার মনো স্যাকরাকে কেটে দু'খানা ক'বে তার সর্বস্ব লুটে নিয়েছে।"

হিংস্র জীবজন্তুমাত্রই শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করবার পূর্বে একটা বিকটরূপ ডাক ডেকে' নেয়। এই হাঁক বা চীৎকার শুনে দুর্বল জীবরা এমনই নিস্তেজ এবং ভীত হয়ে পড়ে। এদের বাধা দেওয়া তো দূরের কথা! এই অবস্থায় তারা পলায়নে পর্যন্ত অক্ষম হয়ে পড়ে। অর্থাৎ রক্ত তাদের হিম হয়ে যায়। স্নায়ুর শক্তিও তারা হারিয়ে ফেলে। এর অল্পকাল পরেই এই হিংস্র জীবরা তাদের শিকারের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাদের বধ ক'রে থাকে। ব্যাঘ্র-সিংহাদি তাদের সিংহনাদ এই কারণেই ক'রে থাকে। এদেশের ডাকাতদলও এইরূপ রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছে। এরা কোনও গৃহস্থ বাড়িতে হানা দিবার পূর্বে এই সব জীবজন্তুর অনুকরণে মুহুর্মুহুঃ হাঁক দিতে থাকে। এই হাঁককে "জীর্গা" হাঁক বলে থাকে। চলতি কথায় এই হাঁককে বলা হয় "জীর্গা দেওয়া"। যথা—"আবা-আবা-আবা-আ। ইয়া-য়া-য়া—" কিংবা "ও ও ও ো,—এ-এ-এ-ে"—কিংবা "রে রে রে-এ-এ—" ইত্যাদি। এ দেশের নমঃশূদ্র, বাগ্দী প্রভৃতি সমরপ্রিয় জাতিরা প্রায়ই এইরূপ জীর্গা হাঁক হেঁকে থাকে। হঠাৎ এদের কাউকে দেখে কোনও গৃহস্থ যদি জিজ্ঞাসা করে, "কেডা রে?" তাহলে উত্তরে এরা

এইরূপ বলে থাকে, "তোর যম্‌" বা "তোর বাবা" ইত্যাদি।*

আজকালকার কোনও কোনও ডাকাতদল এক অভিনব উপায়ে গৃহস্থদের দরজা খুলে দিতে প্ররোচিত করে। রাত্রিকালে এদের একজন এগিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে পোস্টাল পিওনের অনুকরণে চেঁচাতে থাকে, 'বাবু, টেলিগেরাম, টেলি আছে—এ—'। টেলিগ্রাম এ দেশে সাধারণতঃ দুঃসংবাদই বহন ক'রে আনে, শুভকার্যে টেলিগ্রাম করার রীতি এদেশে প্রচলিত নেই। টেলিগ্রাম আসার সংবাদ শুনা মাত্র গৃহস্থগণ [দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে] তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দরজা খুলে দেয়। এর পর দরজা খোলা পাওয়া মাত্র ডাকাতরা সদলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে এরা লক্ষ্য করে কখন গ্রাম্য গৃহস্থ রাত্রে বাহ্যে বা প্রস্রাবের জন্য বাড়ির বার হয়। এই সুযোগে তারা বাড়ি ঢুকে বস্ত্র দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ করে। লুঠ করার পর এরা বাহির হতে বাড়ির দরজা বন্ধ করে। এর পর এদেরকে চীৎকার করার সুযোগ না দিয়ে এরা সরে পড়ে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এদের একটা দল যাত্রা বা কবিদল সেজে গ্রামের প্রান্তরে নাচ বা যাত্রা বসিয়ে গ্রামের অধিকাংশ ব্যক্তিকে ঐ স্থানে আটকে রাখে এবং এই অবসরে এদের অন্য দল গ্রামের অপর সীমানায় অবস্থিত একটি ধনী গৃহস্থের বাটীতে হানা দিয়ে কার্য সমাধা করে। কখনও এদের একজন গোয়েন্দা সেজে পুলিশকে

---

* এদেশে এমন অনেক শীর্ণকায় লোকও দেখা যায় যাদের ডাকাত মনে করতে মন চাইবে না। কিন্তু দুই ভাঁড় তাড়ি পেটে পড়া মাত্র এরাই হয়ে উঠে দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ডাকাত—এই সময় তাদের স্বভাবগত শান্ত ভাব আর থাকে না।

খবর দেয় কোনও এক গ্রামে ডাকাতি হবে। পুলিশ এই খবর পেয়ে তাদের সমুদয় দলবলসহ সেই গ্রামে জমা হয়। ইত্যবসরে ঐ ডাকাতদল অপর আর এক গ্রামে হানা দিয়ে সারারাত লুঠতরাজ করতে থাকে। শহরের অপরাধীরা আজকাল এক অভিনব উপায়ে লুঠতরাজ বা রাহাজানি ক'রে থাকে। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী। মাসাধিককাল বস্ত্রের অভাবে আমার ব্যবসা যাবার দাখিল হয়েছে। ইতিমধ্যে এক দালালের মারফৎ খবর পাই অমুক ব্যক্তি ব্ল্যাক মার্কেটে কিছু কাপড় বিক্রয় করবে। এর পর বন্দোবস্ত মত আমি পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এক নির্দিষ্ট স্থানে এসে হাজির হই। অকুস্থলে হাজির হওয়া মাত্র একদল লোক ছুরি হাতে আমার উপর লাফিয়ে প'ড়ে আমার টাকাগুলা সব কেড়ে নিয়ে প্রস্থান করে—আমি হাতে ও পিঠে ছুরির দ্বারা আহতও হই।"

এইভাবে কাহাকে বাড়ি ক্রয়ের কারণে, কাহাকে বা নিষিদ্ধ দ্রব্য দিবার অছিলায়, কোনও এক নিভৃত স্থানে ভুলিয়ে এনে এরা এদের অর্থাদি কেড়ে নিয়ে থাকে। এইরূপ অপকর্মের কাহিনী বড় বড় শহরে প্রায়ই শুনা যায়। এ সম্বন্ধে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি একজন বিড্‌.গ্যাম্বলার বা নওসেরা চিট্ রূপেই এদের দলে ভর্তি হই। এদের আড্ডায় এসে কিন্তু দেখি যে তাস বা জুয়ার কোনও খবর নেই। সেফ্রেফ ভুলিয়ে এনে টাকাকড়ি কেড়ে নেওয়াই দেখি এদের একমাত্র কাজ। অবশেষে বিরক্ত হয়ে এই ডাকাতদের দল হ'তে সরে পড়ে' আমি এক আসল নওসেরা দলের সন্ধানে বহির্গত হই।"

কিছুকাল পূর্বে রাজসাহীর কোনও এক গ্রামের জমিদারবাড়িতে এক অভিনবরূপে ডাকাতি হয়। এই অপকার্যে ডাকাত দল বিবাহের শোভাযাত্রী দল সেজে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে অগ্রসর হয়েছিল। এদের কাছে স্টেশন হতে গ্রাম পর্যন্ত পথ-নির্দেশক একটি প্ল্যানও দেখা গিয়েছে। অধুনাকালের ডাকাতির মধ্যে রেলওয়ে রবারি এক অন্যতম অপরাধ। এই অপকার্যে দলের একজন ট্রেনেই অবস্থান করে এবং ব্যবস্থামত ট্রেনটি একটি নির্দিষ্ট নির্জন স্থানে এলে শিকল টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেয। দলের লোকেরা ঐ স্থানে পূর্ব ব্যবস্থামত পূর্ব হতেই হাজির থাকে এবং ট্রেনটি দুর্বৃত্তদের মনোনীত স্থানে আসা মাত্র এরা ট্রেনে উঠে লুঠতরাজ শুরু করে দেয়। অধুনা-কালের কোনও কোনও ডাকাতদের অকারণে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতে দেখা যায়—এমন কি সামান্য অর্থের জন্যে বিনা প্রযোজনেও এরা মনুষ্য হত্যাও করে থাকে। এইরূপ মনোবৃত্তি অত্যন্তরূপ বস্তুতান্ত্রিকতার কারণেই এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে। এ জন্যে অধুনাকালীন ধর্ম-বিশ্বাস-হীনতাই দায়ী। এরা সাধারণতঃ প্রাথমিক অপরাধী হ'য়ে থাকে। এদের মতে পাপ বা পুণ্য মনের এক বিকারমাত্র। এ'ছাড়া এদের কেহ কেহ অকুস্থলে এসে এমন নারভাস্ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে যে, এই সময় এরা বুদ্ধিবিবেচনা সবই হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় এরা যাকে সম্মুখে পায় নির্বিচারে তাকেই হত্যা করে থাকে। এই সময় অভ্যাসের অভাবে এরা স্নায়বিক রোগীবিশেষে পরিণত হয়। দুরূহ কার্যে এদের ধৈর্য, সাহস ও চিত্ত সংযমের অক্ষমতাই ইহার কারণ; কিন্তু প্রকৃত বা পেশাদারী ডাকাতদের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কারণ, এরা অপকর্মকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এরা ভালরূপেই বুঝে যে, এইরূপ অহেতুক নিষ্ঠুরতা এদের ব্যবসায়ের

ক্ষতিকারক। পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে এদের নিজস্ব মতবাদও থাকে। এই কারণে বেশি কান্নাকাটি করলে এদের কেহ কেহ গৃহস্থদের অপহৃত দ্রব্যের কিষদংশ তাদেরকে ছেড়ে দিয়েও এসেছে। এরা অকুস্থলে এসে কদাপি স্থৈর্য ও ধৈর্য হারায় না।

এদেশে এমন ডাকাতও আছে যারা কেবলমাত্র একটা উত্তেজনা উপভোগ করার জন্যে বা একটা রোমান্সের কারণেই ডাকাতি করে থাকে। এ সম্বন্ধে কোনও এক ভদ্র ডাকাতের একটি বিবৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

"মনে করুন কোনও এক বাড়ির কথা। সদলবলে আমি পাঁচিল টপকে কোনও এক বাটীতে প্রবেশ করছি। বাড়ির স্ত্রীপুরুষেরা প্রাণভয়ে ছুটাছুটি করতে শুরু করেছে, আর আমি একজন বিজয়ী বীরের ন্যায় তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। এর চেয়েও বড় রোমান্স কি আপনি কল্পনা করতে পারেন?"

অধুনাকালে কোনও কোনও [স্থানীয়] ডাকাত দেখা যায়, যারা মোটর আরোহীদের লুণ্ঠন করবার জন্যে রাজপথে বাঁশ বেঁধে রাখে। এরূপ ঘটনা শহর হতে দূরে ঘটে। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটি চিত্তাকর্ষক বিবৃতি উদ্ধৃত করা হ'ল।

"আমি সপরিবারে মোটরযোগে অমুক জায়গায় যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখতে পাই একদল লোক রাস্তার উপর একটা বাঁশ তুলে ধরেছে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি বুঝে নিই এবং সজোরে গাড়িটা ব্যাক্ ক'রে নিয়ে অনেকদূর পিছিয়ে আসি। তারপর উহা ঘুরিয়ে নিয়ে সরে পড়ি। ডাকাতদল দৌড়ে আসে বটে কিন্তু আমাদের আর তারা নাগাল পায় না।"

[সলমান আমলে এই ডাকাতদল বহুস্থানে প্যারেলাল গভর্ণমেণ্ট

স্থাপন করেছিল। অবশ্য স্থানীয় জমিদাররাও এই বিষয়ে এদের সাহায্য করেছে। মুসলমানগণ হিন্দুস্থানের শহরসমূহে এবং রাজধানীতে আধিপত্য স্থাপন করলেও গ্রামাঞ্চলে বা দেশের অভ্যন্তরাঞ্চলে এঁদের কোনও প্রভাপ ছিল না। ঐ সকল স্থানে জমিদারগণ এবং ডাকাতদের নেতাদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। এই কারণে মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতির উত্থানে মোগল সাম্রাজ্য সহজেই ভেঙে পড়েছিল।]

মোটর ডাকাতি বর্তমান সভ্যতার একটি বিশেষ অবদান। এ দেশে এই প্রকার ডাকাতি [রাজনৈতিক ও সাধারণ ডাকাতি] মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের
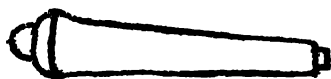
যুবকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঞ্জাবী ও শিখরা তাদের ট্যাক্সির নম্বর বদলে বা উহার এক‍টি বা দুইটি ডিজিট পাল্‌টিয়ে বা উঠিয়ে ঐ সব যানে বন্দুক ও তরবারি সহকারে ডাকাতি করেছে। বাঙ্গালীরা পিস্তল, স্টেন্‌গান, হাতবোমা প্রভৃতি এবং অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ছুরিকা, পিস্তল ও জিপ্পো আদি এই অপকার্যে ব্যবহার করেছে। এই জিপ্পোর স্বরূপ ও ব্যবহার চাতুর্য পুস্তকের সপ্তম খণ্ডে অ্যাংলো অপদল ও রেড্‌হট্ স্করপিয়ন গ্যাঙ্

সম্পর্কে বলা হয়েছে। পূর্বপৃষ্ঠায় ঐরূপ এক অস্ত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া হল।

সাধারণতঃ কয়েকটি মোটর গাড়ি এই অপকার্যে সংগ্রহ বা চুরি করা হয়। এর পর রাত্রে দ্বারবানের ঘুমন্ত অবস্থার সুযোগে এরা পেট্রোল পাম্প ভেঙে পেট্রোল সংগ্রহ করে। ঘটনাস্থলে এসে সিডন্ বডি কারের ছাদে উঠে এরা গ্যাস ও অন্যান্য স্ট্রিট-লাইট প্রথমে নিভিয়ে দেয়। এর পর ওরা একটি বেঞ্চ বা বংশদণ্ড সংগ্রহ করে উহা মোটরের সম্মুখের অংশে এবং দোকান প্রভৃতির দুয়ারের উপর সংলগ্ন করে ঐ মোটরকার সতেজে সম্মুখে চালিয়ে ঐ দুয়ার ভেঙে ফেলে। কখনও কখনও লৌহ শিকলের এক মুখ জুয়েলারী দোকানের লৌহ গরাদে এবং উহার অপর মুখ মোটরকারের পিছনে বেঁধে ঐ গাড়ি সম্মুখে সবেগে চালিয়ে ঐরূপ লৌহ কপাটও উপড়ে ফেলেছে। ঘরে ঢুকে এরা কেহ জলন্ত বিজলী বাতি ত্বরিত গতিতে জিম্মোর বা যষ্টির আঘাতে ভেঙে দিয়েছে। দোকানী বা অপর কেহ চেঁচালে এরা তাদের মুখে তোয়ালে-গামছা গুঁজে উহা অপর এক বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বেঁধে দেয়। তবে প্রায়ই ছুরিকা বা পিস্তল দেখিয়ে তাদের নিস্তব্ধ করা হয়ে থাকে। এই সময় এদের দুই-একজন বাহিরের পাহারাদার মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ করতে থাকে যাতে ঐ শব্দে আক্রান্তদের চীৎকারের শব্দ ডুবে যায়। এর পরে ঐ মোটরকারগুলিতেই লুঠের দ্রব্য তুলে তারা দ্রুতগতিতে সরে পড়ে। এই সময় জনতা তাদের তেড়ে এলে তারা মোটর হ'তে হাতবোমা নিক্ষেপ করে তাদের হটিয়ে দিয়েছে। এরা দুইটি ক্ষুদ্র লৌহ তার মধ্যস্থলে সংযুক্ত করে চারিটি ফলকযুক্ত কণ্টক মণ্ডপ তৈরি ক'রে তা অনুসরণকারী মোটরের সম্মুখে ছড়িয়ে দেয়। এই মণ্ডপের যে কোনও তিনটি ফলক নিম্নে

জমির উপর দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে উহার চতুর্থটি উর্ধ্বমুখী হয়ে টায়ার পাঙচার করে দেয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণে অর্থ সংগ্রহের অজুহাতেও ডাকাতি করা হয়। এইরূপ ডাকাতি সম্বন্ধে পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে রাজনৈতিক অপরাধ শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। আজকাল অবশ্য এইরূপ ঘটনা বিরল। কারণ, দেশের লোককে এমনভাবে এরা আর চটাতে চায় না।

ট্যাক্স ফাঁকি

ট্যাক্স ফাঁকিকে অপরাধ না বলে উহাকে পাপ বা অন্যায় বলা চলে। বহু ব্যক্তি উহা ইচ্ছা করে ফাঁকি দেয় না। উহা তারা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়। বহু ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল ব্যতিরেকে দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রয় কর ও আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে 'ট্যাক্স ধার্যক' কর্মীদের বাড়াবাড়ির জন্য লোকে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে। ঐ সম্পর্কিত আইন সরলীকৃত না থাকাতে লোকে ট্যাক্স ফাঁকি দেয। এই বিষয়ে নিম্নে একটি বিবৃতি উদ্ধৃত করলাম।

"আমাকে হিসাব দাখিল করতে বলা হলে আমি তাদের বলি যে আমি পৈতৃক বাগানের আম গাছ বিক্রি করেছি। সাথে সাথে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—'ঐ গাছের গোড়াতে কি জল দিতেন? জল ঢাললে উহা এগ্রিকালচারাল হবে। উহা তাহলে

ইনকাম ট্যাক্সের বাইরে পড়বে। কিন্তু গাছের গোড়ায় আপনি জল দেন নি। অতএব উহা ভারত সরকারের প্রাপ্য ইনকাম্-ট্যাক্সের আওতায় পড়লো। আপনাকে তাহ'লে বিক্রয় লব্ধ টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। এ বিষয়ে একটা রুলিং আছে। সৌভাগ্য ক্রমে অন্য আদালতের ঐ বিষয়ে ভিন্ন রুলিং থাকাতে ঐ সব হতে অব্যাহতি পাই।"

অধুনা এ দেশে গৃহ সমস্যা সর্বাধিক। সরকার গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দিতে চান। বহু গরিব লোক সর্বস্ব খুইয়ে উহা তৈরি করেন। কিন্তু এতেও ইনকাম্-ট্যাক্স কর্মীরা হৈ হৈ শুরু করে দেন। যেন একটা মহা অপরাধ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি নির্মাতা যেন মহা ঘৃণ্য একজন আসামী। তাকে টানা হিচড়ানোর অন্ত নেই। বাড়ি তৈরির দেনা শোধ হয নি। তদুপরি উকিলের পিছনে খরচ-খরচা। এ অবস্থাতে মনে হয় এর চাইতে বাড়ি ভাড়া বকেয়া রেখে ভাড়াটিয়া থাকা ভালো। বাড়ি তৈরিতে ব্যয়িত টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে তবু ভালো সুদ পেতাম। তাতে সংসারটা অন্ততঃ চলে যেতো। আমার মতে—ছোট ছোট বাড়ির মালিকদেরকে এ'ভাবে ব্যতিব্যস্ত করা উচিত নয়। ঐ বাড়ি তৈরির ব্যাপারে হিসাব বিষয়ে পরামর্শের জন্য আমি একজন পরামর্শদাতার শরণাপন্ন হই। এই ইনকাম্-ট্যাক্স সম্পর্কে তাঁর পরামর্শ শুনে আমি বলি—'এ্যাঁ! সে কি মশায়, এ কি আপনি বলছেন? এতো আমাকে জুয়াচুরি শেখাচ্ছেন!' ভদ্রলোক আমাকে এ'ভাবে আঁৎকে উঠতে শুনে বললেন—'আরে মশাই! সম্পত্তি রাখতে হলে আপনাকে [নিজেকে] জুয়াচুরি শিখতে হবে। শুধু তাই নয়, ঐ জুয়াচুরি পুত্রকেও শেখাতে হবে। এমন কি—সময় পেলে আপনার পৌত্রকেও ওটা শেখাতে

হবে।' এর পর সভয়ে আমি তাঁর বাটী ছেড়ে চলে এসেছিলাম। বৈধ এবং অবৈধ উপায়ে ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া হয়। জনস্বার্থের কারণে উহার অবৈধ উপায়গুলি এখানে বিবৃত করবো না। এখানে মাত্র উহার বৈধ উপায়গুলি উদ্ধৃত করলাম।

( ) হিসাব দেখানোর সুবিধার জন্য বহু ব্যক্তি কিছু চাষের জমি রাখেন। এই চাষের আয়ের উপর রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার আছে। কিন্তু ঐ আয় সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলার কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার নেই। ইনকাম্ ট্যাক্স ভারত সরকারের একটি বিভাগ। ৭০ বিঘার [কিংবা ৮০] উপরে [সিলিং] কারুর জমি থাকলে কৃষি কর দিতে হয়। উহার আয় বাৎসরিক ন্যূনাধিক ৩৩০৲ হলে ঐ ট্যাক্স প্রদেয় হয়। কিন্তু ঐ সিলিং বহির্ভূত মাত্র ৪০ বিঘা জমির [ইনটেন-সিভ্ চাষ] আয় বাৎসরিক দশ হাজার হলেও কোনও ট্যাক্স দিতে হয় না। বহু ব্যক্তি বাধ্য হয়ে ঐ ভাবে কৃষি আয় দেখিয়ে ইনকাম্-ট্যাক্সওয়ালাদের কবল হতে রক্ষা পায়।

বিঃ দ্রঃ—ধরা যাউক কোন ব্যক্তি নিজের সুপারভিশনে একটি বাড়ি তৈরি করলো। স্বভাবতঃই সে ঘুরে ঘুরে সস্তাতে মাল মশলা কিনে আনলো। মাপে চুরি, দড়িতে চুরি, মশলাতে মজুরীতে চুরি এখানে হলো না। কণ্ট্রাকটারের ৩০ ভাগ অর্থ বেঁচে গেল। এভাবে ভদ্রলোকের চল্লিশ হাজারে [টাকা] বাড়ি তৈরি শেষ। কিন্তু ইনকাম্-ট্যাক্স বাবুরা কণ্ট্রাক্টারী রেটে স্কোয়ার ফুট মেপে ওর মূল্য নব্বই হাজারে দাঁড় করালেন। এক্ষেত্রে নানারূপ বৈধ উপায় আবিষ্কার করে আত্মরক্ষা করা ভিন্ন অন্য উপায় থাকে নি।

[ব্যবসায়ে ইনভেস্টমেন্ট (অর্থলগ্নী) করাতে অপরাধ হয় না। তেমনি বাড়ি নির্মাণও একপ্রকার ইনভেস্টমেন্ট। ব্যবসায়ে নানাবিধ

*রচ দেখিয়ে এবং নাবালক স্বজনদের পার্টনার করে ইনকাম্ ট্যাক্স কমানো হয়। কিন্তু বাড়ির জন্য দরোয়ান রাখা, পাম্প মিস্ত্রি রাখা বা কমন সিঁড়ির আলোর খরচ, মেথর ও সুইপারের বেতন— ট্যাক্সকর্মীরা নাকচ করে দেন। রিপেয়ার বাবদ খরচ সামান্য মঞ্জুর করা হয়। অথচ ভাড়াটিয়াদের বেপরোয়া ভাঙ্গাভাঙ্গির অন্ত নেই। পরের বাড়ির প্রতি কারুরই মমতা থাকে না।]

বিঃ দ্রঃ—বহু ব্যবসায়ী নিজেদের চাকর, পাচক, দারোয়ান ও গাড়ির ড্রাইভার প্রভৃতির বেতন ফ্যাক্টরি কর্মীদের হিসাবে দেখান। ফলে, এদের জন্য এঁদেরকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু খরচ করতে হয় না। শিল্পপতিরা ফ্যাক্টরির খরচে বহু গেস্ট হাউস এবং শৌখিন গাড়ি রাখেন। কিন্তু ঐ গাড়ি তাঁরা পরিবারবর্গের কাজে ব্যবহার করেন। ঐ গেস্ট হাউসও তাঁদের ব্যক্তিগত বাগানবাড়ি রূপে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ বহুবিধ খরচ-খরচা দেখিযে তাঁরা ফ্যাক্টরির দেয় ট্যাক্স কমিয়ে দেন। কেউ ভাড়া করা বসত বাড়ির এক অংশ ব্যবসায়ের জন্য ভাড়া নেওয়া অফিস বলে কিছুটা খরচ বাঁচান। বলা বাহুল্য, অসৎকর্মীদের কিছু কিছু উৎকোচ যে এঁরা না দেন তাও নয়। ফলে সৎলোকেরা এদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে অক্ষম হয়। এমন বহু আয়কর অফিসার আছেন যাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যায় বৎসরে ট্যাক্স বাবদ অর্থ তুলে দিতে হয়। ঐ অর্থ সংগ্রহ করে ট্যাক্স তুলে ঊর্ধ্বতনদের মন রাখতে তাঁরা বাধ্য। এজন্য বাধ্য হয়ে সৎ মানুষকেও পোষ্যবর্গের নামে নামে সম্পত্তি বেনামী করতে হয়। ভাড়াটিয়ারা বৎসরাধিক কাল ভাড়া দিচ্ছে না। দেশের আইন তাদেরকে রক্ষা করছে। কিন্তু বাড়ির মালিককে ভাড়ানুযায়ী ইনকাম্ ট্যাক্স ও মিউনিসিপ্যাল

ট্যাক্স দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্যাক্স-বন্ধ আন্দোলন না হওয়াই আশ্চর্য। কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি ও প্রশাসন বাবদ ব্যয় বাড়ছে। সেই ঘাটতি অর্থ তুলতে ট্যাক্স বাড়ছে। অজুহাত - জীবন ধারণের ব্যয় বৃদ্ধি। সেই একই অজুহাতে প্রদেয় ট্যাক্সই বা না কমবে কেন? বহু ব্যবসায়ী এ জন্য লস্‌ [L. ss] পর্যন্ত কিনে থাকেন। দেনাগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে এঁরা আয়করের স্ল্যাব বাঁচান।

এইবার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স সম্বন্ধে বলা যাক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের উপর এর চাপ অধিক পড়ে। অনেকে গৃহের একাংশে থেকে অন্য অংশ ভাড়া দেন। ভাড়ার টাকা হতে তাঁরা ট্যাক্স দেন। কিন্তু ভাড়া বাকি পড়ে ও তার ফলে বাড়ি বিক্রয় হয়। অকুপেশন ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছ হতে আদায়ের রীতি নেই। করপোরেশন প্রভৃতি ঐ ট্যাক্স ভাড়াটিয়ার কাছে আদায করলে ইহার সমাধান হয়। বহু ব্যক্তি বেশি ভাড়া কবুল করে বাড়ি ভাড়া নেয়। কিন্তু দুমাস ঐ হারে ভাড়া দিয়ে ভাড়া বন্ধ করে। অথচ ঐ ভাড়ার হারে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হবে। [হযতো ঐ বাড়ির ভাড়া এর অর্ধেক হয়ে থাকে।] ফলে গৃহস্থকে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার বহু উপায় উদ্ভাবন করতে হয়। উহার কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

(১) ভাড়া না দিযে তিন বৎসরের জন্য রেজিস্টারী করে লিজ দেওয়া হয়।, শর্ত থাকে ঐ সময়ের পরে নূতন লিজ করতে হবে। কিংবা তৎক্ষণাৎ ঐ বাটী ছেড়ে যেতে হবে। ভাড়াটিয়াকে উঠানো শক্ত। কিন্তু লিজ হোল্ডার উঠতে বাধ্য। নচেৎ শর্তানুযায়ী তাকে দৈনিক ক্ষতিপূরণ উচ্চহারে দিতে হবে। এইখানে ভাড়ার বাড়ি ১০০৲ টাকাতে ভাড়া দেওয়া হয়। ওদিকে প্রাইভেটে [হিসাব

বহির্ভূত ভাবে] বাকি ২০০ টাকা হারে একত্রে তিন বৎসরের মোট টাকা নিয়ে নেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মাসিক ১০০ টাকা ভাড়ার হিসাবে ভ্যালুয়েশন করে করপোরেশন ট্যাক্স দিতে হয়। আইন মত মাসিক ভাড়ার উপর ট্যাক্স বসে। এ ভাবে এরা ট্যাক্স ফাঁকি দিতে বাধ্য হয়।

(২) সাধ্যাতীত ট্যাক্স দিতে অপারক হয়ে মানুষ আত্মীয়দের ভাড়া দিয়ে রসিদ দেয় না। কারণ, ভাড়াটিয়া না থাকলে ট্যাক্স কম হয়ে থাকে। কখনও পূর্ব বন্দোবস্ত মত কম টাকার ফলস্ বিল দেওয়া হয়। এই ফলস্ বিল অনুযায়ী ট্যাক্সের বিল আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন। এটা যারা না করে তাদের বাড়ি-ঘর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওদিকে বাড়তি খরচ উঠাতে গরিব মালিকদের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হচ্ছে। ছোট বাড়ির মালিক ও ছোট দোকানীদের দিকে তাকাবার কেউ নেই।

পারণ-পদ্ধতি

যে সকল অপপদ্ধতি সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকে বলেছি, উহাদের দুইটি মূল বিভাগে ভাগ করা যায়, যথা সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট। কোনও পদ্ধতি কেবল মাত্র অপকর্ম সমাধা করার জন্য গৃহীত হলে উহা সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি। এই পুস্তকের প্রতিটি পাতায় ঐরূপ বিবিধ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যেমন দোকানের ছাদ ফুটা করে দড়ি ধরে নেমে এসে কিংবা উহার পাশের ঘর ভাড়া করে দেওয়াল ফুটা করে চুরি করা ইত্যাদি; নওশেরা ঠগীদের তাস সাজাবার কায়দা ইহার অপর দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ছবিকে এরা ঘোঁড়া বলে। সাজানোর

কায়দাতে প্রথমবার ভিকটিম জিতবে। কিন্তু হাতের কায়দায় অলক্ষ্যে একটি মাত্র তাস সরালে রাজা বা নবাবের জিত হতে থাকবে। কিন্তু এইগুলি ছাড়া এমন বহু কাজ অপরাধীরা করে যার সঙ্গে মূল অপরাধের কোন সম্পর্ক নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কোনও কোনও সিঁদেল চোরদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। এরা গৃহস্থদের গৃহে এসে প্রথমে রান্নাঘরে ঢুকে পান্তা ভাত খেয়ে নেয়।* এদের কোনও কোনও শহুরে সহধর্মী ধনী গৃহস্থের গৃহে ঢুকে প্রথমে ব্রাণ্ডি বা মদ প্যানট্রি থেকে তুলে খেয়ে নিয়েছে। এক-একজন এক-একটি খাদ্য খেতে ভালবাসে। এদের মধ্যে আবার এমন চোরও আছে যারা প্রথমে ঐ গৃহ মধ্যেই নিজেদের কাপড় ছেড়ে গৃহস্থদের কাপড় পরে নেয়। বেদিয়া প্রভৃতি গ্রাম্য চোররা তুকরূপে শিকড়, কড়ি, লাল সুতা প্রভৃতি গৃহস্থ গৃহে ফেলে রেখেছে। এই সকল কার্যকে অপকর্মের অসংশ্লিষ্ট কার্য বলা যেতে পারে। এদের কেউ কেউ চুরির পর ঘটনাস্থল ত্যাগ করার পূর্বে ঐ গৃহে বিষ্ঠা ত্যাগ করে যায়।

অপকর্ম বিষয়ে এদের এমন বহু আজব পদ্ধতি আছে; উহা আপাত দৃষ্টিতে অসংশ্লিষ্ট পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে অপকর্মের সঙ্গে উহাদের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেলওয়ের ওআগন ব্রেকারদের কথা বলা যেতে পারে। লোডিং স্টেশনে দুর্বৃত্তরা যে ওআগনে মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকে, সেই ওআগনের গায়ে বহু সাঙ্কেতিক শব্দ লিখে রাখে, যথা, "চল্ চল্ রে নওজোয়ান, বন্দেমাতরম্, দিল্লী চলো"

* আমার জনৈক রক্ষী-বন্ধু বলেছিলেন যে, এতদ্বারা তারা [চেতন মনে?] বুঝতে চায় যে তারা অন্নাভাবে চুরি করে। কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে তারা নিজেরা গরিব হয়ে গরিব গৃহস্থদের পান্তাভাত খাবে কেন?

ইত্যাদি। পরে সুবিধাজনক স্থানে [ইঞ্জিন চালকের যোগসাজসে?] মালবাহী ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হলে দুর্বৃত্তরা ঐ লেখা হতে ত্বরিত গতিতে বুঝে নেয়, কোন ওআগন ভাঙলে তারা আশানুযায়ী দ্রব্যাদি পাবে।

এই সংশ্লিষ্ট অপপদ্ধতিকে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা, সাধারণ এবং অসাধারণ। অসাধারণ পদ্ধতি অসাধারণ প্রবঞ্চনার ক্ষেত্রে প্রযোগ করা হয়ে থাকে। বিড্, গ্যাম্বলিঙ প্রভৃতি অপকর্মে অপরাধীরা কিরূপে মানুষের মনকে প্রলুব্ধ ক'রে অস্বাভাবিকরূপে বোকা করে তুলে ঠকায় তা আমি বলেছি। ঐ ক্ষেত্রে অপরাধীরা বাগ্‌জাল ও পরিবেশ দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে সাময়িকভাবে তাদের বিচারশক্তি রুদ্ধ করে। এই অবস্থায় আপন স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করে তার প্রতিরোধ শক্তি প্রয়োগ করে নি এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ তাকে যা তা বিশ্বাস করানো সম্ভব হয়েছে। এই ব্যবস্থার মূলে অবশ্য থেকেছে লোভজনিত মানুষের সুপ্ত অপস্পৃহার * বহির্বিকাশ। কারণ এই বিশেষ অপরাধে মানুষ

* প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত অপস্পৃহা আছে এবং যে কোনও মুহূর্তে তা কৃত্রিম উপায়ে বহির্গত করা যেতে পারে ইহা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অপরকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে যায়। এ বিষয়ে নিম্নের বিবৃতিটি প্রণিধানযোগ্য।

"আমি এমন লোভাতুর হয়ে উঠলাম যে ঐ দিনেই বর্ধমানে পৌঁছ এক কল্পিত বিপদের অজুহাতে মেশোমশাই-এর নিকট দশ হাজার টাকা কর্জ চাইলাম। তিনি উহা প্রদানে অপারক হলে দেওঘরে ভগ্নীপতির নিকট যাই। দশ হাজার টাকাতে দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ। কিছুতেই ঐ লোভ আমি দমন করতে পারি নি। ভগ্নীপতি আমার পীড়াপীড়িতে বলে উঠলেন—'বুঝেছি। তুমি নিশ্চই নবাবের পাল্লায় পড়েছো। আমাকেও ওদের আড্ডাতে এনে উনি বলেছিলেন—'এই আমি রাখলাম বিশ হাজার, তুমি যতো জমিতে রাখবে তার তিন গুণ আমি রাখবো'। যাই হোক সে যাত্রাতে ভগ্নীপতি আমাকে রক্ষা করেছিলেন।"

স্মাগলাররা গাড়ির রঙ ও নম্বর তো বদলায়ই, উপরন্তু বহু ক্ষেত্রে তারা প্রতি মাসে নূতন গাড়ি ঐ উদ্দেশ্যে কিনে নূতন লোকও ঐ কাজে নিয়োগ করে।

অসাধারণ পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হ'ল। এইবার সাধারণ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলব। অপরাধের সাধারণ পদ্ধতিতে মানুষ তার স্বাভাবিক মন নিয়েই ঠকে থাকে। বহুপ্রকার সাধারণ প্রবঞ্চনা এবং চুরি ডাকাতি প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে মূল অপপদ্ধতিসমূহকে আমি উপরোক্ত তালিকানুযায়ী কয়েকটি বিভাগ ও উপবিভাগে ভাগ করে নিয়েছি।

[এই অপপদ্ধতিকে দশটি অংশে ভাগ করে কিরূপে অপরাধ নির্ণয় সম্ভব তা আমি পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডের শেষাংশে বিশদরূপে বিবৃত করেছি।]

এ ছাড়া পথ-ঘাট, বিপণি-গৃহ—ভারতীয় বা য়ুরোপীয়, স্টেশন,

মেলা, যানাদি প্রভৃতির বিভিন্ন পরিস্থিতি ও সুযোগ এবং নরনারীর জাতি বর্ণ সেক্স ও অভ্যাসও বিভিন্ন অপপদ্ধতির উদ্ভবের কারণ। এদের কেহ কেহ রাত্রে যখন সকলে ঘুমায় কিংবা দুপুরে যখন্ পুরুষ বাড়ি থাকে না, কিংবা রাত্রে গৃহস্থ যখন বাড়িখালি করে সকলে সিনেমা যায় তখন চুরি করে। এইগুলিও এক-একটি দলের এক-একটি পদ্ধতি। এই জন্য দেখা গিয়েছে যে, একটি বিশেষ পরিস্থিতি ও সুযোগের বিলুপ্তির সহিত অপপদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধন হয়েছে। কিন্তু ঐরূপ সুযোগ ও পরিস্থিতির পুনঃ আবির্ভাবেব সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুরানো ও পরিত্যক্ত পদ্ধতিই পুনঃ গৃহীত হয়েছে। এমনও দেখা গিয়েছে যে, প্রাচীন কলকাতার অপপদ্ধতি এক্ষণে ঐ শহরে অচল হলেও উহা হাল-ফিল উঠ্‌তি শহরে পুনঃ প্রবর্তিত হয়েছে। এই কারণে আমি প্রাচীন ও আধুনিক—উভয়বিধ পদ্ধতি সাদরে সঙ্কলন করে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছি।

এই অপরাধসমূহকে আমরা ঐতিহাসিক সূত্রে এবং জাতিগতভাবেও বিভক্ত করে নিতে পারি। সাধারণতঃ আমরা বাঙ্গালী, উড়িয়া, মাদ্রাজী ও মাড়বারীদের দক্ষ প্রবঞ্চকরূপে, হিন্দিভাষী দেশবাসী ও নেপালীদের দক্ষ সিঁদেল চোররূপে এবং পাঞ্জাবী ও কোনও কোনও দেশবাসীদের দক্ষ ডাকাতরূপে এবং মুসলমানদের [বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী] দক্ষ পিকপকেটরূপে দেখে থাকি। বিশেষ অপরাধে বিশেষ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যাধিক্য থেকে বুঝা যায় যে, তাদের খাদ্য ও দৈহিক গঠন এবং স্বভাব ও কৃষ্টি বহুল পরিমাণে বিবিধ অপরাধের নিয়ন্ত্রক। অবশ্য এই তালিকা হ'তে প্রতিটি প্রদেশের ভ্রাম্যমাণ বা স্থায়ী বাসিন্দা স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিদের বাদ দিয়েছি। কারণ স্থানীয় জল-বায়ু ও পরিবেশ পুরুষানুক্রমে

অর্জিত স্বভাবকে স্বল্প সময়ে পরিবর্তিত করতে সকল ক্ষেত্রে পারে নি। এই ক্ষেত্রে আমি মাত্র সাধারণ মানুষের অন্তর্গত অভ্যাস [স্বভাব-নয়] অপরাধীদের সম্বন্ধেই বলেছি। দেশে মুসলমান অপরাধীরা মাত্র ছুরি মারতে ওস্তাদ, অপর দিকে অমুসলমানরা [বিভিন্ন কৃষ্টির কারণে] লাঠিবাজিতে দক্ষ। কিন্তু তা সত্বেও আমরা বহু ভদ্র বাঙ্গালী হিন্দুকে ছুরি মারতে ও ডাকাতি করতেও দেখেছি। এর প্রকৃত কারণ নির্দেশ করতে হলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে ইতিহাসের। ছুরি মারতে বাঙ্গালী হিন্দুরা প্রথম অভ্যস্ত হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধার্থে ও প্রতিশোধার্থে এবং ডাকাতি আদি কার্য তারা প্রথম শিক্ষা করে রাজনৈতিক কারণে। তাই আজও পর্যন্ত মাত্র এক শ্রেণীর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙ্গালী ছেলেদের দ্বারাই এই দুই প্রকার অপরাধ সম্ভব। ধনিক এবং সাধারণ বাঙ্গালীরা এই সব কাজে আজও দক্ষতা অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু তাই যদি হয় তা'হলে নিম্ন শ্রেণীর বহু বাঙ্গালী গোষ্ঠী পূর্বের ন্যায় আজও [খাদ্য, পানীয় ও কৃষ্টির উর্ধ্বে উঠে] ডাকাতি করে কেন? আমার মতে এই সবের প্রকৃত মীমাংসা করতে গেলে মনস্তত্ত্বের সহিত ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণারও প্রয়োজন আছে। কারণ, ঐ তিনটি বিষয় পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে থাকে।

[পুস্তকের এই খণ্ডে মাত্র 'অযৌনজ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। অপরাধের নারীঘটিত বা যৌনজ পদ্ধতিসমূহ, রাজনৈতিক অপরাধ-পদ্ধতি এবং জুয়া, আবগারী, গুণ্ডামী, খুন প্রভৃতির অপপদ্ধতি ইহার তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডে বিবৃত করা হয়েছে। তা'ছাড়া

স্বভাব-দুর্বৃত্ত জাতিসমূহের অপপদ্ধতি বিবৃত করা হয়েছে ইহার অষ্টম খণ্ডের শেষাংশে।]

এই সকল অপরাধের কতকগুলি চক্ষের সম্মুখে সমাধা হয়, যেমন প্রবঞ্চনা ইত্যাদি। কিন্তু উহাদের কতকগুলি সমাধা হয় চক্ষের অগোচরে, যেমন চুরি ইত্যাদি। এই জন্য আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ন্যায় চোরদের নিকটও এই সম্বন্ধে বহু বিবৃতি সংগ্রহ করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বিবৃতি ভাষার উৎকর্ষতার জন্য আমাকে নিজ ভাষায় লিখে নিতে হয়েছে।

[পুস্তকের এই খণ্ডে আমি বহুবিধ অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলেছি। ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলিতে আরও বহু প্রকার অপপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। স্বভাবতঃই মনে হবে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সৃষ্টি করলেন কেন? বহু বিষাক্ত ঘৃণ্য সর্পের সৃষ্টি সম্পর্কেও এই প্রশ্ন উঠে। কিন্তু এই ক্ষতিকর সর্পবিষ হতে বহুবিধ অমৃত সমতুল ঔষধের সৃষ্টি হয়। নকল বা জাল করা, উৎকোচ গ্রহণ, দস্যুবৃত্তি, চৌর্যকার্য প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন উঠে থাকে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে অনাবিল ক্ষতি করার জন্য পৃথিবীর কোনও পদার্থ সৃষ্টি হয়নি। এই অপরাধীদের হতে সাবধান হবার জন্যে বা উহাদের কবল হতে আত্মরক্ষার জন্যে বর্তমান উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়। এরা মানুষকে আয়েসী হতে না দিয়ে সর্বদা সক্রিয় করে রাখে। কেহ কেহ এদের মধ্যে উপকারিতা আবিষ্কার করবার জন্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের কয়েকটি ঘটনার বিষয় বলা হয়ে থাকে।

উৎকোচ গ্রহণ এক অতি ঘৃণ্য অপরাধ। কিন্তু উহার প্রাচুর্য না থাকলে তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র শক্তির

উত্থান হতো না। আগ্রা দুর্গ হতে পলায়ন পথে বাঙলার প্রান্তে এসে ধরা পড়লে ফৌজদারকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করে ছত্রপতি শিবাজী স্বরাজ্যে উপস্থিত হয়ে পুনরায় দেশোদ্ধারে ব্রতী হন। ইংরাজদের মধ্যে জলদস্যু না থাকলে স্পেনীয় আর্মাডা বাহিনীর কবল হতে ইংলণ্ড রক্ষা পেত না। এই জলদস্যুরাই স্পেনীয় বাহিনীর সমুদ্র পথের আগমন বার্তা স্বদেশে এসে জানান। এমন কি তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা এদের বাধা দান কালে ভালো করে কাজে লাগান। ভারতের বহু স্বাধীন রাজা ও জমিদার তৎকালীন দস্যুদের সাহায্যে স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। ইংরাজরা সমগ্র ভারতকে অন্যায় ভাবে একত্রিত না করলে আমাদের আজকের এই মহাভারত রচনা করতে বেগ পেতে হতো। ইংরাজ পুলিশ স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের উপর অত্যাচার না করলে এ দেশবাসী এতো শীঘ্র হয়তো জেগে উঠতো না। এজন্য এদেশীয় রূপকরচনাকারীরা বলেছেন যে বন্ধু রূপে সাত জন্মে এবং শত্রু রূপে তিন জন্মে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। যুদ্ধের কালে শত্রু সাবমেরিনের গোলা ও বিমান নিক্ষিপ্ত বোমা এড়িয়ে ভারতের ডকে ইংরাজরা যুদ্ধোপকরণ এনেছে। কিন্তু এত কষ্টে আনা ঐ সকল দ্রব্য ডক হতে চুরি করে চোরেরা ইংরাজ বাহিনীকে দুর্বল করে ভারতীয় স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সুবিধা করে দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে চুরি ও ডাকাতি দেশের ধন সম্পদের সমান বণ্টনের সহায়ক হয়েছে। বহু দেশীয় নকলকারী বিলাতি কালি ও ঔষধ প্রভৃতি দ্রব্য নকল দ্বারা ক্রমশঃ ঐ সকল বিলাতি দ্রব্যাপেক্ষা উত্তম পণ্য দ্রব্য আবিষ্কার করে দেশের শিল্প সম্পদের যথেষ্ট উপকার করেছে।"

অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অবশ্য বুঝা যাবে যে এই সকল অপকর্ম দেশের ধন সম্পদের ক্ষতি করে এই দেশকে বাসের অযোগ্য

করে তুলেছে। এইভাবে নাগরিকদের ধন-সম্পত্তি অপহৃত হওয়ায় তাদের মধ্যে গঠন মূলক উদ্যম অন্তর্হিত হয়েছে। অথচ কর্মালস আদর্শবিহীন ঐ সকল অপহারকদের :এই বিষয়ে কোনও উদ্যম স্বাভাবিক কারণে থাকে না। এর ফলে প্রাচীন সভ্য দেশগুলি আবার আদি কালীন অরাজক অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছে। এইখানে দেখা যায় যে এদের দ্বারা দৈবক্রমে সমাজের শতাংশের একাংশ মাত্র কালে-ভদ্রে উপকৃত হয়েছে। কিন্তু উহাদের অবর্তমানে আরও নির্ভুল ও প্রবল ভাবে দেশ বা সমাজ উন্নত হতে পারতো। অধুনা কালে সাহিত্যের মধ্যে গ্রন্থকারগণ অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো একটা বাহাদুরীর বিষয় মনে করেন। এদের এই প্রকার সহানুভূতির সহিত এদের উপরোক্ত উপকারিতার তুলনা করা চলে। অপরাধীদের প্রকৃত কার্যকরণ সম্বন্ধে শিল্পীদের অজ্ঞতাই ইহার কারণ। আমি মনে করি এই সকল অপরাধীদের মধ্যে কোনও প্রতিভা সন্ধান করা নিরর্থক। এদের বিষয় নিয়ে অযথা মাতামাতি না করে সমবেত চেষ্টাতে যথাসম্ভব এদের সংখ্যা কমানো উচিত। এদের প্রতি অধিক সহানুভূতি দেখানোর দ্বারা সমাজ উপকৃত হবে না; বরং এতদ্বারা এইসব অন্ধ লেখক এদের সংখ্যা বর্ধনের সাহায্য করেন।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

"অপরাধ-বিজ্ঞান" সম্বন্ধে অভিমত

SRI P. N. BANERJEE, Principal, University Law College and Later VICE-CHANCELLOR., Calcutta University—

"I read three volumes of "Aparadh Bijnan" by my friend and pupil, Dr. Panchanan Ghosal, M. Sc, D. Phil. I. P. S., J. P. of the West Bengal police with deep interest. He has attempted to give us the psychology, the history of crimes and criminals who are dealt with by the custodians of law and order in these provinces. Mr. Ghosal's approach to the subject is, so far as I know, absolutely new. I am told, his experience and his views will be embodied in the other volumes as well, If he succeeds in his great task, he will be constructing a new science of penology based upon solid personal experience. His researches in the subject can justly be regarded as very important contributions to the advancement of learning—the motto of the University of Calcutta. It is just as well that Mr. Ghosal has written his books in the Bengali language. The problem of crime and the problem of punishment are the two great problems which have attracted the attention of every social reformer, political statesman, legislator and magistrate throughout these countries. Mr. Ghosal holds the view that a criminal who commits crime is capable of redemption, and it is one of the fundamental tenets of practically all the major religions of the world. Whether such a criminal can also be redeemed by agencies other than religious or by State organisations, is a problem which Mr. Ghosal has' discussed in the course of his extensive researches. I wish Mr. Ghosal all success in his venture. I am confident his name will go down to posterity. Our people do not always realize that there are scholars amongst police officers."

DR. S. C. MITRA, M. A., D. PHIL. (LEIPZIG), F. N I.

Head of the department, Experimental Psychology, Calcutta University—

"I have just now gone through the 3rd volume of (Aparadh Vignan), a treatise on crimes especially concerned with women. I am very glad to state that it fully maintains the high standard of the first two volumes: They are not only interesting but highly instructive. Students of Psychology interested in the psychology of crime as also social workers will find the volumes to be of invaluable help to them.

There are two features which should be specially noticed and which really enhance the value of the volumes. One is that they are written by one—a high Police Officer--who has considerable practical experience of all that have been described in these volumes, and the second is that they are probably first volumes on criminology written in the Bengali language. In the interests and the welfare of the society it is highly to be desired that more such authoritative books be written in our language."

Sri N. K. Sen, Deputy Legal Remembrancer,

West Bengal, Later a Judge to the High Court—

"I must confess that when I started reading the 8 volumes of "Aparadh Bijnan" written by Dr Panchanan Ghosal. M. Sc., D. Phil., I.P.S., J.P. a senior officer of the West Bengal Police, I thought that they would contain repetitions of Criminology already made by several English authors. On going through this book which I read with absorbing interest I found that every volume contained something which was of interest to the laymen as well as to more serious students of the psychology of criminals. The author has gathered his experience from his long service in the police depart-

ment where he has had opportunities of making a first-hand study of the subject He has handled the topics in a masterly way and his keen observation and deductions are noticeable all throughout the eight volumes.

The subject itself has been a problem to all psychologists throughout the world and various authors have dealt with it in various countries. Unfortunately, I have not come across any book written in Bengali on so absorbing a subject We have so far treated juvenile criminals and for the matter of that all criminals as people who are beyond redemption and we have hardly ever tried to look at crimes as manifestations of diseased minds more often than not as products of environments. We have hardly made any serious attempt to go to the root and find out how far criminals were victims of circumstances. If we could remove the causes, we could also prevent crimes by preventing the growth of criminals. The author with remarkable lucidity has analysed from a large number of illustrative cases the minds of the criminals with a view to finding out why crimes are committed and under what circumstances. To the students of psychology, to the police who are charged with the prevention and detection of crimes and also to the parents and guardians of children these volumes should be an invaluable guide. To Judges who have to deal with criminal law and to criminal practitioners "Aparadh Bijnan" will be of immense help in studying the minds of the so-called criminals. These volumes I have no doubt be welcomed by all who are interested in seeing a better society. I believe it is for the first time that such a subject has been written in Bengali. I congratulate the author on his masterly handling of such a subject in such a simple style and I am sure whoever will read it, will learn something that is worth learning and I can

imagine no Bengali house to be without a complete set of this book."

Dr. H. Mukerjee, Governor of West Bengal—

"It is gratifying to see that in the midst of his multiferious duties the author could devote his time to the study of an abstruse subject like this."

Dr. K. N. Katju, Chief Minister, Madhya Pradesh, Formerly Governor, West Bengal—

"Read the Hindi version with interest. It will benefit the police and the public alike. I recommend this book for Police Training Schools."

Sree A. N. Das, Cuttack, Orissa—

"The Orya version of this book will be a definite acquisition of Orya language."